কীর্তিহাটের কড়চা

[তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

কীর্তিহাটের কড়চা

সুরেশ্বর বললে—এই শ্যামাকান্তের অভিশাপ নাকি রায়বংশ বহন করছে—শুধু শ্যামাকান্তের নয়—এ পাপের অংশ—সোমেশ্বর রায়—ডাকাতি করে তাঁর কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছিলেন। এই ছিল রায়বংশের বিশ্বাস।

সেকালের বিশ্বাস।

সুলতা বললে—তার মানে তো বুঝলাম না। সোমেশ্বর রায় তাঁকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে ?

সুরেশ্বর বললে—এ প্রশ্ন সেইদিনই বীরেশ্বর রায় তাঁদের কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে করেছিলেন। যখন বীরেশ্বর রায় মহেশচন্দ্রের পত্র হাতে নিয়ে বসে ভাবছেন, তখনই রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। প্রয়োজন তাঁর জরুরী। কিন্তু দারোয়ান বলেছিল—হুজুরের বারণ আছে। এখন তো—

কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম রায়বাড়ীর শুধু পুরোহিতই ছিলেন না, তিনি সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তর স্টেটের একজন ট্রাস্টিও ছিলেন। তাঁর একটা অধিকার ছিল। তিনি গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার ছলে সাড়া দিয়ে ডেকেছিলেন—বীরেশ্বর !

বীরেশ্বর রায় ঘাড়টি ফিরিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন—কে ? খানিকটা চিনতে পেরেছিলেন আওয়াজ থেকে, অন্য কেউ হলে হয় সাড়া দিতেন না, নয় দারোয়ানকে বলতেন—পরে আসতে বল !

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—আমি রামব্রহ্ম।

সজাগ হয়ে উঠে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আসুন !

ছেদী তাড়াতাড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠেই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

রামব্রহ্ম এসেই বলেছিলেন—একটি কথা যে বলতে এসেছি বাবা !

—বলুন।

—তোমার ভাগিনেয়, বলতে গেলে রায়বাড়ীর বংশধর সে-ই। তুমি তো আর বিবাহ করলে না ! কমলাকান্ত শ্যামনগরে এসেছে। শুনেছ ?

—শুনলাম ছেদীর কাছে।

—কি জন্য এসেছে, শুনেছ ?

—হ্যাঁ, রবিনসন নীলকুঠী করছে শ্যামনগর ঠাকুরপাড়ায় ; সে তাদের জমিতে জোর করে নীল বুনিয়েছে। কমলাকান্ত এসেছে সেখানে ; বিমলাকান্তের পত্র নিয়ে।

—হ্যাঁ। ছেদী তার সঙ্গে এসেছে। ছেদীর হাতে বিমলাকান্ত বাবাজী আমাকে পত্র দিয়েছে। লিখেছে "কমলাকান্ত জেদী। তাহার প্রকৃতি বীরেশ্বরের মত। সে ঝগড়াঝাঁটি

বাধাইয়া বসিতে পারে। কালটা বড়ই বিরুদ্ধ কাল। আমাদের গ্রহের ফেরও বটে এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজদের আক্রোশ বাড়িয়াছেও বটে। সুতরাং বীরেশ্বরবাবুকে অনুরোধ করিবেন যেন এই বিবাদটা তিনি মিটাইয়া দেন।" তা বিমলাকান্ত কি তোমাকে কোন পত্র দেয় নি ?

—না। বীরেশ্বর রায় হেসে বলেছিলেন—তাতে তার সম্মানের হানি হত!

—না-না বাবা। বিমলাকান্ত দেবতুল্য ব্যক্তি। কিছু মনে করে না। অবিচার বরং তার ওপরই হয়েছে। কথাটা তোমাকে এতদিন আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলতে পারি নি। তোমার পিতা আমাকে তাঁর শেষ অসুখের সময় বলেছিলেন। বলেছিলেন—বিমলাকান্তের পিতার কাছে যে অপরাধ করেছি, তার আর মার্জনা নেই আমার। তার ফল আমি পেয়েছি। বুঝতে পারছি পরকালে অনন্ত নরক হবে আমার। তাছাড়া যে পাপ আমি ঘাড়ে করেছি, সে পাপ আমার বংশকে আশ্রয় করে বংশকেও নরকস্থ করবে।

—আপনি বিমলাকান্তের বাপকে, তান্ত্রিক শ্যামাকান্তকে, কাঁসাইয়ের বন্যায় ফেলে দেওয়ার কথা বলছেন ?

সবিস্ময়ে রামব্রহ্ম বললেন—তুমি কি করে জানলে ?

—জেনেছি।

—তবে ?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাবা আপনাকে মৃত্যুর পূর্বে অসুখের সময় কি বলেছিলেন ?

—তুমি তো জান বলছ, বাবা!

—তবু আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। যা শুনেছি তা কতটা সত্য, তা একটু মিলিয়ে দেখতে চাই।

একটু চুপ করে থেকে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—সে আমি তোমাকে মুখে ব্যক্ত করতে পারব না। কারণ—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুমি তাঁর পুত্র, আমি তোমার পুরোহিত। তোমার পিতার পাপের কথা তোমাকে মুখে-মুখে বলতে জিহ্বা আড়ষ্ট হবে। আর তোমার মানও হয়তো—। হেসেছিলেন ন্যায়রত্ন। আমি ভাল করে স্মরণ করে লিখে জানাব। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কিন্তু বিমলাকান্তের কথা থাক ; কমলাকান্ত তোমার ভাগিনেয়, অন্যাপি তক বলতে গেলে তোমারও বংশধর, তাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। ছেদী চিঠি এনেছে, তার সঙ্গে একই নৌকাতে এসেছে আমার কন্যা এবং দৌহিত্রী। তাদের কাছে শুনলাম, বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছে বাবা। কমলাকান্তের সঙ্গে রবিন সাহেবের বচসা হয়ে গেছে। কমলাকান্ত শুধু বিমলাকান্তের রক্তধারা বহন করে না, সে বিমলার পুত্র, তোমাদের রক্ত রয়েছে, মহাতেজী। ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করেছে, সে ইতিমধ্যে গ্রামের লোকেদের নিয়ে বিবাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই আমার বৈবাহিক আমা

কন্যা-দৌহিত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিলম্ব করলে হয়তো এমন কিছু ঘটে যাবে, যার আর প্রতিকার করবার কোন পথ থাকবে না।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—আমি আজই পত্র লিখে লোক পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে বজরাও পাঠাচ্ছি, কমলাকান্তকে এখানে নিয়ে আসবে। যা করবার আমি এখান থেকে করব। তার সেখানে থাকবার প্রয়োজন কি?

রামব্রহ্ম বিস্মিত হয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়ের কথা শুনে। বালক কমলাকান্তের উপর বীরেশ্বর রায়ের ক্রুদ্ধ আক্রোশ এবং ঘৃণার কথা তিনি জানতেন, চোখে দেখেছেন তিনি। পাঁচ বছরের কমলাকান্তকে চাকর কোলে নিয়ে বেড়াত; ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়ে বাগানে ঘোরাতো; বীরেশ্বর রায় সেখানে থাকলে বলতেন, নিয়ে যা এই উল্লুক, ওটাকে নিয়ে যা এখান থেকে। নিয়ে যা বলছি।

শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল, তখন তিনি মদ্যপান করতে শুরু করেছেন; তিনি হুকুম দিয়েছিলেন—ওটাকে যেন তাঁর সামনে কেউ নিয়ে না আসে। যে আনবে চাবুক মেরে তার পিঠের চামড়া তুলে দেব আমি!

বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে নিয়ে থাকতেন বিবিমহলে। বিমলাকান্ত থাকতেন বাড়ীর দ্বিতীয় মহলটায়। কমলাকান্তকে মানুষ করবার জন্য দাসী ছিল—তাদের হাতে সে মানুষ হত। সে বড় ভালবাসত ভবানী দেবীকে, বিবিমহলে যাবার জন্য ঝোঁক ধরত। কিন্তু সেখানে যেতে পেত না সে। ভবানী দেবীরও হুকুম ছিল না এ মহলে আসবার।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন থেকে সকলেই যা বুঝেছিল তা সহজ অনুমানের কথা। একসঙ্গে বিমলার এবং ভবানীর সন্তান হল, মৃতবৎসা দোষগ্রস্তা বিমলার ছেলে বাঁচল, আর ভবানীর প্রথম সন্তান মরল। এই দুঃখ এবং ক্ষোভ থেকেই হিংসায় এমন হয়ে উঠেছেন বীরেশ্বর রায়। শেষ পর্যন্ত বিমলাকান্ত পুত্র কমলাকান্তকে নিয়ে এখান থেকে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। সে আজ বারো বৎসর। এই বারো বৎসরের মধ্যে বীরেশ্বর রায় ভগ্নিপতি-ভাগিনেয়ের নাম মুখে আনেন নি। কোন সংবাদ নেন নি। এমন কি নিজের বাপের উইলকে একরকম গায়ের জোরে নাকচ করে দিয়েছেন। কমলাকান্ত দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের আট আনা অংশের উত্তরাধিকারী, তাকে আজ এই বারো বছরের মধ্যে জমিদারীর লভ্যাংশ দেন নি। তত্ত্বতল্লাস বলেও কোন টাকা কি সামগ্রী তাকে পাঠান নি।

বিমলাকান্ত নির্লোভ মানুষ, সদাচারী পণ্ডিত মানুষ, সকলে বলে—মানুষটি দেব-চরিত্র। তিনি এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। কিন্তু কমলাকান্ত ছাড়বে না। সাবালক হলেই সে মামলা করবে। সকলের ধারণাই তাই।

গিরীন্দ্র আচার্য বলেন—মামলা হবেই ন্যায়রত্নমশাই। তার আগে কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। না হলে ধর্ম থাকবে না। বীরেশ্বর মিটমাট করবে না। সহজে বিষয় দেবে না।

বিষয় বিষ। শেষে এতে কুরুক্ষেত্র হবেই। দেখুন, রাজা নবকৃষ্ণ দেব, ক্লাইবের দেওয়ান, লক্ষ লক্ষ টাকা, বিষয় তো একটা রাজ্য বিশেষ। তাঁর উইল নিয়ে মামলা হল পোষ্যপুত্র গোপীমোহন আর ছেলের সঙ্গে। ছেলে জানে হারবে, তবু মামলা করলে। দুই পক্ষে ছ লাখ টাকা খরচ করে শেষে মিটমাট। মামলা চলে বিলেত পর্যন্ত। এও তেমনি হবে।

আচার্য দু-চারবার সাহস করে একথা বীরেশ্বরকে বলেছিলেন। বীরেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—ও কথা বলবেন না আমাকে। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। হতে দেব না। আমার মৃত্যুর পর যা হয় হবে। মামলায় যদি হারি, তবে তৎক্ষণাৎ বীরেশ্বর রায় দেহত্যাগ করবে।

তাই আজ এমন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনে ব্রাহ্মণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে রায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—মঙ্গল হোক তোমার, মঙ্গল হোক বাবা। এই তো, এই তো মানুষের মত কথা, তোমার মত কথা! আজ তোমার পিতা পরলোকে তুষ্টি পাবেন।

বীরেশ্বর রায় নীরবেই সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি কিছুটা উদাস, কিছুটা বেদনাভারাক্রান্ত, কিন্তু সে দৃষ্টি প্রসন্ন।

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—আমার কন্যা লক্ষ্মী এসেছে। ওখানে যে সব কাণ্ড চলছে, তাতেই ওরা তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে বলছিল—কমলাকান্তের নাকি চেহারা হয়েছে কার্তিকের মত। বাপেদের বংশের মত মাথায় খাটো নয়। এই লম্বা-চওড়া প্রশস্ত বুক, নাক আর চোখ এ দুটি—নাকি অবিকল তোমার মত। আমি বললাম—তা হবে না, 'নরাণাং মাতুলক্রম' যে মা।

বীরেশ্বরের মুখে এবার একটি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর বড় বড় উগ্র চোখ দুটিও নাকি জলে ভরে উঠেছিল। ন্যায়রত্নের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ন্যায়রত্ন চিঠি লিখে বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে এসেছিলেন। সোমেশ্বর রায় মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ডেকে অকপটে নিজের পাপের কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সেকালের মানুষের বিশ্বাসমত পারলৌকিক শান্তির ব্যবস্থা করতে। নিজে বিছানায় বসে শাস্ত্রবিধানমত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা খুলে সাগ্রহে পড়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। হয় বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, নয় বিশ্বাস করতে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন।

মহেশচন্দ্রের লেখা চিঠিখানায় শ্যামাকান্তের বিবরণের ঘটনার সঙ্গে কোন অমিল নেই।

অমিল ছিল দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে। দুজনেই আপন দোষ দেখতে পান নি। এখানে কিছুটা তফাৎ—শ্যামাকান্ত নিজের দোষ দেখেন নি। সোমেশ্বর কিছুটা দেখেছিলেন। ন্যায়রত্ন লিখছেন চিঠিতে—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—আপনি জানেন, স্বচক্ষে

দেখিয়াছেন, এই তান্ত্রিকের কি অত্যাচার আমি সহ্য করিয়াছি! আপনিই আমাকে এসব অনাচার-বীরাচারের সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, আমি তাহাও শুনি নাই। বংশের জন্য আমি সব সহ্য করিয়াছিলাম। তবে পাপ আমার লোভ! আমার সন্তান বাঁচিল, অবশ্য কলিকাতায় সাহেব ডাক্তার চিকিৎসা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—এবার রক্তদোষের চিকিৎসা হইল, এবার সন্তান রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহা আমি বিশ্বাস করি না। সন্তান ওই তান্ত্রিকই বাঁচাইয়াছেন। কারণ ওই সময়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে দশ হাজার ডিগ্রী পাইলাম, তাহা তো পাইবার কথাই নয়! দুইটা একসঙ্গেই ঘটিল। আগে ডিগ্রী পরে সন্তান! তান্ত্রিক হাসিয়া বলিলেন—এখন হইয়াছে কি, তোমাকে রাজা করিয়া দিব।

এতেই লোভ হয়েছিল সোমেশ্বর রায়ের। তাঁর বিচারের দৃষ্টিতে তিনি তান্ত্রিকের শক্তির দুটি মূলধন দেখতে পেয়েছিলেন। এক ওই সৌভাগ্যশীলা রাজরাজেশ্বর, আর তাঁর তান্ত্রিক সাধনা তপস্যার শক্তি, ওই মনোহরা যোগিনী!

তাঁর মনে মনে অভিপ্রায় ছিল মনোহরাকে পেলে তিনিও এই সাধনা করতে পারবেন। এবং সিদ্ধিও পাবেন।

ইতিমধ্যে মনোহরাকে তিনি আকৃষ্ট করবারও চেষ্টা করেছিলেন। মনোহরা—যোগিনী হোক না দেবী, যাই হোক সে বাইরে ছিল একটা মাথাখারাপ দরিদ্রকন্যার মত। সামান্য রঙচঙে দামী জিনিস পেলে সে খুশী হত। ভাল খেতে পেলে খুশী হত। আর তার স্নেহ পড়েছিল বিমল ... উপর। ছেলে কোলে নিয়ে সে বসে থাকত পরমানন্দে। এই সুযোগ নিয়েছিলেন সোমেশ্বর ... ক্রমে তার বিশ্বাসও হয়েছিল যে, মনোহরার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি তাঁকে বলেছিলেন—ওই সাধুটাকে ছেড়ে দে না। আমার কাছে থাক। আমি কত জিনিস দেব, কত ভাল খেতে দেব! রাণীর মত রাখব! কি?

পাগলী বলেছিল—আমাকে মারবে না ওর মত?

—না, না, না। মারব কেন?

—ও আমাকে মারে। বড মারে।

—তাই তো বলছি, ওকে ছেড়ে দে।

—ও যে আমাকে খুন করে দেবে। ও খুনে। বাবারে।

—ওকে তাড়িয়ে দেব এখান থেকে।

—ও মন্তর জানে, মেরে ফেলবে আমাকে। তোমাকেও ফেলবে। ও তোমাকে ভয় করে না।

হঠাৎ সোমেশ্বরের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তুমি ওকে খুন করে দিতে পার না। দাও না গো! তোমার কাছে আমি খুব ভাল হয়ে থাকব। তোমার মেয়েকে মানুষ করব। দাও না গো!

এই বীজ! বীজ অঙ্কুর মিলল। পাতা বের হল। ক্রমে-ক্রমে সোমেশ্বর মনে মনে সাপের মত চক্রান্তের পাকে-পাকে বিষধারের মত হিংস্র হয়ে উঠলেন। সেদিন রাত্রে ওই বন্যার নৌকো ভাসিয়ে ওপারে যাবার পথে তাঁর মনে সঙ্কল্প জাগল। এই সুযোগ। বন্যার এই দুর্দান্ত তুফানে ফেলে দেবেন। রক্তপাত করতে হবে না, আঘাত করতে হবে না, শুধু জলে ফেলে দেওয়া। মারবে ওকে কাঁসাই। প্রত্যক্ষ অপরাধ হবে না।

তাই দিলেন। কিন্তু—।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা বিচিত্র সুলতা, সোমেশ্বর রায় এই পাগল মনোহরাকে নিয়ে সাধনা করতে সাহস করেন নি, তাকে আহারে-বিহারে নানা সামগ্রীতে সন্তুষ্ট করে নিজের বিলাস-সঙ্গিনীতে পরিণত করে তাকে আটকে রেখেছিলেন। ধারণা ছিল যোগিনী তুষ্ট হয়েই তাকে ধরা দিয়েছে। তার দয়াতে সব হবে।

তা হয়েছিল। সোমেশ্বর রায় তখন মহলের পর মহল কিনেছিলেন। রবিনসন সাহেবকে টাকা ধার দিয়ে তার কুঠীর লাভ থেকে লাভ পেয়েছিলেন। কলকাতায় একজন সাহেব অ্যাটর্নীকে টাকা ধার দিয়ে তার টণ্ডী হয়েছিলেন। কিন্তু কোন বিভূতি তিনি পান নি।

মেয়েটা বেঁচে ছিল বছর তিনেক। তিন বছর সোমেশ্বর উন্মত্ত ছিলেন তাকে নিয়ে। ওরা[illegible]রেশ্বরের জন্মের পর সে মারা যায়। অনেক দেওয়ার সঙ্গে সে তাঁকে আরও একটি সামগ্রী কা[illegible]য়ে গিয়েছিল, সে হল সোমেশ্বরের ব্রাত্যনারীর উপর একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ! এদিকে তাঁর অ[illegible]রুচি আগে ছিল না। আগে বাঈজী রেখেছেন, বাড়ীতে সেবাদাসী রেখেছেন কিন্তু ব্রাত্যনারীতে রুচি ছিল না। এবার হল এই রুচি। রাজকুমারী কাত্যায়নী এক কন্যা, এক পুত্রের পর স্বামীকে দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা। যা ইচ্ছা করুন, তিনি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং গৃহের গৃহিণীত্ব নিয়েই পরিতুষ্ট।

রামব্রহ্ম লিখেছিলেন—শুধু ব্যভিচারের জন্য যোগিনীকে লইয়া থাকার জন্য তিনি প[illegible] হইলেন, পাপগ্রস্ত হইলেন। তিনি স্বমুখে এই কথা আমাকে বলিলেন, এই পাপেই আমি ডুবিলাম। এই পাপ হইতে উৎপন্ন ব্যাধি হইতেই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছি অনন্ত নরকেও আমার বোধ হয় স্থান হইবে না। আপনি যথোচিত যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া ইহার প্রতিকার করিবেন। তান্ত্রিকের নিকট ঋণ আমি শোধ করিয়াছি। বিমলাকান্তকে অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছি। কিন্তু মনোহরা যোগিনীকে লইয়া যে পাপ করিয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে জানি না!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে কি ভেবেছিলেন, মনে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা জানি না। তাঁর নিজের জীবনে সোফিয়া পর্বের মধ্যে এর কোন প্রভাব পেয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে আমি যেন দেখেছিলাম। বিমলা থেকে বীরেশ্বর তিন বছরের ছোট; এই তিন বছরের মধ্যেই সোফিয়া এসেছিল তাঁর জীবনে। তবে সব কথা

চিঠি পড়ে তাঁর মনে পড়েছিল পাগলাবাবাকে, তার নিদর্শন আছে। এবং এ চিঠিগুলির প্রতিটি অক্ষর তাঁর সত্য মনে হয়েছিল। তিনি আকুল হয়ে পত্র লিখেছিলেন কমলাকান্তকে। কমলাকান্ত তাঁর কাছে রত্নেশ্বর; তিনি তাঁকে রত্নেশ্বর বলেই পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রও আছে, এই দেখ। পড়ি শোন।

প্রাণাধিকেষু,

অসংখ্য কোটি আশীর্বাদ এবং স্নেহচুম্বনপূর্বক শ্রীমান রত্নেশ্বর বাবাজীবন অত্র পত্রে তোমাকে লিখি যে, ছেদী সিং এবং অত্র রায়রাজবাটীর পুরোহিত পূজ্যপাদ ন্যায়রত্নমহাশয় প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, তুমি সম্প্রতি শ্রীশ্রীকাশীধাম হইতে দীর্ঘকাল পর কার্যব্যপদেশে শ্যামনগর বাটী আগমন করিয়া তত্র অবস্থান করিতেছ। নীলকর জন রবিনসন সম্প্রতি শ্যামনগর ঠাকুরপাড়ায় কুঠী পত্তন করিয়া তত্রস্থ জমিদার সরকারবাবুদিগের সহিত সহযোগ করতঃ ওখানকার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপরাপর প্রজাদিগের উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেছ, বলপূর্বক প্রজা সকলের ধান্য জমির ধান্যাদি ফসলসমূহ ভাঙিয়া দিয়া নীল বপন করাইতেছে। এমন কি রায়বাটীর জামাতা দৌহিত্রের জমিতেও জবরদস্তিপূর্বক নীল বপন করিয়া তোমাদিগের ভাগদার জোতদের নির্যাতন, অপমান করিয়াছে, তৎসংবাদসমূহ অবগত হইয়া প্রতিকারার্থ তুমি কাশীধাম হইতে আসিয়াছ। উত্তম করিয়াছ। এতাদৃশ উৎপীড়ন, জবরদস্তি শুধুমাত্র অর্থক্ষতিকারকই নয়, ইহা মর্যাদা-হানিকর ও অপমানজনক। অবশ্যই ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজন। কিন্তু বাবাজীবন, অত্র বাটী—যাহা তোমার বাটী—তথায় না আসিয়া শ্যামনগরে আসিয়া উঠা তোমার কি উচিত হইয়াছে? এবং নিরাপদ হইয়াছে? ইহাতে আমি মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিলাম, মর্মস্থলে আঘাত পাইলাম। দীর্ঘকাল তোমাকে নিরীক্ষণ করি নাই। তজ্জন্য বক্ষে তাপ অনুভব করি। আমার তো তুমি ব্যতীত কেহ নাই। যক্ষের মত সমস্ত আগলাইয়া বসিয়া আছি মাত্র। ছেদীর নিকট অবগত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্নকে তদীয় কন্যা বলিয়াছেন শুনিলাম যে, তুমি কুমার কার্তিকের মত সুন্দর হইয়াছ; রায়বংশের অনুরূপ বীরোচিত আকৃতি হইয়াছে এবং তোমার চোখ এবং নাসিকা অনেকটা আমার মত হইয়াছে। শুনিয়া অবধি চিত্ত, হৃদয় তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমাকে বক্ষে লইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

আমি বজরা পাঠাইলাম, তুমি পত্রপাঠ এই বজরায় স্বীয় বাটীতে চলিয়া আসিবে। আমি ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। বাড়ীঘর চুনকাম করিয়া পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আসিবার পূর্বে দ্রুতগামী নৌকায় কাহাকেও অগ্রে পাঠাইবে। এখানে ৺রী মাতার স্থানে এবং ৺রাজরাজেশ্বরের স্থানে বিশেষ পূজা দেওয়া হইবে। নহবৎ বাদ্যের ব্যবস্থা করিব।

সর্বশেষে যাহা লিখিতেছি তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ছেদী বলিল—তোমার সঙ্গেই তোমার ভালো-মা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভবানী দেবী তদীয়া পিতৃদেবসহ কাশীধাম হইতে আগমন করিয়াছেন এবং শ্যামনগরে তোমাকে নামাইয়া তিনি অন্যত্র কোথাও গমন করিয়াছেন। ছেদী

তাহার কোন ঠিকানা, নিশানা অবগত নহে। অবগত হইলে আমি নিজেই গমন করিতাম। তুমি তাঁহাকে মদীয় এই নির্দেশ জানাইবে যে, তিনি যেন অত্র বাটী আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আমার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি আসিলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিব এবং অত্র বাটীতে তাঁহাকে লইয়া আসিব। তাঁহাকে বলিবে, তিনি আগমন করিলেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি কলিকাতায় যাইব। তথায় আমি এক পাগলাবাবাকে জানি—সম্ভবতঃ তাহাকে দেখিলে তাঁহার এতদিনের ব্রত উদযাপিত হইবেক। তুমি পত্রপাঠ এই বজরাতে বাটী চলিয়া আসিবে।

ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীবীরেশ্বর রায় দেবশর্ম্মণঃ

বীরেশ্বর রায় বাড়ী সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমিদারী সেরেস্তার খাতায় খরচ লেখা আছে, ইমারত খাতে খরচ; শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর ওরফে কমলাকান্ত রায় ভট্টাচার্য আসিবেন বিধায় সমুদয় ইমারৎ সংস্কার চুনকাম ইত্যাদি করা হয়, তাহার জন্য ঝিনুকের চুন পোড়াই খরচ একদফা চার টাকা পাঁচ আনা পাঁচ গণ্ডা।

চাপরাসী, দারোয়ান, পাইকদের পাগড়ির জন্য লাল শালু খরিদ। এমনি অনেক খরচ সে সময় রায় এস্টেটে হয়েছিল। যাতে যে কেউ হোক বলবে, বীরেশ্বর রায় সেদিন মনের সকল সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো বা তিনি মনে মনে অভিযোগ করছিলেন ভবানী এবং বিমলাকান্তের উপর। কেন তারা তাঁকে বলে নি এতদিন? তারা তো এসব পরিচয় অনেক দিন আগে জেনেছে! সে সময় জানালে তো সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যেত। যেদিন কলকাতায়—মহেশচন্দ্র ভবানীকে কলকাতায় বিমলাকান্তের কাছে নিয়ে সব কথা প্রকাশ করেছিলেন—সেই দিন!

রত্নেশ্বর তাঁর সন্তান, প্রথম সন্তান।

দিদি বিমলার জন্য সেদিন এ-সত্য গোপন করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা তিনজনে। তিনি, বিমলাকান্ত এবং ভবানী। আর জানত বিমলা, সে নিজে চোর! সে গত। আর জানতেন তাঁর বাবা। সোমেশ্বর রায়। তিনিই এ সংবাদ গোপন করে রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—বিমলা গত হোক, ও বেশীদিন বাঁচবে না। তারপর তুমি পোষ্যপুত্র নিয়ে ফিরে নিও।

বিমলাকান্তও প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

তাঁর এইসব চিন্তার কথার আভাস আছে তাঁর চিঠিতে। কাশীতে বিমলাকান্তকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় সমস্ত চিঠি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কাশীতে বিমলাকান্তকে এই অনুযোগ করেই চিঠি লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়। এবং তাঁকে লিখেছিলেন—

আপনি আমার কাছে পুত্র ঋণে আবদ্ধ। তাহা পরিশোধ করিতে আপনি আসিবেন। বিলম্বে আসিবেন। তাহাতে সরকারী কর্ম না থাকে, কর্ম পরিত্যাগ করুন। আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন, তিনি আমার কনিষ্ঠা সহোদরা। তাহাকে লইয়া আসুন, ৺পিতাঠাকুর তাঁহার ঋণ পরিশোধার্থে অর্ধেক সম্পত্তি নামে রত্নেশ্বরকে দিলেও তাহা আপনার, আপনাকেই তাহা দিয়া গিয়াছেন। তাহা অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমার হৃদয় অধৈর্য পীড়িত হইয়া নিয়ত অশান্ত অধীর। আপনি অবিলম্বে আসুন। এবং আপনার পক্ষে আরও গুরুতর প্রয়োজন এই যে, সম্ভবতঃ আমি মহাসাধক ভবদীয় পিতৃদেব ও মদীয় শ্বশুরমহাশয়কে জানি। তিনি অদ্যাপি জীবিত। পত্রপাঠ চলিয়া আসুন।"

চিঠিখানা রেখে সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় কলকাতায় লোক পাঠিয়েছিলেন, জরুরী পত্র লিখেছিলেন সেখানকার নায়েব দেওয়ানকে।

"আপনি পত্রপাঠ 'বহুবাজার' গিয়া সোফিয়া বাঈজীর সন্ধান করুন। তাহার ওখানে পূজনীয় পাগলাবাবা আছেন কিনা সন্ধান লউন। যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া জানবাজার বাটীতে আনিয়া পরম যত্নে রাখিয়া সেবা করিবেন। যদি না আসেন তবে সদাসর্বদা বহুবাজারের বাটীর উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। যেন কোথাও চলিয়া না যান।

যদি সোফিয়ারা ঐ বাটীতে না থাকে, তবে তাহারা এখন কোথায় বাস করিতেছে, পাগলাবাবাই বা কোথায় বাস করিতেছেন, বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার সন্ধান করুন। দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিতে হইলে তাহাও করিবেন। অত্র কর্মে অর্থব্যয়ের জন্য চিন্তা করিবেন না। যত টাকা খরচ হয় করিবেন। সহস্র, পাঁচ সহস্র কোনমতে মালিকের মতের জন্য চিন্তিত হইবেন না।"

বীরেশ্বর রায়ের আকৃতি, উল্লাস সম্ভবতঃ বর্ষার কাঁসাইয়ের বন্যার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। পরিচয় তার সব কিছুতে রয়েছে। জমা-খরচের খাতায় একটা খরচ রয়েছে। তার মধ্যেও রয়েছে পরিচয়। বিবিমহলের জন্য আসবাব খরিদ। প্রত্যাশা তিনি অনেক করেছিলেন, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কিন্তু কমলাকান্ত আসেন নি। কাইলে চিঠি রয়েছে কমলাকান্তের। বজরা ফিরে এসেছিল। বজরা থেকে নেমে এসেছিল খানসামা কর্মচারী কৃষ্ণ সরকার, রাঁধুনী বামুন, আর চারজন চাপরাসী। এসে নীরবেই বোধ করি চিঠিখানা বীরেশ্বর রায়ের হাতে দিয়েছিল। এই সেই চিঠিখানা সুলতা।

বজ্রের মত চিঠি!

পরম সম্মানাস্পদেষু, মাননীয় মহাশয়,

ভবদীয় পত্রপ্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিভ্রম ও বিভ্রান্তিতে পড়িলাম। আপনি প্রাণাধিক ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া আমাকে অবিলম্বে কীর্তিহাট যাত্রা করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি বহু চিন্তা করিয়া এবম্বিধ আচরণের হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না।

ভাবিতেছি, এই কলিকালে কি দ্বাপরযুগের ধনুর্বক্ত পর্বের ভূমিকা হইতেছে? মহাশয়ের সহিত প্রবল প্রতাপ মহারাজ বংশের তুলনা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণসন্তান আমি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতে পারি না।

মহাশয়, কোন্ মুখে কি করিয়া এমত সুন্দর বাক্যগুলি লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। আপনি আমার মাতুল, ইহা আমার ভাগ্যের দোষ। আমি রায়বংশের দৌহিত্র, আমার রক্তে আপনাদের রায়বংশের রক্তের সংস্রব আছে ইহাতে আমি জ্বালা অনুভব করি। রায়বংশ ধনীর বংশ, কিন্তু তাহাদের পাপের সীমা নাই। এসব কথা আমি জানিতাম না। বীরপুরের ছত্রী গোপাল সিংহ প্রাচীন লোক, সে এখানে আসিয়া আপনার পিতা পিতামহের কুৎসা করিয়া গেল। এবং স্বয়ং আপনি তাহার প্রমাণ। আপনি অত্যাচারী, আপনি মদ্যপ, আপনি লম্পট; মুসলমান বাঈজী রাখিয়া তাহাকে লইয়া কলিকাতার বসতবাটীতে উল্লাস করেন; আপনি নিজের সতীসাধ্বী দেবীতুল্যা পত্নীকে বিতাড়িত করিয়াছেন। মহাশয় আমি ব্রাহ্মণসন্তান, সামান্য ব্যক্তি। তবে আমার পিতা দেবচরিত্র ব্যক্তি। পিতামহ শুনিয়াছি মহাসাধক ছিলেন। আপনার সহিত আমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক অনেক দিন পূর্বেই ছিন্ন হইয়াছে। আমার পিতাকে আপনি একরূপ বিতাড়িত করিয়াছেন। আমাকেও করিয়াছেন। আপনার সহিত কোন সম্পর্কই আমার নাই। উক্ত কীর্তিহাটের পুরী আপনার নানা কর্মে পাপপুরীতে পরিণত হইয়াছে। ওই পুরীতে আপন স্বত্বের বলে যেদিন প্রবেশ করিতে পারিব সেইদিন যাগযজ্ঞ দ্বারা সমস্ত শুদ্ধ পবিত্র করিয়া প্রবেশ করিব। তৎপূর্বে নহে। আপনার নজরা ফিরাইয়া দিলাম।

আপনি আমার ভালো-মা কোথায় আছেন জানিতে চাহিয়াছেন। তাহা আপনি পাইবেন না। তিনি আজ জীবনে তপস্যা সার করিয়াছেন। সমগ্র কাশীর লোকে তাঁহাকে সতী-মা বলিয়া ডাকে। তাঁহার মুখের দিকে কেহ চোখ তুলিয়া তাকায় না। আপনার মত পাপীর স্পর্শমাত্রে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি দয়া করিয়া তাঁহার কোন খোঁজ করিবেন না।

নীলকর জন রবিনসন সাহেবের সঙ্গে যাহা করিবার তাহা আমিই করিব। তবে যাহাতে রায়বংশের ভাগিনেয়ের মর্যাদাহানি হয় এমন কিছু করিব না, তাহাতে নিশ্চিত থাকিবেন। আমি মূর্খ নহি। সুতরাং অতঃপর এ লইয়া ভবদীয় শিরঃপীড়ার কারণ না ঘটিলে কৃতার্থ হইব। পরিশেষে নিবেদন ইতি।

—নিবেদক

—শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্মা (আমার নাম রত্নেশ্বর নহে)।

সুরেশ্বর বললে—

চিঠিখানার মধ্যে ছিল বজ্রের আঘাত।

নির্মম আঘাত তিনি পেয়েছিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করেছিলেন তা বলতে পারব না। তবে ঘটনার স্রোত তখন দ্রুত বইতে শুরু করেছে।

ঠিক চারদিন পরের লেখা একখানা চিঠি দপ্তরের মধ্যে রয়েছে। বীরেশ্বর লেখেন নি। বীরেশ্বর রায়কে লিখেছেন তাঁর দেওয়ান ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য। তিনি দিন-পনের আগে মহল সফরে বেরিয়েছেন। ওই নতুন পত্তনী নেওয়া মহলদিগরে। সেসব মহলে অনেক কাজ। লাট কুতুবপুরের জমিদারী কাছারীতে নিজের কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহলে মহলে।

সে আমলে জমিদারদেরও নিজেদের আকার-আয়তন মত চতুরঙ্গবাহিনী ছিল। ষোল কাহারের পাল্কি, বর্ক-অন্দাজ—যারা দস্তুরমত বড় পাগড়ি-কুর্তা এবং নাগরা জুতো পরে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে চলত; এরা অধিকাংশই ছিল হিন্দুস্থানী ডন-বৈঠক করা, ঘিউ-রুটি খাওয়া শরীর। নিত্যনিয়মিত কুস্তি করত এরা। তার সঙ্গে এদেশী লাঠিয়াল পাইক। কালো রঙ, পাকা বাঁশের মত শরীর, আঁটসাঁট করে হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড়, গায়ে জমিদারবাড়ীর দেওয়া ইউনিফর্ম ফতুয়া, মাথায় লাল শালুর পাগড়ি, কাঁধে একখানা গামছা। হাতে চার হাত লম্বা এদেশী লাঠি। আর থাকত দুজন ঘোড়সওয়ার হরকরা; এরাও বর্ক-অন্দাজদের সামিল, তবে এদের বিশেষ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে যাওয়া-আসা। জরুরী চিঠি নিয়ে জমিদারী কাছারীতে আসা এবং তার উত্তর নিয়ে যাওয়া। এছাড়া গরুর গাড়ীতে আমীন এবং জরীপের সরঞ্জাম, তার সঙ্গে হিসাবনিকাশনবীস মুহুরী দুজন-তিনজন। আরও যেত রসুইয়ে বামুন, চাকর। সরঞ্জামেরও সমারোহ ছিল, রান্নার বাসন, বড় কড়াই, হাতা, বড় হাঁড়া, সতরঞ্জি, তাকিয়া, চাদর, রূপা-বাঁধানো হুঁকো। তার সঙ্গে ডাবা-হুঁকো। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, মাহিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। কল্কে তামাক ঝুড়িভর্তি। আর সঙ্গে চলে গজেন্দ্রগমনের সঙ্গে তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজহস্তীর মত জমিদার-হস্তী। কাছারী পৌঁছে দেওয়ান সরজমিনে তদারকের প্রয়োজন হলে হাতীর পিঠে থাকেন। এই হাতী ঘোড়া গরুরগাড়ীর রথ এবং পদাতিক দিয়ে চতুরঙ্গবাহিনী।

উদ্দেশ্য ছিল, সমারোহ দেখিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই ত্রাস এবং সম্ভ্রম সঞ্চার করা।

নূতন মহলদিগরে প্রজাদের বাকী খাজনা আদায়, খাজনা বৃদ্ধি, পতিত জরীপ এবং পতিত জমি ভেঙে জমি তৈরীর ব্যবস্থা। তার সঙ্গে আছে মাঠের মধ্যে খাস পতিত সামিল সিচের পুকুর পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা; জমিদার কিছু টাকা দেবেন, বাকিটা বেগার ধরে কাটানো। নদীর ধারের মহলে নদীর বন্যা রোধের জন্য বাঁধ তৈরী। দেবস্থান মেরামত, দরকারমত দু-চার বিঘা জমি গ্রাম্য-দেবতার সেবার জন্য দান ইত্যাদি মহৎ কর্মও ছিল এর সঙ্গে। গ্রাম্য কলহ-বিবাদের বিচার করা হত।

চতুরঙ্গবাহিনী কাছারীতে এলে গ্রাম কলরবে মুখর হয়ে উঠত। নিত্য দেড় মণ দু মণ চাল

রান্না হত। গ্রামের দরিদ্রজনেরা আসত, পাত পেতে বসে খেত, কুমড়োর ছক্কা, বেগুনের অম্বলসহযোগে ডাল-ভাত খেয়ে হরিবোল দিয়ে উঠে যেত। এ-হরিবোল জমিদারের জয়ধ্বনি। তাছাড়া গ্রামের সদ্‌গৃহস্থ মণ্ডলদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। স্বয়ং দেওয়ান দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন।

এবারের আয়োজনে ঘটা ছিল অনেক বেশী। এবার মণ্ডলান তৌজী বীরপুরের কাছাকাছি গ্রামের কাছারীতে দেওয়ানের কাছারী পড়েছে।

বীরপুর মণ্ডল প্রজা গোপাল সিং ছত্রীর এলাকা। সে-গ্রামে আজও খাজনা আদায়ের দপ্তর পড়ে নি। কথাবার্তাও না। যা হচ্ছে আদালত মারফত। এবার কাছাকাছি কাছারীতে স্বয়ং দেওয়ান এসে বসে কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব রচনা করছেন।

স্বয়ং বীরেশ্বর রায়ের আসবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন ছেদী সিং আসার পর সে-মত পরিবর্তন করে তিনি দেওয়ান আচার্যকেই পাঠিয়েছেন। তিনি কমলাকান্তকে পত্র লিখে বজরা পাঠিয়ে রায়বাড়ীর রঙ ফিরিয়ে মেরামত করে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় এল ওই বজ্রের মত পত্রোত্তর।

ঠিক তার চার দিন পর এল দেওয়ান আচার্যের এক পত্র। পত্র নিয়ে এসেছে ঘোড়সওয়ার হরকরা। সে-পত্র কমলাকান্তের ওই পত্রের পর যেন বজ্রাঘাতের বিদ্যুৎ এবং গর্জনের পর তার আগুন-জ্বলে-ওঠার চেহারা নিয়ে দেখা দিল।

দেওয়ান আচার্য লিখেছেন—হঠাৎ একটা জরুরী সংবাদ পেয়ে না জানিয়ে তিনি থাকতে পারলেন না। তাই সওয়ার হরকরা মারফত পাঠাচ্ছেন। আজই সন্ধ্যার সময় তিনি সংবাদ পেয়েছেন—বীরপুরের গোপাল সিং ছত্রী শ্যামনগর গিয়েছিল কমলাকান্তের কাছে। কমলাকান্ত শ্যামনগরে এসেছেন এ-সংবাদটা এ-অঞ্চলে রটে গেছে। সেখানে নীলকুঠীর সাহেবের সঙ্গে মামলা লড়বেন বলে গুজব খুব জোর হয়ে উঠেছে। গোপাল সিং ছত্রী খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিল, আজ ফিরে এসে নাকি গ্রামে প্রচার করেছে যে, কমলাকান্ত তাঁর তরফ থেকে তার মণ্ডলান স্বীকার করে নেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি নালিশ দায়ের করছেন মেদিনীপুর আদালতে মামা বীরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে। এবং প্রত্যেক মহলে ঢোলসহরত করে প্রজাদের জানিয়ে দেবেন যে, যারা বীরেশ্বর রায়কে ষোল আনা খাজনা দেবে, তারা নিজের দায়িত্বে দেবে। কমলাকান্ত সমুদয় সম্পত্তির আট আনা অংশের মালিক, তিনি তাঁর অংশের খাজনা নিজে আদায় নেবেন। বীরপুরের গোপাল সিং কাল বীরপুরে গ্রাম-দেবতার কাছে বলি দিয়ে পুজো দিয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে দশখানা ঢাক নিয়ে সারা গ্রাম তোলপাড় করে বলেছে—এবার বীরেশ্বর রায়কে দেখ্ লেঙ্গে। নাকে ঝামা ঘষব। গোটা সম্পত্তি যাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস যায় তার চেষ্টা করছে কমলাকান্ত।

দেওয়ান আচার্য লেখে গিয়েছিলেন—বীরেশ্বর শ্যামনগর থেকে কমলাকান্তকে সদরে

আহ্বান জানিয়ে কীর্তিহাটে আনবার জন্ম বজরা পাঠাচ্ছেন। পত্রের খসড়া তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বীরেশ্বর রায় খসড়া পড়তে দেননি, পড়ে শুনিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—সম্ভবতঃ ভবানী দেবীর কথা এবং পাগলাবাবার কথা তাঁকে জানতে দিতে চান নি। যেটুকু তিনি কমলাকান্তকে লিখেছিলেন, সেইটুকুই পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর এই খবরে দেওয়ান আচার্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, তিনি লিখেছেন—তার খানিকটা তোমাকে পড়ে শোনাই সুলতা, বোধ হয় মুখে বলার চেয়ে ভাল হবে।—

বীরপুরের গোপাল সিং শ্যামনগর গিয়া কমলাকান্তের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছে। এবং তাঁহার কাছ হইতে আশ্বাস লইয়া ফিরিয়াছে। গোপাল সিং নাকি কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবাবু মহোদয়ের তরফ হইতে ঢোল সহরত করিয়া পরোয়ানা জারী করিতেছেন যে, প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়কে খাজনা প্রদান করিবে, তাহারা নিজের দায়িত্বে প্রদান করিবে। তাঁহার তরফ হইতে তাহা ওয়াশীল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না। এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়ের সহিত বন্দোবস্তমত কোন বৃদ্ধিই মঞ্জুর করিবেন না।

মিশ্র বলিলেন—তিনি লাট কুতবপুরের সকল গ্রামেই সকল প্রজার কাছেই এবম্প্রকার কথাবার্তা শ্রবণ করিয়াছেন। সম্ভবত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে দিবার চেষ্টা করিবেন।

সুতরাং অবিলম্বে মেদিনীপুরের আদালতে খোঁজ লওয়া আবশ্যক এইরূপ কোন মামলা দায়ের হইয়াছে কিনা। এবং শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভায়াজীবনের সঙ্গে একটা রফা প্রয়োজন। বিবাদের ক্ষেত্রে গোপাল সিংহের সহিত তাহার যোগাযোগ অতীব ক্ষতিকর হইবেক। আরও শুনিলাম—শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবাবু কীর্তিহাট মোকাম আসিতেছেন না। শ্যামনগর এখান হইতে সন্নিকট। মাত্র ক্রোশ-পনের দূর। শুনিতেছি সেখানে শ্রীকমলাকান্ত ধর্মঘট করিয়া রকারবাবু ও রবিনসন সাহেবের সহিত ঘোরতর বিবাদের সৃষ্টি করিতেছে।

অদ্য ভোর-ভোর সওয়ার যাত্রা করিতেছে। দ্বিপ্রহর বা তৃতীয়প্রহর নাগাদ পৌঁছিবে। আমাকে অবিলম্বে আপনার আদেশ জানাইবেন, আমি অতঃপর কি করিব।

শ্রীশ্রী৺শ্রীমাতার চরণাম্বুজে এবং শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরের নিকট মালিকের সর্ববিধ কল্যাণ কামনান্তে ইতি—

নিবেদক ভবদীয় আশ্রিত

শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র আচার্য

শেষে তোমাকে সম্বোধনটা শোনাই, না'হলে অসম্পূর্ণ থাকবে জমিদারের পরিচয়।

মহামহিম মহিমার্ণব, প্রবলপ্রতাপ, বহুজন প্রতিপালক, অশেষ গুণান্বিত, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর রায় ভূস্বামী কীর্তিহাটস্থ বরাবরেষু।

অজাতশত্রু বাপবিম্বিসারকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন। ঔরংজীব পিতা শাজাহানকে বন্দী করে রেখেছিলেন আগ্রা ফোর্টে। সেসব রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন বাপ বা ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ মদ্যপ, অপব্যয়ী, ব্যভিচারী হলে ছেলে বা উত্তরাধিকারী সরকারে দরখাস্ত দিয়ে প্রার্থনা করত যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজ ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য অপব্যয়ী মালিকের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে' নেওয়া হোক। তার নজীর তখন হয়েছে। কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলার বনওয়ারিবাদ রাজবাড়ীর রাজাবাহাদুর এক মুসলমান বাঈজী নিয়ে কলকাতায় প্রমত্ত জীবনযাপন করতেন বলে তাঁর ছেলে নালিশ করে সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে দিয়েছিল। পুরনো রাজা মাসোহারা নিয়ে কলকাতায় থাকেন। এইসব নজীর সংগ্রহ করেছিলেন কমলাকান্ত।

বীরেশ্বর রায় তাতে ভয় পান নি। ভয় পাবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তবু তখন তিনি মত্ততায় অধীর। ক্রুদ্ধ হয়েও ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারেন নি। তিনি রত্নেশ্বর রায়কে লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু,

তোমার উদ্ধত স্পর্ধিত পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। এবং মনে মনে শঙ্কিত হইলাম যে, তোমার এবম্বিধ উক্তির জন্য নরকেও তোমার স্থান হইবে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে। ইহার জন্য তোমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। তুমি কাহাকে কি বলিয়াছ তাহা জান না।

গোপাল সিং রায়বংশের অবমাননাকারী; তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার পক্ষে ইহা যে কত বড় পাপ তাহা তুমি অবগত নহ।

তোমার সহিত পত্রালাপেও আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছে। তথাপি স্নেহনিম্নগামী। এসব উন্মার্গগামিতা পরিত্যাগকরতঃ তুমি এখনও আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, বরং তোমার ভালো-মাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাতে তোমার পাপ হইয়াছে কিনা। আমার বিশ্বাস তাহা তুমি কর নাই। তিনি কখনই এবম্প্রকার কার্য ও উক্তি অনুমোদন করিতে পারেন না। ইহা ব্যতীত শুনিতেছি, তুমি আমার নামে মামলা করিতে মনস্থ করিয়াছ। মহলদিগরের দোরবস্ত প্রজা সকলকে রায়সরকারে খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া ঢোলসহরত করিবার কথা কর্ণে আসিতেছে। এ-কার্য করিলে তোমার আত্মঘাত করা হইবে। আমি আদালতে প্রমাণ করিয়া দিব যে, তুমি ৺সোমেশ্বর রায়ের কন্যা—বিমলাবালা দেবীর গর্ভজাত সন্তান নহ, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত ভট্টাচার্যও তোমার জন্মদাতা পিতা নহেন। জালিয়াতি বা জাল করিয়া নয়, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত এবং তদীয়া ভগ্নী শ্রীমতী ভবানী দেবীকেই সাক্ষী মান্য করিব। তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

তুমি সাবধান হইবে। নিজেকে সম্বরণ করিবে। তোমাকে এসব কথা লিখিতে আমার

হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অথবা তোমার অপরাধ কি ? ইহা তোমার পিতৃ-মাতৃ উভয় বংশের উপর নিদারুণ অভিশাপের ফল। আমি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি অন্তত তোমার ভালো-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি তোমার ভালো-মাকে বল—আমি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীবীরেশ্বর রায় দেবশর্মণঃ

চিঠি নিয়ে গিয়েছিল একজন সওয়ার বর্ক-অন্দাজ। নদীর পথ অনেক ঘুরপথ। তাতে অনেক দেরি লাগবে। এ যাবে সোজা পথে, নদী পার হতে হবে, রূপনারায়ণ। তা হোক, খেয়া আছে। বড়জোর তিন দিন লাগবে। কিন্তু ততদিনে কর্মফেরই হোক আর অদৃষ্টচক্রই হোক, সে একটা নিষ্ঠুর পাক খেয়েছে। গোটা শ্যামনগর তখন আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

সওয়ার যখন গ্রামে পৌছুল, তখনও অনেক ঘরের খড়শূন্য কাঠ ধোঁয়াচ্ছে। কমলাকান্তের ঘরখানায় শিকল দিয়ে বন্ধ করে একেবারে চারকোণে আগুন দিয়েছিল। ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিল সে। আর এমনি করে আগুন দিয়েছিল ঠাকুরদাস পালের ঘরে। বাকি গ্রামটায় একসঙ্গে অনেক ঘরে আগুন দিয়েছিল। ফলে কেউ কারু সাহায্য করতে পারে নি। কমলাকান্তের গোটা পিঠটা পুড়ে গেছে। ঠাকুরদাস পালের সর্বাঙ্গ এখানে-ওখানে পুড়েছে। সে কমলা-কান্তকে আগলে তার কাছেই শুতো। সে-ই কোনরকমে জানালা ভেঙে কমলাকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওদিকে ঠাকুরদাস পালের বাড়ীতে তার স্ত্রী-পুত্র পোড়া-চালের তলায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গেছে।

কমলাকান্তকে আশ্রয় দিয়েছেন বিমলাকান্তের জ্ঞাতিরা। ঠাকুরপাড়ায় ঠাকুরদের ভিটের উপর নতুন তৈরী বাংলোটায় রবিনসন সাহেব মদ খেয়ে বন্দুক কাঁধে নিয়ে পায়চারি করছে এবং মধ্যে মধ্যে উড়ন্ত কাক-চিল মেরে আনন্দ করছে।

গোটা শ্যামনগর পুড়ে গেছে। যুগলপুরে দুখানা মৌজা—শ্যামনগর, রাধানগর; মিয়াঠাকুরদের ঠাকুরপাড়া ছিল শ্যামনগরেরই অন্তর্গত কিন্তু শ্যামনগর থেকে একটু দূরের শ্যামনগরেরই একটা আলাদা চক ছিল ওটা। তার পাশে পাকপাড়া আর একটা চক।

শ্যামনগরই সব থেকে বড় বসতি। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কয়েকঘর বৈদ্য, তাছাড়া নবশাকদের পাড়া, গোপপাড়া, তেলিপাড়া, তামুলিপাড়া, মাহিষ্যপাড়া—অধিকাংশই সেকালের সদ্‌জাতি। এই শ্যামনগর বলতে গেলে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত পুড়ে গেছে। অকস্মাৎ আগুন লেগে পোড়ে নি, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কুঠিয়াল জন রবিনসন। আগুন লাগিয়েছে নাকি বীরপুরের ছত্রী বদমাস গোপাল সিং। এবং কমলাকান্ত এই আগুনে পুড়ে জখম হয়েছে, আর ঠাকুরদাস পালের স্ত্রী-পুত্র ঘরের পোড়াচাল চাপা পড়ে মারা গেছে। তাছাড়া গোয়ালে গরু

পুড়েছে, ছাগল পুড়েছে, গৃহস্থের উঠোন-চাটা কুকুর-বেড়ালও পুড়েছে। দশ-পনের জন কিছু কিছু পুড়েছে, আর হাত-পা পুড়িয়েছে অনেক লোক।

পৃথিবীতে ঘটনার গতিপথ বিচিত্র। মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট আবহাওয়ার খবরে বলতে পারে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার খবরে বলছি—কাল শুকনো যাবে আবহাওয়া অথবা মেঘলা যাবে। কিন্তু মানুষের মনের গতি অতি বিচিত্র, কোন যন্ত্রেই তাকে মাপা বা ধরা যায় না।

ছত্রী গোপাল সিং এসেছিল বীরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমলাকান্তের পিছনে আশ্রয় নেবার জন্য।

কমলাকান্ত কাশী থেকে শ্যামনগর এসেছিলেন শুধু নিজের জমি উদ্ধার করবার জন্যেই নয়, তিনি নিজেও এসেছিলেন বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। কথাটা তাঁর নিজের মনে মনেই ছিল, ঘুণাক্ষরে বিমলাকান্তকে বা ভালো-মাকে জানতে দেন নি।

কমলাকান্ত রত্নেশ্বর রায় হয়ে ডায়রী রাখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ডায়রীর প্রথম খণ্ডটা একটু বিচিত্র। পৃষ্ঠার দুটো দিক—প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি ডায়রী শুরু করেছিলেন, যেদিন তিনি বীরেশ্বর রায়ের পোষ্যপুত্র হয়ে রত্নেশ্বর রায় হলেন সেদিন থেকে; দুয়ের পৃষ্ঠায় তিনি তাঁর জীবনের পূর্বকথা লিখেছিলেন। তারই মধ্যে আছে তাঁর অকপট মনের প্রকাশ।

নিজের বংশ-পরিচয়—যে বংশ-পরিচয় তাঁর কাছে তাঁর বাল্যকাল থেকে সত্য বলে জানা ছিল তাই দিয়েছেন। যতটুকু কথা মনে পড়ে তা লিখেছেন। তার মধ্যে রয়েছে—'আমার বাল্যকাল, তখন আমার চার বছর বয়স—আমার মামা বীরেশ্বর রায়কে দেখে বড় ভয় হত। আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকতেন যে আমি পালাতাম, পালাবার জন্য কান্না শুরু করতাম। এমন ছবি দুটো-চারটে আমার মনে যেন গেঁথে রয়েছে।' তারপর কলকাতার কথা লিখেছেন। বছর-দুয়েক কলকাতায় ছিলেন। এরই মধ্যে ভবানী তাঁর বাবাকে নিয়ে কলকাতা এসেছেন—তিনি তাঁকে 'ভালো-মা' বলে ডাকতেন। তাঁর কোলেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। 'ভালো-মা'র প্রতি ভালবাসা ছিল বাপ বিমলাকান্তের চেয়েও বেশী। ভালো-মাকে পেয়ে যেমন খুশী হয়েছিলেন, তেমনি ক্রোধ তাঁর বেড়েছিল মামার উপর। সেই বয়সেই এটুকু বুঝেছিলেন যে, 'ভালো-মা' ওই মামা বীরেশ্বর রায়ের ভয়েই চলে এসেছেন। তারপর কাশী। কাশীর জীবনের অনেক ঘটনা আছে। সেখানে দুর্দান্তপনা করেছেন, ওখানকার বাঙালী ছেলেদের নেতৃত্ব করেছেন, কুস্তি লড়েছেন, গঙ্গায় সাঁতার কেটেছেন, হৈ-হৈ করেছেন, ভালো-মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছেন, বাপের সঙ্গে সন্ন্যাসী দেখতে গিয়েছেন; আবার আদালতে গিয়েছেন। কোম্পানীর সাহেবদের বাড়ীতে ও ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়েছেন বাবার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলেছেন। পড়াশুনা করেছেন, সংস্কৃত-ইংরাজী পড়তেন। বাংলা পড়াটা তখন খুব জরুরী ছিল না। বাবা পড়াতেন সংস্কৃত, ভালো-মায়ের বাবা দাদামশাই

হশচন্দ্র পড়াতেন ইংরাজী।

তার সঙ্গে দিন দিন তাঁর আক্রোশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই মামার উপর। তখন জেনেছেন ামেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসেবে তিনি মাতামহের উইলসূত্রে রায়বাড়ীর সম্পত্তির অর্ধেক শের উত্তরাধিকারী, দেবোত্তরের সেবাইত। তাঁর বাবা বিমলাকান্ত সমস্ত ত্যাগ করে সেছেন কিন্তু সে ত্যাগ করবার অধিকার তাঁর নেই। আইন জেনেছেন। সে আইন-বলে নি তাঁর মদ্যপ বাঈজীবিলাসী মামাকে সমস্ত বিষয় এবং দেবত্র থেকে অপসারিত করতে রেন। কিন্তু বিমলাকান্ত এবং তাঁর ভালো-মাকে তিনি এ-মনের কথা ঘুণাক্ষরে জানতে ননি। তিনি জানতেন, তাঁরা তাকে তিরস্কার করবেন, বাধা দেবেন।

ডায়রীর এই বিবরণের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে: "একদা আত্মসম্বরণ করিতে না ারিয়া অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—সে একটি পাষণ্ড; মহাপাপী। ঈশ্বরকে বলিহারি য় তিনি এমন জঘন্য কদর্য মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত করেন না!

ভালো-মা ঘরের ভিতরে ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—তুই কাহাকে এ থা বলিতেছিস রে?

আমি বলিলাম—বলিতেছি আমার মাতুল মহাশয়কে। তোমার স্বামী কথাটা জিভে াটকাইয়া গেল।

ভালো-মা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। তাহাতে নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র নে হইল। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—তোর জিহ্বা খসিয়া যাইবে। অনন্ত নরকে তোর ান হইবে না। তোর চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইলেন। তারপর ক্ষিপ্তের মত স্বীয় ললাটে রাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ফাটিয়া যাউক, ফাটিয়া যাউক, আমার এই মন্দ ললাট াটিয়া যাউক!

অতঃপর সে এক তুমুল কাণ্ড। তিনি জলগ্রহণ করিলেন না। মদীয় িতৃদেব তাঁহার াসাবাটী হইতে আসিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। আমি অধোবদন হইয়া হিলাম বটে, কিন্তু আমার মনের সঞ্চিত ক্রোধ আরও যেন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া ালো-মা এবং পিতৃদেবের আদেশে আমাকে সারাদিন উপবাস করিতে হইল। এই নিন্দায় ামার জিহ্বা কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নির্দেশক্রমে অহোরাত্র আমাকে ওই উপবাসী বস্থায় শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীরাম শ্রীরাম শ্রীরাম জপ করিতে হইল।

তাহা করিলাম। ভালো-মায়ের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। তিনি আমার ভধারিণীর অধিক। দেবী অপেক্ষাও পবিত্রা এবং পূজনীয়া। তাহার সঙ্গে পিতৃনির্দেশ বশ্যই পালন করিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিলাম সুযোগ পাইলেই কলিকাতা াইব। এবং মামলা দায়ের করিয়া এই বীরেশ্বর রায়ের দম্ভ চূর্ণ করিব। প্রতিশোধ লইব। ধু বীরেশ্বর রায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিলাম। যেন আমার পিতৃদেব এবং ভালো-মাতা

হইতে দীর্ঘায়ু হন তিনি। তখন আমি আমার এই আক্রোশ ক্ষোভ মিটাইব।"

হঠাৎ সুযোগ এল। বিমলাকান্ত এবং ভালো-মা বর্তমানেই কমলাকান্ত বাংলাদেশে ফিরিবার সুযোগ পেলেন। চিঠি পেলেন ঠাকুরদাস পালের। "জমিতে সায়েব জবরদস্তি নীল চাষ করাইতেছে। আমি আর চাষ করিতে পারিব না। আতপের অভাবে ঠাকুরের ভোগ হইবে না। প্রতিকার যাহা হয় করিতে আজ্ঞা হয়।" বিমলাকান্ত বাধ্য হয়ে চিঠি দিয়ে কমলাকান্তকে শ্যামনগর পাঠালেন। শ্যামনগরের জমি জন রবিনসনের নীল চাষের গ্রাস থেকে উদ্ধার করবার জন্য। নিজে ছুটি পেলেন না। আদালতের কাছ থেকে তিনি তখন কমিশরিয়েটের কাজ পেয়েছেন।

জন রবিনসনকে পত্র দিলেন বিমলাকান্ত। ওদিকে রায় এস্টেটে গিরীন্দ্র আচার্যকে পত্র দিলেন। রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে পত্র দিলেন। ডাকযোগে কলকাতায় বীরেশ্বর রায়কেও পত্র দিতে তিনি ভোলেন নি। কমলাকান্তকে প্রতিজ্ঞা করালেন, বল তুমি সেখানে গিয়ে তোমার মামার সঙ্গে ঝগড়া করবে না?

কমলাকান্ত বললেন—ঝগড়া আমি করব না কিন্তু তিনি যদি করেন!

—করলেও তুমি সহ্য করবে।

কমলাকান্ত এর উত্তর দিতে চান নি।

রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতে চাহি নাই। এ প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে আসিবার আমার কোনরূপই আগ্রহ ছিল না। কারণ আমার শ্যামনগর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য পৈতৃক জমি নীলকরের হাত হইতে উদ্ধার করা নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কীর্তিহাটের সম্পত্তি। আমাকে পরিত্রাণ করিলেন ভালো-মা। আমি উত্তর দিবার পূর্বে তিনি মধ্যস্থলে আসিয়া কহিলেন—না, তিনি তাহা করিবেন না!

আমি বলিলাম—যদি করেন?

তিনি বলিলেন—তাহার জন্য চিন্তা নাই। আমি দেশে যাইতেছি, তোর সঙ্গেই যাইব। তিনি কলহ করিলে তুই আমাকে বলিবি, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

—কি ব্যবস্থা করিবে?

—আমি তোকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিব—এই আমরা আসিয়াছি, কী করিবেন করুন।

আমি বলিলাম—না—না—না। তাহা আমি পারিব না!

ভালো-মা বলিলেন—উত্তম, তাহাও তোকে করিতে হইবে না! শুধু আমাকে জানাইবি —তিনি ঝগড়া করিতেছেন।

আমি সুযোগ গ্রহণ করিলাম। বলিলাম—তাহাই হইবে। ভালো-মা শ্যামনগরের ঘাটে আমাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার পিতার সঙ্গে। তাঁহার ব্রত উদ্যাপন আছে,

রা বৎসরের ব্রত। বারো বৎসর পূর্বে গঙ্গাসাগর তীর্থের নিকট এক জাগ্রত কালীমন্দিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারো বৎসর অন্তে সেই মন্দিরেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। যাইবার ও বলিয়া গেলেন—আমার চরণ স্পর্শ করিয়া বল তিনি ঝগড়া করিলে কিছু করিবার পূর্বে াকে না জানাইয়া কিছু করিবে না!

সঙ্কল্প ছিল এই প্রতিজ্ঞার সুযোগই আমি লইব। পিতা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন—বল ি মাতুল বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে কলহ করিবে না! আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, তৎপূর্বেই লো-মা মাঝখানে পড়িয়া বলিয়াছিলেন—না, তিনি তাহা করিবেন না। সুতরাং আমার হ করিতে বাধা নাই ইহা আমি জানিতাম। সেই সুযোগই গ্রহণ করিলাম। কীর্তিহাটের লইয়া বজরা আসিতেই আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম, সাদর পত্রের উত্তরে বজ্রসমতুল্য াত্তরে আঘাত হানিলাম। তিনি কলহ করেন নাই, ভালো-মাকে তো তাহা জানাইবার য়োজন নাই!"

সুরেশ্বর বললে—সেদিন শ্যামনগরে এসে কমলাকান্তের অবস্থা আমি কিছুটা অনুমান করতে র। আমার সঙ্গে মেলে। সেটেলমেণ্টের বুঝারতের প্রথম দিন: যেই আমি কুড়ারাম য়র পাঁচালীর কথা উল্লেখ করে গোচর আর বসতবাড়ী লাখরাজ বলে স্বীকার করে নিলাম, নি গোটা গ্রামের মানুষ আমাকে ধন্য ধন্য করে আমাকে তাদের পরম আশ্রয় করে তুললে। ি তাই বিশ্বাস করলাম। স্ফীত হলাম।

কমলাকান্তকেও তাই বলে মেনে নিয়েছিল শ্যামনগরের লোক। প্রথম দিনই সে জন সনসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। বিমলাকান্তের চিঠিখানা বাংলোর ভিতরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছিল, জন রবিনসন চিঠিখানা পড়ে খুশী হয়েই বেরিয়ে এসে তাকে দেখে মত হয়ে বলেছিল—আশ্চর্য্য তো! তুমি বীরার মত দেখতে, তুমি বিমলাবাবুর ছেলে? m so glad to see you young man!

বিমলাকান্তের চিঠিতে বেশী কিছু ছিল না, তিনি লিখেছিলেন—আমার ছেলেকে তোমার ে পাঠাচ্ছি। তার পরিচয়পত্র এটা। আশা করি আমাকে তোমার মনে আছে। সামান্য জের জন্য তাকে পাঠালাম, তার কাছে সব শুনবে।

কমলাকান্তও ভদ্রতা করে কয়েকটা কথা বলেছিল। জন রবিনসন বলেছিল—বল, কি তে পারি? নিশ্চয়ই তোমাদের জমির কথা। ওয়েল, আজ নয়, কাম টু-মরো। আমি য় ব্যবস্থা করব। কিন্তু কিছু খাবে না? এ কাপ অফ টী?

ধন্যবাদ দিয়ে কমলাকান্ত বলেছিল—নিশ্চয়; খুব আনন্দের সঙ্গে খাব।

হেসে রবিনসন বলেছিল—বস, বস। এত খুশী হলাম আমি যে, হিন্দু গোঁড়ামি তোমার া নেই। তোমার বাবা বিমলাবাবু আমাদের ওখানে আসত, তখন সে ছেলেমানুষ, কখনও গ্লাস জল খেতো না।

এইটুকুতেই প্রথম দিনেই গোটা শ্যামনগর মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ওঃ, কি খাতির করে কুঠিয়ালসায়েব! হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে আদর কত! চা খাইয়েছে। যেটা ওই সরকারদেরও বলে না। গ্রামের ভট্টাচার্যেরা অবশ্য সায়েবের ওখানে চা খাওয়ায় দুঃখি হয়েছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। সাহসের কথায়, ইংরিজীতে কথা বলার পারঙ্গমতা মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা ক'রে বলেছিলেন—ও-ও তো নিজে মস্ত জমিদার। কাশীতে শিক্ষা। তা উপর রায়েদের রক্ত আছে। বীরেশ্বর রায়কে ডেকে লাটসাহেব দেখা করে। চেহারা দেখ না! নরাণাং মাতুলক্রম।

ঠাকুরদাস খুশী হয়েছিল সব থেকে বেশী। সে বলেছিল—বাপ জিন্দে ছেলে হয়, দাদাঠাকু আমার মামা জিন্দে ভাগ্নে।

সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সকল লোক এসে তার বাড়ীতে বসে তাকে বলেছিল—দেখ ভায় তোমার কাছে আমরা একবার এলাম।

খুশী হয়ে কমলাকান্ত বলেছিলেন—আসুন। ঠাকুরদাসদা, যে-সতরঞ্জি এনেছি কা থেকে, সেইটেই পাতো। বসুন।

গ্রামের প্রবীণ তিনি, কমলাকান্তের সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, তিনি বলেছিলেন—ভায়া, সা তো তোমার জমি ছেড়ে দেবে। কিন্তু গ্রামের লোকের কি হবে? দেখ গ্রামের মধ্যে কে ধনী হলে, শিক্ষিত হলে সকলে তার মুখের দিকে ভরসা করে চেয়ে থাকে: ধনী শিক্ষিত যি তিনিও লোকের মুখের দিকে তাকান। তোমাদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতে পারলে তো সা এবার হাতে মাথা কাটবে।

তারপর বলেছিলেন—সাহেবের অত্যাচারের কথা। জান ভাই, বেটা মহিষাসুরের ম লম্পট। মেয়েদের ইজ্জত পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তুমি আমাদের ছেড়ে মিটমাট ক না। আমাদের নিয়ে যা করবার হয় কর। না-হয় এক কাজ কর না। তুমি কীর্তিহাট অর্ধেক অংশের শরিক, তুমি আমাদের সব জমিজেরাত কিনে নাও। আমাদের বরং তোম মহলে জায়গা দাও। এখানে তুমি সাহেবের সঙ্গে ফয়সালা কর।

তরুণ কমলাকান্ত স্ফীত নিশ্চয় হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি শহরের শিক্ষায়-দীক্ষ অন্য ধরনের মানুষ। তার উপর তিনি জেদী, দুর্দান্ত—তাঁর দেহে বীরেশ্বর রায়ের রক্ত, তাঁ প্রকৃতি জন্মগত ধাতুর জন্য উগ্র অনমনীয়। তিনি বললেন—এ-কথা বলতে হবে কেন ঠাকুরদ এর জন্যেই আমি কাশী থেকে আসি নি! এ তো ডাকে চিঠি লিখলেই হত। আপনাদে ভরসায় আমি এখানে এসেছি। আপনাদের ছেড়ে আমি মিটমাট করব! তা কখন করব না।

তাঁরা সকলে একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে উঠে গিয়েছিল।

পরদিন কমলাকান্ত সাহেবের সঙ্গে কথামত দেখা করতে গিয়ে তাই বলে এল এবং ঝগড়

করেই চলে এল।

জন রবিনসন তাঁকে বললেন—ওয়েল ইয়ং ম্যান, আমি তোমায় অর্ধেক জমি নীলচাষ থেকে রেহাই দেব। নট অল। দে-সরকার জমিদার বললে—তোমাদের ল্যাণ্ডই হল বেস্ট ল্যাণ্ড। ওল্ড রায়বাবু—ইয়োর ম্যাটারন্যাল গ্র্যাণ্ডফাদার, ভেরী শ্রুড ম্যান, সে সান-ইন-ল'র জন্যে বেছে বেছে বেস্ট ল্যাণ্ড কিনেছিল। হাফ ছেড়ে দেব আমি।

মনে মনে তেতে উঠেছিলেন কমলাকান্ত। কিন্তু নিজের কথা বাদ দিয়ে বলেছিলেন—বাট হোয়াট এ্যাবাউট আদার পিপ্‌ল্? অন্য সব লোকদের কি হবে? আমি আমার জন্যে কিছু বলব না, অন্যদেরও অর্ধেক জমি ছেড়ে দাও। সকলের ভাল জমিতে তুমি জবরদস্তি নীল লাগাতে বাধ্য করছ। তা করলে তো হবে না।

চমকে উঠেছিল জন রবিনসন।

দেশে তখন নীলকরের অত্যাচার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। হরিশ মুখার্জি বলে একজন নেটিভ খুব কড়া কড়া কথা লিখছে। এখানে লেফ্‌টন্যাণ্ট-গভর্নর গভর্নর-জেনারেলের কাছে দরখাস্ত করছে। ছেলেটা সেই সুরে কথা বলছে। শহর থেকে এসেছে ইংরিজী-জানা ইয়ং ম্যান। জন রবিনসন চমকে উঠল। তার উপর ছেলেটা বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে। কীর্তিহাটের অর্ধেক অংশের মালিক। এর আওয়াজ তো র‍্যাঙ্ক কার্টিজের আওয়াজ নয়।

জন রবিনসন চমকে উঠে বলেছিল—হোয়াট?

—অন্য লোকেদের কি হবে?

জন রবিনসন বলেছিল—আই সী, ভয় দেখাচ্ছ আমাকে?

—নো। বলছি—এ মহা অন্যায় করছ তুমি। অত্যাচার করছ। এটা না করে অর্ধেক জমি ওদেরও ছেড়ে দাও। ওদের ফেলে আমি তোমার এই অনুগ্রহের অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া —এ আমি নেব না।

জন রবিনসন হাসি থামিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হুঁ! I see. You are a chela of Haris Mukherjee.

কমলাকান্তের প্রকৃতিও উগ্র ছিল, তিনি ভয় পান নি, বলেছিলেন—No. I am not anybody's chela.

—Then What are you? Who taught you all these things?

—আমি কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর অর্ধেকের মালিক। যে সোমেশ্বর রায়ের টাকাতেই তোমার বাপ ব্যবসা করেছিল, মাসে মাসে সুদ গুনতে তোমরা, তিনি আমার মাতামহ। know all those things.

রবিনসন রেগে উঠে দাঁড়িয়েছিল।—you say so?

—Yes, I say so. কীর্তিহাটের এলাকায় তোমার কুঠী আছে। এস্টেটের টাকা সব

শোধ হয়েছে কিনা জানি না। হরিশ মুখার্জির চেলা নই আমি।

জন রবিনসন চীৎকার করে বলেছিল—বোয়, হামারা চাবুক লে আও।

মুহূর্তে কমলাকান্তও উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নেমেছিলেন জমিতে এবং দ্রুতপদে চলে এসেছিলেন। রবিনসন হা-হা শব্দে হাসতে লেগেছিল।

গ্রামে ফিরে সে-গ্রামের সকলকে ডেকেছিলেন এবং রবিনসনের সঙ্গে লড়াইয়ের বীজ পত্তন করেছিলেন সেইদিনই।

সুরেশ্বর বললে—এখানে একটা কথা বলি সুলতা। সেটা হল—বামুন, বদ্যি আর কায়স্থ - এই তিনটে জাত সেকালে জমিদারী সেরেস্তায় বড় খারাপ জাত ছিল। তার সঙ্গে মুসলমান। সহজে এরা বশ মানত না। রাজা-জমিদার এদের হজম করতে পারে নি। তার সঙ্গে ছত্রী। তবে বাংলাদেশে তারা খুব কম। জমিদারীর বাজারে যেসব মৌজায় এই তিন জাতের বেশী বাস, সে-সব গ্রামের দর কিছু সস্তা। শ্যামনগর সেই ধরনের গ্রাম। ঠাকুর-মিয়াদের জমিদারী যেদিন দে-সরকাররা কেনে, সেদিন এঁরা ঢাক বাজিয়ে পূজো দিয়েছিলেন সর্বরক্ষেতলায়। দে-সরকার যেদিন সুদের দাবী করেছিল, সেদিন গ্রামসুদ্ধ চড়াও হয়েছিল দে-সরকারের নতুন জমিদারী-কাছারীর আটচালায়।

কমলাকান্তকে পেয়ে এরা কোমরে বল পেয়েছিল। বিশেষ করে কমলাকান্ত যে দম্ভ করে বলে এসেছে—আমি কীতিহাটের এস্টেটের আট আনার মালিক, তাতে ভরসা পেয়ে তাদের মনের আগুনের উপর পড়া ছাই উড়ে গিয়ে নতুন করে গনগনিয়ে উঠেছিল। সুতরাং ববাদটা পাকতে দেরি হয় নি।

পথ একটা স্থির হয়েছিল, তাতে জমিদারের সঙ্গে লড়াই শুরু হল আগে। দে-সরকার রবিনসনকে ডেকে এনে বসিয়েছে . সে-ই এখন টাকা দিচ্ছে, সুতরাং মূলে আঘাত দেওয়া হল আগে। ওদিকে রবিনসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমলাকান্ত তাঁর নতুন শেখা ইংরিজীবিদ্যায় কলাও করে দরখাস্ত করলেন হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কমিশনার, লাটসাহেব পর্যন্ত। ওদিকে দে-সরকারদের সঙ্গে ধর্মঘট করে খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হল।

দে-সরকারের বাড়ী রাধানগর—সেখানে অধিকাংশই কায়স্থ, কায়স্থেরাও চুলবুল করতে লাগল, কিন্তু দে-সরকার সুকৌশলে ব্যাপারটাকে কায়স্থদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং অপর জাতের জোট বেঁধে, জাত নিয়ে ঝগড়ায় পরিণত করেছিলেন। ফলে কায়স্থেরা যোগ দিতে ইচ্ছে থাকতেও সরে রইল।

সুরেশ্বর বললে—জাত নিয়ে ঝগড়া যে কি, তা তো তোমাকে বোঝাতে হবে না। এ দেশটাই হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে ভাগ হয়ে গেল।

সুলতা বললে—ইয়োরোপে জু-কৃশ্চানের ঝগড়া, সার্ব-স্লাভের ঝগড়া অনেক উদাহরণ আছে, তুমি বল—কথাটা অবিশ্বাস করছি না। ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের ঝগড়া নেই-নেই

রেও থেকে গেছে। বাবা বলেছিলেন—সুরেশ্বর পিছিয়েছে বোধ হয়, তোকে বিয়ে করলে বোত্তরের সেবায়েৎ-স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে বলে।

সুরেশ্বর বললে—চতুর দে-সরকার এই জাতিতত্ত্বের চাল চালতে ভোলেন নি। রবিনসনের াতে অনেক কায়স্থের চাকরি করে দিয়েছিলেন। চতুর লোক ট্যারা দে-সরকার। সঙ্গে া এ-কথাও তুলেছিলেন—পথে-ঘাটে দেখা হলে বামুনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে া-বুকে ধুলো বুলোতে হবে এটা কি রকম? সেইটে আমি করিনে, সেই ওদের রাগ।

তবুও একটা দল বিরূপ ছিল, কিন্তু ধর্মঘটে যোগ দেয় নি।

শ্যামনগরে ব্রাহ্মণেরা সদ্গোপ এবং অন্যদের বারণ করেছিলেন—কোন কায়স্থকে দেখে মাথা করবিনে। খবরদার!

ঠাকুরদাস পাল তাদের নেতা, কমলাকান্তের চেয়ে বয়সে বড় হয়েও অনুগত লক্ষ্মণ, সে ধ্বনি দিয়ে বলেছিল—হরি-হরি ভাই!

সোৎসাহে হরিধ্বনিও উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে এসেছিল বীরপুরের গোপাল সিং। পাল জানত বিমলাকান্তকে এবং কমলাকান্তকে তাড়িয়েছেন বীরেশ্বর রায়। চতুর বিষয়ী াল সিং কমলাকান্তের আগমনবার্তা শুনেই এখানে এসেছিল, বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে াকান্তের মত দুর্ভেদ্য ঢালের পশ্চাতে আশ্রয় নেবার জন্যে।

বিষয় হল মজার বস্তু, কমলাকান্তকে উত্তেজিত করে কোনরকমে খাড়া করতে পারলে শ্বরের ডান হাতখানাই ভেঙে দিতে পারবে।

কার্যকারণে ঘটনাও এই মুখে চলছিল। বীরেশ্বর রায়ের পাঠানো বজরা এল, লোক এল নিয়ে. কমলাকান্ত চিঠির উত্তরে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে চিঠি লিখে বজরা ফিরিয়ে ন। গোপাল উৎসাহিত হয়ে উঠল। তার কাজ হতে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ হে হঠাৎ একটা কথায় ঘটনার স্রোত ফিরে গেল। অতি চাতুর্যের সঙ্গে সে একই নিশ্বাসে ও জন রবিনসন এবং দে-সরকারদের সঙ্গে ঝগড়ায় কমলাকান্তকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে ল।—

রেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—

গোপাল সিং লোকটি দুর্দান্ত সাহসী লোক। তাহার অসাধ্য কর্ম নাই। সে আমাকে এবং রবিনসন সাহেবের সঙ্গে বিরোধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলিল— বলেন বাবা-সাহেব—ব্রিফ বলেন, মামলা হ'লে টাকা খরচ করবেন—আমি উদের দেখে গোপাল সিংয়ের দল আছে বাবা, উ দল নিয়ে সে সব পারে। বিশুবাবু ডাকাইতি নীলকুঠী সে অনেক লুটেছে, সো বাবা হামিও পারে। ব্রিফ বলেন—মামলাতে খরচ বেন, বাস্, দিব শালা লুচ্চা আংরেজবাচ্চাকে—।

ন্তের উপর দন্ত স্থাপন করিয়া সে ডান হাতখানা তলোয়ারের মত চালাইয়া দিল।

অতঃপর বলিল—টাকা বাবাসাহেবের ছালা ছালা গো! ওই মামা—আপনের মামা ক মামা আছে গো! হাঁ! উস্‌কে হঠিয়ে দিন, আপনার সম্পত্তির ভাগ আউর টাকা লি লিন। আপনি তো রাজা গো। দেখবেন তখুন ই সাহেবটো আপনার পাশ টাকা লি যাবে আউর বলবে—গুট মর্ণিং বাবুসাব, সেলাম বাজাইবে। হাঁ! ইখানে উ সাহেবের জবরদ হামি রুখবে। ই বাত হামি দিলাম। আপনি মামলা করেন আপনার সম্পত্তির ভা লিয়ে। ঢেঁরা পিটাইয়ে দিন তামাম তৌজিতে কি বীরেশ্বর রায়কে খাজনা দিবে তো হ উ উশুল দিবে না। তাহার কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি। সে সত্য কথাই বলিয়া আমার এই অত্যাচারী নৃশংস মাতুলের হাত হইতে অন্ততঃ আমার প্রাপ্য অংশ উদ্ধার করি হইবে। ইহা আমার কর্তব্য। ইহা ধর্ম। না করিলে আমি মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারি এবং রবিনসন ও দে-সরকারদের অত্যাচার হইতে শ্যামনগরের অধিবাসীদের যদি বাঁচা না পারি, তবেই বা আমি মনুষ্যপদবাচ্য কিসে?"

সুরেশ্বর বললে—এর পরই ঘটনার স্রোত বিচিত্রভাবে ঘুরে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় কমলাকান্তের বাড়ীতে গ্রামের লোকেদের জমায়েৎ হবার কথা। আ দিন ষষ্ঠীপুজো ছিল। সেই পূর্বকাল থেকে ষষ্ঠীপুজো সর্বাগ্রে হয় ব্রাহ্মণদের। জমিদার ব্র হলে এবং গ্রামের লোক হ'লে তাঁর পুজো ব্রাহ্মণদের মধ্যে আগে হয়। কিন্তু জমিদার ব না হ'লে তাদের বাড়ীর মেয়েদের অপেক্ষা করতে হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহিণীদের পূজা হ'লে তবে তাঁদের পূজা। দে-সরকার জমিদারী কেনার পর প্রথম বৎসর এ নিয়ে একটা কাণ্ড হয়েছি ব্রাহ্মণ-গৃহিণী ও কন্যারা তাঁদের নাকঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা দে-সরকা মেনে নিতে হয়েছিল, উপায় ছিল না। এবার সকালবেলাতেই দে-সরকারের গোমস্তা রবিনসন সাহেবের পাইক নিয়ে এসে ষষ্ঠীতলা ঘেরাও করে বসেছিল। এবং বেলা বা পর্যন্ত ঘিরে রেখে দে-সরকার এবং তাঁর আত্মীয়বন্ধু বাড়ীর মেয়েদের পুজো শেষ না পর্যন্ত অন্য কাউকে পূজা করতে দেয় নি।

কমলাকান্ত পর্যন্ত সেখানে গিয়েছিলেন প্রতিবাদ করতে। সঙ্গে ছিল ঠাকুরদাস এব গোপাল সিং, আর ছিলেন কয়েকজন মাতব্বর ব্রাহ্মণ।

গোমস্তার সঙ্গে বাদানুবাদ কিছু হয় নি। কুঠির লাঠিয়ালরা, সাহেবের চাকরেরা নিয়েছিল। তারাই বলেছিল—জমিদারের বাড়ীর পূজা হবে, তবে অন্যের পূজা হবে আগে নয়। সাহেবের হুকুম আছে।

বিনা লাঠির জোরে তাদের হঠবার হুকুম ছিল না। হঠলেও বিপদ ছিল রবিনসন কুঠি চাবুকের। কমলাকান্ত ভাবছিলেন, কিন্তু প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা সব দিক বিবেচনা করে এসেছিলেন। সেইদিনই গোপাল সিং যে-বন্ধনে বেঁধেছিল কমলাকান্তকে, অতি উৎসাহে টান দিয়ে কমলাকান্তকে চমকে দিলে; কমলাকান্তও ক্রুদ্ধ হয়ে টান মেরে বাঁধনটাকে

ফেলে দিলেন।

কমলাকান্ত বসে প্রতিকারের কথা ভাবছিল। গোটা গ্রামটাই আহত হয়েছে এ-অপমানে। যারাই আসছিল, বসছিল, তাদের সকলেরই ছিল এক কথা। জমিদার মাথার উপর পা দিচ্ছে, ধর্ম-সমাজ পর্যন্ত মানছে না।

তারই ভিতর থেকে কখন যে দে-সরকারদের কুৎসা আরম্ভ হয়েছিল কেউ বুঝতে পারে নি। গোপাল তার মধ্যে ফোড়ন দিয়ে যাচ্ছিল, তার ফোড়নের উপকরণের সবটুকুই জমিদারের অত্যাচারের নামে বীরেশ্বর রায়ের কুৎসা।

দে-সরকারদের নিন্দা, তাদের অধর্ম-আচরণ, কৃপণতা, ছোট নজর থেকে দে-সরকারের ট্যারা-চোখে এসে উপস্থিত হল। তারপর তার পুত্রের গণ্ডমূর্খত্বের কথা। তার থেকে এল দে-সরকার-গৃহিণীর নাকের নথে; এরই মধ্যে কে বললে—সরকারের কন্যেটার ঢঙ দেখেছ! স্বামী ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্যে কোন দুঃখ আছে, খেদ আছে!

একজন বললে—ওরা তো বলে, মেয়ের ছেলে হ'ল না বলে জামাই বিয়ে করেছে, তাই দে সরকার কন্যেকে বাড়ী এনে রেখেছে; বলেছে—মেয়ে আমার সতীন নিয়ে ঘর করবে না। কিন্তু আসল ব্যাপার তাড়িয়ে দিয়েছে। সে নাকি সাতখানা কাণ্ড।

কমলাকান্ত বলেছিলেন—থাক না ওসব কথা। ও নিয়ে আমাদের দরকার কি?

গোপাল বলে উঠেছিল—দরকার আছে বাবাসাহেব। আদালতে সরকারকে হাজির করতে পারলে ওই তো বরম্ বাণ। হামাদের উকিল জেরা করবে কি—তুমার বেটী ঘরে আছে কেনো সরকারবাবু? অঁা? সরকার জরুর বলবে কি—বেটী হামার সতীন লিয়ে ঘর করবে না, তাই হিঁয়া থাকে। উকিল দিবে এক ধমক—ঝুট বাত্! ফলানা আদমীর সাথ আপনের বেটীর লটঘট হোয় নাই? সব গোলমাল হইয়ে যাবে সরকারবাবুর। হাঁ। উ সব বিলকুল ঘর যোগাড় করো বাবা।

সকলে হেসে উঠেছিল। কমলাকান্ত তিক্ত হয়েও কথাটা ভেবে দেখছিলেন।

গোপাল নিজের কথার জের টেনে বলে চলেছিল—হামি বাবা একদফে বীরেশ্বর রায়কে হাজির করাইয়ে ই জেরা তো জরুর করাই কি, রায়বাবু আদমী লোক বোলে কি আপনে বিবীসাহেবা ভাগ গিয়েছে, কিসকে সাথ গিয়েছে আউর কাঁহা গিয়েছে? অঁ্যা?

মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে গিয়েছিল। কমলাকান্ত চমকে উঠেছিলেন, অসহ্য মর্মযন্ত্রণায়। কথা কটা যেন তাঁর বুকের ভিতরে জলন্ত অঙ্গারের মত। মনে হ'ল গোপাল চিমটে দিয়ে জলন্ত অঙ্গারা ধরে তাঁর বুকের ভিতরে টিপে ধরেছে।

—এ্যা-ও! বলে একটা বুকফাটানো হুঙ্কার আপনি তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এক লাফ দিয়ে উঠে তিনি গোপালের গালে মেরেছিলেন প্রচণ্ড একটা চড়।

গোপাল চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা মজলিস। প্রথমটা কেউ বুঝতেও পারে নি এর

মধ্যে হল কি? গোপাল হতভম্ব হয়ে কমলাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কমলাকান্ত বলেছিলেন—মুখ ভেঙে দেব তোমার। জিভটা ছিঁড়ে নেব!

এরপর যা হবার তাই ঘটল। কথা দু-চারটে আরও হয়েছিল, কিন্তু সে থাক। গোপাল নিজের পাগড়িটা—যেটা কমলাকান্তের চড় মারার ঝটকায় পড়ে গিয়েছিল, কুড়িয়ে নিয়ে নীরবে হনহন করে চলে গিয়েছিল।

সেইদিনই আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেটা সন্ধ্যের সময়। কমলাকান্তের বাড়ীর দাওয়ায় গ্রামের মজলিস বসেছিল। আলোচনা ওই আলোচনা। কমলাকান্ত হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখার্জিকে পত্র লিখেছে—রবিনসনের অত্যাচারের কথা জানিয়েছে, তাই পড়ে শোনাচ্ছিল, এমন সময় জন তিন-চার চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে ছুটে এসে বললে—দে-সরকারের পালকি যাচ্ছে। তার ছেলে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী। ষষ্ঠীতে যায় নি, আজ যাচ্ছে।

সমস্ত আসরটা মুহূর্তে একাগ্র এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পালকি হাঁকিয়ে সদম্ভে চলে যাবে?

কমলাকান্ত বলেছিলেন—ক'জন চাপরাসী আছে রে?

—পাঁচজন-ছ'জন হবে।

—আর বেহারা আটজন নিয়ে তের-চৌদ্দজন।

চট করে ঠাকুরদাস উঠে এসে বলেছিল—তা থাক। তুমি হুকুম দাও, আমি ওর ছেলেকে পায়ে হাঁটিয়ে এখানে এনে দি!

—মারামারি করবি না?

—না-না-না। তিনসত্যি করছি। তুমি শুধু হুকুম দাও। দেখ না কি করি আমি।

—কোন অভদ্রতা করবি নে, শুধু পালকি থেকে নাগিয়ে আনবি! দাঙ্গা করবি নে, সে হবে কি করে?

—দেখ না! গাঙের ঘাটের পাশের জঙ্গল থেকে বড়মেয়ার দুটি হাঁক ছাড়ব শুধু। বলে সে ক'জন সাকরেদকে ইসারা দিয়ে ছুটে চলে গেল। পিছনে পিছনে জন-পনেরো সাকরেদ ছুটে বেরিয়ে গেল। গোটা মজলিসটা মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি কমলাকান্তের সম্পর্কে দাদামশাই—বয়সে ষাট পার হয়েছেন—তিনি পর্যন্ত খি-খি শব্দে হেসে বলেছিলেন—তাহলে জলদি যা, জলদি! দেখ তো কেউ পালকি কত দূরে?

কমলাকান্ত ঠিক বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করেছিল—কি বলুন তো?

—দেখ না নাতি, দেখ না! ঠাকুরদাস অনেক রকম পারে হে। দেখ না!

ইতিমধ্যেই দূরে পালকির বেহারাদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে আলোর ছটা বাড়ল। মশাল হাতে মশালচীর পিছনে দে-সরকারের ছেলের পালকি। সামনে পিছনে তিনজন-চারজন লাঠিধারী বরকন্দাজ। মাথায় লাল শালুর পাগড়ি। মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে গেল। কমলাকান্তে

নে লেগেছিল। তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"আমি কীর্তিহাটের রায় এস্টেটের মালিক, আমার তুলনায় এই ব্যক্তিটা একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তি। সে এইভাবে লোকলস্করসহ পালকি চাপিয়া চলিয়া গেল, আমি আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম। এবং মনে হইল, ইহার জন্য দায়ী বীরেশ্বর রায়, আমার মাতুল। এমন হিংসা, এমন জটিল চরিত্রবিশিষ্ট মনুষ্য আমি দেখি নাই। আমাকে আমার অধিকার উদ্ধার করিতেই হইবে। এবং এই শ্যামনগর-রাধানগর-যুগলপুর লাট খরিদ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।"

তখন আসরে চলেছে দে-সরকারদের ভবিষ্যৎ ভবিতব্যের কথা। প্রবীণতম ভট্টাচার্য বলছেন—অতি দানে বলি বদ্ধঃ, অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি দর্পে হত লঙ্কা, সর্বমত্যন্তম্‌-গর্হিতম। এই কায়স্থ কুলকজ্জলের তাই হয়েছে। একসঙ্গে অতিমান এবং অতিদর্প। এ সহ্য হবে না!

আঘাত তাঁদেরও লেগেছিল।

—সম্মুখে দেবস্থান, ব্রাহ্মণদের মজলিস চলছে, একেবারে একটা সম্ভাষণ না করে চলে গেল! পালকি থেকে না নামিস, মুখ বাড়িয়ে দেবতাকে প্রণামটা তো করলে পারতিস!

হঠাৎ একটা প্রবল কোন জান্তব গর্জনে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল, দু-চারজন চমকেও উঠেছিল। পরক্ষণেই হেসেছিল সকলে। কমলাকান্তও চমকে উঠেছিলেন।

—কি? বাঘ?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হুঙ্কার। ওদিকে কতকগুলো লোকের চিৎকার শোনা গেল।—বাঘ-বাঘ! সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রান্তেই বাঘ-তাড়ানো টিন বেজে উঠল।

বাঘ? এখানে বাঘ আছে। চিতাবাঘ। মধ্যে মধ্যে দু-একটা গেলেদা বাঘও এসে পড়ে, কথা রত্নেশ্বর শুনেছেন।

বুড়ো ভটচাজ হেসে উঠে বলেছিলেন—সাবাস, সাবাস, সাবাস! কমলাকান্তের এবার মনে হল ঠাকুরদাস উঠে যাবার সময় বলে গেছে, 'বড়মেয়ার' দুটি ডাক! তবে কি! তিনি বললেন—ঠাকুরদাস?

—হ্যাঁ। ফুটো হাঁড়ি-মালসায় মুখ ভরে অবিকল ডাকতে পারে। তবে আজকের ডাক কম!

ঠিক সেই মুহূর্তে পালকিবেহারা চাপরাসী মশালচী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে মজলিসের গুলি দেখে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

বৃদ্ধ ভটচাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল?

একজন সভয়ে বললে—বাঘ! ডোরা বাঘ, একবারে ঘাটের মুখে জঙ্গল থেকে হাকড়ে উঠল, জঙ্গল একেবারে ঝড়ে নড়ার মত নড়ে উঠল!

—বস বস বাবাসকল বস। একটু করে জল খাও। লাঠিগুলি রাখ। বাবু কোথায়?

একজন চাপরাসী বললে—বাবু ওই পালকির মধ্যে। কি হবে?

—হবে, বস। হচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই দূরে ঠাকুরদাসের গলা পাওয়া গেল। সে হেঁকে বলছিল—দাদাঠাকুর দাদাঠাকুর!

বলতে বলতেই দে-সরকারের ছেলেকে একরকম জড়িয়ে ধরে নিয়ে এসে হাজির হল বললে—ওঃ, এ্যাই বড় বাঘ, একটু হলেই ঝাঁপ দিত। বাপ, হাঁকাড় কি? আমরা ওখানে ছিলাম। তা বেয়ারা-বরকন্দাজরা পালকি ফেলে চলে এল, বাবুমাশায় দেখি পালকির মধ্যে প্রা বেহুঁস। বড়া খারাপি হয়ে গিয়েছে। কোন রকমে ওনাকে এই নিয়ে আসছি ছোঁড়াগুলান হৈ-হৈ করে বাঘের পেছোনে টিন বাজাচ্ছে। এই লেন। বসেন বাবুমাশা বসেন। এক ঘটি জল দেন।

দে-সরকারের ছেলের পোশাক-পরিচ্ছদ ধুলোয় নষ্ট হয়েছে। ঠাকুরদাস তাকে পাল থেকে বের করবার সময় সুকৌশলে মাটিতে একটা আছাড়ও খাইয়েছিল।

প্রবীণতম ভট্টাচার্য বলেছিলেন—বস বাবা, না তার আগে ঘরে দেবতা রয়েছেন প্রণ কর; ব্রাহ্মণেরা রয়েছেন, পায়ের ধুলো নাও। এ হল বাবা দেবতা ব্রাহ্মণকে অবহে উপেক্ষার ফল। কলিকাল হলেও এক পাদ ধর্ম তো এখনও আছে! এমন করে দেব ব্রাহ্মণকে তুম কোন হ্যায় বলে চলে গেলে এমনি করেই হুঙ্কার দেয়। বাঘে দেয়, ভাল দেয়! কখনও কখনও বিনা মেঘে বাজও হাঁকড়ে ওঠে বাবা!

সুলতা হেসেছিল এবার। বলেছিল—সেকালের রসজ্ঞান তো বিচিত্র!

—সেকালটাই বিচিত্র ছিল সুলতা। সুরেশ্বর হাসলে। তবে একালেই কি আমরা যাই! কলকাতার একটা ইলেকশনে দেখেছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের বাড়ীর সামনে এক সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম করে বলছিল—অমুকচন্দ্র অমুক। আর দল সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁড়ি হ নিয়ে দুম করে ভেঙে দিচ্ছিল। অর্থাৎ নাম করলে হাঁড়ি ফাটে।

সুলতা হেসে বললে—জানি।

সুরেশ্বর বললে—ও কথা থাক। এখন শুনে যাও যা ঘটল। এই রসিকতার মাশু দিতে হল, তাই বলি।

—দে-সরকারের ছেলে একটু স্থূলকায় কিন্তু জমিদার কায়স্থের ছেলে, তিনি ব্যাপ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেবতাকে এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে বলেছিলেন—আমি এবার। এ উপকার মনে থাকবে আমার।

বেয়ারারা পালকিখানা আনতে গিয়ে সেটাকে পায় নি। সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে উপর পড়েছিল। ঠাকুরদাস বলেছিল, তাহলে বাঘটা বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দিয়েছে

এর পর বিনা বাক্যব্যয়ে পায়ে হেঁটে দে-সরকারের ছেলে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল।

কমলাকান্ত সারাক্ষণ চুপ করেই বসেছিলেন। বিদায়ের সময় শুধু বলেছিলেন—আপনার কে বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার পিতা শ্রীবিমলাকান্ত তাঁর মহলে একটা রাখেন বটে, কিন্তু আমি এখনও প্রজা নই আপনাদের। আমি কীর্তিহাটের আট আনা র মালিক। আমিও জমিদার। বলবেন।

দে-সরকারের ছেলে চলে গিয়েছিলেন।

তার দশ দিন পর, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শ্যামনগরে আগুন লাগল। শ্যামনগরে তখন জোট জমাট বেঁধেছে। সকলে সাবধানে চলাফেরা করে। গ্রামের মোড়ে মোড়ে পাহারা দেখে জমিদারের বা রবিনসনের লোক আসছে কিনা। দু দিন পর অবশ্য দে-সরকারের অনেক বরকন্দাজ সঙ্গে করে পালকি হাঁকিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সেদিন রাস্তার ধারে ছিল না। কিন্তু কোথায় কোন অন্তরাল থেকে ক্যানেস্তারা বাস্ত হয়েছিল। এই পর্যন্ত। ঠাৎ দশ দিন পর তৃতীয় প্রহর রাত্রে যখন সব মানুষ একটা শেষরাত্রের ঘুমে ঘুমিয়ে ছ, তখন গ্রামে আগুন লাগল। সে আগুন একটা পরিকল্পনা করে লাগানো আগুন। আগুনের বেড়াজাল বলে তাই।

প্রায় সব কটি ঘরে একসঙ্গে আগুন লাগল। যেন কেউ কারু সাহায্যে যেতে না পারে। কমলাকান্তের কোঠাঘরে চার কোণে আগুন লাগল। এবং ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়েছিল একটা। কমলাকান্তের কাছে ঠাকুরদাস শুয়ে থাকত। ঠাকুরদাস কোঠাঘরের া ভেঙে বের হবার পথ করেছিল। তখন মাথার উপরের চাল পুড়ে খসে পড়েছে ভিতরে। কান্ত উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন। পিঠ তাঁর ঝলসে গেছে। ঠাকুরদাসই তাঁকে কোন টেনে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল নিচে। ওদিকে তখন ঠাকুরদাস পালের বাড়ীতে তার র সকলে পোড়া চালের তলায় চাপা পড়েছে। তার বাড়ীতেও ঠিক তালা শিকল লাগিয়ে কোণে আগুন লাগানো হয়েছিল।

আগুন লাগিয়েছিল গোপাল সিং। হুকুম ছিল রবিনসনের।

গোপাল সিং কমলাকান্তের কাছে চড় খেয়ে তা হজম করে নি। সে গোপাল সিং, তা সে া। সে শ্যামনগর থেকে চলে আসতে আসতে ফিরে গিয়েছিল কমলাকান্তের শত্রু ন এবং দে-সরকারের কাছে। রবিনসন নিতান্ত ইতর ইংরেজ হলেও ইংরেজ, সে যা নিজে সোজাসুজি করতে চেয়েছিল। কিন্তু চতুর দে-সরকার গোপাল সিংকে দেখিয়ে ল—গোপালকে ভার দাও সাহেব। তার থেকে জবরদস্ত লোক তোমার নেই। আর াও তো তোমার কুঠীর কাজে ভর্তি হচ্ছে। দাও, ওকেই ভারটা দাও।

গোপালের দম্ভ স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং ধূমায়িত আক্রোশটাও বাতাস পেয়ে উঠেছিল সে নিজে হাতে শোধ নেবে। সে বলেছিল—চুপ করে থাকেন সাহেব, ক'টা দিন র থাকেন। আমি আমার সাকরেদদের নিয়ে আসি। দোহাই আপনের, কুচ্ছু করবেন

না। আমি লাল ঘোড়ার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে দিব। আপনা কুটীকে বারেন্দেমে কুর্সী বইঠিয়ে আরামসে, দেখবেন লাল ঘোড়াকে ঘৌড়দৌড়।

গোপাল হেঁকে বলেও গেছে। হামার নাম গোপাল সিং!

* * *

সওয়ার খবর নিয়ে ফিরে এল।

বীরেশ্বর সংবাদটা শুনে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞ করেছিলেন—বেঁচে আছে? তুম আপনা আঁখ সে দেখা?

—নেহি হুজুর। মুলাকাত আমার সঙ্গে হয় নি। চিঠিও ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বীরেশ্বর রায় অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে চেতনা হয়েছি কিন্তু চোখ লাল, দৃষ্টি বিহ্বল। তার সঙ্গে বিকারের মত প্রলাপ।

মেদিনীপুর থেকে ইংরেজ ডাক্তারসাহেব এসেছিল। ডাক্তারসাহেব বলেছিল— কন্‌জেশন হয়েছে। যারা মদ খায়, তাদের হয়। আবার কোন মানসিক আঘাত থে হয়। মনে হচ্ছে অবস্থা খারাপ। গিরীন্দ্র আচার্য মহল থেকে ফিরে এসেছেন খবর পে তিনি এসেই সাহেব ডাক্তার আনিয়েছেন।

সাহেব ডাক্তারের কথা শুনে পরামর্শ করে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন, গিরীন্দ্র আচার্য লোক পাঠ কমলাকান্তের কাছে। মাতুলের অবস্থা তাঁকে জানানো আবশ্যক। সেও অসুস্থ। তবু করে হোক তাঁর আসা আবশ্যক। বজরা তাঁরা পাঠান নি সাহস করে।

পাঁচ দিনের দিন একখানা ছিপ এসে লেগেছিল কাঁসাই-এর ঘাটে। নৌকা থেকে এসেছিলেন মহেশচন্দ্র এবং ভবানী।

লোকে প্রথমটা চিনতে পারে নি।

পারবে কেন? সাধারণ লোকে রায়বাড়ীর বধূ ভবানী দেবীকে দেখে নি। সেটা যুগ।

সুলতা, প্রৌঢ়া রাণী কাত্যায়নীকে একটা চৌদ্দ বছরের ডোমেদের ছেলে অবাক- গাছের উপর থেকে দেখছিল বলে তার কি শাস্তি হয়েছিল বলেছি। সেই যুগ। তার বধূ ভবানী দেবীকে তারা জানত রাজরাণী, এবং তাঁকে না দেখলেও তাঁর রাজরাণীর বসন-ভূষণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। এ মেয়ে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের। ভূষণের মধ্যে দু গাছি শঙ্খ ছাড়া কোন ভূষণ ছিল না; আর পরনে একখানি লালপেড়ে শাড়ী। তবে চুলের রাশি এবং চোখের দৃষ্টিতে তারা বিস্মিত হয়েছিল। চিনতে পারে নি।

ভবানী দেবী এসে ঢুকেছিলেন কালীবাড়ীতে।

লোকজন তখন ব্যস্ত। বাবুর অসুখ। একটা চাপা আশঙ্কা সকলের বুকে এবং চো

ট উঠেছে। লোকজন অনেক তবু গুঞ্জনের কলরবও ছিল না।

ভবানী দেবী নাটমন্দিরে প্রথম প্রণাম সেরে, নাটমন্দির থেকে মায়ের মন্দিরের বারান্দায় ় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গড়িয়ে পড়েছিলেন। একেবারে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়েছিলেন ছুক্ষণ।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন ছিলেন তখন রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে। মায়ের মন্দির খোলাই ছিল; নার্থীর জন্য খোলা রাখার নিয়ম ছিল। পরিচারক ঘুরছিল এদিক-ওদিক, সে ভোগের গাড়-যন্ত্র করছিল। সে হাতে একটা বড় গাড়ু নিয়ে গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে চলেছিল ভোগশালা কে মন্দির পর্যন্ত। এই পথে মায়ের ভোগ আসবে। নাটমন্দির থেকে লোকজনেরা সরে চ্ছিল, ভোগে দৃষ্টি পড়বে তাদের। সে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল ওই বারান্দায় লুটিয়ে পড়া য়েটিকে দেখে।

—কে গো? ও গো, কে গো, তুমি বাছা? ওঠো ওঠো। মায়ের ভোগ হবে, ভোগ সবে ওঠো।

উত্তর দেন নি ভবানী দেবী, নিস্পন্দ হয়ে পড়েই ছিলেন। পরিচারক আবার ডেকেছিল, গো মেয়ে! আরে এ যে নড়ে না! কি বিপদ?

নাটমন্দিরে একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। তিনি বোধ করি দারুণ সংশয়ের মধ্যে মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, কি হবে, কি ব এর পর! এবার তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পরিচারককে বলেছিলেন—ওঁকে কো না বাবা, ওঁর হ'লে উনি আপনি উঠবেন।

মহেশচন্দ্র সে আমলের শহরবাসী ইংরিজী-জানা মানুষ। লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। তাঁর কৃত্ব ছিল। তাঁর কথায় পরিচারক একটু দমে গিয়ে বলেছিল—মায়ের যে ভোগের সময় ।

—তা হোক। মা তো! একটু না-হয় দেরিই হবে সন্তানের জন্য!

কথাটা শুনে পরিচারক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে কি করবে বুঝতে না পেরে গাড়ুটা ় ধরে দাঁড়িয়েই ছিল। ঠিক এই সময় রাজরাজেশ্বরের মন্দির থেকে ন্যায়রত্নমশাই মায়ের রে এসে পড়েছিলেন। রাজরাজেশ্বরের চত্বরের দরজা পার হয়েই তিনি মহেশচন্দ্রের গুলি শুনতে পেয়েছিলেন। পরিচারকের কথাও—শেষ কথা—শুনেছিলেন। বুঝতে ছিলেন সে একটু বিব্রত।

—মায়ের যে ভোগের সময় হল।

উত্তরে শুনলেন—তা হোক। মা তো! একটু না হয় দেরিই হবে সন্তানের জন্য!

ভাল লাগল। কিন্তু হল কি? তিনি পরিচারককে ডেকে বললেন, কি হল হরিচরণ?

—আজ্ঞে, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মায়ের দরজার সামনে। ডাকলে সাড়া

নেই। উঠতে বলছি, তা উনি বলছেন—

ন্যায়রত্ন ততক্ষণে এসে পড়েছেন সামনে। দেখলেন সাষ্টাঙ্গে প্রণতা ভবানী উপুড় হয়ে পড়ে আছে, পিঠের উপর রাশীকৃত রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে; নিথর নিস্তব্ধ। একটি প্রগাঢ় আত্মনিবেদন যেন ধ্যানে সমাহিত হয়ে গেছে। তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

—কোন মানসিকের জন্য এসেছেন বুঝি? তিনি এবার ফিরে তাকালেন মহেশচন্দ্রের দিকে। তিনি চমকে উঠলেন, যেন চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তাঁর বিস্ময় অপরিসীম হয়ে উঠেছিল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—মহাশয়ের নাম?

—নাম? মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বলে আঙুল দেখিয়ে ভবানীকে দেখিয়ে বললেন—খবরটা পেয়ে আর থাকতে পারলে না, ছুটে এসেছে।

ফিরে ভবানীর দিকে তাকালেন ন্যায়রত্ন।

মহেশচন্দ্র বললেন—বারো বছর ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়েছে, এই আর এক পক্ষ বাকী। তবু এল। পারলে না থাকতে!

ন্যায়রত্ন বোধ হয় সোরগোল তুলতেন। মহেশচন্দ্র বারণ করে বললেন—না। সোরগোল তুলবেন না। সে খুব খারাপ হবে!

ন্যায়রত্ন এবার এগিয়ে গিয়ে ভবানী দেবীর মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন—মা!

ভবানী দেবীর সাড়া ছিল না। তিনি ওখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তিনি পরিচারকের হাতের গাড়ুটা নিয়ে গঙ্গাজল ঢেলে মাথায় ছপছপ করে ঝাপটা দিয়েছিলেন। আর ডেকেছিলেন—মা-মা-মা!

সোরগোল উঠেই গেল আপনা থেকে। গিরীন্দ্র আচার্য ছিলেন বাড়ীর মধ্যে, বীরেশ্বর রায়ের শোবার ঘরের বারান্দায়। মেদিনীপুরের একজন দেশী ডাক্তার রয়েছেন। ঘরের মধ্যে বীরেশ্বরের খাস চাকর জলধর বসে আছে মাথার শিয়রে। মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপটি চলছে অহরহ। একজন চাকর বাতাস দিচ্ছে। রায়বাড়ীর কবিরাজমশাই বসে আছেন, আচার্যের পাশে। নাড়ী দেখছেন তিনি। সারা অন্দরে এক পায়রার ডাক ছাড়া কোন ডাক শোনা যায় না। নিষেধ আছে জোরে কথা বলতে। কথাবার্তা ফিসফিস করে অথবা অতি মৃদুস্বরে চলছে, তাও দুটো-চারটে। পুকুরের ধারে জলের উপর ঝুঁকে-পড়া কুলগাছ থেকে পাকা কুল মধ্যে মধ্যে ঝরে পড়ার সঙ্গেই তার তুলনা হয়। মধ্যে মধ্যে একটি দুটি টুপ টুপ শব্দ।

এরই মধ্যে গিরীন্দ্র আচার্য কালীবাড়ীর সোরগোলের সাড়া পেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কি হ'ল?

ঠিক এই সময়েই উঠল শাঁখের শব্দ। তিনি দ্রুতপদে নেমে এলেন। ভেবেছিলেন

কান্ত এসেছেন।

তিনি নিচে নাটমন্দিরে এসে দেখলেন, সমস্ত সেরেস্তাখানা, চাকর-বাকর, লোক-লস্কর সব করে চারিপাশে দাঁড়িয়ে গেছে। সব স্তব্ধ, শুধু একটা ঠেলাঠেলি চলছে। মধ্যে মধ্যে ানেরা হেঁকে সাড়া তুলছে। খবরদার! খবরদার! খবরদার!

ভিড় ঠেলে তিনি জিজ্ঞাসা করতে করতেই এলেন—কি? কি? ব্যাপার কি?

কটি কথা—রাণীমা!

—রাণীমা? রাণীমা কে?

—আজ্ঞে রাণীমা! সতীরাণী বউ!

—সতীরাণী বউ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কের ভিতরটা ধক-ধক করতে শুরু করেছিল আচার্যের। আশঙ্কা না আনন্দ তিনি পারেন নি। বারো বছরেরও বেশী—তের বছর পূর্ণ হবে এই বর্ষায়। এতকাল পর? এটা তিনি জানতেন, বীরেশ্বর রায় আজও তাঁর সন্ধান করেন। এত বড় এস্টেটের ন, এস্টেটের খুঁটিনাটি, জমিদারীর জোত-জমাই শুধু তাঁর নখদর্পণে নয়, খোদ মালিকের কর্মের সংবাদ তিনি রাখেন। পা ফেললে আওয়াজ শুনে বলতে পারেন, মালিক কোন্ জ কি বলতে আসছেন।

দিন ছেদী ফিরে আসবামাত্র বীরেশ্বর রায় চঞ্চল হয়ে উঠে বিষয়কর্ম সমস্ত ঠেলে ফেলে একটি কথায় বিদায় দিয়ে, ছেদীকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে পাহারা রেখে ঘরে ঢুকে-। একটি প্রহর দরজা খোলেন নি। তারপর যখন বের হলেন, তখন যেন অন্য মানুষ। নই তিনি কমলাকান্তকে পরম সমাদরে যেন আর্ত হয়ে আসতে বলে চিঠি লিখেছিলেন। ধ্যে একটা রহস্যের আভাস তিনি পেয়েছিলেন।

কটা কৈফিয়ৎ অবশ্য মিলেছিল ন্যায়রত্নের কাছে। তিনি সোমেশ্বর রায়ের পাপের কথা, কান্তের কাছে তাঁর অপরাধের কথা চিঠি লিখে বীরেশ্বরকে জানিয়েছেন, একথা ন্যায়রত্ন বলেছিলেন; এবং বলেছিলেন, বীরেশ্বরের মন সম্ভবতঃ এই কারণেই পাল্টেছে। কমলা-শ্যামাকান্তের পৌত্র। প্রায়শ্চিত্ত করবার সুমতি সেই কারণেই।

বু এই বিষয়ী মানুষটির মন এতে সন্তুষ্ট হয় নি। তিনি ছেদীকে ডেকে কথাবার্তার মধ্যে রে জানতে চেষ্টা করেছেন। ছেদী বুদ্ধি তাঁর থেকে বেশী ধরে না। তবু বিশেষ কিছু পারেন নি। তবে আভাস একটা পেয়েছেন।

াশীতে বিমলাকান্ত আবার বিবাহ করেছে তা জেনেছেন। আর পেয়েছেন এক য়ের খবর। ছেদী বলেছে—তিনি সাকসাৎ দেবী। তপস্যা করেন। এই সতীমাঈজীই দিয়েছেন বিমলাকান্তের। কমলাকান্তকেও তিনি খুব কৃপা করেন। বাবুজী, বেটার

মাফিক। এমন কি সতীমাঈ তীরথ করতে এসেছেন, যাবেন গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, এসেছে বিমলাকান্তের সঙ্গে। কিন্তু সতীমাঈ যে কে তা তিনি প্রশ্ন করেন নি। কাশীধাম তপস্যা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। এই কলিতে ঈশ্বরসন্ধানী তপস্বী-তপস্বিনীদের আশ্রয় ভূমি। সুতরাং কাশীতে সতীমাঈর আবির্ভাব তাঁর বিষয়ী মনের উপরেও এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলে নি। এমন কি রায়বাড়ীর ভেসে-যাওয়া সতীরাণী বউয়ের সঙ্গে কাশীর সতীমাঈজীর নামের মিল সত্ত্বেও এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, তাও তাঁর মনে হয় নি। এই মুহূর্তেও তা তাঁর মনে হচ্ছি না। তিনি নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়েই এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন। ভিড় থেকে বেরিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, একটি মেয়ে মন্দিরের দরজার সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন তাঁর হাতে মায়ের নির্মাল্য দিচ্ছেন। পরিচারক তখনও হাতে শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে ধরে তার পাশে বসে আছেন একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ তার মুখের এক দিকটা দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হল—দেখা মুখ, এবং মুহূর্তেই বুঝলেন ভবানী দেবীর পালক-পিতা, মহেশচন্দ্র। গিরীন্দ্র আচার্য এসে মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন।

ন্যায়রত্ন নির্মাল্য মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন—চিরায়ুষ্মতী ভব।

প্রণাম করলেন ভবানী দেবী। ন্যায়রত্ন গিরীন্দ্র আচার্যকে দেখতে পেলেন এবার, এবং বেশ দীপ্তমুখে বললেন—আর ভয় নেই আচার্যমশায়। বারো বৎসর তপস্যা করে রায়বাড়ী গৃহলক্ষ্মী ফিরেছেন। মা প্রসন্ন। বীরেশ্বর অচিরে সুস্থ হবেন।

ভবানী দেবী প্রণাম করে উঠে ফিরে তাকালেন; গিরীন্দ্র আচার্যের নাম শুনেই তাকালেন এবং উঠবার চেষ্টা করলেন।

আচার্য তাঁর মুখের দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, রুক্ষ চুলের রাশি সে মুখখানিকে ঘিরে আশ্চর্য রূপ এবং মহিমা দিয়েছে। ঠোঁট দুটি শুষ্ক। কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য উজ্জ্বল। ভবানী দেবী একটু ট্যারা। চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নাচ্ছন্নতা রয়েছে যেন। অথবা কোন ভাবনায় সে দৃষ্টি সমাহিতের মত মগ্ন। মধ্যে মধ্যে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে কাটা মেঘের ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্যালোকের মত। আচার্যকে দেখে দেখে সেই মুহূর্তে তেমনি এক ঝলক সচেতনতার আলো ফুটে উঠেছে। তিনি এতক্ষণে অনবগুণ্ঠিত মাথার উপর কাপড়ের আঁচল টেনে দিলেন।

সামাজিক এবং বিষয়ী মানুষ আচার্যের মনে মুহূর্ত পূর্বেও শত প্রশ্ন একটা ভয়ার্ত জনতার মত একসঙ্গে যেন কোলাহল শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে শান্ত শুধু হল না, লজ্জিত হয়ে তারা লুকিয়ে পড়ল মনের কোণে কোণে। আচার্যের ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, একটা আবেগ তাঁর বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তিনি বললেন —আসুন মা!

শুধু বৃদ্ধা মাসীমা, রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর এক জ্ঞাতি ভগ্নী যিনি এখন রায়বাড়ীর

মন্দরে পোষ্যমহলে কর্তৃত্ব করেন এবং দেবমন্দিরে মেয়েদের কৃত্যগুলি সম্পন্ন করেন এবং করান, তিনি এগিয়ে এসে বললেন—এত দিন পর কি দেখতে এলে মা ? একদিন-আধদিন নয়, সাড়ে বারো বছর পার হয়ে গেল, লোকে জানে, আমরা জানি, তুমি জলে ডুবে মরেছ, সেই তুমি ফিরে এলে আজ কি মনে করে বল দিকি ? সম্পত্তি ? বলি ও আচার্য।

আচার্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কথা শুনে, নিজের নাম শুনে সচেতন হয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—চুপ করুন আপনি ! জিভ আপনার খসে যাবে। কাকে কি বলছেন ? জানেন ওঁরা কাশীধাম ওঁকে বলে সতীমাঈ ! পথে চলে যান, লোকে পথের ধুলো কুড়িয়ে নেয় ! ছেদী ছেদী কই ? ছেদী !

ছেদী অনেকক্ষণ এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল লাঠিতে ভর দিয়ে, সে বললে—হুজুর ! হমি আপনা আঁখ সে দেখিয়েছি হুজুর, দেওতা, মাঈজী হামার দেওতা আছেন। হুজুর, হামার বুড়ী মাঈজীর পতা করতে কাশী পাঠাইয়েছিলেন। উনকে চিট্‌ঠি হামি হামারা হুজুরকে আপনা হাতে দিলম, বিলকুল সব বললম। বাবুজীর আঁখ সে আঁশু নিকাল গৈলি হল !

ভবানী দেবী মৃদুস্বরে বললেন—ছেদী ! চুপ কর তুমি। খুড়োমশায় আপনি বলুন, আমাকে পথ দিতে। আমি ভিতরে যাব।

তারপর তিনি মাসীমাকে বললেন—অপরাধ আমার হয়েছে মাসী। কিন্তু উনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তিনি আমাকে আসতে লিখেছেন। তাঁর হুকুমেই আমি এসেছি।

আচার্যের দিকে একখানা চিঠি তুলে ধরে বললেন—এই পড়ে শোনান, ওঁরা যদি শুনতে চান। উনি কমলাকান্তকে লিখেছিলেন। তার মধ্যেই আছে! শেষখানার শেষছত্রটা পড়ুন।

আচার্য পড়লেন—"তুমি তোমার ভালো-মাকে বল, আমি তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।"

পড়া শেষ হওয়ামাত্র ভবানী দেবী চলে গেলেন রাজরাজেশ্বর মন্দিরে, সেখানে প্রণাম করে অন্দরের মুখে দাঁড়ালেন, বললেন—আমাকে পথ দিন। বললেন মাসীমাকে, কিন্তু সকলে পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিলেন।

পরিচারক আবার শাঁখ বাজালে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে কেউ একজন হুলুধ্বনি দিয়েছিল, একজন শুরু করতেই সব মেয়েরাই দিয়েছিল। উলু-উলু শব্দে নাটমন্দির হেসে উঠল।

একজন কেউ বলেছিল—করছ কি ? সবাই কি থম্ব হয়ে গেল নাকি। জলধারা দিয়ে দাও, জলধারা দাও।

আচার্য বলেছিলেন—ওহে পরিচারক, করছ কি ? এস আমার সঙ্গে এস। তিনি ভবানীকে ডেকে বলেন নি, তাতে পিছু-ডাকা হবে, একটু ত্বরিতপদে তাঁকে পাশ কাটিয়ে আগে এসে

বলেছিল—আমি আগে যাই মা। মহেশবাবু, আপনি আসুন।

সিঁড়ি পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে আচার্য বলেছিলেন—তাঁর দেওয়ানী ভঙ্গীতে—আর ন এখান থেকে সব ফিরতে হবে। কেউ না। বরকন্দাজ কোথায়? মহাবীর! সিঁড়ির খাড়া থাক। কেউ না উপরে যায়। একটি শব্দ না হয়। হাঁ?

—হাঁ হুজুর

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, এ সমস্ত বিবরণ আছে রত্নেশ্বর রায়ের প্রথম ডায়রীখানায় খানার এক পিঠে আছে দৈনন্দিন দিনলিপি, ওই পোষ্যপুত্র হিসেবে বাপ-মায়ের কোলে আসার দিন থেকে, আর আর এক পিঠে আছে তাঁর বিগত জীবনের বিবরণ। তারই এই দিনটির সমস্ত ঘটনা তিনি বিশদভাবে লিখেছেন। শুনে লিখেছেন অবশ্য। কারণ তখনও শ্যামনগরে পিঠের পোড়া ঘা নিয়ে শুয়ে। এবং তখনও তিনি তাঁর আত্মপ জানেন না।

তাঁর পুড়ে জখম হওয়ার কথা কীর্তিহাটের বরকন্দাজ ফিরে এসে বলেছিল বীরেশ্বর রায় ওদিকে স্ত্রী-পুত্রহারা আহত ঠাকুরদাস কমলাকান্তের ভালো-মাকে খবর দিতে ভুলে যায় শ্যামনগর তখন পুড়ে গেছে। প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে তাদের ধর্ম ঘট মাটির ঘট থেকে পাথরের ঘট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, রাধানগরের কায়স্থদের এই ঘটনায় দে-সরকারদের জ্ঞাতিদের নেতৃত্বে দু ভাগ হয়ে গেছে। যারা এতকাল জ্ঞ স্বজাতি এবং স্বগ্রামবাসী বলে মুখে চুপ করেছিল, তারাও সদলে এসে শ্যামনগরে এসে ব্র মাতব্বরদের কাছে বলে গেছে যে, তাঁদের সঙ্গেই তারা রইল, আজ থেকে দে-সরকার জ্ঞ স্বজাতি হয়েও আমাদের শত্রু! ঘরে শিকল দিয়ে আগুন লাগিয়ে ব্রহ্মহত্যা! হে ভগব ওই ম্লেচ্ছ কুঠিয়ালের সংসর্গে এসে পিশাচ হয়ে গেছে লোকটা!

শুধু রাধানগর নয়, এই খবরটা এমন একটা চেহারা নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়েছিল যে, দশখানা গ্রামের মানুষ এসে বলে গিয়েছিল, আমরাও আছি। এসব গ্রামের দু-তিনখ জন রবিনসনের নীল অভিযান চলেছিল। বাকী গ্রাম এসেছিল প্রাণের দরদ, দুঃখে।

শ্যামনগর পুড়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য একটা বাহুবলের সৃষ্টি হয়েছিল। ঠাকুরদাস পাল ঠাকুরদাদা ভটচাজমশায়কে ডেকে বলেছিল, একটি কাজ করতে হবে বাবাঠাকুর; ক কান্তদাদার ভালো-মায়ের কাছে আমি যে তিন সত্যি করেছি, ওর অসুক-বিসুক, বিপদ হলেই আমি তাকে খবর দোব। তা তেনাকে যে একটা খবর দিতে হয়। উনি ক সতীমা, কাশীতে লোকে বলে দেবতা। আমার মহা অপরাধ হবে!

—কোথায় খবর দেব? উনি কোথায় আছেন?

—সে আমাকে বলে গিয়েছেন বাবাঠাকুর। আমাদের জানা থানেই আছেন। আমা ঠাকুর মিয়াদের হজরতপুর-গুলমহম্মদ শরীফের ঈশেন্ কোণে পাগলী কালীমায়ের থান অ

তিনি সেখানে আছেন। কাশী থেকে স্বপনাদেশ পেয়ে এসেছেন, স্বপন হয়েছে নাকি ওইখেনেই তেনার কি বেরতো আছে, শেষ হবে। বলে গেছেন, বাবাঠাকুর, মিয়াসাহেবের কাছে গেলেই তিনি লোক দিয়ে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। রাজরোষের উপর দেবরোষ হলে সব্বনাশ হবে বাবাঠাকুর। আমার নরক হবে।

বৃদ্ধ ভটচাজ বলেছিলেন—আজ লোক পাঠাচ্ছি, ভাবিস নে তুই। ওরে আমরাও যে ভাবছি। এ করলাম কি? বিমলাকান্তের একমাত্র পুত্র রে; রূপে কার্তিক, গুণে বৃহস্পতি। তার এ দশা তো আমাদের জন্যে। নইলে সে কীর্তিহাটের জমিদার, বিমলাকান্তের সঙ্গে সাহেবের আলাপ, সে তো তার জমি ছেড়েই দিতে চেয়েছিল। আমাদের জন্যেই মিটমাট করে নি। ঝগড়া করেছে সাহেবের সঙ্গে। আমরাও যে মাথায় মাথায় ভাবছি—বিমলাকান্তকে এ সংবাদ দেব কি করে?

তারপর হঠাৎ বলেছিলেন—ওরে তুই যা বলছিস তাতে ওই সতীমাটি দেবতাই বটেন রে। নইলে এই যোগাযোগ হয়? যোগাযোগটা তো তিনিই করে দিলেন। শুনেছি, বুড়ো ঠাকুর মিয়া আজও বেঁচে আছেন। বয়ঃক্রম পঁচাশী, হয়তো বেঁচে আছেন এই আজকের জন্যে। তিনি ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে খাজনা দিতে হবে বলে যুগলপুরের মত লাট ইস্তবা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যাবার দিন আমরা বামুনরা সর্বরক্ষেতলায় পুজো দিয়েছিলাম ঢাক বাজিয়ে! ঠাকুর মিয়া কানে আঙুল দিয়ে নৌকায় চেপে চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছেও একখানা পত্র দেব রে, বলব হুজরতের বংশ আপনারা ঠাকুরসাহেব, আপনারা এককালে সিদ্ধযোগী ছিলেন। তা আপনাদের কাছে অপরাধের ফল ফলেছে। আমরা আপনাদের নজরানা, সেলাম আপনাকে জানালাম। আমাদের ক্ষমা করবেন!

সুলতা, এইখানটা পড়ে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। হয়ত এটা সেকালের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যা বলবে সবই। তবু ভাল লেগেছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসলে সুরেশ্বর।

সুলতার মুখেও একটি করুণ হাসি ফুটে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—যাক। সেইদিনই লোক চলে গিয়েছিল ছোট একখানা ছিপ নিয়ে। ভাটির মুখে যাওয়া। বোধহয় এক দিনেই পৌঁছেছিল। ভালো-মা ফিরেছিলেন, তিনদিনের দিন। একখানা লম্বা বোল দাঁড়ের ছিপে এসে পৌঁছেছিলেন; দাঁড়িদের সবাই ছিল গোয়ান। ছিপখানা ঠাকুর মিয়ার নিজের ছিপ।

সুলতা প্রশ্ন করলে—ঠাকুরসাহেব কিছু লেখেন নি?

—না! তবে নাকি ভালো-মাকে বলে দিয়েছিলেন, মা, তুমি ভটচাজদের বলিয়ো, কবরের মুখে পা বাড়াইছি। দিল্লীর বাদশাহের শাজাদাদের ফিরিঙ্গীরা শুনেছি নাকি শড়কের উপর ফটকে ফাঁসি লটকাইয়া রেখে দিছে; কবর দিতে দেয় নাই তিনদিন। এই রসুলপুরের মোহনা

দিয়া বাদশাহকে জাহাজে করে রেঙ্গুন পাঠাইয়া আটক রাখছে। শুনে কেঁদেছি। আল্লাহ্‌তলা আর রসুলে আল্লা পয়গম্বরের কাছে কইছি—খতম কর জিন্দিগী, পার কর ; কবরে ফরমান পাঠাও। তা আজ ভটচাজের চিঠিখানা পেয়ে মনে হচ্ছে—এই, এই চিঠ্যি দরখাস্ত পাবার তরেই আল্লা আমারে জীবিত রাখছিলেন। বলিয়ো, দিল সাফা করে হিয়ে খোসলে আমি সব মাফ করে গেলাম।

আর একশো টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন নতুন ঘর করবার জন্যে।

ভবানী দেবী যখন দুদিন পর এসে পৌছেছিলেন, তখন কমলাকান্তের ফাঁড়া কেটেছে, ফোস্কাগুলো কিছু বসেছে, কিছু ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা করছে বিষ্ণুপুরের ভাণ্ডারীরা। তখন এদেশে নানান চিকিৎসা ছিল, এ্যালোপাথি তখনও কলকাতা এবং বড় বড় শহর ছাড়া বড়-একটা হয় নি। বৈদ্য ছিলেন বড় বড়। বিচক্ষণ বৈদ্য। তা ছাড়া ছিল নানান স্বপ্নাদ্য ওষুধ। যার পরমায়ু আজও ফুরোয় নি। পেনিসিলিন উঠেছে। ১৯৫৩ সালে অনেকটা সুলভও হয়েছে, তবু চাঁদসীর, মা মনসার স্বপ্নাদ্য চিকিৎসা বেঁচে আছে। পাঁজির পাতা ওল্টালে আরও অনেক এমন চিকিৎসার বিজ্ঞাপন পাবে। বিষ্ণুপুরের ভাণ্ডারীরা জাতে নাপিত, তাদের কুলধর্ম ক্ষৌরি তারা করত না। ঘা কোড়ের চিকিৎসা করত। তাদের ওষুধ নাকি অব্যর্থ ওষুধ ছিল। সেই চিকিৎসা চলছে। কমলাকান্ত তিনদিনেই ফাঁড়া কাটিয়েছেন, ঠাকুরদাসের পোড়া তাঁর থেকে বেশী। সে তখনও খুব কাতর!

বীরেশ্বর রায়ের প্রথম চিঠিখানা পুড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় চিঠিখানা ভালো-মা পেয়েছিলেন। সেখানা এসেছিল শ্যামনগর যে রাত্রিতে পোড়ে তার পরদিন। চিঠিখানা পড়ে চমকে উঠেছিলেন তিনি। চিঠিখানা পড়েছি, তোমার মনে আছে, কমলাকান্তের সেই বজ্রের মত পত্রখানা পেয়ে এবং আচার্যের চিঠিতে গোপাল সিংয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগের সংবাদ জেনে তিনি লিখেছিলেন, "তোমার স্পর্ধিত পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং শঙ্কিত হইলাম যে, এবম্বিধ পত্রের জন্য তোমার নরকেও স্থান হইবে না!

চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ওরে, তুই তাঁকে কি লিখেছিলি রে? কমলাকান্ত? কি লিখেছিলি তাঁকে?

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন, "প্রথমে নির্বাক রহিলাম। ভালো-মা সব পত্রখানি পাঠ করিলেন। মধ্যে মধ্যে অংশ বিশেষ পড়িয়া উচ্চ কণ্ঠেই তাহা বলিতেছিলেন, 'তোমার সহিত পত্রালাপ করিয়া আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছে।' এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিলেন—'ওরে, তুই কি এমন কথা লিখিয়াছিস রে?' আমি নিরুত্তরই ছিলাম। আবার পড়িলেন "তোমার ভালো-মাকে বলিবে আমি ব্যাকুল হইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

তিনি পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কমলাকান্ত! কি লিখিয়াছিস বল?"

সে কণ্ঠস্বর শুনে কমলাকান্ত—রত্নেশ্বর রায় চমকে উঠেছিলেন। লিখেছেন—"বজ্রের মত কঠোর। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, আমি ভস্ম হইয়া যাইব।"

রত্নেশ্বর বলেছিলেন সব। ভয় পেয়েই বলেছিলেন। ভালো-মা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন। এরই ঘণ্টা দুয়েক পর কীর্তিহাটের সওয়ার এসেছিল গিরীন্দ্র আচার্যের পত্র নিয়ে। বীরেশ্বরের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা! কমলাকান্তের পুড়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন!

তখনও গোয়ানদের ছিপ ঘাটে বাঁধা ছিল।

সেই ছিপেই তিনি রওনা হয়ে চলে এসেছেন কীর্তিহাট।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই আছে—ভালো-মা, আমার গর্ভধারিণী, সতীশিরোমণি শ্রীমতী ভবানী দেবী ইষ্টদেবীকে এবং সৌভাগ্যশিলা রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তদীয় পদতলে উপবেশ করিলেন পুরানের সাবিত্রীর মত!

সেইদিনই শেষরাত্রে পিতা বীরেশ্বর রায়ের জ্ঞান হইল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষ। স্বামীর শিয়রে বসিয়াছিলেন মাতৃদেবী। ভৃত্যেরা তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতেছিল। গৃহের মধ্যে চিকিৎসক বসিয়া ঢুলিতেছিল। বাহিরে দেওয়ান, কবিরাজ প্রভৃতি নিদ্রিত হইয়াছে। আমার মাতারও কখন চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—তুমি কে? তুমি—!

দেখিলেন নির্নিমেষ নেত্রে স্বামী তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

তিনি করুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—আমি আসিয়াছি। আমি তোমার ভবানী!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় এরপরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রত্নেশ্বর?

—ভালো আছে। কিন্তু এখনও ঘা শুকোয় নি! ভাল হলেই আসবে!

—না। কালই আমাকে কলকাতা নিয়ে চল। পথে তাকে তুলে নেব। কলকাতায় চল। কালাবাবাকে বের করতে হবে। তিনিই তিনি। আমি চিনতে পারিনি। আমি কলকাতায় যেতে চাই। তাছাড়া আমাকে ভাল হতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে সমস্ত বিশদভাবে লিখেছেন এবং তারপর শপথ করে লিখেছেন—আমার সতীসাবিত্রীর মত জননীকে যাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা লিখিয়া রাখিলাম। যাহারা কটু বলিয়াছে তাহাদিগকে আমি ক্ষমা করিব না। কখনও না। তাহা হইলে অনন্ত নরক হইবে আমার। পিতার ওই মাসীটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মাসোহারা দিয়া কাশী পাঠাইব। এখানে রায়বাড়ীর অন্দরে 'কর্তামা' সাজিয়া বিচরণের শেষ করিব। আর জমিদারী গ্রহণ করিলাম, এখন আমার প্রধান কর্ম গোপাল সিংহের দমন! সে আমার এই জননীকে কুৎসিত বাক্য বলিয়াছে। এক চপেটাঘাতে সে দমিত হয় নাই। সে আমাকে পুড়াইয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে, গোপাল সিংহ ধ্বংস যজ্ঞের সকল সমিধ প্রস্তুত। আমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিব।

"প্রথমেই পিতৃদেব আমার পৃষ্ঠদেশের ক্ষত দেখিতে চাহিলেন।" রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে। ব্রাকেটে লেখা আছে—তখনও তাঁহাকে মাতুল বলিয়াই জানিতাম।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে—আর তিনদিন পর কীর্তিহাট থেকে বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে নিয়ে বজরায় কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। সঙ্গে লোকজন, ডাক্তার-বৈদ্য, সেবক কর্মচারীর কথা অনুমান করতে পার। বর্ণনা করব না। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় তার বর্ণনা করেছেন। তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে জয়ী হয়ে যৌবরাজ্যে আপন অধিকারে প্রথম পদার্পণ করলেন, রায়বাড়ীর খাস বজরায়, যার নাম ছিল 'কীর্তিহাট।' এ বজরা তৈরী করিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, তখন কুড়ারাম রায়ের 'ললিতা' পুরনো হয়েছে। সে বজরা কমলাকান্ত জন্মে হয়ে প্রথম দেখলেন। তার বিশদ বর্ণনাই করেছেন।

কীর্তিহাট থেকে আসবার পথে হলদীর মোহনার কাছাকাছি গুলমহম্মদ শরীক, হজরতপুর বজরা লাগিয়ে ভবানী দেবী নায়েব আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন ঠাকুরসাহেবের কাছে, সঙ্গে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। উপঢৌকনও পাঠিয়েছিলেন। কমলাকান্তের জন্য কলকাতা থেকে আসবাব আনিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, তার মধ্য থেকে একখানা উৎকৃষ্ট গালিচা পাঠিয়েছিলেন। গালিচাখানা বড় নয়, একজনের আমীরী চালে বসবার মত। তার সঙ্গে তার উপযুক্ত মসনদ অর্থাৎ তাকিয়াও ছিল। আরও কিছু ছিল,—একটা হাতীর দাঁতের কাজকরা মেহগনি কাঠের বই রেখে পড়বার কাঠা, একটি রূপার সামাদান, কিছু আতর এবং একটি ছোট সোনার রেকাবিতে কিছু মেওয়া ফল।

আচার্য গিয়ে ঠাকুরসাহেবকে সেলাম করে সব সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আমার মালিকের খুব অসুখ, মা তাঁর শিয়রে বসে আছেন, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মা ঠাকুরসাহেব বাপজীকে এইগুলি পাঠিয়েছেন।

ঠাকুরসাহেব অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—বা রে নসীব বাঃ! খেল বটে তোর। কদিন আগে শ্যামনগরের বামুনরা চিঠির মারফত পাওনা বকেয়া সেলাম নজরানা মিটিয়ে দিয়েছে, আজকে কীর্তিহাটের রায়বাবু পাঠালে আমারে খেলাত। কিন্তু নিয়া করব কি?

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—ওই গালিচায় বসে নামাজ করবেন, ওতেই বসে এই তেকাঠার উপর কোরান শরীফ রেখে এই সামাদানে আলো জেলে পড়বেন। এই মেওয়া ফলক'টি আপনি খাবেন!

ঠাকুরসাহেব ভবানী দেবীর পরিচয় পেয়েছিলেন এই সেদিন, যেদিন ওই গোয়ানদের নিয়ে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাট যান!

কয়েকটা লোক কয়েকটা নতুন কাপড়ের গাঁট এনে নামিয়ে দিয়েছিল, এখানের লোকেদের জন্য পাঠিয়েছেন ভবানী দেবী।

ঠাকুরসাহেব তখন আশী পার হয়েছেন, তবু সমর্থ মানুষ ছিলেন। খুব সমর্থ লাঠি

গ্রাম ঘুরতেন রোজ। তখনও পাখোয়াজ বাজাতেন, স্থচে স্থতো পরাতে পারতেন এবং তাঁর মত মিহি সেলাইয়ের কাজ নাকি ঠাকুরবাড়ীর বিবিসাহেবরাও করতে পারতেন না।

ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—চল, আমি যাই, বাপজানকে আমাদের সিদ্ধাই আছে, তার দোয়া দিয়া আসি।

হেঁটেই গিয়েছিলেন তিনি নদীর ঘাট পর্যন্ত। একটা ডুলি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। বজরার কামরায় ঢুকেই তিনি বলেছিলেন—কুছ ডর নাই বাপজান! আমার ফকীরির ইমান আর পিতিপুরুষের সিদ্ধাইয়ের যদি কিস্মত থাকে তবে তুমি এই নদীর বাতাসেই ভাল হয়ে উঠবা। আর এই আমার মা জননী, ইনি সতী, ইনি দেবতা বাবা। ইঁয়ার তপস্যা সি কখুনও বরবাদ হয় না। সাবিত্রির কথা জানি বাবাজান, আমি পড়েছি, জানি। বাবা জান, যিবার খরা খুব কড়া হয়, স্থয্যির তেজে যিবার দুনিয়া ফাটে, সিবার বর্ষা নামে তুফানে। তুমাদের বারো বছরের ছাড়াছাড়ি, মার এমুন তপস্যা, মিল হবার সময় এমন তুফান না হলে হয় বাবা!

আশীর্বাদ করে চলে এসেছিলেন। বীরেশ্বর রায়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু মন্ত্রতন্ত্রও পড়ে দিয়েছিলেন। ভবানী দেবী তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। বৃদ্ধ চোখের জল ফেলে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ঘুরে গিয়ে দরজায় দাড়িয়ে বলেছিলেন—একটা বাত বলব বাবা?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বলুন। হুকুম করুন।

—হুকুম রাখবে বাবা?

—সাধ্য ভোর কমুর করব না!

ভিতরে ঢুকে বলেছিলেন—নফরেরা বাইরে যা তো বাবা। আর কামরার দরজাটা বন্ধ করি দিস।

তারপর বলেছিলেন—তামাম শ্যামনগর পুড়ায়ে দিলে ওই বেটা ফিরিঙ্গী। তোমার ভাগ্নাকে ঘরে শিকল দিয়া পুড়ায়ে মারবার চেষ্টা করলে! তুমি তার শোধ লিবে না? পারবে না।

আশ্চর্য ঠাকুরসাহেব, শান্ত ফকীরের মত মানুষ, চোখ দুটো তাঁর ধক-ধক করে জ্বলে উঠেছিল। বলেছিলেন—কলিজায় আমার বড়া লেগেছে বাবা। লাট যুগলপুর আমাদের সিদ্ধাইয়ের বকশিস, জাতের দাম। বাবা, ফিরিঙ্গীকে এনে ঠাকুরদের চোট্টা নফর আজ পুড়ায়ে দিলে। আমি কিছু করতে পারলাম না। তুমি পারবে না শোধ লিতে?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—তাঁর চোখ দুটোও জলে উঠেছিল—মনে এ আমার ছিল, তার উপর আপনি ফরমায়েস করলেন, তামিল জরুর হবে!

—সাবাস সাবাস! দিল আমার খুস করে দিলে!

তিনি চলে গিয়েছিলেন।

শ্যামনগরের ঘাটে বজরা এসে লেগেছিল। তার আগেই ছিপ এসেছিল খবর নিয়ে। স্বয়ং ভবানী দেবী পত্র লিখে কমলাকান্তকে আদেশ করেছিলেন প্রস্তুত থাকতে। কঠোর নির্দেশ ছিল তাঁর। লিখেছিলেন—"আদেশ অমান্য করিলে তুমি মাতৃহত্যার পাতকী হইবে। পিতৃহত্যার পাতক অর্শিলেও আশ্চর্যের হইবে না। দাদা বিমলাকান্ত তোমার মুখদর্শন করিবেন না!"

কমলাকান্ত বীরেশ্বর রায়ের অসুখের সংবাদে এবং শ্যামনগরের এই দুর্ঘটনায় নিজেও অনুতপ্ত এবং হয়তো নিঃসহায় বোধ করছিলেন। তিনি আদেশ অমান্য করেন নি। শ্যামনগরের ঘাটে আসেন নি; লোক রেখেছিলেন। এবং নিজে বাড়ীতে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঘাটে এসে জুটেছিল গোটা শ্যামনগর। বীরেশ্বর রায় এ সারা অঞ্চলে তখন গল্পের মানুষ। বজরা, ভাউলে নৌকো, ছিপ নিয়ে সে একটি ছোটখাট নৌবহর ঘাটে যখন লেগেছিল, তখন এ অঞ্চলের মানুষের বিস্ময়ের সীমা ছিল না!

গিরীন্দ্র আচার্য ঘাটে নেমে গ্রামের প্রধানদের নিয়ে কমলাকান্তকে আনতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে লোক-লস্কর নিয়েই গিয়েছিলেন। কমলাকান্ত জ্ঞাতি ভট্টাচার্যদের বাড়ীতে ছিলেন, সেদিন তখন প্রস্তুত হয়ে তাঁদের পাকা দেবমন্দিরের বারান্দায় বসে ছিলেন।

ডুলি আনানো ছিল। দুখানা ডুলি।

কমলাকান্ত ঠাকুরদাস পালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ঠাকুরদাস দাদা কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে!

আচার্য হেসে বলেছিলেন—বেশ তো বাবুজী, শুধু ঠাকুরদাস কেন গো, শ্যামনগরের দশ-বিশজন-পঞ্চাশজন যত জন খুশি নিয়ে চল না! তোমার হুকুম! অমান্যি করে কার সাধ্যি।

সমবেত লোকজনেরা দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠেছিলেন! কমলাকান্ত একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। ডায়রীতে লিখেছেন—"দেওয়ানজীর এবম্প্রকার উক্তিতে আমি গৌরব এবং লজ্জা উভয়ই অনুভব করিলাম।

দেওয়ান আচার্য কমলাকান্তকে নিয়ে রওনা হবার সময় কীর্তিহাটের বিচক্ষণ কর্মচারী বনু ঘোষ এবং দুজন পাইককে রেখে এসেছিলেন; বিমলাকান্তের পোড়া বাড়ীর চাল বর্ষা চালানোর মত মেরামতের জন্য। এবং ঠাকুরদাস পালের বাড়ীর মাথা ভেঙে নতুন দেওয়াল চড়িয়ে মজবুত করে তৈরীর জন্য। বর্ষার পর ইট পাড়িয়ে বিমলাকান্তের বাড়ী পাকা হবে। সুতরাং কোন রকমে বর্ষা কাটানোর মত করে রাখা হবে। ক্রোশ দুয়েক দূরে কুতুবপুরের কাছারী, কীর্তিহাটের এলাকা, সেখানকার কাছারীর সমস্ত সাহায্য এখানে আসবে। আর প্রধানদের ডেকে শ্যামনগরের লোকেদের বাড়ীঘর মেরামতের জন্য দু হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন—এ হ'ল কমলাকান্তবাবুর প্রণামী। বলতে গেলে এক রকম আগুনটা তাঁর

ফুঁয়েই জ্বলে উঠেছে! টাকা কর্মচারীর কাছে রইল। তাঁরা যাকে যা দিতে বলবেন, বলু অর্থাৎ বলরাম ঘোষ তাকে তাই দেবে। এছাড়া কাঠ তাঁরা কুতুবপুর জঙ্গল থেকে পাবেন।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—ইহাতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। অনুভব করিলাম—হ্যাঁ। আমি জমিদার।

আচার্য আর একটি কথা বলেছিলেন, কমলাকান্তকে—বাবুজী, সকলের কাছে বলুন, আপনার বাড়ীর বিগ্রহকে সাক্ষী করে বলুন—এই নিগ্রহের প্রতিকার না করে শ্যামনগরে আর ঢুকবেন না। লাট যুগলপুর আপনার এই গৃহদেবতার নামে কিনে, সেবায়েৎ হয়ে এ গ্রামে ঢুকবেন। আপনি ব্যাঘ্রশাবক, শৃগালের অত্যাচার নিবারণ করা আপনার ধর্ম। ইজ্জৎ।

একাল হলে রত্নেশ্বর রায় তা পারতেন না। কিন্তু সেকালে তিনি তা পেরেছিলেন। ডায়রীর পাতায় মোটা মোটা করে লিখেছেন কথাগুলি।

তারপর লিখেছেন—ওই কথা।

ডুলিতে চড়িয়া ঘাটে আসিলাম। শ্যামনগরের সমস্ত লোক আসিয়া আমাকে বিদায় দিল। আমি বিজয়ীর মত আসিয়া বজরায় আরোহণ করিলাম। ওই প্রতিজ্ঞা করিয়া মনের সকল গ্লানি আমার মুছিয়া গিয়াছিল। বজরায় উঠিতেছি এমন সময় পিছন হইতে ঠাকুরদাস দাদা বলিল—দাদাঠাকুর, শালা সাহেব! ঘোড়ায় চড়িয়া ওই দেখ, অনেকটা দূর হইতে দেখিতেছে। দেখিলাম—তাহার কথা সত্য, অনেকটা দূরে জন রবিনসন ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতেছে! পিঠে কাঁধের উপর বন্দুকের নলটা উঁচু হইয়া আছে। আমি গ্রাহ্য করিলাম না। বজরায় আরোহণ করিলাম। মাতাঠাকুরাণী বজরার কামরার দরজার মুখে পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই তিনি আমাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—না। আগে আমাকে নহে, আগে তাঁহাকে। আয়! সুসজ্জিত কামরার অভ্যন্তরে বিছানার উপর মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি দরজার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। বুঝিলাম, আমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আমার দৃষ্টি আনত হইল। গভীর লজ্জা এবং অনুশোচনা অনুভূত হইল! শালপ্রাংশু মহাভুজ রাজসদৃশ আকৃতি, তাঁহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ের দীপ্ত দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি অগ্রসর হইয়া পদে প্রণতঃ হইতে উদ্যত হইতেই তিনি আদেশ করিলেন—অগ্রে তোমার পৃষ্ঠের ক্ষতস্থান দেখাও! দেখি!

—না, আগে প্রণাম করুক।

—প্রণাম! তাই হোক। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী! তাই কর, তোমার মা-মায়ের আদেশই শিরোধার্য কর!

প্রণাম করে উঠে এবার অপরাধীর মত হেসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায়, প্রস্তর মনুষ্য, লোকে বলত পাথরে গড়া মানুষ। সে কি দেহে, কি মনে!

সেই মানুষের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল!

রত্নেশ্বর রায় কিন্তু সেদিনও স্পর্শ করতে পারেন নি অন্তর্নিহিত এই পাথর ফাটানো ভোগবতী উৎসটিকে।

সুরেশ্বর বললে—তিনি মানে রত্নেশ্বর রায় খুব বিস্ময় বোধ করেছিলেন, কলকাতার ঘাটে পালকিতে চড়েই বীরেশ্বর রায় ওখানকার প্রধান কর্মচারী ঘোষকে ডেকে প্রথম যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সেই কথা শুনে।

ভবানী দেবীর সামনেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সোফিয়ার ওখানে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ হুজুর!

—খোঁজ পেয়েছ?

—না, হুজুর। তিনি ওখানে নেই। চলে গিয়েছেন!

—কোথায় গিয়েছেন?

—তা ওরা জানে না বললে।

—কে বললে? সোফিয়া নিজে?

—না হুজুর, বাঈ এখন কারু সঙ্গে দেখা বড় করে না। অনেক কষ্টে ওর মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বললে। বললে—তিনি চলে গিয়েছেন, তারা কোন পতা জানে না!

ভবানী দেবী শুনছিলেন। পাশে রত্নেশ্বর রায়ও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিলেন এবং ভাবছিলেন—তিনি ভুল করেছেন এসে!

"আমি তখন ভাবিয়াছিলাম—আমি মহাভ্রম করিয়াছি; পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ ভাবিয়া কণ্টকময় শিংশপা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছি। আর ধিক্কার দিয়াছিলাম ভালো-মাকে। মনে পড়িয়াছিল পুরানের গল্প, এক সতী তদীয়া মহালম্পট কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর আদেশে তিনি ওই পাপাচারী স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন। দারুণ অন্ধকারের মধ্যে পথিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন এক ঋষির অঙ্গে উক্ত পাপাচারীর পা ঠেকিবামাত্র পাপস্পর্শে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, সূর্যোদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে, রে মহাপাপী, তোর মৃত্যু ঘটিবে। সতীশিরোমণি নাকি সদর্পে বলিয়াছিলেন—অন্ধকারে অজ্ঞানতাবশতঃ সজ্ঘটিত এই অপরাধের জন্য তুমি আমার স্বামীকে অভিশাপ প্রদান করিলে। আমি তোমাকে প্রত্যাভিশাপ দিব না। তবে ইহাও বলিব যে, যদি আমি সতী হই, তবে এই রজনীরও আর কখনও অবসান হইবে না। সূর্য উদিত হইবে না। শেষে অবশ্য দেবগণের মধ্যস্থতায় সর্পও মরে নাই, যষ্টিও ভগ্ন হয় নাই, সতী এবং ব্রাহ্মণ উভয়ের মহিমাই রক্ষিত হইয়াছিল; দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সতী তাঁহার স্বামীকে লইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষিত হইয়া রজনীশেষে সূর্য উদিত হইয়াছিল, সৃষ্টিও রক্ষা পাইয়াছিল। এ

[সং]সারের সতীত্ব-মহিমা-কীর্তন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই এদেশের সর্বনাশ করিয়াছেন! [সোফি বিবির চেহারা দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া] ... লো-মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। এবং যখন তিনি নিজে প্রশ্ন করিলেন, ...ন আমার অশ্রদ্ধা জন্মিল।

ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে—আমি চিঠি লিখে সোফি বাঈকে ...কে পাঠাব? হয় তো আমি ডেকে পাঠালে আসবে, আর বলবেও!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি চিঠি লিখবে?

—হ্যাঁ। তুমি লিখলে ভয়ে না আসতে পারে। আমি লিখলে আসবে। অন্তত: আসার ...া পাবে সে। লিখব তোমার অসুখ খুব।

একটু ভেবে বীরেশ্বর বলেছিলেন—দেখ!

বাড়ী এসে ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থার মধ্যেও এ কথাটা ওঁদের দুজনের একজনও ...লেন নি। চিকিৎসক এসেছিলেন দুজন, একজন বড় সাহেব ডাক্তার এবং একজন কবিরাজ। অসুখের উপশম বারো আনাই হয়ে গিয়েছিল; চার আনা অবশিষ্ট ছিল। ...র যন্ত্রণা ছিল না কিন্তু বাঁ হাত এবং বাঁ পা অবশ হয়ে গিয়েছিল, সেটা তেমনিই ...। ডাক্তার বলেছিলেন—প্যারালিসিস। কবিরাজও তাই বলেছিলেন।

ডাক্তারী মতেই ওষুধের ব্যবস্থা হল। পূর্ণ বিশ্রামের কথা দুজনেই বলে গেলেন। সুরা, ইত্যাদি বন্ধ! আর ব্যবস্থা হ'ল মালিশের। সে মালিশের তেল দিয়েছিলেন [কবি]রাজমশাই।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা বসে ভবানী দেবী পত্র লিখেছিলেন সোফিয়া বাঈকে। লিখেছিলেন—[".....]বাবুর খুব অসুখ। বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আমি নিজে পত্র লিখছি, তুমি আমার একবার দেখা কর।"

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—দাঁড়াও আগে খোঁজ করি।

—খোঁজ?

—হ্যাঁ। খোঁজ। জানি, সোফি এখন অন্য কার কাছে রয়েছে। এরা তো—। ...ছিলেন। হাসিতেই বাকী অংশটা বলা হয়ে গিয়েছিল। ঘোষকে ডাকতে বল। জলধর, ...কে ডাক।

[ঘো]ষ এসে মাথা চুলকে বলেছিল—বাঈ এখন কোন বড়লোক বা আমীরের বাঁধা নেই। —। অন্যরকম হয়ে গেছেন। ওই কাজ করে না। তবে গান-বাজনার বায়না হলে তাও নাচে-টাচে না। বৈঠকী গায়! সেও খুব বড় আসরে। নাহ'লে বাড়ীতে ... কি সব জপতপ করে। ওই পাগলাবাবার পর থেকে আর এক রকম হয়ে গেছে।

—হুঁ! একটু চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আমি তোমাকে এক হাজার টাকা [দিয়ে] আসতে বলেছিলাম। সেটা দেওয়া হয়েছিল? আমার এই একটা হয়েছে দেখছি—

কথাবার্তা সব ঠিক মনে পড়ছে না।

ঘোষ বলেছিল—হ্যাঁ নিয়েছিল। তবে বাঈ নিজে নয়—বাঈসাহেবার মা নিয়েছিল।

রত্নেশ্বরে ঘৃণা জন্মাচ্ছিল। শুধু বীরেশ্বর রায়ের উপরেই নয়, ভালো-মার উপরেও চিত্ত ত বিমুখ হয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, ইংরিজী শিখেছেন, সে কালের আধুনিক; রামমো রায়ের বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের হাওয়ায় নিশ্বাস নেন, তাঁর সহ্য হয় নি এই ধরনের লজ্জাই ব্যবহার। বাড়ীতে মহেশচন্দ্র রয়েছেন, মহেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্য ছিল; ত সঙ্গে মতে তাঁর মিলত, তাঁর কাছে গিয়ে বলেও তিনি খুশী হন নি। তিনি বলছিলেন—এ নি কোন ঔৎসুক্যপ্রকাশ তোমার উচিত হবে না ভাই।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আপনি ভালো-মাকে বারণ করুন।

—না। সে অধিকার আমার নাই।

রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"অতঃপর আমি এই বাড়ীতে থাকিয়াও তাঁহাদের স সম্পর্ক ত্যাগ করাই স্থির করিলাম। তাঁহারা যে দিকটায় ছিলেন সে দিকটা ত্যাগ ক একেবারে পশ্চিমের অংশটায় বাসস্থান স্থির করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও স্থির করিলাম মা মহাশয় একটু সুস্থ হইলেই সমস্ত সম্পত্তি ইত্যাদি আমার অংশমত পৃথক করিয়া লইব। ত্রি এক্ষণে একরূপ অক্ষম হইলেন, তাহাকে বলিব—তিনি তাঁহার অংশের মালিকানার পাওয়ার এ্যাটর্নী আমাকে প্রদান করুন। তাঁহার খরচপত্রাদি সমুদয় যথাবিধি আমি সরবরাহ করি এবং তাঁহার সন্তানাদি যদি অতঃপর হয় তবে তাহাদিগকে যথাসময়ে বুঝাইয়া দি এবং শর্ত করাইয়া লইব যে, উৎসব আনন্দ ব্যতিরেকে ভদ্রাসন বাটী মধ্যে কোনপ্রকার অনা করিতে কেহই পারিবেন না। প্রয়োজন হইলে এমতে একটি বাগানবাটী ক্রয় করা যা পারে।

সেইরূপ ব্যবস্থাদি করিয়া লইয়া আমি একদা জানবাজার বাটীর সেরেস্তাখানায় আ বসিলাম; বলিলাম—আগামীকল্য হইতে আমি আসিয়া কাছারীতে বসিব। আমার ব ঘর ও আসবাবাদির ব্যবস্থা করুন।

পিতা কাশী হইতে আসিবেন। তাহার পূর্বেই আমি শক্ত হইয়া বসিতে চাই। অ পিতাকে আমার আশঙ্কা আছে। তিনি বলিবেন—বীরেশ্বর বর্তমানে কদাপি তাহা হ পারে না।

তিনি পিতা। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যান যে সম্পত্তির মালিক তিনি নহেন, মালিক আ তিনি আমার বাল্যকালে আমার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিলে আমি বালককালে অনেক থাকিতে পারিতাম।

সুখছাড়াও আমার কর্তব্য আছে। ভগবান সে কর্তব্য অর্পণ করিয়াই এই রায়ব অর্ধেকের মালিক করিয়া আমাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন! রায়বংশের মর্যাদা,

বেতার তুষ্টিসাধন আমার অবশ্য কর্তব্য।"

পরদিন থেকে তাই হয়েছিল সুলতা।

কাছারীতে রত্নেশ্বরের বসবার ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল—বীরেশ্বর রায়ের ঘরে—তাঁরই আসন র বসবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। পাশে তক্তাপোশের উপর বসেছিলেন গিরীন্দ্র আচার্য। রেশ্বর রায় তাঁকে যেতে দেন নি।

গিরীন্দ্র আচার্য তাঁকে সম্ভাষণ করে বলেছিলে—এস, ভায়া এস। বাবুজীর হুকুম হয়েছে ই ঘরে এই আসনে তুমি বসবে। কাগজপত্রে সই করবে। যা বুঝতে না পারবে তা আমাকে বে। আমি বুঝিয়ে দেব তোমাকে!

প্রথমদিনই আচার্য তাঁকে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের আনন্দময়ী দেবোত্তরের অর্পণনামা এবং মেশ্বর রায়ের ট্রাস্ট দলিল পড়তে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এই দুখানা থেকেই কাঠা- টা বুঝতে পারবে। আর সম্পত্তির আয়ব্যয় বিলিব্যবস্থা সবই পাবে। পড়। কাল দেখাব, দের নিজের নগদ টাকা কারবারে হিসেবপত্র। মজুত টাকা, কত লগ্নী, তার সুদ। এবং ই থেকে হাল পর্যন্ত কত সম্পত্তি আবার কেনা হয়েছে, তার বিবরণ তৈরীই আছে, তা াব।

সম্পত্তি অনেক। তোমরা রাজাতুল্য ব্যক্তি! সরকারের কাছে একটু ধরাপাড়া করলেই াব পাবে। কতবার বলেছি তোমার মাতুলকে, তা তিনি তো এতকাল একরকম পাগলই লেন! এবার মামাকে বল তুমি। তুমি বললে না করবে না। একটা খেতাব না-হলে াচ্ছে না!

বলতে বলতেই উঠে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন আচার্য। ঘরখানা থেকে কাছারীর বারান্দা া যাচ্ছে; সেখানে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। একজনকে চিনতে পেরেছিলেন রত্নেশ্বর। পিক্রুস গোয়ান। জোসেফ পিক্রুস। ভালো-মাকে পৌছে দিতে এসেছিল শ্যামনগর।

আচার্য তাদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে, তাদের বসিয়ে, উপরতলায় চলে গিয়েছিলেন। ত বাকী ছিল না যে, তিনি বীরেশ্বর রায়ের কাছে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত তার বিদ্রোহী উঠেছিল। এ কি কথা? তাকে এই কর্তার আসনে বসিয়ে রেখে আচার্য চলে গেলেন র। তাকে কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। তা হ'লে তো এ সঙ সাজা!

তিনি হরকরাকে বলেছিলেন—ডাক্ ওই লোকটাকে।

পিক্রুস এসে তাঁকে সেলাম ক'রে হেসে বলেছিল—আরাম হয়ে গেলেন হুজুর? আচ্ছা া, মাদার মেইরীর কৃপা, মেহেরবানী!

—কি খবর তোমাদের? কি জন্যে এসেছ?

আবারও হেসে পিক্রুস বলেছিল—এত্তালা ভেজলাম বড়া হুজুরের কাছে! একটা কাম

—কি কাম ? বল !

—উ তো বড়া হুজুরকে কাম। উন্‌কে পাশ শুনবেন !

—হুঁ !

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাইরে এসে উপরে উঠে গিয়েছিলেন। একেবারে বীরেশ্বর রায়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বাইরে দাঁড়িয়েছিল চাকর জলধ আর একজন হরকরা। তিনি তাদের গ্রাহ্য না-করে দরজা টেনেছিলেন। জলধর সভ বলেছিল—হুজুর—

নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কি ?

—নায়েববাবু কি পরামর্শ করছেন, বলেছেন—

তার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় মেড়ে তিনি ডেকেছিলেন—ভালো-মা !

চড় হজম করেই জলধর বলেছিল—মা ও ঘরের মধ্যে নাই হুজুর।

—নাই ? একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে সে এবার একটু জোরেই দরজা ঠেলে ওই ভালো-মাকে ডেকেছিলেন। ভালো-মা !

ভিতর থেকে আচার্য বলেছিলেন—আসছি। কয়েক মুহূর্ত পরেই আচার্য দরজা খুলে দি তাকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—এক্ষুনি তোমাকে ডাকবার কথা হচ্ছিল !

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর, তাঁর আর রাগ বা অভিযোগ করবার কারণ ঘটে নি।

বীরেশ্বর রায় তাকে বলেছিলেন—বস ! পাখাখানা নিয়ে মাথায় হাওয়া কর।

রত্নেশ্বর তাই করেছিলেন।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—যে কথা হচ্ছে তা তোমার মা—মানে ভালো-মাও জানবেন ন জানব আমরা তিনজন—আমি তুমি আর দেওয়ান খুড়োমশাই।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। একটু ভয়ও হয়েছিল।

—শোন ! জন রবিনসনকে আমি শাস্তি দিতে চাই ! দেওয়ানী মামলা তার না দায়ের হয়েছে, কিন্তু তাতে এর শোধ হবে না ! আমি ওকে—।

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কি করতে চান বুঝতে তাঁর বাকী থাকে নি। মুহূর্তে এ দুরন্ত ভয় যেন তাঁকে চেপে ধরেছিল।

বীরেশ্বর রায় তা বুঝেছিলেন। বলেছিলেন—ভয় পেয়ো না। জমিদারিধর্ম বড় কঠি এটা একরকম রাজধর্ম। দুষ্টকে শত্রুকে দমন করতেই হবে। না-পারলে জমিদারী চলবে দেওয়ানী মামলা করেছি, ওর কাছে আমরা আজও হাজার বিশেক টাকা পাব। কিন্তু ত অনেক দেরী লাগবে। একটা দাঙ্গা বা—। দাঙ্গার চেয়ে গোপনে ওকে—। পেয়েছি।

রত্নেশ্বরের শরীর হিম হয়ে আসছিল ! গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

এবার আচার্য বলেছিলেন—আমি বলছি, তাতে অনেক হাঙ্গামা হবে। কোনরকমে প্রকাশ পেলে গভর্নমেণ্ট হুজ্জোতের বাকী রাখবে না। এই সবে মিউটিনী গেল। তেতে আছে। আমি বলি—বেটার তো নানান বাতিক আছে। মেয়েমানুষ, শীকার, টোপ ফেলে কাবেজে নিয়ে এসে বেটাকে এমন করে দিক যাতে কাজের বাইরে যায়! সব থেকে ভাল হত, বিশুবাবুর দলের মত দল থাকলে। কুবী মেরে দিয়ে জখম করে দিয়ে চলে যেত। এরা তা পারবে না। দলটল এদের ঠাকুরসাহেব ভেঙে দিয়েছেন।

এই সময় ঘরে ঢুকেছিলেন ভবানী দেবী। তিনি এতক্ষণ পূজায় ছিলেন পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—আমি পূজোয় বসে সব শুনছিলাম। কিন্তু দুদিনও কি তর সইছে না তোমার? ভাল হয়েই ওঠো!

—না। তুমি জান না—

—জানি!

—রত্নেশ্বর যদি জীবন্ত পুড়ে মরত—

—তা যখন হয় নি, তখন যদি হ'ত বলে রোগ বাড়িয়ে ফল কি?

—না। সে আমি ভুলতে পারছি না।

—ওসবের ভার খুড়োমশায়ের হাতে দাও, রত্নেশ্বরকে নিয়ে উনি যা-হয় করবেন। এসবে আমি দুঃখ পাই। সহ্য করতে পারিনে। তবু জেদ যখন তোমার যাবে না, তখন সর্বনাশা পাপ না করে খুড়োমশাই যা বলেন তাই কর! বিপদ ডেকে আনা হবে। পাপ হবে।

—টাকা বিপদ কাটিয়ে দেবে। আর পাপ? না—তাও হয় না। রাজ্য করতে গেলে বিদ্রোহী দমন করতে হয়। শত্রুকে ধ্বংস করতে হয়। রাজধর্ম জমিদারিধর্মে তাতে পাপ লাগায় না। আইন বাঁচাতে পারলেই হ'ল।

কথাটা কতক্ষণ চলত' তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সমস্তকিছুর মোড় ফিরে গেল পালকির বেহারাদের হাঁকে।

ভবানী দেবী বললেন—থাক এখন ওসব কথা। পালকি এল। সোফিয়া বোধ হয় এল! জলধর, দেখ তো বাবা কে এল পালকিতে?

জলধর বারান্দায় ঝুঁকে বললে—বাঈ সাহেবা।

ভবানী দেবী বললেন—তুই নিচে যা রত্ন।

আচার্য সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। রত্নেশ্বরকে বললেন—এস বাবুজী ভায়া। এস—। আমরাই হয় করব।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। রত্নেশ্বর বেরিয়ে এসে বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলে—ভালো-মা!

ভবানী দেবী সাড়া দিয়েছিলেন—কি?

—আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমাকে একলা বলতে চাই।

বীরেশ্বর রায় বললেন—ভিতরে এস। বাইরে একলা বলা হয় না। যাও পুজোর ঘরে যাও!

পুজোর ঘরে গিয়ে ইচ্ছে করে বীরেশ্বর রায়কে শুনিয়েই একটু উচ্চকণ্ঠে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—এ আমার আর সহ্য হচ্ছে না ভালো-মা!

—কি?

—এই সোফি বাঈকে ডেকে আনছ—

—তুই অন্তত এ কথাটার মধ্যে থাকিস নে। তুই নিচে যা।

—তুমি একে পাপ মনে করছ না? আশ্চর্য!

এঘর থেকে বীরেশ্বর থেকেছিলেন—সতীবউ!

ভবানী ব্যগ্রভাবে বলেছিলেন—ওরে, আমি তোকে মিনতি করছি। রত্ন। তোকে মিনতি করছি!

—সতীবউ।

—যাই।

—যাই নয় শোন; রত্নেশ্বর, তুমিও শোন। নইলে আমাকেই কোনরকমে বিছানা ছেড়ে উঠবে হবে।

ভবানী এ ঘরে এসে বলেছিলেন—ও যাচ্ছে। এখুনি যাচ্ছে। রত্ন।

বীরেশ্বর বললেন—না। তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে, আর শ্বশুরমশাই যেখানা লিখেছিলেন, চিঠি দুখানা ওকে পড়তে দাও।

—পড়তে দেব?

—হ্যাঁ পড়তে দেবে। দাও। দাও।

ভবানী দেবী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে চিঠি দুখানা বের ক'রে রত্নেশ্বরের হাতে দিলেন।

বীরেশ্বর বললেন—চিঠি দুখানা তুমি নির্জন ঘরে পড়ে শেষ করে আমাদের কাছে এসো যাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে। তোমার জানার সময় হয়েছে। যাও। এখন সোফি এসেছে, তার সঙ্গে আমাদের কথা আছে কিছু, সেরে নিই!

রত্নেশ্বর পাশের ঘরে গিয়েই পড়তে বসলেন চিঠি দুখানা।

সোফিয়া এল। কিন্তু সে সোফিয়া নয়। এ যেন আলাদা মানুষ। পেশোয়াজ পায়জামা নয়—ঘাঘরা কাঁচলী ওড়না নয়, নাকে হীরার নাকচাবী নাই—কপালে টিকলী নাই। কানে দুল মাকড়ী নাই, গলায় চিক নাই। হার নাই। হাতে বাজুবন্ধ, কঙ্কন নাই, সাদা-মাটা হিন্দুস্তানী ঢঙে লালপাড় শাড়ী পরে এসেছে, গায়ে মুসলমানী কাঁচুলী আছে; চুলে

বণী নাই, চুল এলানো এবং বেশ ভালো করে আঁচড়ানোও নয়। চোখে সুরমা আছে, মুখে ান জর্দাও আছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে সোফিয়ার তা এক নজরেই বোঝা যায়।

ঘরে ঢুকেই সে শয্যায় আধশোয়া অবস্থায় বীরেশ্বর রায়কে দেখে কয়েক মুহূর্ত যেন স্তিতের মত দাঁড়িয়েছিল। সে বিশ্বাস করতে পারেনি নিজের চোখকে। তসলিম জানাতেও লে গিয়েছিল।

ভবানী দেবী তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন—এস।

সোফিয়া বলেছিল—রুস্তমের মত বাবুজীর এমন হাল হয়ে গেছে!

ঘরখানা ছিল নিস্তব্ধ। সোফিয়া মৃদুস্বরে বললেও—বীরেশ্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি কটু হেসে বলেছিলেন—দুনিয়া ভর একটিই হাল সোফি। সব কুছ বদল যাতা হ্যায়।—সোফি বি ভি বদল গয়ি-হ্যায়।

এতক্ষণে সে তসলিম জানিয়ে বলেছিল—হাঁ হুজুর—ই বাত ঠিক হ্যায়। ত।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—এঁকে চিনতে পারছ? াবার

—হাঁ হুজুর। হুজুরাইনকে আমি দেখবামাত্র পহছান লিয়া! ওঁর পরওয়ানা পেয়েই আ সছি। পরওয়ানা না-পেলেও দেখলেই আমি চিনতে পারতাম। উ তসবীর—? ওই তো।

সে ভবানী দেবীকে বারবার তসলিম জানিয়েছিল।

ভবানী দেবী একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বস।

—আপ খড়ি হ্যায়। আগে আপনার তশরিফ রাখতে হুকুম হোক।

—আমাকে বসতে হবে?

—জরুর। না-হ'লে আমি বসতে পারি? আমি তওয়ায়েফ—নবাব বাদশা আমীর কের পরসতার থাকত—আমি তাও নই। আপনি হুজুরাইন। আগে আপনি বসুন।

রত্নেশ্বর রায় তখন পাশের পুজোর ঘরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পত্র দুখানা পড়ে যাচ্ছেন। ভবানী ী লিখেছেন—মৃতবৎসা রোগাক্রান্তা বিমলা নিজের মৃত্যুরোগাতুর ছেলেটিকে কোলে তুলে য়, নিস্তব্ধ ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে নিজের ঘরের দরজা খুলে, বেরিয়ে এসে ভবানী দেবীর ঘরে ছেন। ঘরে তখন বীরেশ্বর রায় বোনের সাড়া পেয়ে কোণে আলমারির আড়ালে য়েছেন। ভবানী দেবী ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন। বিমলা নিজের ছেলেকে শুইয়ে শ রত্নেশ্বরকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

রত্নেশ্বর কমলাকান্ত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে কমলাকান্ত বড় হয়ে দেখতে হ'ল বিমলাকান্তের মত। মাথা তাঁর ঝিম্‌ঝিম্ ছে।

হ্যাঁ, মুখের চিবুকের গড়ন, কপালের গড়ন, লম্বা ঢঙ—এ বিমলাকান্তের মতই বটে। শুধু কের ডগা এবং চোখের দৃষ্টি তাঁর বীরেশ্বর রায়ের মত। সারা দেহের কাঠামো তাঁর রায়

বংশের মোটামোটা হাড় এবং শক্ত গাঁথুনিতে গাঁথা। রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন সুলতা—"আমার মনে হইতে লাগিল—যেন সমস্ত ভূমণ্ডল থর-থর করিয়া কম্পিত হইতেছে আকাশমণ্ডল হইতে নক্ষত্রসমূহ কক্ষচ্যুত হইয়া দিগ-দিগন্তরে ছুটাছুটি করিয়া কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। আমি দিবা না রাত্রি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সম্যক উপলব্ধি হইতেছে না। কখনও ক্রোধ হইতেছে এতকাল যাঁহাকে মাতা বলিয়া জানিতাম সে বিমলা দেবীর উপর। আমার মাতৃবক্ষ হইতে তিনি আমাকে কাড়িয়া লইয়াছেন। কখন ক্রোধ হইতেছে আমার প্রকৃত পিতামাতার উপর। আমাকে তাঁহারা কাড়িয়া লইতে দিলেন চক্ষে দেখিয়াও নীরব রহিলেন!

"এতদিনে বুঝিতে পারিতেছি, আমাকে—এতদিন আমার পিতা বলিয়া যাঁহাকে জানিতাম তিনি—কেন বিমলা দেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে দিতেন না। আমাকে বলিতেন ই শাহার ইচ্ছাক্রমেই হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন—আমার শ্রাদ্ধ তুমি রিবে। কমলাকান্তকে করিতে দিবে না। তাহাতে তাহার অমঙ্গল হইবে। আমার উপনয়নের সময় নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির নাম তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন।

"কারণ এতদিনে বুঝিলাম। এতদিনে সব বুঝিলাম।"

সে তিনি পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা লিখেছেন।

সুরেশ্বর বললে—হবারই কথা। এ তো সাধারণ ঘটনা নয়। এ তো একটা এত ব গাছ—তাকে শেকড়সুদ্ধ তুলে নদীর এক তীর থেকে আর এক তীরে এনে নতুন ক লাগানোর মত ব্যাপার। গাছ হলে বাঁচত না। মানুষ বলেই সম্ভবপর হয়েছে।

সুলতা বললে—রাগ করো না, একটা কথা বলব। আমি সোস্যালিস্ট বলে বলছি না বলছি একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে। ব্যাপারটা যদি একটু ইতর-বিশেষ হ'ত—ধর— তাঁর আসল বাপ-মা রায়বাড়ীর আশ্রিত দরিদ্র দম্পতি হতেন—এবং তারপর এতটা বয়সে এই সত্য জানিয়ে তাঁর বাপ-মা তাঁকে নিজের ছেলে বলে দাবী করতেন—তা হ'লে এটা ত সহ্য হত কিনা সন্দেহ।

সুরেশ্বর বললে—রাগ সত্যি করব না সুলতা। খুব খাঁটি কথা বলেছ। সংসারে বিম কান্তের মত মানুষ দু-চার জনের বেশী হয় না—যাঁরা সব স্বার্থ অনায়াসে ত্যাগ করে দুঃখ মাথায় তুলে নিতে পারেন। রত্নেশ্বর রায় তা ছিলেন না। বিমলাকান্তের শিক্ষা তি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর রক্ত তাঁর মধ্যে ছিল না। সামলে নিতে তাঁকে বেশীক্ষণ লাগে নি তিনি এরই মধ্যে এঘরে সোফিয়া বাঈয়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের যে কথা হচ্ছিল তা শুনে ক্ষে রেগেছিলেন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এ সত্য আমি অস্বীকার করব না। চরিত্রেও তিনি খুব শক্ত মানুষ ছিলেন—অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে হয়েছে, তন্ত্র সাধনা

সত্য হয় তা হলে শ্যামাকান্ত যা পারেন নি, তা তিনি পারতেন। প্রখর বুদ্ধিজীবী। তন্ত্র সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা বলব পরে। বলব কেন, ডায়রী থেকে পড়ে শোনাব।

সোফি বাঈ পাগলাবাবার কোন খবর দিতে পারে নি।—তিনি অকস্মাৎ একদিন বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি।

সোফি বলেছিল—বাবুজী হুজুর, আপনি যেদিন বাবাসাহেবকে জখম করে দিয়ে চলে এলেন, উসকে বাদ—পুরা ছ মাহিনা—উনি মুর্দার মত পড়ে থাকতেন। না খানা, না পিনা, একদম মুংগা—বোবার মত। কভি কভি—আঁ-আঁ—এমনি করে পুকারতেন।

কারুকে দেখে শান্ত হতেন না। সোফি এলে তবে শান্ত হতেন। ওদিকে বাজারময় খবরটা রটেছিল—হিন্দু সিদ্ধযোগীকে মুসলমান করে নিচ্ছে মুসলমান বাঈ। একদিকে মোল্লারা লেগেছিল উঠেপড়ে। তার সঙ্গে সোফি বাঈয়ের মায়েরও উৎসাহের সীমা ছিল না। অন্যদিকে হিন্দুরা ক্ষেপে উঠেছিল।

—বাবুজী, এই সময়ে মিউটিনির হাঙ্গামা না হলে হয়তো একটা 'খারাপ' কিছু ঘটে যেত। আমরা, বাবুজী, বহুবাজার থেকে চলে গিয়েছিলাম; বড়া মসজেদের কাছাকাছি। পাগলাবাবার তবিয়ৎ এমন বেহাল হয়ে গেল যে, আমরা ভাবলাম—মরে যাবে। আমার মা চাইলে—উনকে বাহার রাস্তার পর ছেড়ে দিত। কিন্তু আমি দিই নি। এক রোজ রাতে বাবুজী, সকলে ভাবলাম আজ রাতে ফকীর জরুর ম'রে যাবে। মাকে উ রোজ কিছুতেই রুখতে পারলাম না—ঘরসে বাহার বারেন্দেমে নিকাল দিলে।—আমিও বাবুজী ওই বারান্দায় এসে তার শিরে বসে রইলাম। থোড়া পানি যদি মরবার সময় খেতে চেয়ে না পায় তবে তার চেয়ে গুনা আর হয় না। জাড়ার রাত বাবুজী। তার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে, নিজে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সাধুর ঠোঁট নড়ছিল হরদম, যেন কিছু বলছিল। কিন্তু আওয়াজ ছিল না। আমার কাছে কিছু কস্তুরী ছিল—আর কিছু দাওয়াই ছিল—মকরধ্বজ আমি থোড়া থোড়া মুখে দিয়েছিলাম।

এমনি সমস্ত রাত বাবুজী। শেষ রাতে আমার থোড়া নিদ এসেছিল। ওদিকে বড়া মসজেদে আজান উঠল। আর তার পরই সাধুজী যেন পুকারে উঠল—মা!—ধরা গলায় খুব ভাঙা আওয়াজে বললে—মা!

আমি চমকে উঠে ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম—বাবাসাহেব!

বাবাসাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল বাবুজী। সে কি কান্না কি বলব! সে যেন দরিয়াতে তুফান উঠে গেল!

সেই দিন থেকে সাধুজীর ওই হাল কাটল—আবার একটু একটু ক'রে ভাল হয়ে উঠল। আমি হকিম ডেকে দেখালাম। হকিম তাজ্জব বনে গেল। বললে—এ বেঁচে উঠল কি ক'রে?

তাজ্জব কি বাত!

বেঁচে সাধুজী উঠল বাবুজী. লেকিন, দুসরা আদমী হয়ে গেল। বহুৎ চুপ-চাপ। যেন পাগল আর নয়।

আমাকে বললেন—বেটী, আমার যা কুছ সঙ্গীতকে মূলধন আছে—তোকে দিয়ে দি, নিয়ে লে। তবে এক বাত আমাকে দে। এই বাত দে কি কসবীগিরি আর করবি না। এই গানা গেয়ে খাবি। আর রোজ সুবাতে উঠে ভজন করবি।

বাবুজী, গলার আওয়াজ উনকে খারাব হয়ে গিয়ে ছিল। ভাঙা তানপুরার মত। তব্‌ আমাকে ভাঙা গলায় গান উনি শেখালেন।

ওদিকে বাবুজী, আমার মা মোল্লাদের নিয়ে মতলব করলে কি উনকে কলমা পড়াবে। আমাদের বদনামী হচ্ছিল—কি আমরা সাধুজীর সঙ্গে থেকে হিন্দু বনে গিয়েছি।

বাবাসাহেব সমঝালেন। একরোজ আমাকে বললেন—আমি চল যায়েগা বেটী। ধরম সব কুছ এক হ্যায়। লেকিন যো সাধন আমার উ তো আবি তক পুরা হুয়া নেহি। আব হামকো যানে হোগা। তু হামাকে নিকাল দে হিঁয়াসে। হম চলা যাই।

একটু চুপ করে সোফিয়া বলেছিল—লেকিন বাবুজী, উনকে বচানে নেহি সেকা হম। বাঁচাতে পারি নি বাবুজী—আমার আম্মাজান আর মোল্লারা মিলে তাঁকে জোর করে কলমা পড়িয়েছিল।

আমি তার পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম—কিন্তু তিনি বলেছিলেন—কেঁদো না সোফি। আমার জাত নেই। ধুবড়ীর কাছে আমি মুসলমানবাড়ীতে ছিলাম—তারা খুব ভক্তি করত। তাদের ঘরেই খেয়েছি। থেকেছি। জাত আমার নেই। জাত কারুর যায় না। তবে এ আমার নসীব। জলদি জলদি তু আমার যা দেবার তু নিয়ে নে। আমি চলে যাব।

দু মাহিনা পরে বাবাসাহেব চলে গেলেন। কোথায় গেলেন বলে যান নি।

পাশের ঘরে ব'সে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। তাঁর ঘৃণার আর অন্ত ছিল না। শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে যেখানে কথা উল্লেখ করেছেন—সেখানেই তাঁর ঘৃণা ক্রোধ যেন উপচে পড়েছে।

তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, সুলতা—"আমার ইচ্ছা হয় আমার দেহ চিরিয়া শ্যামাকান্তের যে রক্ত আমার মধ্যে আছে—তাহা নির্গত করিয়া দিই। কিন্তু তাহা মানুষের পক্ষে তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ পাপ-রক্তের প্রভাব হইতে আমারই পরিত্রাণ কোথায়? কি করিয়া জগতে আত্মরক্ষা করিব তাহার কূল-কিনারা দেখিতেছি না।"

সোফিয়া আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্য উঠেছিল। যাবার আগে কয়েকটি কথা হয়েছিল—সেই কথা ক'টি শুনে রত্নেশ্বর বেশী বিচলিত হয়েছিলেন।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—ডেকে পাঠালে আবার আসবে তো ?

তসলিম জানিয়ে সোফি বলেছিল—আমি হুজুরের বাঁদী। যখন ডাকবেন আসব।

—তাঁর খবর পেলে জানাবে ?

—খবর ? জরুর জানাব। তবে—গোস্তাকি মাফ হলে বলি—

—বল।

—খবর আপনার কাছে আসবে।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভবানী দেবী।

—আপনার জন্যে বাবাসাহেব কাঁদতেন।

—আমার জন্যে ?

—হ্যাঁ। বোধ হয় তিনি আপনাকেই খুঁজছেন।

এতক্ষণে বীরেশ্বর বললেন—তোমাকে তিনি কি বলেছিলেন, বল।

—বলেছিলেন—হু জু রা ই ন—তাঁর বেটী! পহলে দিন—উনার তসবীর দেখে—ওহি য়ে তিনি এমন চীৎকার করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন···হুজুরাইনের মায়ের সবীর। কিন্তু হুজুরাইনের ছ'টা আঙুল—তাঁর ছ'টা আঙুল ছিল না। আর বলতেন—ওঁর ঙ্গে দেখা না হলে তাঁর গুনার শেষ হবে না। বলতেন—হুজুর তিনি ঝুটা বাত কখনও তেন না। বলতেন—সোফি তুমি আমাকে বল বাবাসাহেব আমি তোমাকে বলি বেটী! কভি কভি দিলের মধ্যে তুফান উঠে যায়। আমার অন্দরে এক শয়তান আছে—সে বলে কেন ? দুনিয়াতে ও হল ঔরৎ আর তুমি হলে মর্দানা। কেঁও বাপ বেটী কেঁও। তার টুঁটি পে ধরি। বলি—মর যা—তু মর যা! কিন্তু সে মরে না। ডরকে মারে লুকিয়ে যায়। আবার বস্তা পেলেই বেরিয়ে আসে। ইস সে রেহাই আমার সেই বেটী দিতে পারে। রায়বাবু ছে—সে মরে নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—বলতে পার ও কোথায় আছে ? সে বেঁচে ছে। আমাকে তাকে খুঁজতে হবে। তার দেখা পেলেই আমার আন্দরের শয়তান মরবে! াকে বেটীর মত পিয়ার করতেন। আমার আম্মা এর জন্যে নারাজ ছিলেন। আমাকে একলা লে বলতেন এসব কথা। এসব বাত তোকে বেটী বলে বলছি সোফি। আর কাকে বলব ? যদি পারিস তো রায়বাবুকে বলিস। দোসরা কাউকে বলিসনে। বলিস—আমি তার ছে মাফ চাচ্ছি। তবে আমার বেটী—সে সাক্সাত দেবী।

কথাগুলি শুনে চমকে উঠেছিলেন—রত্নেশ্বর। সন্দেহ তাঁর গোড়া থেকেই হচ্ছিল যে, যে ক পাগলাবাবার কথা হচ্ছে, এর সঙ্গে শ্যামাকান্তের সংস্রব আছে। সোফিয়া যখন প্রথম তখন সে সন্দেহ করেছিল বীরেশ্বর রায়ের লালসাকে। তারপর চিঠি দুখানা পড়ে তাঁর পরিচিত চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে গেল, তিনি ভাবছিলেন এই বিচিত্র কথা আর ছিলেন সোফিয়া বাঈয়ের কথা। প্রায় নিঃসন্দেহই হয়েছিলেন যে, সোফিয়া বিবি যে

পাগলাবাবার কথা বলছে, সে-ই হয় তো শ্যামাকান্ত। এবং বীরেশ্বর রায় ও ভবানী দেবী এই প্রয়োজনেই সোফিয়াকে ডেকেছেন। শেষ কথা কটিতে তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। এই হতভাগ্য ধর্মত্যাগী নারীলোলুপ তান্ত্রিকই শ্যামাকান্ত। তার মাতামহ।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়েছিলেন তিনি। অনেক ভেবেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে ভবানী দেবীকে ডেকে বলেছিলেন—ভালো-মা। মা!

ভবানী তখন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সোফিয়াকে বিদায় দিচ্ছেন। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—রত্ন?

— ওঁকে একটু দাঁড়াতে বল মা।

—দাঁড়াতে বলব?

—হ্যা। বলেই নিজে এগিয়ে গিয়ে সোফিয়াকে সেলাম করে বলেছিলেন—মাতাজী, মেহেরবাণী ক'রে যদি একটু অপেক্ষা করেন। একটু!

সোফিয়া তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সেই বিয়ের আসরের বীরেশ্বর রায় হুজুরকে।

—আমার কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সোফিয়া এবার বলেছিল--সাহেবজাদা, তুমি মাতাজী বলে আমাকে সালাম জানালে বেটা, তোমার উপর আল্লাহতলার মেহেরবানী বর্ষাক। বল বেটা কি বলছ?

—একটু বসতে হবে।

ফিরে এসে বসেছিল সোফিয়া। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আমার বাবুজীর এই বেমার। ছাড়া আমার বাবুজীকে তো আপনি যানেন—আমীর মানুষ। গানা বাজানা ওঁর দিলে পিয়ারা চীজ। আপনি ওঁকে দিনের পর দিন গান শুনিয়েছেন। খুশী রেখেছেন। এখন উনি একলা পড়ে থাকেন। ওঁর মেজাজ দিল ঠিক থাকে না। তা আপনার কাছে আমার আর্জি আপনি যদি—যেমন ওঁকে গান শোনাতেন দিল খুস রাখতেন—তেমনি ভাবে দিন আসেন—থোড়া কুছ গান শোনান—তা হলে বড় ভাল হয়। আমি মাতাজীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। আর আপনি আমার মাতাজীর সমান—আপনি আজ বেকার হয়ে কে কবে মজলিসে গানা বাজানার জন্যে ডাকবে তার জন্যে তাকিয়ে থাকবেন—এতে আমাদের ইজ্জতও যায়। যা তনখা আপনার মিলত—তাই মিলবে! পালকি যাবে। নিয়ে আসবে আপনাকে। আমি আপনার জন্যে মোকাম ঠিক করে দেব। সেই মোকামে থাকবেন। দারোয়ান ভি থাকবে। কাউকে দিক্‌ করতে দেবে না!

তাঁর কথা শুনে সোফিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল তাঁর মুখের দিকে। ভবানী দেবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বলতেও কিছু পারেন নি সোফিয়ার সামনে। নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সোফিয়ার কথা কাশী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল। সে

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর যে সব কথা বলত, তা মনে করে আজকের এই কথার অর্থবোধ তাঁর হয় নি। আজই সোফিয়া এই ঘরে আসবার ঠিক আগেই সে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছে—"ভালো-মা, এইসব অনাচার, এ আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি একে পাপ মনে করছ না?" সেই রত্নেশ্বর এ-কি বলছে?

বীরেশ্বর রায় শুনেই যাচ্ছিলেন, একটি কথাও বলেন নি।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতৃদেব নীরবে সমস্ত শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান। তিনি আমার মনের কথা যথার্থ অনুমান করিলেন এবং কহিলেন—তুমি উত্তম কহিয়াছ। সোফির নিকট আমি ঋণী রহিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহার গান আমাকে পাগল হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছে। আজ প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলে অন্যায় হইবে। এবং জীবনে গীত-বাদ্যের আনন্দের প্রয়োজন আছে। আজ সোফিকে দশজনের মজলিসে গান করিয়া বাঁচিতে হইলে তাহাও এ বাটীর পক্ষে অপমানজনক। সোফি, তুমি বাবুজীর কথা রাখিলে আমি খুবই খুশী হইব। কোন অনুশোচনা থাকিবে না। তোমারও জীবনে সাধু সংস্পর্শে পরিবর্তন হইয়াছে। নিত্য বা মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভজন শুনাইবে—উচ্চাঙ্গের গীত শুনাইবে। ইহা আমারই বাসনা।"

ভবানী দেবীকে বোধ করি কোন ইঙ্গিতও করে থাকবেন। তিনিও বলেছিলেন—আমিও খুব খুশী হব সোফিয়া।

সোফিয়া একটু অভিভূত হয়েছিল। সত্যই, শুধু গানবাজনার উপর নির্ভর করার জন্য তার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। চোখে জল এসেছিল তার, সে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে বলেছিল—হুজুরাইন যখন বলেছেন তখন তাই হবে। হুজুরাইন বলেছেন—বাবাসাহেব ছোটা হুজুর বলেছেন—আমি কি তা অমান্য করতে পারি? যেমন বলবেন, তেমনিই হবে।

ভবানী দেবী অন্যরকম বুঝেছিলেন। তিনি সোজা অর্থেই ধরেছিলেন—বীরেশ্বর রায় যা বলেছেন তাই। আজ সোফিয়াকে অর্থের জন্য কষ্ট পেতে হচ্ছে, সুতরাং রায়বাড়ী থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা করলে রত্নেশ্বর। বাপের জমিদারী আমীরী ইজ্জত বজায় রাখলে। কিন্তু তার ভুল ভাঙল। সোফিয়া চলে যেতেই বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিলেন—তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমি খুব খুশী হ'লাম রত্নেশ্বর। ভালোই করেছ। কথাটা আমার মনেও ছিল। কিন্তু তোমার মাকে না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কথাটা বলি নি।

রত্নেশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—কথাটা প্রকাশ পেলে রায় বংশের কলঙ্কের আর বাকী থাকবে না।

এবার চমকে উঠেছিলেন ভবানী দেবী। বুঝতে পেরেছিলেন ছেলের মন। তিনি বলেছিলেন—আবার চাপা দিবি রত্নেশ্বর? একবার চাপা দিয়ে—

বাধা দিয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ মা, চাপা দিতে হবে। এমন কি এরপর রায় বংশেরও আর কেউ যেন জানতে না পারে—তার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি তো আজ বারো বছর চাপা দিয়ে এসেছ মা। তুমি তো ওঁকে জানাতে পারো নি। সাধারণ ঘর হ'লে হ'তো মা। রায়-বাড়ী তো তা নয়! কথাটা প্রকাশ পেলে ওই গোপাল সিংয়ের মত লোক দেশময় মুখে মুখে বে-ইজ্জত ক'রে বেড়াবে। মহাভারতের যুগ এটা নয়। তাই বা বলছি কেন? কর্ণের কথাটা ভেবে দেখো।—সারাটা জীবন সূতপুত্র পরিচয়েই থেকে গেলেন—কোন দিন মাকে মা বলতে পেলেন না। মা কুন্তী—তিনিও ছেলেকে ছেলে বলতে পারেন নি। কর্ণের মৃত্যুর পর ছেলেদের বলেছিলেন—কর্ণের তর্পণ করো, উনি তোমাদের বড় ভাই। আজ তাও চলবে না চাপা দিতেই হবে। উনি মুসলমান হয়েছিলেন—এ প্রকাশ পেলে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না।

এছাড়া এর নজীর রায় বংশে তখন সোমেশ্বর রায় স্থাপিত করে গেছেন। যে লোকটা জলমগ্ন পাগলাবাবার সন্ধান করতে গিয়ে ফেরে নি—সে বাঘের পেটে যায় নি—তাকে সরিয়ে ফেলেছিলেন সোমেশ্বর। কারণ, লোকটা কেঁদেছিল।

* * *

যাক পাগলাবাবার কথা বলি।

এর ছ মাস পরে একখানা চিঠি এসেছিল নবদ্বীপ থেকে। শ্যামাকান্ত রায়ের শেষ পত্র। নবদ্বীপের 'পোড়া মা' তলায় শ্যামাকান্ত আশ্রয় নিয়েছিলেন। সোফিয়ার বাড়ী থেকে চলে গিয়ে ওই পোড়া মা তলায় পথের ধারে একটা গাছতলায় বাসা বেঁধে জীবনের শেষ ক'দিনে তিনি কি সাধনা করেছিলেন, তা তিনি বলতে পারেন। সাধনার ক্রিয়াকর্ম কেউ কিছু দেখে নি। তবে ওই আধপাগলের মত মানুষটি বসে থাকতেন। কেউ দিলে খেতেন, না দিলে খেতেন না। মাত্র ভোরে একবার তাকে গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেতো। ঘাট থেকে স্নান করে ফিরতেন। গঙ্গার ঘাটে যাওয়া কেউ বড় একটা দেখে নি।

যে লোক চিঠি নিয়ে এসেছিল—সে সাধারণ সামান্য লোক। চিঠি দিয়ে বলেছিল—আজ্ঞে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। না গেলে হয়তো দেখা হবে না।

সুরেশ্বর বললে—চিঠিখানার কথা বলেছি তোমাকে, সুলতা। সাধারণ সুস্থ মানুষের লেখা বলেই মনে হয়।

তিনি তখন সুস্থও হয়েছিলেন। চিঠিখানা পড়ে মনে হয় তিনি যেন ভবানী দেবীর ফেরার কথাও জানতেন।

তখন বিমলাকান্ত কলকাতায় এসেছেন। কাশীর চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছেন। সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি; তবে টাকা তিনি কয়েক হাজার নিয়েছেন। টাকাটা বিমলা দেবীর নামে বিষয়ে খাটছিল। কলকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করেছেন

তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে যান নি।

গিয়েছিলেন ওঁরা পাঁচজন। বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, বিমলাকান্ত, মহেশচন্দ্র আর সোফিয়া। রত্নেশ্বর রায় যান নি। যাবার তাঁর উপায় ছিল না। তিনি তখন মামলার আসামী। ...াধানগরে দে-সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি পড়েছিল। ডাকাতেরা টাকা-কড়ি বিশেষ নিতে ...ারে নি, তবে দে-সরকারকে নির্মমভাবে মারধর করে ডান হাতখানা ভেঙে দিয়েছে, আর ...াড়ীতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। কুঠীয়াল জন রবিনসন তখন নেই। সে ...ন হয়েছে—তার নিজের লোকের হাতে।—একজন ফিরিঙ্গী এসে তার কাছে চাকরি ...য়েছিল। দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত লোক, রবিনসন সাহেবের নামডাক শুনে এসেছিল। ইংরেজ ফিরিঙ্গী ...। পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গী।

তখন শ্যামনগরের প্রজাদের জোট জমাট বেঁধেছে। তারা ধর্মঘট পেতে দে-সরকারদের ...জনা বন্ধ করেছে। রবিনসন সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করছে। ...কেবারে সোজা আইন-আদালতের পথ। তার জন্য তদ্বির-তদারক মামলা পরিচালনা করছে ...তিহাটের এস্টেটের কর্মচারীরা। বিমলাকান্তের বাড়ীতে বিমলাকান্তের নামের আড়ালে ...দের সেরেস্তা বসেছে। পাইক-লাঠিয়াল আছে। বিচক্ষণ মামলাবাজ গোমস্তা আছে। ...দিকে হুগলীতে একটা বাড়ী কিনে সেখানে আর একদফা সেরেস্তা। সেখানে একজন নীল-...র পুরনো কর্মচারীকে মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল করা হয়েছে। হুগলীর সব থেকে ... উকিলকে নিযুক্ত করা আছে। সাব-ডিভিশন আরামবাগে আর একদফা সেরেস্তা।

এসব হয়েছে দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের পাতা ছক অনুযায়ী। তবে খেলে যাচ্ছেন রত্নেশ্বর ...।

পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আচার্য বলেন—মার খেয়ে যাও ভাই। কিস্তী দিক, তুমি ঢেকে ...য় চল। সময় হলে উঠকিস্তী, পরকিস্তী একসঙ্গে হবে।

দে-সরকারদের বাকি খাজনার মামলা চলছে; মামলার সমন আসছে কিন্তু জারী হচ্ছে ... প্রজাকে পায় না। বাড়ীতে লটকে জারী করবে তার সাক্ষী মেলে না। তারপর সমন ... হলে নানান বিচিত্র আপত্তি পড়ছে। সিধে সরল বাকি খাজনার মামলা—চলছে তো ...ছই। অবশেষে ডিগ্রী হচ্ছে। ওদিকে মুন্সেফকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সদরে আপীল ...। সমস্ত যুগলপুর লাটে শ-পাঁচেক জমা।

সুরেশ্বর বললে—জমা বুঝতে পারছ সুলতা?

হেসে সুলতা বললে—টেনেন্সী বলছ তো! তা জানি।

—হ্যাঁ টেনেন্সী জান, তা জানি, কিন্তু ওর এদেশী নাম জমা। তাই বলছি। এই ধরো ...ন-তারিখের মত। আজ কোন্ তারিখ কোন্ সাল জিজ্ঞাসা করলে আমিও বলব, তুমিও ...—আজ পঁচিশে নভেম্বর নাইন্টিন ফিফ্‌টি-থ্রি, বাংলা সনটি যদি বা সাত বছর যোগ করে,

ছ'শো বছর বাদ দিয়ে তেরশো ষাট সালের হদিস করতে পারি, তবু তারিখটা কোনমতেই বলতে পারব না। জমা বলতে ক্রেডিট কথাটাই মনে পড়বে।

—মেনে নিলাম। এখন বল—রত্নেশ্বর রায়ের কথাটা বল। রত্নেশ্বর রায় জমিদারীতে বসেই ফৌজদারী মামলার আসামী কেন হলেন, সেইটেই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তুমি বলছিলে রত্নেশ্বর রায় রায়বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে খুন করিয়েছিলেন। আবার বলছ—জমিদারী গদিতে ছ'মাস বসতে না বসতে ফৌজদারী মামলার আসামী হলেন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষের সংজ্ঞাটির জন্যে কৌতূহলের আমার শেষ নেই।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ সুলতা, আমার বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ রায়বংশে। বীরেশ্বর রায় পথনির্দেশ করছেন, আচার্য দেওয়ান তাঁর পাশে পাশে চলছেন, শেখাচ্ছেন লড়তে হবে, লড়াই ছাড়া রাজত্ব চলে না। এবং লড়তে হলে লড়বে শক্তের সঙ্গে, সবলের সঙ্গে। তাতে যেমন চাই শক্তি এবং সাহস, তেমনি চাই বুদ্ধি এবং কৌশল। একটা কথা এই সঙ্গে বলে নিই—বীরেশ্বর রায় যে পালোয়ান রেখেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর হুকুমে রত্নেশ্বর রায়কে কুস্তী করতে হয়' প্যাঁচ শিখতে হয়। ঘোড়ায় চড়তে হয়।

ওই প্রথম দিনই যে হজরৎপুরের পিক্রুজ একজন পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে নিয়ে এসেছিল, সেই লোকটা পিক্রুজের কাজিন। কস্টেলো পিক্রুজ। গোয়ার লোক। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসত। থাকত। এই লোকই রবিনসনের কাছে গিয়ে কাজ নিয়েছিল। কিছুদিন সাহেবের হুকুম তালিম করে সাহেবের সঙ্গে শীকার খেলে প্রিয়পাত্র হয়ে হয়ে উঠেছিল তার। হঠাৎ তার কাছে এল হজরতপুরের পিক্রুজ, একটি মেয়েকে নিয়ে। ফিরিঙ্গী মেয়ে—কটা চোখ, কটা চুল, কটা রঙ এবং খানিকটা বর্বরা। হজরতপুরের পিক্রুজের সৎবোন ; গোয়ার ফিরিঙ্গী পিক্রুজের বাক্‌দত্তা বধূ। নাম তার মার্থা।

এ সবটাই সুকৌশলে সাজানো বাঘশীকারের 'বেইটে'র মত। বাঘ ঠিক এল, শিকারীর লক্ষ্য অব্যর্থ, বাঘ ম'ল।

রবিনসন একদিন ফিরিঙ্গী পিক্রুজের অনুপস্থিতিতে মার্থার ঘরে ঢুকল। মার্থা চীৎকার করলে। তার সঙ্গে লড়াই করলে। অথচ সেই তাকে ইসারায় ডেকেছিল। পিক্রুজ ছুটে এল। লাফ দিয়ে পড়ল রবিনসনের ঘাড়ে, এবং তাকে শেষ করে দিয়ে চলে গেল মার্থাকে নিয়ে ; গঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে।

পুলিশের হুলিয়া হ'ল—মার্থাকে তারা পেলে, কিন্তু ফিরিঙ্গী পিক্রুজকে পাওয়া গেল না।

পোর্টুগালে যাওয়ার জাহাজের টিকিট কেনার দাম খরচ পড়ে আছে রায়বাড়ীর খাতায়। একটা মোটা টাকাও খরচ পাওয়া যায় দাতব্য খাতে। কাকে কি বৃত্তান্ত তা লেখা নেই।

এটা ঘটল তিন মাসের মাথায়। মার্থা জবানবন্দী দিলে। সাহেব পিক্রুজের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল, সে চীৎকার করে উঠেছিল

কস্টেলো পিক্রুজ কোথায় ছিল—সে ছুটে এসে সাহেবকে আক্রমণ করে। সাহেবও তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু পিক্রুজ গোড়াতেই পড়েছিল তার ঘাড়ে। সে তাকে ছুরি মেরে তাকে অর্থাৎ মার্থাকে নিয়ে পালায়। শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতায় মার্থাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই সে যে কোথায় চলে গেছে মার্থা তা জানে না।

মার্থার পক্ষে বড় কাউন্সেল নিযুক্ত করেছিল হজরতপুরের পিক্রুজ। ব্যাপারটা সাদা চামড়া আর কটা চামড়ায় বলে খুব বেশীদূর এগোয় নি। মার্থার কাউন্সেলও ছিল একজন খাস বিলিতী সাহেব। রবিনসনের ইতিহাসটাও নারী সম্পর্কিত ব্যাপারে খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। এর আগে একটি ব্রাত্য নারীহত্যার অভিযোগ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। মামলাতে তার কিছু হয় নি। কিন্তু প্রথম কুঠী তার ফেল পড়েছিল এইজন্যে। সুতরাং কোনক্রমেই রায়বাড়ীর জমা-খরচের খাতা পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে পুলিশের মনে হয় নি।

তাছাড়া রায়বাড়ীর হাতে আর একটা জোরালো প্রমাণ ছিল রবিনসনের বিরুদ্ধে ধার বাবদ বিশ হাজার টাকার একটা ডিগ্রী। যেটা উত্তরাধিকারী অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রহীন রবিনসনের মৃত্যুতে প্রায় দিকভ্রান্ত হয়েছিল জারীর পথে। রবিনসনের উত্তরাধিকারী স্থির না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রী জারী স্থগিত রাখতে হয়েছিল। মৃতের উপর জারী হবে ডিগ্রী, নয় তার উত্তরাধিকারীর উপর। সুতরাং রবিনসনের মৃত্যুতে রায়বাড়ীর সমূহ ক্ষতি। তবে তা দেখাতে হয় নি। বলেছি তো এ-পথেই হাঁটে নি পুলিশ।

তারপরই মাসখানেক পর দে-সরকারদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, মারধর ক'রে তার ঘর জ্বালিয়ে দিলে। দে-সরকারের ডান হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিলে। জ্বলন্ত মশালের বাড়ি মেরে সারা মুখখানা ছিঁচকে পোড়া করে দিয়ে গেল।

দে-সরকার এজাহারে পুলিশের কাছে বললেন—তিনি দেখেছেন, কমলাকান্ত ভট্চাজকে একটু দূরে বাড়ীর ফটকের সামনে তাকে ঘোড়ার উপর দেখেছেন।

সুরেশ্বর বললে—সব দেশের জমিদারীতেই বোধ হয় আছে। তবে বাংলাদেশের জমিদারীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা অনেকগুলিই আছে। দু-একটা ঘটনা গল্প হয়ে আজও চলিত আছে মুখে-মুখে। জমিদারী চালনায় এগুলি সে-আমলের সিংহকীর্তি। অন্তত, তাই লোকে বলত, সমাজে মানত।

মুসলমান আমলে কাজী ছিল, বিচারও ছিল, কিন্তু ইংরেজের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড ছিল না। প্রজার কাছে খাজনা আদায়ের জন্য হপতম পঞ্চম আইন করেছিল কোম্পানী কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমিদারদের মুখে পারমানেন্ট সেটেলমেণ্টের আট-ঘোড়ার গাড়ীতে ক্রিমিন্যাল আইনের কাঁটা-লাগানো লাগাম পরিয়ে দস্তুরমত পোষা আরবী ঘোড়ায় পরিণত করেছিল। হপতম পঞ্চম তুলে দিয়ে সিভিল স্যুটের মুন্সেফী আদালত দেখিয়ে দিয়েছিল। এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড চালু করে জমিদার-প্রজাকে এক গোয়ালে পুরেছিল। তবু তারা এই কাঁটা-

লাগাম ছিঁড়ে দুর্দান্তপনা করছে ইচ্ছামত।

একটা ঘটনার কথা বলি—হেস্টিংস সাহেবের প্রিয়পাত্র কান্ত প্রথম হলেন বাবু তারপর রাজা। বহু লক্ষ টাকা আয়। কান্তবাবুর চতুর্থ পুরুষ কৃষ্ণনাথ। নাবালক অবস্থায় মালিক হয়েছিলেন বিষয়ের। স্টেট গিয়েছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডসে। কৃষ্ণনাথকে খাসা ইংরিজী শিখিয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাঁকে রাজার মেজাজ তৈরী করে দিয়েছিলেন। প্রচুর মদ্য, হৈ-হল্লা, ইয়ার-বন্ধু, কুকুর-বন্দুক-পিস্তল এসব দিয়ে রাজত্বের খেলাঘর সাজিয়ে দিতে কসুর করেন নি। তার সঙ্গে রাজোচিত পোশাক এবং ডেকরেশন। তরুণ কৃষ্ণনাথ দিলদরিয়া লোক, তেমনি মেজাজ। একবার বাড়ীতে যাত্রাগান হচ্ছে। উনি অবশ্য দেখছিলেন না। উনি বাইরে প্রমোদভবনে ছিলেন। সেখান থেকে রিটায়ারিং টাইমে অন্দরে যাচ্ছেন। সঙ্গে চোপদার চলেছে, মশালচি চলেছে। যাবার পথ ওই আসরের পাশ দিয়ে। আসরে তখন নারদমুনি হরিগুণগান করছেন। রাজার রঙদার চোখে সাদা চুল-দাড়ি পরা মুনিকে খুব ভাল লাগল। চোপদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কৌন হ্যায় উয়ো ?

চোপদার বললে—নারদমুনি হুজুর !

—নারদমুনি ? আচ্ছা। উ তো আচ্ছা আদমী হ্যায়। বলে ঘুরলেন। কুর্শী আনিয়ে সব লোকের সামনে বসলেন এবং হুকুম করলেন—আউর এক নারদমুনি লাও !

অধিকারী সন্ত্রস্ত, ছুটে সাজঘরে গিয়ে আর একজনকে পাকা চুল-দাড়ি পরিয়ে নিয়ে আসরে নামালেন।

হুকুম—আউর লাও। আউর লাও।

শেষ পর্যন্তও দশ-বারোজন লোক—মেয়েদের চুলে সফেদা মাখিয়ে সাদা করে পরিয়ে আসরে এনে নামিয়ে দিলে। রাজা খুব খুশী হয়ে একশো টাকা ইনাম দিয়ে চলে গেলেন।

এই কৃষ্ণনাথের হাতের হাজার-পাঁচেক টাকা দামের আংটি চুরি গেল, সন্দেহ হল চাকরের উপর। সুতরাং তাকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু ভুলে গেলেন ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড অনুযায়ী ও-অধিকার তাঁর নেই। এমন প্রহার করলেন যে, চাকরটা মরে গেল।

বহরমপুরের এস ডি ও খুশী ছিলেন না মহারাজ কৃষ্ণনাথের উপর। লোকটিও ছিলেন গণ্যমান্য বংশের। কিন্তু সে-খাতির কৃষ্ণনাথ করতেন না। তিনি ওয়ারেন্ট বের করলেন ; কৃষ্ণনাথ তার আগে কলকাতা পালালেন। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে কলকাতা তার কেল্লা নয়। মুসলমান আমলে রাজাদের মাটির কেল্লাগুলোর পাঁচিল আর ফটক সব ভেঙে দিয়েছে কোম্পানী। কলকাতাতে কোম্পানীর খাস ডেরা। কোথায় যাবেন ? কৃষ্ণনাথ যে-খেলনাটা পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছে—পিস্তল—গ্রেপ্তারের ভয়ে সেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

তবু বাংলা দেশের জমিদারেরা হটেন নি। সুচতুর ভাবে আইনের সুঁচের সুতোর ছিদ্র দিয়ে

উটে চড়ে পার হয়ে যেতেন।

রবিনসনের পর দে-সরকার। গোপাল সিংহের পর্ব শুরু হয়ে গেছে তখন। মামলা-মোকদ্দমা চলছে তখন। বাঘ-নেকড়ে মারার পথ আর ইঁদুর ধরা কি মারার পথ এক নয়। দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের একখানা পত্র আছে। তিনি রবিনসনের মৃত্যুর পর কীর্তিহাট থেকে লিখেছিলেন কলকাতায়। লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। আচার্য বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বরকে কলকাতায় রেখে চলে এসেছিলেন কীর্তিহাট। হজরতপুরের পিক্রুস মারফৎ ওই কস্টেলো পিক্রুসকে তিনিই নৌকো করে হজরতপুর পর্যন্ত এনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। কস্টেলো এখান থেকেই ফিরে গিয়ে উঠেছিল শ্যামনগরে। চাকরি নিয়েছিল রবিনসনের। কস্টেলো পিক্রুস উধাও হয়ে গেল তার কাজ সেরে, খবর পেয়ে দেওয়ান জানালেন—"যে পাপ-বৃক্ষটির কাণ্ড কায়স্থ এবং তস্য শাখা ফিরিঙ্গী, তাহার শাখাটি ছেদিত হইয়াছে। অতঃপর কাণ্ডটির ব্যবস্থা হইতেছে। এই বৃক্ষে ছাত্র মূষিকটি আশ্রয় লইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে গর্তে আশ্রয় লইতে হইবে। চিন্তা করিবেন না, সকল ব্যবস্থাই হইতেছে। তবে এক্ষণে বাবু রত্নেশ্বর ভায়াজীবনকে লইয়া এখানে আসা প্রয়োজন। ইস্কুল পত্তনের যে আয়োজন হইতেছে, ওই আয়োজনের খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এখানে আনয়ন করিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হউক। তাহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে বলিয়া মনে করি। আমি উক্ত রাত্রেই কাণ্ড ছেদন করাইব।"

* * *

সুরেশ্বর বললে—হয়তো কুটিলতম রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন দেওয়ান। নবাব-বাদশার দরবার হলে ইতিহাসে এ-ঘটনা পড়ে বিস্মিত হ'ত লোকে।

ব্যবস্থা হয়েছিল—ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করবেন মেদিনীপুরের কালেক্টরসাহেব বাহাদুর। সন্ধ্যায় উৎসব হবে। নৃত্য-গীত এবং উচ্চাঙ্গসঙ্গীত।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে বীরেশ্বর-রত্নেশ্বর হাজির থাকবেন। ওদিকে সেই রাত্রে শ্যাম-নগরে দে-সরকারের বাড়ীতে পড়বে ডাকাত। শুধু আগুন দিলে কাজটা সোজা হ'ত, কিন্তু তাতে শ্যামনগরের লোকের উপর সন্দেহ পড়তে পাবে। সেইজন্যে হবে ডাকাতি, যার উদ্দেশ্যটা হবে লুঠতরাজ। প্রতিহিংসা প্রতিশোধ বলে চালানো যাবে না।

ঘটনার কয়েকদিন আগে একটা ফৌজদারী হয়েছিল গোপাল সিংহের সঙ্গে। সামান্য ঘটনা নিয়ে ফৌজদারী। ইঁদুর গোপাল সিং তখন মামলায়-মামলায় উত্যক্ত। শ্যামনগরে বিমলা-কান্তের একজন পাইক রাধানগর গিয়ে সামান্য কথায় খপ করে চেপে ধরেছিল গোপাল সিংয়ের হাত; গোপাল তাকে ঘায়েল করে বসল। এবং ঘায়েল করে তার হুঁশ হল—সে পুলিশ কেসে পড়েছে। সে হ'ল ফেরার।

রাধানগরে দে-সরকারের তখন সেই ছিল ভরসা। গোপাল পালাল পুলিশের ভয়ে। নির্বান্ধব দে-সরকার সারারাত্রি মালা জপ করে গোবিন্দ ভরসা করে দিনযাপন করছিলেন।

আচার্য এ-কার্য সমাধা করবার জন্য লোক এনেছিলেন দক্ষিণ কাঁথি অঞ্চল থেকে। বাংলা-দেশে এমন দল তখন অনেক ছিল। যারা চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত। বিশু ডাকাতের নাম জান। বিশ্বনাথ ঘোষ ডাকাতি করতেন বড় বড় বাড়ীতে, অনেক নীলকুঠিও লুঠেছেন। লোকে বলত বিশুবাবু। কোম্পানী সোজা পথে তাকে ধরতে পারে নি। দলের লোকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ধরা পড়েছিলেন। হাণ্টারসাহেব লিখে গেছেন—

Biswanath Babu exercised his vocation in broad daylight, sending previous notices of his designs to those he intended to plunder."

বিশুবাবুর মত মহৎ ডাকাত চিরকাল দুর্লভ কিন্তু এই ধরনের দুঃসাহস অনেক দলের তখন ছিল। এত বড় একটা জমিদারপক্ষ সহায় পেয়ে তারা দে-সরকারের মত কৃপণ জমিদার-মহাজনের বাড়ী লুঠতে, জ্বালাতে, বলতে গেলে এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। ছকা ব্যবস্থা। তারা হানা দেবে, হৈ-হৈ করে ঘাঁটি পাতবে। শ্যামনগরের লোকে উঠবে, সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে নিজেদের এলাকায়।

গ্রামের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ডাকাতি-চুরি হয় না। এক্ষেত্রে তার অভাব হয় নি, দে-সরকার বাড়ীর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তারা পেয়েছিল। রাত্রি দুপুরের পর ডাকাতের দল—সে প্রচণ্ড চীৎকার করে মশাল জ্বালিয়ে হানা দিয়ে পড়ল, তখন কান্না উঠল দে-সরকারের অন্দরে, কিন্তু সে চীৎকার মানুষ সাড়া তো দেয়ই নি, দে-সরকারের ভগবানও সাড়া দেন নি। ডাকাতদের তিনজন এসেছিল ঘোড়ায় চেপে।

মেয়েদের উপর ডাকাতেরা নির্যাতন করে নি। তারা গায়ের গহনা খুলে দিয়েছিল হুকুমমত। কিন্তু দে-সরকারের ছেলে এবং দে-সরকারকে বাইরে টেনে এনে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটে ছিঁচকা পোড়া করে দিয়েছিল। এবং ভেঙে দিয়েছিল একখানা হাত। তবু দে-সরকারকে বাহাদুরি দিতে হবে। টাকা কোথায় আছে তিনি বলেন নি। ছেলে একটা জায়গা জানত, সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

এই সময়েই ফটকের বাইরে ঘোড়ার উপর দেখা গিয়েছিল তরুণ রত্নেশ্বর রায়কে। মাথায় পাগড়ি, মুখে একটা ফেটা বাধা, পরনে ব্রিচেস কোট—

তিনি ডেকে বলেছিলেন—প্রাণে মেরো না। পোড়ামুখ নিয়ে বাঁচতে দাও।

তারপর আর তাঁকে কেউ দেখে নি।

এ-কাজটি রত্নেশ্বর নিজের মতে ও বুদ্ধিতে করেছিলেন। বীরেশ্বর রায়কে বলেন নি। এমন কি দেওয়ান আচার্যও সময়ে জানতে পারেন নি। তবে রত্নেশ্বর শক্ত করে ঘাঁটি বেঁধে কাজ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় এবং আচার্য দেওয়ান ডাকাতির দিন ইস্কুলের ভিত্তিস্থাপনের ব্যবস্থা এবং রাত্রে নৃত্য-গীত এবং বৈঠকী গানের ব্যবস্থা করেছিলেন 'এ্যালিবি' রাখবার জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং

অন্যান্য রাজকর্মচারীরা উপস্থিন থাকবেন। তাঁরা নিশ্চয় বলবেন—সে কি? আমরা সেখানে সে-রাত্রে উপস্থিত—কীর্তিহাটে। সারাদিন সেখানে ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান, রাত্রে উৎসব। তাঁরা ডাকাতি করাচ্ছেন সেই রাত্রে—এ কি করে সম্ভবপর হতে পারে?

রত্নেশ্বর এই সুযোগ নিলেন।

তিনি মজলিসে সাহেবদের আপ্যায়ন করছিলেন। ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সোফিয়া বাঈয়ের বৈঠকী গান সবে শেষ হয়েছে। সোফিয়া বাঈ সন্ধ্যায় বসে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক তার অপরূপ গানে মজলিশকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর গানের পর আসরে উঠে দাঁড়িয়েছিল দুজন তরুণী খেমটাওয়ালী। বাছাই করে কলকাতার সেরা খেমটাওয়ালী আনা হয়েছিল। রূপে, কণ্ঠস্বরে, নৃত্যদক্ষতায় তারা অপরূপা। ঠিক এই সময় বাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি অবসন্নের মত বসে পড়েছিলেন।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়, তাঁর সঙ্গে ম্যাজিস্টেট সাহেব এবং অন্যান্য অতিথিরাও উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন নি। গোটা আসরটাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রায়বংশের উত্তরাধিকারী —এমন সুন্দর সুপুরুষ মার্জিতরুচি তরুণটির প্রতি দৃষ্টি সকলেরই আকৃষ্ট হয়েছিল। বীরেশ্বর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে রত্নেশ্বরের হাত ধরে বলেছিলেন—কি হল, রত্নেশ্বর?

—মাথা ধরেছে, তার উপর হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

বীরেশ্বর তাকে হাতে ধরে তুলে একখানা আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। একজন পাংখা-বরদার একখানা ছোট হাতপাখা নিয়ে তাঁর মাথায় হাওয়া করতে শুরু করেছিল। একজন এনেছিল গোলাপজলের বোতল। রত্নেশ্বর হাতে মাথা ধরে কিছুক্ষণ বসে থেকে হেসে বলেছিলেন সাহেবকে—I am very sorry sir that I have disturbed the whole show.

—Are you alright now?

কাচুমাচু করে রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—সুস্থ হয়েছি অনেকটা, তবে ঠিক সম্পূর্ণ সুস্থ হই নি। যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটু বিশ্রাম করি গিয়ে। আমার একটা শিরঃপীড়া আছে, তাতে অনেক সময় প্রায় অজ্ঞানের মত পড়ে থাকি। তবে ভয়ের কিছু নেই।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর বাপকে বলেছিলেন—একটুও চিন্তা করবেন না আপনি। আপনি বসুন। আমি একটু শোব।

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে বলেছিলেন—কেউ যেন আমাকে না ডাকে। ভবানী দেবী পুজায় ছিলেন। পূজা সেরে উঠে এসে ছেলেকে আর পান নি। পেয়েছিলেন একটা চিরকুট। তাতে লেখা ছিল—আজ আতসবাজী পুড়বে আমি দেখতে যাচ্ছি। বাবা আর দেওয়ানজী ছাড়া কাউকে বলো না। কোন ভয় নেই। ভোর হবার আগেই ফিরব।

গোপনে তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। দু'জন সওয়ার বরকন্দাজ এবং সঙ্গে

একটা বাড়তি ঘোড়াও তিনি নিয়েছিলেন।

শ্যামনগরের পথ দুটো, একটা নদীর পথ। সেটা অনেক ঘুরপথ। একটা ত্রিভুজের দুটো বাহুর মত কাঁসাই আর ভাগীরথী ধরে এক নদীপথ, অন্যটা ত্রিভুজের কর্ণের মত একটা স্থলপথ। কিন্তু দুর্গম। এই পথটাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। নদীপার ছিল পথে, সেখানেও বন্দোবস্ত তিনি করে রেখেছিলেন—পারের নৌকা অপেক্ষা করছিল। মাইল-তিরিশেক পথ, মাঝে কুতুবপুরের কাছারী। সেখানে ঘোড়া বদল করে নিয়ে উঠেছিলেন শ্যামনগর, ডাকাতি তখন চলছে, মশাল দিয়ে পিটছে কর্তা দে-সরকারকে।

তিনি গিয়ে ডেকে বলেছিলেন—প্রাণে মেরো না। ছিঁচকেপোড়া মুখে নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও।

তিনি আসবেন এ-খবরটা কাজের কাজী যারা তারা জানত, বলা ছিল। তারা তাঁকে ঘাঁটিতে ঢুকতে আটকায় নি।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরেছিলেন। দু'দিকে ষাট মাইল পথ। যেতে-আসতে ঘণ্টা-আষ্টেক লেগেছিল। কীর্তিহাটে যখন ফিরেছিলেন, তখন বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, দেওয়ান আচার্য জেগে পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

ভবানী দেবী তিরস্কারের আর বাকি রাখেন নি। বীরেশ্বর রায় গম্ভীরমুখে শুব্ধ হয়ে বসেছিলেন। আচার্য হাঁক ছেড়ে কয়েকবার মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন—বড্ড ছেলেমানুষী করেছ দাদুসাহেব। বড্ড ছেলেমানুষী। না-না-না, আমাদের না জানিয়ে এরকম ভাবে—না-না-না।

তবে পরে একান্তে তাকে বলেছিলেন—সাবাস দাদুসাহেব। তুমি যা করলে—এ একটা দেখালে বটে। হ্যাঁ, বুকের পাটা আছে তোমার। বুদ্ধিও খেলিয়েছ বটে। সাবাস, সাবাস! তবে এরকম আর করো না।

একটু ভেবে বলেছিলেন—তবে ভাই কাল সকালেই তোমাকে কলকাতা চালান করব সাহেবদের সামনে। রাত্রে অসুখ বেড়েছে, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে। বুঝেছ?

হেসে রত্নেশ্বর বলেছিল—ঠিক আছে, আমি তৈরী।

—কষ্ট হবে না তো! সারারাত্রি তিরিশ কোশ ঘোড়া হাঁকিয়েছ।

—না। বলেন তো কালই নমুনা দেখিয়ে দিতে পারি।

—থাক। তাতে আর কাজ নেই।

পরের দিনই সাহেবদের বিদায় দিয়ে বীরেশ্বর রায় ছেলেকে নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুশী হয়ে বলেছিলেন—স্কুলটা তাড়াতাড়ি শেষ কর মিস্টার রায়।

স্কুলের ফাউণ্ডেশন আমি পত্তন করলাম। ওপনিং দেখে যেতে চাই। এবং আমার ইচ্ছে আমিই সেটা করি।

বিদায়ের সময় রুপোর রেকাবীর উপর পঁচিশখানা মোহর সবিনয়ে তুলে ধরেছিলেন বীরেশ্বর, সাহেব সকলের সামনেই রেকাবখানাসমেত, সেটা নিয়ে দিয়েছিলেন আর্দালীর হাতে। তাছাড়া রুপোর কর্ণি এবং আরও অনেক উপহার ছিল, অন্য সাহেবরাও বাদ যান নি। সকলেই সেলামী নিয়ে রায়বাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই রত্নেশ্বরের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। রত্নেশ্বর অসুস্থ এবং রাত্রে অসুখ বেড়েছে এ-কথাটা আচার্য এসে প্রথমেই জানিয়েছিলেন সাহেবদের। বিবিমহলে এসে সকালবেলাতেই সাহেবের সঙ্গের কেরানীকে বলেছিলেন—হুজুরকে একটু বলে দেবেন, কর্তার আসতে একটু হয়তো দেরি হবে। রত্নেশ্বরবাবুর অসুখটা বেড়েছে। ডাক্তার-কবিরাজে বলছে—সাধারণ শিরঃপীডা নয়, একটু জটিল মনে হচ্ছে। বলছে—কলকাতায় নিয়ে যাওয়া ভাল।

কথাটা কেরানী যথাসময়ে পেশ করেছিল হুজুরের সামনে, এবং তার মিনিট-কয়েকের মধ্যেই বীরেশ্বর রায় এসে হাজির হয়ে দেবীর জন্য বিরক্তি জন্মাবার পূর্বেই দেবীর জন্য মার্জনাভিক্ষা করেছিলেন।

সন্ধ্যার মুখে বজরা রওনা হয়েছিল কলকাতা।

কলকাতায় এসেও রত্নেশ্বর বড় সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। রত্নেশ্বরের শিরঃপীড়া—অহরহ যন্ত্রণা। ডাক্তার রোজ আসছেন, দেখছেন, মোটা ফি নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোন দিক থেকে কোন হদিস পাচ্ছেন না। ওষুধ আসে, ফেলে দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় হুগলী থেকে এল পুলিশের পরোয়ানা। দে-সরকারের বাড়ীর ডাকাতির সময় রত্নেশ্বর রায়কে নিজে দেখেছেন—মাথায় পাগড়ি এবং মুখে ফেটা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও চিনেছেন বলে এজাহার করেছেন দে-সরকার এবং তাঁর ছেলে।

সুরেশ্বর বললে—একটা গল্প বোধ হয় তুমিও শুনেছ সুলতা; এক ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে কি একটা পুজো ছিল। ষষ্ঠী পুজো কি সত্যনারায়ণ ধরনের কিছু। কিন্তু বুড়ী পুরুরী না-পেয়ে গঙ্গারঘাট গেছল পুরুতের সন্ধানে। হাইকোর্টের জজ সার গুরুদাস গঙ্গাস্নান সেরে ঘাটে উঠেছেন; বুড়ী তাঁকে গিয়ে ধরেছিল—ও বাবাঠাকুর, আমার এই পুজো দয়া ক'রে করে দাও। তা সার গুরুদাস বামুন হিসেবে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নি। বুড়ীর বাড়ী গিয়ে পুজো করে দিয়েছিলেন। বুড়ী তাকে বলেছিল—বাবা তুমি দারোগা হয়ো।

তার অর্থ টা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এখানে মেদিনীপুরের সাহেবরা সেলামীর চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন। রুপোর থালাসুদ্ধ মোহরগুলো পকেটে পুরেছিলেন।

সুতরাং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের 'এলিবি'র সূচীছিদ্র দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেলেন রত্নেশ্বর। তার উপর সার্টিফিকেট ছিল কলকাতার সাহেব-ডাক্তারের। একটি কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত বাবু রত্নেশ্বর রায় তাঁর চিকিৎসাধীনে রয়েছে। তাকে স্থানান্তরিত করা এখন অতীব বিপজ্জনক। আচার্য দেওয়ান মোটা জামীন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওদিকে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লোক ছুটেছিল চিঠির জন্য। রত্নেশ্বর রায় ঘটনার তারিখে সমস্ত দিন তাঁর চোখের সামনে ছিলেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম করেছিলেন, যার ফলে সন্ধ্যার পর সম্ভবতঃ নটা নাগাদ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রত্নেশ্বর রায়ের অসুখ বৃদ্ধি পায় এবং ঐদিনই চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়। এ সমস্তই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে।

বাবু রত্নেশ্বর রায়কে ওই তারিখের কোন ঘটনার জন্য দায়ী করা অসম্ভব। এবং তাঁর মত একজন উচ্চশিক্ষিত মার্জিতরুচি তরুণ যুবকের পক্ষে এমন কাজ কখনও সম্ভবপর নয়।

যে ব্যক্তি এমন কথা বলেছে সে আক্রোশবশতঃ মনের ভুলেই চোখে ছায়াবাজীর মত কিছু দেখেছে। অথবা ইচ্ছাকৃত আক্রোশবশতঃই এমন কথা বলেছে।

এই চিঠিতেই রত্নেশ্বর রায় সব দায় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

পাগলাবাবার চিঠি নিয়ে লোক এসেছিল এরই মধ্যে। তখনও রত্নেশ্বর আদালত থেকে দস্তুরমত নথিপত্রে লিখিতভাবে খালাস পান নি। তিনি কলকাতাতেই শয্যাশায়ী হিসেবে ঘরের মধ্যে সেরেস্তাখানা পেতে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ বুঝছেন। সুতরাং তাঁর যাওয়া হ'ল না।

আইনের এই দায়ের বন্ধনে বাঁধা না থাকলে এই যাওয়া নিয়ে হয়তো সমস্যা দাঁড়াত: রত্নেশ্বর রায় যেতে চাইতেন না। এ নিয়ে একটা সংঘর্ষ বাধাও বিচিত্র ছিল না।

তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"আমি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষাও লাভ করিয়াছি। আমি এদেশের প্রাচীনকালের মানুষের মত অন্ধবিশ্বাসী নহি। তন্ত্রও আমি পড়িয়াছি। কিন্তু বীরাচার বা বামাচার বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহার ফল যে যাহাই পাইয়া থাকুক তাহা পশু বা অসুরধর্ম। তাহা কখনও মানবধর্ম হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে-কোন কর্মসিদ্ধি দুই উপায়েই সম্ভবপর, সৎপথে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সেই মত কর্ম করিয়াও সিদ্ধ করা যায়, আবার অসৎ উপায়েও করা যায়। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধ জয়, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে মামলায় ডিগ্রি হওয়া হামেশাই হইতেছে। যে-উপায়ে রবিনসনের উপর শোধ তোলা হইল, যে কৌশলের পথে আইনকে ফাঁকি দিয়া দে-সরকারের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলাম তাহা আইনসম্মত পথ নহে। কিন্তু ইহা বিষয়ব্যাপার এবং বাস্তবজীবনের ব্যাপার। কিন্তু যাহা ধর্ম যাহা ভগবৎতত্ত্ব ও সাধনা তাহা মানবের বিবেকবিরুদ্ধ অশুদ্ধ ক্লেদাক্ত পথে কখনওই সমর্থনীয় নহে। ইহাকে ধর্ম-অনুসারেই পাপ বলিতে হইবে। মহাপাপ—দুষ্কর্ম—বিবেকবিরোধী চিন্তা! শক্তিকে আমরা মাতৃরূপে অর্চনা করি। চণ্ডীতেই আছে—

জগতের নারীজাতিই তাঁহার প্রতিভূ। নারী লইয়া ব্যভিচার করিয়া বিশ্বজগতের মাতৃরূপিণী শক্তিকে যে ব্যক্তি বন্দিনী রক্ষিতার মত আয়ত্তাধীনে পাইতে চায়, সে ব্যক্তি নরকের কৃমিকীটের তুল্যই ঘৃণ্য। নরকের কৃমিকীট বিষ্ঠার মত কদর্য অভক্ষ্য বস্তু আহার করে; মানুষ তাহা করিতে গেলে তাহাতে তাহার অপঘাত অপমৃত্যু ঘটে। সে প্রেত!"

দীর্ঘ দু পৃষ্ঠা ধরে লিখেছেন তাঁর মনের চিন্তা। এবং বাপ মা এবং বিমলাকান্তের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন—তাঁরা কেন গেলেন, কোন মুখে গেলেন তা বুঝলাম না। রায় বংশ—ভট্টাচার্য বংশের স্মৃতি থেকে এই মহাপাতকীর নাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত।

*　　　*　　　*

পাগলাবাবা নবদ্বীপে পোড়া-মা তলার কিছুটা দূরে এক পাশে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, বিমলাকান্ত, মহেশচন্দ্র এবং সোফিয়া কলকাতা থেকে বজরা করে গিয়েছিলেন নবদ্বীপ। তবে যথাসাধ্য আত্মগোপন করে ছিলেন। মনে তাঁদেরও কিন্তু ছিল। পাগলাবাবার সবকিছুই তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ওই কলমা পড়ে মুসলমান হওয়াটা তাঁরা স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। সেই কারণে পথে বজরা থেকে নেমে নৌকো নিয়েছিলেন। বজরা বাঁধা ছিল শান্তিপুরের ঘাটে। নৌকো কলকাতা থেকেই সঙ্গে গিয়েছিল। নবদ্বীপে সাধারণ মনস্কামনা পরিপূরণার্থীর মত যেন ওই সিদ্ধ পাগলাবাবার কাছে এসেছেন, এই পরিচয় দিয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাট থেকে গিয়েছিলেন পদব্রজে। বীরেশ্বর রায়ের জন্য একখানা গরুরগাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ তাঁর পক্ষাঘাতের পঙ্গুত্ব সম্পূর্ণরূপে তখনও সারে নি।

পাগলাবাবার নবদ্বীপেও খ্যাতি হয়েছিল। অনেক লোক তাঁর কাছে আসত, এখানে তাঁর নাম পাগলাবাবা ছিল না। লোকে তাঁকে 'মা-বোলা বাবা' বা মা-বোলা ফকীর বলত। ফকীর মানে তিনি কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন এ কথাটা গোপন ছিল না। প্রকাশ তিনি নিজেই করেছিলেন।

কারুর সঙ্গে কোন কথাই বলতেন না। মৌনী। শুধু মধ্যে মধ্যে বুককাটানো করুণ আর্তনাদে ডাকতেন—মা, মা, মা! চোখ দিয়ে ধারা গড়াতো! বহুলোক আসত, ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত, প্রশ্ন করত, কিন্তু তিনি থাকতেন নীরব নিস্পন্দ। গভীর রাত্রে ভাঙা গলায় গান শুনেছে লোকে। তাও তাতে ভাষা নেই। একাক্ষরা গান। মা-মা-মা। মা-মা-মা-মা-মা। মা!

লোকে পয়সা দিয়ে যেত। পড়ে থাকত, তিনি কুড়োতেন না। খেতেন শুধু ফল! কিন্তু এ সত্ত্বেও দু-তিনজন ভক্ত তাঁর জুটেছিল। এদের কাছেই সামান্য কথাবার্তা বলতেন। তাও একান্তে। এদেরই তিনি বলেছিলেন—তিনি মুসলমান, তাঁর উচ্ছিষ্ট যেন হিন্দু কেউ না খায়; কেউ যেন তাঁকে প্রণাম না করে! তিনি হিন্দুই ছিলেন—কিন্তু মায়ের কোপে বিপাকে পড়ে

তাঁর হিন্দু জাত গিয়েছে।

রত্নেশ্বর রায়ের কাছে বর্ণনা করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর লিখে রেখেছেন নিজের ডায়রীতে।

তাঁর ওই ভক্তরাই ব্যবস্থা করেছিল সাক্ষাৎকারের। তারাও জানত না 'মা-বোলা' ফকীরের সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের কথা। এবং সোফিয়া বাঈই ওঁদের মুখ রক্ষা করেছিল। ভক্তরাও বুঝেছিল এবং তারাও যাদের যাদের বলেছিল তারা জেনেছিল সোফিয়াই তাঁর আপনজন। সোফিয়ার সে সময়ের বেশভূষা সাদাজমি লালপেড়ে শাড়ী, এলো চুল, এবং প্রসাধনবর্জিত সাজ-সজ্জা কারুর মনে কোন সংশয়ই জাগতে দেয় নি। তারা ভেবেছিল সোফিয়াই ফকীরের বেটী আর এঁরা তাঁর প্রসাদধন্য ভক্ত!

দিনের আলোতে নয়, রাত্রে তাঁরা গিয়েছিলেন।

"যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে।" বীরেশ্বর রায় এই কথাটাই বলেছিলেন। উঠবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না। তিনি সোফিয়াকে দেখে খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন—এসেছিস মা! বস্।

দীর্ঘকাল পরে হ'লেও মহেশচন্দ্রকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছিলেন, বলেছিলেন—মহেশ! আঃ বাঁচলাম!

জামাই বীরেশ্বর রায়, পুত্র বিমলাকান্ত, কন্যা ভবানীকে দেখে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—লজ্জায় আমি ম'রে যাচ্ছি। দুঃখের আর আমার পার নেই। সামনে কত জন্ম ধ'রে যে অন্ধকার, কতকাল যে অমাবস্যা তা জানি না। কিন্তু আজ লজ্জা আমার তার থেকে অনেক বেশী অনেক বড়। তোমাদের লজ্জা দিলাম। তোমাকে বিমলাকান্তকে।—তবে—।

তবে আমি তো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি। সম্বন্ধ তো নেই তোমাদের সঙ্গে। তবু ক্ষমা—ক্ষমা চাচ্ছি।

ভবানী এবার এসে তাঁর মাথার শিয়রে ব'সে তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিলেন, এবং ডেকেছিলেন—বাবা!

তাঁর মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিলেন শ্যামাকান্ত। থরথর করে চিবুক ঠোঁট কেঁপেছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার স্থির হয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন—না।

তারপর বলেছিলেন—সেও মরে গেছে। আমি প্রেত।

ভবানী বলেছিলেন—না। বারো বছর আমি সংসার স্বামী ত্যাগ ক'রে আপনার জন্যে তপস্যা করেছি। আপনি ভালো হয়েছেন, জ্ঞান ফিরেছে। এবার আপনি আপনার তপস্যার ফল পাবেন, সিদ্ধি পাবেন।

শ্যামাকান্ত আবার ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—না। নরক হবে আমার। আমি দেখতে পাচ্ছি। কত জন্ম যে ঘুরতে হবে তা জানি না। হ্যাঁ, তবে সেই দারুণ প্রহার আর করে না।

গলাটা টিপে ধরে না। তবে সিদ্ধি-মুক্তি ও অনেকদূর। দক্ষিণেশ্বরে এক জন্ম-সিদ্ধ সাধক আমাকে বলেছে। লোকে তাকে এখনও চেনে নি। অল্পবয়সী পাগল পাগল মানুষ। ওখানে থাকে। পুজুরীর ভাই। সে আমাকে বলেছে। পাগলামীটা সেই সারালে। সেই প্রহার থেকে মুক্তি দিলে। সে বললে—করেছিস কি পাগলাবাবা, মাকে মা চিনলি না—মেয়েছেলে বলে চিনলি রে! মা বলে ডাক। মা বলে ডাক। মা-মা বলে কাঁদ। কিন্তু—

ঘাড় নাড়লেন শ্যামাকান্ত, অর্থাৎ হ'ল না। বললেন—পারলাম কই? আবার ঘাড় নেড়ে বললেন—পারলাম না তো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এই সোফিকে প্রথম 'মা' বললাম। বাবা, মনে হল—সব বিশ্বসংসার মধু হল—পূর্ণিমার আলোয় ঝলমল করে উঠল। মনে হল সব তাপ জুড়িয়ে গেল। বাবা, কিছুক্ষণ পর আবার সোফির মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা ধ্বক ক'রে উঠল। কই মা? মা কেন হবে। যুবতী রূপসী নারী। সেই মোহিনী গো। মজার কথা কি জান—সোফি লজ্জা পেলে। চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালে। মনকে আমি শাসন করলাম। বললাম—মা—মা। ওরে মা!

চুপ করে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। কিছুক্ষণ পর বললেন—তাই চলছে সারাজীবন। আজও। আজও বাসনা। সে মোহিনী হয়ে ওই মেয়ের মধ্যে থেকে অহরহ ভোলাচ্ছে। কত জন্ম যে লাগবে তা জানি না। এই মরব। আজই মরব। রাত্রে অমাবস্যা লাগবে—ওই লাগবে আর মরব। ভয় করছে। মা মা বলে ডাকছি। কিন্তু মধ্যে মনে হচ্ছে আসছে জন্মে—আসছে জন্মে—বাসনা যেন পূরণ হয়। সিদ্ধি যেন পাই!

ভবানীকে দেখতে বাসনা ছিল। রায়বাবুর ঘরে ভবানীর ছবিকে তার ছবি বলে ভুল করেছিলাম। দেখি নি ওকে—তাই জানিয়েছি। কিন্তু মহেশ ওর বিয়ে কেন দিলে! না দিলেই ভাল করতে। আমার তো শুধু ওই বাসনাই ছিল না। রাজা হবারও বাসনা ছিল। আমারই বংশ হ'ল তো! যদি আমার পাপ আশ্রয় করে?

ওই প্রশ্ন করেই চুপ করেছিলেন শ্যামাকান্ত, আর কথা বলেন নি!

এই কথাই রায় বংশের গুপ্ত কথা! আর এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে রায় বংশের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে।

ভবানী দেবীর পিতা, বিমলাকান্তের পিতা—শ্যামাকান্ত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের আপন পুত্র হয়েও পোষ্যপুত্র। সেও গুপ্ত কথা। সোমেশ্বর রায় অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সেই ব্রাত্যনারী মনোহরা বিলাসও গুপ্ত কথা।

হঠাৎ চুপ করে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—শ্যামাকান্তের শেষকৃত্য হিন্দুমতে হয় নি। ভবানী দেবী বা বিমলাকান্ত অশৌচ পালন করেন নি। তাঁর শেষকৃত্য করেছিল সোফিয়া!

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মনুষ্যগণকে মানুষ হইতে দেবতা

করে না। পিশাচ করিয়া তোলে। ধর্মবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া পাপবুদ্ধি গোটা মানবসমাজকে, বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজকে, অন্ধকারের প্রেত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাকে আমি প্রশ্রয় দিব না। আমি জ্ঞানের আলোক হাতে লইয়া বিচরণ করিব।

যে পাপ আমাদের বংশকে আশ্রয় করিয়াছে, বলিয়াছেন ভ্রান্ত তান্ত্রিক, তাহাকে মুছিয়া দিব। ইহাই প্রতিজ্ঞা করিলাম।

একটু চুপ করলে সুরেশ্বর। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে বোধহয়। ডাকলে —রঘু!

রঘু এসে দাঁড়াল। সুরেশ্বর বললে—একটু চা খাওয়া।

সুলতা বললে—বাবু তোমার আজ খেয়েছেন রঘু? না, না-খেয়ে শুধু চা খেয়েই যাচ্ছেন? না খেয়ে থাকলে খাবার দিয়ো। আমি রয়েছি, খাওয়াব। রাত্রের জন্যে কি করছ?

রঘু বললে—উ তো অচি দিদি করছেন। সে বহুত্ কিছু করছেন।

সুরেশ্বর বললে—সে কি? কি করছে?

—পহেলে তো লুচি মান্‌সো আর মাছ বানাইবেন বললেন। তারপর বললেন—না লুচি না, ঘি-ভাত বানাইবেন। বিরিজ দাদাসাহেব ভি বললেন কি হাঁ—ঘি-ভাত বানাও অচি। জমিদারী গেইলো তো আজ ভোজ লাগানা!

—কি কাণ্ড! যেমন অর্চি তেমনি ব্রজদা! অর্চি তো কাউকে নাড়তে ছুঁতে দেবে না। সে তো একাই সব করবে।

রঘু বললে—হাঁ, জলখাবার ভি উনহি বানাইয়ে ফেললেন। হামাকে বললেন দিবার জন্থে। থোড়া কুছ বাকী আছে। ঘিউ মে চুড়া ভাজছেন। হামি চা বানাই? চা না কফি বানাইব?

অর্চনা নিজেই ঘরে ঢুকল, তার দু-হাতে দুখানা প্লেট। নামিয়ে দিয়ে বললে—খাও!

সুরেশ্বর বললে—তুই এসব শুরু করেছিস কি? আমাকে বললি সন্ধ্যের মন্ত্র স্মরণ সেরেই এখানে এসে বসবি, তারপর এইসব শুরু করেছিস? ঘি-ভাত কে করতে বললে?

বাধা দিয়ে অর্চনা বললে—ব্রজদার সাধ হ'ল যে! বললে—অর্চি, তুই যখন কোমরে আঁচল বেঁধে তরকারী রাঁধবার জন্যে হাতা-খুন্তিই ধরবি তখন ভাল ক'রেই ধর। বেশ জুত করে রান্নাবান্না কর। বললাম—বেশ তো কি খাবে বল? বললে—দেখ জমিদারী উঠল তার অনারে একটা ফিস্ট হয়ে যাক। গুষ্টীর সকলে থাকলেই ভাল হ'ত তা ওই কমলেশ্বর খুড়ে দিলে সব তেতো ক'রে! তা ছোট করেই হোক—ঘি-ভাত, মাংস-মাছ-দই-মিষ্টি—ভাজা এই বেশ হয়ে যাবে। খাইনিও অনেকদিন! দেখ ব্রজদা তোর ভাঙা দেউলে রায়বাড়ীতে জন্মেও খেয়েছে প'রেছে ভাল। ওতে খেদ নেই আমার। এখন তো অন্ধ ফকীর। দিনরাত্রি মালা জপি, বলি পার কর—পার কর। আজ কেমন ঘোর লেগেছে। মনে হচ্ছে শে

জমিদারীটা করে নি। গানের আসর পাতলে ভাল হত—তা সে হবে না থাক। খাওয়া-দাওয়াটা কর!

একটু হেসে অর্চনা বললে—কি করব? বললাম—তাই করছি। ব্রজদা বসে আছে, মাংস চড়িয়ে এসেছি, সে ব'সে ব'সে ডিরেকশন দিচ্ছে। এতে সর্বনাশ সর্বনাশ করছ কেন? তোমরা কাহিনী বলছ শুনছ—বল, শোন—আমি এর মধ্যে সব করে ফেলছি!

সুলতা অর্চনাকে দেখছিল, নিবিষ্টচিত্তে এই মেয়েটিকে দেখছিল। সুরেশ্বর একটু আগে বলেছে তাকে যে, অর্চনা বিধবা হবার পর বি-এ পাশ করেছে। সংস্কৃত নিয়ে এম-এর কোর্স শেষ করে রেখেছে। কিন্তু অর্চনার কোথাও তার পরিচয় সে খুঁজে পাচ্ছে না। বেশভূষায় রকমসকমে সেই সনাতন বাঙালী মেয়ে; একটু আগে দেখেছে একখানা মটকার কাপড় সাদামাটা ঢঙে প'ড়ে তার উপর সেই পর্দার চাদর গায়ে জড়িয়ে কালীমায়ের পুষ্প এনে মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে সন্ধ্যে করতে গেল। এখন একখানা নরুনপাড় কাপড় পরেছে, সায়া ব্লাউস আছে কিন্তু সে নেহাতই লজ্জা-নিবারণ মাত্র, তার মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই। কাপড়খানায় সেকেলে বাঙালীমেয়ের মত হাতের হলুদ তেলের দাগ লেগেছে। শরীর থেকে মসলার একটা গন্ধও উঠছে।

সুলতার দৃষ্টির সঙ্গে হঠাৎ তার দৃষ্টি মিলতেই অর্চনা বললে—কি দেখছেন এমন ক'রে বলুন তো!

হেসে সুলতা বললে—আপনাকেই দেখছি।

—আমাকে? আমার মধ্যে কি খুঁজছেন? পুরুষেরা বেহায়া। কিন্তু আপনি তো তা নন।

—এমন অসাধারণ আপনি, কিন্তু কিছুতেই ধরা যায় না, আশ্চর্য সাধারণ সেজে রয়েছেন।

অর্চনা বললে—ও নিয়ে তর্ক পরে করব। তর্ক করতে গেলে রান্না নষ্ট হবে। ব্রজদা মাংস রান্নার ডিরেক্টার, গন্ধ শুঁকে ডিরেকশন দিচ্ছে, এক্ষুনি হাতা দেবার গন্ধের ইসারা পেলে হয়তো নিজেই হাতা ধরতে উঠবে, চোখে একরকম দেখতেই পায় না। হয়তো হাত-পা পোড়াবে; কিন্তু ডাকবে না।

সুরেশ্বর বললে—তা হলে তুই যা—। ব্রজদা এমন অদ্ভুত হয়ে গেল!

অর্চনা যাবার জন্যে ঘুরেছিল, কথাটা শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। বললে—ব্রজদা কি বলছিল জান? অদ্ভুতই বটে ও।

—কি বলছিল?

—বলছিল—অর্চনা, আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয় কি জানিস? আমি বললাম—কি? তো বললে—দেখ আমিই সেই শ্যামাকান্ত; বুঝলি ওই যে পতন হল—মরল। নরক ভোগ করে সে ঘুরছে। দু-তিন জন্ম পরে আবার রায়বংশে এসেছি। তেমনি চেহারা। গান গাইতেও

পারি। তেমনি ব্যভিচারী ছিলাম। তেমনি রাজ্যসম্পদ ভোগের বাসনা। এই দেখ, মারটাও কেমন খেলাম দেখ, অন্ধ হয়ে গেলাম। এখন জপ করছি দিনরাত, কিন্তু করলে হবে কি, মেয়ের গলার সাড়া শুনলে জপ ভুল হয়ে যায়! অনুশোচনারও শেষ নেই, কামনারও অন্ত নেই!

সুলতা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আপনারা এইসব বিশ্বাস করেন না কি?

অর্চনা হেসে বললে—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি বলুন? এ আবার পৃথিবী নয় জন্মান্তর। না হয় নাই মানলুম জন্মান্তর। কিন্তু ফ্যামিলী ক্যারেকটার? হেরিডিটি? ব্রজদা যা বলেছে, তাতে এ বংশের সবাই শ্যামাকান্ত। ওই যে বসে সুরোদা—। ও সমস্ত জীবনটা একরকম তপস্যা করে মেয়েদের থেকে দূরে থেকেছে। আপনাকে ভালবেসেছিল, সে যে কি ভালবাসা আমি জানি। আপনি হয়তো নাও জানতে পারেন। সেই সুরোদা হঠাৎ একদিন কুইনীকে দেখে পাগল হয়ে গেল। যখন সুরোদা রায়বংশের সব কথাই বলছে তখন এ কথাও বলবে। আমি খানিকটা আগে বলে দিয়ে যতিভঙ্গ, ছন্দোভঙ্গ করে গেলাম!

রঘু কফির কাপ হাতে ঘরে ঢুকল এবং বললে—বিরিজবাবু ডাকছেন আপনাকে।

—ওই! আমি চললাম! আমাকে ব্রজদাকে কফি দিয়ে আসিস রঘু। ঠাণ্ডা হলে গায়ে ঢেলে দেব কিন্তু।

অর্চনা চলে গেল।

সুরেশ্বর খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিল। সুলতা কফিটা তুলে নিয়ে বললে—তুমি খাও। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে আমি বুঝতে পারছি।

—উহুঁ, তুমি ঠিক করেছ। কফিটা জুড়িয়ে যাবে।

—ভাল হবে, কোল্ড কফি হবে।

সুরেশ্বর কফিটা নামিয়ে রাখলে কিন্তু খাবারটা টেনে নিলে না, অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুলতা বললে—ভাবতে বসলে যে।

—হ্যাঁ ভাবছি। ভাবছি অর্চনা একটা কথা বলে গেল। বলে গেল কুইনির কথা। হ্যাঁ সুলতা, কুইনীর উপর একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে আর্টিস্টের আকর্ষণ একটি সুন্দর রূপের উপর। কুইনী রক্তমাংসের মানবী, সুতরাং বলব না ফুলের উপর আকর্ষণের মত। তবে তা ছাড়াও একটা কথা আছে। কুইনীর কাছে আমার দেনা ছিল।

সুলতা তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে অতুলকাকার এবং মেজদিদির কনভিকশন হয়ে গেল, আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে বাড়ী ফিরলাম। রাত্রে হ্যারিস এল। বলেছিলাম তোমাকে সে যেন একটা সমন নিয়ে এল।

পরদিন ছবি আঁকব ভাবছিলাম, এমন সময় সে আবার এল হিলডার বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিয়ে, এলিয়ট রোডের বাড়ীর একখানা ঘরের উপর আর কুইনীর উপর তার অধিকারের দাবী নিয়ে ; আমি কথা দিয়েছিলাম, বিরক্ত হয়ে নিজেই গেলাম গোয়ানপাড়া। সেখানে হিলডা হ্যারিসের মুখের উপর যে জবাব দিলে, তাতে কুইনীর মায়ের পিতামহীর কলঙ্ককথা প্রকাশ ক'রে দিলে—বললে ঠাকুরদাস পালের ছেলে গোপাল পাল ভায়লেটকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই জরিমানাস্বরূপ ওই বাড়ীখানা রায়বাহাদুর তাকে দিয়েছিলেন। দলিলে লেখা আছে—ওই বাড়ী ভোগ করবে ভায়লার গর্ভের প্রথম সন্তান। এবং তারই ছেলেমেয়েরা। ভায়লার বিয়েও দিয়েছিলেন, তাকে টাকা দিয়েছিলেন। হ্যারিস অন্তবংশের ছেলে। মনে আছে তোমার। কিন্তু আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। মাথা হেঁট করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম, কুইনীর মাতামহ গোপাল পালের সন্তান নয়, গোপাল পাল নিজের জন্যে ভায়লাকে নিয়ে পালান নি। তিনি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ মডার্ন ব্যক্তি দেবেশ্বর রায়ের জন্য। রায়বংশের কলঙ্ক ঢাকা দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর সেটাকে গোপালের উপর চাপিয়ে। আমি জানতাম বলেই লজ্জা পেয়েছিলাম। কুইনীও এসব কথার উল্লেখে স্বাভাবিকভাবেই লজ্জিত ক্ষুব্ধ দুই হয়েছিল। সে এককথায় হ্যারিসকে দৃঢ়স্বরে 'না' জবাব দিয়েছিল। যার অর্থ আমি যাব না তোমার সঙ্গে এবং ঘরের অধিকারও দেব না, দুইই। বলেই চলে গিয়েছিল সেখান থেকে। আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরবার পথে ওই ছবিখানা কল্পনা করতে করতে ফিরেছিলাম। ওই পরপর উপরে উপরে তিনখানা মুখ।

প্রথমটা শ্যামাকান্তের, তার উপরেরটা সোমেশ্বরের, তার উপরেরটা দেবেশ্বরের। তারও উপরে অনেক মুখ চাপানো যায় সুলতা, আমার বাবার জ্যেঠার জাঠতুতো ভায়েদের, ব্রজদার, কার নয়, সর্বশেষ, ধনেশ্বর কাকার সেই দৈত্যাকার অর্ধোন্মাদ ছেলেটির।

পুরুষ এবং নারীর এই দেহবাদের খেলা মানুষের জীবনে পাপ স্বীকৃত হয়েছে কতকাল তা জানিনে। এবং মানুষের জীবনে যখন থেকে ভালবাসা এসেছে বিবাহ এসেছে, তখন থেকে ব্যভিচার সত্যিই পাপ—এতবড় লজ্জাও নেই আর এতবড় ধ্বংসের বীজও আর নেই। কিন্তু পাপ বলে যত সে বর্জন করতে চেয়েছে, তত সে-পাপ তাকে আশ্রয় করেছে বিচিত্রপথে। ধর্মের ছিদ্রপথে, শক্তি ও সম্পদের সিংহদ্বার দিয়ে। রাজা-বাদশাদের ঘরে হাজার দরুণে ক্রীতদাসী থাকত, লুঠে-আনা বাঁদী থাকত। ধনশালীদের ঘরেও কম থাকত না। আবার নিছক ডাকাত বোম্বেটেরাও কম যেত না। রায়বংশে এই দুটো পথ দিয়ে প্রবেশ করেছে এই পাপপ্রবৃত্তি। একে আমি সমর্থন করব কি ক'রে? এবং হয়তো ওই গোয়ানপাড়াতে শাড়ীপরা কুইনী আমার মনের মধ্যে এ প্রবৃত্তির স্পন্দন তুলেছিল। তাই যেন রায়বংশধর বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম। বাড়ী এসে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী খুলে পড়তে বসেছিলাম। আগাগোড়া পড়ে জানতে চেয়েছিলাম সব।

সারাটা দিন কিছু খাই নি। ১৯৩৭-এর জানুয়ারী মাস। শীতটা একটু বেশীই ছিল। রঘুয়া স্নান করবার তাগিদ দিলে বলেছিলাম—না স্নান করব না। বড় শীত পড়েছে। আর শরীরটাও খারাপ-খারাপ করছে। ভাত-টাতও খাব না। চা আর পাঁউরুটি দিয়ে যা এখানে; এখানেই খাব।

রঘুয়া চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল। ওটা ওর স্বভাব। যে কথা মনোমত হয় না তার প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কথাটা মেনে চলেও যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বলেছিলাম—কি ?

—ডাকডারবাবুর কাছে লোক ভেজি ?

—না। সে ওবেলা হবে'খন।

—কুইনিন খেয়ে নেন—ইটার সাথ—। সে হুইস্কির বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আমি সেদিন শিউরে উঠেছিলাম সুলতা। না।

ধর্ম সম্পদ শক্তি তিন যখন ব্যভিচারে প্রমত্ত করে মানুষকে তখন ওই বস্তুটাই তার প্রথম উপকরণ। না—; খাব না।

পড়তে শুরু করেছিলাম রায়বাহাদুরের ডায়রী। এই সময় আর একজন এলেন—কালীবাড়ীর পূজক। চরণোদক এবং নির্মাল্য নিয়ে এসেছেন রায়বাড়ীর সবচেয়ে মোটা শরীক এবং সম্পদশালী বংশধরটিকে দেবার জন্য।

এটার ব্যবস্থা করেছিলেন মেজদি। তিনি ধমকে বলে এসেছিলেন—রায়বাড়ীর অন্য শরিকেরা ঠাকুরবাড়ী গিয়ে পাতা পেড়ে খেয়ে আসে। ও যায় না। সকলের সঙ্গে ওর তুলনা চলে না। ওকে নিত্যি এসে দিয়ে যাবেন—চরণোদক পুষ্প!

কথাটা মানতেন পূজকেরা। শুধু ভয়েই নয় খানিকটা শ্রদ্ধাও ছিল। আমি কীর্তিহাটে আসবার পর থেকে, দেবসেবার জন্যে মেজদিদি অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুরদের অভাব মিটেছিল।

আমি পূজককেও বলেছিলাম—না।

তারপরই বলেছিলাম—মানে, ওই তাকে রেখে যান, পরে আমি খাব। পুষ্প মাথায় ঠেকাব। এখনও স্নান করি নি, বাসি কাপড় ছাড়া হয় নি।

ধর্মের উপরে আমার সেদিন হুইস্কির চেয়েও বেশী ভয় হয়েছিল। শুধু ভয় নয়, বিরাগ—তীব্র বিরাগ আমার মনে জেগে উঠেছিল। সম্পত্তি পূর্বপুরুষের, দেবতা তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। তাছাড়া মনে পড়েছিল ভবানী দেবীকে। তাই ঘৃণা করতে পারি নি। মানুষের জীবনের বিষ বলতে পারি নি। নইলে—তাই সেদিন বলতাম উচ্চ কণ্ঠে এবং সম্পত্তি দেবোত্তর নইলে বলতাম—আর এক পয়সাও দেব না আমি পূজোর জন্যে।

একটানা পড়ে গিয়েছিলাম রত্নেশ্বর রায়ের দিনলিপির মধ্যে তার বংশকথা। রায়বাহাদুর

বংশকথা শেষ করেছেন শ্যামাকান্তের মৃত্যুতে। তারপর রায়বাড়ীর বিবরণ রায়বাহাদুরের দৈনন্দিন ডায়রীতে তারিখে তারিখে লিখে গেছেন।

যখন শেষ করলাম বংশকথা তখন বেলা অপরাহ্ণও পার হচ্ছে। অভিভূত চিত্ত নিয়ে উঠেছিলাম। চোখের উপর ভাসছিল শ্যামাকান্তের মৃত্যুদৃশ্য। কানে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম শ্যামাকান্তের শেষ কথাগুলি।

বিশ্বের মহাশক্তিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি সনাতনী নারীরূপে। যিনি হবেন তাঁর ভোগ্যা তাঁর দাসী। কি ভয়ঙ্কর বাসনা, কি নিঃসীম স্পর্ধা।

প্রচণ্ড আঘাতে বারবার আহত হয়েছেন—শক্তি বাঘিনীর শিকার নিয়ে খেলার মত নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে, বারবার তিনি মা বলতে চেয়েছেন, গড়িয়ে পড়তে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর কামার্ত শক্তি পিপাসার্ত চিত্ত বারবার 'না' বলেছে। মৃত্যুকালেও তিনি অকপটকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন! বলে গেছেন আবার তাঁকে আসতে হবে বাসনা পূর্ণ করতে। মহেশচন্দ্রকে বলে গেছেন—ভবানীর বিবাহ দিয়ে অন্যায় করেছ। তার গর্ভের সন্তানসূত্রে বংশেও এই বাসনা অর্শাবে!

রায়বাহাদুর দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন, তাঁর বংশপরিচয়ের শেষে রয়েছে—আমি এ পাপকে মুছে দিয়ে যাব!

কিন্তু তা হয় নি!

বেদনা ভারাক্রান্তচিত্ত যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রঘুকে ডেকে বলেছিলাম—ওই ছত্রিঘরে ইজিচেয়ার পেতে দে। নিজে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম ছত্রিঘরে। শীতের অপরাহ্ণে সন্ধ্যায় সেদিন আকাশটা গাঢ় লাল হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা হতে তখনও আধঘণ্টা দেরী, কিন্তু সূর্য তখনই যেন আবীরের থালার মত হয়ে উঠেছে। ছত্রিঘরের মাথা থেকে পশ্চিমদিক অবারিত। একটা শালবন আছে। তার ওপারে দিগন্ত একেবারে কাঁসাইয়ের বাঁকের ওপার পর্যন্ত দেখা যায়।

ছত্রিঘরে চেয়ার পেতে ওইদিকে তাকিয়ে মনটা খানিকটা প্রীত হল। নিজে ছবি আঁকি—রঙের নেশা ধরল। আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের মত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল বললে অর্থহীন কাব্য করা হবে। এবং তা ভাবিও নি। তবে চোখজুড়োনো লালচে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন খানিকটা সুস্থ হল।

কেমন জান—খুব একটা তীব্র শোকার্ত ক্ষোভ শান্ত হয়ে এলে যেমন হয় তেমনি। রঘুকে বললাম—কফি করে নিয়ে আয়।

মনে পড়ল মেজদিকে—তিনি থাকলে একটা সহজ সান্ত্বনা দিতে পারতেন। হয়তো বলতেন—ওরে তুই ভুল বুঝেছিস—শ্যামাকান্ত মুক্তি পেয়ে গেছেন, সিদ্ধি পেয়েছেন—ছেলের মতই মা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

না-হয় বলতেন—ওরে ভাই, জগৎশুদ্ধই ওই চলছে রে। কম আর বেশী। বেশ তো, তুই না-হয় এর প্রায়শ্চিত্ত কর। মুক্তি দে রায়বংশকে! দীক্ষা নে—মা ভাব জগৎ-সংসারকে!

রামকৃষ্ণদেবের কথা বলে বলতেন—স্বয়ং পরমহংসদেব ঠাকুর শ্যামাকান্তের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। ও কি মিথ্যে হয়!

না-হয় একটা লাগ-সই রসিকতা করতেন।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। পায়ের শব্দটা নরম। তার সঙ্গে কাপড়ের খসখস শব্দ। দেখলাম অর্চনা এবং তার পিছনে কেউ!

অর্চনা সেই কাল রাত্রে মেজদিদির জন্যে কেঁদে চলে গেছে। তার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধের সংবাদটাও দিয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম—তুই ভাবিসনে, জগদীশ কাকার কাছে গিয়ে আমি তাঁকে বলে এর ব্যবস্থা করব। ওই বউ-মরা দারোগা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে দেব না। আমি সম্বন্ধ করব—টাকাকড়ি যা লাগে ভার আমার। কিন্তু আজ সারাটা দিন তা মনে পড়ে নি। রায়বংশের পুরুষদের পাপের কথা ঘেঁটেই দিন শেষ করেছি। হয়তো তাই বলতে এসেছে। জগদীশকাকার অন্দরে কথাটা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে।

একনজর দেখেই আমি মুখ ফেরালাম। সামনের দিকে তাকিয়ে বললাম—আয়!

অর্চনা বললে—তোমার শরীর না কি ভাল নেই? স্নান কর নি—সারাদিন খাও নি?

বুঝলাম রঘু বলেছে। কথাটা স্বীকার করে নিয়েই বললাম—হ্যাঁ।

—গোয়ানপাড়ার কুইনী এসেছে। আমার কাছে গিয়েছিল। তোমাকে কি বলবে।

—কুইনী?

—হ্যাঁ। এই তো আমার সঙ্গে।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম—পূর্বমুখে, ওরা পশ্চিমদিকে মুখ করে ছত্রিঘরে ঢুকেছে। অর্চি আগে, কুইনী পিছনে একটু দূরে। সম্ভ্রম করে অর্চির সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে নি। আমার সম্মতির অপেক্ষা করছে। তাতে ছত্রির ছাদের ছায়াটা ওর মুখে বা গায়ে পড়ে নি, আকাশের লাল রঙের প্রতিফলন পড়েছে। শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে বড় চমৎকার লাগল। ওবেলার মত নয়, এবেলা সে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। ক্রশ্চান ঘরের মেয়ে, ওরা আমাদের বাঙালী হিন্দুদের থেকে আগেই কেরতা দিয়ে কাপড় পরে। ১৯৩৭ সালে তখনও আমাদের মেয়েরা কাপড় পরার এ ভঙ্গি আটপৌরে ক'রে তোলে নি। এমন রুখু চুল তখনও রেওয়াজ হয় নি। কিন্তু ওদের সমাজে এটা তখন আটপৌরে ব্যাপার।

তাছাড়া রূপ শুধু চোখই দেখে না, মনও দেখে। আমার মনটাই সেদিন কুইনীর উপর মমতাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ওর সঙ্গে যেন রক্তের আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। পরিপূর্ণ গোধূলি আলোর একটা বিশেষ রূপ আছে, যাকে বলে 'ক'নে-দেখা আলো'। কালো মেয়েও নাকি

এ আলোয় সুন্দরী হয়ে ওঠে। তাই হয়েছিল কুইনী।

অর্চনা বললে—এস কুইনী!

কুইনী বললে—নমস্কার স্যার।

—কি খবর কুইনী? হ্যারিস কি আবার গোলমাল জুড়েছে?

—না স্যার। সে চলে গেছে।

—এস ভেতরে এস।

বসতে দেবার আসন ছিল না, আমি হেঁকে বললাম—রঘু দুখানা বেতের চেয়ার আন।

অর্চি বললে—আমি যাচ্ছি। পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর খাবার কি আছে দেখি। রঘু বলেছে তুমি সারাদিন দু-টুকরো পাঁউরুটি খেয়ে আছ। শরীর খারাপ তবু ডাক্তার ডাকতে দাও নি। আমি বুঝতে পারছি—মেজদির দুঃখ নিয়ে মাথা ভার করে মন খারাপ করে বসে আছ। পুরনো কাগজ ঘাঁটছ, কি খুঁজছ তুমিই জান।

সে চলে যেতে যেতে বললে—কুইনী যা বলবে তা তোমাকে গোপনে বলবে। তার জন্যেই আমার কাছে গিয়েছিল। তুমি বল কুইনী, আমি ভিতরে যাচ্ছি। কথাটা তুমি সেরে নাও।

বুকটা ধ্বক ক'রে উঠল। গোপনে কুইনী কি বলবে? সে কি জানে তার সঙ্গে রায়-বংশের সম্পর্কের কথা? তার মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। সে দৃষ্টি তার রূপ দেখবার দৃষ্টি নয়, তার মন দেখবার দৃষ্টি!

কুইনী কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা পুরনো বড় খাম বের করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি ওগুলো কুইনী?

কুইনী মৃদুস্বরে বললে—এলিয়ট রোডের বাড়ীর দলিল আর তিনখানা চিঠি আছে এর মধ্যে। মা আমাকে মরবার সময় দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি প'ড়ে দেখবেন।

হাতে ক'রে নিয়েও আমি বললাম—হ্যারিস যদি চলে গিয়ে থাকে তবে দলিল দেখার কি দরকার আছে? যদি মামলা-মকদ্দমা করে তখন দেখব বরং!

কুইনী মৃদুস্বরে কথা বলছিল, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েছিল পূর্ণ দৃষ্টিতে। কোন সঙ্কোচ—যে সঙ্কোচ দরিদ্রের থাকে ধনীর কাছে, নারীর থাকে পুরুষের কাছে, তার একবিন্দু ছিল না তার দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু পড়ে দেখলে আমি খুশী হব!

—বেশ তাহ'লে পড়ব।

—তাহ'লে আমি যাই!

—সে কি? অর্চি আসুক।

—না। আমি যাই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, ওপারে যেতে হবে। দেরী হয়ে যাবে। আমি অর্চিদিদিকে ব'লে যাব।

সে চলে গেল—আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। শীতের সন্ধ্যের মুখটায় সূর্য অত্যন্ত দ্রুত অস্ত যায়। ওই অস্তমান সূর্যকে সামনে রেখেই সে চলে গেল কাঁসাইয়ের গর্ভে নেমে। পিছন দিক থেকে একটা শিলুটের ছবির মত মনে হচ্ছিল। অর্চনা এসে বললে—আর বাইরে না। এর মধ্যেই কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ভেতরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে। কি দেখছ?

আঙুল দেখিয়ে বললাম—কুইনী যাচ্ছে। শিলুট ছবির মত।

অর্চনা বললে—মেয়েটা ওদের পাড়ায় খাপ খায় না।

—কি ক'রে খাবে। ও শিক্ষিত। তা ছাড়া ও তো বাঙালীই। তারপর যে কথাটা জিভের ডগায় এসে পড়ল তা বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। বলতে গেলাম ও বাঙালীই শুধু নয়, ওর মধ্যে রায়বাড়ীর রক্তের সংশ্রব আছে।

আমার থমকে যাওয়াটা এত সুস্পষ্ট যে তা অর্চনার নজর এড়ায় নি। সে বললে—আর কি বল তো?

উত্তর খুঁজে যা পেলাম সে আর্টিস্টের উত্তর, বললাম—মেয়েটি বড় ভাল মডেল।

—মডেল? মানে ছবির?

—হ্যাঁ। ফিগারটি বড় ভাল। গোধূলির আলোয় ও দাঁড়িয়েছিল দেখেছিলি?

—দেখেছিলাম। কিন্তু ওসব মতলব ছাড়। কেলেঙ্কারির বাকী রাখবে না লোকে।

—বলেছিলাম—না। সে মতলব নেই। চল।

অর্চনা যে বলে গেল সুলতা, আমি কুইনীকে একদিন দেখে পাগল হয়ে গেলাম, সে ধারণার বীজ এইদিনটির এই ঘটনা। তবে—।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—তবে একেবারে সত্য নয় এও আমি বলব না! সত্য কিছুটা আছে বৈকি। নইলে ওর ঋণশোধের জন্যে এতখানি হয়তো আমি করতাম না!

—ঋণ? সুলতা প্রশ্ন করলে।

সুরেশ্বর বললে—রায়বংশের বা আমার পিতামহের ঋণ!

—সেদিন যে পুরনো খামটা আমার হাতে সে দিয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যের পর সেখানা থেকে বের করেছিলাম তার মধ্যে যা আছে সব। একখানা দলিল। দলিলদাতা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। গ্রহীতা ভায়োলেট পিদ্রুস। যা দান করেছেন সে হল এলিয়ট রোডের বাড়ী।

দলিলখানায় বিশেষ কিছু নেই। বাড়ীটি ভায়োলেট পিদ্রুসের প্রথম গর্ভজাত সন্তান রোজারিও পিদ্রুসের সন্তান-সন্ততিরা পাবে। ঈশ্বর-না-করুন যদি রোজারিও বা তার সন্তানের বংশ না থাকে তবে ওই বাড়ী ক্রশ্চান আইনমতে তার অন্য উত্তরাধিকারী পাবে। দানের

কারণ হিসেবে লিখেছেন—ভায়োলেট পিক্রুসের পিতা পিক্রুস এবং তার ভাই পিক্রুস একসময় বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায়কে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।

সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ছত্র। এর মধ্যে ফাঁক আছে। সে ফাঁক মারবার বা গোপন করবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। ফাঁকটা এই স্থূলতা যে, ভায়োলেটের বাপ-ভাইয়ের উপকারের মূল্য হিসেবে যে বাড়ী দান করছেন, সে বাড়ী ভায়োলেটকে দান করছেন না কেন বা তার গর্ভে রোজারিওর পরে যারা আসবে তারাই বা পাবে না কেন ? গোপাল পাল বা ঘোষের নাম দলিলে নেই।

এরপর ছিল দুখানা চিঠি।

একখানা রায়বাড়ীর এটর্নীর চিঠি। তিনি ভায়োলেটকে লিখছেন—রোজারিও পিক্রুসের মা হিসেবে। লিখছেন—"ম্যাডাম, তোমার ছেলে রোজারিও পিক্রুসের লেখাপড়া এবং শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের জন্য আমার মক্কেল মিঃ ডি রায় (জানবাজার-বাসী) সর্তসাপেক্ষে মাসিক একশত টাকার ব্যবস্থা করেছেন। এবং আপনার নিজের জন্য আজীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকারও ব্যবস্থা ক'রে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। রোজারিও পিক্রুস সম্পর্কে শর্ত এই যে, রোজারিওকে কোন উপযুক্ত মিশন স্কুলে পড়তে হবে, থাকতেও হবে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংএ বা অপর কোন উপযুক্ত মিশন বোর্ডিংএ। এই খরচ সে তার আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত পাবে। কোন কারণেই লেখাপড়া ছেড়ে দিলে এ খরচ সে পাবে না। আপনার সম্পর্কে কোন শর্ত নেই। আপনি এই ৫০ টাকা বৃত্তি আজীবন পাবেন। আপনি রোজারিও পিক্রুসকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আপিসে এলে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হবে।"

দ্বিতীয় পত্রখানা—আমার ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়ের নিজের হাতে লেখা এবং লিখেছিলেন ভায়োলেট পিক্রুসকে।

সোজা ভায়োলেট সম্বোধন। ম্যাডাম নয়, প্রিয় নয়—My dear madam তো নয়ই। শুধু—ভায়োলেট!

তোমার পত্র পেয়েছি। রোজারিও লেখাপড়া ছেড়েছে সেই কারণে তার মাসিক খরচ বন্ধ হয়েছে। এই শর্তেই তাকে খরচ দেওয়া হ'ত। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ভায়লেট যে, রোজারিও সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও সে এই বয়সেই এমন দুর্দান্ত হয়ে গেল। তাকে শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি করে তুলতে আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি, এ মনে করেও সান্ত্বনা পাচ্ছি না। তোমার সম্পর্কেও তাই ভায়োলেট। আমি তোমার সম্পর্কেও সকল খবর রাখি। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে একদিন তুমি সত্যই আমাকে ভালবেসেছিলে। এবং আমিও সে-সময়ে তোমাকে ভালবাসতাম। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভুলতে পারি না যে, তুমি এবং আমি পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ভালই করেছি। না-হলে দুজনেই নিষ্ঠুরতর যন্ত্রণা ভোগ করতাম। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না। তবুও এক্ষেত্রে এই কথাটা ছাড়া আর কথা

খুঁজে পাচ্ছি না যে, ঈশ্বর যা করেন তা' মঙ্গলের জন্যেই করেন। তোমার আজকের দুঃখদুর্দশা এ সবই তোমার কর্মফল। এর দায় বিন্দুমাত্র আমার নেই। তবু পুরনো দিনের কথা স্মরণ ক'রে এ মাস থেকে তোমার ৫০ টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দিলাম।

রোজারিওর প্রতি কর্তব্য আমি অবশ্য অস্বীকার করব না। সে লেখাপড়া করলে না। আমি খবর নিয়েছি শিক্ষকেরা তার সম্পর্কে কোন আশা করেন না। এবং তারা তাকে ইস্কুলে রাখতেও রাজী নন। এক্ষেত্রে আমি মনে করি তাকে এই সময় থেকেই কাজের মধ্যে টেনে আনা উচিত। কাজ করতে করতে সে কাজের মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তুমি তাকে আমাদের রে এ্যাণ্ড কোম্পানী—সোয়ালো লেন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো, আমি তাকে চাকরী দেব। সে এখন মাসে ৮০৲ টাকা পাবে। এবং তাকে বলে দিয়ো, কাজে গাফিলতি হলে কাজ থেকে কোম্পানী যে কোন মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

পুরনো কটিদিনের স্মৃতিকে মনে করে তোমাকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

আরও একখানা চিঠি ছিল। সেখানা রে এ্যাণ্ড কোম্পানীর অফিসের চিঠি। চিঠিখানা মিসেস পিক্রুসের নামে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

"মিস্টার রোজারিও পিক্রুসের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। সে আমাদের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল। কোম্পানী তার এই অকালমৃত্যুর কথা বিবেচনা করে তার একমাত্র কন্যার ভরণপোষণ এবং পড়াশোনার জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। তুমি এর জন্য অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা কর।"

*   *   *

চিঠি ক'খানা পড়ে আমি বিস্মিত হলাম সুলতা।

রায়বংশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা কুইনী জানে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল কি জান? মনে হয়েছিল এই চমৎকার মেয়েটি কুইনী আমার আপনার লোক। বারবার তাকে মনে পড়েছিল।

সুলতা, কুইনীকে প্রথম দেখেছিলাম মাস কয়েক আগে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে হিলডার সঙ্গে। তখন সে ফ্রক পরত। নিতান্ত কিশোরী মেয়ে। তার কোন আকর্ষণই ছিল না। তারপর এতদিন পরে আগের দিন এবং আজ তাকে দেখলাম, সে শাড়ী পরেছে। একটা নারীত্বের আকর্ষণ এসেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে মোহে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে ছুটতে চায়, সে মোহ তখনও তার ছিল না।

অর্চনা বলে গেল, তাকে একদিন দেখেই আমি পাগল হয়েছিলাম, সেটা ঠিক নয়। ওটা ওর ভুল ধারণা।

সেদিন রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি সুলতা! শুধু এই কথাটাই মনের মধ্যে ঘুরেছিল। কথার সঙ্গে কুইনী। বারবার তাকে মনে পড়েছিল। যতবার মনে করেছি ততবার অপরাধীর

মত লজ্জাবোধ করেছি। মেয়েটি ওই দলিল এবং পত্র দুখানা দিয়ে কিছু না বলে চলে গেল। কিন্তু তার মধ্যে কিছু বলে গেল নিশ্চয়। সেটা কি—তা বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'ল আমি যেমন একটি মমতা অনুভব করলাম, তেমনি কিছু বোধ থেকেই সে দিয়ে গেল! পরক্ষণেই মনই প্রতিবাদ করলে—না,—প্রচ্ছন্নভাবে তিরস্কার করে গেল। ঘৃণা জানিয়ে গেল। হয়তো কোন দাবী জানিয়ে গেল।

শেষপর্যন্ত শেষেরটাই মনে হল। তাই তো স্বাভাবিক। আমার থেকে ধনী যারা তাদের আচার-আচরণ বংশের ইতিহাসের আলোচনা তো ঘৃণার সঙ্গেই আমিও করে থাকি। তবে কুইনীই বা করবে না কেন? এটা সর্বকালের মনের কথা—কিন্তু একালে মন যেন উগ্র হয়েছে।

আগের কালে একথা মনেই থাকত। নালিশ জানালে ভগবানের কাছে জানাতো। একালে হয়তো সরাসরিই নালিশ জানিয়ে গেল মেয়েটি।

এরই মধ্যে একটা যেন পরিত্রাণের পথ পেলাম। পথটা সহজ, এই সংসারের প্রচলিত পথ। অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ। এ ছাড়া আর পথই বা কি?

একবার মন হ'ল কিছু টাকা কুইনীকে দেব। বলব—এটা তোমার পাওনা রায়বাড়ী থেকে, তুমি নাও।

আবার মনে হল—না। টাকা নয়, কুইনী যাতে সত্যি মানুষ হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করব। ম্যাট্রিক পাশ করুক। হিলডা বলছিল, ওকে মেদিনীপুর কৃশ্চান মিশন গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দেবে, সেখানে খরচ লাগলে দেব। আর মায়ের নামে গার্লস স্কুলের বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে —সেটাকে তাড়াতাড়ি ওপেন করিয়ে দিই। কুইনী ম্যাট্রিক পাশ করলে ওই স্কুলে চাকরি দেব।

কলকাতায় কৃশ্চান সমাজে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগে বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। ওঁদের সমাজ আলাদা। তাঁরা বাঙালীই। আর একটা সমাজ আছে—এলিয়ট রোডের এলাকাতেই এদের ভিড়—তারা কৃশ্চান, কিন্তু বাঙালী নয়, ভারতীয়ও নয় আবার ইংরেজও নয়। সেখানে গিয়ে যেন কুইনী হারিয়ে না-যায়। ভেবে ঠিক করছিলাম পরের দিন সকালে উঠেই যাব গোয়ানপাড়ায়, কুইনীকে ডেকে বলব—কুইনী, তোমার কাছে আত্মীয়ের দাবী নিয়েই কয়েকটা কথা বলব। তুমি শোন!

সকালে উঠেই শুনলাম রাত্রে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। অতুলকাকার এবং মেজদিদির মামলায় সরকারী পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল ছত্রিদের ছেলে শিবু সিং, তাকে কেউ জখম করেছে। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে তাদের গ্রামের ধারে একটা জঙ্গলের মধ্যে। তার ডান হাতের কব্জির নিচে থেকে আঙুল সমেত হাতখানা প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গেছে—সামান্য মাত্র চামড়ায় লেগে আছে।

শিবু সিং রাত্রে শৌচে উঠেছিল। ওদের বাড়ী গ্রামের প্রান্তে। বাড়ীর পরেই একটা পুকুর, সেই পুকুর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে শৌচে বসেছিল। এ ধরনের আক্রমণের ভয় তখন যথেষ্ট ছিল মেদিনীপুরে। গোটা মেদিনীপুরে পেডি, ডগলাস বার্জ মার্ডার কেসে সরকার সাক্ষী পান নি।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার পুলিশের কথামত সাক্ষী দেন নি বলে ট্রাইবুন্যাল ব্যর্থ হয়েছে। আর একটা কেসে নাড়াজোল খাঁ রাজাদের এক কর্মচারীর ছেলে সাক্ষী ছিল, কিন্তু রাজাসাহেবের নির্দেশে ছেলের বাপ তাকে উল্টো কথা বলিয়ে কেস নষ্ট ক'রে দিয়েছে। সেই মেদিনীপুরে, শিবু সিংয়ের বাপ সরকারী দফাদার হরি সিং পদোন্নতির লোভে আর রায়বাবুদের ওপর বংশগত আক্রোশের বশে ছেলেকে উত্তেজিত করে সাক্ষী দিইয়ে, এ সম্পর্কে চিন্তিত এবং সতর্ক ছিল না, তা নয়, খুব সতর্কই ছিল। ছেলের সঙ্গে হরি সিং পাহারা দিতেও এসেছিল। এবং দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলের বাইরে একটু দূরে।

হঠাৎ ছেলের চিৎকার শুনে বাপ ছুটে যখন গেল তখন জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল কেউ। পিছন থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি। শিবু তখন পড়ে কাতরাচ্ছে ; তার হাতখানা পড়ে আছে মাটির ওপর।

আর পড়ে আছে একখানা কুকরীর খাপ। আনকোরা নতুন। সেই খাপখানা নিয়ে পুলিশ এসেছে ওবাড়ী। খাপের চামড়ার ওপর কালী দিয়েই মালিক নাম লিখেছে শখ ক'রে ; নামটা জগদীশ্বর রায়।

সুলতা, জগদীশ্বর কাকার কথা বলেছি। অর্চনার বাবা ; সবে দুদিন ফিরেছেন তীর্থ থেকে। কোন তীর্থ থেকে শখ ক'রে তিনি কুকরী কিনে এনেছিলেন, এবং খাপটার উপর নিজেই শক্ত কলমে কালী বুলিয়ে বুলিয়ে নাম লিখেছিলেন। এ খাপ্ সেই খাপ্।

বুকটা আমার কেঁপে উঠল সুলতা।

দুটি নাম এবং অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে একসঙ্গে জেগে উঠল। জগদীশ্বর কাকার কুকরীর খাপ! অর্চনা তাঁর মেয়ে। অতুলের সহকারিণী! তারপর অসংখ্য প্রশ্ন। কিন্তু সে-সব প্রশ্ন ঢাকা দিয়ে অর্চনাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠল বড় হয়ে। তাই বা কেন, ওই প্রশ্নটাই একমাত্র প্রশ্ন হয়ে উঠল। এবার ওকে বাঁচাব কি ক'রে? এ কাজ কে করেছে সে জানে ওই সর্বনাশী মেয়েটা এবং কুকরীটা যে সেই বের করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না আমার।

অর্চনা পুরনো শ্যাওলাধরা রায়বাড়ীর মেয়ে হয়েও এ-কালের মেয়ে। অতুলের সহযোগিনী হিসেবে যা করেছে তা জানি আমি। সেদিন রাত্রে ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে আমাকে খাস কাছারীর কোথায় কি লুকোনো আছে তা বলে দিয়েছিল, সে সব মনে পড়ল আমার। মন থেকে সব মুছে গেল, ছুটে গেলাম ভিতর বাড়ী।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, একজন ইনস্পেকটার এসে বসে আছেন। সঙ্গে একদল দশ-

পনেরজন কনেস্টবল। চতুরঙ্গ-বাহিনী নিয়ে আসবার সুযোগ হয় নি। ভোরবেলা খবর পেয়ে হরি সিংহের বাড়ী এসে সমস্ত দেখে, শিবুকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই, ওই খাপটায় জগদীশ্বর রায়ের নাম পেয়েই সরাসরি চলে এসেছেন। জগদীশ্বর রায়কে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন। তার যে ছেলে কটার বারো বছরের বেশী বয়স তাদেরও ছাড়বেন না।

এ বাড়ীকে বিশ্বাস নেই। শুধু ছেলেরাই নয়, এ বাড়ীর গৃহিণীও এতে জড়িয়ে আছেন, এ প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শিবু তার এজাহারে বলেছে যে, আমি শৌচে বসেছি সেই সময়ে ঝোপের ভিতর থেকে একজন মুখে ফেটা বাঁধা লম্বা রোগা লোক বেরিয়ে আসে, আমি তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকি, তখন লোকটা হাত তুলেছে উপরে চমকে দেখলাম হাতে একটা দায়ের মত কিছু চক্‌চক্ করছে। মাথায় মারবে বলে লক্ষ্য করেছে দেখে আমি ডান হাতখানা তুলে ছিলাম রুখ্‌বার জন্য—আঘাতটা পড়ল হাতের উপর। আমার চিৎকারে বাবা 'কি হ'ল' বলে ছুটে আসতে আসতে লোকটা এদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তাকে চিনতে আমি পারি নি। তবে লোকটি অল্পবয়সী ছেলেছোকরা নয়, বয়স হয়েছে, আর তার গায়ে মদের গন্ধ ছিল।

বিবরণ প্রায় বারো আনা জগদীশ্বর রায়ের সঙ্গে মিলে যায়। তবে জগদীশ্বর কাকা রোগা নন, তার শরীর এখন যে রকম, তাতে তাঁকে স্থূলকায়ই বলা যায়!

এ ছাড়া আরও একটা জায়গায় গরমিল হচ্ছে। সেটা হ'ল এই যে, গতকাল সকালবেলা থেকেই রায়বাড়ীর বড় মেজতরফ অর্থাৎ শিবেশ্বর রায়ের প্রথমপক্ষের সন্তানদের কেউই বাড়ীতে নেই। তাঁরা সকালে এখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। বাড়ীতে নেই। তাঁরা গেছেন তাঁদের মামার বাড়ী। হাওড়া জেলায় 'বাগনান' স্টেশনে নেমে মাইল দেড়েক পথ; প্রাচীন জমিদার বাড়ী; তাদের বাড়ীতে 'রটন্তী কালী' পূজা হয় সমারোহ ক'রে।

হয়তো তুমি জানো না সুলতা, রটন্তী কালীপূজা হয় মাঘ মাসের প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ছিল ঘটনার দিন।

ধনেশ্বর কাকা এবং জগদীশ্বর কাকার মামাতো দুই ভাই শুধু জমিদারসন্তান নন, তাঁরা সরকারী চাকরিতে দিকপাল ব্যক্তি। বড় ভাই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর, ছোটভাই আর্মিতে ডাক্তার হিসেবে মেজর হয়েছিলেন। দুজনেই বসবাস করেন কলকাতায়, কিন্তু রটন্তী কালীপূজায় তাঁরা সপরিবারে আসেনই আসেন। এই কালী-পূজার উপর তাঁদের অচলা ভক্তি। রায়বাহাদুর—মেজর সে যাই হয়ে থাকুন—তা এই মায়ের কৃপায়, এ বিশ্বাস তাঁদের হিমালয়ের মত দৃঢ়। তাঁদের জীবনে নজীর আছে, যে যখনই তাঁরা বিপদে পড়েছেন, তখনই এই দেবতাটি তাঁদের কৃপা করেছেন। সেই কৃপায় তাঁরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এবং যেবারই কোনপ্রকারে কোন অঙ্গহানি বা অবহেলা হয়েছে সেইবারই তাঁরা বিপদে পড়েছেন।

ছোটভাই মেজর সাহেব একবার বলেন, পেশবারে তখন পোস্টেড তিনি, তাঁর পুজোর তারিখ ভুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন সববার আসতে পারতেন না, কিন্তু পূজার দিনে নিরম্বু উপবাস করতেন। তারিখ ভুলের জন্ম তাঁর উপবাস করা হয়নি। তাঁর ডায়রীর নোট অনুযায়ী উপবাসের কথা পরের দিন। ওখানে একটু গোলমাল হয়। ত্রয়োদশী সংযুক্ত চতুর্দশী, আর পূর্ণিমা সংযুক্ত চতুর্দশী নিয়ে গোল বাধে। যাই হোক, মেজর সাহেব তখন মেজর নন, ক্যাপ্টেন। রাত্রে সেদিন তাঁর জীবনসঙ্কট হয়েছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ যাক, আমি সঠিক জানিনে, কিন্তু তিনি সেই সঙ্কটে মায়ের নাম জপ করেই পরিত্রাণ পান। এবং পরে দাদার চিঠিতে জানতে পারেন, সেইদিনই গিয়েছিল মায়ের পূজা। এবং একটি বলি নাকি বিচ্ছেদ হয়েছিল!

রায়বাহাদুরেরও এমন অভিজ্ঞতা অনেক।

শুধু তাঁরাই নন, কীর্তিহাটে শিবেশ্বর রায়ের প্রথমপক্ষের তিন সন্তান ধনেশ্বর জগদীশ্বর-সুখেশ্বর এঁদেরও পক্ষ থেকে সেখানে বলি হয়। এবং দৌহিত্র হিসেবে পূজাতে সঙ্কল্পও হয়ে থাকে। এঁদের তার জন্ম অর্থনৈতিক চিন্তা করতে হয় না, বলি ও ভোগের খরচ আসে তাঁদের মাতামহের দেওয়া জমি ও জমিদারীর আয় থেকে। বৎসরে পাঁচশো টাকা মুনাফা আজও তাঁরা পেয়ে থাকেন। জমির উৎপন্ন ধান থেকেও টাকা পান। এই রটন্তী কালীপূজার সময় গিয়েই তাঁরা মুনাফার টাকা এবং ধানের ভাগ নিয়ে বিক্রী করে টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরেন। আগে সপরিবারে যেতেন, এখন মেয়েদের এবং ছোট ছেলেদের নিয়ে যান না। যারা শক্ত সমর্থ হয়েছে, যারা অসুবিধা ভোগ করতে পারবে তাদের নিয়েই যান। তাই বারো বছরের বেশী বয়সের ছেলেদের নিয়ে তাঁরা কাল সকালে চলে গেছেন। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে বড় মেজ তরফের মেয়েরা ছাড়া কেউ নেই।

থাকবার কথা, শিবেশ্বর ঠাকুরদার দ্বিতীয়পক্ষের দুই ছেলের, তাদেরও একজন কমলেশ্বর, গাঁজাখোর, চোর, সেও দাদাদের সঙ্গে গেছে। রটন্তী পুজোর ভোজ খেতে। আছে একা বিমলেশ্বর। মুখচোরা শান্ত কুনো লোক বিমলেশ্বর কাকা। বিশ্বসংসারের কাছে নিজেকে অপরাধী অক্ষম জ্ঞান ক'রে ঘরের কোণেই বাস ক'রে। আর মালা জপ করে, ত্রিসন্ধ্যা পূজা করে। বৈষ্ণবধর্মে তার দীক্ষা। মাছ খায় না, মাংস খায় না, গলায় কণ্ঠিও প'রে। চৈতন্য-চরিতামৃত পড়ে নিয়মিতভাবে। এক হাজার আটবার পড়বার সঙ্কল্প তার, তার মধ্যে দুশো বার পড়া হয়ে গেছে। সে ঘরের কোণেই বসে আছে পুজোর আসনে।

ইনসপেকটর নায়েবকে ডেকে তার সামনে জগদীশ্বর কাকার ঘর সার্চ করেছেন। খুড়ীমাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্চনাকেও করেছেন। অর্চনা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। জগদীশ্বর কাকার বন্দুকটা পড়ে আছে তক্তাপোশের ওপর, লাইসেন্সটাও পড়ে আছে। তার সঙ্গে বহু পুরানো একখানা সরকারী চিঠি। লাইসেন্সটার সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা রয়েছে। চিঠি-

থানায় মেদিনীপুরের ডি-এম জগদীশ্বর রায়ের অসমসাহসের প্রশংসা ক'রেছেন একটা নরখাদক বাঘ মারার জন্য এবং লিখেছেন—সরকার এর জন্য খুশী হয়েছেন এবং তোমাকে একটা ডি-বি-বি-এল ব্রিজলোডিং গানের লাইসেন্স দিচ্ছেন।

আমি যেতেই ইনস্‌পেকটর বললেন—কি মশাই? আপনি কিছু জানেন নাকি?

কণ্ঠস্বর কঠিন দুর্বিনীত। কুটিল ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ এবং বাঁকা।

বললাম—কিসের?

—জানেন না কিছু, ন্যাকা সাজছেন না? শিবুকে কোপালে কে?

বললাম—না।

—কাল রাত্রে কি করেছেন? কোথায় ছিলেন?

—বাড়ীতে।

—বাড়ীতে? তাহলে এ বাড়ীর কুকরী নিয়ে ভূতে কুপিয়ে এল নাকি?

বললাম—বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু না-জানলে কি করে বলব?

—আপনারা জানেন। আপনাদিগে বলতে হবে। বলাব আমি।

ভিতরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছিল। কিন্তু কি করব? একলা আমি হলে হয়তো জবাব দিতাম। মার খেতাম। মারতে পারতাম না। কিন্তু জবাব দিয়ে মার খেয়েও অন্ততঃ তুপ্ত হতাম যে সহ্য করি নি, নির্যাতন ভোগ করেছি। কিন্তু সামনে আমার ওই সর্বনাশী অর্চনা। তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে! মাটির উপর দৃষ্টি রেখে দরজার একটা বাজুতে ঠেস দিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্সপেকটর কুকরীর খাপটা সামনে ধ'রে বললেন—কি লেখা রয়েছে চামড়ার উপর কালী দিয়ে, পড়ুন। এই লেন্স দিয়ে দেখুন। কি এটা?

—জগদীশ্বর রায়, কীর্তিহাট!

—এটা ওখানে গেল কি করে? বলুন কি করে গেল? বলুন? বলনা খুকী—অর্চনা, অর্চনা তোমার নাম, বল না কাকে দিয়েছ তোমরা? কে চেয়ে নিয়ে গেছে? বল? সুরেশ্বরবাবু? বাড়ীতে তো কাল থেকে লোক দুজন, ও বাড়ীতে উনি। আর এ বাড়ীতে ওই বিমলেশ্বর—কুনো কাদার তাল লোকটা। ওর দ্বারা এটা হয় না। লোকটা মদ খায় না, বৈষ্ণব মানুষ। শিবু মদের গন্ধ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এটা এই এঁরই কাজ, নিজে করেন নি, টাকা-পয়সা আছে। মদ খান ছবি আঁকেন, নিজের এতখানি ক্ষমতা হবে না, তবে পারেন, টাকাপয়সা খরচ করে লোক দিয়ে করাতে পারেন। ওই অতুলেশ্বরের আর তার মায়ের কেসে টাকা জলের মত ঢেলেছেন। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আনিয়েছেন। এ কীর্তি ওঁর। কুকরীর খাপটা না-পেলে কথা ছিল, ভাবতাম দলের কারুর কীর্তি। কিন্তু এই খাপ বলছে এ এই বাড়ীর কারুর কীর্তি!

হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল অভদ্র সয়তানটা—এই অর্চনা !

চমকে উঠল অর্চনা।

—বল। বল। বল বলছি !

আমি থাকতে পারলাম না আর। আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলাম—ওরই সমান চীৎকার করে বলে উঠলাম—ভদ্রভাবে কথা বলুন বলছি !

—হোয়াট ? বিকট চীৎকার করে উঠল ইনসপেকটরটা !

আমি অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললাম—আপনি এই দেশেরই লোক, হয়তো ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা বৈদ্য হিন্দু। ভদ্রবংশের সন্তান আমরা—

—চোপ্ চোপ্ চোপ্—। ওসব বাক্যি বাসী হয়েছে, ওসব রাখ্—সত্যি কথা বল। নইলে বুটশুদ্ধ তোর বুকে চড়ে নাচব। আর এই রুল—তাকাল সে অর্চনার দিকে।

শিউরে উঠেছিলাম। অর্চনা থরথর করে কাঁপছিল। দুহাতে শক্ত ক'রে সে দরজার বাজু চেপে ধরলো। ঠিক এই সময় সুলতা, যা ঘটল, তার মত বিস্ময়কর ঘটনা আমার জীবনে বোধহয় ঘটে নি !

পিছন দিক থেকে একটি মৃদু কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হল—ওরা নয় ইনসপেকটর বাবু, আমি—আমি শিবুকে কুপিয়েছি।

চমকে ফিরে দেখলাম—দাঁড়িয়ে আছে বিমলেশ্বর। লম্বা রোগা মানুষটি, হাতে তার একটা কুকরী। কুকরীটা নামিয়ে দিয়ে বললে—এই নিন সেই কুকরীটা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। ইনস্পেকটর পর্যন্ত।

বিমলেশ্বর বললে—কাল সকালে যখন মেজদা'রা বাগনান গেল, যখন বউদি, অর্চনা ওঁদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছিল, তখন ফাঁক পেয়ে ঘরে ঢুকে আমি কুকরীটা চুরি করে এনেছিলাম। এনেছিলাম এই জন্যে। মদ আমি খাই নি জীবনে। আমার বষ্টুম মন্ত্র। কিন্তু ওই গোপাল সিং-এর নাতি হরি সিংয়ের বেটা আমাদের বাড়ীর পাইকের বাচ্চা, আমাদের ইস্কুলে ফ্রিশিপে পড়ত, যে ভাবে আমার মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে জেল খাটালে, সেটা—।

হঠাৎ চুপ করে গেল সে !

আমরাও সকলে চুপ করে রইলাম। কারুর কথা বলবার শক্তিও যেন ছিল না। একটা শব্দে আমাদের সে ভাবটা কাটল। দেখলাম—অর্চনা মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে। সম্ভবতঃ চেতনা হারিয়েছে ; এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারে নি।

মেজখুড়ীমা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অর্চনার পাশে বসে ডাকলেন—অর্চনা ! অর্চনা।

অর্চনার সাড়া ছিল না। ইনস্পেকটর বললে—সেন্সলেস হয়ে গেছে। মুখে চোখে জল দিন।

বিমলেশ্বর অর্চনার এই অবস্থায় বিচলিত হন না। সে বললে—আমি দেশটেশ বুঝি না ; স্বাধীনতা টাধিনতা নিয়েও আমি মাথা ঘামাই না। আমি ভগবানকে ডাকি, আর ঘরের মধ্যে থাকি। কারুর অনিষ্টে নেই ইষ্টেও নেই। কিন্তু হরি সিংয়ের বেটা শিবু সিং, যার ঠাকুরদার বাবা গোপাল সিংকে আমার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর পথের ভিখিরী করে সাজা দিয়ে একটা ভাঁড় দিয়েছিলেন হাতে। দয়া করে জমিজেরাতও কিছু দিয়েছিলেন। তার এই শয়তানি, রায়বংশের গিন্নীর হাতে দড়ি পরানোর শয়তানিতে, আমার মনে বুকে আগুন জ্বলেছিল। ব'সে ব'সে ঘরে ভেবেছি আর কপালে ঘা মেরেছি। পরশুর আগের দিন খবর এসেছিল, মায়ের জেল হয়েছে। সুরেশ্বর তখনও ফেরেনি। পরশু সারাদিন যত ভেবেছি, তত পাগল হয়েছি। রাত্রে তুলসী-মালা ফেলে দিয়েছি। কালী মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলেছি, মা, তোমার শরণ নিলাম। তুমি বল দাও, সাহস দাও। কাউকে কিছু বলি নি। মনে মনে সঙ্কল্প করেছি শোধ নেব। আগের রায়বাড়ী হলে বরকন্দাজ পাঠাতাম, ধরে আনত বাপ-বেটাকে। কাছারীর থামে বেঁধে চাবকাতাম। ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতাম। ঘরে আগুন লাগাবার কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতে ওদের মেয়েছেলেগুলো কষ্ট পেত। ঘর আবার নতুন হত। ভুলে যেত। তাই মনে মনে বিচার ক'রে ওই শিবুকেই সাজা দেব ঠিক করে-ছিলাম। খুন—খুনই করে ফেলব। নয় এমন জখম করব যে, যেন সারাজীবন মনে থাকে। রাত্রে বাবাকে স্বপ্ন দেখেছি! কাল সকালে উঠে ভেবেছিলাম জগদীশদার বন্দুকটা চুরি ক'রে গুলি করে মারব বেটাকে। সকালে যখন দাদারা বাগনান গেল, তখন মেয়েছেলেরা সব নিচে, ঘরখানা খোলা পড়ে ছিল, আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু বন্দুকটা নিতে গিয়ে নিলাম না। এতবড় জিনিসটা সামলাব কি করে? আর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ হবে। চোখে পড়ল নতুন কুকরীটা রয়েছে মেজদা'র বিছানার তলায়। ওইটেই বের ক'রে নিয়ে এলাম। লুকিয়ে রাখলাম। সারাদিন কালীমন্ত্র জপ করলাম। সন্ধ্যের সময় স্ত্রীকে বললাম—আমি যাচ্ছি বলরামপুর বাবাজীর আখড়ায়, ওখানে আজ কীর্তন হবে, ফিরতে রাত্রি হবে আমার। এখন যেতে হবে আটদিন। অষ্টাহ নামগান। স্ত্রী সন্দেহ করে নি। মধ্যে মধ্যে যাবার মধ্যে বলরামপুর যাই আমি। কালীমায়ের প্রসাদী কারণ সন্ধ্যেবেলা বড়দা খায়। আজ বড়দা নেই। আমি সেই প্রসাদটা খাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস হয় নি চাইতে। গোয়ানপাড়ায় চোলাই মদ মেলে। দু একজন গোপনে চোলাই ক'রে বিক্রী করে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বড়দা'র নাম ক'রে মদ এনে মাকে নিবেদন করে খেয়ে গিয়েছিলাম। লুকিয়েছিলাম হরি সিংয়ের বাড়ীর পাশের পুকুরপাড়ের জঙ্গলে। মতলব করেছিলাম, এমনি ক'রে লুকিয়ে থাকব, একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন—একদিনও কি খিড়কীতে হাত-পা ধুতেও বের হবে না! আমার ভাগ্য ভাল যে, সেইদিনই বের হল। হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে হরি সিং আর আগে আগে শিবু। শিবু এসে শৌচে বসল পাশের জঙ্গলটাতেই। আমি সট্ করে বেরিয়ে গিয়ে

ঢুকলাম। তারপর—!

চুপ করলে বিমলেশ্বর।

নীরবে স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেলাম সবাই। সে সেই অতি কুৎসিত অতি অশ্লীল ইনস্পেকটর পর্যন্ত। ওদিকে ততক্ষণে অর্চনার জ্ঞান ফিরেছে। সে স্থির অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছে বিমলেশ্বরের কথা!

বিমলেশ্বর বললে—আমার রক্তমাখা জামাটা আছে। সেটা নষ্ট করতে পারি নি। সেটাও আমি এনে দিচ্ছি।

এতক্ষণে ইন্সপেক্টর বললে—না। দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে আমি যাব। ঘরটা সার্চ করব। একলা আপনাকে যেতে দেব না। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি নি। আপনাদের বাড়ীর নাড়ী নক্ষত্র আমরা সংগ্রহ করেছি। আপনি এ কাজ পারেন এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। কিন্তু। একটু হেসে বললে—মানুষ সব পারে। কিছু অসাধ্য নাই।

সুরেশ্বর চুপ করলে। তারপর বললে—বিমলেশ্বরকে হাতকড়ি দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে বিমলেশ্বর—সুরেশ্বর, দাদারা কেউ নেই, কমলেশ্বরও নেই, তোমাকেই বলে যাচ্ছি, ওরা রইল। দেখো একটু। ওরাও তোমার সঙ্গে একই বংশ। আর আমার জন্যে মিথ্যে উকীল-টুকীল দিয়ে টাকা খরচ ক'র না। আমার কোন আপশোস নেই। আমি রায়বাড়ীর বেইজ্জতির শোধ নিয়েছি।

* * *

বিমলেশ্বরকে নিয়ে গেল, আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন অভিভূত আমি জীবনে হই নি। বিমলেশ্বরের স্ত্রী এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিমলেশ্বরের স্ত্রীকে আজকেই যাকে ভাল করে দেখা বলে, তা প্রথম দেখলাম। বিমলেশ্বর ব্রজদার বয়সী। হয়তো দু-তিন বছরের বড়। কাকীমা আমার থেকে বয়সে ছোট। বর্ধমান শহরের উকীলের মেয়ে। শুনেছিলাম শক্ত কঠিন মেয়ে। বিমলেশ্বরের অংশমাফিক টাকা-কড়ি, ধান-পান, তিনি বুঝে নিতেন। বাইরে বের হতেন না, অন্তরালবর্তিনী থেকেই এ কাজ করে যেতেন। বিমলেশ্বরকে যে কথার যন্ত্রণা-গঞ্জনা দিতেন, সে নাকি বিমলেশ্বর ছাড়া কারুর সহ্য করার শক্তি ছিল না। তাঁর বড় মেয়ে তার বয়স বছর বারো, সেই ছিল তাঁর সেক্রেটারী থেকে পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত সবকিছু। নিজে পর্দা একটু বেশী মানতেন। জগদীশ্বর কাকা যে জগদীশ্বর কাকা, তার স্ত্রী থেকেও বেশী মানতেন তিনি।

তিনি আজ বাইরে এসে দাঁড়ালেন, মাথার ঘোমটা মাথার মাঝখানে তুলে দিয়ে। তিনি কাঁদেন নি। প্রথমেই এসে কঠিন ভাষায় অর্চনাকে বললেন—হল-হল? তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল মা?

অর্চনা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কি বলছেন উনি? উনি কি

অর্চনার সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানেন ?

তাড়াতাড়ি আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—খুড়ীমা। সর্বনাশ হয়ে যাবে ! খুড়ীমা ! রায়বংশের। বুঝতে পারছেন না এ কথা ছড়ালে। বাকীটা বলতে পারলাম না।

আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললেন—আমি উকীলের মেয়ে, আমি বুঝি ! থাক। বলে তিনি গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব ? ফিরে চলে আসব ? না, আর একটু বুঝিয়ে বলে আসব ! কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে কয়েকটা কথা বলাই স্থির করে ডাকলাম—খুড়ীমা !

বিমলেশ্বরের মেয়ে শোভনা কাঁদছিল। খুড়ীমা বললেন ভিতর থেকে, আসতে বল্ ভেতরে।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম, এসে তিনি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছেন, কাঁদছিলেন বোধহয়। তখনও চোখ মুছছিলেন। উঠে বললেন—কিছু বলছ বাবা ?

—বলছি খুড়ীমা !

—বল ?

—যে কথাটা আপনি বলছিলেন খুড়ীমা—অর্চনার নাম ক'রে—

—সে তো সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ করেছি বাবা। আমি বুঝি। তিনিও আমাকে একথা বুঝিয়ে গেছেন। কাল শেষরাত্রে যখন ফিরে এলেন ওইসব করে, তখন চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিলাম। উনি মুখ চেপে ধরে বলেছিলেন—চেঁচালে এখুনি আমি নিজে মরব। সমস্ত কথা শুনে আমি কুকরীটা, রক্তমাখা জামাটা, কাপড়খানা সব নষ্ট করতে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন—খাপটা হাত থেকে পড়ে গেছে বর্ধমানের বউ। ওটা যদি পায়, তাহলে বিপদ হবে। মেজদার ঘাড়ে দায় গিয়ে পড়বে। অর্চনা ধরা পড়বেই। কিন্তু তা তো হতে দেব না আমি। তবে আর শিবুকে মেরে এলাম কেন ? সেই, ছোটমায়ের জেলের কারণ বলেই তো ! এ যে তার থেকেও সর্বনাশ। রায়বংশের কুমারী মেয়ে, পদ্মফুল ; লোকে বলে—সতীবউরাণী ঘুরে এসেছেন। এগুলো থাকবে। দরকার হলে বের করে দিতে হবে প্রমাণ হিসেবে। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে বললেন—কিন্তু ওকে ক্ষমা আমি করতে পারব না বাবা। চিরজীবনে পারব না। এ কাজ উনি নিজে করতেন কিনা জানি না। ইন্সপেক্টর ঠিক বললে—মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। উনি সেই গোড়া থেকেই ; এই কথাটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে—হায়রে কপাল, আর আমরা এমন অপদার্থ যে ব্যাঙও লাথি মেরে গেল, তাই সইতে হল ? ছোটমায়ের অতুলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে হরি সিংয়ের বেটা শিবু সিং ? নিজে থেকে থানায় গিয়ে বলে এল ! আমরা তার কিছু করতে পারলাম না ! বলতেন আর ডাকতেন, হে রাজরাজেশ্বর, তুমি তো

এখনও রয়েছ রায়বাড়ীতে! মা-কালী, তুমিও তো রয়েছ মা। এর বিচার তোমরা করবে না? অতুল ছোটমা রাজদ্রোহ করেছে, তোমাদের বিচারে শাস্তি হয় তো প্রাপ্য, হয়েছে শাস্তি হোক। কিন্তু এই নেমকহারাম, এই অকৃতজ্ঞ শিবু সিং-এর বিচার কর! রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় ওর প্রপিতামহকে শেষ করে দিতেন; তাকে রক্ষা করেছিলেন সতী বউরাণী। তার এই প্রতিদান? এর বিচার করবে না?

বাবা, একদিন অর্চনা বারান্দায় যেতে যেতে বোধহয় শুনেছিল, সে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে—ন'কাকা, চুপ কর, আর লোক হাসিও না। চুপ কর! কথাগুলো শুনলে লোকে হাসবে!

উনি অবাক হয়ে চুপ করে গেলেন, আমিও গেলাম বাবা! উনি বললেন—কেন অর্চনা?

হেসে অর্চনা বললে—সে কি হাসি বাবা, দেখলে মরা-মানুষের অঙ্গেও জ্বালা ধরে। বললে—রাজরাজেশ্বর কি তোমার দারোয়ান না বরকন্দাজ, যে শিবু সিংকে তোমার হুকুমে ঘাড় ধরে লাঠিপেটা করতে যাবে? না মা-কালী রায়বাড়ীতে নবাবী আমলের তাতারিণী প্রহরিণী যে, তলোয়ার হাতে শিবুকে কাটতে ছুটবে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! দুঃখ হয়েছে, ভগবান দুঃখ দূর কর। ভগবান ঝাড়ু হাতে জমাদারের মত দুঃখের জঞ্জাল সাফ করতে আসবেন, সুখ রয়েছে আরও সুখ দাও, তো ভগবান ঝুড়ি ভর্তি আরও সুখ মাথায় করে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হবেন। চারটি খেতে দাও, পরতে দাও কি এই জন্যে? যারা নিজের দুঃখ নিজেরা দূর করতে পারে না, তার দুঃখ ভগবানের বাবা এসেও ঘোচাতে পারে না। বলি হ্যাঁ ন'কা, খাবার সময় তো নিজে যোগাড় করে এনে রেঁধে-বেড়ে হাতে তুলে খাও। তা দুঃখ নিজের হাতে ঘোচাতে পার না কেন? অপমানের শোধ তাই বা নিজে নিতে পার না কেন?

অবাক বাবা—, অবাক হয়ে গেলাম! উনি বললেন—তুই তো মিথ্যে বলিসনি অর্চনা! কথা তো ঠিক! কিন্তু শিখলি কার কাছে?

বললে কি জান? বললে—তুমি যে গোবিন্দের পূজো কর—সেই ঠাকুরের কাছ থেকে। মহাভারত পড়, পুণ্যের জন্যে পড়। ভাব তো কুরুক্ষেত্রের কথা; ঠাকুর তো দেহধারী, তখন—তিনি তো ইচ্ছে করলেই পাণ্ডবদের অপমানের প্রতিকার করতে—তাঁর চক্রকে ডেকে বললেই পারতেন—যাও চক্র, কৌরবদের সবংশে ধ্বংস করে দাও। কে আটকাতো বল? কিন্তু তিনিও তা করেন নি, পাণ্ডবরাও তা বলে নি। পাণ্ডবরা যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করেছে—অপমানের শোধ নিয়েছে।

বলে আর দাঁড়ায় নি তখন—চলে গিয়েছিল। আমি বাবা তখনও ভাবতে পারিনি—এর ফল এই হবে। বরং ভালই মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল এই যে ওর উঠতে-বসতে ঠাকুর আর ঠাকুর, যা করেন তিনি, এটা যদি এতে ঘোচে তো ঘুচুক। জান তো কোন কাজ করতেন না, যা করতাম আমি। উনি বছরে গোটা কুড়ি টাকা খরচ করে লটারীর টিকিট কিনতেন।

যতবার বলেছি—কিছু কর, তা করেন নি! ভেবেছিলাম—অর্চনার কথায় যদি এই ঘোরটা কাটে তো কাটুক!

এরপর বাবা অর্চনার কাছে উনি যেতেন। ডেকে কথা বলতেন। আমি কান দিই নি। অর্চনা বলছে বলুক!

কাল দুপুরে, রান্নাঘর থেকে দেখলাম—অর্চনা একটা কালো কিছু হাতে ক'রে ঘরে ঢুকল—কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি—অর্চনা নিজে কুকরীটা ওঁকে দিয়ে গিয়েছিল। হয়তো উনি চেয়েছিলেন তা' হতে পারে। তবে দিয়ে গিয়েছে ও। ওই সর্বনাশী।

আমি খুব বিস্মিত হই নি! কুকরী অর্চনা বের করে দিয়েছে—এ সন্দেহ আমার গোড়া থেকে। কিন্তু অর্চনা যে—তার বুকে আগুনও জ্বালিয়েছে, এ সন্দেহ হয়নি। অর্চনার এই নতুন চেহারায় আমি ভয় পেলাম!

খুড়ীমা বললেন—আমি ওকে অভিশম্পাত দেব বাবা সুরেশ্বর। দেখো তুমি, ও যেমন একটা নিরীহ মানুষের এমন সর্বনাশ করলে—আমার কপালে এমন করে আগুন জ্বালিয়ে দিলে, এর ফল ওকে পেতে হবে। ও জীবনে সুখী হবে না। বিয়ের বাসরে বিধবা হবে। হয়তো নিজের স্বামীর মৃত্যুর হেতু হবে ওই। এই আমার মত—আমার মত—দুঃখ ওকে পেতে হবে।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বলুন। মনের ক্ষোভটা বেরিয়ে যাক! পরে যা হয় হবে—এখন পুলিশের হাত থেকে অর্চনা বাঁচুক।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন—তোমার অনেক টাকা আছে সুরেশ্বর। আর সম্পত্তি সমস্ত পত্তনী দরপত্তনী হয়ে তোমার হাতে। তুমি ওই সিংদের উচ্ছেদ করবে—বল! এর শোধ নেবে!

কি করব? বললাম—করব।

বিবিমহলে ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম, মনে হচ্ছিল এই অভিভূত অবস্থা থেকে বুঝি কোনদিন মুক্তি পাব না। এই রায়বাড়ীর মধ্যে থেকে কিছু একটা; কিছু একটাই বলি কেন, তার ভালো-মন্দ সব কর্মের ফল একটা অজগরের মত কোন গর্ত থেকে বেরিয়ে আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। এ থেকে বোধহয় আমার আর মুক্তি নেই। শ্যামাকান্তের, সোমেশ্বরের, বীরেশ্বরের, রত্নেশ্বরের, দেবেশ্বরের, আমার জ্যেঠামশাইয়ের, বাবার সব কর্মফলের স্বাদ কেউ যেন আমার বুকে বসে আস্বাদন করাচ্ছে। শুধু তাই বা কেন, ব্রজদার কর্মফলের স্বাদ গ্রহণ করে তার দামও আমাকে মাথায় ব'য়ে দিয়ে আসতে হয়েছে।

ভাগ্য নিয়তি এ মানতাম না। আজও মানি না। তবে কর্মফলের ফলভোগ করতে হয় এবং বংশানুক্রমে সে বহুদূর প্রসারিত, এ-কথা আর না মেনে পারি না। সবিস্ময়ে সেদিন

ভাবছিলাম গোপাল সিংয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা হচ্ছিল, ওই অর্চনা মেয়েটার জন্যে এ-মেয়েটাও এই পাকচক্রে জড়িয়ে পড়েছে। পুড়ে ছাই না-হয়ে যায়। ন কাকীমা ওকে অভিশম্পাত দিলেন। অভিশম্পাতে কিছু হয় না, কিন্তু কর্মচক্রের ঘুরপাকের পাকই শুধু নেই, ওর একটা নেশাও আছে। সে-নেশা কি ছাড়বে ও ?

ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার নায়েব এসে ঢুকল। বললে—বিমলেশ্বরবাবুকে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে গোটা গ্রামটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সামনে দশজন কনেস্টবল, পিছনে দশজন।

কি বলব! চুপ ক'রে রইলাম। নায়েব বললে—উদ্দেশ্য ভয় দেখানো। সরকারের তরফে সাক্ষী দিয়েছিল শিবু, তাকে জখম করার ফল দেখ। শিবুর বড় ভাই তাদের সঙ্গে যাচ্ছে আর বলছে—দেখ বাবা, গোপাল সিং ছত্রির অপমানের শোধ দেখ!

কথাটা যেন খচ ক'রে বুকে এসে বিঁধল সুলতার। গোপাল সিংয়ের অপমানের শোধ। কিন্তু গোপাল সিংয়ের অপরাধ!

হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যেন ডাকলে—সুরেশ্বর রয়েছ ?

নায়েব বললে—দয়াল ভট্টাচাজমশায়। শুনলাম উনি দেখে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদেছেন। বোধহয় এই কথাই বলতে এসেছেন।

বললাম—যান, নিয়ে আসুন।

প্রায় আশী বছরের বৃদ্ধ। এখনও বেশ সবল আছেন। নিজে এখনও সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যান। তিনি এসেছেন।

একা তিনি নন, আমাদের জ্ঞাতি উরু ভটচাজ, তিনিও এসেছেন।

দয়াল ভটচাজ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের জ্ঞাতিভাই। বয়সে অনেক ছোট। রায়-বাহাদুরের মেজ ছেলে শিবেশ্বর রায়ের বন্ধু। বয়সে বড় ছেলে দেবেশ্বর রায়ের থেকে দু'-চার বছরের বড়। কিন্তু দেবেশ্বর রায় ছিলেন সে আমলের এলিট, ইংরিজীতে অতিপারঙ্গম, সাহেবী মেজাজের মানুষ। আর আভিজাত্য-গৌরবে অতি উচ্চশীর্ষ। সম্পদের এবং বংশ-গৌরবের উচ্চপীঠ থেকে কখনও মাটিতে নামতেন না। বাল্যবয়সে গোপাল পালের সঙ্গে যে প্রীতি হয়েছিল, সেটা ঠিক প্রীতি নয়, ভক্তের প্রতি দেবতার বাৎসল্যের মত প্রেম। কীর্তিহাটের লোকেরা তাঁর নাগাল পেত না। তাই তাঁদের বয়সীরা সকলে আশ্রয় করেছিল শিবেশ্বর রায়কে। দয়াল ভটচাজেরা বংশানুক্রমে রায়বংশের গুণমুগ্ধ, প্রেমমুগ্ধ। সে কুড়ারাম রায় ভটচাজের আমল থেকে। দয়াল ভটচাজের প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় ভটচাজের অনুগত জ্ঞাতিভাই হিসেবে তাঁর সম্পত্তির তদ্বির-তদারক করতেন। কুড়ারাম রায় ভটচাজ তাঁকে বেতন দিতেন। তাছাড়াও তাঁকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গল, রায় যদুরামের দেওয়া লাখরাজ ছিটমহল, চিতারং-এর আবাদী জমির সবটুকুই তাঁকে দিয়ে যজমান-

সেবী ব্রাহ্মণ থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে। একে জ্ঞাতি, তার উপর উপকৃত এই পরিবারটি দয়াল ভটচাজ পর্যন্ত চারপুরুষ ধরে রায়বাড়ীকে সম্ভ্রম ও মমতা ত্বই নিয়ে আঁকড়ে ধরে আছেন। কখনও রায়বংশের নিন্দা শুনতে পারেন না। তাঁদের দুঃখের দিনে তার ভাগ নিতে এগিয়ে আসেন সর্বাগ্রে। আজ দয়াল ভটচাজ এসেছেন। সঙ্গে উরু ভটচাজ এসেছে। উরু ভটচাজ ধনেশ্বর রায়ের বন্ধু, থিয়েটার-পাগল, নিঃসন্তান, উল্লাসময় মানুষ। শিবেশ্বর রায়ের আমলে ধনেশ্বরের সঙ্গে থিয়েটার করেছেন। আমোদে-প্রমোদে-উল্লাসে শিবেশ্বর রায়ের সঙ্গী। সেই প্রীতির সম্পর্কটুকু তিনি ভুলতে পারেন না, তিনিও এসেছেন।

সুরেশ্বর বললে—বড় মিষ্ট লেগেছিল তাঁদের সেদিন। আত্মীয়তা যে এত মধুর, এর আগে ঠিক অনুভব করিনি। মেজদি, অর্চনা আমার জ্ঞাতি আত্মীয় নয়, ওরা আমার আপনজন। সম্ভ্রম করেই সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম—আসুন। বসুন! চেয়ার এগিয়ে দিতে পা বাড়িয়েছিলাম। নিজেই চেয়ার নিয়ে বসে দয়ালদাদু বিনা ভূমিকায় কিছু বলতে উদ্যত হয়েও বলতে পারলেন না। তাঁর ঠোঁট-দুটো কাঁপতে লাগল।

উরুকাকা কথা বললেন—বললেন—ঠাকুরদা সেই তখন থেকে কাঁদছেন। বিমলেশ্বরের কোমরে দড়ি বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে—। ওঃ, সে বড় মর্মান্তিক দৃশ্য, ওঃ।

দয়ালদাদু বলে উঠলেন—কাঁদতে কাঁদতেই বললেন—এই কি দেখতে পারা যায়!

—ওঃ! ঠিক বলেছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা কাঁদছে। কাঁদবে না। রায়বংশের ছেলে। কীর্তিহাট—কীর্তিহাট রায়বংশের কীর্তিতে। তার বংশধর, তাও বিমলেশ্বরের মত ধর্মপ্রাণ ছেলে। ওঃ! কালের কি কুটিল গতি। অতুলকে ধরে নিয়ে গেল, মেজখুড়িমাকে নিয়ে গেল। লোকে গৌরব করেছে। সাবাস রায়বংশ। দেশের স্বাধীনতার জন্যে—ওঃ! আর এ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম আমি। ভাল লেগেছিল, লোকে বিমলেশ্বরের জন্যে কাঁদছে।

দয়ালদাদু বললেন—জামিনের চেষ্টা করবে না ভায়া? তুমিই তো বলতে গেলে রায়-বংশের পঞ্চপ্রদীপের একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। আর তো সব প্রদীপে তেল ফুরিয়েছে।

বললাম—হ্যাঁ, করব।

—বিমলেশ্বর নাকি বারণ করেছে?

—তা করুন। ম্লান হেসে আমি বললাম—তিনি আমার টাকা খরচের কথা ভেবেছেন, কিন্তু আমার সে শুনলে চলবে কেন?

উরুকাকা বললেন—শুধু তাই নয় ভায়া, এর শোধ তোমাকে নিতে হবে। হ্যাঁ।

দয়ালদাদু বললেন—যেমন ক'রে রায়বাহাদুর নিয়েছিলেন শোধ। ওঃ, ঋণের শেষ আর রণের শেষ এ রাখতে নেই। নিষেধ আছে। রায়বাহাদুর তা রাখতেন না। ক্ষুরধার বুদ্ধি। তেমনি বিচার! রণের শেষ তিনি রাখতেন না। কিন্তু তাঁর ভালো-মায়ের হুকুম। কি করবেন তিনি। গোপাল সিংয়ের স্ত্রী এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে নাটমন্দিরে। দয়াময়ী সতী-বউরানী—তিনি প্রার্থী ফেরাতেন না। কি করবেন? থেকে গেল রণের শেষ। বীরেশ্বর রায় হুকুম করলেন—থাক। সতীবউরানী অভয় দিয়েছে। থাক। তবে চোখের সামনে এনে রাখ। নজর রাখবে। থাক—বাঘ-ভালুক খাঁচায় পুরে রাখা জমিদারীর একটা অঙ্গ। থাক।

উরুকাকা বললেন—হ্যাঁ। গোপাল সিং একটা বাঘ ছিল। এটা ঠিক। হরি সিংয়ের মত সাপ নয়।

* * *

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের জমিদার জীবনের প্রথম কাজ শ্যামনগরের প্রতিশোধে দে-সরকারদের ঘরপোড়ানো। ট্যারা দে-সরকারের হাত ভেঙে দেওয়া। তখনও তিনি পোষ্যপুত্র হয়ে নিজের বাপমায়ের সন্তান হয়ে খাঁটি মালিক হন নি।

জন রবিনসনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল পিদ্রুস। করিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর রায় জমিদারী পেয়ে জমিদার হিসেবে প্রথম বোঝাপড়া করেছিলেন গোপাল সিংহের সঙ্গে।

তাঁর ডায়রীর যে অংশে পূর্বকথা লেখা ছিল তার শেষ কথা গোপাল সিংয়ের কথা। লিখেছিলেন—"এবার গোপাল সিং ধ্বংসযজ্ঞ। সমিধ প্রস্তুত। আমি জমিদার হইয়া তাহাতে আহুতি দিব।"

এই কথাতেই পূর্বকথা শেষ। তারপরই আরম্ভ হয়েছে তাঁর দিনলিপি ডেলী ডায়রী: সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা। ১২৬৪ সাল। সেদিনের ডায়রী লিখতে গিয়েও তিনি গোপাল সিংয়ের কথা ভুলতে পারেন নি।

সেদিন বীরেশ্বর রায় যজ্ঞ করে রত্নেশ্বরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় এই অনুষ্ঠানে বিরাট উদ্যোগ করেছিলেন। জীবনের এতদিনের সমস্ত দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা অশান্তির স্তূপকে বোধহয় এই যজ্ঞে জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিলেন।

উৎসব তখনকার দিনে যতরকম হতে পারে, করেছিলেন; কবিগান, খেমটা নাচ, বাঈনাচ, যাত্রাগান, পাঁচালী, আতসবাজী, রায়বেঁশের নাচ, তারের খেলা—কোন কিছু বাদ দেন নি।

সোফিয়া বাঈ এসেছিল। সোফিয়া বাঈ কিন্তু বাঈ হিসেবে আসেনি। সে এসেছিল সত্যকারের আত্মীয়ের মর্যাদা নিয়ে। সে কালটা ছিল বিচিত্র; গোপন পর্যন্ত ছিল না যে এই সোফিয়া বাঈই বীরেশ্বর রায়ের অনুগৃহীতা। এ মর্যাদা তাকে দিয়েছিলেন ভবানী দেবী স্বয়ং।

রত্নেশ্বর রায় কিন্তু এর মধ্যেও গোপাল সিংকে ভোলেন নি। লিখেছেন—"এই অনুষ্ঠানে গোপাল সিং আইসে নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

দেওয়ানজী গিরীন্দ্র আচার্য অনেক চিন্তা ক'রে এই অনুষ্ঠানেই একটি বিশেষ পর্ব যোগ করেছিলেন। রত্নেশ্বর বীরেশ্বর রায়ের আমমোক্তারনামার বলে এই অনুষ্ঠানেই সমুদয় খাস-মহালের মণ্ডলদের আহ্বান করেছিলেন। আগামী বৎসরের সদর পুণ্যাহের দিন ধার্য করে-ছিলেন এই দিনেই। মহলের হাটের ডাক, ঘাটের ডাক, জলকর ফলকর বনকর বাৎসরিক বন্দোবস্তির ব্যবস্থা ক'রে মৌজা বীরপুরেও ঢোলশহরৎ করে জানিয়েছিলেন বীরপুরের মণ্ডলান বন্দোবস্ত এই সময়েই হবে।

বীরপুর বন্দোবস্ত নেওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত গোপাল সিংকে নাকচ করবার জন্য অনেক খরচ করে যে বিস্তৃত জাল ফেলেছিলেন, তা প্রায় বাতিল বা নাকচ হবার সম্ভাবনা ছিল এতে। তবু তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন! কারণ এপর্যন্ত হাজার দরুনে যে সব বাকী খাজনার মামলা দায়ের হয়েছিল, তাতে বীরপুরকে মণ্ডলান তৌজি হিসেবে স্বীকার করা হয় নি। এই ঢোল-শহরতে 'মণ্ডলান' প্রথা স্বীকার করেছিলেন রায়েরা। তবে এতে গোপাল সিংকে আসতে হবে কীর্তিহাটে!

রত্নেশ্বর রায় তখন নতুন—তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হবে এতে?

—মণ্ডলান স্বত্ব ডাক হবে। অন্য লোকেও ডাকবে।

—যদি নিজে না আসে? অন্য লোক পাঠায়?

—বেনাম ডাক—নেব না। লিখে দিয়েছি। তা ছাড়া আমাদের সে রাইট আছে বাবুজী!

বলে বই খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—এই পড়ে দেখ—

"Their power to summon and if necessary to compel the attendance of their tanents was maintained."

আচার্য বলেছিলেন—হাত আমাদের লম্বা বাবুজী—খেলতে পারলেই হল। তোমার মাতুলের দোষ কি জান, বড় জেদী আর একগুঁয়ে। ওই যে ধরেছেন মণ্ডলান স্বত্ব স্বীকার করব না, তো করবই না! দেখ না আমি কি করি।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—শুনেছি বীরপুর মৌজার চার পাঁচখানা গ্রামের লোক, তার খুব বাধ্যও বটে, আবার বাঘের মত ভয়ও করে; কে ডাকতে আসবে তার সঙ্গে টোক্কর দিয়ে?

* * *

কথাটা মিথ্যে শোনেন নি রত্নেশ্বর। গোপাল সিং শ্যামনগরে গিয়ে তাঁর কাছে চড় খেয়ে শোধ নেবার জন্য দে-সরকার এবং রবিনসনের কাছে যে আস্ফালন করেছিল তা কতখানি সত্য তা যাচাই করে নিয়েছিলেন রত্নেশ্বর!

বীরপুরের গোপাল সিং সত্যই বিচিত্র চরিত্রের মানুষ !

হয়তো সে আমলটাই বিচিত্র সুলতা! সে আমলে দুচারখানা গ্রামের মধ্যে এমনি ধরনের এক-একজন লোক ছিল। যারা ছিল গ্রামের সর্বেসর্বা প্রধান। তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়, তারা সম্পত্তিশালী দুর্ধর্ষ লোক। চোর-ডাকাতকে শাসন করত, আবার আশ্রয় দিত, ধরে এনে বেঁধে মারত, আবার দারোগা ধরতে এলে তাকে লুকিয়ে রাখত। মামলায় টাকা দিয়ে সাহায্য করত, সাজা হয়ে গেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে যেত এই মানুষদের ভরসায় ! দুর্বৎসরে খেতে দিত, সুবৎসরে কষে আদায় ক'রে নিত। দারোগাকে সেলাম করত। কনেস্টবলকে 'তুম্' বলত। রাইটার আর জমাদারকে বলত—ইয়ার। মাসে মাসে খাসী, বড় মাছ, ঘি, চা'ল, দুধ, তরকারী সাজিয়ে একটা ক'রে ভেট পাঠাতো। নিজে দিত না, পরের কাছ থেকে নিয়ে দিত। সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করত, তুকতাকের কবচ মাদুলী নিত, শঙ্খনির্মাল্য নিত। কাপড় কম্বল দিয়ে বিদায় করত। কিন্তু ধর্মালোচনা করত না—শুনত না! মামলায় মিথ্যা বলত। দিনকে রাত করত, দরকার হলে খুন করাত, আবার বাত দিলে বলত জাত দিলাম। বাত রাখতে পারলে জাত থাকবে, নইলে বাতের সঙ্গে জাতও যাবে। কাউকে রক্ষা করব বললে প্রাণ দিয়ে যথাসর্বস্ব পণ করে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করত।

অধিকাংশেরই বিচার ছিল খেয়াল মত ; বুদ্ধি তাদের ছিল না তা নয়, কিন্তু বুদ্ধির সবটাই ছিল কুটিল। ওই খেয়ালের বিচারকে সমর্থন করতে প্রয়োগ করত। মদ খেত, গাঁজা খেত ; রক্ষিতা রাখত ; রক্ষিতা থাকত ঘরেই। আবার উন্মত্ত হলে ও পাপে সীমা থাকত না।

আইন এরা মানত' না। নিজের এলাকায় নিজের আইন তৈরী করত। জমিদারদের ক্ষুদে সংস্করণ। জমিদাররা এদের জন্যেই এমন হয়েছিল, না, জমিদারদের অনুকরণে বা তাদের থেকে বাঁচবার জন্য এমন হয়েছিল, তা বলতে পারব না সুলতা। সেটা অনুসন্ধান ক'রে দেখতে পার। হয়তো বা সে কালের এইটেই ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র, সমাজের চরিত্র, মানুষের চরিত্র।

গোপাল সিংয়ের কথা বলি।

গোপাল সিং বীরপুর মৌজায় বাঘ ছিল। বাংলাদেশের মাটির মানুষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ মাহিষ্য এদের থেকে কিছু স্বতন্ত্র—ভুলতে পারত না সে ছত্রি। গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমিটুকু ছিল তার। স্বচ্ছল সংসার। সম্পদ টাকাকড়ি কত ছিল বলা কঠিন কিন্তু ধান ছিল তার প্রচুর। একটা পুকুরের চারি পাড়ে খড়ের 'বড়' অর্থাৎ মোটা দড়ি পাকিয়ে তারই বেড় দিয়ে তৈরী গোলায় বাঁধা থাকত। কেউ বলে একশো কেউ বলে দেড়শো গোলা পুকুরটাকে ঘিরে, সে এক আশ্চর্য শোভার সৃষ্টি করত।

উঠত ভোরে ; তারপর ডন বৈঠক দিয়ে ছোলা গুড় আর সদ্যদোওয়া ফেনাশুদ্ধ দুধ খেয়ে, লম্বা ছিলমে গাঁজা খেয়ে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে গায়ে আংরাখা পরে, বেরিয়ে এসে একটা পাক

দিয়ে আসত মাঠে। হেঁটে যেত না, যেত ঘোড়ায়। ভাল দেশী ঘোড়া ছিল তার। পাঞ্জাবী-দের কাছে কিনত। তারপর এসে বসত দলিজার তখতপোশে। মণ্ডলান তৌজি বীরপুরের মণ্ডল সে, তার সেরেস্তা ছিল, সেরেস্তা অবশ্য জমিদারের নামাঙ্কিত। থোকা থেকে সকল কাগজপত্রেই লেখা থাকত জমিদারের নাম। রসিদ 'চেক'-এতেও থাকত জমিদারের নাম জমিদারের শীলমোহর। তবে হুকুম ছিল তার। তার হুকুমে গোমস্তা কাজ করে যেত। 'রোকা' যা দিত তাতে তার দস্তখত থাকত জমিদারের মণ্ডল গোপাল সিং ছত্রি।

তখতপোশে বসে আবার খেত গাঁজা তারপর মদ। শুধু মদ গোপাল সিং কখনও খেত না। গাঁজা খেয়ে মদ খেতো। বলতো—বাবা, কালী মায়ের বেটা আমি। নেশা করি মাকে মনে দেখবার লেগে। তা নিচে পাতি বাবাকে, তারপর তার উপর খাড়া করি মাকে। মা তখুন জিভ বার ক'রে হাসে।

সবই ছিল তার প্রকাশ্য ব্যাপার। জীবনে যা অপ্রকাশ্য তা তার স্বার্থের ব্যাপার বিষয় ব্যাপার।

গ্রামের প্রজারা এসে বসে থাকত। তাদের নালিশ শুনত। জরিমানা আদায় করত। ভেট নিত। কেউ আনত খাসী কেউ আনত তরকারি, সে শাক পর্যন্ত; কেউ আনত ঘি কেউ দুধ। খাজনা আদায় হ'ত। দরখাস্ত জানাতো।

দলিজার কাজ সেরে গোপাল সিং স্নান করতে যেত পুকুরে; ঝাঁপিয়ে পড়ত কুমীরের মত। প্রচুর সাঁতার কেটে উঠত। তারপর কালীমা গোবিন্দজী থেকে ষষ্ঠীমাকে প্রণাম ক'রে এসে খেতে বসত। সে খাওয়াও নাকি একটা পর্ব ছিল। মাছের মাথা ভিন্ন খাওয়া হ'ত না। এবং পাঁচ পোয়া চালের ভাত সে খেতো। তার সঙ্গে ছোলার দাল। তারপর ঘুম। টানা সন্ধ্যে পর্যন্ত। সন্ধ্যের সময় উঠেই নেশা-যোগ। আগে বাবার ভোগ তারপর মায়ের ভোগের প্রসাদ পেয়ে সন্ধ্যার মজলিশ। সে গ্রামশুদ্ধ লোক। সে দুপুররাত্রি পর্যন্ত। তারপর অন্দরে। তিনটি বিবাহ ছিল—তার উপর ছিল রক্ষিতা দাসী!

কিন্তু এই সব নয় গোপাল সিংয়ের। বর্ষার সময় গোপাল সিংয়ের আর এক রূপ ছিল। পাঁচখানা গ্রামের লোক আসত তার দলিজায়। বর্ষার ধান ফুরিয়েছে, চাষের সময় ধান চাই।

'গাঁজার নেশার পাটার উপর মদের নেশার বিগ্রহ চড়িয়ে' গোঁফে তা দিতে দিতে গোপাল প্রশ্ন করত—কোন গ্রামের রে তোরা বেটারা?

—পাঁচপাড়ার আমরা সিংমশায়!

—কতজনে নিবি কত ধান চাইরে শা—রা! হিসেব ক'রে বল।

—হিসেব ক'রে এনেছি সিংমশায়। চার পৌটী ধান আমাদের চাই।

মানে একশো ষাঠ মন!

গোপাল বলত—দেখ তো দাশজী, কোন কোন গোলায় পুরো এক এক পেটি ধান আছে?

দাশজী গোমস্তা বলে দিত নম্বর।

গোপাল বলত—যা এই এই নম্বরের গোলা চারটে ভেঙে ধান নিয়ে যা। খড়ের বড় তুলে রেখে যা।

তারা চলে যেত খুশী হয়ে। আর একদল এসে দাঁড়াত—আমরা সাওতা থেকে এসেছি। প্রণাম।

—তোদের কত চাই ?

—আমাদের লোক কম, দু পৌটী চাই।

—শা-লোক কম কেনে রে ? বেশী হয়ে যা না। আমি বারণ করেছি। দুটো তিনটে বিয়ে কর। বলে দাও দাশ দুটো গোলার নম্বর।

আবার অন্য গ্রাম আসত। তারা নম্বর জেনে নিয়ে চলে যেতো। 'বাখারের' খড়ের দড়ি খুলে ধান তুলে গাড়ী বোঝাই করত ; খড়ের দড়ি সযত্নে জড়ো করে রেখে যেত গোপাল সিংয়ের চাষবাড়ীতে। মেপে দেখার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু কম হ'ত না কখনও। আবার ধান উঠলে মাঘ মাসের শেষ থেকে শুরু করে গোটা ফাল্গুন ধানবোঝাই গাড়ী আসত। গ্রামের লোকেরা প্রণাম ক'রে বলত—আমরা পাঁচপাড়ার লোক ধান এনেছি।

—এনেছিস শা—রা। বেশ করেছিস। যা, যে বাখার ভেঙেছিলি সেই বাখারে ধান তুলে বড় বেঁধে দিয়ে যা। পুরো এনেছিস ?

—আজ্ঞে হাঁ। আসল সব আছে। তবে বাড়ি পুরো দিতে পারছি না সিংমশায়, এবার ফসল খারাপ।

—কত বাকী থাকল লিখে দিয়ে যা।

সিংয়ের তরফেও কেউ ধান মেপে নিত না।

শুধু এই নয়, গোপাল সিংয়ের আর এক চেহারা ছিল। বিবাদী সম্পত্তি দখল নিতে সাহায্যের জন্য লোক আসত। বিবাদী জমি দখল দিয়ে দিতে হবে সিংজী।

—কোথাকার গো ?

—নসীমপুরের।

—কার সঙ্গে, ফৌজদারি ?

—নসীমপুরের সাহাদের সঙ্গে।

—ওরা কাকে আনবে ?

—শুনছি—গোপ গাঁয়ের গোপদের।

—তারা গোপ ? শা—মরদ বটে !

—আপনাকে যেতে হবে।

—যাব। দুশো টাকা লিব।

—আজ্ঞে—

—ভাগ্ রে শা—ভাগ। আজ্ঞেতে নেই গোপাল সিং। হাঁ বললে আছে! আধা টাকা রেখে যা। আধা টাকা গিয়ে আগে লিব—তারপরে নামব। মামলা খরচা শা—তোদের।

তাই ঠিক দিনে যেত গোপাল। ফাটাফাটি ক'রে মিনিট পনেরোর মধ্যে দু চারটেকে ঘায়েল ক'রে তাদের ভাগিয়ে দিয়ে চলে আসত। দুচার লাঠি খেয়েও আসত। কিন্তু জখম হয়ে মাটি সে নেয় নি কখনও। ফৌজদারি মামলায় আসামী হত। কিন্তু বিচিত্র এ্যালিবি রেখে যেতো, যার জোরে অধিকাংশ সময় বেরিয়ে আসত।

কেউ আসত শত্রুর উপর শোধ নিতে হবে।

—কি করতে হবে?

—শিক্ষা দিতে হবে।

—বাবা লিখাপড়ি জানি না আমি। মারধর জানি। জান লিতেও জানি। বাকী কি করতে হবে বল?

—ঘা কতক উত্তম মধ্যম।

—শা—, হাত লিব না পা লিব না কান কেটে লিব তাই বল্। হাত পা ভাঙতে লিব একশো টাকা, কান কেটে লিতে দেড়শো!

জান নিতে হবে বললে বলত—কি করেছে তুমার? বেটী বহু বহেন কারুকে বাহার করেছে? তুমার কারুর জান লিছে? সি হলে পর লিতে পারি। রাখো পানশো। নাম বলো। হদিশ বলো। সাতদিনের অন্দরে লাশ মিলবে মাঠে, না তো ঘাটে, না তো রাস্তার উপর! না-হলি ভাগো!

ঘরে আগুন দিতে হলে পাঁচ দশ টাকা।

পথের মধ্যে লোকের সামনে কান মলে দিতে হলে পঁচিশ টাকা। তার সঙ্গে দুটো থাপ্পড় দিতে হলে আরও দশ টাকা। তার সঙ্গে গাঁজা মদ!

এও সব নয়। এমন যে গোপাল, থানায় তার খাতির খুব। খাসী মাছ ঘি তরকারি দুধ, মধ্যে মধ্যে টাকা, এ গোপাল দিত। কিন্তু তাই সব নয়। তার এলাকার কোন আসামীকে তার সাহায্য ভিন্ন পুলিশ ধরতে পারত না।

কিছুদিন আগে, শ্যামনগর পুড়িয়ে আসার পরই একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেকথা লোকের মুখে গল্প হয়ে উঠেছিল। সকালে দলিজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল থানার নতুন রাইটার, সঙ্গে দুজন কনেস্টবল। গোপাল সিং তাকে দেখেই 'আরে—আরে—আরে—'বলে পরম আগ্রহভরে এসে বলেছিল—চামারী সিং, কাহা জায়েগা ভাইয়া? ই বাবু?—

—আপনার ইলাকায় এলম সিংজী। ইনি নৌতুন জমাদার! বলে সে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল রাইটারবাবুর সঙ্গে।

গোপাল তাকে সাগ্রহে আহ্বান করেছিল তার বাড়ীতে। আসেন—আসেন। বসেন। তামাকুল পিয়েন। সরবত আন, পান আন, মদ আন। খাসী এনে কাট!

রাইটারবাবুটি পুরানো বন্ধু। সিংজীর সঙ্গে অনেক মদ্য পান করেছেন। তাঁর মারফতে অনেক ঘুষ নিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি কান দেন নি। তিনি আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—না। একজন ফেরারী আসামীর সন্ধানে এসেছি। খবর পেয়েছি সে এসেছে। আমাকে যেতেই হবে।

—আরে বসেন মশাই। উ শালাকে হামি হাজির করে দিব। কেনে ভাবছেন আপনি। বসেন, মৌজ করেন। মদ খান। রাত যে যা চান তাই দিব। কাল সকলে শা—কে লিয়ে মজেসে চলিয়ে যাবেন।

কিন্তু মুন্সীসাহেব শোনেননি। চলে গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সন্ধ্যে নাগাদ—অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে—শূন্য হাতে।

গোপাল আবার তাকে পাকড়েছিল। বসেন-বসেন। ই কি বাত! এই রাতে ফিরবেন, না খানা, না পিনা। তা হয় না মশা।

মুন্সীবাবু অগত্যা ছিলেন। সম্মুখে রাত্রি, পথও অনেকটা এবং ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত দুই-ই ছিলেন সকলে।

গোপাল তাদের সমাদর করে মদ্য, মাংস, খিচুড়ি, মাছের মুড়ো খাইয়ে বিছানা করে শুতে দিয়েছিল। একটি যুবতীও দিয়েছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মুন্সীবাবু। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরের মেঝেটা জলে ভিজে উঠেছে, বিছানা ভিজেছে এবং বাইরে থেকে কারা হুড় হুড় করে জল ঢালছে জানলা দিয়ে।

মেয়েটা একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালটা ছিল শীতকাল। মুন্সীবাবু ভিজে বিছানায় শুয়েছিলেন, তাঁর কাপড়-জামাও ভিজে গেছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরে পা দিতে গিয়ে কাদায় পা দিয়েছিলেন, মাটির মেঝে জলে ভিজে কাদা হয়ে উঠেছে।

এ কি?

মেয়েটা জবাব দিয়েছিল—সিংজী।

—সিংজী?

—হ্যাঁ, সিংজীর লোকেরা জানালা দিয়ে জল ঢালছে।

—কেন?

—তা জানি না।

মুন্সীসাহেব দরজায় এসে খিল খুলে দরজা টেনে দেখেছিলেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তিনি তারস্বরে চীৎকার করেছিলেন—সিংজী। সিংজী। গোপাল সিং বাবু। ও মশায়।

বাইরে অট্টহাস্য বেজে উঠেছিল। হা-হা-হা! কেমন মজা!

এটা গোপালের কৌতুক। তার রসরসিকতা এইরকম। কিন্তু শেষ রক্ষা করেছিল গোপাল। দরজা খুলে ভিজে মুন্সীকে বের করে শুকনো কাপড় পরিয়ে শুকনো ঘরে শুকনো শয্যায় শুতে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সকালে উঠেই মুন্সীসাহেব তাঁর ফেরারী আসামীকেও হাজির পেয়েছিলেন। গোপাল সিংয়ের লোকেরাই তাকে লুকিয়ে ফেলেছিল মুন্সী যেতে যেতে, আবার তারাই তাকে হাজির করে দিয়েছে মুন্সীজী উঠতে উঠতে।

গোপাল মুন্সীকে বলেছিল—এই লেও বাবা, তোমার আসামী। লিয়ে যাও। কিন্তু বাবা, গোপাল সিংকে ভিডিয়ে ঘাস খেতে যাইও না। গোপাল ঘোড়া আছে না—হাঁতী আছে, উঁট আছে। ভিডানো যায় না। বললাম—বস বাবা, মৌজ করো। শুনলে না। তাই হাতের খেল দেখিয়ে দিলম।

আসামীটাকে বলেছিল—যা রে শালা যা। বুরা কাম করিয়েছিস, সাজা লিতে হবে। আজ না লিস, কাল লিতে হবে। তা বা চলে যা। তোর 'বালবাচ্চা জরু অরু' রইল। আমি রইলম। খানে মিলবে, পরনের কাপড়া মিলবে। সো সব কুছ আমি দিব। যা।

* * *

এই গোপাল সিং।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের প্রথম দিনের ডায়রী দশ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। অনুষ্ঠানের উৎসবের বিবরণ থেকে মায়ের কোলে ফিরে আসার আবেগময় মনোভাবের বর্ণনার সঙ্গে গোপাল সিংয়ের কথা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

—সে যদি নাই আসে। তবে কি করবেন? কে ডাকবে? এই গোপালকে কে শত্রু করবে? অথচ মণ্ডলান তৌজী স্বীকার দোষ হয়ে যাচ্ছে। রত্নেশ্বর দেওয়ানকে চিন্তিতভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন।

হেসে গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—বাবুজী, লোক আছে। ডাকবার লোক আমার হাজির আছে।

—হাজির আছে?

—কে?

আচার্য ডেকে বলেছিলেন—ভগবান মণ্ডলকে ডাক তো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক দীর্ঘকায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা অনুপাতে শীর্ণকায় এক প্রৌঢ় এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিল।

ভগবান মণ্ডল অবস্থায় গোপাল সিংয়ের সমকক্ষ লোক। কিন্তু নির্বিরোধী। এতকাল পর্যন্ত গোপালের অনুগতই ছিল। সে যা বলেছে, তাই মেনেছে। কিন্তু আর মানবে না। সে ডাকতে প্রস্তুত আছে। কীর্তিহাটের জামাই সে। আচার্য তার শ্বশুর-শ্যালকদের দিয়ে তাকে জাগিয়েছেন। মণ্ডলান তুমি নাও। মাথা হেঁট করে কতকাল থাকবে?

ভগবান রাজী হয়েই এসেছে এখানে।

গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—ফৌজদারি হবেই। গোপাল ছাড়বে না। ওতেই সে জালে পড়বে। ভগবানকে সামনে রেখে লড়বে আমাদের লোক। গোয়ানদের আমি ঠিক করে রেখেছি। এই সমারোহের মধ্যেই বীরেশ্বর রায় গোয়ানদের বসতের জায়গা দিয়েছিলেন ওই সিদ্ধপীঠের জঙ্গলের পাশে খানিকটা দূরে ওই লালমাটির ডাঙ্গার উপর। একেবারে কাঁসাইয়ের ধারে। হিলডার বাবা পিক্রস ওদের সর্দার। পিক্রস তখন পঁচিশ-তিরিশ বছরের জোয়ান। রবিনসনের মৃত্যুর পর পুলিশ তার উপর নজর রেখেছে। সে রায়বাবুর আশ্রয়ে এসেছিল বাঁচবার প্রত্যাশায়।

গোপাল সিং কিন্তু আসে নি। একটা গুজব কেমন করে রটেছিল যে বীরেশ্বর রায় প্রতিজ্ঞা করেছেন গোপাল এলে তাকে ধরে কালীমায়ের স্থানে নরবলি দেবেন। বিচিত্রভাবে গুজব নিজের গড়ন নিজে নেয় সংসারে। গুজব রটেছিল বীরেশ্বর রায়ের নিরুদ্দিষ্টা সতী বউ বারো বছর কালী সাধনা করেছেন। তার উদ্‌যাপন হবে নরবলি দিয়ে। গোপাল সেই বলি।

কথাটা সেকালে অবিশ্বাস্য ছিল না। নরবলি তখনও ছিল। তান্ত্রিকেরা দিত গোপনে শ্মশানে, লোকালয় থেকে দূরে ; ডাকাতেরা বড় ডাকাতি করবার আগে অনেক সময় নরবলি দিত। জেদের ক্ষেত্রে জমিদারেরাও নরবলি দিয়েছে। নিজে গোপালও বলি হিসেবে নরবলি না-দিক, নরহত্যা কয়েকটা করেছে, তার মধ্যে একটাকে নরবলিই বলা চলে। ছিরুদাসকে সে কালীপুজার রাতে অন্ধকার মাঠে এক কোপে কেটেছে। কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে শিবপুরের ছিরুদাস একসময় দুর্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল—মানত' না সে কাউকেই। সম্পত্তিবান লোক, লোকে বলত একদল ডাকাত তার অধীনে আছে। বর্তমানে গোপাল সিং যা করে তাই সে তখন করত। বলতে গেলে গোপালের গুরুও সে বটে এবং গোপাল তাকে খুন করেই তার গদীতে বসেছে তাও বটে। স্থানীয় সম্পত্তিবান ব্রাহ্মণ কায়স্থ গন্ধবণিক তালুকদার পত্তনীদার এবং সৎগৃহস্থেরা ছিরুদাসের ঔদ্ধত্যে পীড়িত এবং লাঞ্ছিত দুইই হয়েছিলেন। শেষে তাঁরা একজোট হয়ে প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়ে কাণ্ডটা করেছিলেন। গোপাল তখন নবীন যুবক। গন্ধবণিক তালুকদার লোকাই চন্দ হয়েছিল জোটের মাথা। সেদিন কালী পুজো। লোকাই চন্দের বাড়ীতে সেদিন গোপাল হাজির ছিল। নেমন্তন্নে গিয়েছিল। রাত্রি দুপুরে পুজো। লোকাই চন্দ উপোস করে বসেছিল। গোপালও বসেছিল কাছে। ওই কথাই হচ্ছিল। গোপাল বলেছিল—হামি পারি চন্দবাবু!

—তুমি পার? হেসে বলেছিল—এত সোজা নয় গোপাল!

—না পারলে দুয়ো দিবেন। ছত্রি থেকে গোপাল খারিজ হয়ে যাবে!

মাথায় কারণের ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকের মাথাতেই হচ্ছিল কথাবার্তা। এমন সময় একজন পাইক এসে বলেছিল—ছিরুদাস এসেছে।

—ছিরু দাস।

—হ্যাঁ। কালীপুজোর খবর করতে এসেছে। নেমন্তন্নপত্ত করেছিলেন।

—নিয়ে আয়। না—আমি যাচ্ছি।

উঠে যাচ্ছিল চন্দ, গোপাল বলেছিল—হামাকে একটা তলোয়ার দিবেন? কি দাও? ঘরেই ক'খানা রামদা আর তলোয়ার সাজানো ছিল।

—গোপাল।

—দিয়া দেখেন।

—কিন্তু আমার গ্রামের মধ্যে নয়।

—ঠিক আছে। তাই হোবে।

—দেখে নিয়ে যাও!

—হামি এই দরজা দিয়ে নিকলে যাচ্ছি। একটুকুন দেরী করবেন।

ছিরু দাস চাষীর ছেলে, দুর্দান্তপনার জোরে সম্পত্তিবান হয়ে সে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাবানদের গায়ে-গা-দিয়ে বসবার শখে একজন অনুচর সঙ্গে ক'রে কালীপূজার দিন সন্ধ্যে থেকে তত্ত্বতল্লাস করতে বেরিয়েছে। সে দাঁড়িয়েছিল কালীমূর্তির সামনে। চন্দ তাকে অতিথি হিসেবেই আহ্বান করেছিল। আপ্যায়িতও করেছিল। কয়েক পাত্র কারণ পান করে উঠেছিল ছিরু দাস।—উঠলাম চন্দমশায়!

চন্দের মনে দ্বিধা হচ্ছিল। অতিথি এসেছে! তার উপর গোপাল একলা গেল যদি না-পারে, তবে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

চন্দ বলেছিল—আজ থাক না দাস।

—আজ্ঞে না। ওইটি আজ্ঞে করবেন না। বাড়ী আমাকে ফিরতেই হবে। অনেক শালা তক্কে আছে। আমি বাড়ী নাই জানলে বাড়ী মেরে দেবে। তাছাড়া গুরুর বারণ আছে—বাইরে রাত আমি কাটাব না। মানুষ ঘুমোয়—না—মরে। পরের বাড়ীতে ঘুম আর যমের দুয়োরে মাথা দেওয়া দুই সমান।

চন্দ বলেছিল—তবে সঙ্গে লোক দি, অপেক্ষা কর।

নিজের হাতের লাঠির মধ্য থেকে একটা ধারালো চকচকে গুপ্তি বার করে বলেছিল—"যাহা ছিরু দাস তাঁহাই ভীমপুর"। এই আমার দোসর। আপনাদের আশীর্বাদে মানুষ তো মানুষ ভূত প্রেত পিশাচে ছিরুকে পথ ছেড়ে দেয়।

বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল। গ্রাম পার হয়েই বিস্তীর্ণ মাঠ একটা। ছিরু চলে যাওয়ার আধঘণ্টাও হয় নি—মাঠ থেকে একটা চীৎকার উঠেছিল। সে চীৎকার ভীষণ চীৎকার। চমকে উঠেছিল চন্দ। কি হল?

গোপাল ধরা পড়ল? মরল? সে ভাবছিল লোক পাঠাবে কি পাঠাবে না। হঠাৎ ছুটে

এসে পড়েছিল ছিরু দাসের সঙ্গের লোকটা।—চন্দমশায়!

চন্দ আবার চমকে উঠেছিল।—কি হল?

হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলেছিল—সর্বনাশ হয়ে গেল হুজুর। মাঠের মধ্যে একটা গাছের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল একটা দানোর মত কি! তারপর—

—তারপর কি?

—একখানা দা দিয়ে—

—কি? কি?

—দাস মশায়কে এক কোপ। তারপর আমাকে। আমার হাতে মশাল ছিল। আমি লাঠী ধরতেই পারলাম না। দাসমশায়ও গুপ্তি খুলতে পারলে না। আমার হাতে কোপ লেগেছে। মশাল পড়ে গিয়েছে। সে দাসমশায়ের বুকে বসে কোপাচ্ছে।

লোকজন গিয়েছিল হৈ হৈ করে। স্বয়ং চন্দ গিয়েছিল। হৈ হৈ সেই করিয়েছিল। গোপাল জানে, সেটা চন্দমশায়ের ইশারা। গোপাল তখন অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে দূরে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে হেসে উঠে সেই জনহীন মাঠে বলে উঠছিল—জয়কালী!

পরদিন পরিচ্ছন্ন পোশাক প'রে মুরেঠা বেঁধে এসে চন্দকে নমস্কার করে বলেছিল—আপনার বাড়ীতে কালীপূজো হয়েছে কাল। পেসাদ লিতে এলম।

চন্দ খাতির ক'রে বসিয়ে বলেছিল—এস—এস—এস। প্রসাদ সর্বাগ্রে তোমার হে! তুমি সাধক! বস!

কথাটা গোপালের মনে পড়েছিল। গোপাল সেইজন্যে আসে নি। তবে উকীল সে পাঠিয়েছিল! উকীল মজবুদ উকীল—মহিষাদল স্টেটের নায়েব। মহিষাদলের কাছারীতেও সে গিয়েছিল। রাজাবাহাদুর তাকে তিরস্কার করেছিলেন। গোপালের বিবরণ তাঁর অজানা ছিল না। বীরেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গে যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি শীলদের সঙ্গে মিট-মাটের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কাছে গিয়েছিলেন, রাজাবাহাদুরকে যে-কথা বলেছিলেন, সবকিছুই তাঁর কানে এসেছিল। এবং শ্যামনগরে সে দে-সরকার এবং রবিনসনের সঙ্গে হাতমিলিয়ে গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে এবং রত্নেশ্বরকে পুড়িয়ে মারবার জন্য ঘরে শিকল দিয়ে বন্ধ করেছিল, তাও জানতেন।

তিনি বলেছিলেন—আমার উচিত এখান থেকেই তোমাকে বেঁধে কীর্তিহাটে পাঠানো। যাও তুমি, আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও! আমি একটি কথাও তোমার জন্যে বলব না বলতে পারব না!

গোপাল অসহায় বোধ করেছিল প্রথমটা। তারপর সে নিজেকেই নিজে বলেছিল, কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়।

তারপর ধরেছিল নায়েবকে। রাজাসাহেব এ নিমন্ত্রণে নিজে যাবেন না, তবে তাঁর

আশীর্বাদী লৌকিকতা নিয়ে যাবে তাঁর সদর নায়েব। সেই নায়েবকে ধরেছিল গোপাল এবং কবুল করেছিল—খেয়া কোনরকমে ঘর ঢুকাইয়ে দিন নায়েববাবু, আমি একশো টাকা কবুল করছি আপনের নজরানা!

* * *

সেদিন গোপাল নিজে এলে কি হ'ত বলা কঠিন! সেদিন রায়বাড়ীতে দেবতা-মন্দির থেকে, কাছারী থেকে অন্দর পর্যন্ত পরিপূর্ণ সন্তোষের একটি অতিপ্রসন্ন বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

নাটমন্দিরে হয়েছিল পোষ্যপুত্র গ্রহণের যজ্ঞ। বিমলাকান্ত অশ্রুসজল চক্ষে দান করেছিলেন কমলাকান্তকে, দান গ্রহণ করেছিলেন বীরেশ্বর এবং ভবানী দেবী। জল সকলের চোখ থেকেই গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরাও কেঁদেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাও কেঁদেছিলেন।

যজ্ঞশেষে অন্দরে লক্ষ্মীর ঘরের সামনের দরদালানে রায় পরিবারের সকলে রত্নেশ্বরকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

প্রথমেই আশীর্বাদ করেছিলেন একসঙ্গে যুগলে বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী।

সেই কাত্যায়নী দেবীর বোন বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা বসে বলে দিচ্ছিলেন ক্রমপর্যায়! এ আর এক মানুষ। বীরেশ্বর রায় পুত্রের হাতে দিয়েছিলেন নিজের হাতের হীরের আংটি। ভবানী দেবী দিয়েছিলেন একসেট সোনার বাসন।

ভদ্রমহিলা বলেছিলেন—ওমা! বাটি যে খালি গো। ওতে বাটি ভরে দুধ দাও। তুমি মা। দাও দাও। ওগো দুধ আন—দুধ আন। সন্তান নিচ্ছ—মা—ও কি সোনায়-দানায় মেলে? মেলে মায়ের দুধে। একবাটি দুধে তোমার মাই থেকে গেলে একফোঁটা মিশিয়ে দাও। না-থাকে, ওই ঘরে যাও, গিয়ে দুধে মাইয়ের বোঁটা ঠেকিয়ে দাও! তারপর মুখে অন্ন দাও দুটি। ওই অন্নপ্রাসন হল। হ্যাঁ। তারপর দুজনে বস। বীরেশ্বর আর তুমি। বউমা, তুমি ছেলেকে আগে কোলে নাও। উঠে বস ভাই রাজাবাবু নাতি আমার, রায়বংশের এ কুল ও কুল দুকুলের শিবরাত্রির শলতে—মায়ের কোলে উঠে বস। মায়ের কোলে এসে তুমি। বা-বা-বা—কি মানিয়েছে দেখ! মা দুর্গার কোলে কার্তিক! যশোদার কোলে গোপাল বলব না মা, গোপাল বড় নিষ্ঠুর, মাকে কাঁদিয়েছিলেন। মা কৌশল্যার রামচন্দ্র। এই ঠিক। ফিরে এল হারানিধি, এসে রাজপাটে বসবে! দুঃখ হচ্ছে কি জান—সীতা নাই! আঃ, আজ সীতা থাকলে কি হ'ত? আঃ, যাত্রায় গান শুনেছিলাম—অযোধ্যার প্রজারা কাঁধে ভার নিয়ে গান গেয়েছিল—'আয় ভাই ভার নিয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।' এ ঠিক তাই!

কে ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠেছিল—তুমি তো রয়েছ ঠাকুমা, সীতা হয়ে বাঁয়ে ব'স না! আনন্দের টলমল সরোবরে যেন দমকা বাতাসে একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠেছিল। মেয়েরা সব হেসে উঠেছিল খিল খিল করে। বীরেশ্বর রায়ের মত দুর্দান্ত পুরুষের সামনেও তাদের হাসতে

ভয় হয় নি!

বীরেশ্বর রায় নিজেও মৃদু মৃদু হেসেছিলেন।

ঠাকুমাটি বলেছিলেন—কে লা?

কেউ সাড়া দেয় নি। ঠাকুমা বলেছিলেন—এ নিশ্চয় অঞ্জনা! ও নইলে কে বলবে এমন কথা। মর—মর—মর। আমায় মানাবে না ভাবিস বুঝি? ওলো, আমি রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর মাসতুতো বোন্। আমাদের গায়ের রঙ সোনার মত, রূপ আমাদের লক্ষ্মীর মত! সাজলে এখনও নাতিকে ভোলাতে পারি! মরণ!

আবার হাসির রোল উঠেছিল। ঠাকুমা বলেছিলেন—থাম, হাসিস নে, শুভকর্ম হয়ে যাক। বউমা, এইবার ছেলেকে চুমু খাও, খেয়ে তুমি বীরেশ্বরের কোলে দাও। নাও বাবা বীরু, কোলে নাও ছেলে, তোমার বংশধর—তুমিও চুমু খাও।

—এইবার নাতি, তুমি বস ভাই মা-বাবার সামনে কোলের কাছে। আমরা পাঁচজনে আশীর্বাদ করি। প্রথমে আমি!

বলে ধানদূর্বার সঙ্গে একটি মোহর দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। একখানি রূপোর থালায় মোহর সাজানো ছিল, বীরেশ্বর সেখানা ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—প্রণাম কর। প্রণামী দাও।

রত্নেশ্বর রায় ঠাকুমাকে পাঁচখানা মোহর দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

পিছন থেকে সেই কণ্ঠস্বর আবার শোনা গিয়েছিল—সুদশুদ্ধ নগদ বিদেয় ঠাকুমা! সকলে আবার হেসে উঠল। এবার বেশী। যেন হাওয়াতে বর্ষার এলোমেলো মাতন লেগেছে। এবং কালটাও যেন ভরা-ভর্তি বর্ষা বলে মানিয়ে গেছে বড় ভাল।

ঠাকুমা মুখঝামটা দিয়ে বলেছিলেন—মর মর মর। এমন মুখ যদি না-হবে তো এমন কপাল হবে কেন তোর?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—কেন ঠাকুমা, কপালটা আমার মন্দ কিসে বল। কঙ্কাপুরের রাজরাণী, খুদকুঁড়োতে পেট ভরাই, রাত্রে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, বাড়ীর পাদাড়ে ঝোপে-ঝাড়ে শেয়াল ফৌজ পাহারা দেয়। রাজা আমার হবুচন্দর, খায়দায় কাঁসী বাজায়; কপাল আমার মন্দ কিসে বল?

বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, রত্নেশ্বর সকলেই এই মেয়েটির খোঁজে কৌতুক এবং কৌতূহলভরে তাকিয়ে দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পায় নি। মেয়েটি পিছনে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—মেয়েটি কে মাসীমা?

—আমারও বটে তোমার মায়েরও বটে ভাইয়ের নাতনী। আমার আপন ভাই। তোমার মায়ের তা হলে মাসতুতো ভাই। তাহলে দেখ তোমার মামাতো ভায়ের বেটী। তোমার

ভাইঝি সম্পর্কে, নাম হল অঞ্জনা। ওদের গেরামে অঞ্জনাঠাকরুণ কালীমা আছে, তার দোর ধরেই হল ওই বেটী। তা আমাকে মধ্যে মধ্যে নেকে চিঠি, তোমাদের খবর নেয়; এবারে তুমি রাজসূয় অশ্বমেধ করছ বাবা, দেশদেশান্তরের লোক এল। প্রজাসজ্জন, তালুকদার, পত্তনীদার, বড় বড় নোক, হাকিম হুকিম, তা আমিও ওকে নিকেছিলাম—আসবি—অবশ্যি অবশ্যি আসবি। চোখের সাথক ক'রে যাবি।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—বেশ করেছেন মাসীমা। উচিত করেছেন। বলা তো আমাদেরই কর্তব্য ছিল। তা আমরা তো ঠিক জানতাম না! বেশ করেছেন।

বীরেশ্বর রায় ভবানীকে বলেছিলেন—তুমি খবর করো!

এদিকে আশীর্বাদ একের পর এক হয়েই চলেছিল। রত্নেশ্বর প্রণাম ক'রে অন্য সকলকেই এক মোহর ক'রে প্রণামী দিয়ে চলেছিলেন!

আশীর্বাদের পালা শেষ হ'তেই এসেছিল প্রণামের পালা। রত্নেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে যারা ছোট তারা এবং দাসীরা ভিড় করে এসেছিল এগিয়ে। হঠাৎ ঠাকুমা বলেছিলেন—অঞ্জনা কই? ও অঞ্জনা? তুই তো বড় লো! আয় আয়। কাল তো হিসেবে হল তুই সাতদিনের বড়! আয় না লো!

এবার এগিয়ে এল অঞ্জনা। বললে—না ঠাকুমা, প্রণাম আমি নিতে পারব না। আমি সাতদিনের বড়, উনি আমা থেকে চৌদ্দ আঙুল মাথায় উঁচু। আমি মনে মনেই বলছি—ভগবান মঙ্গল করুন। মা কালী রক্ষে করুন আপদে বিপদে। জমিদার আছেন রাজা হোন। বলেই সে এগিয়ে এসে প্রথম প্রণাম করেছিল বীরেশ্বর রায়কে। একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, সুন্দর মুখশ্রী, মাথায় একরাশ ফোলা কোঁকড়া চুল, নাকটি একটু খাটো, চোখ দুটি অপরূপ সুন্দর; একটু রোগা দেখাচ্ছে। পরনের কাপড়খানা পোশাকী কিন্তু পুরনো। হাতে দুগাছি শাঁখা আর বাঁ হাতে নোয়া। একটু শীর্ণ। দেহে পরিচ্ছদে অভাব যেন প্রকট হয়ে রয়েছে।

বীরেশ্বর তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—সুখী হও মা। কিন্তু প্রণাম নেবে না কেন রত্নেশ্বরের? সম্বন্ধে বড়।

—না—না মামাবাবু। না। বলে সে ভবানীর পায়ে প্রণাম করেছিল। ভবানী দেবী তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—ছেলেপুলে কি মা?

বলে উঠলেন ঠাকুমা।—তবে আর বলছি কি মা। ছেলেপুলে হয় নি।

বীরেশ্বর বললেন—প্রণাম কর রত্নেশ্বর।

রত্নেশ্বর সর্বাগ্রে কয়েকখানা মোহর তুলে নিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হল। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে এসে হেঁট হয়ে অঞ্জলি পেতে বললে—দিন হাতে দিন। সোনা পায়ে রাখবার ভাগ্যি আমার নয়। আর প্রণাম ওই হল। রাজাবাবুর কোন দূরসম্পর্কের গরীব বোন, রাণী কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাই তার নাতি। কথায় বলে 'সইয়ের

বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউ-এর বোনঝি জামাই'। দিন।

বলে অঞ্জলি পেতে মোহর কটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল—বাবু রত্নেশ্বরকে রাজা কর ঠাকুর। ধনে পুতে সংসার ভ'রে দাও।

কণ্ঠস্বরে তার এমন আন্তরিকতা যে সকলে তার কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর সম্পর্কে ছোটদের প্রণামের পালা তারপর দাসীদের। কুটুম্ব সজ্জন—গ্রামের জ্ঞাতিদের মেয়েরা—দল বেঁধে এসেছিল। এবং তারা ভিড় করে ঠুক্ঠাক্ প্রণাম শুরু করে দিয়েছিল। এতক্ষণে রত্নেশ্বর সহজ হয়ে উঠেছিলেন। হাসিমুখে প্রত্যেকের হাতে একটি করে গিনি দিয়ে তাদের বিদায় শেষ করেছিলেন।

তারপর বাড়ীর দাসদাসীরা।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—বেলা তিন পহর হয়ে গেছে। তোমরা একসঙ্গে প্রণাম কর। তোমাদের সকলে প্রত্যেকে পাঁচ টাকা করে পাবে।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—আমার সঙ্গে আয় রত্ন। একটা কাজ বাকী আছে। আয়। বলে বলেছিলেন—মহাবীর, এখন কেউ যেন না আসে!

বীরেশ্বর রায় তখন প্রায় সুস্থ, শুধু একটা পা একটু টেনে চলতে হয়; লাঠি নিতে হয়েছে। তার সঙ্গে তিনি রত্নেশ্বরের কাঁধের উপর ভর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেলেন। দোতলায় এই মহলে তিনি ভবানী এবং রত্নেশ্বর ছাড়া কেউ থাকে না। আর একজনকে ভবানী দেবী নিয়ে এসেছেন, সে হল সোফি বাঈ। বিবিমহল বিশিষ্ট অতিথিতে ভর্তি। বাইজীর দল, খেমটার দল, সেসব অন্য জায়গায় থাকে। সোফিকে ভবানী এখানে একখানা কোণের ঘরে থাকতে দিয়েছেন। বীরেশ্বর রায় কিছু বলেন নি। রত্নেশ্বর বলেছিল—লোকে কি বলবে?

ভবানী বলেছিলেন—কি বলবে? বলবার কি আছে। আমার বাপের শেষকৃত্য আমি করতে পারি নি, ও করেছে। তারপর ছ' বছর ও ওঁর সেবা করেছে। এতেও যদি ওর থাকলে নিন্দে হয়, তবে সে নিন্দে মাথায় ক'রে নিতে হবে। তাছাড়া ওর আচার-আচরণ খাওয়া দাওয়া কোনটেতে কোন নিন্দের কি আছে বল? তুই কি ভেবেছিস রত্ন, মাসোহারার নাম করে ওর মুখ-বন্ধের জন্যে বেঁধে রেখেছিস? ছি!

রত্নেশ্বর আর কথা বলেন নি। সোফি বাঈ সেইদিন থেকেই রায়বাড়ীর তনখা নিয়ে জানবাজারেই কাছাকাছি একটা বাড়ীতে থাকে। নিত্য সন্ধ্যার সময় আসে, বীরেশ্বরের সামনে মেঝেতে বসে থাকে, ভবানী দেবী বসে থাকেন বীরেশ্বর রায়ের বিছানায়; কথাবার্তা বলেন। গল্পগুজব করেন। তারপর একখানা গান গেয়ে চলে যায়। বেশভূষা করে না সোফিয়া। হিন্দুস্থানী মেয়েদের ঢঙে লালপেড়ে শাড়ী পরে। আভরণের মধ্যে হাতে দুগাছি বালা, চুল সাধারণত এলোই থাকে। কোন কোন দিন বেণী রচনা করে সাধারণ একটা খোঁপা বাঁধে।

স্কুলের বনিয়াদ পত্তনের সময় একবার সে এসেছিল। সেবার বীরেশ্বর তাকে নিয়ে এসে-

ছিলেন, সাহেবদের এদেশী খাঁটী গান গেয়ে শোনাবার জন্যে। এবার ভবানী নিয়ে এসেছেন। তাঁদের স্বামীস্ত্রীর জীবনের শুভকর্মে সোফিকে তিনি বাদ দিতে পারবেন না। এবং প্রথমে বিবিমহলে জায়গা দিয়ে তাঁর মনটা খুঁতখুঁত করেছিল তাই তিনি এক কোণের একখানা ঘরে তাকে এনে রেখেছেন।

তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রান্না সোফিয়ার একজন হিন্দু দাসী করে নেয়। দেবতার প্রসাদও খায়। খায় না শুধু মাংস প্রসাদ। এমনিতেও সে মাছ মাংস পেঁয়াজ এসব খায় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে গেলেন ভবানী নিজের ঘরে। বললেন—বস। তারপর নিজে গিয়ে ডাকলেন সোফিকে।

সোফি উপরতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরদালানে এই অনুষ্ঠানপর্বটি দেখছিল। ভবানী এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে নিয়ে এসে বললেন—বেটাকে আশিস করো সোফি।

—আমি? বুকে হাত দিয়ে অসীম বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—আমি?

—হ্যাঁ। তুমি! বাবুজীর তুমি সেবা করেছ। বহুৎ সেবা করেছ। আমার পিতাজীর তুমি শেষ কাজ করেছ। তুমি আমার বহেন সোফি। আমার বেটা সে কি তোমার বেটা নয়? তোমার আশিস না নিলে তো ওর আশিস পুরা হবে না সোফি!

সোফি অকস্মাৎ চোখ বন্ধ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দুটি জলের ধারা নেমেছিল চোখ থেকে। তার চোখ খুলে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে হেসে বীরেশ্বরকে বলেছিল—মালিক, আপনিও কি এই হুকুম করছেন?

বীরেশ্বরও বোধহয় আবেগে বিচলিত হয়েছিলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। মুখ না-ফিরিয়েই তিনি বললেন—আমার কলেজার কথা ভবানী জানে সোফি!

সোফি এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—বহুয়া! বেটা বলব? বলেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সারাজীবন চরিত্র সম্পর্কে সজ্ঞানে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সকল রকমের ছুৎমার্গ পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু সেদিন তিনিও আবেগে অভিভূত হয়েছিলেন, তাঁর মনকে তিনি কঠোর কঠিন ক'রে রাখতে পারেন নি। তিনি মুখে উত্তর দেন নি, হাঁটুগেড়ে বসে ওই মুসলমানী বাঈয়ের পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করেছিলেন আশীর্বাদের জন্যে। সোফিয়া তার মাথায় ডান হাত ঠেকিয়ে অন্য হাতখানি উপরে তুলে চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলেছিল—মেরি জিন্দিগী সফল হো গয়ি। আল্লা মেহেরবান, আমার এই বেটাকে তুমি দুনিয়ার বাদশা করে দিয়ো।

তারপরেই সে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে।

* * *

বিকেলে হয়েছিল বাইরের লোকেদের সঙ্গে সম্ভাষণ। নায়েব আচার্য এইদিনেই পুণ্যাহের

দিন স্থির করেছিলেন। কালীবাড়ীর বারান্দায় বীরেশ্বর রায়ের পাশে বসে রত্নেশ্বর রায় পুণ্যাহের টাকা গ্রহণ করবেন স্থির ছিল।

পুণ্যাহ সাধারণতঃ বৎসর শুরু না হলে হয় না। চৈত্র মাসে আখেরী গেলে তবে পুণ্যাহের কথা। কিন্তু সে প্রথা লঙ্ঘন করে আচার্য দোলের দিন পুণ্যাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন—আমরা চৈত্র কিস্তির রাজস্ব দাখিল ক'রে দাখিলা নিয়েছি কালেক্টরীতে। সুতরাং সম্পত্তিতে তো আমাদের স্বত্ব আগামী বছরেও বজায় আছে। প্রজাদের সঙ্গে বছরের হিসেব-নিকেশ চৈত্রতেও শেষ হবে না। চলবে। সুতরাং পুণ্যাহ করব, তাতে কার কি বলবার আছে?

বিকেলে বীরেশ্বর ক্লান্ত ছিলেন বলে নিচে নামেন নি। তিনি সন্ধ্যার পর নামবেন। রত্নেশ্বর একলা বসেই পুণ্যাহের 'সেহা' ও টাকা নিচ্ছিলেন। পাশে গিরীন্দ্র আচার্য বসে 'সেহা' অর্থাৎ মহালদিগরের নামধাম ইত্যাদি মিলিয়ে নিয়ে টাকা গুনে রত্নেশ্বর রায়ের হাতে দিচ্ছিলেন এবং দুজন নায়েব বসে সেহাগুলিতে এস্টেটের মোহর ছাপ দিয়ে মণ্ডলদের ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এবার পুণ্যাহের টাকার সঙ্গে আরও একদফা টাকার আমদানি ছিল। সেটা রায়বংশের নতুন উত্তরাধিকারী রত্নেশ্বর রায়ের নজরানা। মণ্ডলেরা নজর দিয়ে প্রণাম করছিল। একজন কর্মচারী লিখে যাচ্ছিল নজরনাদাতা প্রজার নাম ও পরিমাণের অঙ্ক। ওদিক থেকে আর একজন বিদায় করছিল মণ্ডলদের। প্রত্যেককে কাপড় চাদর এবং নগদ টাকা দিয়ে বিদায়। টাকা রাখা হচ্ছিল রূপোর ঘড়াতে!

পুণ্যাহ আরম্ভে ঢাক বেজে থাকে—আবার শেষেও বাজে। ঢাকের অগ্রাধিকার বজায় রেখেও রসুন চৌকি বাজবার ব্যবস্থা। পুণ্যাহের আমদানি শেষ হলেই টাকার ঘড়া নিয়ে গিয়ে কালীমায়ের বেদীর নিচে রাখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজবার কথা।

কিন্তু আচার্য হাত তুলে ঢাক বাজাতে নিষেধ করে হেঁকে ঘোষণা করে বললেন—কাল সকালে মহল দিগরের খেয়াঘাট বা সরকারী নয়, আর হাট, তার সঙ্গে বার্ষিক জলকর আর বনকরের পাতা মহল, কয়লা মহলের ডাক হবে। যারা ডাকবে তারা যেন উপস্থিত হয়। আর একটা কথা, এবার পুণ্যাহে সব মহলের পুণ্যাহের টাকা এসেছে। আসে নি একমাত্র মওলান তৌজি বীরপুরের টাকা! সুতরাং এই মওলান তৌজির মণ্ডল আর মণ্ডল থাকতে চায় না বা অক্ষম। কাজেই কাল ওইসব ডাকের সঙ্গে এই বীরপুরের মণ্ডল পদ ডাকের ওপর বিলি করা হবে। সর্বাগ্রে ওই মণ্ডলানের ডাক হয়ে তবে অন্য ডাক হবে। নে, এবার বাজা। না। দাঁড়া। সন্ধ্যের পর রাজরাজেশ্বর প্রভুর মা আনন্দময়ীর দোল খেলা হবে। তারপর রাত্রে হবে কীর্তন গান। আর কৃষ্ণযাত্রা। বাজী পুড়বে। ব্যাস—হয়েছে, নে, বাজা।

ঢাক বাজতে শুরু করেছিল।

সমস্ত কিছুর মধ্যে আনন্দ এবং উল্লাসের একটা স্রোত বইছিল, তার মধ্যে একটি অন্তঃস্রোত

বইছিল বা গভীর একটি ঘূর্ণি আবর্তিত হচ্ছিল, যেটির লক্ষ্য হল গোপাল সিং।

বহুজন অর্থাৎ বহুপ্রজার ছোটখাটো দরবারও আছে। বাকী খাজনা পড়ে গেছে, কিছু মাফ চাই। না-হলে পেরে উঠছে না। দু' একজন অতি নাতোয়ান প্রজা বাকীটা সবই মাফ চায়। কেউ এসেছে—তার একটি মালের পুকুর আছে, সেটি সে সেলামী দিয়ে নির্দায় বা নোকররী মৌরসী করে নিতে চায়।

কেউ চায়—জমিদারের খাস পুকুর বন্দোবস্ত নিতে।

কেউ চায়—তার বাপ জমিদারের খাস পতিতে গাছ লাগিয়েছিল সেই গাছগুলির ছাড় নিতে। হুজুরের দয়া হলে যদি তলস্থ জমিটুকুও পায় তবে সে একটি বাগান করবে। ছেলেরা আম কাঁঠাল খাবে।

দু' চারজন এসেছে—দেবতা প্রতিষ্ঠা করবে তার জন্য পাকা ইমারতের অনুমতি চাই।

অনেক ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁদের কারুর আছে টোল, কারুর আছে দেবসেবা, তাঁরা জমিদার দপ্তর থেকে বৃত্তিপ্রার্থী। কেউ-কেউ দু-চার বিঘা জমিপ্রার্থী। বাউল-বৈরাগীরাও এসেছে, তারা মহাপ্রভুর সেবা করে, আখড়া স্থাপন করেছে। সেবার জন্য দু-চার বিঘা জমি তারাও চায়। তবে তারা ব্রাহ্মণদের মত নিষ্কর চায় না, খাজনা দেবে, তবে সেলামী দিতে পারবে না।

গোমস্তাদের মধ্যেও প্রার্থী আছে, তারা তহবিল তছরূপ করেছে, মামলা হচ্ছে বা হবে, তার থেকে তারা অব্যাহতি চায়।

কুম্ভকারেরা এসেছে—জমিদারের খাস জায়গায় মাটি নিতে, খাজনা দিতে হয় সেটা মাফের অনুমতি হোক।

মেদিনীপুরে মাদুরের অনেক কারিগর আছে। তারা মাদুরের কাঠির চাষ করে জলা জায়গায়, বিলে, পুকুরে, তার খাজনা লাগে, সেটা মাফ করা হোক।

কোন গ্রামের লোকের আর্জি—তাদের গ্রামে পানীয় জলের অভাব, পুকুর একটি কাটিয়ে দেওয়া হোক।

কোন গ্রাম চায় গ্রামের সরকারী দেবস্থানের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য।

গুজব রটেছে, এবার বীরেশ্বর রায় কল্পতরু হয়েছেন, ফেরাবেন না কাউকে। ওই নতুন বংশধরের হাত দিয়ে যে যা চাইবে দেবেন।

এরই মধ্যে গোপাল সিংয়ের ব্যাপারটি শুধু ক্রুর-কুটিল। দেওয়ান আচার্য দীর্ঘাকৃতি ভগবান মণ্ডলকে চোখে চোখে রেখেছেন। সে এসে উঠেছে তার শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু দুবেলা তার খাবার নিমন্ত্রণ রায়বাড়ীতে। জলখাবার বা দেবতার প্রসাদ উপলক্ষ্য করে মিষ্টান্ন ফল-মূল ভগবানের শ্বশুরবাড়ীতে ভগবানের জন্য পাঠান হচ্ছে মায় ভাল তামাক, টিকে পর্যন্ত পাঠাতে ভোলেন নি তিনি। একজন অতি সাধারণ লোককে তিনি ভগবানের শ্বশুরবাড়ীর সামনে

মোতায়েন রেখেছেন ভগবানের উপর নজর রাখবার জন্য। ভগবান যেন না পালায়। কয়েক-বার তাকে ডেকে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সে সাহসে ঠিক আছে কিনা। এবং সাহসও তাকে দিয়েছেন।

একবেলা পুণ্যাহ শেষ হতেই বীরেশ্বর রায়ের ঘরে রত্নেশ্বরকে বসিয়ে ভগবানকে ডেকে পাঠালেন। এ ঘরের দারোয়ান এখন ছেদী সিং, সে কাটা পা নিয়ে একটা চওড়া টুলের উপর মস্ত মুরেটা বেঁধে বসে থাকে; হুকুমমত বাইরের লোককে দরজা ছেড়ে দেয়। আচার্য বললেন —ছেদী, খুব লম্বাসে এক আদমী, সমঝা—কালাসে—আয়েগা, পাইক লে আয়েগা, উস্কা খাতির দেখলাবে। অঁার বলবে, চলে যাইয়ে মণ্ডলজী, ছোটা হুজুর তো আপকা লিয়ে বৈঠা হ্যায়। অাঁ? উসকা পাশ হামলোকের কাম হ্যায়। উ লেনে হোগা। সমঝা!

—হ্যাঁ হুজুর। সমঝ লিয়া! খাড়া হো যাঁউ?

—না-না। খাড়া কেন হোগা? ওতনা নেই। তবু ওরই মধ্যে সমঝাচ্ছো না? থোড়া খাতির! হঁ!

বলে হেসে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে রত্নেশ্বরকে বুঝিয়ে ছিলেন, কি বলতে হবে!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—ভগবান নেবে। আপনি ভাববেন না। আমি তাকে বোঝাবার জন্যে ঠাকুরদাস দাদাকে লাগিয়ে রেখেছি! ঠাকুরদাসদের সঙ্গে কুটুম্বিতে আছে।

একটু হেসে আচার্য বলেছিলেন—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী সাহেব। আপনার বুদ্ধি রাজবুদ্ধি। জানেন একটা কথা আছে, কাঁটার মুখে শান দিতে হয় না, কাঁটা আপনার ধার নিয়েই গজায়; তেমনি রাজা জমিদারের ছেলেকে রাজবুদ্ধি শেখাতে হয় না, ও নিয়েই জন্মায়।

রত্নেশ্বর ভগবানকে কথা দিয়েছিলেন—তুমি শুধু সামনে দাঁড়াও ভগবান। যা করবার আমি করব। টাকা লোক সব আমার। কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে।

উপু হয়ে বসে হাতজোড় করে ভগবান বলেছিল—আমি ঠিক আছি হুজুর। আজ পঁচিশ বছর এই মনে-মনে জপছি। এই দ্যাখেন।

বলে হাঁটুর উপরে কাপড়টা তুলে দেখিয়েছিল, উরুতের উপর একটা দাগ। কাটা দাগ।

—ওটা কি?

—গোপাল আমাকে কুপিয়েছিল হুজুর। তখন আমার জোয়ান বয়স। গোপালও তখন জোয়ান, আমরা হাম জুটী। প্রথম প্রথম আমি মশায় ওর ডান হাত ছিলাম। আমার বাবার অবস্থা ভাল ছিল খাতির করত। একবার বাবু, আমার জেঠার জমি কিনলে পাঁচ কাঠা, জেঠার কন্যেদায়ের সময়। তার সঙ্গে আমাদের এক কিত্তে জমি, হুজুর, দো ডাকলে রা কাড়ে, সে কিত্তেটার অর্ধেক আর পাঁচ কাঠা জমির সঙ্গে রাতারাতি আল কেটে এক করে দিলে। আমি সামলাতে পারি নাই, মশায় ছুটে গিয়ে ওকে বলেছিলাম—ডাকাত কোথাকার?

ও মশায় হেঁসো দিয়ে কেটে তাল খাচ্ছিল। সেই হেঁসোটা খপ করে বসিয়ে দিলে এইখানে। ছ মাস বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু কি করব? রাজাদের প্রিয়পাত্র। দারোগা-মুন্সীর সঙ্গে খাতির। মুখ বুজে আজ এই পঁচিশ বছর পড়ে আছি। সয়ে যাচ্ছি। এবার আপনব ,র মত বল পেয়েছি, আমি পিছুব কেন?

—মেয়েছেলে সব নিয়ে এসেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সবাই এসেছে।

—দেখ, আমার ধারণা, খবরটা পৌছুবামাত্র ও খেপবে। ঘরে আগুন লাগানো ওর একটা ঝোঁক। শেকল দিয়ে আগুন দেয়। সেই জন্যে বলছি। ঘর পুড়লে আমি ঘর করে দেব। বুঝেছ। আমি লোক বল দেব!

—গরু-বাছুর? তার ব্যবস্থা?

সে ম্যানেজারবাবুর কহত মত কাল ভোরে আমার লোকেরা চরাবার নাম করে নিয়ে যাবে মাঠে, আপনকার কুতুবপুরের কাছারীর চাপরাশীরা ধরে নিয়ে যাবে কাছারীতে।

ঠাকুরদাস বসেছিল তার পিঠের কাছে। পৃষ্ঠবলের মত। ঠাকুরদাস সেই কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত বরাবর রত্নেশ্বরের সঙ্গে আছে। শুধু শ্যামনগরের শোধের সময় তাকে কলকাতায় এক রকম আটক রাখা হয়েছিল। আসতে দেওয়া হয়নি। সে সঙ্গে থাকলে এ্যালিবি সত্ত্বেও বিপদের সম্ভাবনা ছিল। শ্যামনগর ফিরতেও দেন নি আচার্য। বলতেন—কত্তার হুকুম নাই। তুমি যাও, গিয়ে হুকুম নিয়ে এস।

কিন্তু সে ভরসা ঠাকুরদাসের হত না। এবার সে এসেছে এবং শ্যামনগরের অভ্যাগত ভট্টাচার্যদের জ্ঞাতিদের এবং অন্যান্য লোকেদের দেখা-শুনার ভার তার উপর! শ্যামনগরে ধর্মঘট আজও অব্যাহতভাবে চলছে। গত আট মাস ধরে একটি পয়সা আদায় পায় নি দে-সরকার। ওদিকে রবিনসনের দেনার ডিগ্রিতে ঠাকুরপাড়ার কুঠী ক্রোক হয়ে আছে। ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয় নি বলে আজও নীলামে ওঠে নি। ঠাকুরদাসের স্ত্রী-পুত্র গেছে। সংসারে কেউ নেই। ঘরের মমতা বলতে ঘর আর জমি ছাড়া কিছু নেই। সে বেশ আছে। এবং তারও প্রতিজ্ঞা—শ্যামনগর দে-সরকারদের হাত থেকে কীর্তিহাটে না-আসা পর্যন্ত সে শ্যামনগর ফিরবে না।

এ বাড়ীতে সমাদরের মধ্যে সে ভাল আছে। অনেক কিছু বুঝেছে। গোপাল সিংয়ের উপর ক্রোধ তার কম নয়। রবিনসন গেছে, দে-সরকার ঘায়েল হয়েছে, এবার গোপাল সিং। সে রত্নেশ্বরের কথা মত ভগবান মণ্ডলকে ভজিয়েই চলেছে।

সে এবার বললে—দাদাবাবু, আপনি একবার কর্তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন কাকা মশায়ের। ওঁর একটা কথা। বুঝলেন না—তা হলেই বাস!

গিরীন্দ্র আচার্য একটু হেসে বললেন—কেন হে ঠাকুরদাস, শালগ্রামের আর ছোট-বড় আছে নাকি ? তোমাদের বুড়ো শিব জলে থাকেন সম্বছর, চৈত্তির মাসে তুলবার সময় দেখা যায়, অনেক বাচ্চা শিব হয়েছে। বাচ্চা হলে কি হবে তারাও শিব। উনি বলছেন—

—আজ্ঞে না। তবে কত্তার চরণের ধুলো মাথায় নিলে বুকে বল হবে। কত বড় প্রতাপ! এই আর কি! একবার কাছ থেকে চোখে দর্শন। আর দুটো বাক্যি।

রত্নেশ্বর হেসে বললেন—বেশ তো। তুই যা তো ঠাকুরদাস দাদা, দেখে আয় তো কি করছেন উনি। যাকে বলে আয়, একবার আমি যাব একজনকে নিয়ে। ওঁর সঙ্গে কটা কথা আছে!

উপরের দক্ষিণের বারান্দায় বীরেশ্বর তখন আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। ঘুমিয়েছেন এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে কাঁসাইয়ের ওপারের পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। আজ জীবনের সব বিক্ষোভ যেন মিটে গেছে। সাম্রাজ্যে যেন সম্রাট হয়ে বসেছেন। কিন্তু বাঁ পাখানা দুর্বল হয়ে গেল।

সামনে কয়েকখানা চিঠি পড়ে ছিল। কলকাতা থেকে এসেছে। তার মধ্যে একখানা চিঠি লিখেছেন বন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখে এসেছিলেন বীরেশ্বর রায়। কলকাতায় ফিরে অসুস্থ অবস্থার জন্য দেখা করতে পারেন নি। কোন খবরও দেন নি। এসব কথা জানাতে কেমন সঙ্কোচবোধ করেছিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তাঁকে চিঠি লিখে যতটা জানানো সম্ভবপর তা জানিয়েছেন।

সিংহ তাঁর চোখা কলমে অল্প কয়েক ছত্র লিখেছেন।

"রায়মহোদয়, পত্রযোগে ভবদীয় বিবরণে চমৎকৃত হলেম। কাশীধামের বিখ্যাত সতীমাতা আপনার হারানো সহধর্মিণী! এ আশ্চর্য কাণ্ড। তার কথা অনেক শুনেছি মশায়। এমন কি ত্যাঁদড় রাম মল্লিক—তাঁর নাম করতে গদগদ হয়ে ওঠে। বলে তাঁর চলে যাওয়ার পথ থেকে ধুলো কুড়িয়ে পুরিয়া করে নিয়ে এসেছে! পরিহাস করছি নে মশায়, মহিলাটির বিবরণ অন্যের কাছে শুনে শ্রদ্ধা হয়েছে। যাক আপনি ভাগ্যবান। একটা অঙ্গ কমজোরি হয়ে যাওয়ার কল্যাণে তিনি ফিরেছেন, এখন অঙ্গটাকে অক্ষম করে বসে থাকুন অন্তত তার ভান করুন। তিনি সচলা হয়ে পাশে বসে সেবা করুন। তারপর ভাগ্নেকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন, এও উত্তম কথা। কলকাতায় এলে দেখব তাকে। এই উপলক্ষ্যে তার জন্য একটি সোনার ঘড়ি পাঠালেম। বলবেন—জমিদারবাড়ীর ছেলেরা দশটার আগে বিছানা ছাড়ে না; হুতোমপ্যাচা বলে—এতেই তাঁদের সর্বনাশ। বাবাজীকে ঘড়ি ধরে চলতে বলবেন, সাতটার আগেই যেন বিছানা থেকে ওঠেন। বলবেন—ভূগোলে যাই লেখা থাক, লোহিত সাগর পূর্ব দিকে, সেটা যেন তিনি কলম্বাসের মত ভোরে উঠে আবিষ্কার করেন।"

তিনি তাকিয়ে আছেন পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের দিকে। ভাবছেন কথাটা সিংহকে

লিখতে হবে। লিখবেন—"আমি কিন্তু দিবানিদ্রান্তে পশ্চিম দিকে লোহিতসমুদ্র দেখিলাম।"

ভবানী দেবী বসেছিলেন ঘরের মধ্যে, তার সামনে বসে আছেন মাসিমা নিস্তারিনী দেবী।

ঠাকুরদাস ভিতরের দিকের বারান্দায় দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ডাকলে—মা।

—কে ?

—আমি ঠাকুরদাস মা।

—ঠাকুরদাস ? রত্নের কাজ শেষ হল ?

—হয় নি। পুণ্যের ঘড়া আনা বাকী আছে। মায়ের অর্চনা হচ্ছে।

—সে তো সন্ধ্যের পর হবে। তুমি একবার আসতে বল তো তাকে।

—তিনি পাঠালেন মা—

—তাকে পাঠিয়ে দাও বাবা, আমি শুনব তার কাছে। আমারও জরুরী দরকার আছে।

ঠাকুরদাস তাড়াতাড়ি রত্নেশ্বরের ঘরে এসে বললে—মা তোমাকে খুঁজছেন, যাও!

রত্নেশ্বর এসে দাঁড়াল। ভবানী দেবী ঘরে একলা বসেছিলেন, তখন নিস্তারিনী দেবী চলে গেছেন।

—আমাকে ডেকেছ ?

—হ্যাঁ এ সব কি হচ্ছে তোর ?

—কি মা ?

—মাসীমা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন। বলছিলেন—তিনি শুনেছেন, তাঁকে নাকি তুই তাড়িয়ে দিবি প্রতিজ্ঞা করেছিস ? কেন ? আমাকে সেদিন ওই কথা বলেছিলেন বলে ? আমার শাশুড়ী যদি থাকতেন তিনি যদি বলতেন ? কি করতিস তুই ?

রত্নেশ্বর অন্য দিন হলে প্রতিবাদ করতেন, মনে-মনে ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু আজ তা হলেন না। মনটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একটু হেসে বললেন—তাড়িয়ে দেব বলি নি। ঠিক করেছিলাম মাসোহারা দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেব। এ বাড়ীর গিন্নীগিরিটা ঘুচিয়ে দেব।

—না। উনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।

রত্নেশ্বর অত্যন্ত সহজভাবে বললেন—তা থাকুন। তুমি বলছ নিশ্চয় থাকবেন। কিন্তু ওঁকে বললে কে ?

—বলেছেন যেই হোক। বলেছেন ন্যায়রত্নমশায়। উনি শুনেছিলেন ম্যানেজারবাবুর কাছে। কিন্তু ওসব হবে না!

—হবে না। ঠিক আছে। আমার নিজের মনটাও আজ খুঁত-খুঁত করছে দুপুরবেলা থেকে। উনি সেই তখন আশ্চর্য সুন্দরভাবে সব করালেন। আর কি সুন্দর কথাগুলো

বললেন। আমি মা আশ্চর্য হয়ে গেছি। ভাবছিলাম, হ্যাঁ রায়বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম চালাবার জন্যে ওঁর মত গিন্নী না হলে চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলামও প্রতিজ্ঞা করেছি, ভাঙব কি করে! তা ভালই হল তোমার হুকুম!

ভবানী দেবী বলছিলেন—উনি আরও বলছিলেন অঞ্জনার জন্যে। ওর স্বামীকে একটা চাকরি দিয়ে ওকে এখানে রাখার কথা। মেয়েটির বড় খারাপ অবস্থা। বড় দুঃখ। ওকে তোকে বলতে বলে গেলেন।

রত্নেশ্বর বললেন—বেশ তো, তুমি বললে তাই হবে। তোমার ওই মাসশাশুড়ীটির পর এমনি একটি অন্দর-সুপারইনটেনডেণ্ট তো একজন লাগবে। অঞ্জনা মেয়েটি তা পারবে। হয়তো ঠাকুমার থেকে ভাল পারবে! উনি কোথায়?

—উনি? মৃদু ধমকে উঠলেন ভবানী। একটু চুপ করে থেকে চুপিচুপি বললেন—জানিস, তুই ওঁর কথা হলেই উনি-তিনি বলে সারিস, তিনি মনে দুঃখ পান। চাপা মানুষ, বলেন না। মধ্যে মধ্যে আমাকে বলেন—রত্ন এখনও আমাকে তোমার মত নিতে পারলে না। নিলে না।

—কেমন লজ্জা করে। বেধে যায়!

—না! বাধবে কেন? যা, উনি বারান্দায় বসে আছেন, তামাক খাচ্ছেন।

রত্নেশ্বর এগিয়ে গিয়ে দরজা থেকেই ডাকলে—বাবা!

—রত্নেশ্বর! এস!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, তাই বলছিলাম, মনে মনে হিংসা, ক্রোধ যতই থাক, সেদিন যদি গোপাল আসত আর আবেদন জানাতে পারত, তবে কি হত ঠিক বলা যায় না। সমস্ত রায়-বাড়ীতে সেদিন সন্তোষের একটি পরিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষোভ যা কিছু ওই গোপালকে নিয়ে। না আসাতে এ পক্ষের সে ক্ষোভ আরও বেড়েছিল।

রায়বাড়ীর এত বড় উৎসব সমারোহের মধ্যে গোপাল সিং সম্পর্কে বিদ্বেষ ও আক্রোশের অন্তঃশীলা স্রোতটি কোথাও একবার অযথা এঁকে-বেঁকে যায় নি, সোজা বেয়ে গিয়েছিল ক্যানেলের খালের মত।

রচনাটি দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের। মহিষাদলের নায়েব ওকালতি করেছিল গোপালের জন্য। দেওয়ান আচার্য বলেছিলেন—ও কথাটা বল না হে। কত টাকা দিয়েছে গোপাল? টাকাটা তাকে ফিরে দিয়ো। আমি তোমাকে দেব ও টাকাটা।

সে আর কথা বলে নি।

পরদিন সকাল থেকে কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ হয়ে চলেছিল। প্রথমেই ছিল একদিকে দানপর্ব, অন্যদিকে ডাকপর্ব।

কাছারীতে হচ্ছিল হাট-ঘাট, জলকর, বর্ণকরের ডাক। আর ঠাকুরবাড়ীতে চলছিল দান।

'ডাক'-এর কাজ চালাচ্ছিলেন দেওয়ান আচার্য। তবে প্রথমেই বীরসিং মৌজার 'মণ্ডলান' ডাকের সময় নিজে বীরেশ্বর রায় এসে বসেছিলেন একবার। সেটা এসেছিলেন আচার্যের কথায়। ভগবানের মনোভাব বুঝে তিনি বলেছিলেন—ওই সময়টায় খোদ মালিক মানে আপনি বসলে ভাল হয়। বল পাবে।

বীরেশ্বর রায় আগের দিন সন্ধ্যার সময় রত্নেশ্বরের কথায় ভগবানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সাহসও দিয়েছিলেন। আচার্য হুঁশিয়ার লোক, তিনি তবুও ওই অনুরোধ করেছিলেন, এবং বীরেশ্বরও এসে বসেছিলেন। বীরপুরের মণ্ডলান পদের ডাক ডাকতে একটি মাত্র লোক, ভগবান মণ্ডল। সে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুর যদি অনুমতি দেন তো; আমি ডাকতে পারি!

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন—তুমি তো ভগবান মণ্ডল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হুজুরের বীরপুরেরই প্রজা!

—বেশ তো। ডাক! গোপাল তো আসে নি। ডাক।

মানুষ মাত্রেই আপন সাধ্যভোর চতুর। ভগবানও সাধ্য চাতুর্যের সঙ্গে দশের সম্মুখে তাঁর অভয় এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। বলেছিল—ডাকতে হুজুরের অভয় চাই, আশ্রয় চাই। নইলে আমি সামান্য লোক, চাষী মানুষ, আমি পাবব ক্যানে?

বীরেশ্বর বলেছিলেন—নিশ্চয়। সে তুমি পাবে বইকি! নিশ্চয় পাবে। আমার কর্মচারী পাবে, পাইক-বরকন্দাজ দরকার হলে তাও পাবে। সবই পাবে। ডাক।

ভগবান এক ডাকেই পেয়েছিল মৌজা বীরপুরের মণ্ডলান পদ। বীরেশ্বর রায় তার নজরানা না নিয়ে ডাক মঞ্জুর করে উঠে চলে গিয়েছিলেন অন্দরে। তারপর কাজ চালিয়েছিলেন আচার্য।

ওদিকে নাটমন্দিরে রত্নেশ্বর বসেছিলেন দুজন নায়েবকে নিয়ে, তিনি মহালের দেবস্থান মেরামতি বা নির্মাণ খরচা দান ও প্রার্থীদের কাউকে কিছু জমি, কাউকে বার্ষিক বৃত্তি, কাউকে পুকুরের ছাড়, কাউকে বাগান করবার অনুমতি মঞ্জুর করছিলেন। এ সবের ফর্দ কর্মচারীরা আগে থেকেই করে রেখেছিল, তাতেই তিনি সই করে দিচ্ছিলেন।

প্রহর খানেক, প্রহর দেড়েকের মধ্যেই এ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরম্ভ হয়েছিল লোকজনের জন্য উৎসব। সে নানারকম।

অন্যদিকে চলছিল আর এক বড় সমারোহের আয়োজন। তৃতীয় দিনে সব বিশিষ্ট বড় বড় লোকের শুভাগমন হবে। সাধারণ লোকজন অনেকেই চলে যাবে। তারপর হবে বিশিষ্ট অতিথি আপ্যায়ন। তমলুকের এস-ডি-ও আসবেন, কাঁথীর এস-ডি-ও আসবেন। মেদিনীপুরের ডি-এস-পি তিনটে মুন্সেফী কোর্টের মুন্সেফ, পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর, উকীলমোক্তাররা আসবেন।

কাল সকাল থেকে বারোটার মধ্যে সকলে এসে পড়বেন। এর মধ্যে মেদিনীপুরের সদর এস-ডি-ও আসছেন সস্ত্রীক পুত্র-কন্যা নিয়ে, তাঁদের নিয়ে আসছেন বীরেশ্বরের খুড়তুতো দাদা দেবপ্রসাদ ঘোষাল এবং বউদি জগদ্ধাত্রী দেবী। ওঁরাই অনুরোধ করেছিলেন সদর এস-ডি-ও রাধারমণ চ্যাটার্জিকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করতে। রাধারমণবাবু দেবপ্রসাদবাবুর ভায়রা-ভাই; জগদ্ধাত্রী দেবীর পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছেন। তাঁরা কীর্তিহাটের কথাবার্তা শুনে কীর্তিহাট আসবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জগদ্ধাত্রী দেবী এবং দেবপ্রসাদবাবু এই কারণেই প্রথম দিন আসতে পারেন নি, তাঁরা ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

সুরেশ্বর বললে—আচার্য পাকা শিকারীর মত ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই হ্যারিসের মত; সে যেমন শিকারীর জন্যে মাচা বেঁধে তাকে সেখানে বসাবার আগে জানোয়ারের ট্র্যাকটির ডাইনে-বাঁয়ে, এখানে-ওখানে ডালের টুকরো ফেলে রেখে জানোয়ারটিকে সোজা নিয়ে আসে মাচানের সামনে, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

গোপাল সিংকে জানোয়ার আমি বলছি নে, তবে গোপাল সিংকে বাঘ বলব। নর-ব্যাঘ্র। বিক্রম তার বড়, ক্রোধ তার অসংহত, বুদ্ধি-বিবেচনা কম এবং তাকে সে অবহেলাই করে। কতকগুলো চাতুরী তার জানা আছে, তাই সে অভ্যাস করে রেখেছে। তার অতিরিক্ত বুদ্ধির খেলা যেখানে, সেখানে সে হেরে যায়। প্রবীণ বাঘের মত চতুর, সাবধানী—চেনা পথ ছাড়া অচেনা পথে হাঁটে না। কিন্তু এবার আচার্য তার খাদ্য নিয়ে টান মেরে ছেড়ে দিতেই সে বেরিয়ে এল। ঠিক পথে পথে এল।

আচার্য জানতেন আসতে হবে।

বীরপুরের মণ্ডলান ডাকের কথা তার কাছে পৌঁছুবামাত্র সে ক্ষিপ্ত হবে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কিছু একটা করবেই। সম্ভাবনাটা ছিল ভগবানের উপর ঝাঁপ দেবে। ভগবান সপরিবারে কীর্তিহাটে। আজ সকালেই তার গরু-বাছুর মাঠে যাবার কথা, কুতুবপুরের সীমানা বরাবর। সেখানে কুতুবপুরের কাছারীর পাইক-বরকন্দাজরা গরুগুলোকে ঘেরাও করে কাছারীতে পুরবে। নিষ্ফল আক্রোশে গোপাল ভগবানের জনশূন্য বাড়ীতে আগুন দিয়ে দোল-পার্বনের মেড়াপোড়া বা বহ্ন্যুৎসব করবে। হয় তো কুতুবপুর পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। কাছারীও পুড়তে পারে।

তিনি কীর্তিহাটেও সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

তারপরই গোপাল পড়বে শিকারীর মাচার সামনে।

পরদিন সকালে এখানে সাহেব-সুবার আগমন হবে। তাঁদের সামনেই আসবে খবরটা।

গোপাল সিংহের গতরাত্রির কীর্তির রিপোর্ট।

সরকারী সাহেবদের একটা ডিউটি হল অত্যাচারী জানোয়ার শিকার করা!

সুবিধা আর একটু প্রশস্ত হয়ে গেল। সেটা হল মেদিনীপুরের সদর এস-ডি-ও রাধারমণ-বাবুর জন্যে। তিনি আত্মীয়। দেবপ্রসাদবাবুর ভায়রা-ভাই। সদর এস-ডি-ও ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কালেক্টারকে জানাতে পারবেন।

এত বড় উৎসবের মধ্যে বিচিত্রভাবে গোপাল সিংকে নিয়ে তাঁরা যে জাল রচনা করেছিলেন, কেউ অনুমানও করতে পারে নি যে, সে জাল আশী বছর পরে পর্যন্তও বিস্তৃত হয়ে রইল এবং তাতে পড়বে এবার গোপাল সিংয়ের কেউ নয়, রায়বাড়ীর এক ছেলে এবং এক মহিমাময়ী বিধবা বধূ। রত্নেশ্বরেরই পুত্রবধূ!

* * *

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"সে দিন গোপাল সিংয়ের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই আমার ছিল না। নানা চিন্তা হইতেছিল।"

কখনও ভাবছিলেন—যা আমরা ভাবছি, তা যদি গোপাল না করে। যদি সে ধীর হয়ে অপেক্ষা করে। তারপর? তারপর ভগবানের সঙ্গে মিটমাট করে নেয়! যদি! চমকে উঠে ভেবেছিলেন—যদি ভগবান গোপালের বেনামদারই হয় গোড়া থেকে? তাহলে তো হেরে গেলাম!

অন্ততঃ এক বছরের জন্য হেরে গেলাম। গোপাল তার বেনামদার ভগবানকে সামনে রেখে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াবে, আর বলবে—আরে বাবা, হামি গোপাল সিং! হামি শিয়ালকে মানে না বাবা। রায়বাবু! উ লোকেরা শিয়াল আছে। তাহলে এক বৎসর অন্ততঃ কীর্তিহাট অঞ্চলে মুখ দেখানো চলবে না।

পথ আছে। গোয়ানরা আছে। ওরা সব পারে। কলকাতায় লোক মিলবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রত্নেশ্বর।

ফাল্গুনের শেষ। কীর্তিহাট অঞ্চলের লালমাটি ফাল্গুনেই উত্তাপ আকর্ষণ করে। খেয়ে বিছানায় শুয়েও ভাবছিলেন। টানা-পাখা চলছিল। তখন চিন্তার মোড়টা ফিরেছে। তখন ভাবছিলেন—খবরটা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌঁচেছে বীরপুর। এতক্ষণে কেন? আগেই পৌঁচেছে। আচার্যের হুকুম আছে কুতুবপুর কাছারীর উপর যে, বেলা এক প্রহর বাদে, ভগবানের গরু-বাছুর আটক করার পরই, বীরপুর মৌজার ডাকের কথা চাউর করে দেবে।

খবর গোপাল পেয়েছে। সে ভগবানের বাড়ী পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে নিস্ফল আক্রোশে। বাড়ীতে কিম্বা হয় তো পথে পথে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে! ভাবছে কি করবে? অনেক কিছু করতে পারে গোপাল। অসাধ্য কর্ম তার কিছু নেই। এই আজ রাত্রে, এখানে নানা উৎসব। কাল কীর্তন-কৃষ্ণযাত্রা গেছে। আজ খেমটা নাচের আসর পড়বে। বারোটার পর শুরু হবে যাত্রাগান। বাইরে সামিয়ানা খাটিয়ে বড় একটা আসরে কবিগান, চম্পাবতীর গান চলবে। লোক আজ অনেক জমবে। গোপাল হয়তো চলে আসবে এই সুযোগে। একটু

ভোল পাল্টে এলে কে চিনবে। মুখে গামছার কেটা বেঁধে— !

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম নয় তন্দ্রার মত !

সে তন্দ্রার মধ্যে গোপাল সিং রত্নেশ্বর রায়কে ছাড়ে নি, অথবা রত্নেশ্বর তাকে ছাড়েন নি। স্বপ্ন বা তন্দ্রার মধ্যে কল্পনায় তিনি ছদ্মবেশী গোপাল সিংকে দেখেছিলেন ভিড়ের মধ্যে। সে যেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রায়বাড়ীর দোতলার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রুদ্ধ কুটিল দৃষ্টিতে। তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন—পাকড়ো! পাকড়ো। ওই-ওই! তিনি বুঝতেও পারছিলেন এটা সত্য নয়, স্বপ্নের মত কিছু, তবু জেগে উঠতে পারছিলেন না। জাগিয়ে দিলেন ভবানী দেবী। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন—রত্ন! রত্ন!

এতক্ষণে উঠে বসেছিলেন রত্নেশ্বর এবং লজ্জিতও হয়েছিলেন। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন—এমনভাবে চেঁচাচ্ছিলি কেন? স্বপ্ন?

হেসে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ। দেখছিলাম, শয়তান গোপাল সিং এসে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীতে রাত্রে থাম বেয়ে উঠবার মতলব করছে।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—তোকে যে গোপাল সিংয়ের আক্রোশ পেয়ে বসল রত্ন!

ঠিক সেই সময়ে দরজায় দাঁড়িয়ে একটি তরুণী মেয়ে বলেছিল—খুড়ীমা।

—আন। ভিতরে এস!

মেয়েটি ঘরের ভিতরে ঢুকল, হাতে একটি রূপোর গেলাস। দরজার মুখে বাইরের আলো-কে পিছনে রেখে দাঁড়িয়েছিল বলে রত্নেশ্বর তাকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু ঝি সে নয়, এটা বুঝতে পেরেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে?

—অঞ্জনা!

—ও!

—বড় কাজের মেয়ে। বড় ভাল। ওকে আজ সকালে বললাম—তুমি এখানেই থাক। বুঝলে! আপন বাড়ীই ভাববে। তা বললে—খুড়ীমা, যে বাড়ীতে থাকি, সে বাড়ীর খড়ের চালে খড় নেই, শুয়ে চাঁদের আলো দেখি, রোদের তাপে পুড়ি। এত বড় বাড়ী, আপনার ভাববার মত ভাবনা কোথায় পাব? বরং ভাবনা হবে এমন বাড়ীতে থাকব কেমন করে। বললাম—থাকবে ওই আপনার ভেবে। ভাবতে পারলে ও ভাবনা হবে না। বললে—কি করতে হবে আমাকে? বললাম—মাসীমার সঙ্গে থেকে শিখে নাও সব। মাসীমা আর ক'দিন। পরে সব তুমি করবে। বললে—বেশ। বিকেলবেলা সরবৎ তৈরী করে এনেছে নিজে থেকে। বললে—দেখুন তো খুড়ীমা, কেমন হয়েছে? করে আনলাম আপনাদের জন্তে। কি চমৎকার করেছে, কি বলব! বাবু খেয়ে তারিফ করলেন। চমৎকার হয়েছে! তোর জন্তে আনতে বললাম—নে, খেয়ে দেখ!

—দাঁড়াও, মুখে জল দি!

সত্যই সরবৎটুকু চমৎকার লাগল। স্বাদ তো বটেই, ঘোল এবং চিনির সঙ্গে আমআদার স্বাদ ও গন্ধ ; এবং আরও কিছু আছে। সরবৎটুকুতে গাঢ় এবং মিষ্টি গন্ধ দিয়েছে। আম-আদার গন্ধকে ছাপিয়ে উঠছে গন্ধ !

মুখে দিয়ে খানিকটা খেয়ে রত্নেশ্বর বললে—তাই তো !

কাশী অঞ্চলে সরবতের চল খুব, তরিবৎও খুব। কাশীতে মানুষ রত্নেশ্বর আবার চুমুক দিয়ে আবার বললে—আতর ? কিসের আতর ?

ভবানী দেবী বললেন—আমিও বুঝতে পারিনি। কিন্তু উনি ঠিক ধরেছেন।

—কিসের গন্ধ বল তো ? রত্নেশ্বর তাকিয়েছিলেন অঞ্জনার মুখের দিকে।

এতক্ষণে কালকের সেই বাক্‌পটু অঞ্জনা বেরিয়ে এল। চুপ করে মিষ্টি হাসিমুখেই সে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে। বললে—তা শুনে আপনি কি করবেন ? তারপর একটু হেসেই বললে —বউদি এলে বরং শিখিয়ে দেব। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তার তো দেরী আছে। এখন গরমকালটায় সরবৎটা তৈরি করিয়ে খাব।

—তার জন্যে তো আমি রইলাম। আমি করে দেব। শুধু এই সরবৎ কেন, আরও জানি। দেখবেন কাল খাওয়াব।

—কিন্তু গন্ধটা কিসের ? খুব চেনা মনে হচ্ছে।

—মুচকুন্দ ফুলের। জ্যাঠামশাই ঠিক ধরেছেন। মুচকুন্দ ফুল সকালবেলা ঘোলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, তাতে গন্ধটা মিশে গিয়েছে। তারপর সরবতের সময় পাপড়ি বেটে মিশিয়ে দিয়েছি।

ভবানী দেবী প্রসন্ন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ, এবার তিনি বললেন—রান্নার মশলা বড় কথা নয়, বড় কথা হাত। রান্না হয় হাতের গুণে। অঞ্জনার হাতই সুন্দর। জানিস, সকালবেলা পুজোর উয্যুগ করেছিল। সে যে কি পরিপাটী করে ফুলগুলি ধরে ধরে রেখে বেলপাতাগুলি বেছে থালা সাজিয়ে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল থালাখানি সামনে নামিয়ে দিলেই পুজো হয়ে যাবে ; মা হাত বাড়িয়ে ধরে নেবেন।

অঞ্জনা গ্লাসটি তুলে নিয়ে চলে গেল। ভবানী দেবী বললেন—বড় ভাল মেয়ে রে। অনেক গুণ ওর।

রত্নেশ্বর হেসে বললেন—একটু বেশী কথা বলে।

—তা বলে। কিন্তু কথা কইতে জানে। কথাতেও মধু আছে।

—না। শুধু মধু না, একটু টক স্বাদ আছে।

—ওর স্বামীকে একটা চাকরি করে দে। উনি তোকে বলতে বলেছেন।

হয়তো অঞ্জনার স্বামীর চাকরি হয়ে যেত কিন্তু বাইরে থেকে বীরেশ্বরের ডাক এল—

রত্নেশ্বর !

সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন গিরীন্দ্র আচার্য।—বাবুজী !

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রত্নেশ্বর। বুঝলেন কোন খবর এসেছে। গোপাল সিংয়ের খবর।

—যাই। বলে উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ভবানী দেবীও তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। তাঁর উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। স্বামী-পুত্রকে ফিরে পেয়ে সংসার জীবনে সম্রাজ্ঞীর মত ফিরে এসেও তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। এসব তাঁকে বড় পীড়িত করে। কিন্তু 'না' বলতেও পারছেন না। এত বড় জমিদারী, রাজার মর্যাদা, এসব রাখতে গেলে এ না করেই বা উপায় কি ?

খবর গোপাল সিংয়েরই খবর। কিন্তু কল্পনার বাইরে চলে গেছে। গোপাল সিং নিজের স্ত্রী এবং পুত্রকেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে। এবং নিজের ঘরে আগুন দিয়েছে; সেই আগুন এই ফাল্গুনের দুপুরে তার ঘরকেই পোড়ায় নি—গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে; গোটা মৌজা বীরপুরেই লেগেছে। মৌজা বীরপুর এখনও পুড়ছে। গোপাল সিং ফেরার।

খবর এনেছে কুতুবপুর কাছারীর সওয়ার বরকন্দাজ। ঘটনাটা ঘটেছে এইভাবে। বেলা এক প্রহরের সময়, গোপাল সিং মাঠ থেকে ফিরে, শিবকে গাঁজা ভোগ দিয়ে তার প্রসাদ নিয়ে, মা-কালীকে কারণ নিবেদন ক'রে সবে প্রথম পাত্র প্রসাদটি পেয়েছে এমন সময় সদরের নির্দেশমত কুতুবপুর কাছারীর একজন বরকন্দাজ ঢেঁরাদার নিয়ে বীরপুর মৌজার মণ্ডলান পদের নতুন মণ্ডল ভগবানদাস মণ্ডলের নাম ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছিল—"আজ থেকে নতুন ডাক মোতাবেক বীরপুরের নতুন মণ্ডল হল ভগবানদাস মণ্ডল। পুরানো মণ্ডল গোপাল সিং-এর মণ্ডলান খারিজ।"

গোপাল ঢেঁড়ার শব্দ শুনেই চমকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে হাতের লাঠিটা নিয়েই ছুটে বেরিয়েছিল পথে।

কৌন শালারে! কার এতনা বড়া ছাতি আর কলেজা বীরপুরে এসে গোপাল সিংহের বিনা হুকুমে ঢেঁড়া পেটে ডুগ ডুগ আওয়াজ তুলে। কার গর্দানায় দুটো মুণ্ড, কৌন শূয়ারের বাচ্চার চারটে হাত—। হঠাৎ ডুগ ডুগ আওয়াজ থেমে গেল। একটা গোলমাল উঠল। গোপাল আরও জোরে ছুটল।

পথে দেখা হয়েছিল নিজের ছেলের সঙ্গে। ছেলে তখন শুনেছে। সেও গর্জাচ্ছে। ফুঁসছে। কিন্তু সে গোপাল সিংয়ের মত নয়; সে অনেকটা স্থিরমস্তিষ্ক। সে ভাবছিল—কি করবে। ঢেঁড়াদারকে আর বরকন্দাজকে ভাগিয়ে দিলেই কি জিতবে তারা ? ভাগাতে হবে, ভাগাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শুধু ভাগাবে ? না, মারপিট করবে ? ভেবেচিন্তে সে রক্তারক্তি বা অন্য হাঙ্গামা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে ঢেঁড়াদারের ডুগ্‌ডুগিটা ছিনিয়ে নিয়ে বরকন্দাজকে ধমক দিয়ে বা গায়ের জোরে ভাগিয়ে দেওয়াটাই ঠিক করে, এগিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল নিজেদের ক'জন অনুগত লোক। ঢেঁড়াটা ছিনিয়েও নিয়েছিল, বরকন্দাজের সঙ্গে

দু'-চার লাঠির ঠোকাঠুকি হয়েছিল এবং শেষে তার পাগড়িলাঠি কেড়ে নিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিল।

আচার্যের নির্দেশ ছিল মার খেয়ে এস, মেরে আসামী হয়ে এসো না।

ঠিক এই সময়ে গিয়ে পড়েছিল পাগলা হাতীর মত গোপাল সিং।

কেয়া হুয়া ?

সমস্ত শুনে ঠাস করে ছেলের গালে মেরেছিল এক চড়। হারামীর বাচ্চা, কুত্তার কুত্তা, শুধু ডেঁড়া কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলি? শালা বরকন্দাজের জানটা নিলি না রে—বাঁদীর বাচ্চা!

ছেলের বয়স চল্লিশের কাছে। সে বলেছিল—গালাগালি করো না, ঘরে চল। মগজ গরম করলে কাম হয় না। মগজ গরম করে বুড়বুকেরা।

আবার চড় তুলেছিল গোপাল তার গালের উপর। ছেলে খপ করে হাত ধরে খপে দিয়েছিল। তারপর বাপ-বেটায় শুরু হয়েছিল হাত-কাড়াকাড়ি। ওদিকে বিপদের আশঙ্কা করে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল গোপালের বড়-স্ত্রী, বড় ছেলের মা। সে এসে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল—নেহি, নেহি, নেহি। শুনো, শুনো বাবু শুনো—নেহি।

গোপালের পৈশাচিক ক্রোধ উঠেছিল জ্বলে, সে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে, তার বুকে চেপে বসে টিপে ধরেছিল তার গলা। এমন ছেলে যার পেটে হয়, তার মরাই ভাল। মেরেই ফেলবে সে।

ছেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, সে বাপকে ধরে টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল—ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো।

গোপাল এবার স্ত্রীকে ছেড়ে মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মেরেছিল ছেলের মাথায়। লোহার বোলো লাগানো লাঠি। সে লাঠির ঘায়ে ছেলের মাথা ফেটে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল তার মুখ-বুক সমস্ত। ছেলে কয়েক মুহূর্ত পরেই ধড়াস করে পড়ে গিয়েছিল মাটির উপর।

ওদিকে তখন লোক জমায়েত হয়েছে প্রচুর, গ্রামের প্রায় সকল লোক ছুটে এসেছে চীৎকার শুনে। তারা আর থাকতে পারেনি। তারা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গোপালের উপর এবং তাকে আটকে ফেলেছিল। গোপাল তাদের কুৎসিত গালাগালি করে হুকুম করছিল—ছোড়্ ছোড়্ হারামীরা—ছোড়্ রে—শালা লোক, ছোড়্! উসকো জান লেগা আমি। আমার মানইজ্জত বরবাদ করে দিয়েছে ওই লেড়কা। ওকে মেরেই ফেলব আমি।

সে তখন উন্মত্ত—বিকারগ্রস্ত। হাতে আটক পড়ে সে থু-থু করে থুথু ছুড়তে আরম্ভ করেছিল।

গোপালের অন্য ছেলেরা এবং মাতব্বরেরা পরামর্শ করে তাকে ধরে এনে একখানা ঘরের মধ্যে পুরে শিকল-তালা দিয়ে বন্ধ করেছিল। এবং বড় ছেলের ও গোপালের স্ত্রীর সেবার দিকে

মন দিয়েছিল। গোপালের স্ত্রী অজ্ঞান হয়েছিল অনেকক্ষণ। বড় ছেলের মাথার ক্ষতটা গভীর এবং শঙ্কাজনক। সে-ও অজ্ঞান। রক্তস্রাব হচ্ছিল প্রচুর। জনকয়েক মাতব্বর বড় ছেলের ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণী গাঁদার পাতা লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করতে না পেরে কাপড় পুড়িয়ে চুন মিশিয়ে 'করালী' প্রলেপ তৈরী করে লাগাবার ব্যবস্থা করছিল।

আর বড় ছেলের ছেলে, সে আঠারো-উনিশ বছরের নতুন জোয়ান, সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গোপাল সিংকে অভিশম্পাত করছিল।

ঘরের ভিতর গোপাল সিংও নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাচ্ছিল। হঠাৎ উত্তপ্ত উন্মত্ত মস্তিষ্কে শয়তান জেগে উঠেছিল। ঘরের মধ্যে পেয়েছিল চকমকি—শোলা। আর পেয়েছিল চোলাই-করা মদের বোতল। তাই নিয়ে সে ষাট বছর বয়সেও কসরৎ করে উঠেছিল ঘরের ভিতরের সাঙায়। সাঙায় দাঁড়িয়ে ঘরের চালের বাখারীর কাঠামো ভেঙে খড় ছাড়িয়ে চালের উপর উঠে মদটা ঢেলে দিয়েছিল চালের খড়ের উপর, তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল চালের মাঝখানে।

এ-কাজ সে নিঃশব্দে করে গিয়েছিল। প্রথমটা কারুর নজরে পড়েনি। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই গোপাল উল্লসিত চীৎকার করে বলেছিল—যা সব ছাই হয়ে। যা সব জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে। যা—।

কাউকে চালে উঠতে দেয়নি। যে উঠবে, তাকে সে দাও দিয়ে কোপাবে বলে ভয় দেখিয়েছিল।

স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল লোকেরা।

গোপাল জ্বলন্ত খড় টেনে বের করে ছুঁড়তে শুরু করেছিল চারিদিকে। জ্বলে যাক বীরপুর। ছাই হয়ে যাক। সব শালা বেইমান।

ফাল্গুনের দুপুরে রাঢ় অঞ্চলে এলোমেলো তপ্ত হাওয়া বয়। সেই হাওয়াটা তখন উঠেছে। আগুন বাতাসে ছুটতে লাগল।

গোপাল সিং এক সময় ধপ করে পথের উপর লাফিয়ে পড়ে ছুটল। সে বুঝতে পেরেছিল—গ্রামের লোকেরা এমনকি নিজের বাড়ীর লোকেরাও আজ তার শত্রু। তাকে ধরতে পারলে তারা তার হাতে-পায়ে বেঁধে ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবে। একবিন্দু করুণাও আজ আর তার জন্যে কোথাও কারুর মনেই নেই। এই আগুনেই সব পুড়ে গেছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সে পালিয়েছে। পথ ধরে বেরিয়ে মাঠে পড়ে মাঠে-মাঠে ছুটে পালিয়েছে

গোটা বীরপুর এখনও জ্বলছে। ফাল্গুনের দুপুর—রাঢ়ের এলোমেলো গরম হাওয়া আগুনের সঙ্গ পেয়ে দুরন্ততর বেগে মাতামাতি করে নাচিয়েছে আগুনকে। জ্বলন্ত ঘরের খড় শিখার বেগে আকাশে খানিকটা উপরে উঠে হাউইয়ের আগুনের মত বেঁকে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এর ঘরে, ওর ঘরে; কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চালগুলোও জ্বলে উঠেছে। পথ-ঘাট

পুকুরের জল পোড়া খড়ের টুকরোয় ছেয়ে কালো হয়ে গেছে।

লোক অভিশম্পাত দিচ্ছে গোপাল সিংকে।

আর কাকে দেবে? গোপালের স্ত্রীর গলা থেকে এখনও কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠছে। ছেলের এখনও জ্ঞান হয়নি। গোটা গ্রামে ঘরের আশ্রয় নেই। কামাখ্যা মায়ের মন্দির পাকা; একটা পাকা নাট-মন্দিরও আছে, সেইখানে আশ্রয় নিয়েছে গোপালের পরিবারবর্গ। বাকি লোকেরা গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা গোহত্যা হয়ে গেছে। গরু পুড়ে মরেছে। বেড়াল-কুকুর তা-ও পুড়েছে।

বেঁচে আছে গোপালের পুকুরপাড়ের ধানের বাখার। ওইগুলোই লোকে চেষ্টা করে বাঁচিয়েছে। তাও, সমস্ত বাখারের খড়ের চাল তুলে ফেলে বাঁচাতে হয়েছে। কতকগুলো বাখার খুলে ধানের রাশি ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। না বাঁচিয়ে উপায় ছিল না। নইলে লোকে খাবে কি??

দেওয়ান আচার্য কথা শেষ করে বললেন—এমনটা হবে ঠিক ভাবিনি। তবে কাজ শেষ। গোপালের চিতা গোপাল নিজে জ্বালিয়েছে। আমাদের আর কিছু করতে হবে না। শুধু থানাতে খবরটা পাঠাতে হবে। সে কুতুবপুর কাছারী থেকে গিয়েছিল—আমি পাঠিয়ে এসেছি।

শুনছিলেন তিনজন—বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, রত্নেশ্বর রায়। বীরেশ্বর আলবোলা টানছিলেন কিন্তু কখন যে নলটা রেখে দিয়েছিলেন বা হাত থেকে খসে পড়েছিল, তার খেয়াল ছিল না। কথা শেষ হতেই তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডানহাতখানা বাড়িয়ে নলটা হাতড়ালেন। চাকর মহেন্দ্র দূরে দাঁড়িয়েছিল, সে এসে নলখানা তুলে দিল তাঁর হাতে।

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—মা গো!

বীরেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হুঁ।

—কি করলে বল তো?

—কি? একটু হাসলেন বীরেশ্বর।

আচার্য বললেন—আমরা কি করলাম বলুন মা? আমরা আইনের পথ ছাড়া চলি নি। যা করেছে সে নিজেই করেছে।

—করেছে, কিন্তু—।

—না মা, কোন কিন্তু নেই। আমরা কিছু করিনি। বলুন!

—বাঘের খাঁচায় মানুষকে ঢুকিয়ে দিলে বাঘ মানুষটাকে মারে, ছিঁড়ে ফেলে। বাঘই মানুষটাকে মারে খুড়োমশাই। কিন্তু তাতে বাঘের পাপ হয় না। পাপ মানুষেরই হয়।

বীরেশ্বর রায় হাতের নলটা ফেলে দিয়ে বললেন—মানুষ তো একরকম নয়, সতী বউ। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে। রাজা আর প্রজা, জমিদার আর রাইয়ত এক নয়। রাজাকে

মধ্যে মধ্যে বাঘের খাঁচায় মানুষকে ফেলে দিতে হুকুম দিতে হয়। কাশীতে তো কোম্পানী রাজ্য রাখতে মিউটিনীর সময় কি করলে চোখে দেখেছ। ছেদীর কটা নাতীকে গুলী করে মেরে দিয়েছে। ছেলেছুটোকে ফাঁসি দিয়েছে। ছেদীর ঠ্যাঙটাই কাটা গেছে। রাজধর্ম একটা আলাদা আছে। রাম রাবণকে সাজা দিতে গোটা বংশটাকে ধ্বংস করেছিলেন। ওখানে সাধারণের সঙ্গে বিচার চলে না। আপনি এক কাজ করুন।

আচার্য তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

বীরেশ্বর বললেন—কুতুবপুর কাছারীতে আজ রাত্রেই লোক পাঠান—কুতুবপুরের কাছারীর খাসজোতের সমস্ত খড় বীরপুরের প্রজাদের দেওয়া হবে। যা কাপড় এসেছে এখানে বিতরণের জন্যে তার কিছু কাপড় পাঠিয়ে দিন। কাপড়চোপড় পুড়ে গিয়ে থাকবে। ধান-চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। গরীবদের দশ-পাঁচ টাকা দাতব্য—আর গৃহস্থ প্রজা যারা ঋণ চাইবে, তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

রত্নেশ্বর রায় মুখে একটি কথাও বলেননি। যা ভেবেছিলেন লেখা আছে তাঁর ডায়রীতে।

"এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি কল্পনা করি নাই। গোপাল সিংয়ের উপর কঠিন ক্রোধ ও আক্রোশ সত্ত্বেও এমন পরিণতিতে আমি বিমূঢ় এবং বেদনাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পিতৃদেব সুকৌশলে কস্টেলো পিদ্রুসকে দিয়া জন রবিনসনকে হত্যা করাইয়াছিলেন। আমি প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করিয়া সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলাম।"

অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে তখন সারা বাংলায় একটা বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল, তার সঙ্গে রবিনসনের নারী-লোলুপতার জন্য একটা ঘৃণা জমে উঠেছিল মানুষের মনে। নারীহত্যাও সে করেছিল। তাছাড়া যার কান্নায়-দুঃখে এই ক্ষোভ আক্রোশ সত্ত্বেও মানুষ এতটুকু দুঃখ পায় এমন কেউ তার এ-পৃথিবীতে ছিল না।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—"এমন পাষণ্ডের এই পরিণাম মানুষের কৌশলে সংঘটিত হইলেও, ভাবিয়াছিলাম ইহাই বিধাতা-নির্দিষ্ট দণ্ড। ঐ মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে আরও খুশি হইতাম কিন্তু এই পরিণামেও কোন দুঃখ পাই নাই।

"দে সরকারকে দণ্ড আমি নিজে দিয়াছি। তাহাতেও আপশোস করি নাই। কখনও করিব না। কারণ, সে গোটা শ্যামনগর পুড়াইয়াছিল, আমাকে পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল; আমি তাহার ঘর পুড়াইয়া দিয়াছি। ডাকাতেরা তাহার অধর্মসঞ্চিত অর্থ লইয়াছে, কিন্তু তাহার বাড়ীর নারী-শিশুদের অঙ্গ স্পর্শ করি নাই। হাতটা ভাঙিয়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, লোকটা স্বহস্তে জাল করিত। কিন্তু গোপাল সিংয়ের ক্ষেত্রে এ কি হইল? গোপাল সিং নিজে মরিলে কোন দুঃখ হইত না। কিন্তু এ কি হইল? নিজের পুত্রকে সে হত্যা করিল? শুনিতেছি সে বাঁচিবে না। লোকটা পাষণ্ড দুর্দান্ত, সে আমার মাতার অপমান করিয়াছে।

রবিনসন ও দে সরকারের হুকুমে সে-ই শ্যামনগরে আগুন জ্বালাইয়াছে, আমার পৃষ্ঠদেশে পোড়ার দাগ এখনও সামান্য ঘর্ষণে জ্বালা করে। কিন্তু তবু মন হায় হায় করিতেছে।"

ভবানী দেবী বলেছিলেন—বাঘের খাঁচায় লোক ফেলে দিলে বাঘ তাকে হত্যা করে কিন্তু হত্যার পাপ বাঘের তাতে একবিন্দু নেই, পাপ সবটাই মানুষের।

এই কথাটাই অমোঘ মনে হয়েছিল রত্নেশ্বরের। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল—"একদিন জমিদার আমি হইব, ইহা জন্মমাত্রেই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা মনে মনে জানিয়াও এমন কল্পনা কখনও করিতে পারি নাই। অত্যাচারী বলিয়া রায়বংশকে ঘৃণা করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, জমিদার হইয়া আমি আদর্শ জমিদার হইব।"

বীরেশ্বর রায় ভবানীকে বলেছিলেন—মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে সতীবউ। রাজা আর প্রজা, জমিদার আর রায়ত এক নয়। রাজার হাতে শাসনের ভার আছে। রাজাকে মধ্যে মধ্যে বাঘের খাঁচায় মানুষকে ফেলে দিতে হুকুম দিতে হয়। রাজধর্ম আলাদা। মিউটিনি দমন করতে কোম্পানী কাশীতে বালকদেরও গুলী করে মেরে ফেলেছে। রাম রাবণকে সবংশে বধ করেছিলেন।

কথাটা শুনে রত্নেশ্বর যেন পড়তে পড়তে একটা আশ্রয় পেয়েছিলেন। ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতার উত্তর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তাহার বাক্যই যেন আশ্রয়-দণ্ড হইয়া আমাকে আশ্রয় দিল। আমি বল পাইলাম। পিতৃদেব ঠিক কথা বলিয়াছেন। রাজধর্মের মতই জমিদারধর্মও স্বতন্ত্র। ইহা দুর্বলের জন্য নহে। দুষ্টকে দমন করিতে গিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য পাপ করিয়াছি মনে হইলে জমিদারী আসনে বসা চলিবে না। দৃঢ় হইতে হইবে।

"তবে আজ হইতে ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতঃপর যাহাই করিব, তাহা আইনসম্মত প্রকাশ্যপথে করিব। জমিদারী ধর্মে আইনই ধর্ম। সেখানে যাহা ঘটিবে, তাহার জন্য আমার কোন আপশোসের কারণ থাকিবে না।"

সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—তাও পারেননি তিনি। তিনি ঠাকুরদাসদাদাকে পিক্রসকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন। এবং তার আগেও আরও একটা হত্যা তিনি করিয়েছিলেন। সে-ও অবশ্য তিনি দুষ্টকে দণ্ড দিয়েছেন।

সুলতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—সে কে?

—সে? সে একজন গোয়ান চাপরাসী। রায়বাড়ীর অন্দরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সন্দেহে তাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠল সুলতা। রায়বাড়ীর অন্দরের সঙ্গে?

—হ্যাঁ। ওই অঞ্জনা মেয়েটির সঙ্গে।

সুলতা বললে—ওঃ!

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে বলব কি সুলতা, ওই কীর্তিহাটের বিবিমহলে বসে আমি জমিদার হলাম বাধ্য হয়ে। আমাকে তুমি জানতে। একালের মানুষ। আমি একালের সত্যকেই বড় করেই কাজ করছিলাম। আমার স্বার্থের চেয়ে মানুষের দাবীতে প্রজার দিকটাই বড় করে দেখেছি। কিন্তু আমারও মনে হয়েছিল শোধ নিতে শিবু সিংয়ের উপর। শোধ না নিলে আমার অন্যায় হবে। ধর্মচ্যুত হব আমি। আমার ইজ্জত আর থাকবে না। রত্নেশ্বর রায়ের কাল—১৮৫৯ সাল। আমার কাল ১৯৩৭ সাল। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। রায়বাড়ীর ছেলে অতুল জেলে। কুমারী মেয়ে অর্চনা, সে তাতে জড়িয়ে পড়েছে। মেজঠাকুমাও জেল খাটছেন। সে সময়ে প্রজাপীড়ন কতটুকু করতে পারা যায়? যতটুকু যায়, ততটুকু করেছি আমি। সুলতা, আমি শিবু সিংহের ফ্রি-শিপ বন্ধ করতে পারিনি—করিনি। কিন্তু বোর্ডিং ফ্রি-শিপ বন্ধ করেছিলাম। হরি সিংয়ের সঙ্গে কয়েকটা মামলাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সময়ে সুমতি হয়েছিল। চেতনা হয়েছিল এই ডায়রী পড়ে। নিবৃত্ত হয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—বাংলাদেশে, তাই বা কেন, পৃথিবীতে জমিদার এমন একজনও নেই বা হয়নি যে প্রজা দমনের নামে মানুষকে পীড়ন করেনি। ও হয় না।

গোপাল সিংয়ের ধ্বংস পর্ব, আচার্য দেওয়ান এটার নাম দিয়েছিলেন গোপালমেধ যজ্ঞ, শেষ হতে বেশী দিন লাগেনি। মাস-তিনেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। গোপাল সিংয়ের ফাঁসী হবার কথা। কারণ, গোপালের ছেলে ওই রাত্রেই মারা গিয়েছিল। থানায় তার খবর এবং এজাহার দিয়ে এসেছিল কুতুবপুর কাছারীর নায়েব। গোপাল তখন পালিয়েছে। কিন্তু বিচিত্র কথা কি জান, গোপালকে ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচালেন ভবানী দেবীর অনুরোধে বীরেশ্বর রায়।

পরের দিন ভোর রাত্রে ভবানী দেবী উঠে স্নান সেরে মন্দিরে এসেছেন, মঙ্গলারতি হচ্ছে মায়ের; তাঁর সামনে হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসল আপাদমস্তক চাদর ঢাকা একটি মেয়ে।

গোপাল সিংয়ের কনিষ্ঠা পত্নী। তার দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছে রায়বাড়ীর সতী বউরানীর কাছে।

—রানীমাঈ ভিখ্ সা।

ভোরবেলা তখন আবছা অন্ধকার রয়েছে। নাটমন্দিরে একটা পঁচিশ-বাতি সে-আমলের ঝোলানো কেরোসিনের চিমনী জ্বলছে। গোটা নাটমন্দিরে অল্পকিছু লোক। সারারাত্রি প্রায় উৎসব চলেছে। রাত্রি তিনটে নাগাদ উৎসবের বাতি নিভেছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেদের কাছে-পিঠের লোকের বাড়ী, দূরান্তরের লোকেরা এখানে-ওখানে রায়বাড়ীর চারিপাশে এবং সামিয়ানা খাটানো আসরের উপর শুয়ে আছে। হুকুম ছিল—কোন মধ্যবিত্ত

অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েছেলে থাকলে তাদের যেন ঠাকুরবাড়ীতে জায়গা দেওয়া হয়। এ-মেয়েটি কখন এসেছে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরবাড়ীর নাট মন্দিরেই আশ্রয় নিয়েছিল। উৎসবমত্ত রায়বাড়ীর কারুরই ঠিক খেয়াল নেই।

সতী বউরানী আরতির পর মন্দির থেকে নামছেন, এরপর যাবেন, গিয়ে পূজোতে বসবেন।

নাটমন্দির এবং মন্দিরের মাঝখানে, যেখানে হাড়িকাঠ পোতা আছে, সেইখানে তিনি নামবামাত্র এই অবগুণ্ঠনবতী এসে নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বসল। ভবানী দেবীর পিছনে ছিল অঞ্জনা এবং তাঁর দাসী-দামিনী। বাকি রায়বাড়ীর অধিবাসিনী কুটুম্বিনীরা সব তখন ঘুমিয়ে আছে। দারোয়ান-চাপরাসীরা ঢুলছে। পুরুষদের মধ্যে ন্যায়রত্ন এবং পরিচারক ছাড়া আর কেউ নেই।

এই আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটিকে এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে প্রথমটা ভবানী দেবী ভেবেছিলেন, সে দেবীকে প্রণাম করছে। তিনি সরে দাঁড়ালেন সম্মুখ ছেড়ে। কিন্তু মেয়েটি বললে,—রানীমাঈ, ভিখ্‌সা।

অস্ফুটপ্রায় স্বর, কিন্তু তার মধ্যেও কাতরতার অন্ত ছিল না। বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন বেরিয়ে এল।

চমকে গিয়ে পিছিয়ে এলেন ভবানী দেবী। এই শেষরাত্রে এমন অকস্মাৎ সামনে নতজানু হয়ে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কে তাঁকে ভিক্ষা চাচ্ছে ?

একলা তিনি চমকে ওঠেন নি, অঞ্জনা এবং দাসীটিও চমকে উঠেছিল। ন্যায়রত্ন মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে এসে সত্ত পা দিয়েছেন, তিনিও চমকে উঠে বলেছিলেন—কে ?

পরিচারক তাড়াতাড়ি নেমে এসে বলেছিল—কে গো ? কে ? কে তুমি !

ভবানী দেবী তখন নিজেকে সামলেছেন, তিনি পরিচারককে বলেছিলেন—তুমি সরে যাও। দেখছ না, মেয়েটি ঘোমটা দিয়ে রয়েছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে। তুমি সর।

ভবানী দেবী মেয়েটির জোড়করা হাত-দু'খানির রঙ এবং তার হাতের রূপোর মোটা কাকনির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, সে ভাল ঘরের মেয়ে এবং ঠিক এ-দেশের নয়। ভিখ্‌সা কথাটা তাঁর কানে ঠিক সুরটি তুলেছিল।

পরিচারক সরে গেলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কে বাছা ?

—আমি ভিখ্‌সা মাংতে এসেছি রানীমাঈ !

—বল, কি ভিখ্‌সা চাও ?

—আমার বাচ্চাদের বাপের জান। আমার সিঁথির সিঁদুর। দুনিয়ায় কেউ রাখতে পারবে না বলছে লোকেরা, কিন্তু আমি জানে রানীমাঈ, আপনি পারেন। আমি শুনিয়েছি, আপনি আপনার স্বামীকে বাঁচাইয়েছেন। কালীমায়ী আপনার বাত শুনেন।

অঞ্জনা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল, সে বললে—তোমার স্বামীর কি হয়েছে বল। কোথায় বাড়ী বল। কি নাম ?

ভবানী দেবী বলেছিলেন—থাক। তুমি আমার সঙ্গে ভিতরে এস।

তিনি তাঁকে অন্দরে নিচের তলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে বলেছিলেন—কোথা থেকে এসেছ মা ? বীরপুর থেকে ?

ঘোমটাশুদ্ধ মাথাটা নড়ে উঠেছিল—হ্যাঁ।

—বুঝেছি তা। তোমার ভিখ্‌সা ভিখ্‌সা শুনেই বুঝেছি। তার উপর তোমার হাতের রঙ, মোটা কাঁকনি। কতক্ষণ এসেছ ?

—রাত পহেলা প্রহরে বয়েলগাড়ী জুড়ে সঙ্গে আদমী নিয়ে বেরিয়েছি মায়ী, শেষরাতে এসে পঁহুছুলাম।

—গোপাল সিংয়ের ছেলে কেমন আছে ?

—মরে গেছে মায়ী।

—তার মা কি তুমি ?

না-এর ভঙ্গিতে মাথাটা নড়ে উঠল।—না। তারপর বললে—উ বড়কী আছে।

—হুঁ। সে ? সে কি করছে ?

—উকেও জখম করেছে মায়ী। তার উপর—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটি।

একটু স্তব্ধ থেকে ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—গোপাল সিং ?

—সে যে কোথায় ভেগেছে মাঈজী, সেই জানে।

—হুঁ।

—কাল পুলিশ এসেছিল মাঈজী। ইজাহার নিয়ে গেল, বড়ী বেটার লাস ভি আটকে রেখেছে। আজ সুবায় নিয়ে যাবে। লোকে বলছে উসকা ফাঁসী হোয় যাবে মায়ী। আপনি বাঁচান। মায়ী আপনি বাঁচান।

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আমি কি ক'রে বাঁচাব মা ? রায়বাড়ী তো কিছু করে নি ; যা ক'রেছে তার ফল ফলে গেছে। গোপাল সিং রায়বাড়ীর পাইক বরকন্দাজ খুন করলে ত আমি চাপা দিতে বলতাম। কিন্তু গোপাল রাগের বশে নিজের ছেলেকে—। ওঃ!

গোপালের স্ত্রী বলেছিল—মাঈজী, আজ সারা গাঁওয়ের লোক তার উপর খাপ্পা হয়ে গিয়েছে। তাকে পেলে হয় তো ছিঁড়ে ফেলবে, আরও খুন খারাবি হবে ; তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে লোকে তাকে খুঁজছে। এক তুমি বাঁচাতে পার। বাঁচাও তুমি। মায়ী আমার বালবাচ্চারা ছোট।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে।

—কিন্তু আমি কি করব বল ?

—তা আমি জানি না মায়ী। তবে তুমি পার। তোমার পতিকে তুমি সাবিত্রীর মত বাঁচিয়েছ। মা কালীর সঙ্গে তোমার বাতচিত হয়। এ আমাকে সবাই বলছে।

—কি বলছে ?

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মাঈজী, সবাই বলছে কালীমায়ীর রোষে সিংয়ের এই হাল হয়েছে। তোমার মত সতীকে সে কটু বলেছিল তারই সাজা দিয়েছে মা। তুমি খুশী হলেই—মাফ্ করলেই সে বাঁচবে !

ভবানী বলেছিলেন—মা, আমি কোনদিন তাকে শাপশাপান্ত করিনি। তবু তুমি বলছ, আমি অন্তর খোলসা করে বলছি—মা, গোপালকে বাঁচাও, মা, গোপালকে বাঁচাও। মা, গোপালকে বাঁচাও। আর—

একটু চুপ ক'রে থেকে ভেবে বলেছিলেন—আর আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের হুজুরকে, গোপালকে বাঁচাবার কোন পথ আছে কিনা ! তাঁরা কিছু পারেন কিনা ? যদি থাকে তবে নিশ্চিন্ত হও—তা আমি করব।

গোপালের স্ত্রী মেঝের উপরে হাত রেখে বসেছিল, সে হাতখানা মেঝের ধুলোতেই বুলিয়ে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকিয়েছিল !

ভবানী দেবী বলেছিলেন—কিন্তু তুমি তো কাল থেকে কিছু খাওনি মা !

কপালে হাত দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বউটি বলেছিল—থোড়া পানি পিয়েছি মায়ী। আর কিছু কি খাওয়া যায় ?

—যায় না। কিন্তু তবু খেতে হয় মা। কিছু খাও তুমি। তারপর নিজের ঝি দামিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দামিনী তোর উপর এর ভার রইল ! কিছু খাওয়া ওকে। আর, এ বাড়ীর কারুকে পরিচয় দিসনে যে গোপাল সিংয়ের স্ত্রী। মানুষ শত্রু হলে বড় নিষ্ঠুর ; তার ওপর—

একটু ম্লান হেসে বলেছিলেন—বড়লোক হলে তখন আর তার শেষ থাকে না। তারপর অঞ্জনাকে নিয়ে ওপরে চলে এসেছিলেন।

* * *

পূজোর ঘরে ঢুকবার আগে চাকর মহিন্দরকে ডেকে বলেছিলেন—বাবু উঠলেই আমাকে ইশারায় জানিয়ো। দেওয়ানজী কাছারীতে এলেই তাঁকে খবর দিয়ো কোন কাজ যেন আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে না করেন। রত্ন হয়তো উঠে থাকবে, তাকে ব'লো আমার আশীর্বাদ না নিয়ে যেন বাইরে না বের হয়। কোন হুকুম না দেয়। সে যেন কলকাতার জ্যেঠামশাই আর তাঁর ভায়রাভাইয়ের দেখাশোনা করে। অঞ্জনা তোমার উপর ভার রইল জগদ্ধাত্রী দিদির আর ওঁর বোনের।

গতরাত্রে এরই মধ্যে বীরেশ্বরবাবুর খুড়তুতো দাদা দেবপ্রসাদ এসেছেন, জগদ্ধাত্রী বউ এসেছেন, সঙ্গে এসেছেন সস্ত্রীক স-পুত্রকন্যা তাঁর ভায়রাভাই, মেদিনীপুর সদরের এস-ডি-ও রাধারমণবাবু।

তাঁরা ওদিকের মহলের দোতলায় আছেন। লোকজন চাকর দাসী সবই সেখানে মোতায়েন আছে, তবুও নিজেরা দেখাশোনা না করলে আতিথ্যে ত্রুটি হবে।

বীরেশ্বর, রত্নেশ্বর, দেওয়ান আচার্য—কারুর সাহায্যই কিন্তু ভবানীর প্রয়োজন হয় নি। কার্যোদ্ধার তিনি নিজেই করেছিলেন। স্বামী পুত্র কাউকে একটি কথাও বলতে দেন নি।

তিনি পূজোর আসনে বসে অন্তরের সঙ্গে ডেকে দেবতাকে বলেছিলেন—গোপালকে তুমি রক্ষা কর মা। ওই মেয়েটির কাছে আমার মুখ রক্ষা কর।

তাঁর চোখ থেকে জল গ'ড়িয়ে পড়ছিল। স্তবের সঙ্গে প্রার্থনা শেষ ক'রে তিনি প্রণাম সেরে চোখ খুলেই দেখেছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবীকে। জগদ্ধাত্রী তাঁর সম্পর্কে বড় হলেও তাঁর সখী, বয়সে তিনিই বছর দুয়ের বড়।

জগদ্ধাত্রী দেবী কখন এসে তার পূজোর আসনের খানিকটা দূরে বসেছিলেন। চোখাচোখী হতেই জগদ্ধাত্রী বলেছিলেন—তোর পূজো করা সার্থক! কতক্ষণ বসে আছি। খেয়াল নেই। চোখ থেকে জলের ধারা আর থামে না!

ভবানী হেসে চোখ মুছে বললেন—না ভাই, সাড়া ঠিক পাই নি।

—এমনি করে রোজ কাঁদিস?

—কাঁদি। কোন কোন দিন মনের দুঃখ জানাই আর কাঁদি!

—মনের আবার দুঃখ কি তোর এখন?

—সংসারটাই দুঃখে ভরা ভাই। আর নিজের দুঃখই কি সব?

—তা বটে।

—সুরবালা উঠেছে? রাত্রে কোন অসুবিধে হয় নি?

—অসুবিধে? বাপরে! মুখের কথা না-খসাতে পাঁচটা লোক ছুটে আসছে। তা ছাড়া ওই অঞ্জনা মেয়েটি। একেবারে হাজির হয়ে আছে। সুরো উঠেছে, সে মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, তোর ধ্যান দেখে চলে গেল। আমাকে রেখে গেল!

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবানী দেবী। বললেন—আমি যাচ্ছি। পূজোর কাপড় ছেড়ে, পূজোর হাত রত্নেশ্বরের মাথায় দিয়ে, ওঁর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি।

—না। তোর সঙ্গে কথা এখানেই বলবে সুরবালা। তুই পূজোর আসনে বসে থাকবি ও বলবে!

—কেন? কি ব্যাপার? দোহাই তোর, আমি ভাই সিদ্ধটিদ্ধ নই। কি ফ্যাসাদ মা। তারপরই একটা কথা মনে ক'রে এক নিশ্বাসেই বললেন—তা ছাড়া ওঁর কর্তা তো শুনেছি

সাহেবী মেজাজের মানুষ, বাড়াতে সাহেবী কেতা; সুরোবালাও তো মেমসাহেব হয়ে উঠেছিল শুনেছি, ওঁদের এসব বাতিক কেন?

হেসে জগদ্ধাত্রী বললেন—সে-সব উল্টে গেছে। এখন মাদুলী-কবচ পরে। মাঝখানে রাধারমণের ঝগড়া লেগেছিল ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, দারুণ ঝগড়া। চাকরি যায় যায়। হঠাৎ কার পরামর্শে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে দিয়ে যাগযজ্ঞি করিয়ে খুব ফল হয়েছে। সাহেবটা ঘোড়া থেকে পড়ে খোঁড়া হয়ে বিলেত চলে গেল; রাধারমণের চাকরি যাওয়া দূরের কথা উন্নতি হ'ল। বাঁকড়ো ছোট জেলা, সেখান থেকে মেদিনীপুরে এস-ডি-ও হয়ে এল। লালমুখের পোস্ট এটা, বাঙালীকে দেয় না; তা ওকেই দিলে। এখন ভক্তিটক্তি খুব। তার ওপর মেয়ে বড় হয়েছে; তেরো পার হতে চলেছে। সাহেবী মেজাজ নামের জন্যে ভাল বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে না। মুখটিপে হাসলেন জগদ্ধাত্রী দেবী। বললেন—তা না হ'লে নিজে যেচে চিঠি লিখে আমাদের সঙ্গে ক'রে তোর বাড়ী এসেছে!

ভবানী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আভাস তিনি পেয়েছেন।—মেয়ের বিয়ে?

প্রশ্নটা করবার আগেই জগদ্ধাত্রী দেবী মৃদুস্বরে বললেন—ওই এসেছে ওরা! অঞ্জনার সঙ্গে বাড়ী ঘুরে, ছাদে উঠে গ্রামটা দেখে এল। জানবাজারের বাড়ী দেখেছে একদিন!

তারপরই উচ্চকণ্ঠে বললেন—আয় সুরো আয়। আমি বসিয়ে রেখেছি।

ভবানী দেবী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এবং দেখলেন বারান্দায় দরজার ঠিক মুখেই অঞ্জনা এবং তার পিছনে সুরবালা ও তার বড় মেয়ে স্বর্ণলতা ঘরে ঢুকছে। হেসে ভবানী বললেন—আসুন!

অঞ্জনা তাড়াতাড়ি একখানা গালিচা এনে বললে—মামীমা, আপনি মেঝেতে বসেছেন! উঠুন উঠুন এখানা পেতে দি!

সুরবালা সরাসরি বললেন—আমার স্বর্ণকে এনেছি আপনার কাছে। ওকে ... আপনার পূজোর আসনের সামনে আপনার হাতে দিতে এসেছি। ওকে আপনাকে নিতে হবে। বলুন, পূজোর আসনে ব'সে বলুন নিলেন!

মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু রূপ যেন একটু উগ্র। রঙ উগ্র, চোখের দৃষ্টি একটু খটখটে, হয়তো মেজাজ একটু উগ্র হবে। মেয়েটি একটু ডাগরই হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল রত্নেশ্বরকে।

রত্নেশ্বরও সেদিক থেকে বিয়ের বয়স পার হয় হয় বয়সে পৌঁচেছে। কুড়ি বছরে পা দেবে। রত্নেশ্বরের বিয়ের কথা এতদিন বিমলাকান্ত বলেন নি, বীরেশ্বর বলেন নি, বলেন নি ঠিক এই দিনটির জন্যে। এ দিনটি না পার হলে বিবাহের আসরে হয় অধর্ম ক'রে মিথ্যা বলতে হত না-হয়, রায়-বাড়ীর গুপ্তকথা প্রকাশ পেত।

বিবাহের সম্প্রদানের আসরে বলতে হবে—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য প্রবরস্য—কুড়ারাম দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রং—সোমেশ্বর দেবশর্মনঃ পৌত্রং—বীরেশ্বর দেবশর্মণঃ পুত্রম। কিন্তু

তা বলবার উপায় ছিল না। রত্নেশ্বর এতদিন বিমলাকান্তের পুত্র বলে পরিচিত ছিল! সত্য বললে রায়বংশের যে কথা—যে মর্মান্তিক সত্য—নবদ্বীপে শ্যামাকান্তের কবরের নিচে চাপা পড়েছে—তা প্রকাশ হয়ে পড়ত!

রত্নেশ্বরের সঙ্গে ভালই মানাবে।

সুরবালা বলেছিলেন—মেয়ে আমার অসুন্দর নয় ভাই। তাছাড়া আপনার রত্নেশ্বর শুনেছি ভাল লেখাপড়া করেছে। কাল রাত্রে উনি তো কথাবার্তা বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লেখাপড়া খুব ভালবাসে। আমার মেয়েকেও লেখাপড়া শিখিয়েছি। বাংলা তো ভালই জানে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা মুখস্থ! ইংরিজীও বেশ ভাল জানে—উনি শিখিয়েছেন। ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক একেবারে মুখস্থ। ইস্কুলে দেবার জন্তে উঠ্‌বন্দী, তা আমি দিতে দিই নি। তা হ'লে আর ব্রাহ্ম না হয়ে উপায় থাকত না।

ভবানী ভাবছিলেন। মনের মধ্যে রত্নেশ্বর, তারপর বীরেশ্বর তারপর মনে হল রাধারমণবাবু এস-ডি-ও; তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল অবগুণ্ঠনাবৃতা একটি মেয়ে, তারপর মনে পড়ল গোপাল সিংয়ের নাম। আবার মনে পড়ল রাধারমণবাবু এস-ডি-ও!

সুরবালা বলেছিলেন—আমরা অবিশ্যি চাকরে। আপনারা মস্ত জমিদার। রাজা লোক। তবু এ বিয়েতে অগৌরব হবে না আপনাদের!

ভবানী বলেছিলেন—আমি ভাই পণ নেব!

—দেব। আমাদের সাধ্যমত দেব। বলুন কি নেবেন?

—মেয়ে-জামাইকে কি দেবেন সে আপনারা জানেন। যা দেবেন তাই অনেক। তবে আমি মা, আমাকে পণ দিতে হবে!

—বেশ তো! বলুন। হুকুম করুন!

—সে ভাই, মেয়ের বাপকে বলব। পণ নেব আমি তাঁর কাছে।

* * *

সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী তাঁর ভাবী বৈবাহিকের কাছে পণ নিয়েছিলেন—গোপাল সিংয়ের মামলা থেকে মুক্তি! তিনি বলেছিলেন—ওর স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি। গোপালকে বাঁচাতে যা করবার করব।

রাধারমণবাবু অভিভূত হয়েছিলেন ভবানী দেবীর করুণা দেখে। তিনি বলেছিলেন—লোকটা পাষণ্ড, অতি দুর্দান্ত, সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর লোক। এবার নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছে। এসব লোকের সাজা হওয়াই উচিত। তবু আপনি যখন বলছেন, তখন আমা থেকে যতটুকু হয় করব আমি। আসল হাত আপনাদের। আপনারা যদি, মানে বীরেশ্বরবাবু যদি, বীরপুরের লোকেদের সামলান, তারা যদি সাক্ষী না দেয়, তা হ'লে খালাস পেয়ে যাবে! আমি বলব যাকে যা বলবার, মানে তদন্তের সময় তারা যাতে চোখ বুঁজে তদন্ত ক'রে যায়, তা বলব।

ভবানী বলেছিলেন—ওঁকে আমি বলেছি।

সে এর আগেই হয়ে গেছে। বীরেশ্বর রায়ও ভবানীর কথায় গোপালকে ক্ষমা করেছিলেন। রাধারমণবাবুর সঙ্গে একথা হবার আগেই তিনি স্বামীর কাছে একথা বলে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—সতীবউ, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই! তাই হবে, দিলাম!

ভবানী তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন তাঁর পায়ের উপর।

বীরেশ্বর সমাদর ক'রে তাঁর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওঠ, কেঁদো না। তুমি করুণাময়ী। তবে একটা কথা আছে।

মাথা তুলে বসেছিলেন ভবানী দেবী।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তার স্ত্রীকে বল, সর্ত হ'ল গোপাল সিংকে আসতে হবে। হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে হবে! অন্যায় বলছি?

ভবানী বলেছিলেন—না। অন্যায় বলনি। তা করতে হবে বইকি! মামলা-মকদ্দমা এ সবই তাকে মেটাতে হবে। নিশ্চয় হবে। কিন্তু তুমি রত্নেশ্বরকে বল! সে হয়তো কথা শুনতে চাইবে না!

—তোমার কথা শুনতে চাইবে না?

—তুমি বুঝতে পার না?

একটু চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা পারি! রত্নেশ্বর আমার থেকেও জেদী. আমার চেয়ে সে শক্তিতেও বড়। আচ্ছা, তাকে বলব আমি।

ভবানী বলেছিলেন—আমি যাই, তোমার কাছে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

—একটু বস। তুমি বড় দূরে দূরে থাক। এতকাল পর ফিরে এসেও কাছে এলে না; ব্রত করেছিলে, তা শেষ হয়েও শেষ হ'ল না। ব্রতধর্ম নিয়েই থেকে গেলে।

ভবানী তাঁর কাছে একটু সরে বসে বলেছিলেন—রত্নেশ্বরের বিয়ে হোক, তাকে সব ভার দিয়ে চল আমরা তীর্থ বেড়িয়ে আসি।

—খুব ভাল বলেছ। খুব ভাল বলেছ। এখন সুবিধাও হল, রেলগাড়ী হয়ে গেল! পথের কষ্ট নেই। তাই যাব! শুধু তীর্থ নয়, আগ্রা লক্ষ্ণৌ দিল্লী এসবও দেখে আসব। আগ্রায় তাজমহল দেখব। তুমি তাজমহল দেখো, আমি তোমাকে দেখব!

হঠাৎ একটা শব্দে তাঁদের বাক্যালাপে ছেদ পড়েছিল। দরজার ওপাশে রান্নাঘরের মেঝের উপর একটা কিছু যেন পড়ে গিয়ে শব্দ হয়েছিল।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে?

ভয়ার্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এসেছিল—আমি! অঞ্জনা!

ভবানী দেবী বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। অঞ্জনার শ্যামবর্ণ মুখও ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, সে একখানি পরাতের উপর বীরেশ্বর রায়ের প্রাতঃরাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। পরাত থেকে জলের গ্লাসটা কি ক'রে মেঝের উপর পড়ে গেছে। সে পরাতখানা নামাতেও পারছে না, জলের গ্লাসটা নিয়ে কি করবে তাও বুঝতে পারছে না।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—পড়ে গেল গ্লাসটা? কি ছিল ওতে?

—জল! কোনরকমে উত্তর দিয়েছিল অঞ্জনা।

—তা যাক। ওটা তুমি আমাকে দাও, দিয়ে, যাও নতুন গ্লাসে জল নিয়ে এস। না, মহেন্দ্রকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি বরং রত্নেশ্বরকে গিয়ে বল, সে যেন এখুনি এ ঘরে আসে। একটু পর! ওর খাওয়াটা হয়ে যাক। বুঝেছ!

ঘাড় নেড়ে—হ্যাঁ—জানিয়ে অঞ্জনা চলে আসতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল। সে খাবারের পরাত নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল, কর্তা-গিন্নীর কথার সাড়া পেয়ে। ভাবছিল সাড়া দিয়ে ঢুকবে কি না; এই মুহূর্তেই কানে এসেছিল বীরেশ্বরের গাঢ়স্বর এবং সেই গাঢ়স্বরের ওই গাঢ় কথা ক'টি—একটু বস'। তুমি বড় দূরে দূরে থাক। কতকাল পর ফিরে এসেও কাছে এলে না।

রত্নেশ্বরের সমবয়সী অঞ্জনা, রত্নেশ্বর থেকে কয়েকদিনের বড। সেদিন বলেছিল—সাত-দিনের বড়। কিন্তু না, ঠিক হিসেবে আটদিনের বড়। সে হিসেবটা হয়েছিল রত্নেশ্বরের জন্মদিন ধ'রে নয়, বিমলার মৃত সন্তানের জন্মদিন ধ'রে। বয়স তার উনিশ পার হচ্ছে। তার উপর সন্তান হয়নি। এবং বিচিত্র চরিত্র, দারিদ্র্য এবং বাউণ্ডুলে স্বামীর উপেক্ষার মধ্যেও কৌতুক আর পরের ঘরের আনন্দ উল্লাসের ভাগ নিয়ে সে শুধু বেঁচেই নেই, সংসারে বিচরণ করে বেড়ায় চঞ্চল পদক্ষেপে। দশের সম্মুখে কোনরকমে পদক্ষেপের সে চাঞ্চল্য সংযত হয়, কিন্তু একা হলে আর রক্ষা থাকে না। সেদিন সেই মুহূর্তে ওই ভেজানো দরজার এপাশে একলা ওই রাস্তা-ঘরটিতে দাঁড়িয়ে কর্তা এবং গৃহিণীর এই গাঢ় কথাবার্তা শুনে তার অন্তরের কৌতুক-সরসতা উছলে উঠেছিল। সে নীরবে দাঁড়িয়ে আড়িপাতার মত শুনতে আরম্ভ করেছিল তাদের কথাগুলি। তন্ময় হয়ে শুনছিল। যখন বীরেশ্বর বলেছিলেন—তাজমহল দেখতে যাব, সেখানে তুমি দেখবে তাজমহল আর আমি তাকিয়ে থাকব তোমার মুখের দিকে। তখন তাঁর কৌতুক-সরসতা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল দমকা বাতাসের মত। হাসি চাপতে গিয়ে মুখে কাপড় চাপা দেবার জন্য হাত খোলা পায় নি; ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের কাপড়ে মুখ গুঁজতে গিয়ে নড়ে উঠেছিল হাতে ধরা পরাতখানা এবং গ্লাসটা গিয়েছিল সশব্দে মেঝের উপর পড়ে। লজ্জার এবং ভয়ের আর অন্ত ছিল না।

বড়লোকের বাড়ীতে আগন্তুক দরিদ্র আত্মীয়দের অবস্থা বড় নিদারুণ। চাকরদের চেয়েও

মর্মান্তিক। তার উপর সদ্য একদিন আগে তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ভবানী দেবী তাকে নিজের কাছে রেখেছেন, তার সব ভার নিয়েছেন, বাউণ্ডুলে স্বামীকেও চাকরি দেবেন বলেছেন। চোখের উপর এ বাড়ীর ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ খেলা দেখেছে। গোপাল সিং-এর খবরের মধ্যে এদের বিক্রম দেখেছে, বীরেশ্বর রায়ের গাম্ভীর্য দেখেছে, ফলে একটা নিদারুণ ভয়ও তার অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত ছায়ার মত জমে উঠেছে। সেটা তাকে হাঁ ক'রে গিলতে এসেছিল সেই মুহূর্তে। কেঁপে উঠে সে কোনরকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল; ঠেসটা না পেলে হয়তো পড়ে যেত।

ভবানী দেবী এসে তাকে তিরস্কার করলেন না, তাকে অব্যাহতি দিয়ে বললেন—মহেন্দ্রকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দাও। আর তুমি রত্নেশ্বরকে বল, সে যেন কর্তার সঙ্গে এখুনি দেখা করে।

সে বাঁচল। বেঁচে গেল। রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাটা হাল্কা পায়ে পার হয়ে ডানদিকে আর একটা রান্না-ঘরে বেঁকে সে খানিকটা ছুটে নিল আনন্দে এবং কৌতুকে। কিন্তু আবার থমকে গিয়েছিল রত্নেশ্বরের ঘরের সামনে এসে। রত্নেশ্বরকেও তার ভয় হয়ে গেছে ওই বীরেশ্বর রায়ের মতই। তারই বয়সী, তার থেকে সাতদিনের ছোট এই আত্মীয়টি শুধু লম্বায় চওড়াতেই নয়, চোখের চাউনিতে, কথায়-বার্তায়, তার থেকে ওজনে অনেক ভারী। নিজেকে সংযত করেই সে ঘরে ঢুকেছিল।

কিন্তু রত্নেশ্বর তাকে আশ্চর্য হাল্কা এবং প্রসন্ন মেজাজে স্নেহসরস কণ্ঠে বলেছিলেন—কি সংবাদ ?

রত্নেশ্বরও বিবাহের কথার সংবাদটা শুনেছেন। তাঁর মেজাজে তখন দোলা লেগেছে। তিনি প্রসন্নমনেই ছিলেন এবং অঞ্জনার মতই কাউকে খুঁজছিলেন যার কাছে তিনি অসঙ্কোচে সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি বাইরে বের হবার জন্যে পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এবং এই কথাই ভাবছিলেন।

চাকরদের কাছে এ সংবাদ অসঙ্কোচে সংগ্রহ করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে বোন বউদি অথবা ঠাকুমা দিদিমারাই গুপ্তচরের কাজ করবার যোগ্য পাত্রী। কিন্তু তেমন কেউ ছিল না। তাই অঞ্জনাকে দেখে তিনি তার মধ্যেই সেই প্রত্যাশিত জনটিকে পেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে—।

সুরেশ্বর বললে—তাই বা কেন সুলতা, উচ্ছ্বসিত উল্লাসের সঙ্গেই আহ্বান এবং প্রশ্ন করেছিলেন—কি সংবাদ ?

পৃথিবীতে এমন কতকগুলো জায়গা আছে, যে জায়গাগুলোতে ধ্বনির প্রতিধ্বনি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে সাড়া দেয়। অনেক খিলেনওলা বাড়ীতে একটা কে শব্দ বললে প্রতিধ্বনিতে সাতটা আটটা কে পরপর স্পষ্ট হয়ে বেজে বেজে যায়। অঞ্জনার প্রকৃতি চরিত্র ঠিক এমনি ধরনের। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া বাজে। রত্নেশ্বর রায়ের এই হাল্কা মেজাজের সুপ্রসন্ন ওই কি সংবাদ

প্রশ্নটির প্রতিধ্বনি মুহূর্তে উত্তর হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তার মুখ থেকে। তার নেভানো কৌতুকসরস চিত্তদীপটি দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সে বলেছিল—সংবাদ, সুসংবাদ! মিষ্টি খাওয়ান।

—মিষ্টি? তা খাওয়াব। কিন্তু সংবাদটা আগে বল!

—আপনার বিয়ে।

—বিয়ে!

—হ্যাঁ। কনে তো দেখা দিতে এসেছে!

—শুনেছি।

—দেখেছেনও!

—দূর থেকে।

কৌতুকময়ী মেয়েটি মুহূর্তে রঙ্গময়ী হয়ে উঠে চুপিচুপি বলেছিল—কাছ থেকে দেখতে চান না কি?

—উঁ? কাছ থেকে দেখা? না—। এতটা থাক। কিন্তু তোমাকে খুঁজছিলাম।

—কেন?

—মেয়েটি মানুষ কেমন যাচাই ক'রে বলতে পার?

—পারি! কি যাচাই করতে হবে বলুন!

—এখন হবে না। বলব তোমাকে। বুঝেছ। আমি এখন একটু বেরুব। সরকারী হাকিমরা আসবেন। বিবি-মহলে যাব। পরে, দুপুরবেলা একটু অবসর ক'রে এস।

—আসব! কিন্তু এখন বাইরে যাবেন না। কর্তাগিন্নী ডাকছেন আপনাকে। বসে আছেন।

—বাবা মা দুজনে ডাকছেন? কেন?

—তা জানিনে। আসুন এখন। এমনিতেই কথায় দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার বিয়ের আনন্দে!

—আমার বিয়ের কথায় তোমার এত আনন্দ?

—হবে না। কত ধুমধাম হবে। কিন্তু আসুন!

পথে যেতে যেতে অঞ্জনা বলেছিল—বাবাঃ যে বিপদ হয়েছিল—।

—কি বিপদ?

—সে সেই দুপুরবেলা বলব!

বাপ মায়ের ঘরের সামনে এসে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকলেন রত্নেশ্বর। —মা!

উত্তর দিলেন বীরেশ্বর।—এস।

তার পোশাকপরিচ্ছদ দেখে বললেন—বেরুচ্ছ কোথাও?

—হ্যাঁ, বিবিমহলে যাব।

—হ্যাঁ দেখে এস। সমস্ত বন্দোবস্ত নিজে দেখা উচিত। রাজকর্মচারী আসবেন। এঁরা হলেন সাপ, গোখরো সাপ, বাঁশী বাজিয়ে যতক্ষণ মনোরঞ্জন করে রাখতে পারবে ততক্ষণ বেশ তালে তালে দুলে দুলে নেচে যাবেন। যেমনি তাল কাটবে কি তার প্রতি একটু অন্যমনস্ক হবে, অমনি ছোবল দেবেন। চাণক্যের শ্লোকেই আছে—রাজকুলকে বিশ্বাস করো না। অবশ্য এবার রাধারমণবাবু রয়েছেন বাড়ীতে, তিনি আত্মীয় হয়ে এসেছেন, আত্মীয় হতেও চাচ্ছেন। তাঁর জন্যে অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার হবে। তবু দেখে এস। নিন্দারই বা কিছু থাকবে কেন। যাবার সময় বিবিমহল হয়ে যাও, ওঁদের সঙ্গে দেখা করে কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করে যাবে। দেবব্রত দাদা আছেন, জ্যেঠাইমা আছেন, ওঁদের প্রণাম যেমন করবে, তেমনি রাধারমণবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করবে।

—যে আজ্ঞে। ওঁদের কাছ হয়েই যাচ্ছি।

—বস, আর একটা কথা আছে। তোমার জননী একটি কঠিন ভিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একজনকে। ভোরবেলা মঙ্গল আরতির সময় একজন স্ত্রীলোক প্রার্থী তাঁর পায়ে ধ'রে ভিক্ষে চেয়েছেন—উনি মায়ের সামনে দেব বলেছেন।

রত্নেশ্বর ভুল বুঝলেন। তিনি ভাবলেন, ভোরবেলা সম্ভবতঃ রাধারমণবাবুর স্ত্রী বিয়ের কথা তুলে ভবানী দেবীর কথা আদায় করছেন। সেই কথা বলছেন বাবা। তিনি হেসে বললেন—কথা দিয়েছেন মা, তখন কথা কি আছে। দিতে হবে!

ভবানী দেবী এবার কথা বললেন—গোপাল সিংয়ের স্ত্রী এসে হাত জোড় ক'রে আমাকে বললে—আমার স্বামীকে বাঁচাও মা! এ এক তুমি পার। আমি তাকে কথা দিয়েছি রত্ন। মেয়েটি বলছে—গোপালের ফাঁসী হয়ে যাবে। তার বড় ছেলে মারা গেছে, বাঁচেনি। বড় স্ত্রী মর-মর। গাঁয়ের লোক ক্ষেপে গিয়েছে গোপালের উপর। পুলিশ এসেছে, তাকে খুঁজছে। সে ফেরার।

বীরেশ্বর রায় বললেন—আমাকে উনি বলতেই আমিও তুমি যা বললে তাই-ই বলেছি, তবে সর্ত রেখেছি, গোপালকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে প্রকাশ্য কাছারীতে। মণ্ডলান দাবী নিজে থেকে নাকচ করতে হবে। তা ছাড়া যেখানে যা জবরদখল ক'রে রেখেছে সব ছাড়তে হবে!

মুখ নিচু করে রত্নেশ্বর শুনে যাচ্ছিলেন কথাগুলি। ক্ষণেক্ষণে তাঁর কপাল কুঁচকে উঠছিল। গোপাল সিংকে ক্ষমা করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। রাগ হচ্ছিল তাঁর মায়ের উপর! ক্ষমা করবেন তিনি গোপালকে? গোপাল তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিল, তা তো তিনি না-জানা নন। গোপাল তাঁকে ঘর-বন্ধ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচাতে হবে? একি সত্য যুগ না ত্রেতা যুগ না দ্বাপর যুগ? শিবি রাজা আশ্রিত পায়রাকে বাঁচাবার জন্যে

নিজের গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন বাজপাখীকে। জীমূতবাহন নাগকে রক্ষা করতে গড়ুরের আহার হতে গিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ ক্ষমা করেছিলেন পুত্রঘাতী বিশ্বামিত্রকে। এটা কলি যুগ!

ভবানী ছেলেকে নীরব দেখে বলেছিলেন—কি তুই চুপ ক'রে রইলি যে?

—কি বলব? তুমি কথা দিয়েছ, বাবা তাই মেনে নিয়েছেন, এর ওপর আমি আর কি বলব? তবে—

—কি?

—তবে এতে আমাদের করবার কি আছে? আমরা বাঁচাব বললেই তো বাঁচানো যাবে না। এ তো এখন কোর্টের হাতে। এ তো খুনের মামলা দাঁড়াবে! বাদী তো আমরা নই।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা নই। কিন্তু কেসের সাক্ষীর মালিক আমরা। বীরপুরের সাক্ষী বীরপুরের প্রজারা। আমরা যা বলাব, তাই তারা বলবে। তা ছাড়া সরকারী মহলকেও আমরা একটু আধটু ব'লে কয়েও দিতে পারব বই কি! ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই জটিল হয়েছে বেশী। তোমাকে, সে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল—

—যদি তাই হ'ত, তা হ'লে কি গোপালকে বাঁচাবার কথা বলতে পারতেন! মা এ কথা দিতে পারতেন?

—না। তা পারতাম না। কিন্তু তা যখন হয় নি রত্ন, তখন ক্রোধ তোমার সম্বরণ করাই উচিত!

ভবানী বলে উঠলেন—ওরে তোর—তোর বাপের এতে কল্যাণই হবে। বুঝলি, দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। বল তো কি কাণ্ড হল? লোকটা নিজের ছেলেকে খুন ক'রে বসল'। তোদের ওপর রাগে! তা ছাড়া রত্ন, তুই ফিরে এলি আপনার অধিকারে। তোর বিয়ে দেব। তুই সংসারী হয়ে জীবন আরম্ভ করবি। আজ দয়াধর্ম ক'রে আশীর্বাদ কুড়িয়ে নে বাবা। লোকে ধন্য ধন্য করুক।

বীরেশ্বর বললেন—আরও একটা কথা আছে রত্ন, আজ গোপালকে রক্ষা করলে লোকে বলবে—এরা শুধু মারতেই পারে না, ইচ্ছে করলে এরা বাঁচাতেও পারে!

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন—"শেষ কথা দুইটাতে আমার ক্ষোভ অপসারিত হইল! নূতন সংসারজীবনে প্রবেশ করিব, এই সময় গোপাল সিং-এর ওই অল্পবয়সী স্ত্রীটির এবং তাহার বালকপুত্র দুইটির অশ্রুজলে অবশ্যই আমার কল্যাণ হইবে না। ইহা অপেক্ষাও মূল্যবান কথা বলিয়াছেন পিতৃদেব। তাঁহার বিবেচনা বুদ্ধি এবং বিচারবোধ যতই দেখিতেছি ততই বিস্মিত হইতেছি। সত্যই তো, লোকে বলিবে—রায়বাবুরা ইচ্ছা করিলে শুধু মারিতেই পারেন না; ইচ্ছা করিলেই বাঁচাইতেও পারেন। বুঝিতে পারিয়া বলিলাম—ঠিক বলিয়াছেন। আমার আর কোন ক্ষোভ রহিল না। গোপালকে রক্ষা করাই এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য।"

* * *

রত্নেশ্বর এবার উঠবার জন্ম উদ্যত হয়েছিলেন। ভবানী বলেছিলেন—আর একটু ব'স। গোপালের স্ত্রীকে ডাকি, তাকে তোরা বাপবেটায় একটু আশ্বাদ দে। আর কথাগুলোও বল!

গোপালের স্ত্রী এসে প্রায় হাউ-মাউ করে কেঁদেছিল। সে কান্নায় রত্নেশ্বর স্থির থাকতে পারেন নি, কিন্তু বীরেশ্বর রায় অবিচলিত ছিলেন। রত্নেশ্বরের চোখে জল এসেছিল। তিনি তা গোপান করতেই জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় স্থির হয়ে বসে গড়গড়ার নল টেনেই গিয়েছিলেন। গোপালের স্ত্রীকে তার কান্নার বেগ কমে এলে বলেছিলেন—শোন বাছা, কতকগুলো কথা আমি ব'লে নি। স্থির হয়ে শোনো!

একে একে সর্তগুলি বলে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

মণ্ডলান তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

বীরপুরের সমস্ত জবর-দখল সম্পত্তি ছাড়তে হবে।

কীর্তিহাটের কাছারীতে এসে কসুর স্বীকার করে মাফ চাইতে হবে।

এবার বল, তুমি গোপাল সিংকে রাজী করাতে পারবে?

দীর্ঘ ঘোমটাটানা ছত্রির মেয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—হ্যাঁ। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে পেয়েছিল অঞ্জনাকে। তাকে বলেছিল—রাণী মাঈজীকে একবার ডেকে দাও।

ভবানী দেবী উঠে এসেছিলেন, সে ভবানী দেবীকে বলেছিল—সে রাজী না-হলে আমি আর আসব না। রাজী হলে আমি নিজে তাকে নিয়ে আসব!

এতে মত শুধু দেন নি দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য!

তিনি সব শুনে বলেছিলেন—এ কি করছেন বাবা বীরেশ্বর?

বীরেশ্বর রায় চুপ করে ছিলেন—উত্তর দিতে পারেন নি!

ভবানী দেবী বলেছিলেন—মায়ের সামনে আমি কথা দিয়েছি দেওয়ান কাকা।

আলোচনাটা হয় তো আরও কিছুক্ষণ চলত কিন্তু মহিন্দর চাকর খবর নিয়ে এসেছিল—দেবব্রতবাবু, রাধারমণবাবু হাকিমসাহেবকে নিয়ে বাবুর কাছে আসছেন!

দেওয়ান আচার্য একটি কথা বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন—তা'হলে আমি যাই। ওঁরা আসছেন। ওদিকে অনেক কাজ! আপনারা হুকুম করছেন, আপনারা মালিক; আপনারা যা বলছেন তাই হবে! তবে—। একটু চুপ করে থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—সাপের মাজা ভেঙে ছেড়ে দিলে কিছুদিন পর আবার ভাঙা মাজা জোড় খায়। তখন সে সাপ হয় কালসাপ!

বলতে বলতেই—কই ভায়া কই? বলে দেবব্রতবাবু সাড়া দিয়েছিলেন।

—এস, দাদা এস!

—হ্যাঁ, মহিন্দর বললে—তুমি একটু পর আসছ। তা রাধারমণ বললেন—সেটা ওঁকে কষ্ট দেওয়া হবে, ওঁর হাঁটতে কষ্ট হয়, বাঁ পা এখনও টেনে চলতে হয়; চলুন আমরাই যাই। রাধারমণও এসেছেন। তোমার বউদি, সুরবালা, সুরবালার মেয়ে স্বর্ণ, ছেলে মণীন্দ্র সকলে এসেছি আমরা।

বীরেশ্বর বিছানা থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালেন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য। ভবানী তাঁর লাঠিটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

—আসুন—আসুন—আসুন!

দেওয়ান আচার্য বেরিয়ে চলে গেলেন।

* * *

রাধারমণবাবু বসেই বললেন—এ তো আপনারা রাজত্ব গড়ে তুলেছেন বীরেশ্বরবাবু!

বীরেশ্বর রায় হেসে বললেন—পূর্বপুরুষ করে গেছেন। আমাদের ভাগ্যে আমরা ভোগ করেছি।

—তা করুন। রাজারা—রাজাদের ছেলেরা তাই করে। কিন্তু অনেক কীর্তি করেছেন। ভারী ভাল লাগল! আপনার রত্নেশ্বরও খুব উপযুক্ত, খুব যোগ্যতা। He is a brilliant boy—আপনার দেওয়ান আমাকে বলছিলেন।

রত্নেশ্বর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। প্রণামাদি আসবামাত্র হয়ে গেছে।

রাধারমণবাবু বললেন—কে একটা দুর্দান্ত দুষ্ট লোক নাকি ভারী উপদ্রব শুরু করেছে। বলছিলেন আপনার দেওয়ান। শুনলাম আপনাদের ওপর রাগে সে না কি নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছে, বাধা দেওয়ায় তার নিজের ছেলেকে মাথায় মেরেছে এমন ক'রে যে খুন হয়ে গেছে! আমি সব বলব আপনাদের এস-ডি-ওকে! পুলিশকে একটু কড়কে দেবেন। ওরা সব পারে! এসব লোকের চরম সাজা হওয়া উচিত। আমি শুনে খুশী হলাম কেন জানেন? আপনারা বেআইনী জবরদস্তি কিছু করেন নি! আপনারা আইনের পথেই চলেছেন! গভর্নমেণ্টও এইটে চাচ্ছেন।

বীরেশ্বর বললেন—কিন্তু বড় মর্মান্তিক হয়ে গেল ব্যাপারটা। বিশেষতঃ আমার গৃহিণীর মনে বড় লেগেছে। তিনি বলছেন—মণ্ডলানটা এইভাবে—

বাধা দিয়ে রাধারমণবাবু বললেন—নো—নো—নো স্যার, নো। আপনারা ঠিক করেছেন। খুব ভাল কাজ করেছেন। জানেন না বোধহয়, গভর্নমেণ্ট ভূমিস্বত্ব আইন সংশোধন করছেন। তাতে প্রজাদের অনেক সুবিধে হবে। বড়লাটের কাউন্সিলে আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা চলছে।

রত্নেশ্বর বললেন—Mr. Currie মুভ করছেন!

To amend the law relating to the recovery of rent in the Presidency

of Fort William in Bengal. ?

—তুমি খবর রাখ! বাঃ! হ্যাঁ ওটা অনেকদূর এগিয়েছে। মোটামুটি

it is meant for improving the position of the raiyats of Bengal. দুটো জিনিস নির্ঘাৎ—একটা হল—

the abolition of the Zaminders. Power to compel the attendance of their raiyats.

আর হাজির করতে বাধ্য করতে পারবেন না জমিদাররা। Second হল বারো বছর এক-নাগাড় প্রজা জোত ভোগ করলেই অকুপেন্সী রাইট হয়ে যাবে। বারো বছরের উপর মণ্ডলান স্বত্বের মণ্ডলকে তালুকদারী যদি দেয় ওই বারো বছরের দাবীতে তাহ'লে আপনাদের মুস্কিল হবে। বীরপুরের case-এ ঠিক ক'রেছেন আপনারা। এরপর মণ্ডলান আয়মাদারী এসব আর থাকবে না। আপনাদের দেওয়ানের ফারসাইট আছে। খুব ভাল ব্যবস্থা করেছেন!

ওদিকে জগদ্ধাত্রী সুরবালা স্বর্ণলতা ভবানী দেবীকে ঘিরে পাশের ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু ওঁদের কান ছিল এ-ঘরে। সুরবালাই বললেন—ধান ভানতে শিবের গীত। এখানে এসেও সেই গভর্নমেণ্ট গভর্নমেণ্ট আর আইন আর আইন। দেখ তো কাণ্ড! বল না—জগদি!

জগদ্ধাত্রী দেবী উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—ও মশাই সাহেবমানুষ। মেমসাহেব যে মেজাজ খারাপ করছেন! বলছেন কুটুম্ববাড়ীতে এসে সাহেবী মেজাজটা ভুলতে পার না। ধান ভানতে শিবের গীত গাও যে! এলে মেয়ের বিয়ের কথা নিয়ে, এসে এসব হচ্ছে কি ?

রাধারমণবাবু অপ্রতিভ হলেন। বললেন—সে ধর না হয়েই গেছে দিদি। যখন এসেছি, তখন বীরেশ্বরবাবুর মত রাজা লোক প্রার্থীকে ফেরাবেন কি বলে ?

রত্নেশ্বর আর দাঁড়ালেন না। বললেন—আমি তা হলে এখন আসি। ওঁরা সব আসবেন, আমি দেখে আসি ব্যবস্থা সব ঠিকমত হ'ল কিনা!

যাবার সময় ফিরে ওঘরে স্বর্ণলতার দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করেও পারলেন না।

* * *

খুশী কথাটা ঠিক যেন লাগসই হচ্ছে না সুলতা। সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়েরীতে যে কথাটা ব্যবহার করেছেন সে কথাটা একালে প'ড়তে গিয়ে আমারও মনে হয়েছে বড্ড যেন বাড়াবাড়ি করেছেন, তরুণ রত্নেশ্বর। তবে উনবিংশ শতকের উনষাঠ সালে ভাষার ঢঙটাই ওইরকম ছিল। যুগটাই ঈশ্বর গুপ্তের যুগ। এদিকে কালীপ্রসন্ন সিং হুতোমপ্যাঁচার নক্সায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা রত্নেশ্বর রায়ের মত চরিত্রের মানুষের পছন্দ না হবারই কথা। তিনি লিখেছেন—"অহো! এই জগত-সংসারে প্রেম কি দুর্লভ আনন্দদায়িনী সামগ্রী। ইহা অনন্ত অপার আনন্দসুধা রসের অফুরন্ত নির্ঝরধারা। অকস্মাৎ যেন শরবিদ্ধ হৃদয়—ভূতল বিদীর্ণ হওত প্রবল উৎসধারায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া আমার তাপিত নবযৌবনকে নিষিক্ত করিয়া

দিতেছে। আমার জীবনযৌবন যেন প্রখর গ্রীষ্মসন্তাপিত পত্রহীন বৃক্ষের মত এই রস অভিসিঞ্চনে পত্রপল্লব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। পল্লবাগ্রভাগে পুষ্প উদ্গমের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি সে অনেক কথা তিনি লিখেছেন। তাই বলছি কানের সাদামাটা 'খুশী' শব্দটা বোধহয় রত্নেশ্বর রায়ের মনের অবস্থা বোঝাবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেটা আর খুঁজে হায়রান হব না সুলতা, তুমি বুঝে নিয়ো। তিনি লিখেছেন—তাঁর গান মনে পড়েছিল।

গানে রত্নেশ্বরের অধিকার দুদিক থেকে। সংসারে হেরিডিটির সত্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। পিতৃকুলে বীরেশ্বর রায় গান-বাজনার চর্চা করেছিলেন। মাতৃকুলে শ্যামাকান্ত ছিলেন সিদ্ধ-গায়ক। ভবানী দেবীও গানে জন্মগত অধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন। রত্নেশ্বরের স্নায়ুশিরায় অস্থিমজ্জায় মস্তিষ্কে বুদ্ধিতে বোধে সঙ্গীতবোধ ও তার ব্যাকরণের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার বংশসঞ্চিত গুপ্তধনের মতই রাখা ছিল। ওই মধ্যে মধ্যে কখনও এমনি উল্লাস আনন্দে কদাচিৎ গুঞ্জন করেছে। সেদিনটি তার মধ্যে একটি দিন। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর বংশ বিবরণের মধ্যে যা পেয়েছি তাতে কখন গান গেয়েছেন এমন কথা লেখেন নি। তাঁর দিনলিপি আরম্ভ হয়েছে মাত্র দুদিন আগে থেকে। ওই দোলের দিন, পোষ্যপুত্র হিসেবে মা-বাপের কোলে ফিরে আসার দিন থেকে। তার তৃতীয় দিনে রত্নেশ্বর বিবাহ সম্ভাবনাতেই শুধু নয় ভাবী বধূটিকে বাড়ীতে চকিত চাহনিতে দেখে বিবিমহলে যাবার পথে গুনগুন ক'রে বসন্তরাগ ভেঁজেছিলেন। পিছনের বরকন্দাজ তাতে হাসে নি, সে বাবুজী সাহেবের গান শুনে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। বিবিমহলে রত্নেশ্বর রায় যখন দেখাশোনা করছিলেন, তখন বরকন্দাজটি আর একজন বরকন্দাজকে বলছিল—আরে ভাই, বাবুজী সাহেব এমন গানা জানেন কি বলব তোমাকে!

রত্নেশ্বর কথাটা শুনেছিলেন। এবং নিজেকে সতর্ক করেছিলেন—"অন্যায় করিয়াছি, নিজের অজ্ঞাতসারে গান গাহিয়া ফেলিয়াছি। গানের পথে বিপদ আছে রায়বংশের।"

বিবিমহলে তখন ঝাড়াই মোছাই হয়ে গেছে। ভবানী দেবীর প্রত্যাবর্তনের পর বীরেশ্বর রায় বিবিমহলে বাস করেন নি। বংশের অন্দরে বাস করছিলেন। বিবিমহলের ফার্নিচার তখন এখানে এবাড়ীতে এসেছে। তার জায়গায় রত্নেশ্বর আসবেন বলে যে সব নতুন ফার্নিচার এসেছিল কলকাতা থেকে, গদী আঁটা চেয়ার সোফা মার্বেল টপ টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, বড় বড় আয়না, নতুন গালিচা সেইসব দিয়ে বিবিমহল সাজানো হয়েছে। হয়েছে ক' মাস আগেই, সেই ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন স্থাপনের সময়। সেগুলো ঝাড়ামোছা এবং একটু এদিক ক'রে সাজানো এইসব কাজ হচ্ছিল সে দিন। কুইন ভিক্টোরিয়ার, প্রিন্স এ্যালবার্টের ছবি টাঙানো হয়েছে; তার সঙ্গে বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপ ক'খানা টাঙিয়ে সাজিয়েছে। এ-সব কাজের জন্য কলকাতা থেকে সাহেববাড়ীতে কাজকরা একজন বেয়ারাকে আনা হয়েছে। সেই সব বরাতমত করাচ্ছে। রত্নেশ্বর নিজে প্রত্যেক ঘরের ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়েই ওখান থেকে ফিরছিলেন;

নিচে এসে দেখলেন দেওয়ান আচার্য তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। বললেন—বাবুজী সাহেব, আমি তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি ভাই!

রত্নেশ্বর বললেন—বলুন।

—বলব কি? তুমি তো সব জান। এ তুমি বলে ক'য়ে বন্ধ করো।

—কি?

—গোপাল সিংয়ের সম্বন্ধে যে হুকুম হল সে হুকুম তুমি ওল্টাতে পার। ওল্টাও ভাই। নইলে জমিদারী চলবে না। অন্ততঃ আমি তো চালাতে পারব না।

রত্নেশ্বর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তা কি ক'রে হয়! মন তাঁর অন্যরকম হয়েছিল, তিনি সায় দিতে পারলেন না। বললেন—তা কি ক'রে হয় বলুন? যা কথা দিয়েছেন, খোদ কর্তা পর্যন্ত গোপাল সিংয়ের স্ত্রীকে ডেকে কথা দিলেন। সে কথা এখন না বলবেন কি ক'রে?

আচার্য বললেন—আমি তা হ'লে বাবুজী সাহেব, এই কাজকর্মগুলি চুকে গেলেই কাজ থেকে ছুটি নেব।

—ছুটি নেবেন!

—হ্যাঁ। এরপর আমি আর কাজ করতে পারব না। আমার মুখ থাকবে না। কথায় বলেও আচার্য তৃপ্তি পান নি, কথা শেষ ক'রে ঘাড় নেড়েছিলেন—না।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"মুহূর্তে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আচার্য দেওয়ান আমাদের কথাও শুনিতে চাহিতেছেন না। এবং ভাবিতেছেন, রায়বাড়ীর তিনিই হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি না হইলে রায় এস্টেট চলিবে না, অচল হইয়া পড়িবে। আমি বলিলাম—বেশ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা পিতৃদেবকে বলিব।" কথাটা আর সেই মুহূর্তে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি; পালকির বেহারার হাঁক শোনা গিয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে একজন নায়েব ছুটে এসে খবর দিয়েছিল—হাকিমরা এসে পড়েছেন!

রায়বাড়ীতে হাকিমদের সম্বর্ধনা সেদিন রায়বাড়ীর সৌভাগ্যে কুটুম্বিতার আসরে পরিণত হয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সদর এস-ডি-ও রাধারমণবাবুর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধের আসরে পরিণত হয়েছিল। ধুতিচাদর পরা রাধারমণবাবু তমলুকের এস-ডি-ও গুপ্ত সাহবকে বলেছিলেন—আজ কিন্তু আমরা রায়বাড়ীতে গভর্নমেণ্ট অফিসিয়েল নই মিস্টার গুপ্তা। আমরা আজ কন্যাপক্ষ। আপনারা শুনে নিশ্চয় খুশী হবেন যে আমার মেয়ে স্বর্ণলতার সঙ্গে বীরেশ্বরবাবুর পুত্র রত্নেশ্বরের বিয়ের সম্বন্ধ আজ পাকা হয়ে গেল!

অল্পবয়সী ইংরেজ ডি-এস-পি জোনস এসেছিল শীকারের লোভে। কথাটা শুনে সে উল্লসিত হয়ে বলেছিল—তা হলে তো এ শুভকর্মে আমাদের বরকনের কল্যাণ কামনা ক'রে কিছু পান করা উচিত।

এ কথায় রাধারমণবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—সম্ভবতঃ তিনি আমার সম্মুখে মদ্যপান করতে সঙ্কোচবোধ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বরকে বলেছিলেন—তুমি তা'হলে ওদিকে গিয়ে কাজকর্মগুলি দেখ রত্নেশ্বর!

অবশ্য তার আগেই পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে। কীর্তিহাটের রায়বংশের উত্তরাধিকারীকে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন বীরেশ্বর রায় এবং তাঁর সঙ্গে রাধারমণবাবু তাঁর গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। সরকারী হাকিম তিনি—তিনি রত্নেশ্বরের গুণের কথা তাঁদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সুন্দর কৌশলের সঙ্গে।

প্রথমেই বলেছিলেন—রত্নেশ্বর রায় কাশীতে ছিলেন মিউটিনির সময়। নিজের চোখে সব দেখেছেন। আমাকে বলছিলেন কাল; এমন সুন্দরভাবে বললেন এবং এমন বিচার ক'রেছেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এবং আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দেখে। সমস্ত ব্যাপারটা এ্যানালিসিস ক'রে অল্প কথায় সমস্ত কথাটা বলে দিলেন। বললেন—এটা হল ইণ্ডিয়ার ধর্মান্ধতার সঙ্গে ইউরোপীয়ান সিভিলিজেশনের লাস্ট ফাইট। এটাকে আলোর সঙ্গে অন্ধকারের লড়াই বলা যেতে পারে। ইণ্ডিয়ার ভাগ্য ভাল যে আলোর জয় হয়েছে। এ্যাণ্ড—: এইটেই আমার সব থেকে ভাল লেগেছে; উনি বললেন—আলোই জেতে চিরকাল অন্ধকার হারে।

রত্নেশ্বর নিজের ডায়রীতে লিখেছেন—"এরূপ কথা আমি বলিয়াছিলাম ইহা সত্য কিন্তু এমন চমৎকার করিয়া বলি নাই। এবং ইহার সঙ্গে নির্বিচারে বালকবৃদ্ধকে হত্যা করার নিন্দাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুরমহাশয় এই কথাগুলি বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে কোম্পানীর তরফের অত্যাচার বৃত্তান্ত বলা উচিত হইবে না।"

ওখান থেকে ফেরার পথে রত্নেশ্বর দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ভাবী বধূকে। রায়বাড়ীর আলসের উপর বুক রেখে দুটি মেয়ে বোধহয় কীর্তিহাট গ্রাম দেখছিল। তার একজন অঞ্জনা অন্যজন স্বর্ণলতা; স্বর্ণলতাকে তিনি খুব ভাল ক'রে না দেখলেও তিনি তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি। কারণ এমন মেয়ে রায়বাড়ীর জ্ঞাতি কুটম্বের মধ্যে কেউ ছিল না।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"বিবিমহল ও রায়বাড়ীর খাসমহলের মধ্যবর্তী যে কলমের বাগান, সেই বাগানে প্রবেশ মুখে উক্ত নারীমূর্তিদ্বয়কে দেখিয়া চিনিলাম এবং পুলকিত হইলাম। অঞ্জনার পার্শ্ববর্তিনী ওই স্বর্ণাভ-বর্ণা কিশোরীটি যে স্বর্ণলতা ব্যতিরেকে অন্য কেহ হইতে পারে না ইহাতে আমার সংশয় ছিল না। আমি একটি বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। হৃদয় অভূতপূর্ব ভাবাবেশে আবিষ্ট হইল। সম্ভবতঃ তাহারা আমাকেও দেখিয়াছিল। কারণ তাহারা সরিয়া গেল। আমিও সরিয়া আসিলাম

এবং লজ্জিত হইলাম। ছি—ছি—ছি, যদ্যপি কেহ দেখিয়া ফেলে! লোকে হাস্য করিবে। আমি তাড়াতাড়ি অত্রস্থান হইতে দ্রুতপদে কাছারীর মুখে চলিলাম। আমার সঙ্গে বরকন্দাজ আমাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটু বিলম্ব হইলে সম্ভবতঃ গোলমাল হইত। যাহা হোক কাছারীতে আসিয়া বসিয়া মহাবীর সিংকে আজ্ঞা করিলাম যে, কেহ যেন এখন না আইসে। আমি বসিয়া স্বর্ণলতার সঙ্গে আমাব ভাবী মিলিত জীবনের একটি সুখ-কল্পনার চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

"অকস্মাৎ মনে হইল অঞ্জনাকে বলিয়াছি দ্বিপ্রহরে আমার নিকট আসিবার জন্য। স্বর্ণলতার অন্তরের পরিচয় সম্যক জ্ঞাত হওনের জন্য কিছু প্রশ্ন করিব। কিন্তু কি প্রশ্ন করিব? প্রশ্ন একটি। আমাকে তাহার পছন্দ হইয়াছে তো? কিন্তু তাহা কি অঞ্জনাকে সরাসরি বলিতে পারিব? অঞ্জনা একটু প্রগলভা। লজ্জাবোধ হইতেছে।"

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর একটি ছোট কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি তার ডায়রীর মধ্যে আছে।

কন্যার হইবে বিয়া ঘটকেরে আনাইয়া
পিতা কয় বাখানিয়া
পাত্র চাই ইন্দ্রের মতন
মাতা কহে বুদ্ধি নাই ইন্দ্র সাথে চন্দ্র চাই
খানিক কুবেরও চাই
রাজরূপ তার সাথে ধন।
ঘটক নাড়িয়া মাথা কন্যারে শুধায় কথা
এবে তুমি বল মাতা
এর সাথে আর কারে চাই?
কন্যা ভাবে মনে মনে হায় বলিব কেমনে
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে যেন—পাই।

অঞ্জনার হাতে এই ধাঁধাটি দেবেন। স্বর্ণলতাকে সে বলবে—এই শেষ ছত্রে ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে কাকে চাই এই ফাঁকটি তুমি পূরণ করে দাও না ভাই! উত্তরটা আমি ভাই বুঝতে পারছি না!

অঞ্জনা লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তা' বলে মূর্খ বলতে যা বোঝায় তা নয়। সেকালে লেখাপড়া না জেনেও পুরাণে কাব্যে রঙ্গরসিকতায় সে পারঙ্গমা ছিল। ছড়া, পাঁচালী, কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ মুখস্থ ছিল। আওড়াতে পারত। রীত তরিবৎ তাও সে ভালই জানত। লেখাপড়া না জানলেও অশিক্ষিতা ছিল না। সে একবার শুনে বলেছিল—কি—কি—কি আর একবার পড়ুন তো!

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—সুলতা—"অঞ্জনার প্রশ্নে আমি কৌতুকবোধ করিলাম। বুঝিলাম সে বুঝিতে পারে নাই। আমি তাহাকে আবার একবার পড়িয়া শোনাইলাম। সে এবার খুক খুক শব্দে হাসিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি রোধ করিতে চাহিল।"

রত্নেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন—হাসলে যে ?

অঞ্জনা বলেছিল—এ তো খুব সোজা।

—সোজা ? কই বল তো শুনি—।

—আর একবার পড়ুন।

রত্নেশ্বর পড়েছিলেন—

"ঘটক নাড়িয়া মাথা
কন্যারে শুধায় কথা
এবে তুমি বল মাতা এর সাথে
আর কারে চাই ?
কন্যা ভাবে মনে মনে
হায় বলিব কেমনে—
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে যেন—

অঞ্জনা বলে উঠেছিল—"রত্নেশ্বরে পাই।"

বলে খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিল।

রত্নেশ্বর শঙ্কিত হয়ে উঠে বলেছিলেন—চুপ—চুপ। বাইরে কে কোথায় শুনতে পাবে!

সাক্ষাৎকারটি পূর্বের বন্দোবস্ত মত দুপুরবেলা নির্জনে রত্নেশ্বরের ঘরে হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামাঞ্চলে একটা বিশ্রামের সময় আসে। তখন সকলেই একটু আধটু গড়ায়।

সুরেশ্বর বললে—কি শীত কি গ্রীষ্ম—দুপুরের পর একটু গড়ানো এদেশের পক্ষে প্রয়োজন কি না সে কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলতে পারেন। শুনেছি গান্ধীজীও নাকি গড়িয়ে থাকেন। ওঁর কোমরে যে পকেট ঘড়িটা আছে তাতে এলার্ম বাজে ; ওই আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পর সেটা বাজুক না বাজুক ঠিক উঠে পড়েন। তবে গ্রামের লোকে—নিতান্ত গরীবের ঘর ছাড়া সবাই ঘুমোয়। ১৯৩৭ সালেও ঘুমুতে দেখেছি আমি। ওর মধ্যে প্রয়োজন ছাড়া বোধহয় আভিজাত্যও আছে। আমারও ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

সুলতা হেসে বললে—জানি আমি, আজ দুপুরেই টেলিফোন করেছিলাম। রঘু আমাকে বললে—লালবাবু নিদ যাচ্ছে দিদিমণি। কাল রাতভর আপনা সাথ গল্প করিয়েছেন আজ তো বহুৎক্ষণ নিদ যাবেন। দুপহর বেলা নিদ না-গেলে তবিয়ৎ খারাব হোয় উনকা। আমি বললাম—থাক তাহলে, ডেকো না।

সুরেশ্বর হাসলে। বললে—রঘুও ঘুমোয়। তবে টেলিফোনের রিঙ শুনে বোধ হয় জেগে উঠেছিল। ওরও এ রোগ ধরেছে কীর্তিহাটে। দুপুরবেলা সারা গ্রামে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুমপাড়ানি মাসী এসে আঁচল বিছিয়ে বসেন।

—সেদিন, মানে, ১৮৫৮ সালের ফাল্গুন মাসের দুপুর বেলাটায় সবাই গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আগের দুদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব গেছে। সারা রায়বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। রায়বাড়ীর কার্নিশে কার্নিশে অনেক পায়রা থাকত; আজও আছে; সেগুলো পর্যন্ত বাসায় বুক পেতে ব'সে থাকে; মধ্যে মধ্যে এক-একটা শব্দ ক'রে, তাও ক্ষীণ।

রত্নেশ্বর তাও লিখেছেন ডায়রীতে। তাঁর সেদিন ঘুম আসে নি। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা আসছিল কিন্তু পায়রাদের ওই ডাকেই চট্ চট্ করে সে তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবনা হচ্ছিল—অঞ্জনা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। দু চারবার খাট থেকে নেমে পায়চারী করেছেন; বার দুই বাড়ীর ভিতরের দিকের বারান্দার দরজা ফাঁক ক'রে তাকিয়ে দেখেছেন অঞ্জনা আসছে কি না। আবার দরজা বন্ধ ক'রে এসে বিছানায় উঠে হেলান দিয়ে বসছিলেন।

লিখেছেন—"প্রেমজনিত উদ্বেগ সম্বরণ করা অতীব কঠিন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি এখনও তিনটা বাজে নাই। খাওয়া-দাওয়া আড়াইটা পর্যন্ত শেষ হয়। সুতরাং মাত্র অর্ধঘণ্টা পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে মাত্র, অথচ আমার মনে হইতেছে অন্তত দুই তিনঘণ্টা কাল আমি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি।"

তারপর একসময় অঞ্জনা ঠিক এল। সন্তর্পণে দরজাটি খুলে গেল—এক ঝলক আলো ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকল অঞ্জনা এবং দরজাটি বন্ধ ক'রে এগিয়ে কাছে এসে বললে—বাবা! সবার চোখে ঘুম আছে, ঠাকমার চোখে ঘুম নেই। দিব্যি দেখি নাক ডাকছে, দেখে যেই উঠি অমনি দেখি বুড়ী ওঁ—আঁ শুরু করে দেয়। চোখ খুলে তাকিয়ে বলে—কিলা উঠলি যে? বিকেল হয়ে গেল না কি? একবার বললাম—ঘাটে যাব। তা বলে—না। আর একটু পরে যাস। এখন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এই রাজস্যুয় যজ্ঞি। তিভুবনের লোক চারিদিকে। সোমত্ত মেয়ে—কোথা কে থাকে! যাসনে—শো! কি করব? এই এতক্ষণে ঘুমুলো। আস্তে আস্তে উঠে এসেছি। নেন—কি হুকুম বলুন!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—খুব সাবধানে করতে হবে! বুঝেছ?

—বুঝেছি বলুন।

—একটি ধাঁধা দেব। যেন তোমাকে ধাঁধাটি দিয়েছি আমি। বুঝেছ?

—হ্যাঁ।

—তুমি মনে কর ধাঁধাটি বুঝতে পার নি এই ভান দেখিয়ে স্বর্ণলতাকে ডেকে বলবে—ভাই, তুমি তো লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে, এই ধাঁধাটি পূরণ করে দেবে?

—ধাঁধা? কি ধাঁধা? বলুন।

—কাগজে লিখে দিয়েছি। না-হলে তোমার ভুল হয়ে যাবে।

—আমাকে শোনাবেন না ? আমি তো পড়তে জানি না।

পড়ে শুনিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল—কি—কি কি ? আর একবার পড়ুন তো! বলে মুখে কাপড় চাপা দিয়েছিল। সে ধাঁধাই হোক আর ছড়াই হোক তার মর্মটা অনায়াসে বুঝেছিল। হাসিও পেয়েছিল কৌতুকে।

ধাঁধাটা শুনে অঞ্জনা বলেছিল—ও তো সোজা। উত্তর—"রত্নেশ্বরে পাই"। বলে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠেছিল।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—চুপ—চুপ—কে শুনতে পাবে।

অঞ্জনাও সতর্ক হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেছিল—ওই আমার দোষ। হেসে ফেলি। মা বলত—দুষমনের হাড়ে তৈরী দাঁত-না-হ'লে এমন ক'রে সবতাতেই কেউ হাসতে পারে না! ওতেই মরবি—তুই ওতেই মরবি!

রত্নেশ্বর ডায়েরীতে লিখেছেন—"অঞ্জনার বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর মুহূর্তে গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই দরিদ্র অথচ উল্লাস এবং সদাহাস্যময়ী মেয়েটির হাস্য কেহ সহ্য করে না। স্থির করিলাম ইহাকে পরবর্তীকালে স্বর্ণলতার সঙ্গিনী করিয়া দিব। এবং আমি ইহাকে সত্যকারের আপন জনের মতই সমাদর সম্ভ্রম করিব।"

অঞ্জনা চিঠিখানা হাতে ক'রে বলেছিল—তা হ'লে আমি যাই। আপনার কনেকে দেখিয়ে জবাব এনে দেব। তার যা বুদ্ধি সে ঠিক জবাব লিখে দেবে!

—কিন্তু বলে দি একটা কথা। উত্তরে কোন মানুষের নাম হবে না।

—মানুষের নাম হবে না ?

—না। তোমার জবাব হয় নি। রত্নেশ্বরে পাই লিখলে হবে না। লিখতে হবে দেবতার নাম।

—দেবতার নাম ?

—হ্যাঁ। ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এঁদের সঙ্গে মানুষের নাম কি চলে ? ওখানে দেবতার নাম দিতে হবে। যেমন রামচন্দ্রে পাই নয়তো মহেশ্বরে পাই নয়তো নারায়ণে পাই।

আবার মুখে কাপড় চাপা দিলে অঞ্জনা। আবার তার হাসি পেয়েছে।

রত্নেশ্বরও হেসে বললেন—আবার হাসি পেলে কিসে ?

—যদি স্বর্ণলতা লেখে—মহেশ্বরে পাই!

—বেশ তো, আমি শিবের মতই হব তাহলে ?

—পারবেন ?

—কেন ? পারব না কেন ?

—শিব শ্মশানে মশানে ফেরে; গাঁজা ভাঙ খায়। ভূত নিয়ে ফেরে। আপনি এই রাজ

অট্টালিকা ছেড়ে এমন হতে পারবেন? আরও অনেক চাই—বুড়ো হ'তে হবে, মাথায় জটা মুখে দাড়ি; মা গো! সে হতে পারবেন না আপনি।

রত্নেশ্বর হেসে ফেললেন। মেয়েটা এমন যে, সব কিছুকেই হাস্যকর করে তুলতে পারে। শিবের শিবত্ব বোঝে না, বুঝলেও সে-সব বাদ দিয়ে তার সকৌতুক দৃষ্টিতে শিবের পাকা চুল দাড়ি জটা এবং ভাঙ খাওয়াটাই সব হয়ে ওঠে! তিনি বললেন—তা হোক। তুমি ওকে দিয়ো তো! দেখি না কোন দেবতা ওর পছন্দ!

অঞ্জনা চলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তখন রত্নেশ্বর উঠে মুখ হাত ধুচ্ছেন, সন্ধ্যের উৎসব আজ বিশিষ্ট উৎসব। আজ হবে বাঈজীর নাচ। এখুনি নিচে নেমে কাছারীতে গিয়ে বসবেন। খবরাখবর নেবেন।

চাকর রূপোর গ্লাসে ডাবের জল এনে ত্রিপয়ের উপর রেখেছে। রেকাবীতে মসলা-পান। মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়বেন।

অঞ্জনা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—"তাহার মুখ সহাস্য; এবং কৌতুকে চোখ দুটি উজ্জ্বল। দেখিয়াই বুঝিলাম সে এই অল্পসময়ের মধ্যেই ধাঁধার উত্তর লইয়া আসিয়াছে। আমার অন্তর মন উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল উত্তরের জন্য। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে এসব কথা বলিতে নাই। কি করিয়া জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। শুধু কহিলাম—আইস। কোন সংবাদ আছে কি?

অঞ্জনা চতুরা, সে বলিল—"এই যাঃ আমার যে ভুল হইয়া গেল।"

অঞ্জনা চাকর গোবিন্দকে বলেছিল—গোবিন্দ, যাও তো নিচে ঠাকুমার কাছে যাও। বলো ছোটবাবুর জন্যে পান সাজা আছে, বড়বাবুর রেকাবিতে পান আছে, তার পাশেই ছোট রেকাবি আছে, তাতে যে পান সে পান ছোটবাবুর। সে রেকাবিটা নিয়ে এস তো।

গোবিন্দ চলে গেলে অঞ্জনা বলেছিল—পান সেজেছে স্বর্ণলতা। আমি আলাদা করে আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি গোপন করে অঞ্জনা বলেছিল—খুব চালাক, খুব চালাক মেয়ে। আমি পান সাজছিলাম। আপনার হুকুম তামিল করতে গিয়ে আজ এবেলার পান সাজা হয় নি। পান সাজছি আর ভাবছি, কি ক'রে যাই, কি ক'রে বলি। হঠাৎ আমার ভাগ্যি; ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল চুপ ক'রে। আমি পান সাজছি দেখে কাছে এসে বললে—পান সাজছ? বললাম—হ্যাঁ। এ পান কর্তাবাবুর, সতী বউরাণীর আর ছোটবাবুর। এ পান আমি সাজি। তারপর বললাম—এসেছ ভালই হয়েছে। একটা ধাঁধার উত্তর করে দিতে পার? বললে—ধাঁধা? কি ধাঁধা? পাড়াগাঁয়ের ধাঁধা ভাই আমি জানি না। বললাম—না; এ ভাই ছোটবাবুর তৈরী করা ধাঁধা। বললে—ছোটবাবু কে? বললাম—রত্নেশ্বরবাবু! মুখটা লাল হয়ে উঠল, বললে—উনি বুঝি তোমাকে ধাঁধা দেন উত্তর

করতে? বুঝেছেন? মনে—মনে—।

মুখে আবার একবার কাপড় চাপা দিয়ে সামলে নিয়ে বললে অঞ্জনা—আমি বললাম—না, আমি ভাই সম্পর্কে ওঁর সাতদিনের বড় দিদি। কিন্তু ওঁরা ভাই বড়লোক, রাজা লোক, আর ভালমানুষ, তাই আমি পোষ্য হলেও চাকর মনে করেন না, সম্বন্ধটার মান রাখেন। আজ ওঁকে ডেকেছিলেন সতী বউরাণী জ্যেঠাইমা, আমি ডাকতে গেলাম। দেখলাম একমনে কাগজে লিখছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—কই অঞ্জনাদি, একটা ধাঁধার উত্তর দাও তো! আমি ভাই পারলাম না। লেখাপড়াজানা পণ্ডিত লোক। বললাম—লিখে দিন ভেবে বলব। এই দেখ! বলে কাগজখানা দেখালাম। তা পড়ে হেসে বললে—বল না, তোমার যে দেবতা পছন্দ তার নাম। আমি বললাম—আমার তো হয়ে গিয়েছে। এ জন্মের ঢাক বেজে গিয়েছে। কোন দেবতা ধারে কাছে ঘেঁষে না। তুমি বল। তো বললে—কাকে ছেড়ে ভাই কাকে চাইব বল! তেত্রিশ কোটি দেবতা। একে ছেড়ে ওকে চাইলে অন্যজনে রাগ করে। তার থেকে ভাই একজনের মধ্যে সব দেবতাকেই চাই। বুঝেছ! ওখানে উত্তর হবে 'সব দেবে' চাই! হেসে বললে—আমাকে বলো, কি বললেন তোমার ছোটবাবু। তারপর বললে—তোমায় তো দেখছি অনেক পান সাজতে হবে। আমি কয়েকটা সেজে দেব? বলে পান সাজতে বসল। খিলি আষ্টেক পান সেজে দিয়ে উঠে গেল।

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন ডায়েরীতে—"উত্তর পাইয়া সত্য-সত্যই আমি পরাজিত হইলাম। সুকৌশলে 'সব দেবে' লিখিয়া আমাকে ঠকাইয়া দিয়াছে। নারী চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়; বুঝিতে পারিলাম না তাহার পছন্দ কি! কিন্তু পান যখন সাজিয়া দিয়াছে, তখন বিবাহে তাহার আগ্রহ আছে ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।"

অঞ্জনা রত্নেশ্বর রায়ের সম্মুখে হাত পেতে বলেছিল—আমার বকশিশ।

—বকশিশ! বকশিশ কি আপনারজনকে দেয়? তুমি কি দাস-দাসী? তুমি সম্পর্কে আমার সাত দিনের বড় দিদি।

—দিদি না ছাই! সাত দিনের বড় আবার বড়। আর রাজাবাবুর দিদি কি গরীব হয়? আমি আপনাদের দাসী না হই পোষ্য। চাকরে মাইনে পায়। আত্মীয় পোষ্যরা পেটভাতার পোষ্য।

রত্নেশ্বর রায় আবেগে বিচলিত হয়েছিলেন—সেই বিচলিত মনে দুই হাতে অঞ্জনার পাতা অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি চেপে ধরে বলেছিলেন—না-না-না! তোমার সম্মান এ সংসারে আমার মত, আমার যে বউ আসবে তার মতই হবে।

অঞ্জন বলেছিল—হাত ছাড়ুন। আমার পাতা হাত ভরে গিয়েছে।

রত্নেশ্বরের ডায়রিতে আছে—"অঞ্জনাও আনন্দে পুলকের-থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, আমি তাহার হস্ত দুইখানি ছাড়িয়া দিতেই সে সেই হাত মাথায় বুলাইয়া বুকে ধরিয়া চঞ্চল পদে

প্রস্থান করিল।"

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, বিবাহস্বপ্নে বিভোর তরুণ রত্নেশ্বর রায় সেদিন ঠিক বুঝতে পারেননি যে কি ঘটল। বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। সে কথা পরে বলবার সময় হলে বলব তবে তার ছবি আমি এঁকেছি। এই দেখ সে ছবি।

তরুণ রত্নেশ্বর রায় একটি দীর্ঘ শ্যামাঙ্গী মেয়ের হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের কোণে যেন জল-বিন্দুর আভাস! দুজনেরই প্রফিলের ছবি। মেয়েটির চোখটি বড় সুন্দর; আর মাথায় একরাশি কোঁকড়ান চুল, ফুলে ফেঁপে পিঠের দিকে পড়ে রয়েছে, তাতে একটি ঢং এসেছে, যেটা ঠিক এদেশী নয়, অনেকটা সেকালের ইজিপশিয়ান মেয়েদের চুলের মত।

সুলতা ছবিখানা দেখে বিস্মিত হল। মনে হল এই মেয়েটির ছবি যেন আর কোথাও আছে, এই সব ছবিগুলোর মধ্যে। সে উঠে এসে ছবিখানার কাছে দাঁড়াল। তারপর চোখ ফিরিয়ে বাকী ছবিগুলো দেখতে গিয়ে আটকে গেল, পাশের ছবিখানার দিকে।

কোন একজন ভয়ঙ্কর-দর্শন লোকের ছবি। দাঁতে-দাঁত টিপে লোকটা একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপকে ধরে আছে! লোকটা যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, পাথর কেটে গড়া একটা মূর্তি। সুলতা সবিস্ময়ে বললে—এ ছবিটা?

সুরেশ্বর বললে—ও ছবিটা গোপাল সিংয়ের। ওই গোপাল সিং।

—এই গোপাল সিং! কিন্তু এমন করে একটা সাপকে ধরে রয়েছে কেন?

—বলছি সুলতা। এই খবরটা সেদিন ঠিক এমনিভাবেই অর্থাৎ এই মুহূর্তটিতেই এসেছিল রায়বাড়ীতে। রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমি অঞ্জনার গমনপথের দিকেই দৃষ্টিপাত করতঃ তাহার কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। এমত সময় বাহিরের বারান্দার দিক হইতে বন্ধ দরজার ওদিক হইতে কে ডাকিল—হুজুর!

—কে?

—হামি, মহাবীর সিং।

এদিকের দরজা দিয়ে তখনই পানের রেকাবি হাতে ঘরে ঢুকেছিল তাঁর খাস চাকর গোবিন্দ। গোবিন্দ রেকাবখানা তাঁর সামনে নামিয়ে দিতেই সাগ্রহে দুটি পান তুলে মুখে পুরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—দরজা খুলে দে!

দরজা খুলতেই মহাবীর সেলাম করে জানিয়েছিল—বড়া হুজুর আপনে কহলেন কি উনকে সাথ ভেট করনে কো লিয়ে!

—আচ্ছা। যাচ্ছি। বল গিয়ে আসছি আমি।

কথার মধ্যেই এসে ঘরে ঢুকলেন ভবানী দেবী। রত্নেশ্বর—

—মা!

—আমার কথার কোন দাম রইল না রে? আমি মা আনন্দময়ীর সামনে যে কথা বললাম সে-কথা থাকবে না! ঠোঁট দুটি তাঁর কাঁপতে লাগল।

সবিস্ময়ে রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—কেন মা?

—কুতুবপুরের কাছারীর লোকেরা গোপাল সিংকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছে।

—কে বললে?

—কুতুবপুরের কাছারীর লোক খবর এনেছে।

—সে কি? আমি তো সকালেই লোক পাঠিয়েছি কুতুবপুর!

* * *

ব্যাপারটা লোক পৌঁছুবার আগেই ঘটে গেছে। আগে থেকেই কুতুবপুর কাছারীতে যে হুকুম ছিল সেই অনুযায়ী ঘটেছে।

সুরেশ্বর বললে—আগে তোমাকে বলেছি সুলতা, কীর্তিহাটের বিচক্ষণ দেওয়ান ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, বীরপুর মৌজার মণ্ডলান স্বত্ব ভগবান মণ্ডল ডাক নিয়েছে, এ সংবাদ যে মুহূর্তে গোপাল পাবে, সেই মুহূর্তে গোপাল খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত দুর্দান্ত ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঝাঁপ দেবে। তাঁর হুকুম ছিল যে, বেলা এক প্রহরের পরই কুতুবপুর কাছারীর বরকন্দাজ ঢেঁড়াদার নিয়ে বীরপুরের পথে-পথে এই ঘোষণা জারী করবে। এবং গোপাল সিংয়ের কানে কোন রকমে পৌঁছে দিয়ে পালাবে। যদি পালাতে না-পারে, যদি গোপালের হাতে জখম হতে হয় তবে রায় এস্টেট থেকে খেসারত পাবে, মোটা টাকা। সে আমলে একশো টাকার দাম অনেক, এ আমলের হাজার টাকা থেকেও বেশী। আরও আন্দাজ ছিল এই যে, গোপাল তালাবন্ধ ভগবানের বাড়ীতে আগুন দেবে। কিম্বা দল জুটিয়ে এসে লুট করবে। হুকুম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে থানায় এত্তেলা দেবে। থানায় বন্দোবস্ত করা ছিল। থানার দারোগা, জমাদার, মুন্সীবাবুদের সঙ্গে গোপালের দহরম-মহরমের কথা অজানা ছিল না কারুর; দেওয়ান তারও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একদিকে এস-ডি-ও, ডি-এস-পিকে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন কীর্তিহাটে, তার সঙ্গে ইন্সপেক্টারবাবুও বাদ যান নি। ওদিকে দারোগা, জমাদার, মুহুরীবাবুদের খুশী করবার ভার দিয়েছিলেন কুতুবপুরের নায়েবকে। সে তা করেছিল। ঘটল সবই, কিন্তু গোপাল সিং যা করলে, তা সকলের অনুমানকে অতিক্রম করে গেল। দেওয়ান আচার্য যে-মুহূর্তে খবর পেলেন যে, গোপাল বড় ছেলে এবং বড় স্ত্রীকে জখম করে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে ছুটে পালিয়েছে, ফেরার হয়েছে, সেই মুহূর্তেই সওয়ার পাঠিয়েছিলেন কুতুবপুরের নায়েবের কাছে যে, কাছারীর সমস্ত লোকজন নিয়ে খোঁজ করে গোপাল সিংকে ধর, পুলিশের হাতে দাও। যারা ধরবে, তারা একশো টাকা বকশিশ পাবে। অবশ্য সকলে মিলে।

খবরটা কুতুবপুর গিয়ে পৌঁছেছিল সন্ধ্যার পর। ওদিকে কুতুবপুর, বীরপুর, এবং আশ-

পাশের চার-পাঁচখানা গ্রামে এই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনার শেষ ছিল না। আজকের এই ঘটনাটিতে সকল লোকের মনই বিরূপ হয়ে উঠেছিল এই দুর্দান্ত লোকটির উপর। তার সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মজলিসে খবর আসছিল, গোপাল সিংকে দেখা গেছে কোন জঙ্গলে অথবা কেউ যেতে দেখেছে জনহীন মাঠের মধ্য দিয়ে। অথবা গোপাল সিংয়ের কোন অনুচরের বাড়ীতে। কেউ বলে ওই গ্রামে, কেউ বলে সে গ্রামে। থানার দারোগা তখন গোপালের বাড়ীতে পৌঁছে এজাহার নিচ্ছেন। তার ছোট বউ গরুর গাড়ী চড়ে রওনা হয়েছে কীর্তিহাট সতীরাণী মায়ের উদ্দেশে। ওদিকে কুতুবপুরের কাছারী থেকে বরকন্দাজ পাইকের দল একশো টাকা বকশিশের উত্তেজনায় সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়েছিল গোপাল সিংয়ের সন্ধানে। হাতে মশাল, লাঠি, সড়কি। তবে হুকুম ছিল, জীবিত গোপাল সিংকে ধরতে হবে। গোপাল ফাঁসিকাঠে ঝুলে তার জীবনের মাশুল দিয়ে যাবে এই ছিল সর্ববাদীসম্মত রায়।

শুধু জমিদারের রায় নয়, মানুষের রায়ও ছিল তাই। সরকারের রায়ও তাই।

হিটলার নিজে আত্মহত্যা করেছে, তাতে বিজয়ী পক্ষ তৃপ্ত হয় নি। বিচার করে তাকে তারা মৃত্যুদণ্ডই দিত। কিন্তু বিচার হয় নি বলে ক্ষোভ থেকে গেছে। তোজো আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। তাকে বাঁচাবার জন্ম বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সার্জনরা ছুটে এসেছিল এবং তাকে বাঁচিয়েছিল। বাঁচিয়েছিল তাকে বিচার করে ফাঁসি দেবার জন্যে।

* * *

হতভাগ্য গোপাল সিং নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল একবার। কিন্তু তার ভাগ্যে তা সফল হয় নি। তার মস্ত বড় ভুল হয়েছিল! নেশায় কালীসাধক গোপাল সিং ছুটে পালাবার সময় মায়ের নেশা বাবার নেশার একটাও সঙ্গে নেয় নি। যে নেশাটা করেছিল এই দুর্ঘটনার আগে, সেটা ছেড়ে গিয়েছিল বিকেল হতে-না-হতে। নেশা যখন ছুটল তখন দুরন্ত ফাঁসির ভয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে-ভয়কে সে চিরদিন ব্যঙ্গ করে ফাঁকি দিয়ে এসেছে, সেই ভয় সেদিন যেন তাকে পিছন থেকে আচমকা ঝাপটে ধরে হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল এইবার!

সুরেশ্বর বললে—দুর্দান্ত গোপাল সিং শুনেছি, ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠ ভেঙে ছুটেছিল। বেলা দুপুর; চৈত্র মাস তখন। দু-চারজন লোকে তাকে দেখেছিল। এবং বিস্ময়ের তাদের সীমা ছিল না।

সিংজী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে! কেন? কি হল?

গোপালের গ্রাম তখন অনেকটা পিছনে। প্রায় ক্রোশ-দুয়েক। যেসব লোক দেখেছিল, তার ঘটনার কথা তখনও জানতে পারেনি। এমনকি দু ক্রোশ দূর থেকে বীরপুরের খড়ের চালের আগুনের ধোঁয়া বা গ্রামের লোকের চীৎকারও শুনতে পায়নি।

তারা সভয়ে সরেই গিয়েছিল। গোপাল সিং ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তার সামনে পড়া

মানে ছুটন্ত পাগল মহিষের সামনে পড়া। সামনে পড়লে সে বারকয়েক ক্ষুরের আঘাতে মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাথা নিচু করে শিং সোজা করে তাকে বিঁধে গেঁথে নেবে—তারপর ফেলে দেবে ছুঁড়ে। এবং বারবার গুঁতিয়ে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে চলে যাবে।

একজন তার সামনে পড়েছিল। সে তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু গোপাল তাকে আঘাত করেনি, তাকে হুঙ্কার ছেড়ে শাসন করেনি, সেও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর পাশ কাটিয়ে আবার সামনে ছুটেছিল।

সে পালাচ্ছিল।

রায়বাহাদুরের ডায়রীতে আছে, গোপাল তাঁর কাছে বলেছিল—ধরা পড়বার ভয়ে সে পালাচ্ছিল।

কিন্তু না। আমি ডায়রী পড়ে তার ছবিটা মনে মনে কল্পনা করেছি। ধুলায় ধূসর তার সর্বাঙ্গ। চোখদুটো বিস্ফারিত। আতঙ্কিত দৃষ্টি তাতে। হাতে আত্মরক্ষার উপযুক্ত একটা লাঠিও নেই। সব ফেলে দিয়েই সে পালিয়েছিল গ্রাম থেকে। সে পালাচ্ছিল নিজের কাছ থেকে।

সংসারে মানুষেব মধ্যে যে চরমতম দুর্ধর্ষ, হার্ডেনড ক্রিমিন্যাল, সে পশুই হয়ে যায়। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে শুধু একটি জায়গায়। সে হল তার মমতার মধ্যে।

সেই মমতার ঘর রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে ধ্বসিয়ে উপরের ছাউনি আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়ে সে যখন পালাচ্ছিল, তখন তার পশুত্বের হিংসা ওই ঘরভাঙা মানুষটার কাছেই ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল।

গোপাল রায়বাহাদুরকে বলেছিল —হুজুর, পানির জন্তে ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, ভুখে পেটে যেন আগুন জ্বলছিল, কিন্তু ডরকে মারে—কোন গাঁওয়ে ঢুকি নাই—ঢুকতে পারি নাই।

লোকালয়ে সে ঢুকতে পারেনি। কার কাছে যাবে? কি করে বলবে—আমার ছেলেকে আমি খুন করে ফেলেছি, আমাকে বাঁচাও, একটু লুকিয়ে থাকবার জায়গা দাও! খুন সে নতুন করেনি। কিন্তু এমন দুর্বল, এমন অসহায় সে কোনদিন হয়নি। সে লোকালয়কে দূরে রেখে এসে ঢুকেছিল তিন ক্রোশ দূরের একটা জঙ্গলে। তখন রাত্রি নেমেছে। রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করে একটা বড় বটগাছে উঠে মোটা ডালের খাঁজে লুকিয়ে বসেছিল। ঘুম তার হয়নি, কাঁদতেও সে পারেনি, সন্ধ্যেবেলা থেকে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আশপাশের গ্রামগুলো থেকে কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠেছে, গ্রামের হরিনাম-সংকীর্তন শুনে চমকে উঠেছে। গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁক শুনে শুধু চমকেই ওঠেনি, তার যে-বুক কখনও কাঁপেনি, সে-বুকখানাও ধড়কড় করে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা এসেছে, সে বসে বসে ঢুলেছে এবং দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়কড় করে জেগে উঠেছে। রাত্রিশেষে ভোরের পাখীর ডাক শুনে জেগে উঠে সব অবসাদ কাটিয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেছিল।

কিন্তু যাবে কোথায় ?

গোপাল নিজেই পরে বর্ণনা করেছিল সেদিনের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের কাছেই করেছিল। বলেছিল—বাবুজী, ভোরবেলা পাখিগুলো ঘন ঘন একসঙ্গে কলকল করে ডাকে। সে-ডাক যেন মুসাফিরখানায় ভোরবেলা—উঠো উঠো উঠো চলো চলো ডাকের মত। আমার মনে হয়েছিল বাবুজী, যেন তামাম দুনিয়ায় 'ধরো ধরো পাকড়ো পাকড়ো' আওয়াজ উঠে গিয়েছে। আধা-ঘড়ি একঘড়ির মধ্যে দুনিয়া আলো হয়ে যাবে, লোকজন জেগে উঠবে। গরুর রাখালেরা গরু নিয়ে মাঠে আসবে, এই জঙ্গলের ধারে ধারে গরু চরাবে ; কাঠুরেরা কাঠ কাটতে আসবে, মেয়েলোক শুকনো ডাল ভাঙতে পাতা কুড়োতে আসবে। আমি যাব কোথায় ? হাতে আমার কিছু ছিল না বাবুজী। হাতের লোহার বোলোওয়ালা ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছি ; স্রিফ দু হাত ছাড়া আমার কিছু নেই কাছে ; আমাকে ধরতে এলে আমি করব কি ? লড়ব কি দিয়ে ?

মনে হল—মরে যাই। নিজে থেকে মরে যাই। মাথার মুরেঠা খুলে পড়ে গিয়েছে, আছে এক পরনের কাপড়, সেই কাপড় গাছের ডালে বেঁধে ফাঁস বানিয়ে ঝুলে পড়ি। কিন্তু তাও পারিনি হুজুর ! নিজেই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমার নিজের ভয় দেখে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হ'লে পারতাম। তখন মনে মনে হচ্ছিল—এই জঙ্গল ধরে কোনরকমে পালিয়ে যাব, যাব একেবারে গঙ্গার ওপারে ; সুন্দরবনের কোন গাঁওয়ে গিয়ে একদম ভোল পাল্টে কুঁড়ে বেঁধে থাকব। খাটব খাব। কিন্তু এ দিনের বেলা এ জঙ্গল থেকে বেরুনো হবে না।

গোপাল সিংকে এ-অঞ্চলে না-চেনে এমন আদমী নেই। দেখলেই চিনবে আর চিনলেই লোকে হৈ-হৈ করবে। এত রোজ ধরে গোপাল যে জুলুম-জবরদস্তি করেছে, তার আক্রোশ আজ গর্ত খুঁড়ে বেরকরা সাপের মত বেরিয়ে পড়েছে। ফণা তুলে দুলছে।

মনে পড়ে গিয়েছিল—জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা মন্দির আছে। বটগাছ উঠে মন্দির-টাকে ফাটিয়ে দিয়েছে, তবুও গাছের শিকড়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

* * *

ওদিকে জঙ্গলের বাইরে তখন শোরগোল উঠেছে। সন্ধ্যের মুখে সে যখন এই জঙ্গলে ঢোকে তখন দূর থেকে কেউ দেখেছিল। তখনও এতবড় খবরটা তার কাছে পৌছায় নি। খবরটা এসেছিল রাত্রে। তারপর প্রহরখানেক রাত্রে কুতুবপুর কাছারীর পাইকবরকন্দাজ এবং তাদের সঙ্গে গোপালের উপর যাদের আক্রোশ তাদের একটা দল গ্রামে এসে পৌছেছিল।

লোকটি বলেছিল—গোপাল সিং সন্ধ্যের মুখে ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে আমি দেখেছি। কিন্তু খবরটা তো শুনি নাই। ভাবলাম গোপাল সিং তো, তার তো হাজার কাজ, সেই কোন কাজে এই ভরসন্ধ্যেতে জঙ্গলে ঢুকছে। ব্যস্ত-সমস্ত দেখে হেঁকে বলতেও সাহস হয়নি—

"সিং মশায়, এই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলে কোথা যাবেন ?"

তার কথা শুনে গোটা দলটি গাঁয়ের ভিতর অপেক্ষা ক'রে শেষরাত্রে রওনা হয়ে এসে এই সকালেই জঙ্গলের মুখে হাজির হয়েছে। শোরগোল উঠছিল তাদেরই।

গোপালের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার উপায় ছিল না। গাছে উঠে ব'সে থাকতেও ভরসা পায় নি। গাছে উঠলে অসহায়। তীর মারবে বাঁটুল মারবে। সে যথাসম্ভব দ্রুতপদে এসে হাজির হয়েছিল ভাঙা মন্দিরটার সামনে। বটগাছের ডালপালায় ঢাকা মন্দিরটা পেয়ে সে যেন বেঁচে গিয়েছিল, এক কোণে সে লুকোবে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা সাপের খোলস দরজার মাথার একটা ফাটল থেকে লম্বা হয়ে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু সে লহমার জন্যে। গোপাল সাপকে ভয় করে না; গোপাল শুধু লাঠীবাজ দাঙ্গাবাজ খুনখারাবিবাজ নয়, সে আরও অনেক কিছু পারে—সাপ ধরতে পারে, সাপের ওঝা, ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াতে পারে; তার হাতে তাবিজ আছে, জড়িবুটি আছে, ওসবের ভয় তার নেই। ভয় তার মানুষকে।

সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজার পাশের একটা কোনায় উপু হয়ে চুপ করে বসেছিল। লোকজন এলেও দরজার মুখ থেকে সামনের কোণ দুটো খালি দেখে ফিরে যাবে।

কিন্তু—; গোপাল বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে (পরবর্তীকালে), কিন্তু মানুষের পাপ যব পুরা হয়ে যায় বাবুজী তখন ভগবান নারাজ হন, তিনি নারাজ হলে পার কারুর নেই। গোপালের পাপ সে-রোজ পুরা হয়েছিল, ভগবান নারাজ। কোণে বসে থাকতে থাকতে গোপাল চমকে উঠেছিল একটা গোঙানি শুনে। সাপের গোঙানি। বাপ, সে কি গোঙানি!

যেন কাল গর্জাচ্ছে। সতর্কদৃষ্টিতে আওয়াজের জায়গাটা আন্দাজ করে তাকিয়েছিল দরজার মাথার দিকে। হাঁ। ঠিক দরজার খিলানের মাথায় বটের শিকড়ে ফাটানো একটা ফাটল থেকে একটা বড় ব্যাঙের মুখের মত মুখ আর তার দুটো পলকহীন কালো চকচকে চোখ দেখতে পেয়েছিল সে। তার মুখ থেকে চেরা জিভের দুটো কাঁটা লকলক্ ক'রে খেলছিল আগুনের শিখার মত।

সাপকে ভয় করে না গোপাল, কিন্তু বে-কায়দায় পড়েছে সে। সাপটাই আছে কায়দার জায়গায়। মাথার উপর! মাটির উপর সামনা-সামনি লড়া যায়। কিন্তু মাথার উপর দুষমন থাকলে তাকে লড়াই কি ক'রে দেবে।

গোপালের মনে পড়েছিল সে ঠিক এই কায়দায় ছিরুদাসের ঘাড়ের উপর গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে এককোপে ঘায়েল করেছিল!

এক উপায়, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পালানো। সাপটা অনেক উঁচুতে। ছোবল দিতে পারবে না। তাই করবার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে সাপটা নামতে

শুরু ক'রেছে। গোপাল পিছিয়ে এসে বসে তৈরী হয়েছিল সাপটাকে ধরবার জন্য। মাটিতে পড়ে ছোবল দেবার জন্য ঘাড় তুললেই তার ডানহাতও পাশ থেকে ছোঁ দেবে। চেপে ধরবে তার গলা। চোয়ালের নিচে। লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হবে না। সে বিশ্বাস তার ছিল। লক্ষ্য করছিল সে সাপটাকে, সরসর করে পলেস্তারা ওঠা দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে। বিরাট গোখরো! আয় বাপ! দুহাত এক করলেও এতবড় ফণা হয় না!

ওদিকে তখন মন্দিরের সামনে লোক! তারা গোপালকে দেখে হৈহৈ করে এগিয়ে এসেও থমকে গিয়েছিল—আয় বাপ!

সাপটা ফণা তুলেছে, তুলেছে গোপালের দিকে নয়, পিছনে দরজার কাছে মানুষের সাড়া পেয়ে ওদিকে ফণা তুলে গর্জন করে দাঁড়িয়েছে।

গোপাল এ সুযোগ ছাড়েনি। খপ করে সে ডান হাত দিয়ে ছোঁ মেরে সাপটার চোয়ালের নিচে সজোর মুঠিতে চেপে ধ'রে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল লেজটা, যেন সেটা তার হাত জড়িয়ে ধরতে না পারে। এতটুকু ভুল তার হয় নি। নিখুঁত পরিকল্পনায় সাপটাকে ধ'রেছিল। তারপর পা দিয়ে চাপা লেজটা বাঁ হাতে ধ'রে সে বেরিয়ে এসেছিল মন্দির থেকে।

তার তখনকার সে মূর্তি দেখে এতগুলো বরকন্দাজ-পাইক গ্রামের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা ভয় পেয়ে স'রে এসেছিল। দাঁতে দাঁতে সজোরে চেপে নিষ্ঠুর মুঠিতে সে সাপটাকে ধরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটার ভাঙা দাওয়ার উপর। তার হাতের পেশী-গুলো ফুলে উঠে দেখাচ্ছিল পাথরের টুকরোর মত।

সাপ বড় পিছল জীব। গোপাল সিংয়ের মুঠো থেকে মুখটা সঙ্কুচিত করে যত সে পিছলে বেরুবার চেষ্টা করছিল তত শক্ত হচ্ছিল গোপালের মুঠো এবং সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল।

চোখ দুটো ঠিকরে বেরুতে চাচ্ছিল যেন। লোকে অবাক হয়ে দেখছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ গোপালই বলেছিল—কেউ হাতিয়ার দিয়ে কেটে দাও দুষমনের মাঝবরাবর। তারপর হামি ছুঁড়ে ফেলব। এমনি ফেলব তো সয়তান ফের শির উঠাকে তাড়া লাগাবে।

বরকন্দাজ রামপূজন চৌবে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের তলোয়ার দিয়ে সাপটাকে দু টুকরো করে দিতেই গোপাল বাঁ হাতের লেজের অংশটা পায়ের কাছে সেখানে ফেলে দিয়ে ডান হাতে ধরা মুখের অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছল দূরে।

তারপর বলেছিল—লে পাকড়ো। বলে সে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল সেই দাওয়ার উপর!

এ অংশটা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—রামপূজন চৌবে। তারপর তারা গোপালকে ধরে এনেছে কুতুবপুরের কাছারীতে। ঘোড়া হাঁকিয়ে রামপূজনই এসেছে কীর্তিহাট।

গোপাল সিং ধরা পড়েছে। পাকড়েছে বলতে গেলে সেই।

ভবানী দেবী স্বামীর কাছে বসে ছিলেন। তিনি ছুটে এসেছেন ছেলের কাছে, ওরে, মায়ের সামনে আমি কথা দিয়েছি। সে কথা আমার থাকবে না?

রত্নেশ্বর বললেন—সে কি? তাই হয়? তোমার কথা থাকবে না? এখনি লোক পাঠাব। বাবা কি বললেন।

—তিনি তোকেই ডাকছেন।

বীরেশ্বর রায় হুকুম দিয়েছিলেন—গোপালকে যেন পুলিশে দেওয়া না হয়। বা তার কোন অনিষ্ট না করা হয়। কাছারীতেই তাকে আটক রাখ। ঘোড়সওয়ার গিয়েছিল হুকুম নিয়ে। কিন্তু তার আগে একজন পাইক চলে গিয়েছিল রণপায় চড়ে। পাঠিয়েছিলেন আচার্য দেওয়ান।

তিনি বুঝেছিলেন মামলায় আর গোপালের কিছু হবে না। তিনি হুকুম পাঠিয়েছিলেন সেখানকার নায়েবকে—"যে কোন অজুহাতে পার গোপালকে যেন শেষ করিয়া দেওয়া হয়। সদর হইতে যে হুকুমই যাউক না কেন, তুমি এ কার্য অবশ্য অবশ্য সমাধা করিবে। আমি শপথ করিয়াছি গোপালকে শেষ করিতে না পারিলে আমি ব্রাহ্মণ হইতে খারিজ। তুমি আমার জাতি রক্ষা করিবে।"

সুরেশ্বর বললে—বৃটিশ আমলাতন্ত্রের কথা অনেক শুনেছ সুলতা কিন্তু জমিদারী সেরেস্তার আমলাতন্ত্রের কথা জান না। বাংলাদেশে জমিদারদের অপকর্মের বারো আনার দায় এই আমলাদের।

একটা কথা প্রচলিত আছে—'মাটি বাপের নয় মাটি দাপের। মাটি কেনা যায় টাকাতে কিন্তু মাটি দখল হয় লাঠিতে।'

এ কথার স্রষ্টিকর্তা কে তা কেউ জানে না। তবে এই কথাটা জমিদারদের শিখিয়েছে এই আমলারা।

দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের মুখে এ কথা দিনে অন্তত দশবার উচ্চারিত হ'ত। সুকৌশলে তাঁরা জমিদার আর প্রজাকে দুপাশে সরিয়ে রেখে এই লাঠিখেলার আসর পেতে রাখতেন। তবে একটা কথা বলব—তাঁরা কাজ ক'রে গেছেন নিজের ভেবে। দেওয়ান আচার্য রায় এস্টেটকে ছোট থেকে বড় ক'রে তুলেছিলেন—

কথায় বাধা পড়ল—

—অতীত কথায় ছেদ টেনে দিলে রঘু।

রঘু চাকর এসে দাঁড়াল।—খাবার তৈয়ার হল। দিদিমণি পুছলেন কি খাবার দিবেন? ও ঘরে ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা শব্দ হল। সুলতা নিজের হাতঘড়িটা দেখে বললে—সাড়ে দশটা!

সুরেশ্বর বললে—আরও আধঘণ্টা পর। গোপাল সিংয়ের কথাটা শেষ করে নি, কি বল

সুলতা ?

সুলতা গোপাল সিংয়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, তাই শেষ কর !

সুরেশ্বর বললে—ছবিটা তোমার ভাল লাগছে !

—ছবি তোমার সবই ভাল সুরেশ্বর। আর ছবির টেকনিক কি স্ট্যাণ্ডার্ড বিচার তো আমি করছি না। আমি তোমার গল্প শুনে গল্পের মানুষটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি। তার সঙ্গে ভাবছি রায়বাড়ীর কথা, সেকালের কথা।

হেসে সুরেশ্বর বললে—সে-কাল এ-কালের কাছে বিচিত্রই বটে। সব কালই তাই।

—আমি ভাবছি কি জান ? গোপাল সিং আত্মহত্যা করতে পারলে না ?

—সে আমিও ভেবেছি। কিন্তু পারে নি। আত্মহত্যার একটা ক্ষণ থাকে, সে ক্ষণটা পেরিয়ে গেলে আর পারে না। এটা সব কালের কথা। সে ক্ষণটা কখন পার হয়ে গিয়েছিল তা বলতে পারব না। তবে গোপাল একটা কথা বলেছিল, বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে কিছুদিন পর। তখন সে রায়বাড়ীর পোষমানা মানুষ। বলেছিল—ছেলেকে মাথায় লোহার বোলো বসানো লাঠিটা মেরে স্ত্রীর বুকে চেপে ব'সে গলা টিপে ধ'রেছিল—লোকজনে তাকে ছাড়াতে এসে আক্রমণ করেছিল। সে কি হল তা বুঝতে পারে নি। মাথায় তখন আক্রোশের আগুন। সেই আগুনেই সে নিজের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল লোকেদের ভয়ে। লোকেরা যারা তার ভয়ে কাঁপত তারাই তাকে ধ'রে ওই আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। এমনটা কখনও ভাবতে পারে নি। তাই তাদের এই চেহারা দেখে হঠাৎ কেমন ভয় লেগে গেল। ও'দিকে বড় পুত্রবধূ কেঁদে উঠল—মরে গেছে, মরে গেছে। 'একি হ'ল একি করলে' ব'লে। আমি সেই ভয়ে ছুটে পালালাম। তারপর সাপটা যখন ফণা তুলে দাঁড়াল মন্দিরের মধ্যে তখন যে কি ভয় হল বলতে পারব না; আমি তার কামড় খেয়ে মরতে পারতাম। কিন্তু ভয়ে পারলাম না। সেটাকে ধরে ফেললাম। মরতে পারলাম না ! নিজে মরতে পারব না, ফাঁসি দিয়ে মারবে সরকার তাই মারুক। কিন্তু গোপাল মরল না। ভবানী দেবী তাকে বাঁচালেন। আচার্য দেওয়ান তাকে খুন করবার গোপন হুকুম পাঠিয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়ে গেল !

* * *

বীরেশ্বর রায় সন্ধ্যাবেলা খোদ রত্নেশ্বরকে পাঠালেন গোপালকে বাঁচাতে। রণপা চেপে একজন পাইক কুতুবপুর কাছারী গেছে, দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য তাকে পাঠিয়েছেন। খবরটা বীরেশ্বর রায়ের কানে চুপিচুপি তুলে দিয়ে গেল দেওয়ানের সহকারী সদর নায়েব বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী। বীরেশ্বর রায় তাকে বিদায় ক'রে দিয়েই ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি নিজে যাও রত্নেশ্বর। না-হলে তোমার মায়ের বাক্য রক্ষা হবে না। আচার্য যা ব্যবস্থা করেছেন তাতে কাল সকালেই তাঁর দেবতার সামনে দেওয়া বাক্য ব্যর্থ হবে। অপরাধ হবে, মাথা

হেঁটে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই দেওয়ানের হাতে গিয়ে আমাদের বাঁধা পড়তে হবে। আমাদের কাছারীতে গোপালকে বেঁধে এনে রেখেছে। খুনের দায় আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমাদেরই দায়ে ফেলতে পারে। যে চাকর, মনিবের হুকুমের বিপক্ষে যায় তাকে বিশ্বাস নেই। তুমি নিজে চলে যাও। গোপালকে বাঁচাতেই হবে!

তারপর নিজের মনেই যেন বলে উঠেছিলেন—"আমার জাত রক্ষা কর!" মনিবের জাত যাক তাতে ক্ষতি নেই, চাকরের জাত বাঁচুক! জাত! চাকরের জাত!"

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতৃদেবের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রচণ্ড ক্রোধ তাঁহার হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। এবং চিন্তান্বিত হইলাম। কারণ কবিরাজ ডাক্তার সকলেই তাঁহাকে ক্রোধ করিতে নিষেধ করিয়াছে। এমন ক্রোধ তাঁহার এই কয়মাসে আমি কখনও দেখি নাই। বাল্যকাল মনে পড়িতেছে। যখন তাঁহার সম্মুখে গেলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন। বলিতেন—লইয়া যা, উহাকে এখান হইতে লইয়া যা। আজিকার ক্রোধ অন্যরূপ। প্রাণপণে ক্রোধকে চাপিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি অবিলম্বে প্রতিকারার্থ কুতুবপুর গমন করিব।"

—কুতুবপুরের নায়েব যদি গোপালকে দেওয়ানের পত্র পেয়ে শেষ করেই থাকে তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে তুমি পুলিশের হাতে—। না পুলিশের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ভবিষ্যতে প্রজাশাসনের জন্য বে-আইনী কিছু করতে হয় তা করতে ভয় পাবে কর্মচারীরা। তুমি তাকে বেঁধে এখানে পাঠাবে। কাল সকালে তুমি ফিরে আসবে। আমার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না।

*   *   *

কুতুবপুরের নায়েব বিচক্ষণ লোক। দেওয়ান আচার্যের পত্র পড়ে তার খটকা লেগেছিল। "সদর হইতে যে হুকুমই আসুক না কেন, তুমি এ-কার্য অবশ্য অবশ্য করিবে।" কথাটায় সে থমকে গিয়েছিল; "সদর হইতে যে হুকুমই আসুক না কেন—?" তা' হ'লে সদর থেকে অন্যরকম হুকুম আসবে বা আসছে। আচার্যের হুকুমই আগে পৌঁছেছিল। দেশী বাগ্দী পাইক রণপা চড়ে গেছে। রণপা, তুমি নিশ্চয় বোঝ সুলতা; সে কালের 'রণপা' ভাল ঘোড়ার সমান যেত, এমন কি পাকা রণপা-দার হলে তার থেকেও জোরে যেতে পারতো। তা ছাড়া ঘোড়ার পথ সড়ক ধ'রে আর রণপা'র পথ মাঠে মাঠে নাকের সোজা। রণপার একমাত্র বিপদ কাদার জলে। কিন্তু মাসটা তখন চৈত্রের শেষ, সুতরাং কাদা জলের বাধাবিঘ্ন তখন পাবার কথা নয়।

বীরেশ্বর রায়ের হুকুমবাহী সওয়ারও খুব দেরীতে পৌঁছয় নি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছেছিল। হুকুমনামা পড়ে তিনি তখন ভাবছিলেন কি করবেন!

তখন গোটা বীরপুরের লোক ভেঙে এসেছে কাছারীতে। একদিনে একটি ঘটনায় বীরপুর

বিজয় সম্পূর্ণ। গোপাল সিং বাঁধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কুতুবপুরের কাছারীতে এসে হাজির হয়েছে। আনুগত্য জানাতেই এসেছে। এমন কি যে সব দুর্ধর্ষ লোক গোপালের ডান হাত বাঁ হাত বা হাতের আঙুল ছিল তারাও এসেছে। শুধু কীর্তিহাটের জমিদারের ভয়েই নয়, গোপালের এই নিষ্ঠুরতম কৃতকর্মের আঘাত কেউ সহ্য করতে পারে নি, এই ঘটনার পর বিমুখ হয়েছে সবাই।

এরই মধ্যে রাত্রি একপ্রহরের সময় রত্নেশ্বর রায় সদলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কাছারীর সামনে।

* * *

প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়—গোপাল সিং কোথায়?

নায়েব বুঝতে পেরেছিল প্রশ্নের অর্থ। সে বলেছিল—আছে হুজুর। বেঁধে রেখে দিয়েছি। না-হলে তো তাকে আটকানো যায় না! হয়তো দরজা ভেঙে আবার হাঙ্গামা করে—

—ঠিক করেছেন! কি বলছে সে?

—কিছু না, মড়ার মত পড়ে আছে। বোবা হয়ে গিয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু তারপর চুপ হয়ে গিয়েছে।

—ওর বাড়ীর লোকেরা? তারা আসেনি?

—কে আসবে? বড়ছেলে মরেছে; বড় স্ত্রী এখনও পড়ে আছে। এমন ক'রে গলা টিপে ধরেছিল যে এখনও জল খেতে পারছে না। ছোটবউ আছে, তার বয়স অল্প, সে কাছারীতে আসে নি। বড়ছেলের দুই ছেলে, তাদের উঠতি বয়স, তারা বলে—পেলে ওর জান নেবে। কে আসবে!

—চলুন, আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আর একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করুন। এক্ষুনি। আমি রাত্রেই ফিরব। গোপালকে নিয়ে যাব কীর্তিহাট। কোথায় গোপাল?

গোপাল কাছারীবাড়ীর কয়েদঘরে হাতে পায়ে বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। ঘরখানার তালাবন্ধ দরজায় দুজন সমর্থ-শক্ত জোয়ান মোতায়েন ছিল। রত্নেশ্বর ঘরের দরজায় আসতেই তারা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

তালা খুলে রত্নেশ্বর ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তাকে ডেকেছিলেন—গোপাল সিং!

নায়েব বলেছিলেন—গোপাল সিং, ছোট হুজুর নিজে এসেছেন। গোপাল!

বিশালকায় গোপাল সিং হাতে পায়ে বাঁধা অবস্থায় মাটির উপর পড়েছিল, ধূলা মাখা সর্বাঙ্গ, পরনের কাপড়, গায়ের আংরাখা এখানে ওখানে ছেঁড়া; মাথার বাবরী চুল, গালপাট্টা গোঁপ ধুলোয় জট বেঁধে গেছে। অসাড় নিষ্পন্দ। মুখখানা আলোর দিকে ঘোরালে গোপাল সিং; রত্নেশ্বর রায় দেখলেন, গোপালের মুখ আঘাতের চিহ্নে ক্ষতবিক্ষত। কপালে কয়েকটা

ক্ষতচিহ্নের উপর কালোরঙের কিছু জমাট বেঁধে আছে। বুঝলেন, গোপাল নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছে।

তিনি এগিয়ে গেলেন।

সুরেশ্বর বলতে বলতে থেমে গেল।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। দেখলে সুরেশ্বরের চোখ চক্‌চক্ করছে। কোন একটা উত্তেজনায় সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

সুরেশ্বর তার দিকে থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে একটু বেঁকে মাটির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন কিছু ভাবছে।

হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বললে—মাফ করো সুলতা, গোপাল সিংয়ের কথা বলছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ১৯৩৭ সালের সেই দিনের কথা। বিমলেশ্বর রায়কে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে। তারা দেখালে, ইংরেজের রাজসাক্ষীর উপর জুলুম করার ফল দেখো। এ যারা করবে, তাদের দশাও এই হবে।

কিন্তু তার সঙ্গে শিবুর বাবা গোপালের পৌত্র হরি সিং দফাদার যে কুৎসিৎ আস্ফালন ক'রে বেড়ালে, সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে রায়বাড়ীর উর্ধ্বতন প্রত্যেক জনকে গাল দিয়ে বেড়িয়েছিল পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো বলছিল সে বিমলেশ্বরকে।

—ডাকো—তোমার বাবা শিবেশ্বর রায়কে ডাকো। তার বাবা সেই সব-সে বড়া বদমাস, সেই তুমাদের বাঘে গরুতে একঘাটে জলখাওয়ানো—সেই রায়বাহাদুর রায়বাবুকে ডাকো। তার বাবাকে ডাকো। রাখুক তোমাকে আজ। আঃ, আজ আমার বুকটা ঠাণ্ডা হল। হাঁ—আগুন মে জল পড়লো। আমার দাদো গোপাল সিংকে হাতে পায়ে বেঁধে কুতুবপুর কাছারীর কয়েদখানায় ধূলো আর গর্দার উপর ফেলে রেখেছিল। জমিদার! হাতে মাথা কাটে। যাও, আজ তুমি যাও, রায়বাহাদুরের বাহাদুর পোতা, বেটার বেটা তুমি যাও—হাজত ঘরে হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে থাকো গোপাল সিংয়ের মতন! হা—হা করে হেসে বলেছিল—আজ শোধ হইল। হাঁ কলেজা ঠাণ্ডা হইল। হাঁ—হাঁ বাবা, এখুন কি হয়েছে। তুমিদের ঘর পড়বে ইট খসবে নীলাম হবে। আমি কিনব। হাঁ আমি কিনব। আমার শিবুকে সরকার বিলাত পাঠাবে। ব্যালিস্টার হবে। বহুৎ টাকা রোজগার করবে—সে কিনবে। আর তুমাদের বহু বেটী আসবে, আর আমার দাদি যেমন করে রায়গিন্নীর পা ধ'রে কেঁদেছিল তেমনি করে কাঁদবে। ঘর থেকে তাড়াও না সিং সাহেব। ঘর থেকে তাড়াও না।

লোকে পুলিশের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল। সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ নেব। কিন্তু পারি নি। কথাটা মনে হলে আজও শরীরে জ্বালা ধরে আমার। চুপ করলে

সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর বললে—থাক—। জবানবন্দীতে এসব কথার ঠাঁই নেই। গোপাল সিংয়ের ওই অবস্থা দেখে কিন্তু তরুণ রত্নেশ্বর রায় বিচলিত হয়েছিলেন।

তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায় উৎপাটিত বটবৃক্ষের মত ধুলিধূসর হইয়া পড়িয়াছিল। নায়েবের কথা শ্রবণ করিয়া সে সেই বন্ধন অবস্থার মধ্যেই মুখ ফিরাইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।"

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—গোপাল সিং!

হেসে গোপাল বলেছিল—আমাকে বেঁধে পুড়াইয়ে মারবেন, না, কালীমায়ের ঠাঁই কাটবেন?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না গোপাল। আমার যে-ভালোমায়ের অপমান করায় আমি তোমাকে চড় মেরেছিলাম সেই ভালোমা আমার তোমাকে ক্ষমা করেছেন, বলেছেন তোমাকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপাল স্তম্ভিত হইয়া গেল! কোন বাক্য তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। আমি আবার বলিলাম—গোপাল! আমি মিথ্যা বলি নাই। আমি তোমাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইব। অদ্য রাত্রেই অল্পক্ষণের মধ্যেই রওনা হইব। তোমার কনিষ্ঠা স্ত্রীও তোমার সঙ্গে যাইবে। ভালোমা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সে পরশু রাত্রেই কীর্তিহাট গিয়া ভালোমায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল।"

এতক্ষণে গোপাল চীৎকার করে উঠেছিল—বাবুজী!

রত্নেশ্বর চমকে উঠেছিলেন। ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—গোপাল!

গোপাল আর কথা বলে নি, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না—না—না।

—তুমি যাবে না?

—না বাবুজী, যাব। জরুর যাব। আমি বলছি—না, কুছু না!

—তুমি সারাদিন কিছু খাও নি। কিছু খাও।

—পানি পিয়েছি বাবুজী।

—পানিতে তেষ্টা যায়, ক্ষিদে যায় না গোপাল, কিছু খাও।

—কুছু খাব? বহুৎ খাইয়েছি ছোটা হুজুর, বহুৎ খাইয়েছি। জোয়ান বেটার মাথা ভেঙে কাঁচা কাঁচা খাইয়েছি।

একটু চুপ ক'রে ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। তারপর বলেছিলেন—যা হ'য়ে গেছে তার উপায় নেই গোপাল সিং! তবু বাঁচতে হলে খেতে হয়—খাও কিছু। আমি তোমার ছোট স্ত্রীকে খবর পাঠাচ্ছি। সে আসবে। সেই তোমাকে খাওয়াবে।

গোপাল সিংয়ের কনিষ্ঠা পত্নী খবর পেয়ে এসে গোপালকে সত্যিই খাইয়েছিল। গোপাল

কি খেয়েছিল জান সুলতা ? সের খানেক দুধ। কিন্তু তার আগে সে রত্নেশ্বর রায়ের কাছে হুকুম নিয়েছিল, এক ছিলম গাঁজা খাওয়ার।

বলেছিল—নেশা না করলে কিছু মুখে রুচবে না ছোটা হুজুর! মদ খাব না। মদ খেলে খুন চাপে। গাঁজা! গাঁজা পিবার হুকুম না-দিলে খেতে পারব না!

* * *

কীর্তিহাটে পৌঁছে গ্রামে ঢুকবার আগে গোপাল সিং একবার চঞ্চল হয়েছিল। হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না—না—না। ছোটা রায় হুজুর!

ঘোড়ার উপর রত্নেশ্বর রায় তখন অনেকটা এগিয়ে কীর্তিহাটে ঢুকছেন। তখন ভোররাত্রি; মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উৎসব হয়েছে। সেরাত্রে রাজকীয় অতিথিদের উপস্থিতিতে বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হয়েছে। উৎসব শেষ হবার পর লোকজন ঘুমিয়েছে। পরপর তিনরাত্রি জাগরণের ঘুম। গ্রাম স্তব্ধ।

রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"আমি কাঁসাইয়ের বাঁধের উপর ঘোড়ার রাশ টানিয়া দাঁড়াইলাম। গোপাল সিং-এর গাড়ী অনেক পিছনে পড়িয়াছে। তাহাকে ফেলিয়া আমি গ্রামে ঢুকিলাম না। কারণ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি করুণাময়ী মদীয় মাতাঠাকুরাণী গোপাল সিংয়ের নিরাপত্তার জন্য জাগিয়া আছেন। আমি একাকী গেলেও তিনি মানিবেন না। তদপেক্ষা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই ভাল।"

কাঁসাইয়ের ওপারে এসেই গোপাল চীৎকার শুরু করেছিল। সওয়ার এপার থেকে এসে খবর দিয়েছিল রত্নেশ্বর রায়কে। রত্নেশ্বর রায় অত্যন্ত তিক্তমনেই ফিরে ওপারে গিয়ে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি ? চীৎকার করছ কেন ?

গোপাল বলেছিল—আমাকে কেটে এই নদীতে গেড়ে দিন রায়বাবু, আমাকে হাত-পা বেঁধে লিয়ে যাবেন না। মারিয়ে ফেলেন আমাকে। আমি গোপাল সিং—আমি—

এবার সে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল ছোটছেলের মত।

দীর্ঘঅবগুণ্ঠনবতী গোপালের স্ত্রীও হাত জোড় করেছিল রত্নেশ্বরের সামনে।

রত্নেশ্বর কয়েক মুহূর্ত ভেবে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই হুকুম দিয়েছিলেন।

ভোররাত্রিতে তাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন কীর্তিহাটের কাছারীবাড়ীর সামনে। সেদিনও তখন মঙ্গলারতি হচ্ছে। ভবানী দেবী মন্দিরের দাওয়ায় মায়ের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। আরতি শেষ হতেই রত্নেশ্বর তাঁর সামনে এসে বলেছিলেন—গোপালকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি মা!

—এনেছিস! বলেই হাত জোড় করে দেবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমার মুখ রেখেছিস মা। রায় সংসারের মুখ যেন এমনি করে চিরদিন রাখিস, মা!

* * *

সুরেশ্বর থামল এইখানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কটা টান দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—১৯৩৭ সালে সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর ঠিক এইখানে এইভাবেই থেমেছিলাম সুলতা। মনে হয়েছিল পরলোক যদি থাকে তবে সেখানে ভবানী দেবীর আত্মা আজ কি বলছেন, কি করছেন?

একটা ছবি মনে রূপ নিয়েছিল এক-মুহূর্তে।

মনে মনে অনেক সময় এমন হয়। মনের প্রশ্নের উত্তর ঝট করে একটা ছবি হয়ে জেগে ওঠে।

ঠাকুরদাস পালের মৃত্যু বিবরণ পড়ে তোমার এমনি একটা ছবি ভেসে উঠেছিল মনে। প্রশ্ন জেগেছিল—একথা যখন জানবে সুলতা তখন সে কি করবে? কি বলবে?

যে ছবিটা জেগে উঠেছিল সেটা আজ মনে করতে পারি। তুমি যেন স্থির বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ আর দুটি জলের ধারা চোখের কোণে টলটল করছে। নেমে ঝ'রে পড়বে ব'লে।

তেমনি সেদিন ভবানী দেবীর যে ছবিটা মনে জেগেছিল, সেটা কতবার ভেবেছি আঁকি কিন্তু আঁকা হয় নি। ভবানী দেবী যেন দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন লজ্জায় অনুশোচনায়।

আমার কানের কাছে গুঞ্জন করে উঠেছিল অর্চনার কথাগুলি। বিমলেশ্বর কাকার স্ত্রীর কাছে যে কথাগুলি ওবেলা শুনেছিলাম, সেই কথাগুলি। "রাজরাজেশ্বর কি রায়বাড়ীর পেয়াদা না মাকালী তাতারিণী প্রহরিণী যে দিনরাত তোমাদের হুকুম তামিল করবে?"

সেইদিন আমি কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর খাঁটি মালিক, জমিদারবংশের সন্তান, খাঁটি জমিদার হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, এর শোধ আমি নেবই নেব। গোপাল সিংয়ের পৌত্র দফাদার হরি সিং, তার ছেলে শিবু সিং। তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে বিমলেশ্বর কাকা পারলেন না। উল্টে অপমানের বোঝা ভারী হল। এর শোধ আমি নেব।

বীরেশ্বর রায় তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে যে-ভুল করেছিলেন, সে ভুলের সংশোধন করব।

গোপাল সিং সেদিন ভোরবেলা কালী মন্দিরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে বলেছিল—মাইজী, আপনেকে আমি খারাব বাত বলেছি, আমার পুরা সাজা হইয়েছে। ছোটা হুজুরকে আমি পোড়ায়ে মারবার জোগাড় করেছিলম, তার ভি সাজা হামার মিলিয়েছে। দুনিয়া তিতা হয়ে গেলো মাইজী। পাপী, হমি বহুৎ পাপ করিয়েছি মা! হামার সাজা হইয়েছে। আমাকে মাফ্ করেন মা, আমাকে মাফ্ করেন আপনে!

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—কিন্তু তোমাকে তো শাপশাপান্ত আমি করি নি বাবা!

—না মাইজী, আপনে দেবী, সাক্ষাত দেবী। সে আমি জানে। তব্ ভি বলেন—মাফ্ করলেন! বুক আমার পুড়িয়ে গেলো মাঈ। খাক হইয়ে গেলো!

ভবানী দেবী বলেছিলেন—মাফ তোমায় করেছি, তোমার স্ত্রীকে মায়ের সামনে কথা দিয়েছি। তবু তুমি যখন বলছ; তখন আবারও বলছি, এই মায়ের সামনে বলছি—মাফ তোমাকে করলাম।

—মাঈজী, আমার ইজ্জৎ—

—বেশ। সে কথাও দিচ্ছি গোপাল। বেইজ্জৎ তোমার হবে না। তবে কর্তাবাবু যা বলেছেন তা শুনেছ তুমি?

—হ্যাঁ মা।

—বেশ; বেইজ্জৎ তুমি হবে না। পুলিশের হাত থেকেও তুমি বাঁচবে। সে সব ব্যবস্থা আমি করেছি বাবা। তোমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি বলেই নয়, তোমার কৃতকর্মের এই ভয়ঙ্কর ফল দেখে আমি কেঁদেছি। তোমাদের ছোট হুজুরের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে এ জেলার সদরের ডেপুটি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে। আমি তাঁকে বলেছি—তিনিও আমাকে কথা দিয়েছেন। তুমি বেঁচেছ। তিনি বাঁচিয়েছেন।

গোপালকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন। বেইজ্জতি হয় নি, কটু কথাও বলেন নি বীরেশ্বর রায়। এতটার কারণ বোধহয় দেওয়ান আচার্যের ওই চিঠি। আচার্যকে অপদস্থ করবার জন্যই তিনি এতটা করেছিলেন। প্রথম ক'দিন বীরেশ্বর রায় গোপালের সঙ্গে দেখাও করেন নি। তাকে থাকতে দিয়েছিলেন, দু-মহলা প্রকাণ্ড অন্দরের এক প্রান্তে চাকরদের ঘরে।

রায়বাড়ীতে তখন রায়বংশের লোক মাত্র তিনজন। কর্তা-গৃহিণী এবং পুত্র। আত্মীয়-স্বজন যারা বারো মাস থাকত, তাদের সংখ্যা তখন দশজন। উৎসব উপলক্ষ্যে আর অনেক আত্মীয় এলেও মোটমাট চল্লিশের বেশী হয়নি। বাইরের লোকজনের সামনে যাতে গোপালের অপমান না-হয়, যাতে দেওয়ান আচার্যের হাত সহজে না পৌঁছায় তারই জন্যে স্থান দিয়েছিলেন বাড়ীর ভিতর।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে—"পিতৃদেবের দূরদর্শিতায়, আশ্চর্য বুদ্ধিতে আমি নিত্য চমৎকৃত হইতেছি। অন্দর মহলে গোপাল সিংহ ও তদীয় পত্নী পুত্রকে স্থান দেওয়া আমার মনোমত হয় নাই। তাঁহাকে একথা নিবেদন করিতেই তিনি বলিলেন—তুমি এখনও বালক রহিয়াছ। তুমি দেওয়ান আচার্যকে সম্যক চিনিতে পার নাই। দেওয়ান আচার্য না-পারেন এমন কর্ম নাই। অন্যত্র রাখিলে তিনি সহজেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবেন। আমি চমৎকৃত হইলাম। এ কথা আমার মনে হয় নাই। তিনি বলিলেন—রবিনসন সাহেবকে যে সুন্দর সুকৌশলে পর্তুগীজ স্ত্রীলোকের দ্বারা বশীভূত করিয়া এক পর্তুগীজ দ্বারাই শেষ করিল, তাহা স্মরণ কর। এখানে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করাইয়া দশ-বিশজন লোক দ্বারা তেমন কিছু করিলে কি করিবে!"

রাজকর্মচারীরা বিদায় নিয়েছিলেন পরের দিন। সদর এস-ডি-ও রত্নেশ্বর রায়ের ভাবী

শ্বশুর আরও একদিন ছিলেন। বিবাহ পাকাপাকি স্থির হয়ে গেলে তিনি গেলেন।

রাধারমণবাবুর সামনেই গোপালকে ডেকে তিনি তাকে বলেছিলেন—রায়বাড়ীর গিন্নীমা তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমার সে সব অপরাধের কথা আমি তুলব না। তোমার নিজের শাস্তি তুমি নিজে নিয়েছ, কিম্বা ভগবান দিয়েছেন, তার ওপর আমার হাত নেই। এখন শোন, যা বলছি। একথা তোমার স্ত্রীকে বলেছি। সে রাজী হয়েই মেনে নিয়েছে। বীরপুরের তোমার জোতজমার বেশীর ভাগ জবরদখল। সে সমস্ত তোমাকে ইস্তফা দিতে হবে। যা তোমার নিজস্ব, তা পাবে তোমার বড় ছেলের ছেলেরা আর তোমার বড় স্ত্রী। বীরপুরে তুমি বাস করতে পাবে না। তোমাকে বাস করতে হবে নতুনহাটে, কীর্তিহাটের পাশেই, নতুন গ্রাম পত্তন করেছি সেখানে। সেখানে তোমাকে দশ বিঘে জমি, একটা বাড়ী, একটা খিড়কীর ডোবা—এই তোমাকে দেব, পাইকান বন্দোবস্ত করে। রায়বাড়ীর কাছারীতে তোমাকে রোজ সকালে আসতে হবে। সেলাম দিয়ে যাবে। দূরে চোখের বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না। রায়বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে এ বাড়ীতে আসবে, মোতায়েন থাকবে. রাজী আছ?

গোপাল চুপ করেই থেকেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে নি।

রাধারমণবাবু বলেছিলেন—নীচে আমার দারোগা হাজির আছে। রাজী থাকিস তো বল। না-থাকলে দারোগা নিজের কাজ করবে।

গোপাল রাধারমণবাবুর দিকে তাকিয়েছিল, সে তাঁকে চিনত না; তার কপালে ভ্রূকুটি জেগেছিল।

বীরেশ্বরবাবু বলেছিলেন—উনি মেদিনপুরের এস-ডি-ও।

গোপাল এবার মাথা হেঁট করে বলেছিল—জান যখন ভিখ মেঙেছি হুজুর, তখন বিলকুল মেনে লিয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—হ্যাঁ। আপনি আমাকে বাঁচাইলেন। বীরপুরে ঢুকবার মুখ আমার নাই। আর আপনের তাঁবেদারী ছাড়া দুসরা কোন কাম—সেও ভি আমি পারবে না। বিলকুল মেনে নিলম!

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ। আমার তাঁবেদারী ছাড়া তুমি কোথাও গিয়ে বাঁচবে না। দেওয়ানজীর হাত থেকে—।

বলেই তিনি থেমে গিয়েছিলেন। চাকরকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ ছোট নায়েব কাগজ-পত্র নিয়ে ওপাশে বসে আছে। ডাক তাকে।

নায়েব এলে বলেছিলেন—কাগজপত্রে টিপ ছাপ নিয়ে নিন।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, গোপাল সিংকে রক্ষা করতে গিয়ে, হারাতে হল দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যকে।

আচার্য দেওয়ান পরের দিনই এসে বলেছিলেন—আমার বয়স হল বাবা ; এদিকে তোমাদের সংসারেও আর ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নাই। ছোটবাবু ভায়া এরই মধ্যে বেশ বুঝে নিয়েছেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। এবার আমি ছুটি চাচ্ছিলাম।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—রত্নেশ্বরের বিয়ে বৈশাখে। এই সময় কি আপনার যাওয়া চলে ?

গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—বেশ ; তারপর যেন আমাকে আর বেঁধে রেখো না বাবা। শরীর বড় ভেঙেছে আমার।

বীরেশ্বর অবলীলাক্রমে বলেছিলেন—না। ১লা জ্যৈষ্ঠ অষ্টম। ২রা জ্যৈষ্ঠ আপনি খালাস। আপনাকে আটকানো উচিতও হবে না। কারণ রত্নেশ্বর আপনাকে নিয়ে ঠিক চলতে পারবে না। আমার সঙ্গেই ওর সব মত মেলে না। কাল রাধারমণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এই গোপালের কেস নিয়ে কথা। উনি বলেছিলেন—বীরেশ্বরবাবু এ পথে জমিদারী চালান আর চলবে না। ইংরেজ জাত বড় কঠিন জাত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাওয়ার। কিন্তু ওরা আইনকে বড় মানে। বিচারের সময় জজেরা ইংরেজ গভর্নমেণ্টেরও খাতির করে না। জমিদারীর ধারা পাল্টান মশাই! রত্নেশ্বর বললে—আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি, বেআইনি প্রজাশাসন—এ আমি কীর্তিহাট এস্টেট থেকে তুলে দোব। আপনার সঙ্গে ওর বনবে না! আমি ভাবছিলাম! আমিও আর হস্তক্ষেপ করব না, আপনাকেও বলব, দেওয়ান কাকা, এবার আমাদের সব ছেড়ে দিয়ে বসে-বসে দেখাই ভাল। তা আপনি নিজেই বলছেন।

সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের কথা এখানেই শেষ। গোপাল সিং এরপর বেঁচে ছিল কম দিন না, দশ বছর। ১৮৬৯ সালে রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"আজ গোপাল সিং মারা গেল। এস্টেটের একজন হিতৈষী লোককে হারাইলাম। লোকটি অতীত কালে যাহাই করিয়া থাক, শেষ জীবনে সে সত্য-সত্যই সজ্জন ব্যক্তি হইয়াছিল ; মদ্যপান ছাড়িয়াছিল, বৈষ্ণব হইয়াছিল। কীর্তন শুনিতে-শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিত। অনুতাপ করিত। নেশার মধ্যে গঞ্জিকা সেবন করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষতি হয় নাই। অবগত হইলাম যে, সে মৃত্যুকালে হরি-হরি জপ করিতে-করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। আরও অবগত হইলাম যে, তাহার পুত্রকে রায়বাড়ীর আশ্রয়ে সদ্‌ভাবে অনুগত থাকিয়া জীবন নির্বাহ করিতে বলিয়াছে। বলিয়াছে—এ কাল বড় কঠিন কাল, সে কাল গিয়াছে। ছোট রায়হুজুর ধার্মিক লোক। বিদ্বান পণ্ডিত লোক। আইন বোঝেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে উন্নতি হইবে। সুখে থাকিবে। তাঁহাদের সহিত সর্ত মানিয়া চলিবে। উনি না থাকিলে আমি বাঁচিতাম না। ফাঁসিকাঠে ঝুলিতাম। গোবিন্দ আক্রোশে তোদেরও রাখিত না, শেষ করিয়া দিত। বাঁচিলে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইত। গোবিন্দ শেষ পর্যন্ত কালাপানিতে মরিয়াছে। ওপথে হাঁটিস না।"

গোবিন্দ সিং গোপালের বড় ছেলের বড় ছেলে। বড় নাতি। বাপের মৃত্যুর জন্যে তার

সব আক্রোশ পড়েছিল গোপালের উপর। বীরেশ্বর রায় বিচার করে গোপালের ন্যায্য সম্পত্তিটুকু রেখে বাকী সবই—যা মণ্ডলান স্বত্বের মালিক হিসেবে দখল করেছিল,—সে-সব কেড়ে নিয়েছিলেন, এবং বীরপুরের সম্পত্তি গোপালকেও দেন নি, দিয়েছিলেন ওই গোবিন্দ সিংকে। বলতে গেলে, খেসারত হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন। এতেই গোবিন্দ সিং রায়হুজুরের বিচারের সুনাম করে সব আক্রোশ ফেলেছিল তার পিতৃহন্তা পিতামহের উপর। সে নাকি শপথ করেছিল, ঠাকুরদার জান সে নেবেই। এবং এতে তাকে উৎসাহিত করেছিল তার পিতামহী; গোপালের বড় স্ত্রী। আরও একজন এতে তাকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। সে লোকটি হচ্ছে রায়বাড়ীর পুরনো দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য।

গিরীন্দ্র আচার্যকে দেওয়ান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়; ওই ২রা জ্যৈষ্ঠই সরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিজের মুঠি থেকে ছাড়েন নি। রায়বাড়ীতে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর দেওয়ানী কালের হিসেব-নিকেশ দাবী করে দায়ী করেছিলেন বিশ হাজার টাকার জন্য। টাকাটার হিসেব মেলে নি। শেষে তার কাছে দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে বলেছিলেন—এটা আমি লিখিয়ে নিলাম, কিন্তু এ আমি আদায় কখনও করব না। আপনি এস্টেটের অনেক খবর জানেন, আপনার কাছে তার নমুদও আছে। এটা আমি তার জন্য হাতে রাখলাম। আর আপনার চিঠি আছে, সেটাও দেখিয়ে রাখি, সেটা আপনি এই সেদিন কুতুবপুরের নায়েবকে লিখেছিলেন—"সদর হইতে যে হুকুমই যাউক না কেন, যে কোন অজুহাতে গোপালকে শেষ করিয়া দিবে। আমার জাতি রক্ষা করিবে।"

গিরীন্দ্র আচার্য হেসেছিলেন। বলেছিলেন—ও আমি জানি, বাবুজীভাই চিঠিখানা গোড়াতেই নায়েবের হাত থেকে নিয়েছেন, সে খবর আমি জানি। বেশ তাই হল।

আরও বলেছিলেন—দেখ বাবা, নোকরী, গোলামী লোকে করে পেটের জন্যে। তবে পেটের জন্যে কখনও মুনিবের ক্ষতি করি নি। মুনিব মেরে খেলে আজ কীর্তিহাটের অন্ততঃ অর্ধেকটাই পেটে পুরতে পারতাম। তা আমি করি নি। তোমাদের কি আয় ছিল, কি আয় হয়েছে, তা তুমি জান। সে আমিই করেছি। পাপপুণ্য বাছি নি। তার অনেক নজীর আছে। পাবে সেরেস্তা খুললে। তিরিশ বছরে তিরিশটা জান খতম করিয়েছি, হয়তো বেশীই হবে। যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরই, হয় হাতে, নয় ভাতে, মেরে রাজ্য নিষ্কণ্টক করে দিয়েছি। বীরপুর নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিলাম তোমাদেরই জন্যেই। ভুল হয়েছিল, মাকালীর সামনে বলেছিলাম, গোপালকে খতম না করি তো আমি বামুন থেকে খারিজ। তবে, ভেবো না, তোমাদের দৌলতে অনেক করেছি আমি, আমি তোমাদের অনিষ্ট করব না। এই উপবীত ছুঁয়ে ইষ্ট দেবতার নামে হলপ নিয়ে বলছি।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—এ হ্যাণ্ডনোট আমি আপনার বউমা সতী বউয়ের কাছে রেখে দিচ্ছি, তাহলে হবে তো?

—বাস-বাস-বাস। এ আর কথা কি আছে।

—আর একটা কথা বলি।

—বল।

—একখানি মহল আপনাকে পত্তনী বা দরপত্তনী প্রণামী দিতে চাই। আর আপনি শেষ জীবনটা মেদিনীপুরে ল' দপ্তরের ভার নিয়ে বসুন। দেওয়ানীতে যা পেতেন তাই পাবেন। অপরের কাজকর্মও করতে পারবেন। আপনার প্রতিজ্ঞার আর একটা বাকী আছে, শ্যামনগর এখনও রায় এস্টেটে আসে নি।

হেসে আচার্য বলেছিলেন—সে এই আষাঢ় বা আশ্বিন কিস্তিতেই হয়ে যাবে বাবা, ভেবো না। তাছাড়া, দে-সরকাররা মহাল রাখতে পৌষ মাসে একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে, চৈত্র মাসে একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে হুগলীর মহাজনের কাছে। সে হ্যাণ্ডনোট দুখানা আমি চোটা দিয়ে কিনবার কথাবার্তা পাকা করেছি। ওরা দুখানা হ্যাণ্ডনোটে আট হাজার নিয়েছে, সুদ মাসিক শতকরা একটাকা, আমি বলেছি, সুদসমেত আট হাজার আর ধরাট দু হাজার দিয়ে হ্যাণ্ডনোট আমি কিনব। তারা রাজী। কিনেই আষাঢ়ের আগে নালিশ ঠুকে দিলে আর সামলাতে পারবে না, টাকাও পাবে না। শ্যামনগর ঘরে ঢুকে যাবে। আমাকে খালাসই দাও। আমার আর খুব ইচ্ছে নেই!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা হয় না দেওয়ানকাকা। কারণ আমাকে অবসর নিতেই হবে। রত্নেশ্বরকে ভার দিয়েছি, তাকেই সব ছেড়ে দিতে চাই। ওর সঙ্গে আপনারই মতে শুধু বনবে না নয়, হয়তো আমার সঙ্গেও বনবে না। আমি হস্তক্ষেপ করতে গেলে ও অসন্তুষ্ট হবে। আমি কলকাতায় না-হয়, সতী বউ বলছে—কাশী চলে যাব। ওর মাথার উপর লোক চাই। ওর শ্বশুর অবশ্য এস-ডি-ও, সরকারের ঘরে মুরুব্বির জোর ভালই হয়েছে। কিন্তু কি জানেন, বিষয়বুদ্ধি এঁদের নাই। এঁরা শুধু সরকার চেনেন, খেতাব চেনেন, কিন্তু সম্পত্তি বাড়ানো, সম্পত্তি রক্ষা কি করে করতে হয়, তা জানেন না। রত্নেশ্বর এরই মধ্যে বলছে—নতুন কাল, নতুন কাল। সব ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

*　　　*　　　*

সুলতা তখনও গোপাল সিংয়ের সেই দুই হাতে সাপ ধরা ছবিখানা দেখছিল। ছবিখানা তার আশ্চর্য ভাল লেগেছে।

সুলতা দেখতে দেখতে বললে—দাঁড়াও সুরেশ্বর, গোপাল সিংয়ের ছবিখানা একটু দেখি। আশ্চর্য বোল্ডনেস রয়েছে ছবিখানার মধ্যে।

সুরেশ্বর বললে—ও ছবিখানা শুধু গোপাল সিংয়ের ছবি নয় সুলতা; ওখানার গোপাল বাংলার সেকালের দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তির প্রতীক। সে শক্তি স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু ওরই চাপে সাধারণ মানুষগুলো চাপ বেঁধে, জমাট বেঁধে একটা শক্তি ছিল। তারা গোপালকে বেঁধে

পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সুলতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, সেটুকু চমৎকার ফুটেছে!

সুরেশ্বর বললে—১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত গুনতিতে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল সুলতা; পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট থেকে ১৮৫৯ সালে নতুন ভূমিস্বত্ব সংস্কার আইন। এর মধ্যে জমিদারদের প্রশ্রয় দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, এই দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তিকে ইংরেজ শেষ করলে। তারপর হল নতুন আইন। তার আগে সুলতা, ১৭৫৭ সাল থেকে ৮ বছর পর ১৭৬৫ সাল, পলাশীর যুদ্ধ থেকে মীরকাসেম নবাবের পালা শেষ করে, বাদশাহের কাছে দেওয়ানী নিলে। ৬৫ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল গুনতিতে ২৮ বছর, ধরতে পার তিরিশ-বত্রিশ-এর মধ্যে বাংলা দেশে নবাবী পালার পর জায়গীরদারী শেষ করে জমিদারী পালায় ফেলেছিল। রাজারা-মহারাজারা খেতাবটা রেখে জমিদারীই স্বীকার করে ইংরেজ রাজত্বের বনিয়াদ পোক্ত করেছিল। একদিকে করেছিল কোম্পানী সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে শক্ত, অন্যদিকে এদেশের দুর্ধর্ষ মানুষ, যারা বর্গীর হাঙ্গামা পুইয়ে বেঁচেছে, গিরিয়া, পলাশী তারপর কাটোয়া-গিরিয়া-উধুয়ানালার বিপর্যয় মাথায় করে বেঁচেছে, বিশু ডাকাতের মত ডাকাত যারা নীলকুঠী লুঠ করে, নীল বাঁদরের অত্যাচার নিবারণ করতে চেয়েছে, যারা কুটিল মহাজনদের মেরেছে, যারা জমিদারদের সঙ্গে লড়েছে, তাদের শক্তি এমনিভাবে নাগপাশে বেঁধে জব্দ করতে বসল নতুন আইন।

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।"

কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য এল ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে। সাম্রাজ্যবাদের ভোল বদল হল দুনিয়া জুড়ে; ক্ষাত্র সাম্রাজ্যবাদের বদলে বৈশ্য সাম্রাজ্যবাদ। ইয়োরোপের সব জাতের ধাতই তাই। ইংরেজ তখন বিশ্ববিজয়ী হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য বদ্ধ-পরিকর।

'বৃটিশ এম্পায়ার এস্টাব্লিশড বাই ল'।

সে রাজত্বে মানুষের এতশক্তি তার সহ্য হবে কেন। তাকে শেষ করে দিতেই হবে। ওই সব কথাই বলতে চেয়েছি ওর মধ্যে। ছবিখানা সত্যই বোল্ড হয়েছে।

ছবিখানার দিকে নিজে কিছুক্ষণ দেখে, বললে—১৮৫৯ সালে নতুন আইন পাশ হল, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল তাই দিয়ে জমিদারকেও বাঁধলে। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের কনট্রাক্ট সই করে জমিদার ভেবেছিল, রাজার সঙ্গে কনট্রাক্ট বলে আমরাও রাজা। প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কিন্তু ইংরেজ তা ঘুচিয়ে দিলে। এবার স্পষ্টাক্ষরে বলে দিলে—না, প্রজারা শুধু সরকারের প্রজা, তোমাদের সঙ্গে কনট্রাক্ট, তোমরা খাজনা আদায় করবে। তা থেকে সরকারের দেয় দিয়ে বাকীটা পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ করবে!

১৮৫৯ সাল থেকে বাংলার প্রজাশক্তির সঙ্গে গণশক্তি শ্রান্ত ঘুমন্ত; উঠল প্রথম ১৯২১

সালে। বিচিত্র কথা কি জান, গুনতে গিয়ে উত্তর পেয়েছি ৭২ বছর। আবার ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদ ৩২ বছর।

সুলতা হেসে বললে—হঠাৎ ছবির মারফৎ জবানবন্দী দিতে গিয়ে যে রিসার্চ তত্ত্ব এনে বসলে? ওটা গবেষকদের হাতে ছেড়ে দাও। ওরকম গবেষণা একবার ১৮৫৭ সালে হয়েছিল, সেটা ফলে নি। আবার প্রত্যাশা ছিল—১৯৫৭-তে। কিন্তু তার দশ বছর আগে ১৯৪৭-এ ইংরেজ দেশ ছেড়েছে, স্বাধীনতা এসেছে। এসব চেতাবুনীওলাদের পক্ষে ভাল। তোমার কোন কাজে লাগবে না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—দেখ, পথের ধারে খড়ি দিয়ে ছক এঁকে অদৃষ্ট গণনা কিম্বা রবিবারে সাপ্তাহিক রাশিফল লেখার বাসনা আমার নেই। সেজন্যে বলি নি। তবে কীর্তিহাটে বসে বসে ভাবতে ভাবতে এটা আমার চোখে পড়েছিল। তাই বললাম! এখন ফিরে যাচ্ছি ১৮৫৯ সালে।

গোপাল সিং এবং গোপাল সিংয়ের দৃষ্টান্তে মিউটিনির পর ইংরেজের শক্তির আতঙ্কে অন্য গোপালেরা দুরন্ত গোপাল থেকে সুবোধ গোপাল হয়ে গেল।

শুধু প্রজারাই নয়, ১৮৫৯ সালের আইনে, যে হাতে মিউটিনি দমন করেছিল ইংরেজ, নিঃশেষিত-শক্তি প্রজার মাথায় সেই হাতে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে, সেই হাতেরই তর্জনী উল্টে জমিদারকেও শাসন করলে। জমিদারেরা পাল্টাল; পাল্টাতে বাধ্য হল।

তাদের কাছে ইংরেজ শুধু মিউটিনি দমনকারী শক্তিই নয়। ইংরেজ তার আগেই ক্রিমিয়ান ওয়ার জিতেছে। এদেশের লোকে মধ্যে মধ্যে কল্পনা করত, খাইবার পাস হয়ে রুশ পল্টন আসছে; কখনও কখনও ইণ্ডিয়ান ওসেনে রুশ রণতরীর গুজব উঠত। এ সর্বকিছুর স্বপ্নকে তাসের ঘরের মত সে ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং তাদেরও শঙ্কিত এবং সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না।

তার সঙ্গে আর একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কিসের থেকে বা কোন ঐতিহাসিক কারণে না কোন বিচিত্র অভিপ্রায়ে দেশের মধ্যে একটা নতুন স্রোত বইতে শুরু করল।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর এসেছেন, মাইকেল এসেছেন, বঙ্কিমের পদধ্বনি নিকটতর হয়েছে। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন এক ব্রাহ্মণ সন্তান। রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে পঞ্চবটীর তলায় রাত্রে বসে থাকেন, ঘুরে বেড়ান।

সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের মাতামহ শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় যে ধর্মসাধনার বিকৃতিতে শুধু নিজের জন্যে নরকের দ্বার উন্মুক্ত করেই যান নি, গোটা দৌহিত্র বংশের মধ্যে তাঁর বাসনার পাপ বীজ পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন, সে ধর্মসাধনার পথেই গদাধর চাটুজ্জে স্বর্গের দ্বারমুক্তির পথ খুলতে চলেছেন।

১৮৬০ দশকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

নবজাতকের কান্নার মধ্যে দেবেন ঠাকুরের বাড়ীতে এক নবজাতকের স্বর শোনা যাচ্ছে। ওদিকে মধ্য কলকাতার দত্তবাড়ীতে বাজছে আর এক নবজাতকের কণ্ঠস্বর।

রবীন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁদের সঙ্গে ও পিছনে আরও অনেক সুলতা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সুলতা বললে—সে নাম অনেক সুরেশ্বর! সেসব আমি জানি!

—জান না, একথা আমি কখনই বলিনে। আমি বলছি, এই যে স্রোত, এই যে ধারা, সেটা আর যাই হোক, সেটা ইংরেজের ভয়ে আসে নি। তবে যদি বল—ইংরেজ শাসন সেকালে দুষ্ট ছেলে শাসন করা কটন ইস্কুল, সেই ইস্কুলে পড়ে শাসনের ভয়ে দেশে ভাল স্রোত এসেছিল, তবে তাই না হয় হল। কিন্তু সেটা সেকালের উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে এসেছিল। সেটা রত্নেশ্বর রায়ের মধ্য দিয়ে রায়বংশে তিনি আনতে চেয়েছিলেন। শুধু কীর্তিহাটের রায়বংশেই নয়, অনেক জমিদারবংশেই এসেছিল।

তাই, বীরেশ্বর রায় যে দেওয়ান আচার্যকে বলেছিলেন—রত্নেশ্বর বলছে, সেরেস্তাকে সে ঢেলে সাজাবে। পুরনো আমল আর চলবে না, সেটা তিনি মিথ্যে বলে আচার্যকে সরাতে চান নি। সে সত্যকে তিনি রত্নেশ্বরের সঙ্গে অল্প কথাবার্তা বলেই বুঝছিলেন।

সেটা রত্নেশ্বর রায় করেছিলেন। অন্ততঃ করতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটি পেরেছিলেন, একথাও আমি বলব।

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বলেছিল—পরবর্তীকালে দুটি হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তবুও তিনি আইন এবং ধর্মকে বড় করেই চলেছিলেন, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যে কেউ জানত না। অন্ততঃ সাধারণ লোকে কেউ এ ধরতে পারে নি, বুঝতে পারে নি। তাঁর ডায়রী পড়ে আমি বুঝেছি, জেনেছি—আমিও তা বলতে পারব না। তার আগে—।

তার আগে আমি গোপাল সিংয়ের জীবনটা শেষ করে নি। এমন একটি ঘরেলাগা আগুন বা বনে-লাগা আগুনের মত জীবন শেষ দশ বৎসর কেরোসিনের ডিবের নিরীহ আলোর মত জ্বলেছে। সেটা আর চোখে পড়বার মত নয়। আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি।

১৯৩৭ সালের সেদিন, যেদিন বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল, সেই রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, গোপাল নিশ্চয় এই ক্ষোভ তার ছেলেদের বুকের মধ্যে জ্বেলে দিয়ে গিয়ে থাকবে।

নিশ্চয় সে বলে গেছে তার ছেলেকে, ছত্রির ছেলে আমি। আমার শিবটা মাটিতে ঠেকল তো মরণ আমার হইয়ে গেল। বাপের এই মরণের শোধ লিবি।

অবশ্য সে কথার উল্লেখ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে থাকবার কথা নয়। তবে একথা তার মনের মধ্যে থাকলে, নিশ্চয় কখনও না কখনও কোন ঘটনায়, কোন কথায়, কোন আচরণে প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

এরই জন্যে সুলতা, সেদিন অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে সেদিন রাত্রে আমি রত্নেশ্বর রায়ের দিনলিপিগুলো পাতার পর পাতা উল্টে গিয়েছিলাম, শুধু খুঁজে গিয়েছিলাম একটি নাম। গোপাল সিং। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত। প্রথম প্রথম প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গোপালের নাম পেয়েছি।

"গোপাল ঠিক কথা মত আসিয়াছিল এবং হেঁট হইয়া সর্বসমক্ষে নমস্কার করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—ভাল আছ ? সে বলিল—হ্যাঁ হুজুরের মেহেরবাণীতে ঠিক আছি।

আমি তাহাকে একটি সিকি বকশিসের হুকুম দিয়া হাতে দিয়া বলিলাম—খাজাঞ্চীবাবুকে দাও।

সে আবার নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।"

বছরখানেক ধরেই এটা পেয়ে গেলাম। তারপর আর নিত্য নাম পাই নি। মধ্যে মধ্যে পেয়েছি।

১৮৬৯ সালে পেলাম গোপালের মৃত্যু সংবাদ।

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"আজ গোপাল সিং মারা গেল। মনটা খারাপ হইল। তাহার মৃত্যুতে একজন সত্যকার অনুগত হিতৈষী হারাইলাম।"

শেষ দিকে দেখলাম "গোপাল তাহার পুত্রকে মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে, যেন রায়বাড়ীর আশ্রয় ছাড়িস না। তাহার কৃপাতেই ফাঁসির হাত হইতে বাঁচিয়াছি। এবং তোরাও বাঁচিয়াছিস। নহিলে হয় ভিক্ষুক হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। অথবা যে সব দুর্ভিক্ষ গেল, তাহাতেই সকলে পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত।"

সেদিন এর উত্তর পাই নি।

তবে নিজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। মানুষ আগ্নেয়গিরি। তার বুকের আগুন কখনও নেভে না। শুধু তাই নয়, মানুষ মরে গেলেও তার বুকের আগুন তার বংশের বুকে জেলে দিয়ে যায়। সিদ্ধান্ত আমার ভ্রান্ত নয়। ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। ১৯৩৭ সালে পৃথিবীতে এমনি একটা ভয়ঙ্করতম আগ্নেয়গিরি ধোঁয়াচ্ছিল। তখন সারা পৃথিবীতে হিটলারের কথায় বক্তৃতায় সে আগুন লকলক করে শিখা বের করে জ্বলছে।

একটু চুপ করলে সুরেশ্বর।

তারপর বললে—পরে আমি খবর নিয়েছিলাম। জেনেছিলাম, কিভাবে গোপাল সিংয়ের ক্ষোভটা বংশাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বিচিত্র পথ সুলতা। বিচিত্র পথ।

গোপালের সঙ্গে গোপালের স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হত। সেই ঝগড়ার মুখে তার স্ত্রী বলত—তোমার মত বেইমান আমি দেখি নি। আমাকে তুমি আজ লাথি-ঝাঁটা মারছ! বেইমান তুমি 'পাসর' গিয়েছ যে সেদিন আমি ছত্রির মেয়ে রায়গিন্নীর পা ধরে 'ভিখ মাগোয়ার'

ভিখ মেঙে তোমার জানটা বাঁচিয়েছিলাম।”

গোপাল ক্ষেপে গিয়ে মাথা চাপড়ে বলত—বেইমান হামি না। বেইমান তু। তু ‘পাসর’ গেলে কি তুর লেগে হামি গোপাল সিং এ মুলুকের শের, আজ হামি ‘শিয়ার’ হয়ে বেঁচে আছি। তুর আর তুর বেটা-বেটীর পেট ভরাবার জন্তে রায়কাছারীতে সেলাম দিয়ে চার আনা, আঠ আনা পয়সা লিয়ে আসি। আজ রায়বাড়ীর চাকরান জমি চষি। চাকর বনে গেলাম, স্রিফ তুর আর তুর বাচ্চাদের লেগে।

এর পর সে সবিস্তারে কখনও কখনও বলত—তার দুর্দশার কথা, লাঞ্ছনার কথা। কথাটা ছেলের বুকে প্রবেশ করেছিল এইভাবে।

ছেলের থেকে তার ছেলের বুকে। হরি সিং দফাদার।

হরি সিংয়ের ছেলে শিবু সিং।

তুমি শুনেছ সুলতা, শিবু সিংয়ের কাছে দফাদার হরি সিং ছোরা আর প্যাম্পলেট দেখে তাকে যে মুহূর্তে অতুলেশ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেনেছিল, সেই মুহূর্তে তার বুকের পুরনো কথা নতুন হয়ে জেগে উঠেছিল। আগুন লেগেছিল। সারা রাত হরি সিং শিবুকে গোপাল সিংয়ের অপমানের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তপ্ত করে তুলে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে দারোগার হাতে দিয়েছিল এবং শিবু সেই আগুনের দহনে গলে হয়েছিল এ্যাপ্রুভার।

গোপাল সিংয়ের কাহিনী শেষ ১৮৬৯ সালে। কিন্তু তার শিকড় থেকে গিয়েছিল। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৯৩৭ সালে তা থেকে আবার গাছ বের হল। এবং ওখানেও শেষ হয় নি। তারপরও তার জের আছে, জের চলছে।

বিচিত্রতরভাবে পরে আর একটা এমনি মরা গাছের শিকড় থেকে গজানো গাছের সঙ্গে জড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত আমাকেই জড়িয়ে ধরেছিল পাকে-পাকে।

১৯৩৭ সালে সেদিন রাত্রে ঘুমুতে পারি নি। সেইদিনই করেছিলাম এই ছবিতে জবান-বন্দীর পত্তন।

১৯৩৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী; তারিখটা আমার মনে রয়েছে সুলতা, রায়বাড়ীর জবানবন্দী—কীর্তিহাটের কড়চা আমি আরম্ভ করেছিলাম।

সুরেশ্বর বললে—তার আগেই আমি ঠাকুরদাস পালের অপঘাত মৃত্যুর কথা জেনেছি, তোমার সঙ্গে সম্পর্কের সকল প্রত্যাশায় ছেদ টেনে দিয়েছি। কিন্তু কীর্তিহাটের রায়বংশের হিসেব-নিকেশের বোঝা বয়ে সারাজীবন বেড়াব—এ সংকল্প আমার ছিল না। ভেবেছিলাম —সেটেলমেণ্টের হাঙ্গামাটা মিটিয়ে দিয়ে কোনরকমে এখান থেকে বেরিয়ে পালাব। চিরদিন আমার বদনাম আছে—আমি একজন উদ্ভট খেয়ালী মানুষ; অনেক টাকা আছে আমার, সুতরাং আমি কাল ঘোড়া, ব্ল্যাকহর্স, অবশ্যম্ভাবীরূপে সয়তান হবে আমার সওয়ার। এবং আমি তার চালনায় আমার ক্ষুরে অনেক কিছু—অনেক কোমল বক্ষ—ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে

একদা এক অন্ধকার গর্তে পা ভেঙে পড়ে সকল দৌড়ের অবসান করব। রায়বাড়ীর যে-কলঙ্ক ঢাকতে রত্নেশ্বর রায় ঠাকুরদাস পালকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন সুকৌশলে, তা জানায় আমার পক্ষে কাল ঘোড়া হওয়ার বাধা ছিল না। কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে অতুলেশ্বর আর অর্চনা রায়বাড়ীর একটা বিচিত্র, বিস্ময়কর রূপ প্রকাশিত করে দিয়ে বিপদ বাঁধালে। শিবু সিং তারই মধ্যে এসে গোপাল সিংয়ের ঘটনার জের টেনে সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে কেমন করে দিলে। মনে হল কি জান? মনে হল— রায়বংশের কর্মফলের মধ্যে একটা আশ্চর্য দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। মন্দ কর্মের ফল ভাল কাজের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। গিলে ফেলতে চাচ্ছে সকল পুণ্যকে। পুণ্য-বল, ন্যায়-বল করতে হলে অন্যায়ের দেনা শোধ করে তবে করতে হবে।

একটু ভুল হল; তার আগে—মানে শিবু সিংকে নিয়ে বিমলেশ্বরকাকা যে-নতুন দৃশ্যের পটোত্তলন করলে, ২৬শে জানুয়ারী-এর ক'দিন আগে থেকেই ছবি আঁকার কল্পনা আমার হয়েছিল। মনে আছে—আমি বলেছি—কুইনীকে নিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল সেই ফিরিঙ্গী হ্যারিস। হ্যারিসের দাবী কুইনীর ওপর। গোয়ান বুড়ী হিলডা তাকে তার হাতে দেবে না।

মীমাংসা করতে গিয়েছিলাম ছবি আঁকা ফেলে। ছবি আঁকব বলে ইজেলের উপর ক্যানভাস বসিয়ে সবে তুলি ধরেছি, ঠিক এই সময়ে সে পিছু ডাকার মত ডাকলে। বললে— আমি মীমাংসা করে দেবার ভার নিয়েছি, কথা দিয়েছি, আশা করি আমার মত একজন লর্ড-বংশের ছেলে সে-কথা কখনই খেলাপ করবেন না তিনি।

বিরক্ত হয়ে তখনই তুলি ফেলে উঠে গিয়েছিলাম। লোকজন কাউকে সঙ্গে না নিয়েই গিয়েছিলাম গোয়ানপাড়া। সেখানে গিয়ে ঝগড়ার মধ্যে রায়বংশের নাম উঠল। এবং অন্যের কাছে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক, আমার কাছে ধরা পড়ল আসল সত্য। সে-সত্য ইঙ্গিতে আভাসে বলেছি যে, কুইনীর উপর দাবী হিলডাই করুক আর হ্যারিসই করুক, কুইনীর দায় রায়বংশের। আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায় তার জন্যে দায়ী। আমি মাথা হেঁট করে চলে এসেছিলাম। মীমাংসা আমাকে করতে হয়নি। কুইনী হ্যারিসের দাবী প্রত্যাখ্যান করে নীরবে চলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, হিলডার দাবী সে মেনে নিলে। কিন্তু পরের দিন এসে সে আমাকে দেবেশ্বর রায়ের চিঠি আর রত্নেশ্বর রায়ের দলিল পড়তে দিয়ে চলে গেল।

আমি দেখতে পেলাম—শ্যামাকান্তের সোমেশ্বরের পাপ রত্নেশ্বরকে ডিঙিয়ে এসে আবার দেবেশ্বর রায়ের মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। শ্যামাকান্তের পাপ ধর্মের মধ্য দিয়ে সোমেশ্বরের পাপ সম্পদের মধ্য দিয়ে।

মনে মনে ছবির কল্পনা জাগল—তিনখানা মুখ আঁকব। একের উপরে আর একটা। শ্যামাকান্তের মুখের আউট-লাইনের মধ্যে সোমেশ্বরের মুখের লাইন তার উপর দেবেশ্বরের

মুখ। তার চারপাশে একটা কালো ধোঁয়াচ্ছন্নতার পরিবেষ্টনী।

১৯৩৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী রাত্রে বিমলেশ্বরকাকা শোধ নিতে গেল শিবু সিংয়ের উপর। ২৪শে দারোগা এসে অ্যারেস্ট করলে। তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে ঘোরালে সারা গ্রাম। দেখলাম ঘাতে-প্রতিঘাতে রায়বংশের কর্মফল আজও স্তব্ধ হয়নি। সে বয়েই চলেছে।

আমার নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করলাম সে-স্রোত বইছে। বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী বর্ধমানের কাকী আমাকে শপথ করালেন—এর শোধ আমি নেব।

গোপাল সিংয়ের কাহিনীটা গোটা পড়লাম। রায়বংশের দায়-অপরাধ পেলাম না তা নয়, পেলাম; কিন্তু তার সঙ্গে পেলাম রায়বংশের ক্ষমাগুণেরও পরিচয়। এর পর ছ'মাস ধরে রায়বংশের ইতিহাস তন্নতন্ন করে রায়বংশের জবানবন্দী এবং কীর্তিহাটের কড়চা আঁকলাম ছবিতে। তার মধ্যে শুধু মানুষের অপরাধটাই পেলাম না, আরও কিছু পেলাম। ইতিহাস আমাকে বুঝিয়ে দিলে, একটা কালের গৌরব আর একটা কালের অগৌরব। এক কালের ন্যায়, অন্য কালের অন্যায়। আমি তাকে এড়াতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি, আমি জানি এ-কালে জন্মে তার দৃষ্টিভঙ্গী তার নির্দেশ অস্বীকার করব কি করে?

ঠিক সেই কারণেই সুলতা, গোপাল সিংহের ওই সাপ ধরা ছবিখানা—প্রতীক-ধর্মী হয়ে উঠেছে আপনাআপনি। ওটাতে গোপালের জীবন যেমন আছে, তেমনি আছে বাংলাদেশের একটা কালের ইঙ্গিত। প্রজাশক্তি বাঁধা পড়ল নাগপাশে।

কাল বদল হচ্ছে।

সেটা স্পষ্ট হয়েছে দেখ পরের ছবিতে। সেখানে প্রজার সঙ্গে জমিদার পাণ্টাচ্ছে।

সুলতা বললে—ওটা তো রত্নেশ্বর রায়ের টোপর-পরা ছবি—পাশে কনে-মুকুট-পরা কনে। তারপর—ওটা আবার কার বিয়ে?

সুরেশ্বর বললে—ওটা তোমার পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পালের বিবাহ। বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী—দুজনের বিবাহ একসঙ্গে দিয়েছিলেন। বীরপুরের ভগবান মণ্ডলের শ্যালকের মেয়ের সঙ্গে। কীর্তিহাটের যে রংলাল মণ্ডল অতুলের ডাকা কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, যাঁর ছেলে উকিল হয়েছে, কনে তাঁর পিসীমা। শ্যামনগর পুড়ে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীপুত্র সব গিয়েছিল। রত্নেশ্বরকে সেই বাঁচিয়েছিল। সে-কথা ভোলেননি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী। রত্নেশ্বরও তাই চেয়েছিলেন।

সুলতা কিছুক্ষণ ছবিখানার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। তারপর পরের ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বললে—এখানা? এ-তো রত্নেশ্বর রায়—সর্বালঙ্কার-ভূষিতা স্বর্ণলতা—

—ওটা নয়, ওর পরের খানা। যেখানায় দেখ রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাটের কাছারীতে বসেছেন।

—কিন্তু এখানা ? এখানায় রত্নেশ্বর রায় আর স্বর্ণলতা দেবী, তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে—।

—ওই অঞ্জনা।

—অঞ্জনা ! এই অঞ্জনা ?

—হ্যাঁ, এই অঞ্জনা।

—অঞ্জনার ছবি এর আগে তো এঁকেছ ?

—হ্যাঁ এঁকেছি। কিন্তু তার কোনটাতেই অঞ্জনা খুব স্পষ্ট নয়। প্রথম আছে ভিড়ের মধ্যে—পুরবাসিনীদের সঙ্গে মিশে। তারপর যেটাতেই আছে, অঞ্জনা হয় পিছন ফিরে আছে, নয় মুখের অতিঅল্প অংশই আছে।

সুলতা একদৃষ্টে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে—কি দেখছ বল তো ?

—কিন্তু মনে হচ্ছে এই ছাঁচের মুখ যেন দেখেছি। আরও আছে। বলছ অঞ্জনার মুখ কোথাও পুরো দেখাওনি। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কার সঙ্গে মিল রয়েছে। কার ঠিক মনে হচ্ছে না।

সুরেশ্বর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তার আর আশ্চর্য কি সুলতা। মানুষ শিল্পীর হাতে আর ক'রকমের ছবি আসবে বল। বড়জোর ছটো-তিনটে-চারটে। পোট্রেট যারা আঁকে, তারা আসল মানুষ দেখে কিম্বা ফটোগ্রাফ দেখে আঁকে। আমাকে তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কল্পনা সম্বল করতে হয়েছে। রায়বংশের রায়দের অয়েল-পেন্টিং ছিল, ফটোগ্রাফ যখন থেকে হয়েছে, ফটোগ্রাফও পেয়েছি। বাকিদের তো সবই কল্পনায় এঁকেছি। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, বিধাতাপুরুষ যে বিধাতাপুরুষ তিনি যখন সৃষ্টি করেন, তখন একটা বংশের মানুষ-গুলোকে প্রায় একরকমই করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে অন্য বংশের মেয়ে এসে তাদের বংশের ছাপ মিশিয়ে একটু-আধটু পাল্টে দেন মাত্র।

সুলতা ছবিটা তখনও দেখছিল। সে বললে—কিন্তু ছবিটাতে তুমি একটা ঘটনার কথা বলেছ। সেটা কি ? ঠিক তো রত্নেশ্বরের বিবাহিত জীবনের মধুচন্দ্রিকা নয়।

—না, তা নয়। ছবিটাতে দেখ নতুন বউ স্বর্ণলতা দেবী ইংরিজী বই হাতে বসে রয়েছেন। এস-ডি-ও রাধারমণবাবু ইংরিজী-নবীশ, তিনি মেয়েকে ইংরিজী পড়িয়েছেন। রায়বাড়ীর যে অন্দর রাজকুমারী বউ-রাণী কাত্যায়নী দেবী পত্তন করে গিয়েছিলেন, সেই অন্দরের হাস বদলাচ্ছে স্বর্ণলতা দেবী থেকে। বীরেশ্বর রায়ের গৃহিণী সতীবউ, ভবানী দেবী মিশনারী ইস্কুলের মাস্টার মহেশ্বরবাবুর পালিতা কন্যা, তিনিও লেখাপড়া জানতেন, শুধু বাংলাই নয়, কিছু ইংরিজীও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তা তাঁর ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর রক্তে এমন কিছু ছিল, যাতে শিক্ষার থেকে সংস্কার বড় হয়ে উঠেছিল। সেটা আবার জন্মগত

সংস্কার। বাপের সঙ্গীতবিদ্যার অধিকার জন্ম থেকে নিয়ে জন্মেছিলেন। তার সঙ্গে ধর্ম-পিপাসা। যার জন্যে রাজ্যপাট তাঁকে বাঁধতে পারেনি। রাজরাণী হয়েও তিনি সন্ন্যাসিনীই থেকে গেছেন আজীবন। রায়বাড়ীর কীর্তিহাটের অন্দরে রাজত্ব চলছিল রাণী কাত্যায়নীর মাসতুতো বোন নিস্তারিণী দেবীর। আর কলকাতায় সোফি বাঈয়ের। রায়বাড়ীর অন্দরের হাল এই প্রথম পাল্টালো রত্নেশ্বর-বধূ স্বর্ণলতা দেবীর পদার্পণে। এস-ডি-ও'র মেয়ে ইংরিজী বিদ্যে ইংরিজী ফ্যাশনের হাওয়া বইয়ে দিলেন সেখানে। অবশ্য যৎসামান্য। ছবিটাতে অঞ্জনা স্বর্ণলতা দেবীর নাম দিচ্ছে। রায়বাড়ীর বউদের আসল নাম ঢাকা দিয়ে পোশাকী নাম বা জমিদারশাহী নামকরণ হত। জাহাঙ্গীর বাদশার হারেমে ঢুকে মেহেরউন্নিসা হয়েছিলেন নূরজাহান বেগম। সাজাহান বাদশাকে বিয়ে করে নূরজাহানের ভাইঝি আরজুমন্দবানু হয়েছিলেন মমতাজ মহল। সেকালে জমিদার-রাজাদের বাড়ীতেও এই রেওয়াজ ছিল। ভবানী দেবীর দেওয়া রত্নবউ নামটা কিছুদিনের মধ্যেই পাল্টে হয়ে গিয়েছিল বিদ্যেবতী বউ। রায়বাড়ীর অন্দরের জ্ঞাতি-পোষ্যমেয়েরা ঠাট্টা করে নামটা দিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত। স্বর্ণলতা দেবী চটেছিলেন। অঞ্জনা মেয়েটির কথা বলেছি সুলতা। তার একটা ছন্দ ছিল নদীর মত। সেটা যেমন সহজ তেমনি সুরেলা। সে এই বিদ্যেবতী নামটা পাল্টে দিয়ে নাম দিয়েছিল—সরস্বতী বউ। সতী-বউয়ের বেটার বউ—সরস্বতী বউ।

সুলতা বললে—এসবগুলি কিন্তু চমৎকার ফুটেছে। গোপাল সিংয়ের ছবিটা বোধহয় সব থেকে বোল্ড। গোপাল সিং নাগপাশের সঙ্গে লড়াই করছে।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরেশ্বর বললে—ঠিক ধরেছ। রায় এস্টেটের দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত প্রজার রিপ্রেসেণ্টেটিভ গোপাল সিং। ওর সঙ্গেই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত প্রজাকে জবরদস্তি জঙ্গীশাসন শেষ হয়েছিল রায় এস্টেটে। এই দেখ—এই সরস্বতী বউ নামকরণের ছবিখানার পরের ছবিখানায় রত্নেশ্বর রায় সেই নির্দেশই জারী করছেন কাছারীতে।

ওই দেখ, কাছারীর ঘরে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়েছে। গদীআঁটা চেয়ারে বসেছেন রত্নেশ্বর রায়। তাঁর ডানদিকে নতুন দেওয়ান দাঁড়িয়ে। দুপাশে সারিবন্দী কর্মচারী নায়েব-গোমস্তারা। পিতলের তকমা-আঁটা পোশাক-পরা বরকন্দাজরা দরজায় দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে বললে—ছবিখানাতে একটু এ্যানাক্রনিজিমের মত দোষ আছে। দেখ, টানা পাখাগুলো একটু বেঁকে রয়েছে অর্থাৎ চলছে। পিছনে বড় তালপাখা হাতে একজন খানসামা। অথচ রত্নেশ্বরের গায়ে হাঁসিয়াদার শাল দিয়েছি। প্রলোভনটা সম্বরণ করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় জাঁকজমক ভালবাসতেন। আর সভা-সমিতি, দরবার, কালেক্টরসাহেবের খাস কামরায় দেখা করবার সময় ছাড়া কখনও চোগা-চাপকান শামলা এসব পরতেন না। পরতেন কোঁচানো ধুতি, সে-আমলের পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির নীচে ফতুয়া কি গেঞ্জি পরতেন না। ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে তাঁর দেহের গৌরবর্ণ ফুটে উঠত। বীরেশ্বর রায় প্রথম যৌবনে

বাবরী চুল রেখেছিলেন। পরে কলকাতায় এসে কেটে ফেলেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় গোড়া থেকেই খাটো করে চুল কাটতেন। দাড়ি-গোঁফ দুই কামাতেন। শুধু শাদা পাঞ্জাবিতে কাছারীর দরবারে তাঁর জাঁকজমক-প্রিয় চরিত্র ঠিক প্রকাশ হত না বলেই হাঁসিয়াদার কাশ্মীরী শাল তাঁর গায়ে দিয়েছি।

সুলতা ছবিখানা দেখছিল।

সুরেশ্বর পাশাপাশি তিনখানা ছবিতে রত্নেশ্বরের দৃষ্টি তিন রকম করেছে। শিল্পী সুরেশ্বরকে প্রশংসা না করে পারলে না সে। প্রথম বিবাহমণ্ডপে বর-বধূর ছবিতে রত্নেশ্বরের দৃষ্টি আনন্দোজ্জ্বল, প্রসন্ন হাসি ফুটেছে সে-দৃষ্টিতে। দ্বিতীয় ছবিতে, যেখানে স্বর্ণলতার নামকরণ করছে অঞ্জনা, সেখানে সে-দৃষ্টি অন্যমনস্ক। অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখান দিয়ে খোলা দরজায় নিবদ্ধ। দরজার চৌকাঠের মাথা থেকে সরু শাদা একটি দাগ, তাতে যেন একটা কি! তারই দিকে চেয়ে আছেন রত্নেশ্বর রায়। তৃতীয় ছবিখানায় তাঁর দৃষ্টিতে মালিকের দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ, গম্ভীর।

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় সেদিন নির্দেশ প্রচার করেছিলেন—কীর্তিহাট এস্টেট এখন থেকে পুরনো আমল বদলে নতুন আমলে এল। এ আমলে এস্টেট চলবে আইনের পথে। বে-আইনের পথে চলবে না। আইনে যতটুকু আছে, ততটুকু ছাড়া জোরজবরদস্তি বন্ধ।

প্রজার খাজনা বাকি—তার কাছে তাগাদা কর, তারপর নালিশ কর। নালিশী ডিগ্রীর টাকার এক পয়সা মকুব নাই।

আবওয়াবের মধ্যে তহুরী, তলবানা, নজরানা বহাল রইল। এছাড়া কোন মাণ্ডন, কোন আবওয়াব রইল না।

স্বত্বস্বামীত্বের ক্ষেত্রে ফৌজদারী আমরা করব না। তারা করতে এলে আমরা অবশ্যই ঠেকাব। কিন্তু এগিয়ে যাব না।

প্রজাকে মারধর বন্ধ।

কোন প্রজার কোন অন্যায়, কোন পাপ আমি বরদাস্ত করব না। কোন মামলায় হাই-কোর্ট পর্যন্ত না লড়ে আমরা হার স্বীকার করব না। যে-প্রজা এস্টেটের অবাধ্য হবে, তার সঙ্গে সবক্ষেত্রে মামলা হবে। সে খাজনা দিতে এলে নেবে না। তার পথ খোলা। সে আদালতে দাখিল করুক। আমরা অপোসে নেব না। প্রয়োজন হলে প্রতি কিস্তীতে নালিশ হবে। সে চার আনা দাবী হলেও নালিশ হবে।

সে-সব ক্ষেত্রে সরকারী খাস পতিতে সে গরু চরাতে পাবে না। বন্ধ করবে না পথ, আর বন্ধ করবে না ঘাট। তাছাড়া জমিদারের খাস যাকিছু তার একগাছি ঘাস সে পাবে না।

রায় এস্টেটের গোমস্তা, নায়েব, বরকন্দাজ, পাইক প্রত্যেকের বেতন বৃদ্ধি হল। তাঁরা প্রজার কাছ থেকে বে-আইনী কিছু আদায় করতে পাবেন না।

আরও একটা নির্দেশ ছিল—রায় এস্টেটের জমিদারীর মধ্যে যেসব দেবস্থলের মালিক জমিদার, যেখানে দেবস্থলের খরচ জমিদারের দেওয়া দেবোত্তর থেকে চলে, সেখানে পুরোহিত-পূজক অনাচারী হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। তাছাড়াও অনাচারী তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম বাউল-বষ্টুমদের আখড়া এসবও তুলে দেওয়া হবে। এ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

সবশেষে তিনি বলেছিলেন—তোমরা কেউ মনে করো না যে, এটা আমার উদ্ভট খেয়াল কিম্বা খুব একটা সাধু-সন্ন্যাসী-গিরি করছি আমি। এটা হল এই আমলের পথ। আগেকার আমল চলে গিয়েছে। এ-আমল নতুন। আগের আমল ছিল কোম্পানীর আমল; তারা ব্যবসা করতে এসেছিল। তারা লাভ করতে এসেছিল—লাভ হলেই সন্তুষ্ট থাকত; খাজনার টাকা আদায় তুমি যে করে হয় কর, আমি দেখব না, তুমি আদায় করে আমাকে দাও। বাস্। তাদের টাকা জুগিয়ে তুমি যা কর—কর, দেখব না। এখন ইংলণ্ডেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া আমাদের কুইন; মহারাণীর রাজত্ব। তাঁর চোখে সব প্রজা সমান। জমিদার প্রজা, বড়লোক-গরীবলোক সবাই প্রজা, সবাই সমান। তার জন্যে আইন করেছেন, নতুন আইন হচ্ছে—হবে। সেই আইন মেনে চলতে সকলে বাধ্য। আগে ঘুষ চলত, এখনও হয়তো চলছে কিন্তু তা বেশীদিন বোধহয় চলবে না। ইংরেজদের বিচারের মত সূক্ষ্ম বিচার এদেশে ছিল না—এমন সূক্ষ্ম বিচার হয় না। কাজীর বিচার নয়। এ-বিচার অতি সূক্ষ্ম বিচার। প্রজার উপর অন্যায় হলে জমিদার তো জমিদার, প্রজা আদালতে গিয়ে গভর্নমেণ্টের নামে নালিশ করতে পারে। তারপর নতুন লেখাপড়া এনেছে ইংরেজ। লোকের চোখ খুলছে। ইংরেজ এদেশে একরকম ঈশ্বরপ্রেরিত। মস্ত বড় জাত। এতটুকু একটা দেশ—সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে। তার পরাজয় কোথাও নেই। সুতরাং এসব আর চলবে না। আমার শ্বশুরমশাই এস-ডি-ও। তিনি আমাকে বলছিলেন—বাবাজী, তোমাদের এস্টেটের ধারাধরন পাল্টাও। ইংরেজ-জাত বড় কঠিন জাত। সাতসমুদ্র-তের-নদী পার হয়ে এসেছে, জাহাজ করেছে, স্টীমে চলছে। রেল-লাইন পেতে রেলগাড়ীতে তিন মাসের পথ তিন দিনে পৌঁছে দিচ্ছে। বিদ্যুৎশক্তিতে টেলিগ্রাফ করেছে, এখান থেকে দিল্লী খবর যাচ্ছে মুহূর্তে। দেশের হালের বদলের এই শুরু। এই বদলের সঙ্গে যারা বদলাবে, তারাই থাকবে, শুধু থাকবে নয়—উঠবে, দিন-দিন উঠবে, যে না বদলাবে, সে মরবে।

সুরেশ্বর বললে—এই দীর্ঘ বক্তৃতাটির সবটাই তাঁর ডায়রীতে আছে। হয়তো আরও অনেক বলেছিলেন, কি বলেছিলেন জানি না, তবে এটুকু লিখে গেছেন। তার সঙ্গে আরও লিখেছেন—

"ইংরাজ ঈশ্বর-প্রসাদে আজ বিশ্ববিজয়ী। শুধু ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে বলিয়াই নয়—ক্রিমিয়ায় সে বিজয়ী হইয়াছে। যে রুশ-ভীতির কথা লইয়া দেশে অনেক প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিত, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। মধ্যে মধ্যে আফগানিস্তানের আমীরের কথা বলিত।

বিশালকায় দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ আফগান সৈন্যের ভয় দেখিত, কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর আজ ইংরাজেরই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মদেশে পর্যন্ত ইংরাজ পদার্পণ করিয়াছে। ব্রহ্মের অধীশ্বর আজ রেঙ্গুন হইতে মান্দালয়ে পলায়ন করিয়াছে। ইংরাজ বিশ্ববিজয়ী। তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনা নাই। আজ আইনমত না চলিয়া উপায় নাই। তাহা ছাড়াও পিতামহ সোমেশ্বর রায়ের এবং পিতৃদেবের দৃষ্টান্ত এবং মাতামহ শ্যামাকান্তের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া নূতনভাবে নূতন পথে যাত্রা শুরু করিতে আমি বদ্ধপরিকর। শ্যামাকান্তের এবং সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের কুৎসিত কুসংস্কার আমি আমার জীবন এবং বংশ হইতে মুছিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। পিতৃদেবের দুর্দান্ত দুঃসাহসের পথ, তাহাও পরিত্যজ্য। আমি ঈশ্বর এবং ধর্মকে মানি না তাহা নয়, কিন্তু ওই শবসাধনা, নারী লইয়া সাধনাকে কুসংস্কার এবং বিকৃত ধর্মাচার বলিয়াই মনে করি। এবং পিতৃদেবের জীবনকেও আদর্শ বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম আমি হইব না, ধর্ম পরিত্যাগ করিব না, কারণ উপায়ও নাই। প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য এই বংশ এবং এস্টেটের পত্তনই দেবসেবার উপর করিয়া গিয়াছেন। আমি শুদ্ধাচারে বৈদিক ধর্মমতে থাকিব এবং সম্পূর্ণ আইনের পথে চলিব। জমিদারীর ক্ষেত্রে রাজার আইনই একমাত্র ধর্ম।"

* * *

সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের পৌত্র হরি সিংয়ের উপর শোধ নিতে পথ খুঁজতে আমাকে চিন্তা করতে হয় নি। বিমলকাকা এমন শান্ত লোক হয়েও ভুল করে বীরেশ্বর রায়ের পথ নিয়েছিলেন। আমি রত্নেশ্বর রায়ের নির্দিষ্ট পথ নিয়েছিলাম নির্ভয়ে। ইংরেজ সরকার তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে কিন্তু পারবে না, আমি তার উপর কিস্তী কিস্তী নালিশ করব। ইংরেজকেই আমাকে ডিগ্রী দিতে হবে। তার আদালতের পেয়াদারা এসে তার যথাসর্বস্ব ক্রোক করবে। সে যাবে কোথায়?

সুলতা, আমার মনে আছে, সেদিন মনে জমিদারীর নেশা লেগেছিল, আমি রঘুকে বলেছিলাম—দে রঘু, বোতলটা দে।

সুলতা বললে—তোমার জমিদারগৌরব পরে শুনব, কিন্তু রত্নেশ্বর রায় দুটো লোককে খুন করিয়েছিলেন বলছিলে। সে জমিদারীর জন্যে নয় বলছ তুমি?

সুরেশ্বর বললে—না সুলতা, জমিদারীর জন্য নয়, যে দুটো খুনই তিনি করিয়েছিলেন তার কোনটাই জমিদারীর প্রয়োজনে করান নি। সংসারে রাম রাজত্বের কথাও আছে, রাবণ রাজত্বের কথাও আছে।

বাঁকা হেসে সুলতা বললে—কি বলছ তুমি? রত্নেশ্বর রায় দুটো খুন করিয়েছিলেন রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন এবং শূদ্রতপস্বী বধের মত পুণ্যকর্ম ভেবে করেছিলেন?

—কথাটা তুমি অনেকটা ঠিকই বলেছ সুলতা। রামচন্দ্র রাজা না-হলে এ দুটো করতেন না। আমার কথাটা আমি শেষ করি নি; তুমি তার আগেই মন্তব্য করেছ। রামচন্দ্র রাজা

না-হ'লে—সীতাকে সতী জেনেও পরের মিথ্যা সন্দেহে নির্বাসন নাও দিতে পারতেন। আর শূদ্রক তপস্যা করার দরুণ অনাবৃষ্টি হয়েছে এর জন্য তাকে শাস্তি তিনি দিতেও পারতেন আবার নাও দিতে পারতেন। অনেক মানুষ আছে যারা রাজা নয় জমিদার নয় তাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীকে হরণের জন্যে—যে হরণ করে তাকে খুন করে, অনেকে আর এক বিয়ে করে দিব্যি সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে, আর পাড়ার বা গ্রামের বদমাসকে কেউ কেউ শাস্তি দেওয়ার ভারটা কর্তব্যবোধে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দাঙ্গা-মারপিট করে হাঙ্গামা বাধায় জেলেও যায়। কিন্তু রাজা হলে ওই রামের মতই কাজ না করে উপায় থাকে না।

—তার মানে ?

—ধর, ঠাকুরদাস পাল রায়বংশের গোপন পাপের কথা প্রকাশ করব বলে ভয় দেখিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রত্নেশ্বর রায় সাধারণ লোক হলে তার সঙ্গে হাতাহাতি করতে পারত আবার মুখ বুজে সয়েও যেতে পারত। কিন্তু জমিদার রত্নেশ্বরের ঠাকুরদাস পালের মুখ বন্ধ না ক'রে উপায় ছিল না। ওটা জমিদারী রক্ষার জন্য বা জমিদারীর আয় বাড়াবার জন্য নয়। ওটা জমিদার হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় খুনটাও তাই। একজন গোয়ানকে তিনি কোথায় হারিয়ে দিয়েছিলেন, সে কেউ জানে না।

—রায় বাড়ীর মর্যাদা ?

—রত্নেশ্বর লিখেছেন তাই তাঁর ডায়রীতে। কিন্তু ঠিক তা নয়। অঞ্জনা যদি ভ্রষ্টাই হয়ে থেকেছিল, তাতে রায়বাড়ীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। অথচ এটাকে তিনি তাইং ভেবেছিলেন! ওই ছবিখানা আর একবার দেখ সুলতা। ওই যে বিবাহের ছবির পর, যেখানে রত্নেশ্বর রায়, স্বর্ণলতা দেবী বিদ্যাবতী বউ, এবং অঞ্জনা তিনজন রয়েছে, সেখানার দিকে। অঞ্জনা বলছে—বিদ্যেবতী না—নাম থাকুক সরস্বতী বউ। জ্যাঠাইমা সতী বউ, তার বেটার বউ সরস্বতী বউ। বিদ্যেবতী যেন ঠাট্টা ঠাট্টা। বিদ্যেসুন্দরের বিদ্যে-বিদ্যে।

—মেয়েটি তো লেখাপড়া জানত না বলছ।

—কিন্তু বলেছি ছড়া, পাঁচালী, এসব মুখস্থ ছিল, বিদ্যাসুন্দর সে আমলে খুব চল ছিল। কে তাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল জানি না। তবে বিদ্যেসুন্দর কারুর কাছে সে শুনেছিল। এখানেই স্বর্ণলতা বলেছিলেন—কর্তা গিন্নীকে ব'লে অঞ্জনাকে আমাকে দাও। ওঁরা তো শুনছি এইবার কলকাতা যাচ্ছেন। তারপর যাবেন পশ্চিম। কাশী গয়া বৃন্দাবন তীর্থ করতে। ওরই মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের ওই গোয়ানটার হারিয়ে যাওয়ার বীজ লুকিয়ে আছে।

সুরেশ্বর বললে—এই দুটো খুনের যা কারণ তা জমিদারীর প্রজাশাসন, প্রজাশোষণ এ সব-কিছুর জন্য নয়, এর কারণ যা তা জীবনে অনেকের ঘটে থাকে হয়ে থাকে। মা-বাপের নামে কেলেঙ্কারী অপবাদ রটনা করলে এ কাজ ক্রোধবশে যে কোন লোক করতে পারে। তবে জমিদার বলে রত্নেশ্বর রায়ের পক্ষে সহজ হয়েছিল, যদি বল স্বাভাবিক হয়েছিল, তবে তাতেও

আপত্তি করব না।

আর এই গোয়ানের ব্যাপারটা, ওটাও তাই বলা যায়—তবে ওর আসল কারণটা অন্য, দেখেছ, রত্নেশ্বর রায়ের দৃষ্টি অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখানে একটা মাকড়সা ছাদ থেকে সুতো টেনে নামছে সেটার দিকে? দেখ সুতোটা দুলছে, ছাদ থেকে রাইট অ্যাংগেল করে নেমে আসেনি, একটুখানি বেঁকে আছে।

সুলতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—তুমি ওটা বড় ভাল কল্পনা করেছ সুরেশ্বর। মাকড়সাটা অঞ্জনার দিক ঘেঁষে বেঁকে রয়েছে। তুমি—কি—।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। তাই।

—রত্নেশ্বর সাধুতার আবরণে—

—না, আবরণে নয়। ওটার ইণ্টারপ্রেটেশন অন্যে যে যা করবে করুক আমি তা করি নি। তা করব না। কখনও না। রত্নেশ্বর রায় নিজের জীবনে কোন অসাধুতা কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। মানুষ তিনি, তার মনও মানুষের মন, তাঁর মনে যখনই কোনও অন্যায় অসাধু প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে, তখনই তাকে তিনি চাবুক মেরে সার্কাসের ট্রেনার যেমন বাঘ সিংহকে খাঁচায় ঢোকায় তেমনি করেই তাদের পিঞ্জরেতে পুরেছেন। নির্মমভাবে নিজেকে আঘাত করেছেন তিরস্কার করেছেন।

এর ইণ্টারপ্রেটেশন আমার কাছে ওই রায়বাড়ীর রক্তে শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের ধর্ম-সাধনায় ভ্রষ্টতার পাপ। শ্যামাকান্ত যেমন শেষ জীবনটা ক্রমাগত নিজেকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে শাসন করতেন, ঠিক তেমনি ক'রেই রত্নেশ্বর রায়ও নিজের অন্তরের মধ্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। এই পাপই বল আর তোমাদের আজকের ইণ্টারপ্রেটেশন অনুযায়ী হেরিডিটিই বল, অথবা এইটেই মানুষের স্বভাবের আসল চেহারাই বল, বলতে পার। কিন্তু আমি তা বলব না।

রত্নেশ্বরের জীবনে এই শাপ বা পাপকে প্রথম উদ্রিক্ত করেছে এই অঞ্জনা। একটু আগে বলছিলে—অঞ্জনার মুখের ঢঙের মধ্যে, আকৃতির মধ্যে আর কার ছবির যেন ছাপ পড়েছে।

পড়েছে সুলতা, একজনের নয় দুজনের। রায়বাড়ীর কড়চা বা জবানবন্দীতে প্রথম এ মুখের ছাপ পাবে সেই পাগল মেয়েটির মধ্যে, যাকে শ্যামাকান্ত চিনেছিলেন যোগিনী ব'লে। যাকে নিয়ে তিনি কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধপিঠের জঙ্গলে সাধনার নামে ব্যাভিচার করেছিলেন। এবং শ্যামাকান্তকে সেই বর্ষার সময় অমাবস্যার রাত্রে দারুণ দুর্যোগে তুফানপ্রমত্তা কাঁসাইয়ের জলে ফেলে দিয়ে সোমেশ্বর তাকে কেড়ে নিয়েছিলেন যোগিনী সাধনা করবেন ব'লে। চল, ওইদিকে চল, তার ছবি দেখবে। মিলিয়ে পাবে। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তখন কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

—এই দেখ পর পর দুখানা ছবিতে যে পাগলী এসে রায়বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে।

ধূলিধূসর দেহ, অধ উলঙ্গ, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। এর সঙ্গে হয়তো পুরো মিল পাবে না। কিন্তু এইটেতে পাবে। এই দেখ, পাগলাবাবা শ্যামাকান্ত তাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করেছে। স্নান করিয়েছে। নতুন কাপড় পরিয়েছে। মেয়েটি শান্ত এবং তৃপ্ত হয়ে শ্যামাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আরও দুটো ছবি আছে, এই একটা দেখ সোমেশ্বর রায়ের অন্দরে, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলাকে কোলে ক'রে দোলাচ্ছে। কি প্রসন্ন শান্ত মুখ দেখ! আর একটা ছবি, যোগিনী তখন সোমেশ্বরের সাধনসঙ্গিনীর ছদ্মবেশে তাঁর বিলাসসঙ্গিনী হয়েছে, দেখ, এইটেতে যে ছবি আছে তারই সঙ্গে অঞ্জনার মিল রয়েছে পুরো।

সুলতা দেখলে। তাই বটে। দেখলে ভ্রম হয়; মনে হয় বুঝি যোগিনীই দাঁড়িয়ে আছে রত্নেশ্বরের সামনে। একটু ভেবে নিলে সুলতা। কপালে ক'টা রেখা জেগে উঠল। একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—এটা তুমি কেন করলে সুরেশ্বর? অঞ্জনা রায়বাহাদুরের পোষ্য ছিল—হয়তো বা—

—না সুলতা, তা ছিলেন না অঞ্জনা দেবী।

—তা হ'লে দুটো ছবি একরকমের ক'রে তুমি ওই মেয়েটির কি অপমান কর নি?

—না। তুমি রাগ করো না। একটু ভেবে দেখ। এখানে ওই মেয়েটি রায়বংশের কড়চার একটা সিম্বল। আমি যোগিনীর কোন ছবি পাই নি। দেখি নি। অঞ্জনার একটা ফটো ছিল শুনেছি কিন্তু সেটা নাকি রায়বাহাদুর আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এক জায়গায় তার ছবির আদল পেয়েছি। তাই দেখে অঞ্জনার ছবি এঁকেছি এবং তা থেকেই যোগিনীর ছবিও এঁকেছি। আগে আমার জবানবন্দী শেষ হোক তারপর তুমি রায় দিয়ো। তবুও যদি তর্ক করো তবে কৈফিয়ৎ হিসেবে বলব—বিজ্ঞানস্বীকৃত একটা নিয়মকে আমরা স্বষ্টির মধ্যে লক্ষ্য কার, সেটা হল একজনের সঙ্গে আর একজনের আশ্চর্য চেহারার মিল। ওটা হয়ে যায়। এও তাই।

একটু বক্র হাসি সুলতার মুখে ফুটে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—তুমি এখনও বিচারক হিসেবে নিরপেক্ষ হতে পারলে না। কিন্তু পরে তোমাকে মত বদলাতে হবে।

—ভাল। বল শুনি!

একটু চুপ ক'রে বোধহয় কিছু ভাবলে সুরেশ্বর তারপর বললে—তাহ'লে তোমাকে রায়-বংশের জবানবন্দীর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করে পাঁচ বছর পরে যা ঘটেছিল সেইটেই আগে—এখনই শুনিয়ে দিই। আমি আমার কথায় বলব না। বলব রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর কথা।

সামনের টেবিলের উপর রাখা ডায়রীগুলির গাদা থেকে ১৮৬৪ সালের ডায়রী বেছে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি পোরা চিহ্নিত জায়গাগুলি খুলে দেখতে দেখতে একজায়গায় থামল সুরেশ্বর। বললে—এই পেয়েছি। শোন।

"আমি নিভৃতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অঞ্জনাকে ডাকিয়া কঠিন ভানই করিয়া কহিলাম—এ তুমি কি করিতেছ ? এসব কি শুনিতেছি ?

অঞ্জনা ভয় পাইল না, সে বলিল—কি শুনিতেছ ?

—তাহা তুমি জান না ? গোটা অন্দরে কথাটা লইয়া কানাকানি চলিতেছে। লোকে হাস্য করিতেছে !

—কানাকানি চলুক। হাস্য করুক—তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আমি এবার রোষদৃপ্ত কণ্ঠে কহিলাম—অঞ্জনা, তুমি সাবধান হইয়া কথা বলিবে।

অঞ্জনা আশ্চর্য এক হাস্য করিল, যেন জগৎসংসার সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল—কেন ? কি করিবে তুমি ? মারিয়া ফেলিবে ? তোমরা বড়লোক জমিদার, তোমরা সব পার। কিন্তু আমি তাহাতে ভয় করি না। আমি তাহাতে জুড়াইব। তবে একটি দয়া প্রার্থনা করিব। যেন ভাড়াটিয়া লোক দিয়া আমাকে হত্যা করাইয়ো না। তুমি স্বহস্তে আমাকে হত্যা করিয়ো। তুমি বিষ গুলিয়া আমাকে দিয়ো, আমি সহাস্যে তাহা পান করিয়া মরিব। তুমিই আমাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছ, আমি স্বহস্তে লিখিয়া যাইব, আমি স্বেচ্ছায় বিষ পান করিয়া মরিতেছি। ইহার জন্য কেহ দায়ী নয়।

অঞ্জনা প্রগলভা বটে। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক প্রগলভতায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি পাপিনী। কালসর্পিণীর সহিতই একমাত্র তোমার তুলনা হয়। দুগ্ধ পান করাইয়াও ফল হইল না।

অঞ্জনা এবার যেন আরও উদ্ধত এবং প্রগলভ হইয়া বলিল—হাঁ—হাঁ—আমি কালসর্পিণীই বটে। আমি পাপিনীই বটে। পাপ উদ্দেশ্যেই তোমাদের গৃহে সেবার আসিয়াছিলাম। দরিদ্রের কন্যা, এক দরিদ্রের স্ত্রী, সে দরিদ্র হইলেও ক্ষতি ছিল না, সে পাষণ্ড, সে দুশ্চরিত্র, সে বাউণ্ডুলে। তোমাদের গৃহে আসিলাম উৎসব দেখিতে। ঐশ্বর্য দেখিয়া লোভ হয় নাই তাহা বলিব না। অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। কিন্তু ততোধিক লোভ হইল তোমাকে দেখিয়া। আবার ভয়ও হইল। তোমার মত গম্ভীর, তোমার মত কঠোরচরিত্র যুবক আমি দেখি নাই। পিত্রালয়ে, আমার দিকে আমাদের গ্রামের দুশ্চরিত্র যুবকেরা লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। আমি কৌতুক বোধ করিতাম এবং অহংকারও অনুভব করিতাম। তাহাদিগকে লইয়া কথায় খেলা করিতাম। আমি কালো হইলেও আমার মত মোহময়ী যুবতী দুর্লভ ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। রাজার ঘরে আমি পড়িলে তোমার স্বর্ণলতা অপেক্ষা বহুগুণে মহিয়সী হইতে পারিতাম। তুমি প্রথম আমার দিকে একবার চাহিয়া আর ফিরিয়া চাহ নাই। তারপর তোমার মাতা অনুগ্রহ করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। আমি হস্তে চাঁদ পাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিয়া গেলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিলাম নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উপর আমার ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া আমি

ফেলিয়াছি। তুমি আমাকে, স্বর্ণলতার কাছে সেই ধাঁধা প্রেরণ করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে তোমার ঘরে আহ্বান করিলে। আমি মনে মনে হাস্য করিলাম; উৎসাহিত হইলাম। তাহার পর তোমার বিবাহ হইল। তোমার মাতাপিতার সঙ্গে আমার চলিয়া যাইবার কথা। আমি সরস্বতী বউকে ধরিলাম; বলিলাম—ভাই, বউ, জ্যাঠাইমা জ্যেঠামশায়ের নিকট কোন প্রবীণাকে পাঠাইয়া দাও। আমি ভাই তোমাদের যুগলের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন সার্থক করিব। তোমরা শয়ন করিবে, আমি শয্যা রচনা করিব, আমি তোমাকে কেমন করিয়া পুরুষের নাসিকা ফুঁড়িয়া দড়ি পরাইতে হয় শিখাইব। পান সাজিব। এবম্বিধ নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া তাহাকে দিয়াই তোমাকে বলাইলাম। জ্যাঠাইমাকে বলাইলাম। সঙ্কল্প করিলাম, তোমাকে জয় করিব।

আমি বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি থাম। তুমি থাম। এসব কথা বলিলে পাপ হয়, শুনিলে পাপ হয়—তুমি থাম।

অঞ্জনা বলিল—সে তোমার হয়, আমার হয় না। আমাদের মত যাহারা তাহাদের হয় না। যে ভগবান এবম্বিধ অদৃষ্ট দিয়া আমাদের জগতে পাঠান তিনি আমাদের এবম্বিধ চরিত্র দেন। আর তুমি এবং তোমার মত যাহারা শুদ্ধাচারী, তাহারা ভণ্ড, তাহারা কালী কালী হরি হরি জপ করিয়া দন্তে দন্ত টিপিয়া পড়িয়া থাকে, তুষানলে দগ্ধ হয়।

সভয়ে আমি বলিলাম—অঞ্জনা!

অঞ্জনা বলিল—আমি তোমাকে জানি না মনে করিতেছ? তোমার প্রতি পদক্ষেপ আমি চিনি, তোমার মুখ দেখিয়া বলিতে পারি কি তুমি ভাবিতেছ। মুখ খুলিলে বলিতে পারি কি বলিবে। তোমাকে দেখিলে তোমার দৃষ্টি উৎফুল্ল হয় না? আমি থাকিলে সরস্বতী বউয়ের সঙ্গে আলাপনের মধ্যে তোমার উচ্ছ্বাস বাড়ে না? কোনক্রমে আমার হাতে হাত ঠেকিলে তুমি চঞ্চল হও না? সত্য বলিবে!

আমি এবার কঠোর হইয়া বলিলাম—না—না—না!

অঞ্জনা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বিষণ্ণ থাকিয়া বলিল—তুমি মিথ্যা বলিলে।

আমি বলিলাম—না।

অঞ্জনা বলিল—তবে সত্য গোপন করিলে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজের মতই কথাটা বলিলে। জমিদার হিসাবে তোমাকে লোকে ভয় করে। মানুষ হিসাবে তুমি আরও ভয়ঙ্কর। হাঁ, অস্বীকার করিব না তুমি অত্যন্ত সত্য। তুমি হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়াছ। তোমাকে একাকী দেখিয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তুমি কোন-প্রকার ছুতা করিয়া স্বর্ণলতাকে আহ্বান করিতে। বা চাকরকে আহ্বান করিতে! স্বর্ণলতার সম্মুখে তোমার উল্লাসে আমি পুলকিত হইতাম কিন্তু তোমাকে একাকী পাইয়া কাছে

ছুটিয়া গিয়াও সভয়ে সরিয়া আসিতাম।

অতঃপর সহসা সে যাহা করিল তাহাতে আমি ভীত হইলাম, চঞ্চল হইলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—কেন, আমাকে কি এতটুকু ভালবাসা তুমি দিতে পারিতে না? এতটুকু? এক কণা। স্বর্ণলতার উচ্ছিষ্ট এতটুকু? তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইতাম। এই তো সারা দেশময় জমিদারদের দুইটা তিনটা করিয়া স্ত্রী থাকে। রক্ষিতা থাকে। বাড়ীতে আশ্রিতাদের মধ্যে কত সুন্দরী যুবতীকে তাঁহারা অনুগ্রহ করেন। তাহাতে কি ক্ষতি হয়?

—তাহা ছাড়া রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা তোমার যোগ্যই নয়। নামেই লেখাপড়া জানা সরস্বতী বউ। রঙটাই কটা। আমার সঙ্গে তাহার তুলনা! তুমি ভয়ঙ্কর বলিলাম, ভুল বলিলাম। তুমি কাপুরুষ। তুমি পুরুষই নও। তুমি সিংহ নও, তুমি শশক।

আমি কঠোর কণ্ঠে তাহাকে বলিলাম—তুমি দুশ্চরিত্রা! চুপ কর তুমি।

অঞ্জনা তাহাতেও দমিল না। সে বলিল—হাঁ, আমি দুশ্চরিত্রা। অন্ততঃ মনে মনে আমি দুশ্চরিত্রা। তুমি সাধু। তুমি ভয়ঙ্কর। সেই প্রেতিনীর গল্প আছে—যাহারা সুযোগ পাইয়া সুন্দর পুরুষকে আশ্রয় করে তাহাকে চুষিয়া খায়, আমি তাই। সেইরূপভাবেই তোমাকে চুষিয়া খাইবার জন্য তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহার খাইয়া আমাকে পলাইতে হইতেছে। কিন্তু তুমিও জ্বলিবে। নিশ্চয় জ্বলিবে। এই তেজ তোমার থাকিবে না।

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—অঞ্জনা! অঞ্জনা—শোন।

সে চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে বলিলাম—কদাচ এ কার্য করিও না। কদাচ না। তাহা হইলে আমি তোমাকে সত্যই হত্যা করিব।

সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে ফিরিয়া চলিয়া গেল! আমি বুঝিলাম এবার ঔষধ ধরিয়াছে। সে ভীত হইয়াছে এবং বুঝিয়াছে!"

সুরেশ্বর খাতাখানা বন্ধ করলে।

সুলতা বললে—অদ্ভুত মেয়ে।

সুরেশ্বর বললে—বল, কি বলবে এর সম্বন্ধে?

—এর সম্বন্ধে বলব; হাসলে সুলতা, বললে—তুমি কি বলবে জানি না, আমি বলব—সে চেয়েছিল তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু পায় নি।

—রত্নেশ্বরকে সে চেয়েছিল, কিন্তু রত্নেশ্বরের কি তার দাবী মেনে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল?

—রত্নেশ্বর ছাড়াও আর অনেক মানুষ ছিল, যারা রত্নেশ্বর থেকে কম উজ্জ্বল, কম গুণবান নয়। হয় তো ধনী না হতে পারেন। সে স্বচ্ছন্দে ডাইভোর্স ক'রে তাদের একজনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তা সে করেছিল সুলতা। সে রত্নেশ্বর রায়ের সমস্ত শাসন, সমস্ত বন্ধন অস্বীকার ক'রে কলকাতায় জানবাজারের এই বাড়ী থেকে একদিন রাত্রে চলে গিয়েছিল। তখন কলকাতার বাড়ীতে রত্নেশ্বর রায় শীকারের জন্য একজন পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে রেখেছিলেন। ওই হ্যারিসের মত চরিত্র। এবং আশ্রয় নিয়েছিল কৃশ্চান চার্চের। যেখানে রত্নেশ্বর রায়ের হাত পৌঁছয় না। যাবার সময় একখানা চিরকুট লিখে গিয়েছিল। 'পাপ তোমার কাছে হারিয়া পলাইতেছে।'

সুরেশ্বর একটু থেমে কথার জের টেনে বললে—এইজন্যেই আমি রায়বাড়ীর পূর্ব-পুরুষের ব্যাভিচার-সঙ্গিনী সেই যোগিনী মেয়েটার চেহারা অঞ্জনার চেহারার আভাস নিয়ে এঁকেছি। অঞ্জনাকে আমি অপমান করতে চাই নি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।

আরও আছে সুলতা। অঞ্জনার কথাটা তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে তুললে বলে ক্রমভঙ্গ ক'রে বলতে হ'ল। এখন আমার জবানবন্দীর ক্রমে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালে। রত্নেশ্বর রায়ের বিবাহ হল। অঞ্জনাকে স্বর্ণলতাই চেয়ে নিলে শাশুড়ী ভবানী দেবীর কাছে।

শুধু বীরেশ্বর রায় একটু খুঁত-খুঁত করেছিলেন। বলেছিলেন—তাই তো!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় প্রস্তাবটা শুনে বলেছিলেন—তাই তো!

ভবানী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন, তাই তা কেন বলছ!

—তোমার মনে হচ্ছে না? অঞ্জনা এখানে বউমার কাছে থাকবে বলছ?

—আমার কাছে থাকলে আমার সুবিধে হ'ত। তোমার খাবার, সেবার ভারটা ওর উপর দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অঞ্জনারও আমাদের সঙ্গে তীর্থ দর্শন হ'ত। কিন্তু বউমার কথাও তো ভাবতে হবে। বউমা বলছেন—ও থাকলে আমি কথা কইবার লোক পাব। ও ভারী মজার মজার কথা বলে। এত বড় বাড়ীতে—চুপ করলেন বউমা। তবে বুঝলাম। কথাটা তুমিও ভাব, এত বড় বাড়ীতে ওই অল্পবয়সী মেয়ে, হাঁপিয়ে উঠবে যে।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—একবার রত্নেশ্বরকে ডেকে দিয়ো। তোমার সঙ্গে তার এ বিষয়ে কোন কথা হয়েছে?

ভবানী দেবী বলেছিলেন—তার সামনেই তো কথা হল। মায়ের মন্দির থেকে এলাম, বউমা, অঞ্জনাও আমার সঙ্গে ছিল। পূজার পর, ভোগের আগে বউমা বললে—আমার শরীরটা কেমন করছে মা। দেখলাম খুব ঘেমে গেছে। বললাম—তুমি চলে যাও, আমি রয়েছি; অঞ্জনা রয়েছে, তোমার চলে গেলে কোন দোষ হবে না। বউমা চলে এল নিজের ঝিকে নিয়ে। ফিরে এসে তোমায় মার চরণামৃত পুষ্প দিয়ে রত্নকে দিতে গেলাম, দেখলাম, বউমা একটু সুস্থ হয়েছেন। ছেলেমানুষ, সায়েবী চালে মানুষ, এসব অভ্যেস নেই। বললাম—এখন সুস্থ লাগছে তো?

রত্ন বললে—ওঃ সে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল যেন। এসে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তারপর বললে—বাবাঃ, পেটের ভেতর আমার হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ভয় করছে। এ আমি সব সামলাব কি করে? মা চলে যাবেন! বললাম—কিন্তু পারতে হবে। না পারলে তো চলবে না। তুমি নিজে চোখে বিয়ের আগে এসে সব দেখে গিয়েছ! তা সাহস আছে, বললে—পারব বই কি। এসব ভাল লাগছে খুব। কিন্তু কখনও তো করি নি। দেখে ভাল লেগেছিল। এখন সেইসব করতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাচ্ছে! ভয় হচ্ছে। কোথায় খুঁত হচ্ছে, কোথায় খুঁত হচ্ছে!

হেসে ভবানী দেবী বলেছিলেন—এর পর যখন অভ্যেস হবে, তখন দেখবে, মা তোমাকে অনবরত হেসে বলছেন, ভয় কি? ভয় কি বেটা। ওরে আমি যে মা। আমার কাছে খুঁত হয় সন্তানের! তাছাড়া মাসি মা রইলেন, উনিই এতদিন করে আসছেন, তোমার হাতে-হাতে সব জুগিয়ে দেবেন; বলে দেবেন। ওই দেখ না, অঞ্জনা সব কেমন অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে।

ভবানী বীরেশ্বর রায়কে বললেন—এই কথাতে রত্নেশ্বরই বললে—তোমার বউমা আমাকে একটা কথা বলছিল।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—কি?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন স্বর্ণলতাকে—বল না, তুমি নিজেই বল না। আমাকে বললে কি হবে? খোদ মাকে বল। আমি বলতে পারব না।

—কি বউমা?

স্বর্ণলতা শাশুড়ির সামনে ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি শোন, ও কি বলছে।

তখনকার কালে বউ শাশুড়ির সামনেও ঘোমটা দিত, এবং চাপা গলায় কথা বলত। অবশ্য ঘোমটা সারা-মুখ-ঢাকা ঘোমটা নয়, কপাল ঢেকে অন্তত ইঞ্চি দুই সামনের দিকে ঝুলে থাকত।

মৃদু কণ্ঠে স্বর্ণলতা বলেছিলেন—বলছিলাম, অঞ্জনা ঠাকুরঝির কথা!

—কি কথা? অঞ্জনা কিছু বলেছে বুঝি?

—না, ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কথাটা সেরেছিলেন নবীনা রায়বধূ।

এবার রত্নেশ্বর ভিতরে ঢুকে এগিয়ে এসেছিল এবং বলেছিল—মা তো আমার বাঘিনী বউ-কাঁটকী শাশুড়ী নয়। বলতে গলা শুকুচ্ছে। ও বলছিল, তুমি চলে যাবে, একলা হবে ও; এইসব দেখা তার কাজ; ঠাকুমা বয়সে গেলে বুড়ো হয়েছেন। এই তো বিয়েতে খেটে নেচে খেয়ে আজ প্রায় মাসের উপর পড়ে আছেন। সেরে গেছেন, তবু উঠতে পারেন না। তার ওপর বাতের ব্যথা। আর ওঁর কথাবার্তা বড় সেকেলে। শুধু সেকেলে নয়, একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং। তোমাকেও কি বলেছিলেন, তোমার মনে আছে। তাই বলছিল, অঞ্জনা যদি ওর কাছে থাকত, তো ভাল হ'ত। বলছিল—ঠাকুরঝি যদি এখানে থাকতো তাহলে খুব

ভাল হ'ত। সব কাজ দিব্যি করে যেতো দুজনে মিলে, হাসি গল্পের মধ্যে। এই আর কি। কি বল না! ঘোমটাশুদ্ধ ঘাড়টা নেড়েও তো জানাতে পার!

তাই জানিয়েছিলেন নতুন বউ।

ভবানী দেবী হেসে বলেছিলেন—তোমার আমার কথা ছিল আলাদা। শাশুড়ী ছিলেন না। শ্বশুর ছিলেন, তিনি থাকতেন কীর্তিহাটে, তো তুমি আমায় নিয়ে ছুটতে কলকাতায়। আবার তিনি কলকাতা গেলে তুমি আমায় টেনে আনতে এখানে। ঘোমটা দিতে হত না। সমীহ করবার কেউ ছিলেন না। তার ওপর সে আমলে ঘোরতর সাহেব তুমি।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ। শুধু একটি হুঁ।

ভবানী দেবীর খেয়াল হয়েছিল, এতক্ষণে, তিনি বলেছিলেন—তুমি কি ভাবছ বল তো!

—ভাবছি, তা'হলে অঞ্জনার স্বামীকেও এখানে রাখতে হবে।

—তা তো কথাই হয়েছে।

—না, এই বাড়ীতেই তার জন্যে নিচেরতলায় সংসার পাতিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটা মদ খায়, যাত্রা করে বেড়ায়, বাউণ্ডুলে। তাহলেও অন্দরেই তাকে থাকতে দিতে হবে।

—কেন? তা করতে হবে কেন? সে তো অঞ্জনাকে নেয় না। গণ্ডা দরুণে বিয়ে। চাকরি অঞ্জনার খাতিরে দিতে আমরা চাচ্ছি, কিন্তু অঞ্জনা বলছিল, কেন মিথ্যে তাকে চাকরি দেবেন জ্যাঠাইমা, সে চাকরি করবার মানুষ! দুদিন পর পালিয়ে যাবে। না হয় কারুর সঙ্গে মারপিট করবে। না হয় মাতলামি করে, আমার লজ্জার আর শেষ রাখবে না। আমাকে দয়া করে কাছে রাখবেন, এতেই আমি বাঁচলাম। এ-ই ঢের। স[illegible] অদৃষ্ট নয়। আর ও আমি চাইনে। ও কাজ করবেন না। আমি বললাম—দেখি না! তখন বললে—দেখুন! আপনাদের কাছে আমার অপমান নেই; আর সবই বলে রাখছি যখন, তখন আমাকে এর জন্যে দায়ীও করবেন না, আপনারা। এর পর চাকরি দেব বলেছি দেব, কিন্তু বাড়ীতে তাকে ঢুকতে দেব কেন?

—তাহলে অঞ্জনার জন্যে আলাদা বাড়ী করে দিতে হবে।

আলাদা বাড়ীতেই যদি থাকবে, তাহলে এবাড়ীর ওইসব কাজ চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, তা হবে কি করে? ধর ভোররাত্রে মঙ্গল আরতি। শয়ন হয় রাত্রি এক প্রহরের পর। তখন শয্যা-ভোগ দেওয়া, তারপর বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া, কারুর অসুখ থাকলে তাকে একবার দেখা।

বাধা দিয়ে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তোমাকে কি বলব, বুঝতে পারছি না আমি। আমাকে দেখেও তুমি পুরুষ চরিত্র বুঝলে না ভবানী! পুরুষের মন বহুগামী। তোমার দাদা বিমলাকান্ত দু'চারটেই হয়। তার বেশী হয় না। তার উপর ভূস্বামী, বলতে গেলে রাজা।

—ছিঃ! বলে উঠেছিলেন ভবানী! তুমি নিজে নিজের মুখে কালী মাখাচ্ছ, মাখাও।

জোর করে মাখাচ্ছ। কিন্তু আমি তো জানি। সোফিয়াকে নিয়ে—। থাক ওসব কথা। নিজের ছেলেকে এত ছোট ভেবো না।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—ছোট আমি নিজেকে ভাবিনে কোনদিন। তবে ভয় আমার ওই অভিসম্পাতের, তোমার বাবা—।

শিউরে উঠে ভবানী দেবী বলেছিলেন—না। আমি তার জন্য সাধনা করেছি, না তা হবে না।

বীরেশ্বর হেসেছিলেন, বলেছিলেন—ভাল।

কথাগুলো আড়াল থেকে শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন। বাপের উপর ক্রোধ হয়েছিল তাঁর!

তিনি ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতার বাক্যগুলি অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হই নাই। সারাটা জীবনই তিনি অকারণে সকলকে সন্দেহ করিয়া গেলেন। আমার মাতৃদেবী যিনি সাক্ষাৎ দেবী, সারাটা জীবন যিনি তপস্বিনী, তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমার সাধু-প্রকৃতি চরিত্রবান মাতুলকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি আমার উপর সন্দেহের আশঙ্কা পোষণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? তথাপি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কর্ণকুহর যেন দগ্ধ হইয়া গেল। যিনি সারাটা জীবন একজন বাঈজীকে লইয়া প্রমত্ত থাকিলেন, কি বলিব, অন্তরে অন্তরে সময়ে সময়ে দাবানল সদৃশ অনল জ্বালা অনুভব করিয়া থাকি, যখন মনে পড়ে সোফিয়া বাঈয়ের মোহ আজও তাঁহার অন্তরে ঘৃতলোভী অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। সোফি বাঈয়ের পরিবর্তন হইয়াছে অনেক। তাহার চরিত্রের বরং প্রশংসা করি, মদীয় পিতাকে সে প্রায় স্বামী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতলহরী শুনাইয়া তৃপ্তিদান করে, উত্তম পান সাজিয়া দেয়। তাহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু পিতাকে কি বলিব? এমত চরিত্র ব্যক্তি, এমত সন্দেহ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আমার চরিত্রবল তাঁহাকে এবং সকল জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিব। এই অভিসম্পাতকে আমি ব্যর্থ করিব। পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

"অঞ্জনা সরস্বতী বধূর নিকটেই থাকিবে। এই বাড়ীতেই থাকিবে। এবং চব্বিশ ঘণ্টাই থাকিবে। রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।"

তাই রেখেছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা স্বর্ণলতার কাছেই রইল। আরও মাস তিনেক পর কালীপূজোর পর বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন কলকাতা। সকলেই তাঁর সঙ্গে এসেছিল। রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা এমন কি অঞ্জনা পর্যন্ত।

রত্নেশ্বর বীরেশ্বরের জন্য খুব এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিন্দর চাকর যেমন ছিল তেমনি ছিল তামাক সাজা, কাপড় কোঁচানো, তেল মাখানো, গা-হাত-পা টেপা, সামনে হাজির থাকা ও তাঁর ওষুধ-পত্র ঠিক ঠিক সময়ে দেবার জন্য সে কালের কম্পাউণ্ডারী-জানা একজন লোক নিযুক্ত করেছিলেন; বীরেশ্বরের খাবার ভার ভবানী দেবীর উপর; সোফিয়া তাকে গান

শোনাবে। পান সেজে দেবে। আর ভবানী দেবীর পরিচারিকা ছিলেন দুজন। একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা, প্রৌঢ়া বিধবা। আর একজন কলকাতার বড় লোকের বাড়ীর উপযুক্ত একটি ঝি। এ ঝি খুঁজে দিয়েছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর জ্যাঠাইমা জগদ্ধাত্রী দেবী।

রত্নেশ্বর রায় কলকাতায় এসে প্রায় মাস দুয়েক থেকে ফিরেছিলেন কীর্তিহাটে। কার্তিকের মাঝামাঝি এসে ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে।

পৌষ মাসে কিস্তী আসছে, বাংলা দেশের জমিদারদের পৌষ থেকে চৈত্র চারটে মাস সমারোহের মাস। জমিদারী সেরেস্তায় যত কাজ হয়, তার বারো আনা কাজ এই চারটে মাসে। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের খামারে ধান উঠছে। ধান ঝাড়াই হচ্ছে। পৌষ থেকেই আলু। আখ মাড়াইয়ের মরসুম মাঘ থেকে। তার সঙ্গে ছোলা-মসুর-গম, নানান রবি ফসল। চৈত্রে তিল। এই কটা মাসেই জমিদারীর খাতায় জমার অঙ্ক হাজারে হাজারে। মহালে মহালে গোমস্তা সেরেস্তা পেতে বসেই থাকবে। পাইকেরা নিত্য প্রজার দরজায় দরজায় তাগিদ দিয়ে ফিরবে।

জমিদারবাড়ীর লক্ষ্মীর ঘরে বড় চৌকো ত্রিশ-চল্লিশ মণ ভারী আয়রণ চেস্টগুলো প্রায় নিত্যই খোলা হবে একবার করে। তাতে টাকা পড়বে ঝঙ্কার তুলে। জমিদারের কাছারী চলবে, সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত, আবার সন্ধ্যের পর থেকে। দশটা-বারোটা যেদিন যেমন। আটটার পর থেকে অবশ্য সেরেস্তায় কর্মচারীরা কলম পেষে, জমিদার বসেন তাঁর আসর ঘরে।

শতরঞ্চের উপর সাদা ধবধবে চাদর ; তার উপর পুরু দামী গালিচা, চারিপাশে বড় বড় তাকিয়া। রূপোর আলবোলা, তাওয়া দেওয়া কল্কে ; রূপো বাঁধানো হুঁকো, হুঁকোদানের উপর বসানো থাকে।

গ্রামের যাঁরা ওরই মধ্যে সম্ভ্রান্ত, তাঁরা আসেন। নানান আলোচনা হয়। বেশীর ভাগ গ্রামের সমাজ নিয়ে। কোনদিন খোস-গল্প হয়। উচ্চ হাসিতে সব গমগম করে ওঠে।

কোন কোন দিন গানের মজলিস বসে। মধ্যে মধ্যে ওস্তাদ এসে হাজির হন। মাঘ মাসের সারা মাসটা মায়ের সামনে নাট-মন্দিরে ভাগবত পাঠ হয়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এসে গোটা নাটমন্দিরটা ভরিয়ে দিয়ে বসে।

সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাট যদি কখনও অচির ভবিষ্যতের মধ্যে যাও সুলতা, তাহলে তোমাকে নাটমন্দিরটা দেখিয়ে খুশী হই, তুমিও খুশী হও, তা বলতে পারি। মনে পড়ে গেল বলে, না বলে পারলাম না। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটার চারদিক ভাগ করা ছিল আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে। কালীমন্দিরে বিরাট বারান্দাটায় বসত ভদ্রঘরের মেয়েরা, তাবা বর্ণেও উঁচু। এক পাশটা ব্রাহ্মণ, অন্য পাশটায় বৈদ্য-কায়স্থ থেকে অন্যেরা। চার-পাঁচটা বারান্দাবরাবর লম্বা সিঁড়ি আছে পর পর, গ্যালারীর মত, সেখান পর্যন্ত। তারপর একটা রেলিং, তার এধারে

পুরুষ-মহল, সেও ভদ্র উচ্চবর্ণ। আর তিন দিকটায় যাদের এখন নাম হয়েছে হরিজন, তারা এবং মুসলমান, কৃশ্চান।

সুলতা বললে—খৃশ্চান?

সুরেশ্বর বললে—গোয়ানদের ভুলে যাচ্ছ। ওই হিলডা বুড়ীর পাড়ার লোক।

—এরা ভাগবত শুনতে আসত?

—না, ভাগবত শুনতে আসত না; যাত্রা হলে শুনতে আসত, বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হলে আসত। আর আসত গল্প শুনতে।

বিস্মিত হয়ে সুলতা বললে—গল্প শুনতে?

—হ্যাঁ সুলতা, গল্প শুনতে। ভাগবত কথকের মত সেকালে গল্প কথক ছিলেন, যিনি গল্প বলতে, আসর পাতলে পনেরো দিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন একটি গল্প।

—বল কি?

—হ্যাঁ। এঁদের বোধহয় শেষ জনকে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি পাঁচ দিন গল্প বলেছিলেন। এই কীর্তিহাটের ছবির কড়চায় একটা বিশেষ ছবি। গল্পগুলো বেতাল পঞ্চবিংশতি বা কথা-সরিৎসারের মত। একটা গল্প শুরু করে, তার থেকে ফ্যাকড়া বের করতেন, পাঁচ-ছয়-সাত থেকে পনেরো পর্যন্ত, তারপর শেষ দিনে প্রথম গল্প শেষ হত! কিন্তু সে থাক, এখন ১৮৬০ সালে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালের নভেম্বরের প্রথমেই বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাট থেকে গেলেন কলকাতা; ব্যবস্থা হল, সদলে যাবেন তীর্থ দর্শনে, চাকর, ঠাকুর, ঝি, সরকার নিয়ে ভবানী দেবী এবং তিনি ঘুরতে যাবেন তীর্থ; তখন রেললাইন বসে গেছে মোটামুটি। যেখানে হয় নি, সেসব জায়গায় নৌকো কিম্বা পালকি, রয়েল গাড়ী নিয়ে ঘুরবেন। সোফিয়া বাঈ সুদ্ধ সঙ্গে গিছলেন, তিনি দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তসলীম রাখবেন, আজমীঢ় শরীফ যাবেন।

মনে তাঁর ইচ্ছে আজমীঢ় শরীফ থেকে আর ফিরবেন না।

রত্নেশ্বর রায় ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে, ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর।

তিনি অগ্রহায়ণের শেষে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সস্ত্রীক প্রথম কলকাতায় গিয়ে কলকাতার বড় বড় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কারণ বীরেশ্বর রায় কলকাতায় এসে ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বড় বড় বাড়ী যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, নিমন্ত্রণপত্র চলত, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে একটা বউভাত করেছিলেন; যার খরচ আট হাজার টাকা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে নৃত্য-গীতও ছিল, একথা সহজেই, অনুমান করতে পার। এর পর বড় বড় বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ আসতে শুরু করেছিল এ-বাড়ীতে, বর-বধূর। অনেক বাড়ীতে সপরিবার নিমন্ত্রণ। শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী দেবীর বাড়ী থেকে। রাণী রাসমণির বাড়ী থেকে উপঢৌকন এসেছিল। ও বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় সস্ত্রীক পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে রাণীকে

দেখাতে গিয়েছিলেন। জানবাজারের বাড়ীর জমি দানের জন্যও বটে, আর রাণীর মহিমময়ী চরিত্রের জন্যও বটে, তাঁর উপর বীরেশ্বর রায়ের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ।

এর মধ্যে আবার নতুন জুড়ি কেনা হয়েছিল। এবার কালো ঘোড়া নয়, সাদা এক জোড়া ওয়েলার, দাম দেড় হাজার টাকা এবং গাড়ীটা ল্যাণ্ডো। সেই গাড়ীতে চড়ে রত্নেশ্বর কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়িয়েছিলেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনও পর্যন্ত অল্প। ছেলেবেলা বালক বয়সে বিমলাকান্তের সঙ্গে এসে বছর খানেক কি তার কম কলকাতায় ছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন কাশী। ফিরেছিলেন দীর্ঘকাল পর ; তখন তিনি যুবা। অনেক কাণ্ডের পর বাপের সঙ্গে পরিচয় এবং পুনর্মিলনের পর রুগ্ন বীরেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় এসে মাস চারেক ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে পুরো এক মাস তাঁকে জামীনে খালাস থাকতে হয়েছিল। সে সময় তিনি বের হন নি। এবার স্ত্রীকে নিয়ে নতুন ল্যাণ্ডো গাড়ীতে, নতুন সাদা জোড়া ঘোড়ায় জৌলুষ ছড়িয়ে বের হতেন। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং স্ট্র্যাণ্ড রোডের গঙ্গার ধার থেকে লাটসাহেবের বাড়ীর চারিদিক থেকে সিঁথিতে এখন যেটাকে চিড়িয়ার মোড় বলে সেখানে কোন সাহেবের চিড়িয়াখানা পর্যন্ত ঘুরে দেখেছিলেন সেবার। তাঁদের সঙ্গে থাকত অঞ্জনা। তার কাছে থাকত খাবারের কৌটো, জলের কুঁজো, পানের বাটা, কোচ বক্সে কোচম্যানের পাশে মহাবীর সিং দারোয়ান, তার কোমরে সরকারী লাইসেন্সে বর্তমান তলোয়ার। পিছনে জোড়া-পোশাক পরা সহিস।

তখন কলকাতায় নতুন যুগ। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির পর থেকে ইংরেজের প্রতাপে কলকাতা, যে বনে বাঘ থাকে সেই বনের মত হয়ে অন্য জন্তুর উপদ্রব থেকে শান্ত হয়েছে।

তুমি হয় তো জান, তবুও পুরনো কলকাতার কথা আমার কড়চায় আছে বলেই বলছি, পুরনো কলকাতা ১৮৫৭ সালের আগে খুব শান্ত ছিল না। হুতোমের নক্সায় এর পরিচয় আছে। মোয়, খেলায়, পথে-ঘাটে ১৮৫৭ সালের আগে নানান উপদ্রব ছিল।

সমাচার দর্পণে ১৮৪০ সালের একটা খবরের কথা রত্নেশ্বর রায় তার ডায়রীতে লিখেছেন এই প্রসঙ্গে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা নানান অত্যাচার করত। বিশেষ করে সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে লাঞ্ছনার সীমা থাকত না।

দর্পণের খবরটা বেহালা সম্পর্কে। সেটা এই—"মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের ডুলী পালকী দৃষ্টিমাত্রেই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে অবাক্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত, তাহাই কহিতেন, তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন।"

সুলতা বললে—মনে পড়েছে, পেটন সাহেব নামে একজন দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট মেয়ে সেজে

পালকি চড়ে বেহালায় এসেছিলেন। এরা জবরদস্তি করে পালকির দরজা খুলতেই সাদা গোখরোর মত বেরিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট পেটন।

—হ্যাঁ। পেটন সাহেব সেবার সায়েস্তা করলেও পুরো সায়েস্তা হয় নি। হুতোমের কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪১ সালে, তাঁর নক্সায় আছে, তাঁর আমলে একবার এক বারোয়ারী-তলার প্রতিমার সিংহ ভেঙেছিল আনবার সময়। সেই সিংহ মেরামতির জন্যে টাকা চাই। তারা পরামর্শ করে আটকে ছিল এক বিশিষ্ট সিঙ্গি মশায়কে। চাকুরে মানুষ। আপিস যাবেন। তাকে পথে আটকে ধরেছিল মায়ের সিঙ্গির পা ভেঙেছে, এখন সিঙ্গি কোথায় পাই, আমাদের উপর স্বপ্ন হয়েছে, আপনাকে এনে বসাতে হবে, মা দুর্গার পায়ের তলায়। সিঙ্গি মশায় মেরামতি খরচ দশ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই নিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৮৫৭ সালে মিউটিনী দমনের পর ইংলণ্ডেশ্বরী যখন ভারতেশ্বরী হলেন, তখন কলকাতার ওই হাল পাল্টাল! ইংরেজের ভয়ে তখন ফণা গুটিয়ে গর্তে ঢুকেছে সব।

তবু রত্নেশ্বর রায় দারোয়ান ছাড়া যেতেন না কোথাও। প্রয়োজন হলে একজনের জায়গায় দুজন নিতেন।

ডায়রীতে লিখেছেন—"দারোয়ান ইত্যাদি লইয়া অদ্য চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিলাম। দুইজন দারোয়ান লইয়াছিলাম। কলিকাতার এক শ্রেণীর ইতর গুণ্ডা ও উচ্ছৃঙ্খল ভদ্র যুবকের কথা শুনিয়াছি। আমি নিজেও সবল শক্তিমান। কাশীতে থাকিয়া কুস্তী করিয়া দেহ পাকাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। সকল জীবজন্তু দেখিয়া নিরাপদে ফিরিলাম। অদ্যকার এই ভ্রমণ বড়ই আনন্দসহকারে উপভোগ করিয়াছি। একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া চিত্তে রোমাঞ্চকর ভাবের উদয় হইল। এক জোড়া সবল ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রীর প্রেমলীলা দেখিলাম, ব্যাঘ্রটি ব্যাঘ্রীকে কামড়াইতেছে, ব্যাঘ্রী তাহাকে থাবা মারিয়া প্রতিহত করিয়া গর্জন করিয়া যেন শাসন করিয়া কহিতেছে, নির্লজ্জ পুরুষ কোথাকার, তোমার কি কোন প্রকার লজ্জাসরম নাই। এই এত লোকজনের সম্মুখে এসব কি হইতেছে।

আমার পার্শ্বেই স্বর্ণলতা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া আমি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে লজ্জায় মুখ নত করিল। আমি অগ্রসর হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, দেখিতেছ। সে বলিল—আঃ।

পিছন হইতে খুক খুক শব্দে কেহ হাস্য করিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম অঞ্জনা হাস্য করিতেছে। সে সব লক্ষ্য করিয়াছে।"

গাড়ীতেও সামনের সিটে বসে অঞ্জনা বারবার মুচকে-মুচকে হাসছিল! স্বর্ণলতা দেবী রাঙা হয়ে উঠেছিলেন।

অঞ্জনা বলেছিল—এই আমি মুখ ফিরিয়ে উল্টো মুখে বসছি ভাই বউ। তাছাড়া ননদদের আড়ি পেতে শোনা চিরকালের। ওরা দেখলেও দোষ নেই, শুনলেও দোষ নেই। ছোটদাদা

আমার চকোরের মত চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি ভাই চাঁদ, মেঘের আড়ালের মত ঘোমটাটা সরাও।

সে সত্যিই মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

স্বর্ণলতা সুযোগ পেয়ে রোমকটাক্ষে শাসন করেছিলেন রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সেই গাড়ীর মধ্যেই হা-হা শব্দে হেসে উঠেছিলেন।

অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে বলেছিল—লজ্জা ভাঙল ?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—অঞ্জনা, ঠিক বাঘিনীর মত তাকালে রে, হাতে আমায় আবার চিমটী কাটলে।

অঞ্জনাও খিলখিল করে হেসেছিল। এবার স্বর্ণলতাও খুক-খুক করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছিলেন।

বাড়ীতে এসেই দেখেছিলেন, কীর্তিহাটের খবর এসেছে। সেখানে ফিরতে হবে। সামনে বড়দিন। ভেটের ব্যবস্থা যাবে কলকাতা থেকে। তার কেনাকাটা আছে। এবং ছোট হুজুরকে যেতে হবে, মেদিনীপুরে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। হুজুরের শ্বশুর বলে দিয়েছেন, রত্নেশ্বর যেন আসে। দেওয়ান মশাইয়ের কাল গেছে। এখন জেলার কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই সব থেকে বড় কথা। আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন নতুন কালে নতুন চাল।

তা ছাড়াও বড় খবর ছিল, এবার শ্যামনগরের দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রী করতে রাজী হয়েছে। তারা একবার ছোট হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু কথাবার্তা বলতে চায়।

খবর নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরদাস পাল। বিয়ে করে তিনি চলে গিয়েছিলেন শ্যামনগর। শ্যামনগর বিক্রীর চিঠি তিনি এনেছেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

সুলতা বললে—রত্নেশ্বর নিজের পতনের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন! মানুষ তাই করে! তবে দোষ তিনি ষোল আনা অঞ্জনার ঘাড়েই চাপিয়ে গেছেন নিশ্চয়।

সুরেশ্বর বললে—বারো আনা তো বটেই। তবে নিজের ঘাড়ে চার আনা নিয়েছিলেন—সে তাঁর ডায়রীতে আছে। সে তোমাকে প'ড়ে খানিকটা শোনালাম। পরে আরও আছে। কিন্তু আমার ক্রম ভেঙো না। ক্রমানুসারে বলে যাই বলতে দাও।

এই যে দীর্ঘ ইতিহাসটি বললাম—এটি কিন্তু সব জেনেছিলাম একদিনে।

১৯৩৭ সালের শেষ জানুয়ারী শীতের দিন, সকালবেলাতেই পুলিশ এসে বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল ; অর্চনাকে তিনি বাঁচিয়ে কোমরে দড়ি প'রে হাতে হাতকড়ি পরে পুলিশের সঙ্গে গ্রাম ঘুরে দেখিয়ে গেলেন, রায়বংশের ঋণ তিনি শোধ করলেন। ঋণ শোধ করতে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি বিক্রী করেছেন, যে সম্মানটুকু ছিল তা বিক্রী করেছেন—অনুতাপ করেন নি।

কাকীমা আমাকে ডেকে বলেছেন—এর শোধ নেবে, তুমি আমাকে কথা দাও ভাসুরপো!

আমি কথা দিয়েছি। অর্চনা ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। তার কথা বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী, তাঁর জা অর্থাৎ অর্চনার মায়ের কাছেও প্রকাশ করেন নি। তিনি বর্ধমানের উকীলের মেয়ে, তিনি আইন বোঝেন। এবং দেশের অবস্থাটাও বোঝেন।

বাড়ীতে ফিরে এসে আমি গোপাল সিংয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। মাঝখানে গ্রামের লোকেরা এসেছেন। প্রত্যেকে সেদিন সহানুভূতি জানিয়ে গেছেন। দয়ালঠাকুরদা—উরুকাকা এসে চোখের জল ফেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে গেছেন—শোধ নিয়ো।

বৃদ্ধ রঙ্গলাল মণ্ডল নিজে আসতে পারেন নি, শরীর তাঁর ভেঙে গেছে। তিনি বাড়ী থেকে বের হতে পারেন না, ওই কংগ্রেসের মিটিং যা অতুলকাকার কাণ্ড তার পর থেকে। রঙ্গলাল মণ্ডলমশায় সভাপতি হয়েছিলেন। পুলিশ যখন লাঠি চালায়, তখন অতুলকাকা নিজের দেহ দিয়ে তাঁকে ঢেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন, তবু আঘাত নিবারণ করতে পারেন নি। একটা লাঠির গুঁতো তাঁর কোমরে লেগে হাড় ভেঙে দিয়েছিল। তাঁকে এ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল, সেরে ওঠার পর প্রায় অক্ষম দেখে এবং বয়স দেখে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। লোকে বলে—তাঁর হয়ে তাঁর উকীল ছেলে একটা বণ্ড গোছের কিছু লিখে দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল বাপকে। অক্ষম রঙ্গলাল বিছানায় শুয়ে থাকতেন আর ওই উকীল ছেলেকে গালাগাল দিতেন। তাঁর বড় ছেলে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—আমাদের বাড়ীর সামনে বিমলবাবুকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। লেফট রাইট লেফট রাইট বলে চেঁচিয়ে কনেস্টবলগুলোকে দিয়ে পা ঠুকিয়েছে। বাবাকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছিলাম। তাঁকে তো দেখেছেন—খুব চেঁচান তিনি! এখনও হাউমাউ ক'রে কাঁদছেন। আপনার কাছে পাঠালেন, বললেন—সুরেশ্বরবাবুকে বল গা গিয়ে এর শোধ যেন তিনি নেন।

আমার মনেও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সেই ক্ষোভের বশেই ডায়রী পড়ছিলাম। বিচার করবার জন্য নয়; দেখছিলাম পূর্বকালের ঘটনার মধ্য থেকে কোথায় কোন ছিদ্রপথ পাওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে আইনের দড়ি পরিয়ে শিবু সিং এবং তার বাপ হরি সিংকে বাঁধতে পারি। কিন্তু পড়তে পড়তে কাহিনীর মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সে তন্ময়তায় রত্নেশ্বর রায়ের পূর্বকথা শেষ করে তার দিনলিপিতে এসে পড়ে পৌঁছুলাম রত্নেশ্বরের বিয়েতে, রায়বাড়ীর জীবননাটকে, অঞ্জনার প্রবেশে এবং বীরেশ্বর রায়ের প্রস্থানে।

সুলতা প্রশ্ন করলে—প্রস্থানে? মানে?

—তার অর্থ বীরেশ্বর রায় আর কীর্তিহাট ফেরেন নি। ওই গেলেন তিনি কীর্তিহাট থেকে কলকাতা। এবং তারপর কলকাতা থেকে তীর্থে।

—তীর্থে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর?

—না। বৈরাগী তিনি ছিলেন না। স্ত্রী ভবানী দেবীর জন্য দেবতার পুষ্প চরণোদক এও তিনি নিত্য খেতেন তাঁর হাতে, তাঁর জন্যেই তীর্থে ঘুরেছেন, দেবমন্দিরে গেছেন, দেখতে গেছেন নিজের আগ্রহে কিন্তু প্রণাম করেছেন স্ত্রীর ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছায় নয়। শুধু গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দিয়েছিলেন নিজের আগ্রহে। থাক; এমনভাবে বলার থেকে গুছিয়ে বলি।

* * *

১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের আগেই ফিরলেন তিনি। সরস্বতীবউয়ের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ সুতরাং অঞ্জনার মত একটি চিত্তরঙ্গিনী চতুরা অতি সুকৌশলে তার মধ্যে নিজের ইচ্ছেগুলো সঞ্চারিত করে দিত।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—বিপদে পড়িলাম। কীর্তিহাট হইতে নায়েব এবং মেদিনীপুর হইতে পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় ওখানে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। গিরীন্দ্র আচার্য লিখিতেছেন—দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এমত সময় স্বর্ণলতা সরস্বতীবউ একরূপ আবদার ধরিয়াছে কলিকাতায় বড়দিন না দেখিয়া যাইবে না। এখানে অবশ্য কলিকাতা দেখিয়া বেড়াইতেছি আনন্দ করিতেছি, আমারও যৎপরোনাস্তি সুখ এবং আহ্লাদ হইতেছে। বিশেষ করিয়া পরিভ্রমণের সময় অঞ্জনা যেরূপ ননদোচিত হাস্যপরিহাসে আমাদের উভয়ের জীবনের আনন্দে চঞ্চল বায়ুপ্রবাহ হিল্লোলিত করিয়া তুলিতেছে তাহাতে সুখ ও আহ্লাদ যেন তরঙ্গিনীর তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু যে সব পত্রাদি পাইলাম তাহার পর আর কি করিয়া থাকা চলে? আমি সামান্য যুবক নহি; আমি কীর্তিহাটের রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারীই বা কেন, আমি অধীশ্বর। অদ্যই পিতা সকল পত্রাদি পাঠ করিয়া আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—।

বড়কর্তা বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বস; যা পত্র এসেছে তাতে তোমাকে দু-তিন দিনের মধ্যে কীর্তিহাট ফিরতে হবে। জরুরী কাজ। বিশেষ ক'রে শ্যামনগর। শ্যামনগর ক্রয় সম্পর্কে যা পত্র দেখছি তাতে মনে হচ্ছে দে-সরকাররা হয়তো বা কিছু কিছু সুবিধে চাইবেন। প্রতিশ্রুতি চাইবেন। হয়তো বা রাধানগর বাদ দিয়ে বাকী বিক্রী করতে চাইবেন। কিম্বা ওঁদের সম্পত্তি জোতজমা নিষ্কর বলে স্বীকৃতি চাইবেন দলিলে। মৌখিক প্রতিশ্রুতিও কিছু চাইবেন বলে মনে হচ্ছে আমার। আচার্য হয়তো দিতে চাইছেন না—চাইবেন না। আমি বলব দেবে। দেওয়া উচিত। তাঁরা নত হয়েই যখন চাচ্ছেন তখন দেবে। এগুলি হল রাজধর্ম। আমাদের দেশেও আছে, অন্যদেশেও আছে। আলেকজেণ্ডার পুরু রাজার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলেন সে তো জান। আমাদের দেশে অজস্র আছে। শাস্ত্রেরও এই নির্দেশ। সুতরাং তাঁরা শ্যামনগর বিক্রী করছেন এইটেই আমাদের কাছে তাদের হার মানা। আমি হলে ওটা জলের দরে বিক্রী ক'রে দিতাম. কিন্তু যার সঙ্গে ঝগড়া তাকে দিতাম না। অবশ্য—

একটু থেমে হেসে বলেছিলেন—অবশ্য ট্যারা দে-সরকার অর্থগৃধ্নু, অল্পপ্রাণী লোক; টাকাই

তার কাছে সব। টাকা পেলে সে সব সইতে পারে। টাকার জন্যে সে সব করতে পারে। কিন্তু সে বিচার আমরা করব না।

রত্নেশ্বরের মন এতে সায় দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে সম্পূর্ণ একমত আমি। যা আদেশ করলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

—হ্যাঁ। তবে সর্তগুলি যত্নসহকারে খুঁটিয়ে বুঝে দেখো। ওঁদের সম্পত্তি নিষ্কর এ আমরা দেব না। না। তা হতে পারে না। তা হ'লে প্রজা ঠিক হলেন না তাঁরা। মৌরসী ক'রে দিতে পার। খাজনা অন্ততঃ বছরে একটা টাকাও দিতে হবে। বুঝেছ!

—আজ্ঞে বেশ। তাই হবে।

—আর একটা কথা।

—আজ্ঞা করুন।

—দেখ—। শুরু করেও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—বাবা।

—হ্যাঁ বলছি। আর একবার ভেবে নিলাম। ভেবে দেখলাম। দেখ—আমি মনে মনে অভিপ্রায় করেছি যে তুমি সম্পত্তির ছ আনার মালিক হয়েই আছো বাকী দশ আনার মালিক এখনও আমি। তোমাকে আমার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছি। তুমিই সব করছ। কিন্তু—।

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কিন্তু পরমুহূর্তেই বীরেশ্বর রায় যে-কথা বলেছিলেন সে কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—দেখ আমি স্থির করেছি—অনেক চিন্তা করেই স্থির করেছি, যে আমার অংশ আমি দানপত্র করে তোমাকে দিয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে চাই।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা? আমার কি কোন ত্রুটি—

—না—না। তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তার জন্য নয়। কথা হল কি জান, এই যে কালটা এল, এটা সম্পূর্ণ নতুন কাল। এ কালের জমিদারী চালনা সে কালের প্রথায় চলবে না। জমিদারীকে যে অর্থে রাজত্ব বলতাম তা আর রইল না। ১৮৫৯ সালে যে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন হ'ল সে আইনে জমিদারের আসল অধিকারই চলে গেল। কীর্তিহাটে যে আদেশ তুমি কাছারীতে জারী করেছ তা খুব কালোচিত হয়েছে। প্রথমটা শুনে আমার ক্ষোভ হয়েছিল। পুত্র সকলেরই সমান রত্নেশ্বর, কিন্তু তুমি আমার কি তা অবশ্যই অনুমান করতে পার। সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়া নিধি। বিচিত্র কৃপায় ফিরে পেয়েছি তোমাকে।

রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার মনে হইতেছিল আমি যেন স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি, ইচ্ছা হইতেছিল আমার এই হিমালয়তুল্য পিতৃদেবের চরণতলে লুটাইয়া পড়ি।"

বীরেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যা গোপন তোমাকে করব না। তোমার শ্বশুরমশায় কথাটা

বলে গিয়েছিলেন—বেহমশাই কালটা বড় কঠিন পড়ল, আগের কাল গেল। কোম্পানী মানে বেনের দল আর দেশের মালিক রইল না, বৃটিশ ক্রাউন হল মালিক। এবার আর ঘুষের রাজত্ব রইল না। লাভের জন্যে যা খুশী তাই করার কাল রইল না। এবার মহারাণীর রাজত্ব, এ রাজত্বে বামুন চণ্ডাল জমিদার প্রজা ধনী দরিদ্র সব এক আইনের ফাঁসে বাঁধা পড়ল। নতুন এ্যাক্টটা পড়ে দেখুন। তখনও ঠিক আমলে আনি নি। তুমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে নতুন হুকুম জারী করলে; শুনে একটু লাগল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না একবার? তারপর এখানে এসে এ্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা হল কালীপ্রসন্ন সিংহীমশায়ের সঙ্গে, তিনিও বললেন—আরে মশাই আগের কালে তলবমাত্রে প্রজার হাজিরানা ছিল কম্পালসারি। না এলে আপনি সিপাই পাঠিয়ে প্রজার ঘাড়ে ধ'রে আনতে পারতেন। আর তা পারবেন? অবিশ্যি রামাশ্যামাকে পারবেন। কিন্তু আমাকে পারবেন? আবার রামার পিছনে আমি দাঁড়ালে পারবেন? এ তো মশাই জুতো জামা পরা ঘোড়া হাতী চড়া গোমস্তাগিরি! জমিদারীর আর রইল কি? কথাটা ঠিক। আর ওতে আমার দরকার নেই রত্নেশ্বর। জমিদারী তোমাকে আমি দান করব। কলকাতার বাড়ী, আর নগদ টাকা আমার অংশের চার লক্ষের মধ্যে দু লক্ষ টাকা—এই আমার থাকবে। ওতেই আমি বেড়াব তীর্থ—নানা স্থান। বাস। পরমায়ু আমার বেশী দিন নেই। আমি বুঝতে পারছি। বাকী ক'টা দিন আনন্দ করে কাটিয়ে দেব। আমার অন্তে আমার উইল অনুযায়ী চাকরবাকরকে কাউকে পাঁচশো কাউকে হাজার কাউকে একশো দিয়ে যা থাকবে তার থেকে সোফিয়াকে পাঁচ বা দশ হাজার টাকা এবং জীবন স্বত্বে ওই এলিয়ট রোডের বাড়ী দেব। এবং অবশিষ্ট সবের মালিক হবেন তোমার গর্ভধারিণী।

স্তব্ধ হয়ে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আপত্তি করো না। এ তোমার জন্যে করছিনে আমি। আমার জন্যেই করছি—রায়বংশের জন্য করছি। বুঝেছ। রায়বংশের জন্য। অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের বাইরের যা সম্পত্তি তাও আমি দেবোত্তর করে তোমাকেই তার সেবাইত করে দানপত্র করব। তুমি মালিক হবে সেবাইত সূত্রে। কোন সর্ত আমি আরোপ করব না। শুধু দেবত্র সম্পত্তি রইল দেবতার নামে। তাঁর সেবা চালিয়ে বক্রী আয় তুমি তোমার পছন্দমত খরচ করবে। আমি অপব্যয়ী। আমি বাল্যকাল থেকে ক্রোধীও বটে। এই গোমস্তাগিরির বড়লোকপনা এ আমার সইবে না।

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে একটি বিস্ময়কর কথা আছে, সুলতা, সেটি বলি। সেটি না বললে রায়বংশের জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে কথা ভবানী দেবীর কথা।

এই জানবাজারের বাড়ীর বড় হলঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল পিতাপুত্রে। পাশের ঘরটা ছিল ভবানী দেবীর পূজার ঘর—নিজের ঘর। পাশেই ছিল ওদের শোবার ঘর। ওদিকের দক্ষিণ-

পূব খোলা ওই ঘরখানা। ভবানী দেবী পূজায় বসে সব শুনেছিলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওঘর থেকে পূজার একটি জবাফুল এবং বিল্বপত্র হাতে ক'রে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

পিতাপুত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। ঠিক গোপন করবার জন্য নয়। তার উপস্থিতিতে ঠিক এইসব কথা যেন স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে কওয়া যেত না।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মাতৃদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ পিতৃদেব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিলাম। এই পূজার পর তাঁহার যে মূর্তি হইত তাহা এক আশ্চর্য বিস্ময়জনক মূর্তি। মনে হইত তিনি যেন মানবী নহেন কোন অপার্থিব দেবীমূর্তি। তিনি আসিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব হস্ত প্রসারণ করিতেই তিনি পূজার জবাপুষ্প ও বিল্বদল তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। পিতৃদেব তাহা মস্তকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া স্বকীয় উপাধানের তলদেশে রাখিলেন। অতঃপর মাতৃদেবী বামহস্তের রৌপ্য ঘট হইতে কুশী করিয়া ইষ্টদেবীর চরণোদক তাঁহাকে পান করাইয়া কহিলেন—তুমি যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা কদাপি ফলবতী হইবে না। বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পিতা কহিলেন—কি মনস্থ করিয়াছি কোন কথা বলিতেছ?

—তোমার উইলের কথা!

—হাঁ। বলিতেছিলাম বটে। তুমি তাহা শুনিতে পাইয়াছ?

—পাইয়াছি। শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। কিন্তু মা বলিলেন—চঞ্চল হইস না; ইহা কদাপি সত্য হইবে না।

পিতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—উইল করা হইয়া উঠিবে না?

—না। উইল তুমি করিবে। কিন্তু যাহা মনে করিতেছ তাহা হইবে না। তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং অর্থ ভোগ করিবার জন্য ভবানী কদাপি জীবিত রহিবে না। আমি অগ্রে যাইব। তুমি আমার বিরহে উন্মত্তবৎ হইবে। সতীহারা শিবের মত তোমাকে হাহাকার করিতে হইবে।

পিতৃদেব হাস্য করতঃ বলিলেন—অতঃপর কি হইবে। তুমি উমা রূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া আবার আমার গৃহে আসিয়া আমাকে সংসারী করিবে!

মাতৃদেবীর অধরে শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার মত ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন —না। এতটা হইবে না। তবে তোমাকে—। তিনি নীরব হইয়া গেলেন। তৎপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিলেন—তাহা তোমাকে আমি বলিব না। অন্ততঃ আজ বলিব না। আমি যেদিন যাইব সেইদিন বলিব। আমি শুধু বলিতেছি যে, তোমার উইলের মধ্যে আমার নাম উল্লেখ করিয়া ওই সকল কথা লিখিয়ো না। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত

যাতনা হইয়া থাকে। এ সংসারে ভাবনা আমার তোমার জন্য।

অকস্মাৎ তাঁহার আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দরদর ধারায় তাহা নির্গলিত হইয়া দরদর ধারে তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিল।

পিতৃদেব অত্যন্ত অভিভূত হইয়া গেলেন, বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ—সতীবউ?

মাতা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে-মূর্তি অপরূপ। এমন কদাচ নিরীক্ষণ করিয়াছি। মুখমণ্ডল যেন ঈষৎ উর্ধ্বে তুলিয়া তিনি কোন অদৃশ্যলোকের দিকে তাকাইয়া আছেন। এবং সেখানে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম—মা।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—রত্ন বাবা, তাঁহার ভাগ্যে আমার জন্যই দুঃখ-ভোগ রহিয়াছে। তুমি আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমার অবর্তমানে উনি যাহাই করুন, তুমি কদাচ তাঁহাকে অভক্তি করিবে না। অবহেলা করিবে না।

আমি কহিলাম—সে কি মা? এমন বাক্য তুমি কেন কহিতেছ? আমি কি নরাধম? আমি কি মনুষ্যত্ববর্জিত?

মাতৃদেবী কহিলেন—না বৎস, তুমি অতি কঠোরচেতা ন্যায়বান বলিয়াই এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়াও আরও একটি কথা রহিয়াছে। তোমরা ধনবান, তোমরা ভূসম্পত্তিশালী রাজতুল্য ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে এমতপ্রকারের মতিভ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। পূর্বে রাজাদের বাদশাহদের মধ্যে এরূপ ঘটনা নিরন্তর ঘটিয়াছে। আজও ধনসম্পত্তি লইয়া পিতাপুত্রে মনোমালিন্যের অবধি নাই।

বলিয়া তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পিতা সকরুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—উঁহার কথা তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিয়ো না রত্নেশ্বর। দেবতা-দেবতা, ধর্ম-ধর্ম করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সকল সময় সুস্থ থাকে না। বিশেষ করিয়া পূজা করিয়া উঠিবার অব্যবহিত পরই। অনেক সময় তিনি এইরূপ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন।

অতঃপর—।

তারপর রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে এদেশের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের অজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন; বলেছেন—এইসব 'ভর' দেবাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্ট হওয়ার মতই মানসিক বিকার। মা যে বারো বৎসর ব্রত করেছিলেন, তাতে কি তার বাপের পাপের খণ্ডন হয়েছে? —হয়নি। এইসব অলীক বিশ্বাস আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমি এসব থেকে দূরে থাকব।

যাক, এইবার যা ঘটল, তাই বলি। রত্নেশ্বর রায় ফিরে এলেন কীর্তিহাট। কলকাতা

থেকে হুইস্কী-ব্র্যাণ্ডির কেস এল, টার্কী ফাউল, তার সঙ্গে ডজন দরুণে দেশী মুর্গী, ভাল দেখে ভেড়া, দেশী কলকাতার মিষ্টান্ন। বিভিন্ন সাহেব-অফিসারদের এবং তাঁদের স্ত্রীর জন্যে সোনার ঘড়ি, সিল্কের থান, গরম কাপড়ের থান, মূল্যবান লেডীজ শাল এল। বিশেষ ব্যবস্থা করে কলকাতা থেকে সাহেবদের প্রিয় ফুল, তা-ও আনানো হয়েছিল। তবে সেগুলো মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত পৌছুতে তাজা থাকেনি।

রত্নেশ্বর রায় চোগা-চাপকান পেণ্টালুন পরে মাথায় শামলা লাগিয়ে বুকের উপর কাটাকাটি চিহ্নের মত ধাঁজে কাশ্মিরী শাল ফেলে সাহেবদের বাংলোয় বাংলোয় বড়দিনের ভেট দিয়ে সাহেবদের অজস্র ধন্যবাদ নিয়ে কীর্তিহাটে ফিরে এসেছিলেন।

ওদিকে শ্যামনগর কেনা হয়ে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় যা বলেছিলেন, তাই সত্য হয়েছিল। ট্যারা দে-সরকার নিজে এসেছিলেন হুগলী শহর। শ্যামনগর হুগলী জেলা। সেখানে কীর্তিহাটের রায়েদের এস্টেটের সেরেস্তা ছিল, নিজের বাড়ী কিনেছিলেন। একটা সে-আমলের পুরনো ওলন্দাজদের কুঠী। সেই বাড়ীতে ট্যারা দে-সরকার ভাঙা হাত নিয়ে পুত্রের হাত ধরে এসে রত্নেশ্বর রায়ের সামনে প্রথম হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলেছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে তুলসীপত্র একটিকে ছোট দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি বাবা। মনে হয়েছিল, তুলসীপাতা নয়, পুদিনার পাতা। পায়ে মাড়িয়ে গেলাম, একটু ঠাওর করেও দেখলাম না। তা ডান হাতখানাই ভেঙে গেল!

আচার্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন—হবে। আবার ডান হাত হবে দে-সরকার। পায়ে-মাড়ানো তুলসীপাতা মাথায় তুলে ধরলে যখন তখন আবার হবে। তবে ওই কিঞ্চিৎ বেঁকে থাকবে।

—হবে? আচার্যমশায়—বলছেন—আবার হবে?

—হবে বৈকি? সত্যনারায়ণের পাঁচালী তো শুনেছ? সেই যে বণিকের মেয়ে সত্য-নারাণের প্রসাদ নিয়ে খেতে যাবে এমন সময় খবর এল—নদীর ঘাটে বাপ-স্বামী সাতখানা বোঝাই নৌকো নিয়ে ফিরেছে, অমনি—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে থাকা কি সুখস্থ আছে। 'পাক দিয়া ফেলে রামা হস্তের প্রসাদ।'

—হ্যাঁ, অমনি নৌকোসমেত স্বামী ঘাটের মুখে বারকয়েক বোঁ বোঁ করে ঘুরে ভুস করে জলের তলায় চলে গেল। ঘাটের জলের উপর শুধু বুক বুক করে বুক-বুকি উঠল। তার দৈববাণী—'আমার প্রসাদ ফেলে কোন্ অহঙ্কারে?' যা—এখন মাটি শুধু চেঁচে তুলে খা। তাহলে স্বামী নৌকো উঠবে। তা সে মেয়েটা খেয়েছিল, আর স্বামীসমেত নৌকো যেমন ভুস করে ডুবেছিল, তেমনি আবার ভুস করে উঠেছিল। হবে আবার তেমনি হবে।

রত্নেশ্বর এঁদের এই বিচিত্র কথোপকথন কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। কথা-গুলো তিনি ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।

আচার্য দে-সরকারদের কাছে হাজারদুয়েক টাকা গোপন দালালী পেয়েছিলেন, সে-খবর রত্নেশ্বর রায়ের কাছে গোপন ছিল না। তিনি মুখে কিছু বলেননি। দে-সরকার যখন তার সম্পত্তি নাখরাজ করে নেবার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন, আচার্য তা সমর্থন করেছিলেন প্রকারান্তরে। কিন্তু সে নামে। তিনি রত্নেশ্বরকে চিনেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের উপদেশ মনে করে সম্পত্তি মোকররী-মৌরসী করে দিয়েছিলেন—বিঘায় দু' আনা খাজনা। মোট খাজনা ধার্য হয়েছিল বত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আচার্য বলেছিলেন—ওঁদের ভিটে দেবতার ঘর—এগুলি সম্বন্ধে আমি বলি—নাখরাজ করে দেওয়া হোক।

দলিল হয়েছিল বিমলাকান্তের নামে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর দুটো দলিল হয়েছিল—পাট্টা আর কবুলতি। জমিদার বিমলাকান্ত শ্যামনগর-রাধানগর পত্তনী বিলি করেছিলেন কীর্তিহাটের মা আনন্দময়ীর সেবায়েত বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বর রায়কে।

শ্যামনগরের ব্রাহ্মণ-বৈশ্য, সদ্গোপ-মাহিষ্য বাসিন্দারা চব্বিশপ্রহর হরিনাম উৎসব করেছিল—বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল! দে-সরকারদের বাড়ীতে বিগ্রহের সামনে হরিবোল দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ধ্বনি দিয়ে গিয়েছিল—বল হরি—হরি বো—ল!

একমাস পরে আবার কলকাতা থেকে পত্র এসেছিল।

"তুমি অবিলম্বে বধূমাতাকে লইয়া এখানে আসিবে। মাঘ মাস শেষ হইতে চলিল। আশা করি ইতিমধ্যে আদায়পত্রের কার্যাদি সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়াছে। আমরা ফাল্গুনের প্রথমেই পশ্চিম যাত্রা করিতেছি। তোমাকে যে-সকল দলিলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা এ্যাটর্ণী প্রস্তুত করিয়াছেন। তুমি আসিলেই রেজেস্ট্রি হইবে। মাসীমাতাকে বলিবে—তিনি যদি তীর্থে যাইতে চান, তবে আসিতে পারেন। অঞ্জনার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু মাসীমাতা থাকিবেন না, সুতরাং তাহার যাওয়া হইবে না। মাসীমাতাকে বলিবে—সোফিয়াবাঈ আমাদের সঙ্গে আজমীঢ় যাইবে। তিনি যেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন।"

প্রায় ছ' মাস পর বীরেশ্বর রায় কলকাতা ফিরেছিলেন। তিনি তখন একা। ভবানী দেবী নেই। তিনি যা বলেছিলেন, তাই হয়েছিল। বীরেশ্বর রায় আবার তখন মদ্যপান শুরু করেছেন।

সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাটের কড়চায়, রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে, বীরেশ্বর রায় শেষজীবন—বছর তিনেক বলতে পার—হারিয়ে-যাওয়া মানুষ।

তাঁর কথাটা সেরে নি সুলতা। ভবানী দেবীর মৃত্যু আমি এঁকেছি। কিন্তু বীরেশ্বর রায়কে তারপর আর আঁকি নি। তিনি।—

যাক, বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর জীবনের কথাটা গুছিয়েই বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দীর ওই ছবিগুলির দিক থেকে দৃষ্টি একটু সরিয়ে নাও।

বীরেশ্বর রায় ভ্রমণকাহিনীর কথা লেখেন নি, কিছু পাই নি, তবে লোকজন যারা সঙ্গে

গিয়েছিল, তাদের বলা কথা রায়বাড়ীতে কিছু কিছু আজও বেঁচে আছে। এবং একটা জমা-খরচের ছোট খাতা আছে।

যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সবই চাকর-বাকর, দারোয়ান, ঠাকুর এইসব। একটু বিস্ময়কর ঠেকবে স্থূলতা যে, এদের মধ্যে গোপাল সিংও ছিল। বড়াবাবুহুজুর তীর্থ যাবেন শুনে রত্নেশ্বরের অনুমতি নিয়ে সে কলকাতায় এসে বড়াহুজুরের কাছে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুরের কিরপা হলে সে মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাকে হুজুরবাহাদুর এত লোকজনের সঙ্গে তাঁবেদার হিসেবে গরীবকে ভি সঙ্গে নিয়ে চলেন। সে গয়াতে গিয়ে বেটাকে পিণ্ড দেবে, বাপ দাদাকে দেবে। কাশী আর প্রয়াগমে গিয়ে স্নান অর্চনা করে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে!

বীরেশ্বরের আগেই ভবানী দেবী বলেছিলেন—তুমি যাবে গোপাল সিং, তুমি যাবে।

বীরেশ্বরের মাসীমা রত্নেশ্বরের ঠাকুমাও গিয়েছিলেন। আর বলেছি, সোফিয়া বাঈও সঙ্গে গিয়েছিল। তার ব্যবস্থা সব আলাদা ছিল, কিন্তু খাওয়া-শোওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ের বেশীর ভাগটা থাকত বীরেশ্বর রায়ের কাছে। বাঈজির ঢঙ বা বেশভূষায় মুসলমানী ভাব তার ছিল না। সেই দীর্ঘকাল পর প্রথম সে যে লালপেড়ে শাড়ী হিন্দুস্থানী ঢঙে পরে এসেছিল, তাই ছিল তার পোশাক। এক সন্ধ্যার পর সে যখন এসে গানের আসর পাতত, তখনই কিছুটা প্রসাধন এবং সামান্য বেশভূষা করে আসত।

রেললাইন তখন হাওড়া থেকে উত্তর মুখে উত্তরাপথ চলছে দ্রুতবেগে। কাজ মিউটিনীর কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে লুপ লাইনের কাজ চলছিল, তিনপাহাড়ী, সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে, এদিকে মেন লাইন গিয়ে পৌঁছেছিল রাণীগঞ্জ। ১৮৫৫ সালে রেললাইনের তিনজন সাহেব সাঁওতালদের মেয়ে কেড়ে নিয়ে খুন হয়েছিল ইতিহাসে আছে। সে সময় কীর্তিহাটের জেলা মেদিনীপুরেও সাঁওতালরা ক্ষেপেছিল। মিউটিনীর পর রেললাইন দ্রুততর বেগে তৈরী হয়ে এগিয়ে চলেছিল। স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রেনের বগিতে চড়ে পনেরো দিনের পথ তিনদিনে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ট্রেনে চড়েন নি, তিনি গিয়েছিলেন বজরায়।

চিকিৎসকের উপদেশের জন্যও বটে, এবং তাঁর মেজাজের জন্যও বটে। রেলগাড়ী—সে ছুটবে আপন গতিতে, আপন নিয়মে এবং আরাম তাতে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ভবানীর এবং তাঁর সঙ্গে মাসীমা প্রভৃতি ক'জন বিধবার রেল গাড়ীতে দারুণ অসুবিধা। সে আমল—রেলগাড়ীর বিভিন্ন কামরায় কত জাতের কত লোক, গাড়ীগুলো পৃথক হলেও একসঙ্গে জোড়া; এর মধ্যে জাত বাঁচিয়ে কি খাওয়া যায়?

বীরেশ্বর রায়ের অসুবিধা, রেলগাড়ী তাঁর হুকুম মানবে না। তাঁর জীবনের কার্যসূচীগুলোর সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। তার উপর ট্রেনে ঝাঁকি আছে। আর আছে উল্টে-পড়া

কি সামনাসামনি তুটো ট্রেনে ধাক্কা লাগবার ভয়। চিকিৎসকেরাও বলেছেন, এই ধাক্কা-ধকলে বীরেশ্বর রায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। তার থেকে, তাঁরাই বলেছেন—বজরায় যাওয়াই উচিত। ধাক্কা-ধকল থাকবে না, এখন ফাল্গুন মাস, ঝড় বা হাওয়ার সময় নয়। বজরা নৌকো যাবে মসৃণ গতিতে। মানসিক স্বস্তিতে থাকবেন রায়। এ ছাড়াও এই গঙ্গার বাতাসের গুণে রায়ের স্বাস্থ্য আরও ভাল হয়ে উঠবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাই হয়েছিল।

তিনখানা বজরা, তুখানা বড়, একখানা ছোট। সব থেকে বড় বজরাখানা বীরেশ্বর রায়ের আমলের নতুন বজরা, যাতে তুখানা কামরা। একখানা বসবার, একখানা শোবার। এই বজরাতেই কীর্তিহাট যাওয়া-আসা করতেন। আর একখানা বজরা ছিল, সোমেশ্বর রায়ের আমলের, ছোট বজরা, সেটায় ছিল সোফিয়া বাঈ। অন্য বড় বজরাখানায় ছিল ভবানী দেবীর পূজার ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা, এইটেরই একটা কামরায় থাকতেন মাসীমা এবং আরও তুটি বিধবা আত্মীয়া।

বাকী বাদবাকী লোকজন সব ছিল কয়েকখানা নৌকোয়। ভবানী দেবীর নিয়ম ছিল, ভোরবেলা উঠে ঘাটে নেমে স্নান করে পূজোর নৌকোয় উঠতেন। এদিকে লোকজনেরা মুখ-হাত ধুয়ে মুড়ি-মুড়কি-চিঁড়ে-গুড় কাছে বাজার থেকে দই কিনে ভিজিয়ে এক পেট খেয়ে নিত। মাল্লা-মাঝিদের অনেকে ভোর রাত্রে উঠে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেয়ে তৈরী হত। ওদিকে মাসীমারাও স্নান সারতেন। তখন নৌকো ছাড়ত।

সোফিয়া বাঈয়ের কথা বলতে ভুলছি। সেও উঠত খুব ভোরে। উঠে স্নান করে বজরায় গিয়ে ঢুকত। কাপড়-চোপড় ছেড়ে ছাড়াতে বসত মেওয়া ফল। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস ভেজানো থাকত রাত্রে। তার সঙ্গে কাটত ফল। বাজার থেকে টাটকা ভাল যা পাওয়া যেত তাই।

রায় উঠতেন একটু বেলায়। নৌকো চলতে থাকত, তখনই তিনি উঠতেন। কোন দিন দেড় ঘণ্টা, কোন দিন তু ঘণ্টা পর উঠতেন তিনি। তখন আবার একবার বজরা থামত। তিনি একবার তীরে নামতেন। কিছুখানি হাঁটতেন। শরীরটাকে একটু চঞ্চল করে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার নৌকোয় উঠতেন। মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে বসতেন বসবার ঘরে। এদিকে সোফিয়ার বজরা থেকে রূপোর রেকাবীতে কাটা ফল, মেওয়া ফল এসে পৌঁছুত, ভবানী দেবীর বজরা থেকে আসত মিষ্টান্ন এবং তুধ। তারপর চাকর বানাতো চা। নটা, কোনদিন দশটাও বাজত। খাওয়া শেষ হলেই বজরাখানা মাঝগঙ্গায় থামত। ওদিকে পাশে এসে লাগত সোফিয়া বাঈয়ের বজরা। মাঝখানে তুপাশে রেলিং দেওয়া তক্তা পেতে দিত মাঝিরা। বাঈ তার বীণাখানি হাতে করে এসে উঠতেন হুজুরের বজরায়।

এসে সেলাম করে বসত; তার জন্যে পাতা থাকত স্বতন্ত্র গালচে, সঙ্গে কেউ না, সারেঙ্গীদার বা তবলচী কেউ না। বসে বীণ বাজাতো। কখনও উৎসাহবোধ করলে নিজেই বীরেশ্বর

রায় তবলচী সারেঙ্গীদারদের ডাকতেন। সে ক্বচিৎ। কারণ এর ঘণ্টাখানেক পরই বজরা আবার একবার দাঁড়াত। এবার সোফিয়া চলে যেত নিজের বজরায়। তারপর তার বজরা সরে গেলে এপাশে এসে লাগত ভবানী দেবীর বজরা। ভবানী দেবীর বজরা এবং সোফিয়ার বজরা এক সঙ্গে ঠেকলে বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা আপত্তি করতেন।

—ঠাকুর-দেবতা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে স্পর্শ-দোষ ঘটবে।

যাক। আবার বিকেল হতে হতে আসত সোফিয়া। এবার সাজসজ্জা কিছু করতে হত তাকে, সারেঙ্গীদার, তবলচী, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসর পড়ত। ভবানী দেবীও বজরায় থাকতেন। কিছু রাত্রি হলে তবে ভবানী দেবী আসতেন। স্বামীর খাবার-দাবার নিয়ে। সন্ধ্যের মুখে বজরা নৌকো কোন একটা বাজার বা গঞ্জের ঘাটের আশে-পাশে বাঁধা হত। রাত্রিকালে চলার নিয়ম ছিল না। আর একবার দুপুরে নৌকো বাঁধা হত, লোকজনেরা রান্না করে খাবে।

প্রথম এসে নৌকো বজরার বহর তাঁরা বেঁধেছিলেন পাটনায়। ওখান থেকে পথে পথে যাবেন গয়া। পালকী, রয়েল গাড়ী নিয়ে গয়া যাবেন। সেখান থেকে ফিরে পাটনার ঘাট থেকে আবার রওনা হবেন কাশী। গোটা বৈশাখটা থাকবেন কাশীতে, তারপর রওনা হবেন প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে যমুনায় ঢুকে মথুরা-বৃন্দাবন; আগ্রা-ফতেপুরশিক্রি; আকবর শাহের সমাধি। তারপর এখনও ঠিক হয় নি, দিল্লী যাবেন কি গোয়ালিয়র যাবেন। গোয়ালিয়রে মিঞা তানসেনের সমাধি আছে। দিল্লী থেকে হরিদ্বার যাবার ইচ্ছা, ওদিকে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রীতীর্থ, জয়পুর এবং আজমীঢ়। আজমীঢ়ে সোফিয়া বাঈ বিদায় নেবে বলেছে।

বীরেশ্বর রায় সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন যথেষ্ট। কত নিয়েছিলেন, তার জমা-খরচ নেই। গয়াতীর্থে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড তিনিও দিয়েছিলেন, ভবানী দেবীও দিয়েছিলেন। এই প্রথম শ্যামাকান্তকে তাঁর গৃহী নামে পিণ্ড দিয়েছিলেন। স্বামীকেও অনুরোধ করেছিলেন—সমাজের ভয়ে সেখানে তাঁর শেষ কাজ করতে পারিনি। এখানে করলাম। তুমিও তোমার কাজ কর। আমার বাবাকে এখানে তুমি পিণ্ড দাও। সেও দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

* * *

স্থূলতা, যেটুকু শুনতে পাই; তাতে শুনি এই গয়া থেকেই ভবানী দেবী কেমন পাল্টে গিয়েছিলেন। পিণ্ড দিয়ে এসে স্বামীকে বলেছিলেন—আমার কাজ শেষ হল গো! এইবার তুমি খালাস দিলেই আমি খালাস!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—সে আমি যাবার সময় দিয়ে যাব, তার আগে নয়! অপেক্ষা করে থাক।

ভবানী বলেছিলেন—ওকথা বলতে নেই, বল' না।

—তুমিও খালাস চেয়ো না!

কথাটা ওইখানেই শেষ হল, কথার মধ্যে। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা এখানে ফিরে এসে বলেছিল—কথা শেষ হলে কি হবে ; কাজে, ওই দিন থেকেই শুরু হল।

ভবানী দেবী কেমন যেন বদলে যেতে লাগলেন ; আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন একটা কোন ধ্যানে। ধ্যান কথাটা তাদের স্থূলতা ; একাল হলে অন্য কথা বলতো নিশ্চয়। কোন একটা চিন্তায়, কিম্বা নিজের জীবনের সংস্কারের আচ্ছন্নতায়।

গয়া থেকে পাটনা ফিরবার পথে এটা ঠিক ধরা যায় নি। কারণ পালকীতে এসেছেন। পথে চটীতে আশ্রয় নিয়েছেন রাত্রে। বীরেশ্বর রায়ের কাছে এটা ধরা পড়ল পাটনায় ফিরে, বজরায় কাশীর পথে। প্রথম দিনই ভোরে গঙ্গাস্নান করে তাঁর পূজোর ঘর যে বজরায়, সেই বজরায় উঠে পূজোয় বসলেন। সকালবেলা সেদিন বীরেশ্বর রায় একলা পড়ে গেলেন। সোফিয়া বাঈ পাটনা সিটিতে গিয়েছিল, এক বান্ধবী বাঈজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। বীরেশ্বর রায়ের অনুমতি নিয়েই সে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় একখানা ইংরিজী বই পড়ছিলেন। ভেবেছিলেন বই পড়েই সময়টা কেটে যাবে। কিন্তু সময় দীর্ঘ হলে তিনি কি করবেন? বেলা প্রায় এগারটা অতিক্রান্ত হতে চলল, তবু ভবানী এলেন না তাঁর পূজার নির্মাল্য নিয়ে। সোফিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে সরাসরি উঠল তার বজরায়। কারণ এই সময়টায় সে থাকত না। ভবানী দেবী জল খান, এই কর্তব্যটির পর। এ সময় সোফিয়া থাকলে ঁার মন খুঁত-খুঁত করত।

জানবাজারের বাড়ীতে সোফিয়া বসে থাকত মেঝের উপর পাতা গালিচায়, বীরেশ্বর রায় বসে থাকতেন একটা বড় ডিভানে ঠেস দিয়ে। অথবা দামী সেগুন কাঠের পালিশ-করা খাট জাতীয় তক্তপোশের উপর বড় তাকিয়া ঠেস দিয়ে। সেখানে দোতলার মেঝে হলেও সেটা পড়ত মা ধরিত্রীর অংশের পর্যায়ে। সেখানে ছোঁয়ার গণ্য হত না। কিন্তু বজরার কাঠের মেঝে তা নয়।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, একথাটা ভবানী দেবী বা ঁারা মাসীশাশুড়ীরা মানতেন না।

সেই কারণে সোফিয়া ফিরে এসে এ বজরায় ওঠে নি। সে নিজের বজরায় গিয়ে উঠেছিল।

তার রান্নাবান্না আছে। খাওয়া-দাওয়া আছে। তারও নিজের কিছু ভজন আছে। তার ভজনও নানান যোগের জটিলতায় জটিল। ইসলামী উপাসনার সঙ্গে তার আর একটা জপ ছিল, সেটা পাগলাবাবার দেয়া মন্ত্র জপ।

বীরেশ্বর রায় অধীর হয়ে মহিন্দরকে বলেছিলেন—কি হল দেখতো মহিন্দর? এখনও পূজো শেষ হল না? এত দেরী তো হয় না!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী দেবী এসে উঠেছিলেন তাঁর বজরায়।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এত দেরী আজ?

একটু বিস্মিত হয়েই ভবানী বলেছিলেন—দেরী? না তো!

না তো? দেখ তো ঘড়িতে কটা বাজল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভবানী বলেছিলেন—তাই তো! এগারটা! আমি তো বুঝতে পারি নি!

সেদিন আর এ নিয়ে উচ্যবাচ্য হয় নি। ভবানী দেবী চরণোদক নির্মাল্য দিয়ে, কাপড় ছেড়ে এসে স্বামীর পাশে বসেছিলেন।

বীরেশ্বর তখন যুবক। জন্ম তাঁর বিশ সালে, তখন চলছে উনিশশো ষাট। চল্লিশ বছর বয়স। তবুও জীবনে যে যুদ্ধ তিনি করেছেন নিজের সঙ্গে, যে যুদ্ধের নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁর বাঁ হাত, বাঁ পা খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে, তারই ফলে তখন তাঁর চুলের মধ্যে দু-চারটে পাকা চুল দেখা যেতো; ভবানী পাশে বসে তাই খুঁজে খুঁজে বের করে তুলে ফেলতেন।

সেদিন তিনি বলেছিলেন—আজ সকাল থেকে গান শোনা হয় নি, না?

—হ্যাঁ, সোফিয়া তার এক সহেলীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—এখনও ফেরে নি?

—সে ঠিক সময় ফিরেছে। সে বলেছিল—দশ, সাড়ে দশ বাজে লৌটেঙ্গী, ঠিক তাই এসেছে। কিন্তু তোমার আসবার সময় হয়েছে বলে বজরায় ওঠে নি।

—ও, তাই আমার রাজাবাহাদুরের মেজাজ খারাপ হয়েছে।

—তোমার তাই ধারণা, না?

—তাতে অন্যায়টা কি হল?

ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল বীরেশ্বর। বলেছিলেন—তুমি বুঝতে পার না ভবানী, আমি তোমাকে কেমনভাবে পেতে চাই? কিন্তু তুমি নিজেকে এমন আড়াল করে রেখেছ, পুজো পুজো আর পুজো নিয়ে—!

ভবানী দেবী সেদিন অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন—দেখ তো পাগলামী! হ্যাঁ গা, আমি পুজো-অর্চনা করি কি আমার মঙ্গলের জন্যে?

বীরেশ্বর বলেছিলেন—থাক!

ভবানী ডেকেছিলেন মহিন্দরকে—মহেন্দ্র, বাবুকে তামাক দাও নি কেন? তামাক দাও। না। এক কাজ কর তো! বজরা থেকে আমার তানপুরাটা নিয়ে এস তো! পাখোয়াজটাও আনো। ময়দা করো।

স্বামীকে বলেছিলেন—নাও, আজ অধীনী তোমাকে গান শোনাবে। মহিন্দর তানপুরা এনে দিতেই, বলেছিলেন—বজরা খুলে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেতে বল! ঘাটের কাছে ভিড় জমে যাবে। আর ও বজরায় মাসীমারা আছেন। সোফি বাঈকেও ডাক।

—না। বীরেশ্বর মানা করেছিলেন। তুই তানপুরো পাখোয়াজ দে। সোফি থাক।

ঘাট থেকে বজরা খুলে মাঝগঙ্গার দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল। সকলে বিস্মিত হয়েছিল,

কিন্তু মহিন্দর চাকর বজরার ছাদে উঠে বলেছিল, একটু ঘুরে আসতে চলল বজরা।

* * *

এ বিবরণ মহিন্দরের সে তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল। রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।

সেদিন নাকি বড়হুজুরের সে আনন্দ, হুজুরের তেমন আনন্দ মহিন্দর আর কখনও দেখেনি। গান গাইতে গাইতে তানপুরার হাত মায়ের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুচোখ থেকে ধারা নেমেছিল।

গান সে আশ্চর্য গান, আর হুজুরের সে বাজনাও আশ্চর্য! গান থামল, পাখোয়াজে ঘা মেরে হুজুর চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—আমি ভাল হয়ে গিয়েছি। সতীবউ, আমি ভাল হয়ে গিয়েছি।

ভবানী দেবী প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সবিস্ময়ে। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাঁ হাতে আমার একটু কষ্ট হল না! আমি ভাল হয়ে গিয়েছি!

বিকেলে গঙ্গার কিনারায় উঠে দারোয়ানের সঙ্গে ঘুরেও এসেছিলেন। লাঠির দরকার হয় নি, তবু হাতে ছড়ি না নিলে যেন কেমন হাতখানা স্বস্তি পাচ্ছিল না।

* * *

পরের দিন ভোরে নৌকো বজরা পাটনা ছেড়ে রওনা হয়েছিল কাশীর মুখে। সে দিনও দুপুরে গান গেয়েছিলেন সতীবউরাণী। সেদিন কিন্তু পাখোয়াজ ধরতে দেন নি স্বামীকে। বলেছিলেন—বাঁয়া তবলা নাও। কাল যা পাখোয়াজে ঝড় তুলেছ, ও চলবে না। ভাল হয়েছ, বেশ ভাল কথা। কিন্তু ও হাত নিয়ে যুদ্ধ করা চলবে না।

সেদিন ভবানী দেবী ধ্রুপদী গান নি। হাল্কা গান ধরেছিলেন। সেদিন গানের আসর ভাঙতে আরও বেলা হয়েছিল। খেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। ভবানী দেবী বললেন—না। এ হবে না। কাল থেকে রাত্রে, সোফির আসরের পর আমি গান শোনাব। না হয় এ বেলা সোফি বেশীক্ষণ গান শোনাবে, রাত্রে ওর আসর সকাল সকাল ভেঙে দিয়ো, তারপর আমাদের পালা।

তাই চলেছিল ক'দিন। বড় আনন্দ চাকর-বাকরদের। গান-বাজনা নিয়ে হুজুরের ঝোঁক বাড়ল। নতুন নিয়ম হ'ল, বেলা থাকতে নৌকো বাঁধতে হবে। হুজুর কিনারায় উঠে খানিকটা করে হাঁটবেন।

স্নানের আগে তেল মেখে হুজুর নিজে হাত-পা ভেঁজে নিতেন। ডন-বৈঠক দেবার মতলবও করেছিলেন, কিন্তু তাতে সতী-রাণী-মা বাধা দিয়ে বলেছিলেম—না। যা রয়সয়, তাই কর। ও করতে আমি দেব না।

দিন দশেক পর, কাশী পৌঁছুবার দুদিন আগে, হুজুর সেদিন যেন একটু বেশী মেতে

উঠলেন। মদ খেয়ে নয়, নিজের ঝোঁকে। সেদিন বললেন—অনেক দিন নাচ হয় নি, আজ নাচ হবে।

সতীরাণী-মা বারণ করলেন—না।

হুজুর বললেন—না কেন? অনেক দিন নাচের আসর বসে নি, আজ এক বছরের ওপর।

সোফি বাঈ মাফি চাইলে। হাত জোড় করে। তবু শুনলেন না। নাচ হল শেষ পর্যন্ত। সে এক প্রহর রাত পর্যন্ত।

সেও আসর জোর করে ভেঙে দিলেন বউরাণী। সোফি বাঈ চলে গেল। এই পর্যন্ত মহিন্দর জানে।

এর পর রাত্রে কি হল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে, কেউ জানে না। কিন্তু ভোরবেলা উঠে বউরাণী গঙ্গাস্নান করে সেই যে পূজোরঘরে ঢুকলেন, সারা দিনেও আর বের হলেন না। মাসীমা এসে চরণোদক পুষ্প দিয়ে বলে গেলেন, আজ আর বউমা পূজোরঘর থেকে বেরুবে না বাবা। কাল কাশী পৌঁছুবে, সে আজ সংকল্প করছে, হবিষ্যান্ন করবে। কম্বলে শোবে। শোবেও ওই পূজোরঘরে। বললে—ওঁকে কাল বলা হয় নি। ভুলে গেছি বলতে। ওঁকে আপনি বলে দেবেন। আজ আমি ও বজরায় যাব না। সোফিকে একটু বেশীক্ষণ থাকতে বলেছে। এবেলা-ওবেলা দুবেলাই।

বীরেশ্বর রায় একটি কথাও বলেন নি। চুপ করে শুনে শুধু একটি হুঁ বলেছিলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

সেদিন স্নানের সময় তেল মেখে ডনবৈঠক দিলেন। বিকেলবেলা অন্যদিনের চেয়ে বেশীক্ষণ বেড়িয়ে ফিরলেন।

সন্ধ্যেবেলা সোফি বাঈয়ের গানের আসর বসে ভাঙল প্রথম প্রহরের বদলে রাত দু প্রহরে। গঙ্গার পাড়ে চারিদিকে তখন কোলাহল করে শেয়াল ডাকছে।

পরের দিন বেলা দশটার সময় নৌকো কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর লাগল। ও বজরার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বেণীমাধবের ধ্বজাকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে মা প্রণাম করছিলেন। তাঁর সে চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

এ তো পরশুর রাণীমা নন।

এ যেন সেই হুজুরের অসুখের সময় যে রাণীমা এসে শুধু শাঁখাশাড়ী পরে যোগিনীর মত রায়বাড়ীতে ঢুকেছিলেন, সেই রাণীমা!

একদিনের উপবাসও নয়, হবিষ্যান্ন করেছিলেন ভবানী দেবী, অর্ধ-উপবাসও বলা যায় না, সন্ধ্যার পূর্বে দুধ খেয়েছিলেন, তবু মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কয়েকটা উপবাস করে আছেন, তার উপর চুল রুক্ষ; সংকল্পের জন্য উপবাসের পূর্বদিন তেল নিষিদ্ধ। কম্বলে শুতে হয়।

অশৌচ পালনের মতই ব্যবস্থা। অলঙ্কার সব খুলে রেখে শুধু শাঁখা পরেই তিনি নেমেছিলেন। বিমলাকান্ত এসেছিলেন সস্ত্রীক, পাণ্ডার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে থেকে ব্যবস্থা করা ছিল। একটা বড় বাগিচাওয়ালা মোকাম ভাড়া করে রাখা হয়েছিল। পালকি-ডুলি এবং এক্কা হাজির ছিল। শহর থেকে একটু বাইরে। ভবানী দেবীর পরামর্শ মতই করা হয়েছিল সব। আর একটা বাড়ীও ভাড়া করে রাখা হয়েছিল শহরের মধ্যে বিমলাকান্তের বাড়ীর কাছে। কাশীতে এক মাসেরও উপর থাকবেন, বিশ্রাম নেবেন বীরেশ্বর রায়। গঙ্গার একেবারে ধারে। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটের দিকে। বীরেশ্বর রায় ওই বাগানে থাকবেন, সঙ্গের দারোয়ান লোকজন সবই থাকবে সেখানে; শহরের বাড়ীতে থাকবেন মাসীমারা। ভবানী দেবী ভোরবেলা শহরের বাইরের বাড়ী থেকে পালকিতে চলে আসবেন শহরের বাড়ীতে। এখানে এসে সারাদিন থাকবেন, স্নান, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি করবেন। বিকেলবেলা বীরেশ্বর রায় আসবেন, সন্ধ্যায় দেবদর্শন সেরে বিমলাকান্তের সঙ্গে গল্পগুজব করে সস্ত্রীক ফিরবেন বাগিচাবাড়ীতে। সোফিয়ার থাকবার ব্যবস্থা ওই বাগিচাবাড়ীতেই একটা আলাদা ছোট বাড়ীতে করা ছিল। সেটা ছিল বাগিচাবাড়ীর দপ্তরখানা বা বাইরের বাড়ী। মূল বড় বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও স্বতন্ত্র বাড়ী।

সুরেশ্বর বললে—এ-বাড়ী পরে কেনা হয়েছিল। এবং বাড়ীখানা পেয়েছিলেন মেজতরফ। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়। শিবেশ্বর রায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিল বলে রত্নেশ্বর রায় বাড়ীখানা তাঁকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এ-বাড়ী কিনেছিলেন আমার জ্যেঠামশাই—যজ্ঞেশ্বর রায়। এ-বাড়ী একবার আমি দেখেছি। আমার যখন পাঁচ-ছ বছর বয়স, তখন বাবা আমাকে এবং মাকে নিয়ে গোটা পশ্চিম ঘুরে এসেছিলেন। বড় মনোরম জায়গা ছিল; বাড়ীখানাও তেমনি মুঘল আমলের আমীরী ছাপমারা। কিন্তু সে-কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। এই বাইরের বাড়ী বা দপ্তর সেরেস্তাখানায় একখানা প্রশস্ত হল ছিল—সেইখানে বসত রাত্রের আসর।

মহিন্দর চাকর রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—এই কাশী এসেই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। সতীরাণীমা ব্রত করলেন; ভোরবেলা যখন পালকিতে উঠতেন তখন আবছা অন্ধকারের মত দেখতাম, মায়ের যেন কেমন ঘোর লেগেছে। আবার ফিরতেন রাত্রে, তখন তাঁর দিকে তাকানো যেত না। সে যেন কেমন মানুষ। "পিথিমার নন।" খাওয়াদাওয়া তো ফল-জল; তা ওই বাড়ীতে খেয়ে আসতেন। পালকি থেকে নামতেন যেন কাঁপছেন; দু'জন ঝি তাঁকে দু'পাশে ধরে উপরে নিয়ে যেত। এক মাস ব্রত, পয়লা বোশেখ থেকে বোশেখের সংক্রান্তি পর্যন্ত—তার মধ্যে প্রথম পনের দিন উপরে উঠেছিলেন,—বাকি ক'দিন উপরে ওঠেননি, তিনি আলাদা ঘরে শুতেন, তাঁর বিছানা একখানা কম্বল, তার উপর খুব ভালো রেশমী চাদর পাট করে চাদরের মত পাতা হত; আর একখানা কম্বল গুটিয়ে রেশমী চাদর জড়িয়ে বালিশের কাজ

করত। আর চারখানা লালপাড় গরদের শাড়ী। শ্বেতপাথরের দু'-তিনটে গেলাস, খান-দুই রেকাবি; আর জপের মালাটালা এই সব। বাক্সপেটরা যা সব আসল সামগ্রী, সে-সব থাকত রায় হুজুরের কামরায়। একেবারে জানালা খুললেই গঙ্গা।

মহাবীর সিং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘরের দরজায় পাহারা থাকত।

মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মা ব্রত করতে লাগলেন, হুজুর যেন নতুন করে সেরে উঠলেন, মুখের উপর দাগ পড়েছিল, সেগুলো উঠে গেল, মনে হল দশ বছর বয়স কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই মেজাজ। সেই চোখের তাকানি। সেই কড়া গলার ডাক। সব ফিরে এল।

রাত্রে সোফি বাঈয়ের আসর বসত অল্পক্ষণের জন্যে। ওই মায়ের সঙ্গে ফিরে এসে; মাকে উপরে তুলে শুইয়ে দিয়ে সটান এসে উঠতেন বাইরের বাড়ীতে পাতা আসরে, একখানা গান শুনেই ফিরে এসে শুতেন। সোফি বাঈয়ের সঙ্গে আসর যা হবার তা হ'ত দিনের বেলা। সকালে হুজুর উঠতেন আটটার সময়, তখন মা চলে গেছেন কাশীর ভিতরে শহরের বাড়ীতে। হুজুর মুখ ধুয়েই উঠতে উঠতে বাঈ মেওয়াফল আর অন্য ফল কেটে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত; আমি গরম দুধ, মাখন, মিছরী, প্যাড়া এনে নামিয়ে দিতাম। হুজুর খেতেন; সোফিয়া বাঈ এসে খাওয়াতো। সতীরাণী মা বাঈকে ভারটা ডেকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খেতে খেতে গল্প করতেন। হাসতেন, মসকরা করতেন। আমি তামাক সেজে নলটি রেখে বাইরে গিয়ে বসে থাকতাম। খাওয়ার পর ডাক পড়ত তবলচীর আর সারেঙ্গীদারের। গানের আসর বসত। একটা বাজলে সে-আসর ভাঙত। হুজুর স্নান করে খেয়ে উঠে শোবার আগেই বাঈ আবার এসে হাজির হত পানের রেকাবি হাতে। পান-তামাক খেয়ে হুজুর শুতেন। বাঈ প্রথম প্রথম চলে যেত, দিনকয়েক পর থেকেই হুজুর বলেছিলেন—মাথায় হাত বুলিয়ে দাও; ভবানী দিত, পাকাচুল তুলত। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। না দিলে ঘুম আসবে না।

বাঈ মাথার শিয়রে কুর্সি টেনে নিয়ে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। পাকাচুল তুলতে বললে বলত—হুজুর, এখন তুমি ফের নওজোয়ান হয়ে গেছ, এখন কি আর পাকাচুল থাকে?—

হুজুর খুব হাসতেন। এই সময় হুজুর আর একরকম মানুষ হয়ে যেতেন।

*   *   *

কাশী থেকে রওনা হয়েছিলেন, বিন্ধ্যাচল হয়ে প্রয়াগ। জষ্ঠি মাসের পনের-ষোল তারিখে। পনের তারিখের শেষ রাত্রে ষোল তারিখের ভোরে। সতীবউরাণী একমাস ব্রত করে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন; তিনি একটু বল পাবেন—এই বলে অপেক্ষা করা হয়েছিল।

কিন্তু কাশী থেকেই আগের হালচাল সব বদলে গেল। সতীবউরাণী বাসা নিলেন নিজের ঠাকুর ছিল যে বজরায় সেই বজরায়। সেইখানেই তাঁর খাওয়া সেইখানেই শোওয়া। মাত্র তিনবার আসতেন এ বজরায়। একবার চরণোদক দিতে, একবার হুজুরের দিনে খাবার সময়,

একবার রাত্রে খাবার সময়। ব'সে থেকে খাইয়ে হুজুরকে শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হুজুর ঘুমিয়ে পড়লে তবে চলে যেতেন।

বলেছিলেন—তীর্থ শেষ করে ফিরে আবার আগের মতন হবে সব। তীর্থ যাচ্ছেন, ভগবান দর্শন করতে চলেছেন, এ সময় একমন হয়ে যেতে হবে। ওই চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করলে কি ভগবানের দর্শন মেলে?

বলতেন—যে যে চিন্তা নিয়ে যায়, তীর্থের মন্দিরে দেবতার মূর্তির বদলে সে তাই দেখে। দেবতা দেখতে পায় না!

হুজুর মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু মেজাজ তাঁর আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন—বেশ, তাই হবে। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন তাই হবে।

মহেন্দ্র বলেছিল—হুজুরের বজরার কামরায় আমি শোব এই ব্যবস্থা করেছিলেন রাণীমা। আমি শুতাম।

প্রয়াগ থেকে বজরা ঢুকল যমুনায়। বরাবর এসে উঠল মথুরায়, তারপর বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে দশদিন থেকে ফিরে এসে উঠলেন আগ্রায়। তবে মাসীমারা থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। আগ্রায় দেবদেবতা নেই, সেখানে থেকে কি করবেন? আগ্রায় বাড়ী ভাড়া করে দশদিন পর হুজুর রাণীমা, সোফিবাঈ আর লোকজনকে নিয়ে গিয়ে আগ্রায় উঠলেন।

রাণীমায়ের শরীর তখন আরও খারাপ হয়েছে। রোগা হয়ে গেছেন। আর মনে মনে কি ভাবেন, যেন মাটির মানুষই নন। খেতে কিছু পারেন না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অরুচি।

মহেন্দ্র মাথা চুলকে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মাসীমারা ফিসফাস্ গুজগুজ করছিলেন। মানে—।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ।

মহেন্দ্র এসব কথা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর। সে প্রায় এক বছর পর। তীর্থপর্যটনে লেগেছিল ছ' সাত মাস, ছ' সাত মাস পর তাঁরা ফিরে এসেছিলেন কাশীতে। কাশীতেই একটি কন্যাসন্তান প্রসব ক'রে ভবানী দেবী মারা যান।

রত্নেশ্বর মোটামুটি ঘটনাগুলি জানতেন, তাই বলেছিলেন—হুঁ। বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা এবং অন্যান্য প্রবীণারা কি কানাঘুঁষো করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বলেছিলেন—হুঁ।

কথাটা কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে বলতে ভরসা পায় নি। তার কারণ ভবানী দেবী। ভবানী দেবী বারো বছর পর স্বামীর ঘরে ফিরে এসেও ঠিক সংসারী হন নি। এবং কালটা সে-কাল! কুড়ি-বাইশ বছর পর এমন ধর্মপরায়ণা পূজারিণীর মত মেয়ে সন্তানবতী হয়েছে, এটা যেন প্রবীণাদের কাছে একটু কেমন ভোগলিপ্সা অপবাদের মত মনে হয়েছিল। ভবানী দেবীর নিজের কাছেও সেটা অপরাধ বলে মনে হয়েছিল।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, প্রমাণ সঠিক মানে লিখিত প্রমাণ আমি পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস—তাই। কীর্তিহাটে সেদিন রাত্রে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়তে পড়তে আমি যেন চোখে দেখতে পেয়েছিলাম বিশীর্ণা ভবানী দেবীকে। মুখে চোখে তাঁর অপরাধ-বোধের ছাপ। তিনি যেন মনে মনে বলছিলেন—'একি করলি মা! এ কি লজ্জায় ফেললি! সংসারে ফিরে আসার জন্যে কি এই শাস্তি দিলি!'

আর রাজকুমারী রাণীবউ কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোন বৃদ্ধা নিস্তারিণী দেবীর ফিস্‌ফাস্ কথাগুলিও যেন কানে শুনেছিলাম—ছি—ছি মা, এ কি লজ্জা—! এতকাল পর! পুষ্যি-বেটা একুশ পার হয়ে পড়েছে বাইশে; বউ এসেছে ঘরে, কোনদিন ডাকে চিঠি আসবে ম্যানেজার লিখবে—রত্নেশ্বরের সাহেব শ্বশুর লিখবে নাতবউয়ের সন্তান হবে! তা—না—। এখান থেকে খবর যাবে চিঠিতে—। লিকবে কি ক'রে গো!

আর একজন বলেছিলেন—তা বীরেশ্বর আমাদের পারবে। দিব্যি পারবে। আগেকার কথা তো ঢাকা নেই। এখন এই দেখ না, তীর্থে এসেছে, সঙ্গে বাঈ নিয়ে এসেছে।

নিস্তারিণী বলেছিলেন—এইবারে আগুন লাগবে দিদি। বাপবেটায় মানে পুষ্যিবেটায় আর বাপে বিষয় নিয়ে লাঠালাঠি হবে। ছেলে আর হবে না এই বলে সব পুষ্যিবেটাকে দানপত্র ক'রে দিয়ে এল। এখন? এখন তো মায়ের নিজের ছেলে আসবে কোলে! সে কোথা দাঁড়াবে? কি মতিচ্ছন্ন মা! দানপত্তর ক'রে দিলি কেন?

সুরেশ্বর বললে—এ কথাগুলির আভাস আছে রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে। তাঁর ডায়রীতে শ্রাবণ মাসের আট তারিখে তিনি লিখেছেন—"আজ আগ্রা হইতে পিতৃদেবের পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। মাতৃদেবী এত দীর্ঘকাল—একুশ বৎসর পর আবার সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন! বুঝিতে পারিলাম, মনুষ্য যতই এবং যেমনি সংকল্প করুক, যত নিষ্ঠার সঙ্গেই ধর্মাচারণ করুক, তাহার প্রবৃত্তির কদাপি পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। পিতা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও মৃদু হইলেও পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ছিলেন। তিনি সুস্থ হইবামাত্র আবার ভোগলালসার কাছে পরাজিত হইয়াছেন! কিন্তু আমার নানা চিন্তা হইতেছে। পিতা তাঁহার সম্পত্তি আমাকে দানপত্র করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। লোকচক্ষে আমি স্বর্গীয় সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসাবে তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক অংশের মালিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল আনা সম্পত্তিরই মালিক তিনি। আমি অবশ্য ইচ্ছা করিলে এই অর্ধেক অংশ নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস পিতৃদেবও এ বিষয়ে কোন দাবী করিবেন না। করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার পক্ষে ন্যায় কি হইবে? চিঠিখানা ম্যানেজারকে দেখাইলাম। তিনিও এই কথাগুলিই বলিলেন। অবশ্য দৌহিত্র হিসাবে আমার অংশের কোন কথাই তুলিলেন না। এবং বাড়ীতে এই পত্র সরস্বতীবউও দেখিল। পত্র পাঠ করিয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ বলিল—"এখন কি হইবে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিসের কি হইবে?"

সে বলিল—সম্পত্তির ?

পুত্রসন্তান অর্থাৎ ভ্রাতা হইলে তাহার সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লইব। ভগ্নী হইলে প্রচুর খরচপত্র করিয়া উচ্চবংশে তাহার বিবাহ দিব।

সরস্বতীবউ চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম—ইহাই কর্তব্য এবং ধর্ম নহে কি ?

সে বলিল—না, আমি তাহা মনে করি না। শ্বশুরমহাশয় তোমাকে যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা ইচ্ছা করিলে তুমি অবশ্যই দিতে পার। কিন্তু জমিদারী সম্পত্তি, বসতবাটী ভাগ হইলেই মাটি হইয়া যায়। তাহার আবার দাম কি ? তা ছাড়া শ্বশুরমহাশয়ের কলিকাতার সম্পত্তি তো কম নয়। শুনিয়াছি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটিতেছে এবং গোকুলের কৃষ্ণের মত দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে। কলিকাতার বাড়ীতে তোমার ভাগ নাই। ও বাড়ী দাদা-শ্বশুর ফোমেশ্বর রায় দৌহিত্র হিসাবে তোমাকে দেন নাই। কলিকাতার তেজারতি ইত্যাদিও নয়। সে-সব তো সোনা। এই জমিদারী তাহার কাছে মাটি।

কথায় বাধা পড়িল। অঞ্জনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি কহিলাম—থাক এখন এসব কথা। সে-সব অনেক দূরের ব্যাপার। এক্ষণে চুপ কর। অঞ্জনা আসিতেছে।”

সুরেশ্বর বললে—কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম সুলতা, বলছিলাম বীরেশ্বর রায় আর ভবানী দেবীর রায়বাড়ীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থানের কথা। এসে পড়লাম রত্নেশ্বর রায়ের কথায় কীর্তিহাটের বাড়ীতে। ফিরে আবার সেই কথাই বলি।

আগ্রাতেই প্রথম কবিরাজ এবং ডাক্তার দেখিয়ে বীরেশ্বর রায় জানতে পারলেন যে ভবানী-দেবী আবার সন্তানসম্ভবা।

মহেন্দ্র খানসামা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—সেদিন রাত্রে রাণীমায়ের সঙ্গে হুজুরের কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি কথা কাটাকাটি ?

মহেন্দ্র চুপ করে থেকেছিল—জবাব দেয় নি।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মহেন্দ্রকে দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া ধমক দিয়া প্রশ্ন করিলাম—কি কথা হইয়াছিল বল্। বলিতেই হইবে।

মহেন্দ্র মুখ নিচু করিয়া বলিল—সতীবউরাণী সংবাদ শুনিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে-ছিলেন। হুজুর গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কাঁদিতেছ কেন ?

ভবানী দেবী বলিয়াছিলেন—এ তুমি কি করিলে ?

হুজুর বলিয়াছিলেন—কেন কি হইয়াছে ?

—কি হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার ব্রত, ধর্মাচরণ সব পণ্ড হইল, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। রত্নেশ্বরের সম্মুখে আমি মুখ তুলিয়া কথা বলিব কি প্রকারে ?

ইহকালের জন্য আমার পরকাল নষ্ট হইল। জীবনে মাকে ডাকিবার সময় পাইব না। মমতার পাঁকে আবদ্ধ হইয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, মায়ের মুখ ভুলিয়া যাইব, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি হইয়াছে। তুমি জান, আমার জীবন ভোগের জীবন নয়। একবার বালিকা বয়সে যখন সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলাম না তখন তোমাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল তুমি তো জান! নিজে তুমি কত দুঃখভোগ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ! বারো বৎসর পর তোমার জীবনসংশয় অসুখের সময় আবার আমি ফিরিয়াছিলাম। সম্ভবত ভুল করিয়াছিলাম। তোমাকে তো বারবার বলিয়াছিলাম ঐসকল কথা!

হুজুর বলিয়াছেন—ভুল আমারও হইয়াছিল সতীবউ। তোমাকে বিবাহ করা আমার ভুল হইয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনসংশয়ের সময় তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণার উপশম হইল বলিয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরা আমার ভুল হইয়াছিল। আমার বাঁচিতে চাওয়া—বাঁচা ভুল হইয়াছে। তোমাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিব কল্পনা করা ভুল হইয়াছে। চিকিৎসায় এবং এই পশ্চিম ভ্রমণে জলবাতাসের গুণে নূতন করিয়া জীবন যৌবন ফিরিয়া পাওয়া ভুল হইয়াছে। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—তুমি একান্ত করিয়া আমার। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—আমিই তোমার একমাত্র কাম্য! সবই ভুল হইয়াছে ভবানী, সবই ভুল হইয়াছে!

সতীরাণী মা কেমন হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি শুধু বিহ্বলের মত হুজুরের দিকে তাকাইয়াই ছিলেন, একটি বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই।

হুজুর বলিয়া গিয়াছিলেন—বলিতে পার সতীবউ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ছাড় স্বয়ং মহেশ্বরের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাহারা কি অধার্মিক? ব্রহ্মার-ঔরসজাত পুত্র নাই, তাঁহার মানসপুত্র আছে। পূর্ণব্রহ্মের অবতার রামচন্দ্রের পুত্র হইয়াছে, ভগবান কৃষ্ণের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কি ধর্মভ্রষ্ট? বল—বল। তুমি বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে, তুমি বল—তোমার উত্তর আমি শুনিতে চাই! বল—বশিষ্ঠের শতপুত্র ছিল বলিয়া কি তাঁহার পত্নীর পরকাল নষ্ট হইয়াছে? সীতার পুত্র লবকুশ, সাবিত্রী শতপুত্রের বর লইয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহারা নরকস্থ হইয়াছেন। বল—শুনি!

মহেন্দ্র বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে—হুজুর, আমি হুজুরের পিছন পিছন আসছিলাম, হুজুর রাণীমার ঘরে ঢুকলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছিলাম, কিন্তু রাণীমাকে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরই কথা আরম্ভ হল। রাণীমায়ের কথা শুনতে শুনতে মনে হ'ল আমি স'রে যাই। কিন্তু হুজুরের গলা তো জানেন, আর তিনি ঠাণ্ডা গলাতেও কথা বলছিলেন না। ঘরখানা গম্‌গম্‌ করছিল। তার আওয়াজ পেয়ে অন্য চাকরবাকরেরা ঝিয়েরা এসে বারান্দায় উঁকি মারছিল। আমি কি করব? রাণীমায়ের ঘরের

দরজাটা টেনে দিয়ে আমি দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতের ইসারায় সকলকে চলে যেতে বললাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে হল। শুনলাম।

তারপরই হুজুর ডাকলেন—মহিন্দর, মহিন্দর!

আমি ঘরে ঢুকে দাঁড়ালাম। দেখলাম—হুজুর রাণীমায়ের বিছানার পাশে ব'সে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমাকে দেখে বললেন—জল জল আন মহিন্দর জল। আর পাখা!

মা মূর্চ্ছা গিয়েছেন।

মাথায় মুখে জলের ছিটে দিয়ে হুজুর ডাকছিলেন—রাণীমার নাম ধ'রে। তাঁর হাত কাঁপছে। হুজুর, আমি চেঁচিয়ে দামিনী ঝিকে ডাকলাম—সে ছুটে এল।

জ্ঞান অল্পক্ষণ পরেই হল। জ্ঞান হয়ে আমাদের সকলকে দেখে একটু হেসে মা বললেন—থাক্—থাক্। কেমন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। থাক্ আর বাতাস করতে হবে না।

হুজুরকে বললেন—যাও, যাও, তুমি এখানে থেকো না। আমার কিছু হয়নি। মাথার শিয়রে বসে থাকতে হবে না। যাও।

তারপর সুলতা, সুরেশ্বর বললে—আর কোনদিন কোনও এমন কথা হয় নি। এর-পর থেকে নাকি ভবানী দেবী ধীরে ধীরে সেরে উঠেছিলেন। নানান রকম খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালবেলা থেকে বেদানার রস, আঙুরের রস, বাদামের সরবৎ, পেস্তা, কিসমিস, তার সঙ্গে ঘি দুধ প্রচুর পরিমাণে খেতেন তিনি।

আগ্রায় আষাঢ় মাস থেকে প্রচণ্ড গরম আরম্ভ হয়েছিল। তাই আগ্রা থেকে বজরায় দিল্লী পৌঁছে, সেখান থেকে পালকি ঘোড়া, বয়েল গাড়ীতে হরিদ্বারে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

দিল্লীতে এসেই সোফিয়া বাঈজীর বিদায় নেওয়ার কথা। চলে যাবেন আজমীঢ়। চিরজীবনের জন্যই যাবার কথা। কিন্তু আজমীঢ় যাওয়া তার হয় নি। যেতে দেন নি ভবানী দেবী।

হুজুরের যত্ন ভাল হবে না। তা ছাড়া তিনি বলেছিলেন—এবার এসময় আমার দরকার আছে সোফি বাঈ!

সোফি বাঈ আগ্রা থেকেই নীরব হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপই থাকত। সে সেলাম ক'রে বলেছিল—আমাকে আপনার দরকার আছে হুজুরাইন?

—হাঁ, দরকার আছে সোফি। এতদিন তুমি তোমার হুজুরকে গান শুনিয়েছ, এবার আমাকে শোনাবে। ভজন শ্রিফ ভজন!

সোফি হেসে বলেছিল—বেশ। তাই হবে! আমি তো একলা হুজুরের বাঁদী নই। আমি

আপনারও বাঁদী।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—আরও আছে সোফি বাঈ। তুমি আমার পিতাজীর ধরম বেটী। তাঁর শেষ কাজ আমি করতে পারি নি। সে করেছ তুমি। তুমি আমার বহেন। তাঁর কাছে তুমি শেষ শিক্ষা নিয়েছ, দীক্ষা নিয়েছ। ভজন শিখেছ। সেই ভজন আমাকে শোনাবে। তা ছাড়া হুজুরের তোমার দিল খুস রাখবে কে? আমি তো আর পারব না! তুমি ছুটি নিলে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে আমাকে। কিন্তু আমাকেই যে ছুটি নিতে হবে।

মহেন্দ্র সেদিনও কাছে ছিল ওঁদের। কাজ করছিল। রত্নেশ্বরকে সে যা বলেছিল তা তাঁর ডায়রীতে আছে।

"মহেন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। মহেন্দ্র বলিল—আমার মাতৃদেবীর কথা শুনিয়া সোফি বাঈ নাকি চকিত হইয়া বলিয়াছিল—

—ছুট্টি? এ কি বাত্ বলছেন দিদিজী?

—হাঁ। ছুট্টি তো নিতে হবে ভাই। এই অবস্থায় কি আমি তাঁর সেবা করতে পারি। আমার কি সে বল আছে? না হুজুর তোমার আমাকে কাজ করতে দেবেন?

সোফি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি আমাকে ভুলাচ্ছ দিদিজী?

হেসে উঠেছিলেন ভবানী দেবী!

সোফি জিজ্ঞাসা করেছিল—বেশ, কত দিনে ছুটি মিলবে আমার?

—খুদা মালুম সোফি!

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার ভগবতীর কৃপাধন্যা জননী তাহা হইলে সব অবগত হইয়াছিলেন!"

কার্তিকের প্রথমে হরিদ্বার থেকে দিল্লী ফিরে সেখানে দিন দশেক থেকে ওঁরা ফিরেছিলেন কাশী!

সেও ভবানী দেবীর ইচ্ছায় এবং আগ্রহে। সন্তান কাশীতে হবে।

ছেলে হ'লে নাম রাখবেন—বিশ্বেশ্বর। কন্যা হ'লে নাম রাখবেন—অন্নপূর্ণা!

পুত্র নয়—একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন ভবানী দেবী।

বিমলাকান্ত কাশীতে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর সাহেব মেমসাহেবদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তার পদোন্নতিও হয়েছিল। তখন তিনি কালেক্টরেটের এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট হয়েছেন। ডাক্তার দাই এগুলি অর্থাৎ আঁতুড়ে থাকবার লোক ইত্যাদির সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। কেউই বিশেষ আশঙ্কা করেন নি। তবে মাসীমারা আশঙ্কা করেছিলেন। এতকাল পরে সন্তান হবে। তার উপর ভবানী দেবীর শরীর আবার যেন কিছু খারাপ হয়ে পড়েছিল—শেষের দু' মাস।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা কাশীতে ফিরে আসার পর থেকেই গুছিয়ে বলি সুলতা। ভবানী

দেবীর বৃত্তান্ত রায়বাড়ীর সর্বাঙ্গে সর্বকর্মে বোধহয় জড়িয়ে আছে।

ভবানী দেবীও কাশীতে এসে আবার যেন বদলে গেলেন। প্রথম তিন মাস আগ্রা পর্যন্ত তিনি মনে মুহ্যমানা এবং দেহে শীর্ণা হয়েছিলেন। কিন্তু আগ্রা থেকে স্বামীর সঙ্গে ওই কথাবার্তার পর হয়েছিলেন অন্য মানুষ। হাসি আনন্দ যেন তাঁর জীবনের পাত্র থেকে উপ্‌চে পড়ত। সোফির কাছে গান শুনতেন। স্বামীর খাওয়া-দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু ত্রুটি হতে দিতেন না। কিন্তু কাশী ফিরে আট মাসের শেষ থেকে তিনি আবার বদলালেন।

স্বামীকে বললেন—এবার আমাকে ছুটি দাও। এই শরীর নিয়ে আমি যেমন দেখাশুনো করতাম তা আর করতে পারব না। হাঁটতে ফিরতেও আমার কষ্ট হয়।

মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—হুজুর বলেছিলেন—না—না। বেশী হাঁটাহাঁটি তুমি করো না। বিশ্রাম নাও। আমার জন্যে ভেবো না। মহেন্দ্র আছে। তা ছাড়া সোফি রয়েছে। আর মন্দির-টন্দিরে যাওয়াও বন্ধ কর। হাঁটাহাঁটি তোমার ওখানেই বেশী হয়। আর ওই উপোসগুলি। ওগুলিও এখন বাদ দেওয়া দরকার। নেহাত কোন পর্ব হলে—কি একান্ত ইচ্ছে হলে এক একদিন—।

বাধা দিয়ে ভবানী দেবী নাকি মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হেসে বলেছিলেন—না, তাও আর যাব না। স্নানজল নির্মাল্য আসবে তাতেই হবে।

সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী এই বয়সে তাঁর এই অবস্থান্তরে লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং মনে মনে ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন এর জন্যে। সম্ভবতঃ স্বামীর কাছে ফরে এসেও তিনি দেহসম্পর্ক-রহিত একটি দাম্পত্যজীবনের কল্পনা করেছিলেন। প্রথম প্রায় এক বছর বীরেশ্বর রায় আংশিক পক্ষাঘাতে রোগীর মতই জীবনযাপন করেছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হয় নি। কিন্তু একবৎসর নিয়ম পালন ক'রে সুচিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেও যেটুকু রোগ অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও এই চেঞ্জে যাওয়ার ফলে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেই সহজ এবং স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন ফিরে পেতে চাইবেন এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ভোগী মানুষ। দুর্বল ভোগী নয়—সবল ভোগী তিনি। কিন্তু ভবানী দেবী তাঁর বিপরীত। তিনি বারো বৎসর ব্রতপালনের পর স্বামীর রোগশয্যায় ফিরে এসেছিলেন; এবং স্বামী তাঁর পুণ্যেই বেঁচেছেন এই বিশ্বাসবশে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর তপস্যাকে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল—বীরেশ্বর রায়েরও স্বপ্নভঙ্গ হল।

ভবানী দেবী সন্তান প্রসবের দিন গণনা করে ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন। মন্দিরে তিনি যেতেন না তাঁর দৈহিক অবস্থান্তরের জন্য, কিন্তু ঘরের মধ্যে পূজা পাঠ নিয়েই থাকতেন। স্বামীর কাছে আসতেন দুবার। সকাল এবং সন্ধ্যায়। দুবেলা দুটি প্রণাম ক'রে দু'চারটি কথাবার্তা বলে আপনার ঘরে চলে যেতেন।

একঘরে শোওয়া বন্ধ হয়েছিল। প্রথম কাশীতে আসবার পথে, কাশী পৌঁছুবার ঠিক আগের

দিন থেকে। কাশীতে এসে থেকেই সেই যে একমাস সারাদিন উপোস ক'রে থাকতেন, ভোরে উঠে কাশীর ভিতরে বিমলাকান্তের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এসে সারাদিন পূজা অর্চনা করতেন, তারপর সন্ধ্যায় আরতি দেখে বাড়ী ফিরতেন—তখন থেকে।

ব্রত উদ্‌যাপনের পরও পনেরদিন কাশীতে ছিলেন—তখনও সেই নিয়ম ভাঙেন নি। তারপর সারা তীর্থ ঘোরার চার পাঁচ মাস সেই নিয়মই বজায় রেখেছিলেন।

আগ্রাতে সন্তানসম্ভবা হয়েছেন এই কথাটা যখন ডাক্তার কবিরাজে বলে গেল, তখন স্বামীস্ত্রীতে যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল—যার কথা একটু আগেই তোমাকে বলেছি সুলতা—যার পর ভবানী দেবী স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেও এই নিয়মটুকু ভাঙেন নি।

তবে একটা নিয়ম নতুন করেছিলেন। হরিদ্বার থেকে ফিরে কাশী ফেরা পর্যন্ত সোফি বাঈ থাকত স্বতন্ত্রভাবে, জলপথে স্বতন্ত্র বজরায়, কাশীতে আগ্রায় হরিদ্বারে স্বতন্ত্র কুঠীতে; সেখান থেকে সে আসতো-যেতো নিয়মমাফিক, সকালে জলখাবার সময় ফল কেটে আনত, পান আনত, গান শোনাতো, দুপুরে খাওয়ার সময় এসে দূরে ব'সে থাকত; পান আনত; বড় রায়হুজুর শুলে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলে মনোরঞ্জন ক'রে ঘুম পাড়াতো; আবার সন্ধ্যের সময় গানের মজলিসে আসত। হরিদ্বার থেকে সন্ধ্যের মজলিসও বসত বড় রায়হুজুরের শোবার ঘরে, সেখানে ভবানী দেবী থাকতেন। তারপর সোফি বাঈ চলে যেত। এবার কাশীতে ফিরে ভবানী দেবী বললেন—সোফি থাকবে এই বাড়ীতেই, দোতলায়। ভবানী দেবীর কামরা এবং বড় হুজুরের কামরা একেবারে পুব দিকে, সোফির জন্যে নির্দিষ্ট হল একেবারে পশ্চিম দিকের কামরা। আর বদল হল হুজুরের সঙ্গে ভবানী দেবীর কামরার। একেবারে পূর্বদিকের কামরাখানা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট—কামরার পূর্বের জানালার নিচেই গঙ্গা এবং দক্ষিণদিকের জানালা খুললে অবারিত দক্ষিণই শুধু পাওয়া যায় না, গঙ্গাও খানিকটা পাওয়া যায়। রায়হুজুরকে দিলেন তার পাশের ঘরখানা, যেখানায় প্রথমবার তিনি থাকতেন।

সুরেশ্বর বললে—তোমার কি মনে হবে বা হচ্ছে তা আমি জানি না সুলতা, তবে আমার মনে হয়েছে বা এখনও আমার তাই বিশ্বাস যে ভবানী দেবীর ওই নতুন ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর নিজের ভবিষ্যত তিনি নিজে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে আমাদের রায়বাড়ীতে একটা প্রবাদ আজও রয়ে গেছে। মেজঠাকুমা বলতেন—পুণ্যবতীর কাজ ফুরলো, কিন্তু যাই যাই করেও স্বামীর মমতায় যেতে পারছিলেন না; তাঁর ইষ্ট তাঁকে সন্তানধারণের লজ্জা দিয়ে চৈতন্য দিলেন—বললেন—বাঁচবি আর? বাঁচতে হলে, এই সংসারপঙ্কে ডুবতে হবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস ভাগ্য তোর সধবার ভাগ্য, ভাগ্যের ফলফুল ধরতে হবে। তা আমার দিদিশাশুড়ী প্রথম নাকি স্বপ্নে বলেছিলেন—মা, আমি স্বামীকে কাছে পেয়েও সে ব্রত পালনের ধর্মকে ধ'রে থাকব। কিছুদিন সংসার আমাকে

ভোগ করতে দাও। ইষ্টদেবী বলেছিলেন—'বেশ তাই কর।' বলে হেসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তা না-হলে না কি স্বামী বেঁচে উঠলেই তাঁর যাবার কথা ছিল। তা একবছর পার হয়ে দু বছরের বছরেই থাকার মাশুল দিতে হল। সধবা মেয়ে, ফল ধরতে হল। তখন সতীবউয়ের চোখ খুলল। মনে মনে মাকে ডেকে বললেন—আর নয় মা। ভোগের সাধ আমার মিটেছে। আমাকে এবার পায়ে টেনে নে। মা বললেন—তথাস্তু। সংসারে থাকার যে ফলটি জীবনে ফলেছে, ওই ফল বোঁটা খসে মাটিতে পড়ুক—তখন আসব। নিয়ে যাব।

এই স্বপ্নের কথা কে তৈরী করে চালু করে গিয়েছিল তা জানিনে। সুরেশ্বর বললে—তবে আমার মেজদি আমাকে কথাটা বলেছিলেন এবং আজও পর্যন্ত একথা রায়বাড়ীর মেয়েরা প্রায় সবাই জানে এবং বিশ্বাস করে। সে অর্চনাও করে!

সুলতা বললে—তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, সে নিজেই ভবানী দেবী, জন্মান্তরে রায়বাড়ীর ঋণ শোধ করতে এসেছে—একথাও বিশ্বাস করে অর্চনা।

—হ্যাঁ—তা বোধহয় করে। আগে ছেলেবেলায় তো করতই। তবে এখন এম-এ পাশ করেছে, এখন সেটা ততটা শক্ত আছে কিনা জানিনে।

সুলতা বললে—ছেলেবেলার বিশ্বাস সহজে মরে না। আমি ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে, আমার ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা ঠাকুরদাস পালকে কিছুতেই তোমার আঁকা ছবির মত চেহারায় কল্পনা করতে পারি নে, বিশ্বাস করতে পারিনে। মনে হচ্ছে তুমি জমিদারীর অহঙ্কারে চাষী ঠাকুর-দাসকে এমনি ক'রে এঁকেছ।

—ঠাকুরদাস পালের যে ছবি আমার আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে, তা কল্পনার ছবি নয় সুলতা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে ফটোগ্রাফের রেওয়াজ হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়েছেন—তার মধ্যে চার পাঁচখানা গ্রুপ ফটো আজও আছে। বিবর্ণ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু তবুও ঠাকুরদাসকে সবগুলোতেই চেনা যায়। আমি তাকে যেমনটি পেয়েছি তেমনটি এঁকেছি। দেখাতে পারি।

—আমাকে দেবে সেখানা?

সুরেশ্বর হেসে বললে—দেব। কিন্তু কি করবে নিয়ে?

সুলতা বললে—দেওয়ালে ছবি দিয়ে জিনিওলজি তৈরী করব। আমাদের বাড়ীর জীবনের অহঙ্কারকে একটু সংযত করব। যা ছিলাম—যা হইয়াছি। 'যা হইব'—তার ছবি পার তো একখানা এঁকে দিয়ো।

—কিন্তু কতদিন পরের ভবিষ্যৎ সেটা বল? চরম ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে পারি। সেটা আমি ভবানী দেবীর মত জানি। তার এদিকের যে ভবিষ্যৎটুকু সেটা আমার অজানা। ভবানী দেবী একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। তিন মাস পর মাঘ মাসে তিনি একটি কন্যা প্রসব করে মারা যান। কাশীর সিবিল সার্জেন থেকে ভাল ডাক্তারদের ডেকে

বীরেশ্বর রায় ডাক্তারের হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন। সিবিল লাইনের একজন মেমসাহেব মিড-ওয়াইফকে এনেছিলেন ডেলিভারির জন্যে। তিনদিন লেবার পেনের পর ডেলিভারী হল। হ'ল কন্যাসন্তান। তারপর হ'ল ভবানী দেবীর জ্বর। সেই জ্বরে আর তিনদিন পর তিনি মারা গেলেন।

সেদিন তিথি ছিল পূর্ণিমা। মাঘীপূর্ণিমা হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যতিথিগুলির মধ্যে একটি। মাঘী পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা।

মৃত্যুর পর ভবানী দেবীর হাতবাক্স থেকে চিঠিখানা পেয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর পুরনো কাগজ ঘেঁটে অনেক মূল্যবান দলিল পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী পেয়েছি; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের তিরিশ বছরের ডায়রী পেয়েছি; দেবোত্তরের সিন্ধুকের মধ্যে তাড়াবাঁধা চিঠির মধ্যে সোমেশ্বর রায়—রাণী কাত্যায়নীর প্রেমপত্র পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের গোপন সাধনার কথা লিখে যে পত্র ভবানী দেবী লিখেছিলেন তাও পেয়েছি। চন্দন কাঠের বাক্সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী পেয়েছি, কিন্তু ভবানী দেবীর এই চিঠির মত মূল্যবান আমি আর কিছু পাই নি। চিঠিখানা আমি অহরহ সঙ্গে রাখি। রাত্রে মাথার বালিশের তলায় রেখে শুই। ছবি আঁকবার আগে বা কোন কাজ করবার আগে কপালে ঠেকাই।

জামার ভিতরের পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য মরক্কো লেদারের নোটকেস বের করে তার ভিতর থেকে একখানি বিবর্ণ কাগজ বের করে সযত্নে ভাঁজ খুলে সামনের টেবিলের উপর সে মেলে ধরলে।

—এই দেখ।

সুলতা দূর থেকেই চিঠিখানার হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হল। গোটা গোটা সেকালের ছাঁদের হস্তাক্ষর, কিন্তু ভারী সুন্দর। আরও একটা কথা—লেখাগুলি এতটুকু অস্পষ্ট হয় নি, কালী যেন ডগ্‌ডগ্‌ করছে। কালী সম্পর্কে বিস্ময় তার ছিল না, কারণ সোসিওলজি সম্পর্কে রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক পুরনো পুঁথি সে ঘেঁটেছে। তার মধ্যেও এই কালীর দীপ্তি সে লক্ষ্য করেছে। সেকালে এদেশে লোহার কড়াইয়ে নানারকম জিনিস ভিজিয়ে তার কষ থেকে কষের কালী তৈরীর কথা সে জানে। একটা উপাদান—হীরাকষের নামও তার মনে আছে।

চিঠিখানার উপর সাগ্রহে সে ঝুঁকে পড়ল। প্রথমেই সম্বোধনটা বড় ভাল লাগল।

*   *   *

জন্মজন্মান্তরের পরমারাধ্য প্রিয়তম

স্বামীন—

দাসীর শেষ প্রণাম নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ করুন। শেষমুহূর্তে আমার জ্ঞান থাকিবে না—সেই কারণে আমি প্রণাম এই পত্র নিবেদন করিয়া রাখিলাম।

সন্তান প্রসব করিয়াই আমার জীবনের লীলা সম্বরণ করিতে হইবে, ইহাই দৈবাদেশ। সন্তানে আপনাকে দেখিয়া দেহত্যাগে দুঃখ অনুভব করিব বলিয়াই মা'র নিকট ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম। জানি তুমি ইহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করিও—দৈবাদেশ স্বপ্নযোগেই হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বাস করিও। তোমাকে কতদিন তো বলিয়াছি, স্বপ্নযোগে মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার কথা। বারো বৎসরের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়া—তোমার অসুখের কথা শুনিয়া—ব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া তোমার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মা তোমাকে বাঁচাইলেন। আমাকে বলিলেন—তুই ফিরিয়া আয়। কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া পাইয়া যাইতে দুঃখবোধ করিলাম। নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিনির্গত হইল। জননী হাসিলেন। বলিলেন—থাকিলে এয়োতী নারীর ফল ভোগ করিতে হইবে! ফল ধারণ করিয়া সৃষ্টির নিয়ম মানিতে হইবে। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াও শিবের প্রতি এমত আকর্ষণে ফিরিয়া উমা হইয়া গিরিরাজতনয়া হইয়াছিলেন। এবং শিবকে লাভ করিয়া, যিনি নিজেই মহাপ্রকৃতি, তাঁহাকেও ফল ধরিতে হইয়াছে। স্বকীয় অঙ্গের হরিদ্রা হইতে গঠন করা পুতুল জীবিত হইয়া গণেশ হইল অতঃপর কার্তিকের। কার্তিকেয়ের জন্য শিব উমার সহিত রতিরঙ্গে মাতিয়াছিলেন।

এ স্বপ্নের কথা তোমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। এই দিবস তুমি আমাকে বলিলে—দেখ ভবানী, ইতিপূর্বে তুমি আমাকে অনেক স্বপ্নের কথা বলিয়াছ, আমি এ সম্পর্কে কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করি নাই বা উত্তর প্রদান করি নাই। শুনিয়া তোমার তৃপ্তির জন্য কখনও হাস্যসহকারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি, কখনও কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছি—কখনও শঙ্কা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রকার দেবপূজা বা গ্রহস্বস্ত্যয়ন করিতে চাহিয়াছ, তাহাতেই মত দিয়াছি। কিন্তু আজ যে স্বপ্নের কথা বলিতেছ, ইহার উত্তর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত না দিয়া উপায় নাই। কথাটা হইল কি জান, স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না, বা সত্য নহে; দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় মনুষ্যসকল যে প্রকার চিন্তাভাবনা করিয়া থাকে বা যে সমস্ত ঘটনা সমুদয় সংঘটিত হইয়া থাকে, নিদ্রিত অবস্থার মধ্যেও সেই সকলই কিছুটা এলোমেলো হইয়া বা যেমত তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় বা বিশ্বাস তদনুসারে পরিবর্তিত হইয়া স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়।

যেমন ধর—তুমি ক্রমাগতই দেবতার কথা ভাবিয়া থাক। তাহাতে তোমার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস; সুতরাং তিনিই তোমাকে দেখা দিয়া কথা বলিয়া থাকেন। তোমার মনে হইয়াছে যে—তুমি ব্রত উদ্‌যাপন স্থগিত রাখিয়া আমার অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলে এবং আমি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া বাঁচিলাম। তাহাতে তোমার ধারণা হইল যে, এমত কঠিন অসুখ হইতে যখন আমি বাঁচিলাম তখন তাহার মাশুলস্বরূপ তোমার জীবন দিতে হইবে। যা আমার জীবনলাভেই তোমার তপস্যা পূর্ণ হইল—এবার তোমাকে যাইতে হইবে। এবং এতদিন ব্রহ্মচর্য করিয়াছ, তপস্যা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার মনে ধারণা হইয়াছে যে, ইহার

পর সন্তান ধারণ করা তোমার পক্ষে পাপ বা শাস্তিস্বরূপ হইবে। সুতরাং এমতপ্রকার স্বপ্ন তুমি দর্শন করিয়াছ।

আমি খুবই আঘাত পাইয়াছিলাম। তাহার কিছুটা তুমি অনুভব করিয়াছিলে। এবং কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলে—ভবানী, আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমার কথা ভুল ; আমি এতকাল নাস্তিক ছিলাম, সেইমত আচরণ করিয়াছি ; সেইহেতু এতবড় দৃষ্টান্তের এবং শিক্ষার পরও মূঢ়ের মত তোমার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আমি সত্যই মূঢ় ভ্রান্ত। দেখ, যতবার এমত চিন্তা মনে উদিত হইল ততবারই ঐ কোণে একটা টিকৃটিকি টকটক করিয়া উঠিল। এবং আরও আশ্চর্যের কথা ততবারই বা হুরে হাঁচির শব্দ শুনিয়াছি। এবং আরও আশ্চর্যের কথা আমার মনের মধ্যেও বারবার মায়ের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল।

আমাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য তুমি মায়ের একটি বিশেষ পূজা দিতে বলিয়াছিলে। পূজার পর নির্মাল্য ও চরণোদক গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলে—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলাম।

সেই রাত্রে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—দেখ ভবানী, একটি শ্যামাসঙ্গীত আছে। আয় মা সাধনসমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে। আমাকে গাহিতে বলিয়াছিলে, আমি গীতখানি গাহিলাম, শেষ হইবামাত্র বলিলে—ভবানী, অতঃপর আমরা যতদিন বাঁচিব, ততদিন এবম্প্রকার সাধনসমরই করিব মায়ের সঙ্গে। আমার দেহের তো এমতপ্রকার অবস্থা। এই অবস্থাই আমাকে এই সাধনজীবনে সাহায্য করিবে। আমরা সংসারে যতদিন বাঁচিব ততদিন ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীর মতই জীবনযাপন করিব। দেখাই যাউক না-কেন—'মা হারে কি পুত্র হারে ?'

আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কিছুদিন বেশই ছিলাম—সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস এক হইয়াছে।

কিন্তু মায়ের বিচিত্র পাকচক্র দেখ, মদীয় পিতৃদেবের সন্ধানের নিমিত্ত সোফিকে আহ্বান করা হইল এবং মা সেটা করাইলেন আমাকে দিয়াই। আমার ডাকে নির্ভয়ে সে আসিল এবং কথাবার্তার পর যখন তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল তখন রত্নেশ্বর কথাবার্তাগুলি শুনিয়া এবং সমস্ত বিবরণ জানিয়া সোফিকে সেই তোমাকে গান শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করিল। ভয় করিল —সোফি স্বাধীন থাকিলে হয়তো বা কথাটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। এবং আশ্চর্যের কথা—আমার মনে হইল—আমি বাঁচিলাম, তুমি পুরুষ এবং ভোগী, তোমাকে তুষ্ট করিবার একজন লোক পাইলাম—তাহাকে আড়াল দিয়া আমি বাঁচিব।

তুমি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে। আমি সোফিকে আরও বেশী করিয়া সামনে আনিলাম। কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা করিয়া আমাকেই আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে। রত্নেশ্বরকে যজ্ঞ করিয়া গ্রহণ উপলক্ষ্যে তুমি তাহাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইতে ইচ্ছুক

ছিলে না। কিন্তু আমিই জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

তোমার মনে পড়িবে—আমি বলিয়াছিলাম—একনিষ্ঠভাবে সে তোমার মনোরঞ্জন করিয়া তোমার একধরনের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছে। মহাভারতে মহাত্মা বিদুরের গর্ভধারিণী দাসী ছিলেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তুমি কোন উত্তর প্রদান কর নাই। তবু লইয়া যাইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলে। এই কারণেই তাহাকে আমি সকালে তোমার ফল কাটিয়া আনিবার ভার দিয়াছিলাম। তুমি যত সুস্থ হইতেছিলে তত বেশী করিয়া আমাকে টানিতেছিলে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া মরিতে চাহিতেছিলাম না অথচ ভয় হইতেছিল—সাধনসমরে হয় তো হারিয়া যাইব। মনে কর আমরা সন্তানাদির কামনা করি নাই বলিয়া রত্নেশ্বরের অনুকূলে দানপত্র সমাধা করিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম।

তাহার তীর্থযাত্রার পথে গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনায় সেদিন সকালে সোফি ছিল না, আমার পূজা শেষ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল—তুমি রাগ করিয়াছিলে—তোমার সন্তোষ সাধন করিতে গান গাহিলাম, তুমি পাখোয়াজ সঙ্গত করিয়া উল্লাসে বলিয়া উঠিলে—আমি ভাল হইয়া গিয়াছি। ছড়ি ছাড়িয়া হাঁটিতে লাগিলে, খানিকটা ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, আমি সুখী হইলাম, কিন্তু তুমি যখন আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে, তখন ভয় পাইতাম। আরও ভয় পাইতাম দর্পনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া। আমারও যেন যৌবন ফিরিয়াছে। মাসীমারা বলিলেন—গঙ্গার বাতাসে, পশ্চিমের জলে, আমার শরীর সারিতেছে। এবং জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে এই সময় মা আমাকে আর স্বপ্নে দেখা দেন নাই।

কিন্তু যেদিন তুমি সোফিকে নাচিতে হুকুম করিলে, সেদিন আমি চমকিয়া উঠিলাম। শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিলাম—নাচ দেখিতে শখ হইল কেন? সোফির কটাক্ষ, তাহার অঙ্গের হিল্লোল লীলা দেখিয়া তোমার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং আমার নিজের মধ্যেও কামনা জাগিয়াছিল—ইহা অস্বীকার করিব না।

তাহার পর যাহা হইল তাহা হইয়া গেল। কুশীর মুখে গলিত ঘৃতধারা যখন অগ্নিকে আকৃষ্ট করে তখন ঘৃতের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না, সে আত্মসমর্পণই করে। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে গিয়াও পারি নাই।

সেইদিন রাত্রে মনে হইল—এ কি হইল। এ কি করিলাম? সাধনসমরে পরাজিত হইলাম। অনেক কাঁদিলাম। শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখিলাম। মা দেখা দিয়া মৃদু মৃদু হাসতেছিলেন। মাকে বলিলাম—মা, আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। এইবার চরণে স্থান দাও। টানিয়া লও।

মা বলিলেন—সংসারে থাকিতে চাহিয়াছিলে, তাহার ঋণ শোধ কর। তৎপর তোমাকে টানিয়া লইব। মৃত্তিকাবক্ষে বৃক্ষ জন্মে, রস শোষণ করে, তাহার ঋণ শোধ হয় ফলদানে। তোমাকেও ফল দিতে হইবে।

কিন্তু তাহাতেও আমি দমিত হই নাই। আমি যেন ফলবতী না হই এই জন্য কাশীতে বিশেষ সঙ্কল্প লইয়া কঠোর ব্রত করিলাম। তোমার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিলাম। লোকসমাজে কি করিয়া মুখ দেখাইব ভাবিয়া পাইলাম না। আগ্রায় তোমার সহিত কলহ হইল। তুমি কঠিন কথা বলিলে। তখন সোফির শরণাপন্ন হইলাম। সোফি আমার ভগ্নী-তুল্যা। তোমার দিক দিয়াই নয়, আমার বাবার দিক দিয়াও বটে। তাহাকে ডাকিয়া সব খুলিয়া বলিয়া বলিলাম, সোফি তুমি আজমীঢ় যাইও না। তুমি এখানে থাক। আমাকে রক্ষা কর। ভগ্নীর কার্য কর। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম হইলেও তুমি তাঁহাকে ভজনা করিয়াছ, তাঁহাকেই চাহিয়াছ; আমার বাবার কাছে দীক্ষা লইয়া তুমি ধর্মেও আমাদের ধর্ম পালন করিতেছ। এ জন্মে তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হও। তুমি নূতন করিয়া তাঁহার মনোহরণ কর। তাহাকে টানিয়া লও।

এ সব বৃত্তান্ত তুমি সোফিকে জিজ্ঞাসা করিলেই জ্ঞাত হইবে। সে কখনই মিথ্যা বলিবে না। সে আমার অনুরোধে, আদেশে নূতন করিয়া সাজিল, নূতন করিয়া অঙ্গ মার্জনা করিল, বেণীবন্ধন করিল। আমি সেই সুযোগ দিবার জন্য তাহাকে প্রায়ই নৃত্য দেখাইতে আদেশ করিয়াছিলাম।

তুমি আকৃষ্ট হইলে। তাহার নিকট ধরা দিলে। তখন তোমার শরীর নীরোগ, দেহে পূর্বের বল পাইয়াছ, বলিতে কি তোমাকে দেখিয়া আমারই মনে হইত তুমি সেই যৌবনের বীর নবযুবক!

আমি সোফিকে অধিক করিয়া তোমার দিকে ঠেলিয়া দিলাম। কাশীতে আসিয়া সেই কারণেই সোফিকে দোতলায় স্থান দিলাম, তোমার সঙ্গে ঘর বদল করিয়া এক পাশের ঘর লইলাম এবং তোমার ঘরে সোফির আসা-যাওয়ার পথের সব সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিলাম।

স্বামীন, পরম দেবতা, আমি নিশ্চিত জানি, আমার সংসার ভোগের অনিবার্য ফল প্রসব করিয়াই আমাকে যাইতে হইবে। আগ্রাতে তুমি আক্ষেপ করিয়া প্রকারান্তরে আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলে যে, সংসারে মানুষ যাহারা, তাহারা যেন দেবী অংশোদ্ভূতা যাহারা তাহাদিগকে বিবাহ না করে। তাহারা বিবাহ করিয়া স্বামীকে সেবা করে, ভালবাসে, স্বামীকে পাইবার জন্য নয়, দেবতাকে পাইবার জন্য। সংসার করে, স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য। পরজন্মে বা লোকান্তরে তাহারা স্বামীকে কামনা করে না, তাহারা কামনা করে দেবতাকে। বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ হয়, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য।

স্বামীন্, কথাটি আমি মনে মনে অনেক আলোচনা করিয়াছি। কথাটি এক হিসাবে সত্য বটে। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই হিসাবটি তো মায়া-মোহের মিথ্যা হিসাব। ইহাই তো শাস্ত্রোক্ত পথ। তোমার কথাটি ভাল লাগিবে না। কারণ তোমার অনেক বাসনা আছে। আরও অনেক জন্ম তোমাকে পৃথিবীতে আসিতে হইবে। আমার এই জন্মেই মুক্তি

নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং ইহাই অবশ্যম্ভাবী। তুমি যেন আর বিবাহ করিও না। আমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি না। তোমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি। কারণ নিজের শক্তি না বুঝিয়া তুমি সকল সম্পত্তি রত্নেশ্বরকে দান করিয়াছ। বিবাহ করিয়া নূতন সংসার করিলে নিদারুণ অশান্তি ও পুত্রের সঙ্গে কলহ আরম্ভ হইবে। সে কলহে অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমায় রায়বংশের এবং আমার পিতার সাধনভ্রষ্টতার সকল রহস্য প্রকাশ পাইবেই।

এ সম্পর্কে আমি দাদার সঙ্গে কৌশলে আলোচনা করিয়াছি।"

সুলতা এবং সুরেশ্বর এক সঙ্গেই চিঠিখানা পড়ে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে ভবানী দেবীর দাদা বিমলাকান্ত; বুঝতে পারছ সুলতা?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ, তা সে বুঝেছে।

তারপর পড়ে গেল—

"দাদাকে বলিলাম, দাদা সম্পত্তি তো রত্নেশ্বরকে দানপত্র করা হইয়াছে। এখন যে সন্তান হইবে তাহার কি হইবে?

দাদা বলিলেন—রত্নেশ্বর অবশ্যই তাহাকে তাহার অংশ দিবে। সে তোমার সন্তান। বীরেশ্বরেরই পুত্র। দানপত্র করিয়াছে বলিয়া কি সে অংশ দিব না এমন কথা বলিতে পারে?

আমি বলিলাম—দাদা, বিষয় বিষের তুল্য। ইহা দেবতাকেও স্বার্থপর করে। মানুষকে অমানুষ করে।

দাদা বলিলেন—তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবুও রত্নেশ্বর তাহা পারিবে না!

আমি বলিলাম—মা কালী তাহাই করুন। বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে সেই সুমতিই যেন দেন। কিন্তু আইনটা কি? আইনের বলে পাইতে পারিবে কি?

দাদা বলিলেন—না। দানপত্রের অর্থই হইল যে, দানপত্র সহি এবং রেজেস্ট্রী হইবামাত্র সেই মুহূর্ত হইতে গ্রহীতা মালিক হইল। দাতা আর কোনরূপেই তাহা নাকচ করিতে পারিবেন না। তবে অনেক সময় এমন মামলা হইয়া থাকে, দাতা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, তিনি অসুস্থ, বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। তাহা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে যদি সকল কথা অর্থাৎ রত্নেশ্বর বিমলার গর্ভজাত আমার পুত্র হিসাবে স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় সোমেশ্বর রায়ের পৌত্র নহে, সে বীরেশ্বরের ঔরস-জাত পুত্র, কেবলমাত্র বিমলার পুত্র চুরির অপরাধ গোপনের জন্য এমত প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সবই নাকচ হইয়া যাইবে। দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের উইলসূত্রে সে যে আট আনার মালিক, তাহার মালিকও বীরেশ্বর হইবেন এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে যে আট আনা দান করিয়াছেন, তাহাও নাকচ হইবে। সুতরাং চিন্তা করিও না। এ কার্য রত্নেশ্বরও করিবে না। বীরেশ্বরও করিবে না। তাহাতে আমাদের পিতৃদেবের মর্মান্তিক কথা এবং শ্বশুর মহাশয়ের মনোহরা যোগিনী লইয়া কেলেঙ্কারির কথা সমুদয় প্রকাশ হইয়া যাইবে। সমগ্র দেশে রায়বংশের আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

এই কথা তোমাকেও প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, নিশ্চিন্ত থাক। রত্নেশ্বর এমত করিবে না। যদি করে তাহা হইলেও চিন্তা নাই। কলিকাতার বাটী, সম্পত্তি এবং নগদ কারবারের যে টাকা আছে, তাহা সমুদয় আমি আমাদের এই সন্তানকে দিব। তাহা ব্যতীত আমার পিতামহের আমল হইতে কিছু হীরা জহরতের সঞ্চয় আছে। আমার পিতৃদেব সে সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে হাত দিই নাই। মধ্যে মধ্যে দু-চারিখানা কিনিয়াছি। পিতৃদেব এ সঞ্চয় দৌহিত্রকে দেন নাই। আমাকেই দিয়াছিলেন। তাহার মূল্যও অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা। ওই সকল জহরতের মূল্য এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের লর্ডদের এই সকল রত্নরাজিতে ঝোঁক বাড়িয়াছে। এ সমুদয় হইতে আমি আর একটা কীর্তিহাট এস্টেট গড়িয়া তুলিব।

একটি সন্তানের তাহাতে ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু আমার পর বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে চার-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিলে কি করিবে? এবং তাহাদের যিনি জননী হইবেন, তিনিই বা মানিবেন কেন? সন্তানেরাই বা শুনিবে কেন?

তুমি ভাবিও না আমি আমার সন্তানদের স্বার্থহানির কথা চিন্তা করিয়া এ সকল কথা লিখিতেছি। আমি ইহা লিখিতেছি এই বংশ-কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া যাইবে আশঙ্কায়।

তুমি সোফিয়াকে লইয়া থাকিও। সোফিয়া বাঈজী হইলেও এতকাল ধরিয়া তোমাকে ভজনা করিয়াছে, তোমার প্রতি তাহার প্রেম অতি গভীর। সে আমার মত নয়। সে তোমাকেই চায়, মুক্তি সে চাহে না। সে আজমীঢ় না গিয়া তোমাকে পাইবার আশা পাইয়া ফিরিয়াছে। সে আমারই মত তোমার সেবা করিবে। সম্ভবতঃ অধিক মাত্রায় করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কি আর লিখিব? তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এ জীবনে আমার সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি ছাড়া আর কাহারও সহিত বিবাহ হইলে—সে আমার বারো বৎসর ব্রতকাল পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া থাকিত না। এবং তাহার সংসারে আমার আর স্থান হইত না। এবং ভাগ্যের চক্রান্তে যে সন্দেহ তুমি করিয়াছিলে তাহাই লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া আমার ললাটে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়া দিত। রত্নেশ্বরের ভাগ্যেও লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না।

আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম গ্রহণ করিও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিও। আমার অপরাধ মার্জনা করিও।

আমার সন্তান বাঁচিলে—বাঁচিবে বলিয়াই মা বলিয়াছেন, এবং সন্তান কন্যাসন্তান হইবে, তাহাকে তুমি প্রতিপালনের জন্য দাদা এবং বউদিদির হস্তে অর্পণ করিও। রত্নেশ্বরকে দিয়া আবার তাহাকে কাড়িয়া লইয়াছি। দাদার বিবাহ আমিই দিয়াছিলাম। অদ্যাপি তিনি নিঃসন্তান! দাদার মনে ক্ষোভ আছে। তুমি এই সন্তান তাঁহাকেই মানুষ করিতে দিও। তুমি সোফিকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিও। রত্নেশ্বর বংশের অভিশাপ ব্যর্থ করিবে

বলিয়াই বিশ্বাস করি। রায়বংশ ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

পরমারাধ্য প্রিয়তম স্বামীন, দাসী শ্রীচরণে বিদায় লইতেছে।

ইতি
প্রণতা
ভবানী।

এ-চিঠিখানা রায়বাড়ীতে ছিল না। এ-চিঠি পরে পেয়েছি আমি অন্নপূর্ণা দেবী—রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরার কাছে। তার জন্ম ১৮৬২ সালে, ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তাঁকে দেখিনি আমি। এবং রায়বংশের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর থেকে কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি রাখেননি।

সুলতা—তার মূল কারণ জমিদারী এবং সম্পত্তি।

বিয়ের পর তাঁর সন্তান হতেই, তাঁর শ্বশুরেরা বীরেশ্বর রায়ের যে অর্ধেক অংশ পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরকে দান করেছেন, তার উপর দাবী তুলেছিলেন। বলেছিলেন—কন্যা জন্মাবার পূর্বে বীরেশ্বর পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন তাঁর সন্তান নেই বলে। কিন্তু পরে সন্তান যখন হয়েছে, কন্যাও সন্তান, তার সন্তানেরাই বীরেশ্বরের বিত্তাধিকারী, সুতরাং এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ সিদ্ধ নয়, এবং সে-সময় বীরেশ্বর রায় পক্ষাঘাতে অসুস্থ ছিলেন। সে-রোগ তাঁর কখনওই সারেনি। তার প্রমাণ, ভবানী দেবীর মৃত্যুর দেড় বছর পর আবার তিনি পক্ষাঘাতে একেবারেই পঙ্গু এবং স্মৃতি ও বাকশক্তি হারিয়েছিলেন; তার কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় সই-করা দানপত্র এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ অসিদ্ধ। তা নাকচ হতে বাধ্য।

তোমার বাবা ব্যারিস্টার, তুমি নিজেও আইন মোটামুটি জান। এসব তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না।

পরে বিমলাকান্তের মধ্যস্থতায় এ-মামলা মেটে। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে রত্নেশ্বরের সামনে ভবানী দেবী যে-চিঠি বীরেশ্বর রায়কে কাশী থেকে লিখেছিলেন, তাঁর পালক-পিতা যে-চিঠি লিখেছিলেন, যে-চিঠি দুখানা নিয়ে এসেছিল ছেদী সিং, সেই চিঠি এবং তার সঙ্গে এই চিঠি দেখিয়ে অন্নপূর্ণাকে নিরস্ত করেছিলেন মামলা থেকে। এবং এই চিঠিখানা তিনি চেয়ে নিয়ে বলেছিলেন—ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে। আমি রাখব।

তার সঙ্গে রত্নেশ্বর বোনকে দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা। আর বিমলাকান্ত দিয়েছিলেন তার নিজের সর্বকিছু।

অন্নপূর্ণাকে তিনিই মানুষ করেছিলেন। তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন।

এই কথাবার্তার সময়েই ঠাকুরদাস পাল সমস্ত কথা শুনেছিল। এবং এই কথার জোরেই সে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল, তোমার বংশের সব কুলুজী আমি ফাঁস করে দেব। এবং তার জন্যেই—।

সুলতার বুঝতে বাকি রইল না যে, সুরেশ্বর বলতে চাইছে—তার জন্যই রত্নেশ্বর রায় পিক্রু গোয়ানকে ইসারা করেছিলেন এবং সেই ইসারার হুকুম শিরোধার্য করে পিক্রু তাকে ঝগড়া করতে টেনে নিয়ে এসেছিল কাঁসাইয়ের গোয়ানপাড়ার ঘাটে। এবং মুহূর্তে তার লুকানো ছোরাখানা বের করে ঠাকুরদাস পালের পেটখানা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরদাস পালের পেটের মধ্যে রায়বাড়ীর গুপ্তকথা যা লুকনো ছিল, যা হজম হবার নয়, তা তার চিরে-দেওয়া পেট থেকে রক্তের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে মাটির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—এর পর বীরেশ্বর রায়ও একরকম মরা মানুষ। রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"একবার মাকে হারাইয়া ভ্রান্তির মধ্যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর আবার তিনি সেই প্রেতই হইলেন! আবার সেই মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী নাকি সোফিয়াকেই তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে এবং অহরহ তাঁহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে। মাতুলও তাহাই বলিলেন। বলিলেন—মাতৃদেবী এইরূপই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার নিকট। সোফিয়া বাঈ মুসলমানের কন্যা। পেশায় সে বাঈজী। বহুজন ভজনাই তাহার জীবিকা। সেই সোফিয়া বাঈও পিতৃদেবের আচরণে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। সে পাগলাবাবার কাছে দীক্ষা লইয়া এখন হিন্দুর আচরণেই থাকে। তাহার কর্মগুলি সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কিন্তু পিতৃদেব (দেবতা বলিতে সঙ্কোচ হয়) হয় উন্মাদ, নয় জীবনকালেই প্রেতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে যাইতে ইচ্ছা হয় না, আমার ক্রোধ হয়, ঘৃণা হয়, লজ্জাও হয়। আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবীর নিন্দা এবং তাঁহাকে প্রকারান্তরে গালিগালাজই করিয়া থাকেন।

বলেন, আমার জীবন সে বিষময় করিয়া দিয়া গিয়াছে। সারাটা জীবন একটা সুন্দরী প্রস্তর নারী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আমার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তপস্বিনী-সতী-শাপভ্রষ্টা দেবীকে বিবাহ করিয়া আজ আমার এই অবস্থা। আমি ভালবাসিলাম তাহাকে, সে আত্মসমর্পণ করিল দেবতাকে। আমাকে সারাজীবন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, জীবনের একটা কণা না দিয়া, আমার হৃদয়ের ক্ষোভের তুষের স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া দেবলোকে চলিয়া গেল। আমি তুষানলে দগ্ধ হইতেছি, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইহাই সতীত্বের এবং নারীধর্মের উৎকৃষ্টতম আদর্শ।

সোফিয়া হউক বাঈজী, হউক সে সকলের চক্ষে ঘৃণিতা, পতিতা, হউক সে বিধর্মী, তথাপি সেই আমার সান্ত্বনার উৎস, সেই আমার শান্তি, সেই আমার সব।

সমাজ ইহাতে আপত্তি করিলে আমি সমাজ ছাড়িব। আত্মীয়স্বজন, এমনকি তুমি পুত্র, তুমি আপত্তি করিলে তোমাকেও পরিত্যাগ করিব। আমাকে বলিলেন—তোমার ঘৃণা হয় তুমি আসিয়ো না। ইচ্ছা না হইলে বা লজ্জাবোধ করিলে আমার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ করিয়ো না। স্বর্গে মুক্তিতে আমার লোভ নাই, কামনা নাই এবং তোমার মত দেবোত্তরভোগীও আমি নহি

যে, আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমার কলিকাতার সম্পত্তি আছে। ইহা দেবোত্তরের অন্তর্গত নহে, ইহার পত্তন করিয়াছিলেন কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য। তিনি প্রথম যৌবনে মুসলমানীকে বৈষ্ণবী করিয়া ঘর বাঁধিয়াছিলেন, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নাই; আমার পিতা একটা অজাতের মেয়েকে লইয়া তাহাকে যোগিনী বলিয়া জাহির করিয়া প্রকাশ্যে—কীর্তিহাটে রাখিয়াছিলেন। আমি সোফিয়াকে লইয়াই জীবনযাপন করিব, আমি যদৃচ্ছা জীবনযাপন করিব। ইহাতে কাহার কোন কথা শুনিব না। মদ্য আমি পান করিব। চিকিৎসকের কথাও আমি মানিব না। তাহাতে আমার যাহা হয় হইবে। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন—আবার আমি পঙ্গু হইতে পারি। হইলে যতক্ষণ অর্থ আছে, ততক্ষণ আমার সেবার কোনরূপ অভাব হইবে না। তুমি পুত্র হইয়া আমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়ো না।

তুমি তোমার শ্বশুরের পরামর্শে—তিনি ডেপুটি সাহেব, হাকিম লোক, তাঁহার পরামর্শ আইনানুসারে ভাল, তুমি জমিদারী আইন অনুসারে চালনা করিতেছ; বলিতেছ এ-যুগ নূতন যুগ। উত্তম কথা। তাহাই চল। বলিতেছ—এ-যুগে যাহারা ভদ্র, যাহারা শিক্ষিত, যাহারা অভিজাত, তাহারা আর আগের নিয়মে চলে না। তুমি তাহাই চল।

আমার কাছে আমাকে এরূপভাবে উত্যক্ত করিতে আসিয়ো না। তাহার শ্রাদ্ধে আমি যাইব না। তাহাতে তোমার মাথা হেঁট হইবে তুমি ফিরিয়া যাও।

রত্নেশ্বর রায়ের দারুণ ক্রোধ হয়েছিল। তিনি বীরেশ্বর রায়ের চেয়ে কম ক্রোধী ছিলেন না। তবু তিনি ছিলেন সংযমী এবং ছেলেবেলা থেকে জীবনের শিক্ষাও ছিল অন্যরকম। তাছাড়া জমিদারীতে আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অভিভাবকের অধীন হয়েছিলেন—যিনি ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক, তারপর পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এবং রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে মিলনের পর যতই আবেগ এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকুন, তাঁর বাল্যকালে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন, সেটা সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল মাত্র। মায়ের জীবিতকালে সে মুখ বন্ধ গর্তের সাপের মত চাপা ছিল; মায়ের মৃত্যুর পর সুযোগ পাবামাত্র তার বিষ নিশ্বাস তার মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

তিনি বাপকে মায়ের শ্রাদ্ধে বলতে এসেছিলেন। ভবানী দেবীর মুখাগ্নি করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর তখন কীর্তিহাটে। এবং তখন সরস্বতী-বউ স্বর্ণলতা চার-পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। এবং সন্তান প্রসব করে তিনি মারা যাবেন এ-কথা কেউ ভাবেওনি। চিকিৎসকেরাও না। প্রসবের তিন-চার দিন পর মারা গেলেন ভবানী দেবী, সুতরাং মৃত্যু আকস্মিক। রত্নেশ্বরের অনুপস্থিতিতে বীরেশ্বর শেষকৃত্য করেছিলেন। দশদিনে অশৌচান্তের সময় রত্নেশ্বর এসে পৌঁচেছেন, একলাই পৌঁচেছেন; সরস্বতী-বউয়ের বাপ এস-ডি-ও সাহেব ডাক্তারদের

পরামর্শমত কন্যাকে তখনকার দিনে ট্রেনে যেতে দেননি। রত্নেশ্বর একলা গিয়েছিলেন। পরে এক বছর পরে প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় রত্নেশ্বর কীর্তিহাটে চন্দনধেনুসহ দানসাগর ক্রিয়া করে সমারোহ করেছিলেন, সেই শ্রাদ্ধের সময় বাপকে বলতে এসেছিলেন যাবার জন্য। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—না। তখন তিনি আবার মদ ধরেছেন। এবং এ সম্পর্কে পিতা-পুত্রে কিছু পত্রালাপ হয়েছে। সেদিন বিস্ফোরণ হয়ে গেল। এবং সেইদিনই বীরেশ্বর রায়ের আবার নূতন করে পুরনো ব্যাধি দেখা দিল। শরীর অসুস্থ হল।

এর ছ'মাস পর তিনি মারা গেলেন। তাঁর শয্যার পাশে সোফিয়া আর মহেন্দ্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। অবশ্য নিচে এবং বাড়ীতে লোকজন কলকাতার ম্যানেজার থেকে দারোয়ান-টারোয়ান সবই ছিল।

রত্নেশ্বর এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এসে উঠেছিলেন তাঁর শ্বশুরের বাড়ীতে জোড়াসাঁকোয়—তার কারণ তিনি এসেছিলেন সস্ত্রীক। স্বর্ণলতার কোলে তখন প্রথম সন্তান। সোফিয়াকে নিয়ে যে-বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় বাস করেন, সে-বাড়ীতে তিনি এসে ওঠেননি। সেই সময় থেকেই এ-বাড়ীতে ওঠা বন্ধ করেছিলেন। রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শ্বশুরের বাড়ীতে। তখন অবশ্য অবস্থা এমন খারাপ ছিল না। ডাক্তার একজন বাড়ীতে মোতায়েন ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং কয়েক ঘণ্টা পরই মারা যান।

অবস্থা খারাপ হতেই রাত্রে গাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালের কলকাতা। পথঘাট একালের মত পিচঢালা পথ নয়। এবং জানবাজার থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত বড় রাস্তা মাত্র একটি। চিৎপুর রোড। আর একটা কলেজ স্ট্রীট-কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কিন্তু সেদিক থেকে জোড়াসাঁকো যেতে অনেক আঁকা-বাঁকা অপরিসর রাস্তা এবং সঙ্কীর্ণ গলি। দু পাশে টিমটিমে কেরোসিনের আলো। তাও দূরে-দূরে। সুতরাং পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল এবং ডাকাডাকি করে রত্নেশ্বর রায়কে তুলতেও সময় লেগেছিল। তারপরও দেরী হয়েছিল তাঁর বের হতে।

সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এসব কথা আছে। কিন্তু ঠিক এভাবে নেই। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, মিথ্যা কথা ডায়রীতে লেখেন নি। কিন্তু অন্যত্র যেভাবে তিনি তাঁর মনকে প্রকাশ করেছেন, তা এই ঘটনার ক্ষেত্রে নেই।

শুধু লিখেছেন—"উঠিয়াও একটা কারণে বাহির হইতে বিলম্ব হইল। স্বর্ণলতাকে এই রাত্রে লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে কিনা স্থির করিতে বিলম্ব হইল। অবশেষে এই শীতের রাত্রে ছোট ছেলে লইয়া যাওয়া ঠিক উচিতবোধ হইল না, অতএব আমি একাই বাহির হইলাম, বাহির হইবার সময় অঞ্জনা বলিল—আমি যাই। কারণ এ সময় অনেক সাংসারিক মঙ্গলের কাজ থাকে। ও-বাড়ীতে তো এক সেই বাঈ ছাড়া মেয়েছেলে কেউ নাই! সে সব আমিই করিব। ইহা খুবই সমীচীন মনে হইল অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সেই শীতের শেষ রাত্রে রওনা হইয়া

যখন জানবাজার আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন আমার পিতা দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ বীরেশ্বর রায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখবোধ করিলাম। অনুশোচনাও হইল। গত রাত্রে এখানে থাকিলেই হইত। না-হয় ফলটল খাইয়াই থাকিতাম। হায় এমন দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ পুরুষ, বিশালকায় বীরপুরুষ আজ চিরনিস্তব্ধ। আমার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বক্ষের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। সেই সমারোহময় পুরুষ আজ নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অথবা ইহাই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি সংসারে একা থাকিতে চাহিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি বিরাগের অন্ত ছিল না, আমি পুত্র আমার সহিত আজ এক বৎসর পত্র ভিন্ন সাক্ষাৎ করেন নাই। আজীবন এক বাঈজীকে লইয়াই জীবনাতিপাত করিলেন। ঈশ্বর মানিতেন না। কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং এবম্প্রকার মৃত্যুই তাঁহার উপযুক্ত এবং বিধাতা কর্তৃক অবধারিত ছিল।"

সুরেশ্বর একটু চুপ করলে। সুলতা বললে—রত্নেশ্বর রায় একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন সুরেশ্বর। একটা সত্যকারের ক্যারেক্টার। অত্যন্ত শক্ত মানুষ!

সুরেশ্বর বললে—হাঁ, তা ছিলেন! সে-কথা আমি আমার জবানবন্দীর মধ্যে বারবার বলেছি। সেই কারণেই যে দুটো হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তার অপরাধ বিবেচনা করতে গিয়ে সম্ভ্রমভরে পিছিয়ে এসেছি। মনে-মনে বলেছি, তোমার বিচার অন্ত যারা শুনবে, জানবে, তারা যা বলে বলুক, যা করে করুক, আমি শুধু তোমার কাজের জবানবন্দী দিয়েই খালাস।

তবে এক্ষেত্রে, তাঁর ডায়রী থেকে যা পেয়েছি, তার বাইরেও আরও কিছু আছে। সেটা জেনেছিলাম আমি রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। এক্ষুনি আমি তোমাকে বললাম—ভবানী দেবীর এই পত্রখানা পেয়েছি আমি তাঁরই কাছে। ১৯৩৭ সালেও পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি বেঁচেছিলেন।

১৮৬৩ সাল থেকে কিছুক্ষণের জন্যে ১৯৩৭ সালে এল সুলতা।

১৯৩৭ সালে যে সময় গোপাল সিংয়ের প্রপৌত্র শিবু সিং নামক ভাল ছেলেটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েও তার বাপের কাছে রায়বাড়ীর অত্যাচারে তার দুর্ধর্ষ এবং প্রবলপ্রতাপ প্রপিতামহ গোপাল সিংয়ের সর্বনাশের এবং চরম অপমানের গল্প শুনে বিপ্লবীর ধর্ম বিসর্জন দিয়ে, দেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে, সরকারী সাক্ষী হয়ে বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র, রত্নেশ্বর রায়ের পৌত্র, শক্তিহীন দেউলে জমিদার শিবেশ্বর রায়ের পুত্র—তাদের অঞ্চলের বিপ্লবী গোষ্ঠীর নায়ক অতুলেশ্বর কাকার বিরুদ্ধে এজাহার দিলে এবং নির্দোষ আমার মেজদিদিকে সুদ্ধ ধরিয়ে দিলে, সেই সময়ে এল।

নিশ্চয় মনে আছে তোমার সুলতা যে, মেজদি আমাদের অর্চনাকে বাঁচাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত রিভলবারটা নিজে নিয়ে বের ক'রে দিয়ে এই শাস্তিটা নিজে নিয়েছেন। অর্চনা তাতেও নিজেকে সংযত করতে পারে নি; শান্ত নিরীহ বৈষ্ণব প্রকৃতির বিষয়ে অনাসক্ত মানুষ

বিমলেশ্বর কাকাকে সুকৌশলে উত্তেজিত করে রায়বংশের রক্তের প্রসুপ্ত প্রচণ্ড ক্রোধকে জাগিয়ে তুলেছিল।

অর্চনা যে কথাটা বিমলেশ্বর কাকাকে বলেছিল, সেকথা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল যে, অমোঘ শক্তিতে তা আমি শুনি নি, আমি শুনেছিলাম, বিমেলশ্বর কাকার স্ত্রীর মুখ থেকে, তাতেই আমার বুকেও আগুন জলেছিল। বিমলেশ্বর কাকা বুকের জ্বালায় শিবুকে মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন। আমি সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে যাচ্ছিলাম। সকালের পর ওবাড়ী থেকে যখন বিমলেশ্বর কাকাকে ধরে নিয়ে গেল কোমরে দড়ি বেঁধে, তখন থেকেই পড়তে বসেছিলাম, খাই নি, স্নান করি নি, হুইস্কী স্পর্শ করিনি, খেয়েছিলাম কয়েক কাপ চা। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল দশটা। শীতের দিন, কীর্তিহাট গ্রামে রাত্রি দশটা কম নয়। শেয়াল ডেকে গেছে, বিবিমহলের পাশে কাঁসাইয়ের ধারে জঙ্গলে প্যাঁচা ডাকছে। প্যাঁচার ডাক বড় কর্কশ সুলতা। কলকাতায় মানুষ তুমি, নিস্তব্ধ রাত্রে পেঁচার ডাক সম্ভবত তুমি শোন নি। বিবি-মহল খুব বড় নয়, কিন্তু ছোটও নয়, বাড়ীটার মধ্যে আমি আর রঘু চাকর। রঘুও কিছুকাল কীর্তিহাটে বাস করে আর রায়বাড়ীর মহলগুলোয় ঘুরে রায়বাড়ীর মেজাজ খানিকটা পেয়েছিল। বিমলেশ্বর কাকার অপমানে সেও সেদিন দুঃখ পেয়েছিল। সেও আমাকে সেদিন খাবার কথা বিশেষ বলে নি। নিজেও খায় নি।

আমি ডায়রী পড়ছিলাম, হঠাৎ চৌদ্দ বাতির টেবিলল্যাম্পটা দপ করে নিভে গেল। সম্ভবত সন্ধ্যেবেলা থেকে জলতে জলতে গরম হয়ে গ্যাস হয়েছিল। রঘুকে আলো জ্বালবার জন্যে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই পড়েছি, ভবানী দেবীর মৃত্যুর কথা। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের ওই তিক্ত কঠিন কথাগুলির কথা। তখনও আমি ভবানী দেবীর ওই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানি না।

কি জানি কেন রত্নেশ্বর রায়ের কঠোরতা আমার এক্ষেত্রে ভাল লাগে নি। তাঁর ডায়রীর শেষ যে লাইনটা পড়েছিলাম, সেটা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন—"সংসারে ন্যায় এবং নীতিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ন্যায়কে মাথায় করিলে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে পিতাপুত্রকে পরিত্যাগ করেন, এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে। স্ত্রীর অন্যায়ে স্ত্রীকে ত্যাগ এদেশে সাধারণ ঘটনা। পিতাকে লোকে পরিত্যাগ সচরাচর করে না, তাহার কারণ বিষয় শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে পৈত্রিকই হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে রামমোহন রায়ের মত দৃঢ়চেতা পুরুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পিতাকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শের জন্য পিতৃশ্রাদ্ধে বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে অসম্মত হইয়া মাতার সহিত বিরোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমার পিতা চিরদিনই স্বেচ্ছাচারী, কোন ন্যায়, কোন ধর্মকে মান্য

করেন না। তিনি বাঈজীকে আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবী অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেন। আমার মাতাকে অভিশাপ দেন। তাঁহার প্রতি চিরদিনই আমার বিরাগ। মধ্যে বৎসর তিনেকের জন্য মাতার জন্যই তাঁহার অনাচার সহ্য করিয়াছি। কিন্তু মাতৃদেবীর অন্তে তাঁহার প্রতি পূর্ব বিরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রায়বংশে তিনি অনাচার, ব্যভিচার এবং স্বেচ্ছাচারে, অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত পুরুষ। সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত। তিনি আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দুঃখ আমার হইতেছে। কিন্তু দুঃখ হওয়া বোধহয় উচিত ছিল না। আমাকেই তাঁহার মুখাগ্নি করিতে হইল। মনে মনে বলিলাম, আমি কামনা করি 'তুমি মুক্তিলাভ কর,' কিন্তু আমি জানি, তোমার কর্মফলে তোমাকে বহু জন্মান্তর এই সকল কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।"

অন্ধকারে বেদনাহত মন নিয়েই বসেছিলাম।

রঘু বাইরের ঘরে বসে ছিল, সে ঘরের অন্ধকার দেখে ঘরে এসে ঢুকল, আমি বুঝতে পেরে বললাম—থাক আলো জ্বালতে হবে না!

ঠিক এই সময় নিচে থেকে ডাক শুনলাম, সুরেশ্বর! শুয়েছ নাকি?

কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম না। হেঁকে বললাম—কে?

—আমি জগদীশ্বর কাকা।

জগদীশ্বর কাকা? অর্চনার বাবা! খবর পেয়েছি সন্ধ্যার পর ফিরেছেন। এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন জগদীশ্বর কাকা কিসের জন্য। এসে সমস্ত খবর শুনে আর একটা সর্বনাশ বা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলেছেন না কি?

আমি তাড়াতাড়ি রঘুকে আলোটা জ্বালতে এবং ডায়রীগুলো সামলে রাখতে বলে বাইরে রঘুর ঘরে যে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল, সেটা নিয়ে নেমে গেলাম। দেখলাম, জগদীশ্বর কাকা অর্চনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। বললাম—এত রাত্রে জগদীশ্বর কাকা?

জগদীশ্বর কাকা বললেন—ওপরে চল বলছি। এসেছি এই সর্বনাশী হারামজাদীর জন্যে।

কোন প্রশ্ন করলাম না সেখানে। কারণ আমার সন্দেহ ছিল, কোন-না-কোন পুলিশের চর কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। বিমলেশ্বর কাকাকে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়া বেঁধে গ্রাম ঘুরিয়েই তাদের কাজ তারা শেষ করেছে, এ কথা অন্ততঃ আমার বিশ্বাস হয় নি।

উপরের ঘরে এসেই জগদীশ্বর কাকা অর্চনাকে ছেড়ে দিলেন এবং কঠোর কণ্ঠে বললেন—চুপ করে দাঁড়া হারামজাদী। চু-প করে!

তারপর আমাকে বললেন—তুমি তো শুনেছ সব!

জগদীশ্বর কাকার শরীর থেকে গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছিল।

আমি বুঝলাম কি বলছেন তিনি, বললাম—সবই তো আমার চোখের সামনে ঘটেছে। আমি তো ছিলাম!

—ন্যাকা সেজো না হে! বিমলের স্ত্রী, বর্ধমানের বউমা তোমাকে সব বলে নি? হারামজাদী পোড়ারমুখী যা সব বলত বিমলকে, সেসব কথা পুলিশের কাছে বলতে তুমি তাকে বারণ কর নি?

স্বীকার করলাম। বললাম—হ্যাঁ, বলেছিলাম। না-হলে যে আজ ওকেও ধরে নিয়ে যেত জগদীশ্বর কাকা!

—যেতো, আপদ যেতো! আমি বাঁচতাম।

—এসব আপনি কি বলছেন জগদীশ কাকা!

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।—বলছি সাধে! তুমি জান, আমার শালার শালা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর, তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করে এসেছি, তারা আসবে, কথা পাকা হবে। দিনও ঠিক করে এসেছি; এই মাঘ মাসে। এখন হবে কি? করব কি? বলতে পার?

হঠাৎ কান্না থামিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন, বললেন—আর হারামজাদী আমাকে মুখের ওপর বলে কি জান? ওর এতবড় আস্পর্ধা। এতবড় বুকের পাটা, ঘাড়ের ওপর তিনটে মাথা—বলে ওখানে আমি বিয়ে করব না। জোর করলে আমি বলব—আমি এসবের ভেতরে আছি। নয়তো আমি বিষ খাব। নয় গলায় দড়ি দোব।

এসব কথা আমি জানতাম। অর্চনা সেদিন আমায় বলেছিল। আমি বললাম—একটা কথা বলব কাকা?

মুখভঙ্গী করে আমাকে বললেন—তুমি বিয়ের ভার নেবে তো। যা খরচ করতে হয় তুমি করবে! সে কথা ও আমাকে বলেছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, সে কথা আমি বলেছি ওকে। আমি কালই যেতাম আপনার কাছে কথাটা বলবার জন্যে।

জগদীশ কাকা আবার বদলালেন। এবার সংযত অথচ শাসনের সুরে বললেন—হ্যাঁ। তাই আমি জানতে এসেছি। ও আমাকে বললে। বললে, আমার বিয়ের কথা নিয়ে তোমরা ভেবো না। সুরেশ্বরদা বলেছে আমাকে সে পাত্র ঠিক করে বিয়ে দেবে। যা খরচ হয় সে করবে।

—হ্যাঁ। তা করব আমি। আমি সে কথা আপনার সামনেই বলছি।

—না। সামনে বললে হবে না। আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আমি গাঁজা খাই, মদ খাই, যাই হই, আমি তোমার কাকা, গুরুজন, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আর তিন সত্যি কর।

তাই বললাম। এবং পায়ে হাত দিয়েও শপথ করলাম। তখন আবার বললেন—শুধু ও বললে হবে না। স্বজাতে, স্বঘরে মানে পালটি ঘরে বিয়ে দিতে হবে। তুমি আধা বেহ্ম, আমি জানি। তুমি যে লেখাপড়া-জানা যার-তার ঘরের ছেলে এনে বলবে এর চেয়ে ভাল পাত্র

আর হয় না, সে হবে না।

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে কি বলব সুলতা, আমি এই অধঃপতিত রায়বংশের সন্তানটির কথায় রাগ করতেও পারি নি, ঘৃণা করতেও সঙ্কোচ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল কাঁদি। এক কোণে অর্চনা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটো হয়ে উঠেছে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। ধুক ধুক করে জ্বলছে। সে যেন এখনি ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়বে বলে মনে হল।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। বললাম—তাই হবে!

জগদীশ্বর কাকা বললেন—শোন, এই রায়বংশ সিদ্ধপুরুষের বংশ। অর্চনাকে সবাই বলে, ও হল সতীবউরাণী। এই বংশে ফিরে এসে জন্মেছেন। সতীবউরাণীর বাবা কালীসিদ্ধ মহাসাধক ছিলেন। ওকে সৎ বংশে, সৎ পাত্রে না দিলে সর্বনাশ হবে তোমার।

অর্চনা এবার সত্যই ফেটে পড়ল। চিৎকার করে উঠল, বাবা!

জগদীশ্বর রায় দুরন্ত ক্রোধী; গাঁজা, মদ খেয়ে প্রায় বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁর বাপ, আমার ঠাকুরদা শিবেশ্বরের সমৃদ্ধি এবং জবরদস্তির আমলে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, ছেলেবেলা থেকে দুরন্ত, দুর্দান্ত। এক পুলিশ আর গভর্ণমেণ্ট ছাড়া কাউকে গ্রাহ্য করেন না। সেই তিনি পর্যন্ত চমকে উঠলেন তার সে চিৎকারে।

তার দিকে তাকিয়ে তাকে তিনি ধমক দিতে পারলেন না, সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অর্চনা বললে—তুমি এবার থামবে কিনা বল?

অপ্রতিভের মত জগদীশ্বর কাকা বললেন—থামব?

—হ্যাঁ থামবে। এবার তুমি যা বলবে আমি জানি। বিয়েতে যে টাকা সুরেশ্বরদা খরচ করবে, সেই টাকাটা তুমি নিজে চাইবে। বলবে—তার থেকে সুরেশ্বর, টাকাটা তুমি দাও, আমি দেখে-শুনে ভাল পাত্রেই ওর বিয়ে দিই। আমি জানি! তা হবে না। তুমি বাড়ী চল!

আমি বললাম—অর্চনা চুপ কর। এসব কথা বলতে নেই। উনিই বা তা বলবেন কেন?

অর্চনা বলে উঠল—বলবেন। বলবেন। বলবেন! আমি জানি!

জগদীশ্বর কাকা মাথা হেঁট করে রইলেন।

অকস্মাৎ কোন চোরের লুকানো চোরাইমাল বেরিয়ে পড়লে, যেমন তার মুখের চেহারা হয়, ঠিক তাই হয়ে গেল।

অর্চনা বললে—রঘু, তুই আমাকে আলো নিয়ে বড় জেঠাইমার কাছে দিয়ে আয়।

বড় জেঠাইমা—শিবেশ্বরের বড় ছেলে—ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী!

খুড়ীমা বিচিত্র মানুষ। আজও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হয়েছে। তাঁর

বড় ছেলে বিচিত্র চরিত্র মধুরভাষী আমার ব্রজদা, ব্রজেশ্বর। এবং তার সেজ ছেলে সেই দানবটি, যে সুখেশ্বর কাকাকে হত্যা করেছিল।

লোকে বলে এই দুই প্রকৃতিই তাঁর মধ্যে আছে। খুব বড় ঘরের কন্যা। পড়েছিলেনও ভালঘরে। ব্রজদার মত মিষ্ট কথা। আবার রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু একটা বড় গুণ আছে, কেউ আশ্রয় চাইলে সেখানে তিনি আশ্চর্য মানুষ। তাঁর নিজের সন্তানের চেয়েও বড় মমতায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। জগদীশ্বর কাকা বড় ভাই ধনেশ্বরকেও ভয় করেন না। কিন্তু বড় বউঠাকরুণ—"কি হচ্ছে ঠাকুরপো"! বলে বের হলে, আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাড়া পেলেই সরে পড়েন!

কথাটা বলেই হনহন করে চলে গেল অর্চনা

* * *

পরের দিন থেকে সুলতা, আমি অর্চনার বিয়ের জন্যেই সবকিছু ফেলে দিলাম। ওই বিয়ের জন্যেই উঠে-পড়ে লাগলাম।

সেদিন আমি বসে চিঠি লিখছিলাম। লিখছিলাম কলকাতায় জানবাজারের ম্যানেজারকে, লিখছিলাম—একজন বিচক্ষণ ঘটক অবিলম্বে যেন পাঠিয়ে দেন এখানে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এমন সময় খুড়ীমা এলেন, অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে খুড়ীমা আমার সামনে এই প্রথম এলেন বিবিমহলে। ভিতর মহলে আমি অনেকবার গেছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কদাচ কখনও। এবং আমাকে দেখবামাত্র সরে যেতেন। কখনও আমি আগে-ভাগে কথা কইলে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চলে যেতেন ভিতর মহলে।

আমি এগিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করে নিয়ে এলাম। প্রণাম করলাম। অন্য সময় তিনি পায়ে হাত দিতে দিতেন না। বলতেন—ছুঁয়ো না বাবা, তোমাদের কাপড়-চোপড় শুদ্ধ নয়, আমি পুজোর কাপড় পরে আছি! মাটিতে প্রণাম কর।

তাঁর পুজোর কাপড় আগে দেখেছিলাম, একখানা অতিজীর্ণ লালপেড়ে গরদের শাড়ী। ব্রজদা বউ নিয়ে মাস ছয়েক আগে যখন এসেছিল, তখন একখানা নতুন দামী গরদের শাড়ী দিয়েছিল, আজ সেইখানা পরে এসেছিলেন।

তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করলাম মাটিতে হাত দিয়ে। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি বাবা। এবার ব্রজ এসে তোমার অনেক সুখ্যাত করে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজকে তো আমি জানি চিনি। ও যত মন্দ, তত ভাল। ভালও বাসতে পারে, কিন্তু ওর স্বার্থ যেখানে, সেখানে সে চোর-জোচ্চোর সব। আমি ভেবেছিলাম, তুমি কলকাতায় বড়লোকী করতে, ও তোমার মোসাহেবী করত। তাই প্রশংসা করছে। তুমিও হয় তো রায়বংশের ছেলেদের মত। তোমার বাপ আমার ভাসুর। তার

কীর্তিও শুনেছি। তাই 'এলে-গেলে-খেলে-নিলে ভাল আছ, মঙ্গল হোক, এই বলেই কথা সেরেছি। কাল অর্চনা গিয়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল। বললে আমাকে সব। ন-বউ, বিমলেশ্বর ঠাকুরপোর বউও এসেছিল, ওর কাছেও সব শুনলাম। তার আগে ঘরে পুরে যে মারটা অর্চনাকে মেরেছে সেজঠাকুরপো, তাও শুনেছিলাম। সব শুনে তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা। যে সঙ্কল্প করেছ, তা তুমি যত শিগগির হয় করে ফেল! পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

সুলতা, আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ধনেশ্বর কাকার মত নাটুকে চরিত্র, ভণ্ড তান্ত্রিকের স্ত্রীর এমন কথা শুনে। ইনিই মিথ্যেবাদী, মিষ্টমুখ ব্রজদার মা, ইনিই দৈত্যের মত পশুচরিত্র ছেলেটার মা। এঁকেই সারা রায়বাড়ীতে প্রতিটি জন বলে, মা চামুণ্ডা।

বললাম—আমি এক্ষুনি চিঠি লিখছিলাম খুড়ীমা।

—কোথায় লিখছিলে বাবা? জানাশুনো কেউ?

—না: কলকাতায় লিখছি, ওখানকার ম্যানেজারকে, একজন ঘটক পাঠাবার জন্যে।

খুড়ীমা বললেন—তা ভালই করছ বাবা। তাও লেখ। তবে আমি একটি পাত্রের কথা বলতে এসেছি, তুমি চেষ্টা করে দেখ না। জানা ঘর; বলতে গেলে আমাদের আপনার ঘর; তবে বিষয় তো বিষ বাবা। বিষয়ের ঝগড়ায় অতি আপনার হয়েও পর। এক রকম তিনপুরুষ মুখ দেখাদেখি নেই।

শঙ্কিত হয়েই বললাম—বলুন।

শঙ্কা হল সুলতা, যে, রায়বংশের যারা তারাও আজ মহাকাল প্রভুর গদার ঘায়ে ভগ্ন উরু দুর্যোধনের মত সংসার দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। অশ্বত্থমাও নেই এ-যুগে, যে সে পঞ্চ-পাণ্ডবের বংশধরদের মুণ্ড এনে দেবে। হর্ষ বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু এ দুর্যোধনদের সবারই মৃত্যু হবে বিষাদে।

খুড়ীমা বললেন—আমার দাদাশ্বশুর রায়বাহাদুরের বোন ছিল জান তো। ফন্নপুন্না দিদিশাশুড়ী। রায়বাহাদুর তো এ বংশে পুষ্যিপুত্তুর! কিন্তু সতীবউরাণীর কাশীতে গিয়ে কন্যা হল। কন্যা হয়েই মারা গেলেন। সেই কন্যা ফন্নপুন্না দেবীর বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। বিয়ের পর শ্বশুররা ছাড়বে কেন? মামলা করলে তারা। দানপত্তর নাকচ হবে। শেষ মিটমাট করে দিলেন বিমলাকান্ত চাটুজ্যেমশায়, ফিরেশ্বর রায়ের ভগ্নীপতি। পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলকাতায় জমি আর তাঁর নিজের সম্পত্তি দিয়ে। মামলা মিটল, কিন্তু মানের মামলা মিটল না। ভাই-বোনে সম্পর্কই মুছে গেল। তাই শুধু নয়, ফন্নপুন্না ঠাকুরুনের স্বামী রাগের বশে আর একটা বিয়ে করলেন। ভাই মানে রায়বাহাদুর তত্ত্ব পাঠালে ফন্নপুন্না ঠাকুমার শ্বশুররা ফিরিয়ে দিতেন। কখনও আসতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলে নিয়ে ঠাকরুণ স্বামী-ভিন্ন হয়ে গেলেন। টাকার তাঁর অভাব ছিল না। বাপের বাড়ীর পঞ্চাশ হাজার

টাকা। কলকাতায় জমি। সেই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ আজও বেঁচে আছেন। পঁচাত্তর-আশী বছর বয়স। ছেলে নেই। নাতিদের দুজন মারা গিয়েছে। একজন আছে। বড় নাতির একটি ছেলে আছে। বাবা আমার মেয়ে বড় হয়েছে—প্রতিমা। তা আমি চেষ্টা করেছিলাম। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ছিল তখন। তা এ বাড়ীর নাম শুনে রাজী তিনি হয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা হয় নি। ওরা মস্ত বড়লোক। জমিদার তো নয়। ওরা সব কেউ উকীল, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ ডেপুটী এই রকম বংশ। তা একবার তার কাছে তুমি নিজে গিয়ে পড় না। টাকা তো তুমি দেবে। আর এ মেয়েটাকে সবাই বলে সতীবউ ঠাকরুন ফিরে এসেছে। যদি ঐ কথাটা তুমি বল তবে হয় তো রাজীও হতে পারেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুমাও কথাটা জানেন। হয় তো আগ্রহ করেই নেবেন।

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা দেবীর নাম আমি বাবার কাছে শুনেছি। আমার বাবা সাহেব মানুষ—মা ছিলেন সে কালের আধুনিকা। তবুও তাঁরা বিজয়ার পর একবার প্রণাম করতে যেতেন। তার কারণ ছিল। অন্নপূর্ণা দেবী আর রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বর এক বয়সী। মাস কয়েকের ছোট বড়।

অন্নপূর্ণা দেবী মানুষ হয়েছিলেন বিমলাকান্তের কাছে, কাশীতে, আর দেবেশ্বর বড় হয়েছিলেন কলকাতায়। জানবাজারের এই বাড়ীতে রত্নেশ্বর পাকাপোক্ত এস্টাব্লিশমেণ্ট করেছিলেন। প্রথম প্রথম জানবাজারের বাড়ীতেই থাকতেন, বছর দুয়েক ছিলেন, ছেলে পড়ত কলকাতার ইস্কুলে, আর তাদের সুখ-দুঃখ দেখবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন ঠাকুরদাস পালকে। লেখাপড়া শেখবার জন্যে সেকালের গ্রাজুয়েট মাস্টার নিযুক্ত করেছিলেন। তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া শেখাবার ব্যবস্থা, ডন-বৈঠক শেখাবার জন্য ছিল একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। পূজোর ছুটিতে, গরমের ছুটিতে যেতেন কীর্তিহাট। ওদিকে কাশী থেকে আসতেন অন্নপূর্ণাকে নিয়ে সস্ত্রীক বিমলাকান্ত। গোটা একটা মাস কীর্তিহাটের রাজত্বে রাজপুত্র এবং রাজকন্যা—সহোদর-সহোদরার প্রীতিতে পিসী আর ভাইপো ছুটোছুটি করতেন, হাতী চড়ে বেড়াতেন, পূজোর সময় আশ্বিন-কার্তিক মাসে ভরা কাঁসাইয়ে বজরায় ঘুরতেন। গোয়ানপাড়ায় যেতেন।

দুর্গাপূজোর পর কালীপূজো—রায়বাড়ীর প্রধান উৎসব। সে-উৎসবে—সেকালে তিন-চারদিন উৎসবে—পাঁচ হাজার টাকা খরচ একবারে বাজেটে নির্দিষ্ট করা ছিল। কম কখনও হত না। বরং বেশীই হত। তাছাড়া সরস্বতী-বউরাণী বা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের অথবা বিমলাকান্তের মানসিক পূজোর খরচ তাঁরা আলাদা দিতেন।

কালীপূজোয় দেবেশ্বর অন্নপূর্ণা পাশাপাশি যাত্রার আসরে বসত। নিয়ম ছিল রায়বংশের যাঁরা, তাঁরা বসতেন চেয়ারে, আর বসতেন অতিথি-অভ্যাগত। রত্নেশ্বর রায়ের শ্বশুরবাড়ীর লোক। জেলার দু-চারজন হাকিম। তার সঙ্গে দারোগা-ইন্সপেক্টর, সব-রেজিস্ট্রার আর দু'-চারজন বন্ধু-বান্ধব। তার মধ্যে অন্নপূর্ণা আর দেবেশ্বর ঠিক মাঝখানে বসতেন দুখানা

চেয়ারে।

বিসর্জন ছিল না। পাষাণময়ী কালী। তবু বিসর্জনের রাত্রে বাজি পুড়ত। তারও অঙ্ক কখনও দু'শোর নিচে নামেনি। ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। সেখানেও এইসব অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য একটা চাঁদোয়া হত। তার নিচে বসতেন এইসব লোকেরাই। সেখানেও অন্নপূর্ণা দেবেশ্বরের আসন ছিল সামনের সারিতে পাশাপাশি। আর একটা ঘটনা কয়েক বছরই ঘটেছিল; সেটা ভাই-দ্বিতীয়ার দিন। দেবেশ্বরের বোন ছিল না। রত্নেশ্বরকে বোন হিসেবে ফোঁটা দিতেন অন্নপূর্ণা দেবী। তাই দেখে দেবেশ্বর কাঁদতেন—আমি ফোঁটা নেব।

গ্রাম-সম্পর্কের বোন বের করতে দেরী হয়নি। কিন্তু তা না, দেবেশ্বরের আব্দার—ওই অন্নপিসীর কাছে ফোঁটা নেব।

অন্নপূর্ণাও ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতেন—আমি দেবু ভাইপোকে ফোঁটা দেব।

এদের সঙ্গে আর একজন অহরহ ঘুরত সুলতা। তাঁর নাম হল—গোপাল পাল, দেবেশ্বরের ঠাকুরদাস জ্যাঠামশায়ের ছেলে।

তাই খুড়ীমা মানে ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী আমাকে বললেন—তুমি নিজে যাও বাবা, তিনি নিজে আজও বেঁচে, তোমার কথা রাখবেন বোধহয়। অর্চনার একখানা ফটো নিয়ে যেয়ো, তাতে কাজ দেবে। তাঁর মায়ের অয়েল পেন্টিং তাঁর কাছে আছে। অর্চনার সঙ্গে মিল দেখলে মন তাঁর নরম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজছিল। সুলতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে দশটা। ওদিকের খাবারঘরে টেবিলের উপর বাসনপত্রের ঠুংঠাং শব্দে হচ্ছে। অর্চনার গলা পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত বাসন সাজানো হচ্ছে। খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

সুরেশ্বর বললে—এখন এখানেই ছেদ টানতে হবে হয়তো। ১৯৩৭ সালে সেদিন মেজতরফের বড় খুড়ীমার একটা কথা বলেই ছেদটা টানি সুলতা। তাঁকে আমার বড় ভাল লাগল। বললাম—এ বাড়ীতে এলেন খুড়ীমা, কিছু খাবেন না?

হাসলেন তিনি। বললেন—খাব না কেন বাবা। তবে তোমার রঘুর হাতে তো খাব না।

অর্চনা এতক্ষণ আমাদের পানে পিছন ফিরে কাঁসাইয়ের ধারের বারান্দার ঠিক দরজাটার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বললে—আমি চা করে আনব জ্যেঠাইমা।

—তা আন। কিন্তু এত বেলায় চা কেন? সরবৎ করে আন।

—শীতের দিনে সরবৎ খাবে?

—তা হলে চা করেই আন্। তোরাও খাবি।

অর্চনা চলে গেল। খুড়ীমা এবার কথা বন্ধ করে উঠে চারিদিক ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন—জান বাবা সুরেশ্বর, এই বিবিমহলে আমি আজ প্রায় ত্রিশ বছর আসি নি। এসে-

ছিলাম সেই বিয়ের পর—কনে-বউ আমি তখন, তের পার হয়ে চৌদ্দতে পড়েছি। তখন আর একরকম ছিল। এমন সুন্দর ছিল না। তোমার বাবা আমার ভাসুর। কিন্তু তোমার কাকার বিয়ে আগে হয়েছিল। তোমার বাবা বিয়ে করলেন, ক'রে এখানকার ভেতর মহলে তোমাদের অংশ আর বিবিমহল একরকম নতুন করে গড়লেন। তখন থেকে আর ঢুকি নি।

বলে হাসলেন। সে হাসি ঠিক সহজ হাসি নয়। তার অর্থ ঠিক হাসি নয়। তার মধ্যে অনেক কিছু ছিল।

সুরেশ্বর বললে—আমি ঠিক বুঝিনি। তাই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম—কেন খুড়ীমা? সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়ল যে, বাবার মৃত্যুর পর যখন প্রথম মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম বাবার শ্রাদ্ধ করতে, তখন খুড়ীমা এ বাড়ীতে আসেন নি। তাঁর সঙ্গে মা দেখা করে এসেছিলেন ও-বাড়ীতে গিয়ে, আমিও মার সঙ্গে ছিলাম। শুনেছিলাম মেজঠাকুমা বলেছিলেন—"বড়বউমার কথা ছেড়ে দাও মা, বড় জমিদারবাড়ীর মেয়ে, অবস্থাহীন হয়েছে কিন্তু দম্ভ যায় নি। চব্বিশঘণ্টা দম্ভে ফেটে পড়ছে। মা, ধনেশ্বরকে ভয় করে এবাড়ীর সবাই। জগদীশ্বর তো সারা গাঁয়ের লোকের কাছে বাঘ ভালুকের মত। কিন্তু বড়বউমার কাছে সব জুজু। মন হ'ল তো মা—দেবতা। আর মেজাজ বেগড়াল তো মহিষমর্দ্দিনী!

আমার প্রশ্ন শুনে খুড়ীমা চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আমার বাবা এবং মায়ের অয়েল পেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এ ছবি তোমার বাবার একটু বেশী বয়সের ছবি। বিয়েই তো করেছিলেন সাতাস বছর পার ক'রে।

বললাম—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, বিশ একুশ বছর বয়সের সে রূপ এতে নেই। এতে ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি রয়েছে। গোঁফ সুচলো ক'রে পাকানো, যেন ভারিক্কি মানুষ। মায়ের তোমার পূর্ণ যুবতী বয়স। বোধহয় এর থেকে ভালো চেহারা কখনও হয় নি। বিশ একুশ বছরে তোমার বাবার সে রূপ ভোলবার নয় বাবা। আমার ঠাকুমা দেখে বলেছিলেন—এ যে কন্দর্প লো!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি দেখেছিলেন?

সলজ্জ হেসে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খুড়ীমা বললেন—দেখেছি বই কি বাবা। না হলে আর বলছি কি ক'রে? আমার বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন বেড়াতে। উনিই তো আমার বিয়ের ঘটক বাবা।

আমি কৌতুকবোধ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম সুলতা—তাই নাকি! কই শুনিনি তো?

—শুনবে কি ক'রে বল। একথা তো বেশী কেউ জানত না!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমার তখন বয়স তেরো চলছে। গোবরডাঙ্গার

মুখুজ্জেবাড়ীর দৌহিত্রে শরীক হলেন বাপ আর গ'ড়ের বাঁড়ুজ্জেবাড়ীর মেয়ে হলেন আমার মা। দুদিক থেকে সম্পত্তি পেয়ে বাবা আমার কেষ্টবিষ্টু লোক। চাল-চলন একেবারে রাজারাজড়ার মত। আর আমার রূপ ছিল বাবা। তের বছর বয়সে আমার রূপের খ্যাতি রটেছিল। সম্বন্ধ আপনি আসছিল। বাপের বড় আদুরে মেয়ে ছিলাম আমি। রাগলে জ্ঞান থাকত না। আমাদের বাগান ছিল খুব ভাল। সাবু গাছ, হরেক রকমের পাম গাছ, অর্কিড পাতাবাহার থেকে গোলাপ যুঁই বেল, জবা, চামেলী, গন্ধরাজ, চাঁপা—কি গাছ ছিল না। তার মধ্যে গোটা কয়েক মতিয়াবেলা ছিল, তার ফুল হত এই বড় বড় আর কুঁড়িগুলো হত বড় বড় মুক্তোর মত। ঠাকুমা শিবপূজো করাতেন। আমি মতিয়াবেলার কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথে পরাতাম। কিন্তু পাড়ার সব গেরস্তঘরে মেয়েরা খুব ভোরে উঠে এসে ফুল চুরি করে নিয়ে পালাত। আমার বাতিক ছিল এদের পাকড়ে খুব বকা-ঝকা করে তারপর মালীকে ডেকে ফুল দিতে বলতাম। তারা নিয়ে যেত। ওটা আমার স্বভাব ছিল। এখনও আছে। কেউ গরীব এসে কাপড় চাইলে প্রথম খানিকটা খুব বকতাম, তারপর তারা যখন চলে যেতে চাইত তখন ডেকে কাপড় দিতাম।

একদিন বাবা, ভোরে উঠে এমনি কতকগুলো মেয়েকে ধরে বকাঝকা করছি, হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের পাঁচীলের ওপার থেকে একখানা হাত কেউ তুলে মার্শাল নীল গোলাপের লতার একটা ডাল আস্তে আস্তে নোয়াচ্ছে। মস্তবড় মার্শাল নীলের লতা। আর ফুলগুলো খুব ভাল।

আমি মালীকে বললাম—দেখেছিস ?

সে বললে—হ্যাঁ।

বললাম—আস্তে আস্তে যা। গিয়ে দু হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরবি হাতখানা। তারপর দেখছি আমি। যা।

মালী গিয়ে খপ করে চেপে ধরলে হাতখানা।

তারপর কি কথা হ'ল মালীর সঙ্গে, মালী হাত ছেড়ে দিলে।

আমার রাগ হ'ল, বললাম—হাত যে ছেড়ে দিলি হারামজাদা !

মালী বললে—খুব একজন বড়বাবু দিদিমণি—

—যেই হোক। ফুলচুরি করছে সে চোর। তুই কেন ছাড়লি তাকে ?

মালী বললে—বাবু আসছে দিদিমণি। বললে—আরে হাত ছাড়। আমি হাতটা এখুনি টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারি। তোমার থেকে আমার জোর বেশী। ছেড়ে দাও, আমি ফুল তুলেছি, তা যখন মালিকের আপত্তি, তখন আমি নিজেই যাচ্ছি তাঁর সামনে। ওই উনি আসছে। ওই ফটকে দাঁড়িয়েছে। বাবা, তোমার বাবাকে দূর থেকে দেখেই আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম। একেবারে সাক্ষাৎ রাজপুত্র। তোমাদের বংশের লম্বা তো সবাই। আর

তেমনি রূপ। তখন ফুনফুনে দাড়ি বলে দাড়ি কামান। গোঁফ সত্ত গজিয়েছে, আর যেমন পোশাক তেমনি কেতাদুরস্ত। দারোয়ানকে বলে তিনি ফটকের ভেতরে ঢুকলেন, তাঁর হাতে তিন চারটে মার্শাল নীল গোলাপ।

বাবা, আমার লজ্জার সীমা রইল না, আমি একেবারে দে ছুট; বাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাজির। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা উঠেছে আর উঠেছেন ঠাকুমা। আমাকে দেখে বললেন—কি লা, এমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

—ছুট্টে পালিয়ে এসেছি ঠাকুমা।

—কেন কি হ'ল?

আমি বললাম বাবা। ঠাকুমার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, খুব ভালবাসতেন। এমন সময় মালী এসে বললে—উ বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি বললাম—যেতে বলে দে।

ঠাকুমা বললেন—না। আমি যাচ্চি দাঁড়া। দেখি নবাবনন্দিনী আমার আবার কাকে কি বলে এলেন। কি ফ্যাসাদ বাধালেন।

ঠাকুমা খিড়কীর দরজা দিয়ে বাগানে গেলেন। আমি দরজার আড়ে লুকিয়ে রইলাম।

একটু থামলেন খুড়ীমা। তারপর হেসে ওই বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হাসি বাবা। হো-হো-হো ক'রে হেসে একেবারে সারা। তখন ঠাকুমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। ঠাকুমা পরিচয় পেয়েছেন—একেবারে অপ্রস্তুতের শেষ। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর বড় রায়মশায়ের ছোট ছেলে, বি-এ পাশ করেছে অনার্স নিয়ে। এম-এ পড়ছে। এসেছে গোবরডাঙ্গার মূল মুখুজ্জেবাড়ীতে, এসেছেন শীকারের নেমন্তন্নে। গোবরডাঙ্গার মুখুজ্জেবাড়ীতে শীকারের ধূম ছিল। গোটা বাংলাদেশের লোকে জানে। জ্ঞানদা মুখুজ্জে তখন নতুন উঠেছেন, ভারী নাম। ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গোবরডাঙ্গা এসে ভোরবেলা উঠে একলা বেরিয়ে আমাদের বাগানের ধারে মার্শাল নীলের ঝুঁকেপড়া ডাল নুইয়ে ফুল তুলছিলেন। তাঁকেই আমি মালী দিয়ে পাকড়েছি। কি লজ্জা বল তো! ঠাকুমা এসে আমাকে টেনে ধরে নিয়ে গেলেন, বললেন—এই এনেছি ভাই, এ-বাড়ীর পুলিশসাহেবকে। এ মেয়ে ভাই, পুলিশসাহেব। তা ধরবি তো ধর রাজার ছেলেকে! আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার বাবা খুব হাসলেন। বাবা এলেন। আমাকেই চা জলখাবার আনতে হল। খেয়ে বিদায় নিয়ে এলেন।

তারপর—।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—এরপর বাবা তোমার ঠাকুরদার কাছে এলেন বিয়ের কথা নিয়ে। তোমার ঠাকুরদা তো সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন, বললেন—যোগেশ্বরের বিয়ে এখন তো দেবই না। এম-এ পাশ করার পর ভাবব। আর বিয়ে ও করবে নিজে দেখে।

বড়ছেলের বিয়ে দিয়েছি জনাইয়ে। তাতে ছেলে সুখী হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর চাপে অন্যরকম হয়ে গেল। যা ঠিক আমার পছন্দ নয়। যোগেশ্বরকে আমি অন্যরকম তৈরী করব। হয়তো বিলেত পাঠাব। এখন থেকে বিয়ে দিয়ে ওর হাতপা বেঁধে পঙ্গু করে দেব না। আর আমার ইচ্ছে, ওর বউ হয় লেখাপড়া জানা মেয়ে। আপনারা মেয়ে তেরো বছরের হতেই ব্যস্ত হয়েছেন বিয়ে দেবার জন্যে। সুতরাং মতে মিলবে না। আপনারা বড়লোক, মানী লোক, মেয়ে সুন্দরী, আপনারা চেষ্টা করুন, যোগেশ্বরের থেকে ভাল পাত্র মিলবে।

বাবা ফিরে এলেন মুখ ভার ক'রে। ঠাকুমাকে বললেন—তুমি পাঠালে জোর ক'রে, এখন হ'ল তো!

তারপরই বাবা, তোমার বাবা চিঠি দিলেন, তোমার খুড়োমশায়ের সন্ধান দিয়ে। আমার শ্বশুর তখন কীর্তিহাটে দেবোত্তরের ভার নিয়ে রাজত্বি করছেন জমিদারদের বনেদী চালে। তোমার খুড়ো তখন এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে কলকাতায় পড়ছেন। পূজো-আহ্নিকে খুব ঝোঁক। চেহারাতে তিনি তোমার বাপ থেকে উজ্জ্বলই ছিলেন। লিখলেন—আমার খুড়তুতো ভাই আছে, বড়কাকার বড়ছেলে, লেখাপড়া করছে, হিন্দুয়ানীতে ঝোঁক আছে। সুন্দরী কন্যা খুঁজছেন। আপনি যদি পছন্দ মনে করেন তবে চেষ্টা করুন, আমার বিশ্বাস হয়ে যাবে। আমি আমার ভাইকে বলেছি আপনার মেয়ের রূপের কথা। আর ভবিষ্যতে রায়বাড়ীতে সে উপযুক্ত গৃহিণী হতে পারবে।

ঠাকুমা বললেন—তাই কর রমানাথ। আমার বাবার নাম রমানাথ বাঁড়ুজ্জে। অন্তত রায়বাড়ীর শরীক হয়ে থাক আমাদের মেয়ে। বড়ভাই ফিরিয়ে দিয়েছে, মেজভাইয়ের পুত্রবধূ হয়ে থাক, জেদটা তাতে আমার বজায় থাকবে।

তাই হ'ল—মেজতরফের বড়বউ হয়ে এলাম। আমার টানে তোমার কাকা লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ী এসে বসলেন। জুড়ি হাঁকালেন, প্রজাশাসন করলেন, থিয়েটার করলেন, মদ ধরলেন। আমার কোলে দু বছর অন্তর ওই সব ছেলের পাল এল। বড় ব্রজ, তাকে জান; সেজটা যা ক'রেছে তা জান। ওদিকে তোমার বাপের নামে দেশ ছাইল। তবু উনি বলতেন —খবরের কাগজওয়ালা। বাঁধা মাইনের চাকর। মাতাল। ফিরিঙ্গী মেয়ে নিয়ে ঘোরে। তারপর যখন বিয়ে ক'রে এখানে তোমার মাকে নিয়ে এলেন, তখন মেজতরফের দেনা হয়েছে, সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে, কিনছে তোমার বাপ আর জ্যেঠা। বাবা, তখন থেকে আমার রাগ হল। মনে হ'ল আমার সর্বনাশের হেতু ওই তোমার বাপ। সেদিন থেকে বিবিমহল আমি মাড়াই নি। তোমার কথা শুনেছিলাম, মেলা টাকা তোমার। ছবি আঁক। আর টাকা ওড়াও। এখানকার চালচলন তাও ভাল লাগেনি। আমার ছেলেরা, ব্রজ বাদে, সবাই তোমার নামে অনেক কথা বলে। কিন্তু কাল অর্চনা গিয়ে যখন পড়ল আমার পায়ে আর তোমার কথা বললে, তখন চোখ খুলল। ভাবলাম ভালই হয়েছে। ছেলে তো মা বাপ দুয়ের গুণেই হয়।

আমার গর্ভে তুমি হলে তুমি এমন হতে না। অন্যরকম হ'তে। তোমার মা লেখাপড়া জানা মেয়ে, বড় উকীলের ভাগ্নী। তার গুণ পেয়েই না তুমি এমনি। আজ অর্চনার বিয়ের সব ভার নিতে চেয়েছ। দেবোত্তরকে বাঁচিয়ে রেখেছ। ছোটমা—আমার শাশুড়ীর জন্যে এত করেছ। ভালই হয়েছে। সারারাত ভেবে সকালে অর্চনাকে বললাম—চলতো সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। কথা বলে আসি। তা মনটা জুড়লো বাবা।

আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে শুনছিলাম—দাঁড়িয়েই রইলাম।

অর্চনা চা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন—পান দেখ দেখি? সুরেশ্বরের এখানে পানের কারবার আছে না—নেই? কলকাতায় মানুষ আজকালকার ছেলে সিগারেট খায়, মদও হয় তো খায় কিন্তু পান তো ওরা খায় না। বলে খুড়ীমা হাসলেন।

অর্চনা বললে—দোক্তা আনতে রঘুকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। পান এখানে আছে। জর্দাও আছে, তা জর্দায় তো তোমার হবে না! সুরোদার সেদিকে ত্রুটি নেই। সায়েবী কেতা থেকে দেশী কেতার বন্দোবস্তের ত্রুটি নেই।

খুড়ীমা বললেন—তা তো এ-বাড়ীর চিরকালের রেওয়াজ মা। আমি যখন প্রথম বউ হয়ে এলাম, তখন গাড়ী ঘোড়া লোকলস্কর, সাহেবী বাসন কাঁটা চামচে, মুসলমানদের বাসন বাবুর্চি সব ছিল। শ্বশুরের আমলের হাতীটাও তখন বেঁচে। তা যা, পান সেজে নিয়ে আয়। যা, দাঁড়াস নে, চা খেয়েই আমার পান চাই। খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ থাকলে আমার ন্যাকার আসে।

অর্চনা চলে গেল। খুড়ীমা চা নিয়ে কর গুনে নিবেদন করে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—চমৎকার চা হয়েছে। এমন চা অনেকদিন খাইনি। হঠাৎ হেসে বললেন—আমাদের বাড়ীতে দু পয়সা প্যাকেটের চা, আর একটা পুরনো এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জল গরম হয়—ফুটতে শুরু করলে প্যাকেট শুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে ফুটল। তাই নামিয়ে দুধ দিয়ে চিনি দিয়ে পেতলের হাতায় ঘেঁটে চা তৈরী হল। তারপর কাঁসার গেলাসে একগেলাস করে নিয়ে বসল মেয়ে-পুরুষ ছেলেতে বিশ-পঁচিশজন। যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না সুলতা, এসব কথার কি উত্তর দেব। শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু খুড়ীমার সেদিকে গ্রাহ্য ছিল না। তিনি যেন শুধু কথা বলতেই এসেছিলেন এবং আমাকেই বলতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ এবার বলে ফেললেন—আমার হিংসে ছিল বাবা, রাগ ছিল দারুণ রাগ ছিল। দেখ এসব তো আমার হ'তে পারত। তুই তো আমার পেটে হতে পারতিস! তা হ'ল না—বেশ, হ'ল না। আমি লেখাপড়া জানা ছিলাম না, বিবি ছিলাম না। বেশ। কিন্তু ঘটকালী করে আমার কপালে এই এমন একটা মানুষ—

অর্চনা এসে ঢুকল পান হাতে করে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন খুড়ীমা। খুড়ীমা হেসে

বললেন—পান, প্রাণটা বাঁচল। এ তো বেশ বড় ঢলকো পান রে! খুব মোটা খিলি করেছিস।

অর্চনার সেই এক উত্তর—তোমার ভাসুরপো একেবারে আমীর গো। পানের সরঞ্জাম, সেই কলকাতার কাটা সুপুরী সুগন্ধি খয়ের কমলানেবুর শুক্নো খোসা, খুব সুগন্ধি জরদা, ছোট এলাচ বড় এলাচ সব আছে!

—ছোট এলাচ দিয়েছিস নাকি?

—না। তুমি খাও না আমি জানি। জর্দাও দিই নি।

—আন। জর্দা খাইনে পাইনে বলে রে। নইলে সেকালে কাশী থেকে জর্দা আসত মেজতরফের কর্তার নামে। তাই ভাগ ক'রে দিতেন। এখন কড়া তামাকপাতা আর দুটো জোয়ান মৌরী দিয়ে ভেজে নামিয়ে নি। আন জর্দা আন।

এতক্ষণে সুলতা, আমি কথা খুঁজে পেয়ে বাঁচলাম। বললাম—কৌটাটা আপনি নিয়ে যান খুড়ীমা।

—নিয়ে যাব? আমার মুখের দিকে তাকালেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—দে। তোকে আজ বড় ভাল লাগল রে।

তারপরই চলে গেলেন। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—যা বললাম তার চেষ্টা তুই অবিলম্বে কর বাবা! তোর ঠাকুরদার ওপর অন্নপূর্ণা ঠাকুমার একটা মায়া ছিল। হয় তো তোর কথা রাখলেও রাখতে পারেন। সে ছেলের বিয়ে এখনও হয় নি। এ বাড়ীতে বিয়ে দেবেন না বলে চিঠি লিখেছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে। আজ তো মাঘ মাসের ৪ঠা।

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমি ৬ই মাঘ, দুদিন পর, কলকাতায় এলাম। খুড়ীমার কথাটা আমার মনে ভাল লেগেছিল। অন্নপূর্ণা দেবীকে বছর দুয়েক বিজয়ার পর একবার ক'রে দেখেছি। বাবা-মার সঙ্গে যেতাম। বিজয়ার পর প্রণাম করতে যেতেন। বাবা যখন খুব সাহেব, যখন বিয়ে করেন নি তখন বাবা যেতেন না তাঁর ভয়ে। বিয়ের পর তিনি নিজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, মাকে গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমি যেবার প্রথম যাই তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। আমাকে দেখে ব'লে উঠেছিলেন—ওরে, এ সে অবিকল আমার দেবুরে। কি সমাদর—আমাকে একশো টাকার নোট দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন—দেখ, সাচ্চা জরী বসানো ভেলভেটের পোশাক কিনে দিস। আর মাথায় একটা পালক দেওয়া পাগড়ি। জানিস, কালীপূজার সময় এই বয়সে দেবু আমার এই পোশাক পরত।

পরের বছর ঠিক তেমনি পোশাক পরে গিছলাম বিজয়ার সময়। তিনি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমাকে দেখে কেঁদেছিলেন। অবিকল দেবেশ্বর। অবিকল! তারপর আমাকে বলেছিলেন—দেখিস বাবা, সেই রূপ পেয়েছিস, কিন্তু দেবুর মত হ'সনে। খবরদার।

তারপর যাওয়া বন্ধ হয়েছিল। বাবা, ইংরিজী কাগজে খুব কড়া প্রবন্ধ লিখলেন, সেটা

ষোল সতেরো সাল, পলিটিকাল মার্ডার আর টেররিজিম নিয়ে প্রবন্ধ। প্রবন্ধ একটা নয়, সে একটা সিরিজ—বোধহয় তিনটেতে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তার মধ্যে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন মার্ডারারদের মন এবং প্রকৃতি। তিনি বলেছিলেন—আসলে এরা মার্ডারার প্রকৃতি নিয়েই জন্মায়; যদি এরা শিক্ষা না পেত, তা হ'লেও তাদের এই দুর্নিবার প্রকৃতি এই পথেই এদের চালাত। সাধারণ মার্ডারের সংখ্যা তো কম নয়। এ শুধু এদেশেই নয়, সব দেশে। শিক্ষা এদের খুঁজিয়েছে একটা 'কজ'—'এ নোবল কজ'। কিন্তু কজ—যা তোমার কাছে নোবল—তা অন্যের কাছে নোবল্ তো নয়ই, সেটা সেই চিরন্তন ক্রাইম। এই ধরনের প্রবন্ধ। তার সঙ্গে তিনি জড়িয়েছিলেন ল'ইয়ার এ্যাডভোকেটদের। বলেছিলেন—যারা এই সব ক্রিমিন্যালদের ব্রিফ নিয়ে কেস ডিফেণ্ড করে তাদের নেচার এ্যানালিসিস করলেও ঠিক এই ক্রিমিন্যাল ইনস্টিংক্ট্ পাওয়া যাবে। এবং তাদের মধ্যে আবার আরও এক গভীর জলের মৎস্য আছে যারা একই সঙ্গে এই ইনস্টিংক্ট এবং তাদের কেরিয়ারের পথ ক্লীয়ার এবং ব্রডার করে নেয়—যাতে ক'রে তারা পায়ে হাঁটার বদলে জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে পারে। সেই হিসেবে কনসিডার দেম গ্রেটার অফেণ্ডারস্ টু দি সোসাইটি এ্যাণ্ড স্টেট। যদিও ম্যাজিকে-মুগ্ধ জনসাধারণের স্তিমিত লজিক অনুযায়ী তারা সেলফলেস গ্রেট মেন এ্যাণ্ড ওয়ার ফ্রন্টের সাপ্লাই এ্যাণ্ড সাপোর্ট লাইনের বিগ হিরোজ ব'লে পরিগণিত হয়।"

তুমি তো জান সুলতা, বাবা আমার গান্ধীজীকে কি ব্যঙ্গোক্তি এবং বক্রোক্তি করেছিলেন! তাঁর এ প্রবন্ধ আমি পড়ি নি, কারণ বয়স তখন আমার ছ' সাত বছর। আমি শুনেছি। অবিশ্বাসও করি না। বাবা হয়তো ঠিক এই ধরনের মানুষ ছিলেন না, তবে ইংরিজী কাগজে গিয়ে নাম করবার জন্যে এই ধরনের স্টাণ্ট লিখেছিলেন। এ বোধহয় ছিল তাঁর রক্তে।

সুলতা বললে—তার কিছুটা তোমার মধ্যেও আছে।

—নিশ্চয় আছে। স্বীকার করব না কেন? নিশ্চয় করি। নইলে বাবার বিরুদ্ধে আমিও তো এগার পেরিয়ে বারো বছর বয়সে ননকো-অপারেশনে পিকেটিং করতে গিয়েছিলাম। যার ধাক্কায় বাবা চাকরি ছাড়লেন। বাবা মিস চন্দ্রিকাকে নিয়ে পালালেন। আমি গোঁড়া হিন্দু হলাম। তারপর বাবা মারা গেলেন, শ্রাদ্ধ করতে এসে কীর্তিহাটের রায়বংশের পরিণতি দেখে তিরিশ সালে জেলে গেলাম। জেল থেকে বণ্ড দিয়ে একমাস আগে বেরিয়ে এসে ইংরিজী কাগজে বিদায় সত্যাগ্রহ লিখলাম। তারপর আর্টিস্ট হলাম। দাড়ি গোঁফ রাখলাম। মা মারা গেলেন। তোমার সঙ্গে আলাপ হল। হঠাৎ কীর্তিহাটে সেটেলমেণ্টের টানে এসে আর একরকম হয়ে গেছি। বলতে গেলে জমিদারী মেজাজ নিয়ে রায়বাড়ীকে কলঙ্কমুক্ত করবার মত দম্ভ নিয়ে এইসব ছবি এঁকেছি। আছে বই কি।

সুলতা রাগ করলে না। হাসলে। বললে—বড় রেগে গেছ তুমি হঠাৎ। কথা শেষ হতে হ'তে হাসিটা জোর হয়ে উঠল। হঠাৎ থেমে বললে—পাত্রাধার তৈল এবং তৈলাধার পাত্র এক

সঙ্গে দুইই সত্য—বললে—রাগ করো না।

লজ্জিত হ'ল সুরেশ্বর। বললে—ঠিক বলেছ। মনটা ফুঁসছে। পাত্রে তৈল থাকে, পাত্রের আকার নেয় কিন্তু তৈলও গুণ হারায় না পাত্রও আকার হারায় না। কীর্তিহাটে এসে ইণ্টেলেক-চুয়াল আমি এবং জমিদারী আসনে বসে জমিদার বংশধর আমি মিশে গিয়েছি। হয়তো প্রদীপ হয়ে আলো ছড়াতে চেয়েছি কিন্তু কড়াইয়ের তেলে বেগুনের ফালির মত ফুটতে শুরু করেছি।

সুলতা হেসে উঠল আবার। বললে—চমৎকার বলেছ। কিন্তু আমি বলছি—বে-গুণ তুমি নয়। গুণ তোমার কাছে। হঠাৎ রেগে গেছ। কারণটা ঠিক বলতে পারব না।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর আবার বললে—কারণ আমার বাবার ওই প্রবন্ধের স্মৃতি। ওই 'বিদায় সত্যাগ্রহ' চিঠিটার একটা সম্পর্ক আছে। হেরিডিটি ছাড়া কি বলব? তা ছাড়া যা বলতে যাচ্ছি—অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ীতে অর্চনার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়ার কথা—তার সঙ্গে যোগটা আরও নিবিড়। ওর সঙ্গে আমার বাবার ওই প্রবন্ধটা বের হবার পরই অন্নপূর্ণা দেবী বাবাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—"তুমি ইংরাজী কাগজে যেসব কথা লিখিয়াছ তাহা শুনিয়া আমি নগেন্দ্রকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলাম। সে সমস্তই আমাকে বাংলা করিয়া শুনাইল। ইহাতে তুমি আমাদিগকেও গালি দিয়াছ। আমার ছেলে ভবেন্দ্র উকীল ছিলেন। আমার স্বামী উকীল ছিলেন। আমার স্বামী আলিপুর বোমার মকদ্দমায় আসামীপক্ষে ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। আমার ছেলে ভবেন্দ্র এমন অনেক মকদ্দমায় বিনা ফীতে কাজ করিয়া গিয়াছে। সেও আজ নাই। তাহার পুত্র নগেন্দ্রও এমন ওকালতি করিয়া থাকে। আমি তাহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিই। ইহার জন্য আশীর্বাদ করি। সুতরাং তুমি আমার বংশকে এমন কি আমাকেও অপমান করিয়াছ। বহু পূর্বেই পিতৃবংশের সহিত সম্পর্ক ত্যাগই করিয়াছি। সে দাদার আমল হইতে। শুধু দেবেশ্বর আমার সমবয়সী—খেলার সঙ্গী ছিল, তাহাকে বাল্যকালে ভাইফোঁটা দিবার জন্য কাঁদিতাম, সেই কারণে সে অনেক কুকার্য করিলেও তাহাকে ত্যাগ করি নাই। অদ্য হইতে তোমাকেও ত্যাগ করিলাম জানিবে। অতঃপর, তুমি বৎসরে একদিন আইস, তাহাও আর আসিবে না।"

বাবা হেসে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এবং আর যাননি কোনদিন। আমিও যাইনি। এবং একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র গিয়েছিল। অন্নপূর্ণা দেবী লোক দিয়ে ঘাটে কামিয়ে উঠবার পর পরবার জন্য নতুন কাপড় পাঠিয়েছিলেন। আর দশ টাকা লৌকিকতা। কিন্তু পত্র দেননি।

মায়ের মৃত্যুর পর ও-বাড়ীতে যাইনি নিমন্ত্রণ করতে। মনটা যেন ভুরু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—নাঃ। কি লাভ হবে কতকগুলো কটু কথা শুনে!

এবার অর্চনার জন্যে সংকোচ করলাম না। ঠিক করলাম যাব। অন্তত অর্চনার ফটোখানা দেখিয়ে আসব।

খুড়িমা বললেন—উকিল নগেনবাবুর ছেলেটি ভাল। ডাক্তারী পাশ করেছে, বিয়ে করেনি। কারণ, অন্নপূর্ণা দেবীর প্রপৌত্রের জন্য পাত্রী তাঁর পছন্দমত হওয়া চাই।

অর্চনা অবিকল ভবানী দেবীর মত দেখতে, তার উপর সে গৌরী। দেখেছ তো অর্চনাকে। আজও তার কি রূপ! কিন্তু সে সময়ের রূপের আর কিছুই নেই। সে অর্চনার আর কিছুই নেই বিধবা অর্চনার মধ্যে।

ঠিক এই মুহূর্তেই পুরানো কথার ধারায় বাধা দিয়ে আজকের বিধবা অর্চনা এসে ঢুকল। কাঁধে একখানা বড় তোয়ালে। তার বেশী অংশটাই সামনের দিকে ঝুলছে, সে তাতে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। এবং বললে—রায়বংশের ইতিহাসে বড় বড় রায়দের ছেড়ে সর্বনাশী অর্চনার নাম কেন?—না, তাই বলছ।

সুলতা বললে—না ভাই, হচ্ছিল তোমার সে-কালের রূপের কথা।

—রূপের কথা! একটু হাসলে অর্চনা। তারপর বললে—হ্যাঁ, তা ছিল। কিন্তু তাই আমার কাল। রূপের জন্যেই বিয়ে হল। বল তো সুরোদা, বিয়েটা না হলে রায় বংশের মহাভারত কি অশুদ্ধ হত? আমি আমার পথ তো ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমি হয় মরতাম, নয়তো এত মেয়ে জেলে গেল—যেতাম। সুলতাদির মত দেশের কাজ করে বেড়াতাম।

সুরেশ্বর বললে—তোর বিয়ের কথাই বলছি রে। রায়বংশের মহাভারত তুই যে শুদ্ধ করতে এসেছিস। তোর বিয়ে না হলে সেটা হয় কি করে? অতুলেশ্বরকাকা আজ কংগ্রেসী মাতব্বর। স্বাধীন দেশের মধ্যে কাটা বাংলাদেশে মেদিনীপুর সব থেকে বড় জেলা। সেখানকার কংগ্রেসীরাই আজ প্রধান। বল না অতুলেশ্বর রায়বংশের মহাভারতে পাণ্ডব কৌরবদের কে? কেউ না! সে যদুবংশের মহানায়ক পার্থসারথির ডানহাত বা বাঁহাত সাত্যকী-টাত্যকীর মত কেউ হয়ে বসে আছে। রায়বংশের মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তার চুকে গেছে। তুই তেমনি ধারা, রায়বংশের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে সুলতার মত প্রমীলা-ট্রমীলা কেউ হতিস।

—খুব হয়েছে। কিন্তু এখনকার মত ওঠো। খাবার তৈরি, শীতের দিন, গরম-গরম খেয়ে নাও এখন। পুরনো কাল ছেড়ে নতুন কালে—যে-কালে মহাভারতের হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি-ঢাকা পড়েছে, সেইকালে এস। নয়াদিল্লীর কনট সার্কাসের হোটেল-রেস্টুরেন্টের মত খাবার করেছি। তবে মাংস মুর্গীর নয়। ওটা মাপ করতে হবে।

—ব্রজদা কি করছে? তার ভজনটজন শেষ হয়েছে।

—অনেকক্ষণ। বসে বসে মাংস রান্না বাতলাচ্ছিল। ওইটেই ছাড়তে পারলে না ব্রজদা। কি বলছিল জান?

—কি?

—হঠাৎ চুপ করে গেল একসময়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বল, এবার কি করব? ঝোল

অনেকটা রয়েছে, অথচ মাংসটা নরম হয়ে গেছে খুব। গলে যাবে হয়তো। উত্তর দিলে না। আবার ডাকলাম, ব্রজদা। ব্রজদা হেসে উঠল। বললাম, হাসছ যে? ব্রজদা বললে—ওরে অর্চি, সন্ধ্যেবেলা থেকে ঠাকুরকে বলছিলাম—ঠাকুর, এবার পথে বের করে দাও। বড় ইচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে শুধু তোমায় নিয়ে থাকি। কিন্তু মজা দেখ—এই এতক্ষণ ধরে ত্রাণেন অর্ধভোজন করছি, আর ভাবছি, আঃ, এমনি আহারটি যদি নিত্যি জোটে! হঠাৎ সন্ধ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভাবছিলাম, ঠাকুর সব পারে। চোখ-কান-মাথা-হাত-পা সব জব্দ করতে পারে। সবাইকে দমন করতে পারে। কালীয়-নাগকেও পারে, কংসের হাতীকেও পারে। পারে না শুধু মানুষের উদরের সঙ্গে। আরে অন্যে পরে কা কথা, নিজেই ঠাকুর ছেলেবেলায় চুরি করে খেয়েছে, মদ্দ জোয়ান হয়ে ভাত পায়নি, রুটি পায়নি, বিদুরের খুদ খেয়ে—নামই হয়ে গেছে দামোদর।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে অর্চনা।

তোয়ালের খুঁটে চোখ মুছলে। সুলতা বললে—ওটাই মহাভারতের আদি কথা অর্চনাদি। কৌরব-পাণ্ডব, রায়বাড়ী—সব বাড়ীর সব কথার মূলেই ওই কথা। তবে উদর বলব না, বলব অন্ন।

—না। সুলতাদি, কথাটা তোমার নেহাতই পলিটিক্যাল থিয়োরী। ওছাড়া আরও অনেক কিছু আছে।

সুরেশ্বর বললে—চল খেয়েদেয়ে এটার মীমাংসা করব। ওঠো সুলতা।

খাওয়া দাওয়া সেরে এ ঘরে এসে সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেখ, আমার জবানবন্দী নেবার বিচারক, তুমি কি এ্যাডজোর্নমেণ্ট দিয়ে বাড়ী যাবে—না? রাত্রিও অনেকটা হয়েছে।

সুলতা চুপ করে রইল। ভাবছিল।

—তা হলে আজ না-হয় থাক! গাড়ী বলে দি!

—না। অন্ততঃ অর্চনার ভাগ্যের কথাটা শুনে যাব। উনি—ওকথা বললেন কেন?

—কোন কথা, নিজেকে স্বামীঘাতিনীর কথা?

—হ্যাঁ।

কথাটা অর্চনা বলেছে খাবার সময়। দুপাশে মুখোমুখি হয়ে বসেছিল চারজনে।

টেবিলে নয়, অর্চনা খাবার ব্যবস্থা করেছিল মেঝের উপর আসন পেতে। বলেছিল—টেবিলে বসলে আমার বসা হবে না—তাই মেঝের উপর আসন পেতে সনাতন নিয়মে করলাম। অসুবিধে হবে?

কথাটা সুলতাকেই বলেছিল। এর অর্থ সুলতার বুঝতে দেরী হয় নি। ব্যাপারটা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার। এবং সেটা তাকে নিয়েই। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বলেছিল—না—

না—অসুবিধে কিসের ? ঠিক আছে। এ বেশ সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু শেষকালটায় না-বলে পারে নি—আর ছোঁয়াছুঁয়িটা আপনি মানেন—

—না সুলতাদি, তা মানিনে। এই দেখুন—ওপাশে দুখানা আসন—ও দুখানা বড়দা আর সুরোদার জন্যে। আর এদিকে পাশাপাশি আমরা দুজন। আমি মাছ মাংস পেঁয়াজ এগুলো খাইনে, রাত্রে ভাতটাও খাইনে কিন্তু নিরামিষ তরকারী আলু ছেঁচকি-আলুভাজা-পটলভাজা এসব খাই, লুচি রুটির সঙ্গেও খাই মুড়ির সঙ্গেও খাই। হয়তো জানেন না নির্জলা একাদশীও একালে উঠে গেছে। তা নয়, আমার আপত্তি ওই টেবিল। আর ওই চাদর। বুঝলেন না ওটা ভাই বরদাস্ত করতে আমি পারিনে। বিধবা বিয়েও আমি সহ্য করতে পারি, সমর্থন করি। অসবর্ণ বিয়ে—এমন কি International কি Inter Communal বিয়েতেও আপত্তি নেই। কি একটা মেয়ে ডাইভোর্স করছে তাও সয়—কিন্তু দুবার তিনবার ডাইভোর্স করে বিয়ে এটা সহ্য করতে পারিনে। ওটাকে আমি ঘেন্না করি। আর ঘেন্না করি cheating কে! ভালবাসার ছলনার চেয়ে পাপ আর হয় না! জানেন আমার লাইফের ট্র্যাজেডিই ওইখানে। আমার স্বামী আমাকে—।

হঠাৎ চুপ করে গেল অর্চনা। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বসুন—আপনাদের পরিবেশন ক'রে দিয়ে আমি বসে পড়ব আপনার পাশে।

প্রায় অন্ধ ব্রজেশ্বর কালো চশমাটা খুলে রেখে খেতে বসল। তার পাশে সুরেশ্বর।

ব্রজেশ্বর দিনের থেকে রাত্রে দেখতে পায় অপেক্ষাকৃত ভাল। সকালে সূর্যোদয় থেকেই চোখ তার রাঙা হতে শুরু করে। রোদ যত বাড়ে তত যন্ত্রণা বাড়ে। কালো চশমায় আরাম বোধ করে এবং একটু আধটু দেখতেও পায়, রাত্রে যন্ত্রণা কমে—জল পড়া বন্ধ হয়। তখন আলোতে দেখতে পায়।

চশমাটা খুলে রেখে ব্রজেশ্বর বলেছিল—ওরে ভাই, এসব এড়াবি কি ক'রে ? সংসারে এ-জন্মের ঋণ ও-জন্মে শোধ করতে হয়। তুই সেই সতীবউরাণী—

অর্চনা বলেছিল—থাম তো! ওই ব'লে ব'লে তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে। যত সব বাজে কথা! তোমাদের যত ঝঞ্ঝাটে আমাকে জড়াবার ফন্দী! আমি সতীবউরাণী তাহলে তুমি-টা কে শুনি ? আর ওই সুরোদা, ওই বা কে ?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—রাজাভাই আমার; প্রজাদের কাছে রায়দের ঋণ তো অনেক। শোধ দিতে এসেছে। সে জন্মে মদ খায় নি—বিলাস করে নি—তা ক'রে নিতে এসেছে। অঞ্জনা ঠাকরুনের ঋণ শুধতে এসেছে।

সুরেশ্বর বলেছিল—ব্রজদা, তুমি ভাই একখানা বই লেখ—।

ব্রজেশ্বর হা—হা করে হেসে বললে—দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো আজীবনে দোরস্ত করতে

পারিনি—বাংলা পণ্ডিতের কিল খেয়ে রায়বংশে জন্মেও মোটাতে পারি নি। তার উপর ঠাকুর চোখে মেরেছেন। তুমি জানো রাজাভাই—সুপুরুষ ব্রজেশ্বরের চোখের চাউনিতে কি ভেল্কী খেলতো। এখুনি করুণ সজল ; রাজা মহারাজাদের সামনে সেই দৃষ্টিতে তাকালে পত্থল পানি হো যাতা থা। সুন্দরী যুবতীদের দিকে একটু ঢলঢলে উদাস দৃষ্টিতে তাকাতাম, তারা মরমে মরে যেতো। এখন সেই চোখ গেছে, দু চোখে পানি ঝরে। দেখতে পাইনে। তবে আমি বলে যেতে পারি তুমি লিখে নিতে পার। মডার্ন রিয়ালিস্টিক না হোক, লোকে অবাক বনে যাবে।

অর্চনা বলেছিল—আমাকে ব'লো আমি লিখব। সংস্কৃতে এম-এ পাশ করেছি—বানান সব আমি শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারব।

—তা হলে ধর—তুই সতীবউরাণী, রাজা ভাইয়ের তিন জন্ম রায়বংশে—প্রথমে কুড়ারাম রায়, তারপর রত্নেশ্বর রায় তারপর রাজাভাই সুরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বলে উঠল—নিজের কথাটা বল—।

—দাঁড়াও ভেবে দেখি, আমি কে ?

অর্চনা বললে—তুমি কে আমি বলব ?

—বল ?

—তুমি সেই শ্যামাকান্ত—এ জন্মে কাঁদতে এসেছ। মুক্তি তোমার এই জন্মে।

—উঁ-হু, উঁ-হু, উঁহু! শ্যামাকান্ত আমি ? বাপস্। আমি হলাম ;—আমি হলাম কে ?

সুরেশ্বর হেসে বললে—তা হ'লে আমি যতটা দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি তাতে দেখছি তাতে তুমিই হলে কুড়ারাম রায়।

অর্চনা বললে—ঠিক, ঠিক, ঠিক! বংশটা প্রতিষ্ঠা করেছিলে—কোন প্রেজুডিস্ ছিল না—সেই মুসলমান মেয়েটার চুল বঁটিতে কেটে গোবর খাইয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে ঘর করেছিল, তোমার সঙ্গে মিলবে ব্রজদা—সেই হলে তুমি।

খেতে বসে আলোচনার ধারাটা হাস্য-পরিহাসে এসে পৌচেছিল। ব্রজেশ্বর বললে—আচ্ছা সুলতা দেবীকে আপ্যায়ন কর। উনি বলুন। আমরা গেঁয়ো লোক—বকে মরছি গেঁয়ো চোরের মত, উনি শহুরে—ঠিক সেই শহুরে চোরের মত নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন—ওঁকে একটু বাধা দেওয়াও হবে। উনিই বলুন—সেই স্থূল বপু গজরাজের মত দুঃসাহসী, ধীর গতি যিনি নাকি রাঁয়-রাঁইয়ার রাজহস্তীস্বরূপে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে বিশাল কীর্তিহাট নামক অরণ্য এলাকা দখল করে বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই মহাশয় ব্যক্তি বা ঐরাবৎ কি এমনি দুর্বল দেহ, শেয়ালের মত ধূর্ত ভীরু যে অহং ব্রজেশ্বর রায়—সে হতে পারি ?

সুলতা হেসে বললেন—শেষকালটায় মিল আছে। তিনিও শেষ বয়সে কালী কালী

করেছিলেন, আপনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছেন।

—হা হতোস্মি—এই হল আপনার বিচার ? শহুরে চোরের মত এককথায় ফুললো আর মলো ? সংসারে শেষ জীবনে কালী কালী বা কেষ্ট কেষ্ট কি শুধু কুড়ারাম রায় করেছিলেন না আমি করছি ! সব পাখীতে মাছ খায় রাজাভাই, ধরা পড়েছে মাছরাঙার মত এই তোমার ব্রজদা।

—কি বললেন—কি বললেন কথাটা ? কি সব পাখীতেই—

—ও—সব পাখীতেই মাছ খায় ধরা পড়েছে মাছরাঙা।

অর্চনা বললে—ওসব আমাদের পাড়াগাঁয়ের প্রবাদ।

ব্রজেশ্বর একখানা ফ্রাই তুলে নিয়ে বললে—হয়েছে অর্চনা। আমি হলাম অঞ্জনার বাউণ্ডুলে স্বামী ! সুদর্শন ! আর বিমলেশ্বর কাকা কে জান। ও হ'ল সেই বেটা গোপাল সিং ! বেটা শেষকালে জব্দ হয়ে বীরেশ্বর রায়ের অনুচর হয়েছিল, তীর্থ ক'রে এসেছিল—সে এসেছে এ বংশে তার বাজেয়াপ্তি সম্পত্তি ভোগ করতে। দেখ, সে-জন্মে মেরেছিল নিজের বেটাকে। এ-জন্মে শিবুর হাত কুপিয়ে সে-জন্মের জেল-খাটাটা খাটতে গেল।

অর্চনা বললে—তুমি বড়দা ভুল বললে—তুমি এসেছ খোদ বেদব্যাস, পথ ভুল করে এই রায়বাড়ীর ভাঙাহাটে। সে-জন্মে যা ভোগ করনি, যে-সব পাপ করনি এ-জন্মে করার পর তোমার ভগবান তোমায় চোখে রোগ দিয়ে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছে !

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তাও হতে পারে। না হলে, তুই সতীবউরাণী এ কথা আমার মত কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে ? হ্যাঁ, দিব্যচক্ষেই দেখছি রে আমি। অর্চি দিব্যচক্ষেই দেখছি। সতীবউরাণীকে সে-জন্মে বীরেশ্বর রায় প্রাণ দিয়েও পান নি। বারো বছর পর সতীবউরাণী ফিরে এসেও ধরা দেন নি। তোকে সেই সতীবউরাণী জেনেই অন্নপূর্ণাঠাকরুণ নিজের একমাত্র নাতির নাতবউ করেছিলেন। তুই এবার প্রাণঢেলে তাকে চাইলি—কিন্তু সে শোধ নিলে গত জন্মের, বছর না ঘুরতে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা ক'রে শোধ নিয়ে চলে গেল।

সুরেশ্বর বলে উঠল—থাম ব্রজদা। কি সব বলছ ?

ব্রজেশ্বর হেসে বললে—ওই দেখ। রাজাভাই, কাল জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হয়েছে। কাল থেকেই তোমাকে আমার রাজাভাই বলা উচিত নয়, তোমারও আমাকে প্রজাদাদা হিসেবে ধমক মারা উচিত নয়। কিন্তু হলে কি হবে ? ও কি ওঠে রে রাজাভাই—না ও ওঠবার। তা বেশ—চুপ করতে বলছ—তা চুপ। চাঁদবিবি নাটক হয়েছিল—তাতে মিয়ানমুঞ্জু আর হাবসী এখলাস্ খাঁ তরোয়াল খুলে লড়ে আর কি, এমন সময় চাঁদ সুলতানা ঢুকল, বললে—মিয়ানমুঞ্জু চুপ। অমনি মিয়ানমুঞ্জু চুপ—ওদিকে এখলাস খাঁ রুখে উঠেছে, কাটে আর কি, চাঁদ সুলতানা তাকেও বললে, চুপ। তো সেও চুপ হয়ে গেল। তা তুমি রাজাভাই যখন বলছ তখন মিয়ানমুঞ্জু চুপই হয়ে গেল।

কথাটা বলায় কোথায় যে অন্যায় হয়ে গেছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না, সে-কথা বুঝতে পেরেই সে এই ধরনের খানিকটা আবোলতাবোল বকে ব্যাপারটা লঘু করে নিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অর্চনাকে নিয়ে। অর্চনা সুলতার পাশে বসে খাচ্ছিল, হঠাৎ সে বাঁ হাতে কপালটা ধরে ঝুঁকে পড়ল, ঝুঁকে পড়ার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সকলেই বুঝতে পারলে যে সে নিজের মুখখানিকে ওই ভঙ্গির মধ্যে আড়াল দিতে চাচ্ছে। এবং ডান হাতে সে শুধু খাবার নাড়াচাড়াই করছে, কিন্তু গ্রাস মুখে তুলছে না!

সুলতা বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে কষ্ট হল না যে, এই কথাটায় নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে অর্চনা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। স্বামীকে মনে পড়েছে।

সেও মাথা হেঁট ক'রে খেতে চেষ্টাই করছিল। সুরেশ্বরও তাই। শুধু অতি স্বল্পদৃষ্টি ব্রজেশ্বর কথাগুলো শেষ করে অকারণে নিজের কথার ব্যর্থ কৌতুকে খানিকটা হেসে হাতে ধরা ফ্রাইখানা খেতে খেতে বললে—কি চমৎকার ফ্রাই করেছিস অর্চনা! জানিস চিরকুমার সভার সেই ধরে আনা বর ছুটোর "কটলেট কই মশাই কট্‌লেট?" মনে পড়ছে। আমি একবার ওই মৃত্যুঞ্জয়ের পার্ট করেছিলাম! ঠাকুরদা বলেছিলেন—সাবাস্ রে ব্রজ সাবাস্! তুই আমার নাতি না হ'লে তোকে মেডেল দিতাম।

বলে আর একদফা হাসলে এবং গবগব ক'রে খেতে লাগল।

তাতেও কেউ কোন কথা বললে না; প্রায় অন্ধ ব্রজেশ্বর এবার বললে—গানটা মনে আছে? বলেই হাত নেড়ে ভঙ্গি ক'রে গেয়ে উঠল—যাও ঠাকুর, চৈতন চুটকি নিয়া—এস দাড়ী নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা!

সুরেশ্বর এবার বললে—ব্রজদা, কি করছ তুমি?

তার কণ্ঠস্বরে ছিল বিষণ্ণ তিরস্কার, প্রায়ান্ধ ব্রজেশ্বর এবার তার স্পর্শে চমকে উঠে বললে—কেন রাজাভাই? কি—? অর্চি—অর্চি—ওরে অর্চি!

এবার বুঝতে পেরেছে সে। সে আর্তভাবে ডেকে উঠল—অর্চি। অর্চি! ওরে অর্চি! সাড়া দিচ্ছিস না কেন ভাই?

এবার প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে অর্চনা কোনমতে বললে—কি বড়দা?

—তুই কাঁদছিস?

—না—না!

ব্রজ বলে উঠল—ছি—ছি-ছি। ছি—ছি—ছি! এ আমি কি করলাম। আমি দেখতে পাইনে—। ছি—ছি—ছি! এর থেকে—।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—তুমি ছি ছি ক'র না বড়দা। তোমার কোন অন্যায় হয় নি। কিছু অন্যায় বলনি! আজকের তোমাকে তো আমি চিনি। জানি। তুমি

কোনকালে কোন পাপ করেছ তুমি জান। কিন্তু অন্ধ হয়ে চোখ চাওনি—শুধু ভগবানকে ডাক—তোমার মুখ থেকে সত্যি ছাড়া মিথ্যে বের হবে কেন? ঠিক বলেছ তুমি। তোমাদের সতীবউরাণীর অপরাধ কি ছিল তা আমি জানি নে। আমি তিনি কিনা তাও বলতে পারব না। তবে তাঁর এক বছরের মধ্যে অকালমৃত্যুর কারণ আমি। বলতে গেলে আমিই স্বামী-ঘাতিনী। এবং আমাকে দুঃখ দেবার জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন!

এরপর আর খাওয়া যায় না। কেউ খেতে পারে না। প্রথমেই উঠে পড়ল ব্রজেশ্বর!

—ব্রজদা—বড়দা।

—ওরে অর্চি, পেট ভরে গেছে রে। ওরে আর পারব না।

সে যেন আর্তনাদ করে উঠল।

* * *

আধখাওয়া ক'রে উঠে সুলতা এবং সুরেশ্বর সেই কীর্তিহাটের কড়চার ছবির ঘরে এসে বসল। বিষণ্ণতাটুকু যেন কেটেও কাটছে না। সুরেশ্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললে—দেখ, আমার জবানবন্দীর তুমি বিচারক, তুমি কি এ্যাডজোর্নমেণ্ট দিয়ে বাড়ী যাবে—না? রাত্রিও অনেকটা হয়েছে। দেখ।

সহজ করে কথাগুলি গুছিয়ে বললেও সুরেশ্বরের কণ্ঠের বিষণ্ণতাটুকু চাপা পড়ল না বা মোছা গেল না—রেশটা রয়ে গেল।

সুলতাও চুপ ক'রেই ছিল; ভাবছিল।

সুরেশ্বর বললে—দেখ, গাড়ী আনতে বলে দিই।

সুলতা এতক্ষণে বললে—না। অন্ততঃ অর্চনার ভাগ্যের কথাটা শুনে যাব। উনি ও কথাটা বললেন কেন?

—কোন কথাটা? স্বামীঘাতিনীর কথা?

—হ্যাঁ।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সুরেশ্বর। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দিয়ে বললে—তা হ'লে গোড়া থেকে—মানে যেখানে ছেড়েছি সেখান থেকেই শুরু করি শোন। তা হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। অন্ততঃ কোন প্রশ্নের ফ্যাকড়া বের হবে না।

সুরেশ্বর বললে—বলছিলাম সেই রাত্রির কথা। ১৯৩৭ সালে বিমল কাকাকে এ্যারেস্টের পরের দিন, বড়খুড়ীমা ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী মোহনডাঙার মেয়ে সকালে অর্চনাকে সঙ্গে করে এসে আমাকে অন্নপূর্ণা মায়ের কাছে যেতে বললেন। তাঁর বড় নাতির একমাত্র ছেলে ডাক্তারী পাশ করে কিসব রিসার্চ করছে। উজ্জ্বল ছেলে। অর্চনার উপযুক্ত পাত্র হবে। খুড়ীমা তাঁর মেয়ের জন্তে চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু সে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন—তবে অর্চনার চেহারাই এ

ক্ষেত্রে বড় আশা। সে সতীবউরাণী ভবানীর মত দেখতে। সতীবউরাণী কালো ছিলেন। অর্চনা গৌরাঙ্গী, সুতরাং কঠোর অন্নপূর্ণাঠাকরুন গলতে পারেন।

আমিও তখন বাইরে থেকে বেকার। না পারি কলকাতায় ফিরতে; তোমার চিন্তাও আনতে পারি না। কাঁসাই নদীর ঘাটের একটা রক্তমাখা স্থান থেকে কে যেন নিষেধ করে। এদিকে বিপদের উপর বিপদ। অতুলেশ্বর কাকা—আমার একাধারে মা এবং দিদির মত স্নেহময়ী সঙ্গিনী মেজদি—জেলে। তার উপর অর্চনা।

অন্যদিকে শীত চলে যাচ্ছে, মাঘ মাস, চাষের ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে। সেটেলমেণ্টের আবার এক নতুন পর্ব আসছে। কিছু বুঝারত তখনও বাকী। তারপর ডিসপিউট দেওয়া কেসগুলির বিচারের জন্যে কোর্ট বসবে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। বিষয়ের জন্য কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পেয়েছি কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী; ঠাকুরের সিন্দুকের মধ্য থেকে সোমেশ্বর রায়ের প্রেম পত্র। এবং ওই যোগিনী আর শ্যামাকান্ত সম্পর্কে পত্র, বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর থাক। বিষয়ের জট ছাড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি রায়বংশের বৃহৎ বটবৃক্ষ।

সে বটবৃক্ষের মূল কাণ্ড মরে গেছে অথচ গাছটা বেঁচে আছে ডাল থেকে নেমে আসা শিকড়গুলোকে কাণ্ড ক'রে নিয়ে।

কখনও দক্ষিণেশ্বর গেছ? তুমি ব্রাহ্ম বলেই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য বটানিক্যাল গার্ডেনে বিখ্যাত বটগাছটা দেখেছ, কিন্তু সে গাছটা অতি যত্নে তৈরী। রায়বাড়ীর বংশ বৃক্ষটা ওই দক্ষিণেশ্বরের গাছটার মত। তারই মধ্যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দুনিয়া ভুলে গিয়ে। দেখছি এই বংশ বৃক্ষটির শিকড় মাটির তলায় তলায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার মুখ বিস্তার করে। সব রস শুষে চুষে খেয়ে নিয়েছে। কত নতুন গাছকে মেরেছে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—কথা তুমি বাড়িয়ে ফেলছ সুরেশ্বর। ও সব জানা কথা। প্রজাপীড়নের কথা—কত প্রজাবংশ ধ্বংস করার কথা—কত ঘরবাড়ী সংসার ক্ষেত খামার বন্ধ্যা করে দেওয়ার কথা—জমিদার বংশ, ধনী বংশরূপী বটবৃক্ষেরা যা করেছে কোন ইতিহাসই তার নিখুঁত হিসেব দিতে পারবে না। আজকাল স্টাটিস্টিকসবিদেরা মহেঞ্জদেড়ো হরাপ্পার লোকসংখ্যা যাঁরা বের করছেন ওটা তাঁদের হাতে ছেড়ে দাও। তুমি অর্চনার কথায় এস—তোমার কথায় এস।

সুরেশ্বর বললে—আমি আমার মনটার কথা বোঝাতে চাচ্ছিলাম। আমি তখন আপনার অজ্ঞাতসারে আমার বংশের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি। বংশ পরিচয় সন্ধানী দীর্ঘকালের প্রবাসী একটি খেয়ালী তরুণ এসে যেমন পড়ো ভিঁটের খোঁজ পেয়ে ভূতগ্রস্তের মত ঘুরে বেড়ায়—রাত্রে সাবল হাতে খুঁড়ে বেড়ায় গুপ্তধনের সন্ধানে—তেমনি অবস্থা আমার। কোথাও দু চারটে

পুরনো মোহর মেলে কোথাও মেলে পাথর—যাকে মনে করি দুর্লভ মূল্যবান জহরৎ, কিন্তু ধুয়ে মুছে দেখি মোহরগুলো তামার পয়সা, জহরৎগুলো কাচ। আবার অকস্মাৎ মোহরও মেলে, মণিমুক্তাও মেলে। সারা দিনটা বসে বসে ভাবি আর ভাবি—তেমনি আর কি। এর মধ্যে ওই ডাল থেকে নামা ঝুরির মত লম্বা হয়ে নেমে মাটি ছুঁয়েছি, তারও খেয়াল নেই।

তা থাক ও কথা। ইতিহাসই বলি। গল্প বলব না। কারণ মিথ্যে এর মধ্যে নেই।

অর্চনা আমার পরম প্রিয়পাত্রী, তার সম্পর্কে রায়বংশের প্রচলিত প্রবাদেও অন্তত বারো আনা বিশ্বাস করেছি। তখন আর আমি ইণ্টেলেকচুয়াল নই বলতে পার। শুধু খোলসটাই আছে ভিতরটা পাল্টে গেছে। কীর্তিহাট ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে হয় না।

তবু নড়লাম। অর্চনার তাগিদে নড়লাম। রঘুকে বললাম—জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। কলকাতায় যাব—কাল হবে না—পরশু। ফিরব দিন চারেক কি এক সপ্তাহের মধ্যে। তার বেশী দেরী হবে না।

খবরটা শুনে মোহনডাঙ্গার খুড়ীমা বলে পাঠালেন—পরশু তেরস্পর্শ, পরশু যেতে বারণ করো সুরেশ্বরকে। শুভ কাজে যাচ্ছে।

খবরটা নিজে এসে দিয়ে গেলেন মনোহরপুরের খুড়ীমা মানে অর্চনার মা!

এখানে একটা ফালতু কথা বলি সুলতা। সেটা ওই রায়বাড়ীর এবং বাংলাদেশের বউদের নামের কথা। আগের কালে বড় বড় এবং মধ্যবিত্ত বাড়ীতে বড়দের নামকরণের কথা বলেছি। কাত্যায়নী দেবী ছিলেন রাজকুমারী রাণীবউ, তাঁর পুত্রবধূ ভবানী দেবী ছিলেন সতীবউরাণী। তাঁর পুত্রবধূ স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন সরস্বতী বউ। রায়বাহাদুরের তিন ছেলের ছয় বউ। দেবেশ্বরের এক বিবাহ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন মানিক বউ; মেজঠাকুরদার তিন বিয়ে—প্রথমার অর্থাৎ ধনেশ্বর জগদীশ্বর সুখেশ্বরের মায়ের নাম ছিল পদ্মবউ, দ্বিতীয়ার নাম ছিল 'গোলাপ বউ' —তারপর তৃতীয়া আমার মেজদিদি যিনি আমার মায়ের থেকে কমবয়সী, গ্রামের গরীব পুরুত ঠাকুরের মেয়ে—তাঁরও একটা ফুলের নাম জুটেছিল কিন্তু সে নাম ধরে ডাকবার কেউ ছিল না বলেই সেটা কায়েম হয় নি—লোকে তাঁকে বলত মেজমা। ওঁদের ছোট ভাইয়ের দুই বিয়ে —প্রথম স্বজাতে স্বঘরে হয়েছিল তাঁর নাম হয়েছিল রত্নবউ। দ্বিতীয়া যিনি তিনি কখনও কীর্তিহাটে আসেন নি। এলাহাবাদের মেয়ে—ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা মেয়ে—তাঁর নাম আমার খাতায় লেখা আছে মনে নেই। কিন্তু রত্ন, মণি, পদ্ম এসব তাতে ছিল না।

এরপর আমার বাবা জ্যেঠা কাকাদের আমল। আমার নিজের জ্যেঠাইমা যজ্ঞেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় কয়লা ব্যবসাদারের মেয়ে, তাঁর নামকরণ হয়েছিল "সৌরভ বউ"। বাবা বিয়ে করেছিলেন সাতাস বছর বয়সে—আমার মায়ের নাম আগে হলে হয়তো 'গৌরব বউ' বা এমনি একটা কিছু হ'ত। ধনেশ্বরকাকার বিয়ের কথা বলেছি, মোহনডাঙ্গার দৌহিত্র শরীক বাড়ীর মেয়ে যখন এসেছিলেন তখন তিনিও একটা নাম পেয়েছিলেন 'সৌভাগ্য বউ'। জগদীশ্বর

কাকার বউ মনোহরপুর জমিদারবাড়ীর মেয়ে, পড়ন্ত জমিদারবাড়ী,—রূপও তাঁর ছিল, তার জন্যই তিনি নাম পেয়েছিলেন—'জ্যোৎস্না বউ'। সুখেশ্বর কাকার বউয়ের আমল থেকে এসব নাম রাখা উঠে গেল। তখন ওঁদের মা 'পদ্মবউ' মারা গেছেন। দ্বিতীয়পক্ষের মেজঠাকুমা গোলাপ বউয়ের কোলে তখন দুই ছেলে এক মেয়ে এসেছে। তিনি বলেছিলেন—নাম আর কত খুঁজবে? দেশেও ওসব নাম রাখা উঠে গেছে, বউদের নাম এখন বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম দিয়ে চলছে। বড়-বউমা মোহনডাঙ্গার মেয়ে ও হবে মোহনডাঙ্গার বউ, মেজবউমা মনোহরপুরের মেয়ে ও মনোহরপুরের বউ, সুখেশ্বরের বিয়ে হল 'ওতোরপাড়ায়' ও হবে ওতোর-পাড়ার বউ।

তাই মোহনডাঙ্গার মেয়ে সৌভাগ্য বউ নাম পেয়েও হারিয়েছেন—তিনি ঘরে বাইরে মোহনডাঙ্গার বউ;—আমরা সামনে বলি বড় খুড়ীমা—আড়ালে বলি মোহনডাঙ্গার খুড়ীমা।

অর্চনার মা তাই মনোহরপুরের খুড়ীমা—এসে বললেন, বাবা, বড়দি বললেন, পরশু তেরস্পর্শ। তেরস্পর্শে যাত্রা নেই। তুমি হয় তো এসব মানো না তাই বললেন—মেজ তুই যা বলে আয়, এ কাজে তেরস্পর্শ মাথায় করে না যায়।

আমি সুলতা, এসব মানতাম না তুমি জান—আজও ঠিক যে মানি তা নয়। তবে সেদিন মেনেছিলাম। না-মানলে কি হ'ত তা জানি না। তবে মেনে খুব শুভফল হয়নি। তবে যদি অনিবার্যভাবে এইটেই আমার অর্চনার ভাগ্য ফল হয় তো প্রতিবাদের কিছু নেই।

সেদিন ৬ই মাঘ—ভোরবেলা রওনা হলাম। কলকাতায় বাড়ীতে খবর দিয়ে রেখেছি। কীর্তিহাট থেকে পাঁশকুড়ো স্টেশন কাছে। কাছে মানে পঁচিশ তিরিশ মাইল। পালকির বন্দোবস্ত করেছিলাম। পথে তমলুকে এসে ট্যাক্সি নিলাম। বাস সার্ভিসও আছে এখান থেকে। স্ট্যাণ্ডে পালকি ছেড়ে নেমে ট্যাক্সি ধরব, নামলাম; নেমেই দেখি—গোয়ানপাড়ার হলদীবুড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে কুইনী, আর ওদেরই একজন মধ্য বয়সী লোক। কখনও দেখেছি বলে মনে হল না।

কুইনী কাপড় পরেছে,—সাজগোজের বাহুল্য নেই। কিন্তু সেই ভোরবেলা—সবে তখন আলো ফুটছে—সেই আলোতে বড় মনোরমা মনে হল তাকে। আমাকে দেখেই সে চোখ নামিয়ে নিয়ে হাত জোড় করে বললে, নমস্কার স্যার।

সুলতা—এর আগে তোমার মনে আছে—একদিন সন্ধ্যাবেলা অর্চনার সঙ্গে এসে আমার হাতে তাদের বাড়ীর দলিল আর কয়েকখানা চিঠি আমাকে দেখতে দিয়ে নীরবে চলে গিয়েছিল। কাঁসাই সে যখন পার হয় তখন তার পিছন দিক থেকে তাকে শিলুটের ছবির মত মনে হয়েছিল। সেদিন তার রূপ যেন ঠিক উল্টো। উজ্জ্বল, সকালের রাঙা আলোয় বললাম তো মনোরমার মত মনে হ'ল। এবং—।

সুলতা সহাস্যমুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে হাসির রেখা বড় বিচিত্র।

সুরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকায় নি। সে তাকিয়েছিল তার ছবির সারির দিকে। সে বললে—ওই দেখ, সে ছবিখানা।

সুলতা আগ্রহভরে উঠে গেল, ছবিখানা একটু দূরে ছিল, ক্রমপর্যায়ে ওটা এসে পড়েছে রায় বংশের কড়চার ছবির সারির শেষের দিকে।

ছবিটার পানে সে তাকালে।

সুরেশ্বর ওঠেননি—সে বসে বসেই বললে—দৃষ্টিটা দেখো আমার। এ-দৃষ্টি যৌবনের দৃষ্টি। আমি লুকোইনি।—কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবি নি যে,—।

সুলতা ফিরে এসে বললে—এইটেই জীবনের শুভদৃষ্টি। বলে হাসলে সে। সুরেশ্বর বললে—রাইট। খুব ভাল শব্দ তুমি প্রয়োগ করেছ।—কিন্তু থাক। সে পরের কথা পরে। জীবনে যৌবন দৃষ্টি তো বহুবার বহুরূপসীর রূপে আকৃষ্ট হয়। মনও উতলা হয়। তার উপর ১৯৩৭ সালে তখনও আমি জমিদার। বুড়ো বৃটিশ সিংহের তখনও নখ দাঁত থাবা অটুট আছে। মার খেয়ে সহ্য করে—সে প্রতিশোধে শত্রুকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। চার্চিল প্রাইমমিনিষ্টার তা তো ইতিহাসে মোটা-মোটা অক্ষরে খুদে রেখে গেছেন। ভারতবর্ষের গণ আন্দোলন, টেররিষ্ট আন্দোলনে বিচলিত সে হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তখনও হাল ছাড়েনি। তার আশেপাশে যেসব প্রসাদ-ভিক্ষু নেকড়ে হায়েনার দল বসে আছে তারা ইচ্ছে করলে একটা হরিণী বধ করলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল না। সুতরাং ওই দৃষ্টিতে হয়তো আরও কিছু দরকার ছিল। সেটা আমি ফোটাতে পারিনি। বলতে পারব না কেন? নিজের উপর মমতায় যদি বল, তবে আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু মন আমার তাতে সায় দেয় না।

সুলতা বললে—তাই মেনে নিলাম। বল। সংসারে দিনেও মানুষের ছায়া পড়ে মাটির উপর, পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সঙ্গে চলে। রাত্রে কায়াটাই দেহকে ঢেকে নেয়। তুমি বলে যাও না কি হল। তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে।

—ঠিক বলেছ। হিলডা আমাকে সেলাম করে বললে, সালাম হুজুর। আপনি ভি কলকাতা যাচ্ছেন? আমি ভি যাচ্ছি—কুইনীকে নিয়ে।

—কেন? হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছ কেন?

—পুছেন হুজুর ইয়ে ছোকরাকে পুছেন।—ই আমাদের আপনা আদমী। কলকাতায় কাম করে, ইখানে কভি কভি আসে—। ওহি কলকাতায় মোকামের ভাড়া আদায় করে।

কুইনী তার আগেই মৃদুস্বরে বললে, কলকাতার সেই বাড়ীর ভাড়াটেরা গোলমাল করছে স্যার। ওদের কাছে মাসে মাসে লোক পাঠিয়ে ভাড়া আদায় করত দিদি, এবার তারা বলেছে—ভাড়া দেব কি? আদালত থেকে কি নোটিশ এসেছে যে, বাড়ী আমার নয়। ভাড়া আমি পাব না।

—সে কি?

—হ্যাঁ সার!

—কাগজপত্র কিছু পাওনি?

—না। মুখেই ওরা বলেছে। আর আমার নামেও একটা কি নোটিস হয়েছে, সেটাও ভাড়াটেদের কাছে আছে। দেয়নি।

এতক্ষণে সেই লোকটি কথা বললে—হাঁ হুজুর! দিলো না আমাকে।—

জিজ্ঞাসা করলাম—কি নাম তোমার?

—আমার নাম হুজুর, জন চৌধুরী। আমি বাঙালী খৃশ্চান। তবে কুইনীদের সঙ্গে একটা কি রিলেশন আছে। আমি জানি না। তবে ওদের ভালবাসি!

হিলডা রূঢ়স্বরে বলে উঠল—ই কাম সেই হারামী-হ্যারিসের কাম আছে হুজুর! ওহি হারামজাদ এইসব লটপট লাগা দিহিস! ওহি সোওয়াইন। কুত্তিকে বাচ্চা।

—চুপ কর দিদি। আগে সেখানে চল, দেখ কি ব্যাপার। তারপর বলো।

হিলডা বললে, পানি আর তেল। এ দুনো কভি মিলে নারে কুইনী। তুই তো পুরা গোয়ান নেহিনা। তু বাঙ্গালী!

সুরেশ্বর বললে, আমি বললাম, সুলতা—তুমিও তো বাঙালী হিলডা। এদেশে এতদিন বাস করছ—গোয়া কখনও দেখনি, পর্টুগালের নামও হয়তো জান না। এখানে বাস করছ, ভাত খাচ্ছ, পানি খাচ্ছ, বাংলা বুলি বলছ, বাঙালী নও কেন?

হিলডা তবু বললে—নেহি হুজুর, হামি লোক হারমাদদের বেটাবেটী। মুলুক হামাদের গোয়া। উসকো আগে পোর্টুগালসে হামি লোক আসিয়ছলম। হামি জানি বাবু।

আমি আর কথা বাড়াইনি। ট্যাক্সিটা এসে গেল। আমি রঘুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

*　　　　*　　　　*

কলকাতায় বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছেছিলাম এবং মোহনডাঙ্গার খুড়ীমার নির্দেশমত অর্চনার ফটো নিয়ে বিকেল বেলাতেই গেলাম ভবানীপুরে। অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ী!

বাড়ীটা নিশ্চয় চেনা বাড়ী। এককালে এ্যাডভোকেট বি এন মুখার্জি ছিলেন কলকাতার একটা মস্ত নাম। যত বড় উকীল—তত ছিল দয়া। দয়াটার উৎস ছিলেন তাঁর মা অন্নপূর্ণা দেবী। ভবেনবাবু কত বঞ্চিত দরিদ্রের পক্ষ নিয়ে যে বিনা ফীতে লড়েছেন এবং জিতেছেন, তার সংখ্যা নেই। টাকা নিতেন জমিদার ব্যবসাদারের কাছে। জমিদার প্রজার যেসব মকর্দমা হাইকোর্টে আসে সে সবই প্রায় স্বত্বের মকর্দমা। তাতে জমিদার পক্ষের ব্রীফ তিনি নিতেন না। মায়ের বারণ ছিল। তবে জমিদারে জমিদারে, কি জমিদার বাড়ীর পার্টিশন স্যুট-এ তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তাঁর ছেলে এন, এন, মুখার্জি—তাঁর ছিল ক্রিমিন্যাল প্র্যাক্টিস। অধিকাংশ স্বদেশী মকদ্দমায় তিনি থাকতেন। ফিস নিতেন না। ভবেনবাবু

ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস করতেন না এবং কোন কেসে তিনি কারুর নিচে কাজ করতেন না, কিন্তু মানিকতলা বোমার কেসে একজন সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সে তাঁর মায়ের আদেশ। বলেছিলেন—ওরে আমি মেদনিপুর জেলার মেয়ে। ক্ষুদিরাম মেদনীপুরের ছেলে। সেই বাংলা দেশে প্রথম ফাঁসী গেল। এ কেসে ছোট হয়েই তুই থাক। তাতে তোর মান যাবে না। মূল ডিফেন্সের কাজ করবেন সি আর দাশ। সে তো এই নাড়ীর লোক। তাকে তো জানিস। কি লজ্জা ?—

ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম—অর্চনার এসব কথা তাঁকে বলব কি না। মধ্যে মধ্যে সব চিন্তা ভাবনা ওলোট পালোট করে দিয়ে হঠাৎ ভয় হচ্ছিল, যদি নাম শুনেই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ বলেন, বলে দে আমার দেখা করবার সময় নেই। কি বলবার আছে তা যেন নিচের কাউকে বলে দেয়। কিম্বা নগেনের সঙ্গে দেখা করতে বল।

গাড়ীখানা ময়দানের দিক থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডে ঢুকে খানচারেক বাড়ীর পরেই দাঁড়াল।

পি-জি হস্‌পিটাল থেকে একটু দক্ষিণে,—যে দিকটায় মুরশিদাবাদের এক রাজা বাহাদুরের বাড়ী আছে সেই দিকটায়।

বাড়ীটা সকলেই চেনে। তুমি ব্যারিস্টারের মেয়ে। এ্যাডভোকেট এন, এন, মুখার্জির নাম বোধ হয় জান।

প্রথমেই দেখা হোল নগেনবাবুর সঙ্গে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। রায়বাড়ীর সৌন্দর্যের স্পর্শও আছে, আবার একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। এঁদের রঙ রায়বংশের মত উজ্জ্বল নয়। এক ধরনের খুব মাজা রঙ আছে শ্যামবর্ণের মধ্যে—এ-রঙ সেই রঙ। রায়বংশের চোখ বড় এবং একটা প্রখরতা আছে দৃষ্টিতে ; নগেনবাবুর চোখ ছোট নয়, টানা চোখ এবং দৃষ্টির মধ্যে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও একটি মাধুর্য আছে।

গাড়ীটা বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াতেই নগেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু এগিয়ে এলেন। তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন বারান্দার উপর।

আমি মনে মনে সম্বন্ধ নিয়ে অনেক হিসেব করে গিয়েছিলাম। আসবার সময় গোবর-ডাঙ্গার খুড়ীমা আর মনোহরপুরের খুড়ীমা আমাকে কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মাথায় পুষ্প ঠেকিয়ে বলেছিলেন—দেখ্‌, বাবা, কোনমতে যেন সম্পর্ক ভুল করবিনে। অন্তত অন্নপূর্ণা ঠাক্‌মার কাছে। বুঝলি ? উনি তোর বাবার ঠাক্‌মা, রায়বাহাদুরের বোন। ওঁর বোধহয় তিন নাতি—নগেনবাবু উকীল, সুরেনবাবু—

ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন—কর্পোরেশনের কাউন্সিলার উনি। কণ্ট্রাক্টারি করেন। ছোটর নাম বীরেন ; তিনিও কণ্ট্রাক্টারি বিজিনেসে আছেন। তাঁকে বোধহয় পাবে না। এঁরা হলেন অন্নপূর্ণা ঠাক্‌মার নাতি—সম্পর্কে তোমার কাকা। বুঝেছ। ঠাক্‌মা—তোমার তাহলে

প্রপিতামহী—কি বলবে গো তাহলে? অ—সৌরভবউ!

জগদীশকাকা বসেছিলেন চুপচাপ। তিনি সেদিন থেকে একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম গাঁজা বেশী খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—ওই ঠাকুমাই বলবে। ঠাকুমা থেকে উপরের সবাই ঠাকুমা।

ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন—যেমন তোমার বুদ্ধি। তার উপর ওই ছাইগুলো চব্বিশঘণ্টা খাচ্ছ।

হয়তো এই নিয়েই ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া একটা বেধে যেত। কিন্তু গোবরডাঙ্গার খুড়ীমা বলেছিলেন—বড়-মা বলিস বুঝলি! বড়-মা!

জগদীশ্বরকাকা বলে উঠেছিলেন—ঠাকুমার মা—বড়-মা—

ধমক দিয়েছিলেন—অবশ্য মৃদুস্বরে মনোহরপুরের খুড়ীমা অর্চনার মা—হ্যাঁ। তাই বলবে। দিদি বলছেন শুনছ না।

—তবে তাই বলুকগে।

তর্কটা ওখানেই শেষ হয়েছিল—আমার বড়-মা কথাটা ভাল লেগেছিল। ভারী মিষ্টি হৃদ্য মনে হয়েছিল।

নগেনবাবু আমার কাছে এসে বললেন—আসুন।

আমি টপ করে তাঁকে প্রণাম করে বললাম—আমি আপনার ভাইপো, আমার নাম সুরেশ্বর রায়, ঈশ্বর যোগেশ্বর রায়ের ছেলে।

সবিস্ময়ে তিনি বললেন—তুমি যোগেশ্বরদার ছেলে! তুমি তো আর্টিস্ট শুনেছি। এস, এস, এস। ভেতরে এস।

বাড়ীর ড্রইংরুমে এসে বসলাম। প্রশস্ত হল। দামী ফার্নিচার। সোফা-কৌচের ঢাকাগুলো ধবধবে খদ্দরের। নগেনকাকা-ও খদ্দরের কোঁচানো ধুতি আর আধবাইয়া পরে রয়েছেন।

একটু মিইয়ে গেলাম সুলতা। কারণ, দেখলাম এঁদের বাড়ীতে গান্ধীয়ানাই হোক আর কংগ্রেসীই হোক, বেশ একটু চড়া সুরেই বাঁধা আছে।

বসেই বললেন—অনেককাল তোমাকে দেখিনি হে! ১৯১৬।১৭ সালে সেই যে যোগেশ্বরদা আসা বন্ধ করলে, তারপর আর এল না। তখন তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি আসতে। ফুটফুটে ছেলেটি। ঠাকুমা বলতেন—অবিকল আমার দেবু। মানে তোমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়। মায়ের ভাইপো তো উনি!

—আমার মনে আছে।

—মনে আছে? তোমার মেমরী তো খুব শার্প! কিন্তু। এমন চেহারা হল কি করে? রঙটা পুড়ে গেছে। একটা কালচে ছাপ পড়েছে। তারপর একালে, সেই সেকালের মত

দাড়ি-গোঁফ।—

—আজ এক বছরের ওপর কীর্তিহাটে রয়েছি—ওখানকার রোদে—

—আজকাল কীর্তিহাটে গেছ নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটেলমেণ্ট হচ্ছে, তার টানে যেতে হয়েছে।

—আই সী। হ্যাঁ, আমরাও ক'খানা নোটিশ পেয়েছিলাম—ওখানে কি কি যেন ঠাকুমার বাবা দিয়ে গিয়েছিলেন—। তা আমরা ও ক্লেম করিনি। ওখানে খানিকটা জমি-পুকুর নিয়ে কি করব আমরা।

—আমি সেসব আপনাদের নামে রেকর্ড করিয়েছি।

—করিয়েছ ? তোমাদের মেজতরফ রেকর্ড করাতে দিলে ?

—তা দেবে বইকি ?

—নো-নো-নো। আই নো দেম। দে আর—আই মীন দি হোল ফ্যামিলী অব শিবেশ্বরকাকা ; একটু থেমে বললেন—দেখ দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশী। অবশ্য ধনেও তাই তাই হয়। ধন থেকেই সূত্রপাত, দোষগুলো তখনই ধরে, তারপর ধন ফুরিয়ে গেলে দারিদ্র্যের ছোঁয়াচ লাগলে তখন পচতে শুরু করে। সুখেশ্বর মধ্যে মধ্যে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখত আমাকে। কিছু কিছু দিয়েছি তখন। তারপর বুঝলাম এটা ওর স্টাণ্ট। তারপর ধনেশ্বরের ছেলে ব্রজেশ্বর এসেছিল বার-দুই। হি ইজ এ স্নীক।

আমি চুপ করে রইলাম। এবং অনুভব করলাম রায়বংশের প্রতি বিদ্বেষ এঁদের মজ্জাগত বা বংশগত ধারায় পরিণত হয়ে গেছে।

নগেনকাকা এবার বোধহয় অনুভব করলেন—কথাগুলো বলা অন্যায় হয়ে গেছে। তিনি এবার বললেন—থাক ওসব কথা। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ—অপ্রিয় সত্য সত্য হলেও না বলাই ভাল। এখন কি খবর বল। সব ভালো তো ?

বললাম—ভালো নয়। অনেক ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেল।—

—কি ? মামলা-মকদ্দমা ?

—হ্যাঁ। তবে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে নয়। মেদিনীপুরের কাণ্ড তো জানেন সব। পরপর তিন-তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট মার্ডার হল—

—খুব জানি। মেদিনীপুর ওয়েস্ট বেঙ্গলে, রাজস্থানের চিতোর। বাংলাদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বলি ষোল বছরের ক্ষুদিরাম। ১৯২১ সাল থেকে সারা বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড হল, মেদিনীপুর হতে দেয়নি। কীর্তিহাটে সুখেশ্বর ইউনিয়ন বোর্ড করেছিল। পেডি মার্ডার কেসে বিমল দাশগুপ্তকে প্রসিকিউটর করে হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল। সে-কেসে ডিফেন্সে আমি ছিলাম। কলেজিয়েট ইস্কুলের হেডমাস্টার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার হীরালাল দাশগুপ্ত আর নারায়ণ মুখুজ্জেমশায়কে সাক্ষী দিতে কিছুতেই রাজী—

রাজী কেন বাধ্য করাতে পারেনি পুলিশ। নমস্য ব্যক্তি তাঁরা। এমন শিক্ষক না হলে এমন ছাত্র হয়!

আমি বললাম—যেন একটা সুযোগ পেলাম, বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ঝড় এসে বেজেছে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীতে।

—বল কি? চমকে উঠলেন নগেনজ্যাঠা। সেই ঝড়? তুমি বাধিয়েছ নাকি? বিদায় সত্যাগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত! হাসলেন। তারপর বললেন—কি করেছ? টাকাকড়ি দিয়েছ, সেটা জেনেছে পুলিশ? না, আরও কিছু? কংগ্রেস-ফ্ল্যাগ-ট্ল্যাগ তুলেছ? মিটিং-টিটিংয়ে প্রিজাইড করেছ?

বললাম—না। তার থেকে অনেক বেশী।

—অনেক বেশী?

অতুলেশ্বরের বিবরণ থেকে মেজদির জেল, বিমলেশ্বরকাকার এ্যারেস্ট পর্যন্ত সব বললাম তাঁকে। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে শুনলেন। ঘন ঘন মুখের ভাব তাঁর বদলাচ্ছিল। অবশ্য অর্চনার নাম একটুখানি উল্লেখ করে ছেড়ে দিলাম। বললাম—জগদীশ্বরকাকার অর্চনা বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে শুদ্ধ পুলিশ জড়াতে চেষ্টা করেছিল।

—মানে?

—মানে, মেয়েটি মেজদিকে খুব ভালবাসত। আর বিমলেশ্বরকাকা যখন ঘরে বসে কাঁদতেন আর বলতেন—মা কালী, তুমি তো সাক্ষাৎ বিরাজ করছ, প্রভু রাজরাজেশ্বর; তুমি তো সব দেখছ, তবু তার প্রতিকার করছ না তোমরা? অর্চনা শুনে বলেছিল—ন-কাকা, একটা কথা বলব? তোমাদের মা কালী কি বাদশাহী আমলের তাতারিণী-প্রহরিণী, না রাজরাজেশ্বর তোমাদের দারোয়ান-পাইক যে, তোমাদের হয়ে খাঁড়াচক্র নিয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে ছুটবেন? দাও তো দুবেলা ফুল-জল। আর একথালা করে আতপের ভাত। দাও না, দেখাও। দেখিয়ে নিয়ে নিজেরা খাও। এগুলো যারা বলে, তারা ভক্ত না মাথা, কাপুরুষের দল। প্রতিকার দেবতা করে দেয় না—মানুষকেই করতে হয়। তিনি অভয় দেন, সাহস দেন। এমন করে ঘরে বসে কালী কালী আর কেষ্ট কেষ্ট করে কেঁদো না।

কথাটা চাপা আছে। আছে তাই পুলিশের হাত থেকে বেঁচেছে।

স্তম্ভিতের মত তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—এমন মেয়ে? রায়বাড়ীতে এতবড় পরিবর্তন ঘটে গেছে? বল কি হে? কিন্তু হাইকোর্ট থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গেলে, আর আমাকে জানালে না? বল—এখন কি করতে হবে? বিমলেশ্বরের কেসে যেতে হবে?

বললাম—বিমলেশ্বরকাকার কেসে কনভিকশন হবেই। কারণ তিনি অত্যন্ত ধর্মবাতিকগ্রস্ত

লোক ; কনফেশন তিনি করেছেন, কুকরীখানা বের করে দিয়েছেন। শুধু অর্চনার কোন কথা তিনি বলেন নি। বলবেনও না। এবং যা বলেছেন তা উইদড্রও করবেন না।

—স্ট্রেঞ্জ! একটু চুপ করে থেকে বললেন—তবু আমি যাব। কাগজপত্র এনেছ?

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম—আমি ও কথা নিয়ে আসি নি। আমি একবার বড়মার কাছে এসেছি। অর্চনার সম্বন্ধে কথা বলব।

—মানে?

—মেয়েটির অবিলম্বে বিয়ে দিতে হবে। জগদীশ্বরকাকার শালা রেলে চাকরি করেন, তার এক শালা, সে পুলিশের দারোগা। প্রথমপক্ষের বউ মারা গেছে। ক'টা ছেলে আছে। তার সঙ্গে বিয়ে দেবার সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু অর্চনা জেদ ধরছে এ বিয়ে সে কিছুতে করবে না। বিষ খাবে। অথচ—

—কি অথচ?

—অথচ আমাদের বাড়ীতে সবাই বলে—অর্চনাই নাকি সতীবউরাণী, মানে বড়মার মা। চেহারাতে অবিকল তাঁর মত! তাই তার কাছে এসেছি একটু পরামর্শ নেব।

ফটোখানা বের করে তাঁর হাতে দিলাম। আমারই তোলা ফটো! ফটো দেখে চমকে উঠলেন নগেন কাকা।

* * *

সুরেশ্বর বললে—এইখানে তোমাকে এই বাড়ীটির একটি পটভূমি দিয়ে রাখি সুলতা। অন্নপূর্ণা দেবীর যে টুকরো টাক্‌রা ছবি পেয়েছ, তাতে তাঁর সম্পর্কে অনায়াসে তাঁর একটা ছবি গড়ে নিতে পার। সে ছবিটা হবে পটভূমিহীন মানুষের ছবি। একান্তভাবে ফটোগ্রাফের মত।

এই বাড়ী তাঁর নিজের তৈরী বাড়ী। তাঁর যে বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল, সে বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

মা মারা গিয়েছিলেন তাঁকে তিন বা চার দিনের শিশু রেখে। চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন—এর নাম হবে অন্নপূর্ণা আর একে মানুষ করবার জন্য যেন বিমলাকান্তের স্ত্রীকে দেওয়া হয়। তাঁর সন্তান নেই। রত্নেশ্বরকে দিয়ে আবার তাকে আমরা কেড়ে নিয়েছি।

বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে বলেছি—চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে পাবার জন্যে অথবা তাঁকে হারিয়ে প্রায় পাগল হয়েছিলেন। ক্রোধে আক্রোশে বাঈজী—মানে সোফি বাঈকে নিয়ে উন্মত্ত জীবনযাপন করেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে পেলেন ভবানী দেবীকে; তখন তিনি একরকম অর্ধপঙ্গু। কিন্তু সেবায় যত্নে চিকিৎসায় নিয়ম পালনে ভাল হয়ে উঠলেন আবার।

তার ফল এই অন্নপূর্ণা দেবী। অন্নপূর্ণা দেবী রায়বংশের দ্বিতীয়া কন্যা। প্রথমা ছিলেন

উন্মাদরোগগ্রস্তা বিমলা দেবী। যাঁর জন্যেই বলতে গেলে রায়বংশে বীরেশ্বর রায় পর্যন্ত একটা সর্বনেশে ঝড় বয়ে গেছে। রক্ষা পেয়েছেন ভবানী দেবীর তপস্যায়।

এ ঝড়ের সব বিবরণ মূল কথা রত্নেশ্বর রায়ের পর বোধহয় কেউ জানতে পারে নি। জেনেছিল ঠাকুরদাস পাল। তাকে খুন করিয়ে রত্নেশ্বর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তবু কি খেয়াল ডায়রীতে লিখে গিয়েছিলেন। শেষের দিকে কথাটা মনে হয়েছিল বলে দপ্তর বেঁধে তার উপর লিখেছিলেন—"আমার চিতায় যেন এগুলি দগ্ধ করা হয়। যে এসব খুলিবে বা পড়িবে তাহার সর্বনাশ হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

সুখেশ্বর রায় এগুলো পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি চতুর অতি কুটিল মানুষ। স্বার্থের জন্য সব পারতেন। তিনি এগুলো পড়েছিলেন কিনা জানি না। হয়তো পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি রায়বংশের একটা কামার্ত দৈত্যের হাতে জীবন দিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজদা পড়তে গিয়েও পড়েন নি। পড়লাম আমি।

তাই বলছি—বিমলা দেবী যে রায়বংশে কতবড় অশুভের উৎস তা রায়বংশে কেউ জানত না। আর ভবানী দেবীর তপস্যা যে কত বড় কল্যাণ করেছে, তাও কেউ জানে না।

আমি নাস্তিক হয়েও এরই জন্যে আস্তিক হ'তে চেয়েছি। কিন্তু তা পারিনি। আমি না-আস্তিক না-নাস্তিক।

এক একবার মনে হয় ভবানী দেবী বোধহয় রত্নেশ্বরকে দিয়ে ফিরে নেওয়ার অপরাধ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। আবার মনে হয় ভবানী দেবী বীরেশ্বর রায়ের উপর কন্যার ভার দিয়ে যান নি—স্বামীর উপর বিশ্বাস ছিল না বলে। ভবিষ্যত তিনি অনুমান করেছিলেন।

জীবনের শেষ ক' মাস তিনি কাশীর বাড়ীতে একপ্রান্তের ঘরে এইটে জেনেই একান্তে বাস করতে চেয়েছিলেন। তিনি থাকতেন একেবারে পূবের ঘরে। তারপর ছিল তাঁদের সন্ধ্যার আসরের ঘর। যে-ঘরে সোফিয়া এসে গান শোনাতো। তার ওপাশে ছিল বীরেশ্বর রায়ের ঘর। তারপর তিন চারখানা ঘর একরকম খালি পড়ে থাকত, তারপর ওপ্রান্তে থাকত সোফিয়া বাঈ। বুঝতে পারছ, স্বামীর স্বেচ্ছাচারের পথে কোথাও একটা পর্দার আড়ালও দেন নি।

সত্য যাই হোক, তিনি কন্যাটিকে দিয়ে গিয়েছিলেন বা স্বামীকে শেষ অনুরোধ করেছিলেন, কন্যাটিকে তাঁর নিঃসন্তান ভাই বিমলাকান্তের স্ত্রীকে দেবার জন্য। তাতে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। হয়তো এমন ভয়ও ছিল যে বীরেশ্বর রায় সোফিয়াকেই দেবেন মেয়েকে মানুষ করতে।

অন্নপূর্ণা দেবী পূজোর সময় একবার আসতেন দেশে। বিমলাকান্ত পূজোর ছুটিতে আসতেন। আসতেন শ্যামনগর। ওখানে যে বিষয় তাঁর ছিল এবং লাট শ্যামনগর রাধানগর

দিগরের যে জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা তিনি পেতেন তা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ছিল না। রায়-বংশের কীর্তিহাটের তুলনায় সেটা হয়তো পঁচিশ তিরিশ ভাগের এক ভাগ। অবশ্য বীরেশ্বর রায়ের সময়ের কথা বলছি। রত্নেশ্বর রায়ের আমলে কীর্তিহাটের আয় তিন গুণ বেড়েছিল।

শ্যামনগর কেনা হয়েছিল বিমলাকান্তের মাতামহের বিগ্রহের নামে। তখন জমিদারী মুনাফা ছিল চার হাজার টাকা। বিমলাকান্তকে জমিদারী স্বত্ব দিয়ে রত্নেশ্বর রায় সম্পত্তিটা পত্তনী নিতে ভোলেন নি।

একটু থেমে—হেসে সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় এই চার হাজার মুনাফা বিমলাকান্তকে দিয়ে শ্যামনগরের জমির উপর দু-দুবার বৃদ্ধি করে নিজের মুনাফা করেছিলেন ন' হাজার টাকা। অথচ জবরদস্তি বে-আইনী কিছু করেন নি। এবং সেই নিয়েই ঠাকুরদাস পাল, যিনি তাঁকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, যিনি তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গোটা পিঠটা পুড়িয়েছিলেন, যাঁকে তিনি দাদা বলতেন—তাঁর সঙ্গে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত রত্নেশ্বর রায়ের।

অবশ্য তিনি শ্যামনগরে ইস্কুল এবং ঠাকুরদাস পালের স্মৃতিতে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিও করে দিয়েছিলেন। যা সেকালে এই ন' হাজার টাকা মুনাফা থেকেই চলবে বলে চিহ্নিত করা ছিল।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর বিচিত্র চরিত্র। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি অন্যায় কিছু করেছেন। স্নেহ করুণা দয়া ক্রোধ বিদ্বেষ সবের মধ্যে তাঁর চুলচেরা বিচার ছিল, তাঁর কথা থাক পরে বলব। অন্নপূর্ণা দেবীর কথা বলি।

তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ভবানীপুরের মুখুজ্জে পরিবারে। তাঁরা ব্যবসায়ী লোক, ধনী। কলকাতায় অনেক সম্পত্তি। কর্তার নাম ছিল দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর তিন ছেলে—বড় ছেলে নরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হ'ল। নগদ টাকায় অলঙ্কারে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। বিবাহের সময় রায়বাড়ীর সম্পত্তি নিয়ে একটি কথা তাঁরা তোলেন নি। বছর তিনেক পর অন্নপূর্ণা দেবী ষোল বছর বয়স তখন, প্রথম সন্তানের জননী হলেন। ছেলের জন্মের মাসখানেকের মধ্যেই, শ্বশুর তাঁর দাবী তুললেন—রায়বাড়ীর অর্ধেক অংশের মালিক এই নবজাতক পুত্র। ওই উইল—যে উইল বীরেশ্বর রায় ভাগিনেয় পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরের নামে করে গেছেন তা ক্যান্সেল হতে বাধ্য; প্রথম কারণ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় কোন ক্রিয়া বা দলিল করলে তা সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ পরে তাঁর নিজের কন্যাসন্তান হয়েছে, এবং সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তানই তাঁর প্রকৃত পিণ্ডাধিকারী, উত্তরাধিকারী।

মধ্যস্থতার জন্য ছুটে এলেন বিমলাকান্ত। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে সমস্ত বিবরণ বললেন এবং রত্নেশ্বর রায় বের ক'রে দিলেন মায়ের শেষ চিঠি।

অন্নপূর্ণা দেবী শুধু প্রশ্ন করলেন—কিন্তু শ্বশুরকে আমি কি বলব বলতে পার? বেশ, কলকাতার সম্পত্তি ছেড়ে দাও আমাকে। বুঝিয়ে বলব!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না। তা পারব না। আমি সম্পত্তির মালিক নই। আমি রক্ষক। রায়বংশের যা, তা রায়বংশের।

এর উত্তর অন্নপূর্ণা রত্নেশ্বরকে দেন নি, দিয়েছিলেন বিমলাকান্তকে, তাঁকে তিনি ছেলেবেলা থেকে বাবাই বলতেন; বলেছিলেন—বাবা, তাহলে তুমি আমাকে কাশী নিয়ে চল। ও-বাড়ী আমি ঢুকতে পারব না।

বিমলাকান্ত তাকে বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেবেন মুখুজ্জের কাছে। এবং নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে মিটমাট করতে চেয়েছিলেন।

দেবেনবাবু হেসে বলেছিলেন—ফিরে নিয়ে যান। রত্নেশ্বর রায়কে ফিরে দেবেন। বলবেন —সোজা আঙুলে তোলা দু ফোঁটা ঘি দিয়ে ভাত খাওয়া দেবেন মুখুজ্জের অভ্যেস নেই।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন—আমার যা কিছু কাশী কলকাতা এবং শ্যামনগরে, সব আমি লিখে দিচ্ছি।

—আমাকে কি বীরেশ্বর রায়ের শ্রাদ্ধের কাঙালী ভোজনের কাঙালী পেয়েছেন বেইমশাই? না সভায় নিমন্ত্রিত চালকলা-বাঁধা পুরুত পণ্ডিত? আমি বীরেশ্বর রায়ের দৌহিত্রের পিতামহ।

অন্নপূর্ণা দেবী দরজার আড়ালে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে শ্বশুরের সামনেই ঘোমটা খুলে বলেছিলেন—বাবা, তুমি বাড়ী যাও।

বিমলাকান্ত মাথা হেঁট করেই উঠে এসেছিলেন এই জানবাজারের বাড়ীতেই। অনেক বোঝাতে চেয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়কে কিন্তু তিনি বলেছিলেন—না। সত্যসত্যই যদি পোষ্যপুত্র হতেন, তা হ'লে এই অর্ধেকই নিশ্চয় ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যখন রায়বংশের বংশধর, বীরেশ্বর রায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান তখন তা তিনি দেবেন না। তাতে তাঁর জন্মমর্যাদার হানি হবে।

দিন চারেক পর একদিন একখানা পালকীগাড়ী এসে লাগল এই বাড়ীতে। নামলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

দেবেন মুখুজ্জে তাঁকে এ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে চিরদিনের মত! গয়নাগাঁটী এমন কি ছেলে পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছেন এবং ছেলের আবার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কারণ, কি-কি মামলার কাগজে তিনি অন্নপূর্ণাকে সই করতে বলেছিলেন, তা তিনি করেন নি।

পরের দিন নরেন্দ্র-জামাই-ছেলেটিকে বুকে ক'রে নিয়ে পায়ে হেঁটে এসে হাজির হয়েছিলেন এ-বাড়ী। ছেলেটিকে অন্নপূর্ণা দেবীর কোলে তুলে দিয়ে আবার ফিরে চলে গিয়েছিলেন।

তার পরদিন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। দেবেন মুখুজ্জেমশায় ছেলেকেও ক্ষমা করতে জানতেন না। তাঁর বাক্যবাণ তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

অন্নপূর্ণা দেবী বিমলাকান্তের সঙ্গে কাশী গিয়ে ওই সন্তান—ভবেনকে নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। যাবার আগে তিনি গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। তখন তাঁর

প্রকাশ হয়েছে। দেশের মধ্যে যেন একটা নতুন হাওয়া বয়েছে। জানবাজারে পাশেই রাণী রাসমণির বাড়ী। বিমলাকান্ত নিজে একদিন তাঁকে দর্শন করে এসে মুগ্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধচিত্ত অন্নপূর্ণাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণা তাঁর মধ্যে যাই দেখে থাকুন, তার ক্ষোভ যেন মিটে গিয়েছিল। তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল।

পরমহংসদেব হেসে বলেছিলেন—গঙ্গা গঙ্গা—গঙ্গা গড়াচ্ছে রে বেটী, দে—দে ওই জল একফোঁটা দে আমাকে।

অন্নপূর্ণা দেবী দু হাতে চোখের জল মুছে তাঁর পায়ে মাখিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—ভগীরথ—ভগীরথ হবে তোর ছেলে।—ভগীরথ হবে। অন্নপূর্ণাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ঠাকুরের নামই জপ করেছেন। সেই তাঁর দীক্ষা।

বিমলাকান্তের সম্পত্তি, তাঁর টাকা যা ছিল তাঁর সব তিনি অন্নপূর্ণাকে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। আর নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, যেটা একটা চিঠিতে বীরেশ্বর রায় কন্যার বিবাহে খরচ করতে বলেছিলেন, সেই টাকাটা নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

ওটার বেলাতেও তিনি হিসেব-নিকেশ করে নিয়েছিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদসমেত কষে অঙ্ক স্থির হয়েছিল আশী হাজার। টাকাটা বীরেশ্বর রায়ের চিঠির কাল থেকে সুদে খেটেছে। তার থেকে বাদ দিয়েছিলেন বিবাহের যৌতুক তিরিশ হাজার টাকা।

ছেলেকে উকীল করে হরিশ মুখুজ্জে রোডের এই মোড়ে বাড়ী তৈরী করিয়ে, কলকাতা এসেছিলেন।

অতি কঠিন মেয়ে অন্নপূর্ণা দেবী। অত্যন্ত কঠিন। কলকাতায় এসেও স্বামী বা শ্বশুরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। দেবেন মুখোপাধ্যায়ের তখন বৃদ্ধাবস্থা, কিন্তু শক্ত মানুষ, তখন বাড়বাড়ন্তও খুব। স্বামী তখন আবার সংসারী, ছেলেমেয়ে হয়েছে। এদিকে বিমলাকান্তের মিতব্যয়ীতা এবং হিসাব করে টাকা খাটানোর গুণে নগদ টাকা সুদে আসলে বেড়ে দেড় লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁচেছে।

দেবেন মুখুজ্জের কানে কথাটা গিয়ে পৌঁচেছিল। তিনি একটা খবর পাঠিয়েছিলেন নাতির কাছে। 'একবার আসবে। দেখা ক'রে যাবে।'

ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বলে দিয়েছিলেন—একটি উত্তর করে আসবি নে। সব কথায় বলবি—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে বলব।

ছেলেও তাই করেছিল। কুশল প্রশ্নের পালা শেষ ক'রে ঠাকুরদা দেবেন মুখুজ্জে বলেছিলেন—কত বড় বাড়ী করেছ? আমার বাড়ী থেকে বড়?

ভবেন্দ্র বলেছিল—তাই কি হয়, না—পারি?

—তবে?

চুপ ক'রে ছিলেন ভবেন্দ্র। ঠাকুরদা বলেছিলেন—এ বাড়ীতে তোমার ঠাঁই হ'ত না? প্রাকটিস চলত না?

এতেও চুপ করে ছিলেন ভবেন্দ্র। দেবেন মুখুজ্জে বলেছিলেন—যা হয়ে গেছে গেছে। এমন অনেক হয়। আমার যা আছে, তা তোমার কীর্তিহাটের পুষ্যিমামার থেকে কম না। এর দাম অনেক। যাও, এ-বাড়ীতে এস সব নিয়ে। মস্ত বড় কারবার আমাদের ল' ডিপার্টমেণ্ট আছে। তা দেখাশোনা কর। প্রাকটিস কর। বুঝলে? ও-বাড়ী একটেরে ময়দানের ধারে। ভাড়া দিয়ে দাও। সাহেব-টায়েবরা এখুনি নেবে।

এবার ভবেন্দ্র বলেছিল—মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বলব।

—মাকে? আচ্ছা! তা হলে উত্তর পাঠাতে হবে না। উত্তর জানি আমি। ষোল বছরের বউ, ঘোমটা কপালে তুলে আমার সামনে এসে বলেছিল—বিমলাকান্তবাবুকে বলেছিল—তুমি উঠে যাও বাবা। আর্জিতে সই করাতে পারি নি।—আচ্ছা এস।

বাপ কথা অল্পই বলেছিলেন। বলেছিলেন—মন দিয়ে কাজকর্ম কর। আমি আশীর্বাদ করছি।

এর পাঁচ বছর পরেই, দেবেন মুখুজ্জের বয়স তখন পঁয়ষট্টি, রাণীগঞ্জের কয়লাকুঠি কিনে তার সীমানা নিয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সঙ্গে ফৌজাদারী করে আসামী হয়ে গেলেন। কুঠীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ফায়ারিং-এর হুকুম দিয়েছিলেন, বেঙ্গল কোলের দুজন লোক, ছররায় আহত হয়েছিল। একজন মারা গিয়েছিল।

বর্ধমানে সেসনস কোর্টে মামলা। কাঠগড়ায় দেবেন মুখুজ্জে, তার মেজছেলে এবং ভবেন্দ্রের সৎভাই দাঁড়িয়েছিলেন আসামী হয়ে। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর মালিক ইংরেজ। অঢেল টাকা। রাজার জাতের খাতির তাঁদের। দেবেন মুখুজ্জের টাকা কম ছিল না। তিনিও হাটকোর্ট থেকে ব্যারিস্টার এনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভবেন্দ্র মুখুজ্জে জুনিয়রের কাজ করেছিলেন কিছুদিন। তিনি নিজে থেকে গিয়ে বলেছিলেন—এ কেসে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য নিলে আমি সুখী হব।

ব্যারিস্টার বলেছিলেন—তুমি তো এখন নিজে কাজ করছ, নাম হয়েছে, আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে যাবে?

—আমি যেতে চাই।

—ওঁরা যদি না চান?

—আমি ফীজ দাবী করব না সার।

—কেন?

যতটা বলা চলে, ততটা বলেছিলেন ভবেন্দ্র। ব্যারিস্টার তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—তুমি যাবে। এবং আমি তোমাকে স্কোপ দেব।

মামলাটায় দেবেন মুখুজ্জেরা সেসনসে হেরেছিলেন। বাঙালী জজ সাহেব বাঙালী মেশানো জুরী। ওঁদের কারুর চার-বছর কারুর তিন বছর জেল হয়ে গিয়েছিল।

হাইকোর্টে সেই মামলায় রায় ওল্টালো। এবং তাতে পুরো আর্গুমেণ্ট করেছিলেন ভবেন্দ্র।

খালাস হয়েছিলেন মুখুজ্জেরা কিন্তু কলিয়ারী হারাতে হয়েছিল। গোটা ব্যবসাটাই প্রায় শেষ হতে বসেছে তখন।

*   *   *

এই অন্নপূর্ণা দেবী সুলতা। ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচে, বয়স তখন তার পঁচাত্তর। এখনও এ-বাড়ীর সর্বময়ী তিনি। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন পরমহংসদেবের কাছে। গোটা বাড়ীটাই বেলুড় মঠের শিষ্য। ভবেনবাবু নিজে স্বামীজী বিবেকান্দের সঙ্গলাভ করেছেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর উপর কথা নেই।

আজও এস্টেট তাঁর নামে। গোটা সংসারের খরচ, খাওয়াপরা, ছেলেদের লেখাপড়া, কাপড়চোপড়, চিকিৎসা এসব তাঁর হাতে। ছেলে ভবেন্দ্র মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর বয়সে। নাতিরাও সেই নিয়মে চলে। নাতিদের উপার্জন থেকে একটা ক'রে টাকা তাঁকে দিতে হয়। সেটা জমা হয় এস্টেটে। এখনও নিত্য তরকারি কোটার বঁটি নিয়ে বসেন। পাশে বসেন তিন নাতবউয়ের একজন এবং বিধবা বউ। তিনি বলে দেন—এই রান্না হবে, এই কোটো। আলু এত বড় ক'রে কুটো না। দু ভাগ নয় চার ভাগ কর।

সুলতা বললে—দুর্দান্ত মহিলা।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ তা বটে। তিনি খবর পেয়েই আমাকে ডেকে পাঠালেন। নগেন কাকা নিজে উপরে উঠে গিয়ে ঠাকুমায়ের সঙ্গে দেখা করে বললেন—চল, ওপরে চল। ঠাকুমা ডাকছেন।

আমি তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম।

তিনি সেই ফটোটা হাতে দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে টাঙানো ভবানী দেবীর অয়েল পেন্টিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। একবারে যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন।

নগেন কাকা গলার সাড়া দিয়ে ডাকলেন—ঠাকুমা।—

শুনতে পেলেন না তিনি। আবার ডাকলেন নগেন কাকা—ঠাকুমা।

মুখ ফেরালেন তিনি। দেখলুম পুরু চমশার অন্তরাল থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসেছে। তিনি কাঁদছেন।

সুরেশ্বর বললে—অর্চনার ফটোর সঙ্গে নিজের মায়ের অয়েল-পেন্টিংয়ের এমন সাদৃশ্য দেখে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ঘুরে আমাকে দেখে বললেন—এস। তারপর আবার একবার ছবির সঙ্গে ফটোটা মিলিয়ে দেখে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর একটু

হাসলেন। সে-হাসির অর্থ ঠিক বুঝলাম না। শুধু হাসি নয়, ঘাড় নাড়লেন, যেন বললেন—হায় হায়। নাতির দিকে একবার চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এই ফটোর সঙ্গে মেয়েকে একবার মিলিয়ে দেখব, বুঝলে বাবা। যদি ঠিক এমনি হয়, তবে এ-মেয়ে আমি নিলাম।—কার মেয়ে বলছ?

এমনটা আমি ভাবতে পারিনি। অর্থাৎ এত সহজে এক কথায়? তারপর বললেন—নগেন? আমি তো বললাম—তুই—

—ঠাক্‌মা, আজ এ-কথা কেন বলছ?

—বলছি। তুই হাজার হলেও ছেলের বাপ। বলে আবার একটু হাসলেন। বললেন—দেখ, ভবেনকে বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দিইনি। আমিও রাখিনি। কিন্তু ভবেনের বিয়ের সময় তোর মাতাম'-কে বলেছিলাম—তাঁর কাছে যাও। তুই ছেলের বাপ, মনে মনে হবে যে, ঠাক্‌মা-বুড়ী মরেও মরে না—বাহাত্তুরে ধরেছে, একবার আমার মতটাও চাইলে না! তারপর—। কার মেয়ে বললে?

আমি বললাম—জগদীশ্বরকাকার মেয়ে।

—জগদীশ্বর? শিবেশ্বরের মেজ ছেলে? যেটা গাঁজা খায়, মদ খায়, একটা বাঘ মেরেছিল, সেইটের?

তাঁর মুখ দেখে কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—আজ্ঞে শুনেছি, খান। আপনার কাছে মিথ্যে কি করে বলব?

—তাহলে তো টাকা-পয়সা খরচের ক্ষমতাও তার নেই।

—বড়মা, আমি একটা কথা বলব?

—কি বললি? বড়মা? হুঁ। যোগেশ্বর সাহেবের ছেলে হয়ে শিখলি কি করে রে? এ্যাঁ!—কে শিখিয়েছিল—মা? তা তোর মায়ের শ্রাদ্ধের সময় একবার খবর দিলিনে তুই হারামজাদা?

চুপ করে রইলাম। কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগছিল। বললেন—বল, কি বলবি?

বললাম—অর্চনার বিয়ের ভার আমি নিয়েছি বড়মা। যা চাইবেন আমি দেব।

—এ-মেয়ের বিয়ের ভার তুই নিয়েছিস?

—হ্যাঁ বড়মা, টাকার জন্যে মেয়েটিকে একজন দোজবরে পুলিশ দারোগার হাতে দেবার ঠিক করেছিলেন ওর বাবা। আমাকে মেজ-ঠাকুমা জেলে যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন—তুই ওর বিয়ের ভারটা নিস। ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিস।

—মেজ-বউমা মানে শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী জেলে গেছে?

নগেনকাকা বললেন—হ্যাঁ ঠাকুমা, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কীর্তিহাটের জমিদারী কেল্লার ফাটল দিয়ে দেশের হাওয়া ঢুকেছে। মেদিনীপুর তো। অতুলেশ্বর—শিবেশ্বরকাকার

দ্বিতীয় পক্ষের ছোট ছেলে, একটা স্বদেশী কেসে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে খুড়ীমা গেছেন। ছেলেটিকে তিনি মানুষ করেছিলেন, সে রিভলবার রাখতে দিয়েছিল মাকে।

—ওরে আর দুখানা আসন দে তো! দাঁড়িয়ে থেকে কোমর ধরেছে। আমি আসনে বসছি—ওরা তো ওপরে বসবে না!—

আসনে বসে আমার কাছে সব শুনে বললেন—আশ্চর্য। বংশের প্রায়শ্চিত্ত করলে শিবেশ্বরের এক ছেলে। যার বড় ছেলে মাতাল, মেজটা গাঁজাল-মাতাল, সেজটা ছিল জোচ্চোর। তার ছোট ছেলে। একটা খবর দিলিনি রে নগেনকে?—

—না ঠাকুমা। ও খুব বড় ব্যারিস্টার দিয়েছিল।

—তা দিক। তুই যেতিস। আমি খুশি হতাম।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—বস, আমি আসছি। নগেনকাকা বললেন—কাল সকালেই একবার এস। রথীনের সঙ্গে দেখা করে যাবে। তাকে একবার দেখাও হবে, আলাপ করেও যাবে। তার ঘরে তোমার আঁকা একখানা ছবি আছে। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের পর ছবির একজিবিশন করেছিলে, সে দেখতে গিয়েছিল—ইনকগনিটো অবশ্য. আলাপ করেনি। একখানা ছবি সে কিনে এনেছিল।

আমি লজ্জিতও হলাম আবার খুশিও হলাম।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর দিক থেকে অন্নপূর্ণা দেবীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—বউমা, তোমারও কি আক্কেল-বুদ্ধি সব গেছে। সব হারিয়েছ? যোগেশ্বরের ছেলে এসেছে। তুমি একবার বের হলে না। এখনও জলখাবার পাঠাও নি! ছি-ছি-ছি!

—এই তো যাচ্ছি মা! আমি একা যে বাড়ীতে।

—কেন, নাত-বউরা গেল কোথায়? আমার নগেন্দ্রাণী কোথায়? বাড়ীর বড়বউ—

—তারা আজ থিয়েটার দেখতে গেছে মা।

—থিয়েটার দেখতে? তারপরই বললেন—ও, হ্যাঁ। আমাকে বলেছিল বটে! হ্যাঁ বলেছিল। সুরেন নিয়ে গেছে তো!—

—হ্যাঁ।

—ওই, আমার আর সব মনে থাকে না। তা' তোমার হল?

—এই যে।

তারপরই পায়ের শব্দ পেলাম। এবং ঘরে এসে ঢুকলেন অন্নপূর্ণা দেবী আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, সম্পর্কে আমার ঠাকুমা—ভবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। থান কাপড় পরা, মাথার চুল ছোট করে কাটা, ছোটোখাটো মানুষটি। এককালে সুন্দরী ছিলেন। পিছনে ঝি, তার হাতে জলের গ্লাস। আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন—ভাল আছ ভাই?

—আমি সসম্ভ্রমে উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন—চিনতে পারছ আমাকে?

বললাম—হ্যাঁ। আপনি আমাকে একটা ভারী সুন্দর পুতুল দিয়েছিলেন। মার্বেলের ভেনাস, সেটা ঠাকুমা আমার এখনও আছে।

—আছে? কি বলেছিলাম বলতো?

—বলেছিলেন—এই তোমার মেম-বউ। বড়মা বকেছিলেন।

কথাটায় বাধা দিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বললেন—থাক।

সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম বাবার কথা। ওঁরা কি ভেবেছিলেন তা বলতে পারব না। পরে বুঝেছিলাম—তা পরেই বলব। একটুখানি স্তব্ধতার পর অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—রথীনের জন্যে এই মেয়ে আমি নিলাম বউমা।

—এতে আর আমি কি বলব?

—নগেনও তাই বলেছে।

—বলবে বইকি। তাছাড়া এতো দেখছি উনিই একেবারে।

—হ্যাঁ। তবে বাপ গরীব হয়ে গেছে। তা এ-ছোঁড়াটা তো বড়লোকের বেটা বড়লোক, বলছে টাকাকড়ি ওই দেবে। আগের কাল হলে কান মলে দিতুম। শোন—বিয়ের খরচ তুই করবি, বরযাত্রী খাওয়ানো আর পাত্রাভরণ। ওটা তুই দিবি। মেয়ে আমি সাজিয়ে নেব।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মুখ তুলতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে হঠাৎ জ্বলে গেলেন। বললেন—হ্যাঁরে, তখন থেকে বলব বলব করে বলতে ভুলছি—কথার পিঠে কথা এসে পড়ছে। বলি একি রে? এই জঙ্গুলে দাড়ি রেখেছিস কেন রে? বাপ রেখেছিল ফ্রেঞ্চছাঁট, তুই রেখেছিস লম্বা-দাড়ি। একমুখ জঙ্গল। কেন?

তাঁর পুত্রবধূ আমার ঠাকুমা—নগেনবাবুর মা হেসে বললেন—নাতি খুব খেয়ালী মা। ওর যখন যেটা খেয়াল হয়।

—আমি তো জানি গো সব। ওরা খবর রাখে না—আমি খবর রাখি। মহাবীর দারোয়ান এই তো বছর-কয়েক মারা গেছে। মহাবীর তো মধ্যে মধ্যে আসত। দিদি বলত আমাকে। তারপরও খবর নি। জানবাজারে লোক পাঠাই। কীর্তিহাটে দয়াল আমার থেকে ছোট। শিবেশ্বরেরও ছোট। কীর্তিহাটে যখন যেতুম কালীপুজোর সময়, তখন তাকে পাঁচ-ছ' বছরের দেখেছি। কলকাতার এ-বাড়ীতে প্রথম প্রথম দয়াল আসত। প্রথম এসেছিল তাঁর মেয়ের বিয়ের সময়; সেকাল তো বিয়ের পণ হয়েছিল বারশো টাকা, তা কীর্তিহাটের বাড়ী থেকে ওকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। দেবেশ্বর আড়াইশো, শিবেশ্বর আড়াইশো, রামেশ্বর তো তখন বিলেতে। দয়ালের নিজের ছিল শ-চারেক টাকা; বাকিটার জন্যে আমার কাছে এসেছিল, তখন তো ভবেনের খুব নাম! আমি দয়ালকে আড়াইশো দিয়ে বলেছিলাম—পণ ছাড়াও তো খরচ আছে দয়াল। তা দেখ, দয়াল সে-আমলের লোক তো,

মিথ্যে বলতে বাধত, বলেছিল—দিদি মিথ্যে বলব না, সে আমার আছে ; মাছ-কাঠ এ পাব তোমাদের বাড়ী থেকেই। আমার অভাব একশো টাকার। আর মেয়ে ইচ্ছে একখানা বালুচরের রেশমী শাড়ীর। তার দাম আর কত। ওই বিশ টাকাতেই খুব ভাল হবে। আমার কাছ থেকে একশো পঁচিশের বেশী নেয়নি।

নগেনবাবুর মা বললেন—আমি তাঁকে দেখেছি মা। কি ভাল গান গাইতেন! আর কি আমুদে লোক ছিলেন—সেই গানটা আমার আজও মনে আছে মা! সেই যে যেবার হাতে জুতো নিয়ে ছাতা মাথায় বোশেখ মাসের দুপুর বেলা এসেছিলেন, দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছিল না—।

হেসে উঠলেন অন্নপূর্ণা দেবী, বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগ্যে আমি বারান্দায় বেরিয়েছিলুম। হ্যাঁ, আমি বললাম—ওকি, দয়াল জুতো হাতে কেন? বললে—পায়ে ফোস্কা পড়েছে। গান গেয়ে বলেছিল।

—আমার সে-গান আজও মনে আছে। আপনি বললেন—ওকি রে, জুতো হাতে কেন? তো সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে কেত্তনের সুরে গেয়ে বললেন—

"ভাস্করেরই করো, অতীব প্রখরো,
ফোসোকা পড়িল পায়।
দারোয়ানে দ্বার, রুখিয়া হুঙ্কার
ভয়েতে পরাণ যায়!!"

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার তো খুব মনে আছে বউমা। আমরা খুব হেসেছিলাম। নতুন জুতো কিনে দিতে চেয়েছিলাম, তা চটি ছাড়া নেয়নি। বলেছিল—দিদি, কীর্তিহাটের মাটিতে হাঁটি খালি পায়ে, কাটা চরণ, এতে কি জুতো চলে—দেবে তো চটি দাও।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা! দয়াল-বৃদ্ধকে দেখেছি, তাঁর কাছে গল্প শুনেছি, তিনি আমার জ্বরের সময় হাত দেখতে এসে সোমেশ্বর রায়ের বজরার আসরের গল্প বলতেন। তাঁর শোনা গল্প। চিরকাল রায়বাড়ীর কাছে কৃতজ্ঞ। যদুরাম রায়ের স্বাক্ষর করা ছাড়পত্র তাঁর কাছে দেখেছি। এই বিমলেশ্বরকাকার গ্রেপ্তারের দিনও এসে কেঁদে গেছেন, কিন্তু এমন পরিচয় পাইনি। সম্ভবত বয়সের সঙ্গে হারিয়ে গেছে।

তাই সবিস্ময়ে শুনছিলাম, তাঁর আর এক কালের আর এক রূপের কথা!

সেদিন অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—"দয়াল এখনও চিঠি দিলে উত্তর দেয়, তার কাছে খবর পাই। শিবেশ্বরের আমলে একবার ওর তৃতীয় পক্ষের বিয়ের খবর পেয়ে আমি শিবেশ্বরকে খুব কড়া করে চিঠি লিখেছিলাম। গালাগাল দিয়েছিলাম। লিখেছিলাম—দয়ালের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে, তুমি আবার এই বয়সে দুই পক্ষের ছয়-ছয়টি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা থাকিতেও আবার বিবাহ করিয়াছ একটা পুরুতের মেয়েকে। পৌত্র হইয়াছে, পৌত্রী হইয়াছে, কয়েকগণ্ডা

দৌহিত্র-দৌহিত্রও হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই মতিচ্ছন্ন তোমার কেন হইল তাহা জানি না। রায়বংশকে ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িলে তুমি।”

শিবেশ্বর উত্তর দেয়নি। দয়াল দিয়েছিল পত্র। লিখেছিল, ‘দিদি আপনি আমার নাম করিয়া মেজ-রায়কে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমার আর লাঞ্ছনার বাকি নাই। অতঃপর আপনাকে আমি নিয়মিত সংবাদ দিয়া খবরাদি দিব। আমাকে আপনি পত্র দিবেন না বা মেজ-রায়কে পত্র দিবেন না। তাহা হইলে আমাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে।’ দয়াল আমাকে পত্র দেয়। তোর খবরও আমি জানি! তুই সেটেলমেণ্টে গোচর বাস্তু নাখরাজ দিয়েছিস, তুই গোয়ানদের গোয়ানপাড়া নিষ্কর দিয়েছিস, তাও লিখেছে। লিখেছে—‘দিদি যোগেশ্বরের পুত্র এই সময় আসিয়া রায়বংশের সরোবরের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছে। চারিদিকে রায়বংশের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে নহিলে শিবেশ্বরের সেই দৈত্যের মত পাগল পুত্রের কীর্তির পর রায়বংশ সরোবর নরককুণ্ড আখ্যা পাইয়াছিল।’

গম্ভীর হয়ে গেলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বোধহয় সেই ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। তারপর বললেন—সবই কর্মফল আর অদৃষ্ট তাছাড়া আর কি? আমার মাতামহের ওই যন্ত্রণা, ওই তপস্যা সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছিল তাঁর জীবনে। আমি ভাবি কি জানিস? আমি ভাবি—ওই আমার মাতামহের ওই পাপ···ওই শিবেশ্বরের ছেলেটা হয়ে এসেছিল।

এরপর সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও চুপ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নগেনবাবু মনে করিয়ে দিলেন সময়ের কথা। বললেন আমাকে। বললেন—রাত্রি তো অনেকটা হয়ে গেল, শীতকাল ৮॥টা বাজল। তা সুরেশ্বর তুমি আজ এখানেই খেয়েদেয়ে যাও। ঠাকুমা—।

যেন দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ হল তাঁর। তিনি বললেন—তাই তো যাবে। এর আর নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি? ঘরের ছেলে!

নগেনবাবু আবহাওয়াটা গরম করতেই বোধহয় বললেন—তা আজ ওকে ঘরের ছেলে বললে হবে না ঠাকুমা।

—কেন? কুটুম্ব?

—তাই বা কেন? ও আজ তোমার নাতির বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে, দেশজুড়ে কনে দেখে পছন্দ হচ্ছে না যখন, তখন এমন কনে ও এনেছে যে, তুমি যে-মেয়েটি চাচ্ছিলে, ঠিক তাকেই এনেছে। ওকে নেমন্তন্ন কর। খাতির কর।

হঠাৎ দুহাতে আমার গালদুটি চেপে ধরে বললেন অন্নপূর্ণা দেবী—শুধু তাই নয় নগু, এর চেহারা আর আমার দেবুর চেহারা এক, একরকম। ঠিক যেমন এই মেয়েটি—কি নাম—

—অর্চনা। তা বেশ নাম। ভাল নাম। অর্চনা মানে পূজা। বললেন নগেনবাবুর মা।

—হ্যাঁ। অর্চনা আর আমার মায়ের চেহারা যেমন একরকম, ঠিক সেইরকম। ছেলেবেলায়

তাই মনে হত। ওকে আমি ভেলভেটের জরিওলা পোষাক-পাগড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দেখেছি আর কেঁদেছি।

চোখের জল মুছে বললেন—শোন রে, পিসীর কথা শোন। তুই আমাকে বড়মা বলবিনে। বলবি অন্নপিসী। তা না পারিস তো বলবি বড়পিসী। দেবু কীর্তিহাটে প্রথম মানুষ হয়েছিল, আমাকে পিসীমা বলত না, বলত অন্নপিসী। শোন আজ থাবি তো এখানে নিশ্চয়। কাল সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে ফেলবি। নগু আমি তো পুজোয় থাকব ভাই। তুই দাঁড়িয়ে ওর দাড়ি কামিয়ে দেওয়াবি, কেমন? তারপর আমি উঠে ওকে দেখব। তারপর বাড়ি যাবে।

নগেনবাবুর মা বললেন—ও ভারটা আমাকে দিন মা। কিন্তু ওর চুলগুলো? ওই যে লম্বা বাবরী মতন? ওতে কিন্তু ওকে খুব ভাল দেখাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাড়ীর যাঁরা থিয়েটারে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরলেন। তাঁদের সঙ্গে অর্থাৎ নগেনবাবুর ভাই সুরেনবাবু এবং বীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। পরিচয়ে জানলাম—সুরেন-বাবুর স্ত্রী আমার মায়ের পিসতুতো বোন।

পরিবারটিকে বড় ভাল লাগল।

সবশেষে এলেন পাত্র রথীনবাবু। মেডিকেল কলেজের নাম-করা ছাত্র। এই সুন্দর সুপুরুষদের বংশের মধ্যে এই ছেলেটিই যেন সবথেকে উজ্জ্বল এবং পৃথক। চেহারায় পার্থক্য আছে। কথায়-বার্তায় আছে. আচারে-আচরণেও আছে।—

আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি এ-বাড়ীতে!

অন্নপূর্ণা দেবী তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলেন। নইলে ডাক্তার রাত্রে চেম্বার এবং নার্সিংহোম থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকে। নিচের তলায় তার ঘর। সেখানে বিশেষ রকম বন্দোবস্ত। দরজার সামনে সিঁড়িতে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো থাকে। তাই মাড়িয়ে ঘরে ঢোকেন। পোষাক সব খুলে স্নান করে কাপড়-চোপড় পরে তবে উপরে আসেন।

বেশ একটু অসুখ ও অসুখের সংক্রামকতা সম্পর্কে বাতিল আছে। স্নান করে এলেও ডেটল-জাতীয় ডিস্‌ইনফেক্‌টেন্টের গন্ধ ওঠে।

আমার উত্তর অন্নপূর্ণা ঠাকুমাই দিলেন। বললেন—তোর জন্যেই এসেছে রে। বসে আছে।

—আমার জন্যে?

এবার আমি বললাম—হ্যাঁ, আপনার জন্যেই।

অন্নপূর্ণা ঠাকুমা বললেন—দেখতো এই ফটোখানা!

—ফটো? কার?

—দেখে বলতো কার?

হেসে সে বললে—একটি মেয়ের।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, বাঘিনীর নয়, গণ্ডারনীর নয়, এতো সবাই জানে।

—তাই তো বলছি।

আমার ভাল লাগল। অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে এমনভাবে কাউকে কথাবার্তা বলতে শুনিনি। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—তুই মস্ত ত্যাঁদড়।

—বাঁদরও বলতে পার। তোমার কথার উপর কথা কয় কে বল?

—তুই হারামজাদা সে তুই বলিস। দেখতো আমার মায়ের অয়েলপেন্টিংয়ের দিকে াকিয়ে!

রথীন এবার ভবানী দেবীর অয়লেপেন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে সত্যই বিস্মিত হল। বেশ ভাল রে দেখে যেন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে বললে—তাই তো! আশ্চর্য মিল তো। অবিকল লে যাচ্ছে। বলতুম এটা ওই অয়েলপেন্টিংয়ের ফটো কিন্তু সাজেগোজে মিল নেই, এত গয়না ই। কার ফটো এ, মামণি?

—তাই তো বলতে বলছি। বল?

রথীন হেসে বললে—মঙ্গলবারের কথায় বলতে—সেটা আমার মনে আছে। মঙ্গলচণ্ডীর াসন টলল, মুকুট নড়ল; মা বললেন—দেখ তো জয়া, দেখ তো বিজয়া খড়ি পেতে, আসন ন টলে, মুকুট কেন দোলে? অমনি জয়া-বিজয়া গুণেগেঁথে বলতো—মা তোমার ভক্ত পদে পড়েছে। আমি তো ঠাকুর নই, দেবতা নই, কি করে বলি বল? তুমিই নয় ড়ি পেতে গুণেগেঁথে বলে দাও—এ-ফটো কার?

—ওই জন্যেই তোকে ভালবাসিরে ছোঁড়া। তোর এসব মুখস্থ। চমৎকার করে বলিস। ন, এ-ফটো হচ্ছে সুরেশ্বরের খুড়তুতো বোনের। শিবেশ্বরের মেজ ছেলে জগদীশ্বর রায়ের মেয়ে। বাপটা গাঁজা খায়, মদ খায়, লোককে মারপিট করে বেড়ায়। তার মেয়ে। া দোজবরে দারোগা ধরে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছে। সুরেশ্বর এসেছে আমার ছ। তোর জন্যে।

—আমার জন্যে? মানে আমাকে বিয়ে করতে হবে?

—হ্যাঁ। আমাদের সবারই মত হয়েছে। ইচ্ছে তাই।

—আমাদের বলে লাভ কি? বল তোমার মত হয়েছে। তোমার মায়ের মত দেখতে নি তোমার মন গলে গেছে। কেমন?

—তবু তোকে হ্যাঁ বলতে হবে তো।

একটু চুপ করে থেকে রথীন বললে—ভেবে দেখতে সময় দাও মামণি। আমাকে ভেবে তে হবে।

সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। রথীন এক মুহূর্তে আর এক রথীন হয়ে গেল। আলাদা, মুখ-চোখ আলাদা, সব আলাদা!

এবং সঙ্গে গম্ভীরকণ্ঠে নগেনবাবু বলে উঠলেন—রথীন !

পিতৃত্বের শাসন, ক্ষোভ, অধিকার একসঙ্গে যেন মিলিত গর্জনে ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কিন্তু রথীন বিচলিত হল না। সে বললে—বলুন !

নগেনবাবু বললেন—এমন কথা তুমি ঠাকুমাকে বলতে সাহস কর আমাদের সামনে ?

রথীন বললে—কথাটা কি অন্যায় বলেছি ? আমি বিবাহ করব। আমি ভেবে দেখব না ?

—ঠাকুমা কথা দিয়েছেন জেনেও তুমি বলছ ভেবে দেখতে হবে ?

নগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—দাঁড়াও। এ বাড়ীতে বাবার থেকে শুরু করে তোমার ছোটকাকা পর্যন্ত সকলের বিবাহ কখন হবে, কোথায় হবে, সে-সবই স্থির করেছেন উনি, আজ—

অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে রথীন বললে—আজ সে-কাল পাল্টে গেছে বাবা-এই কথাটা আপনি বুঝে দেখবেন না ?

অন্য সকলে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন—নগেনবাবুর মা, রথীনের মা, সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, তাঁদের স্ত্রীরা দুজন। অন্নপূর্ণা দেবী পাথরের মত বসেছিলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম রথীনকে।

দেখলাম, অন্নপূর্ণা দেবীর অজ্ঞাতসারে তাঁর বংশধারা গঙ্গা থেকে পদ্মা ভাগীরথীর মত দুভাগে কখন ভাগ হয়ে গেছে, তা তিনি জানতে পারেননি। অথচ দুভাগ হয়ে গেছে নিঃসংশয়ে।

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—সুরেশ্বর, বাড়ী যা বাবা। এখানে বিয়ে হবে না। তই খরচ করবি বলছিস, মেয়ে সুন্দরী—পাত্রের অভাব হবে না। তুই বাড়ী যা। তারপর রথীনকে বললেন—আমার ভুল হয়েছে রথীন, তুই স্বাধীন হবার আগে তোর বিয়ে না দেওয়া। আজ তুই স্বাধীন ;

রথীন আর দাঁড়াল না। সে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল।

আমি বললাম—খেয়ে যাব বড়মা। আমার খাবার কথা আছে যে !

*　　　*　　　*

বাড়ী ফিরে এলাম এক বিচিত্র মন নিয়ে। অর্চনার বিয়ের ভাবনা আমার মন থেকে তখন যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আমার মনে শুধু ঘুরছে রথীন ডাক্তারের কথা। আশ্চর্য একটা ছেলে।

তার সে আশ্চর্যরূপ এতকাল ওই অন্নপূর্ণা দেবীর পরমাদরের মধ্যেই লালিত হয়ে স্বচ্ছন্দ-বৃদ্ধিতে বেড়ে উঠেছে। তিনিই তাকে যেন ঢেকে রেখেছিলেন। আজ আমাকে উপলক্ষ্য করেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে সে অন্নপূর্ণা দেবীর পরমাদরের সমস্ত আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে এসে

আপনার চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

জানবাজারে ফিরলাম আমি ওঁদের গাড়ীতে। আমার গাড়ী আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। রাত্রে থাকব কথা হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল কথাটা পাকা করে নিয়ে ফিরব। বাধা উঠবে মনেই করিনি। বাধার মধ্যে বাধা বা অপেক্ষার মধ্যে অপেক্ষা থাকবে—অর্চনাকে হয়তো একবার এনে দেখানোর। কিন্তু সে কোন বাধাই নয়। অর্চনাকে পছন্দ ফটো দেখেই যখন হয়েছে, তখন চোখে দেখলে সে-পছন্দ পরম আগ্রহে পরিণত হবে তাতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু রথীনকে দেখে তার কথা শুনে তার উপর কোন ক্ষোভ আমার হল না। এ-বাড়ীর ছেলে না-হলে ভাবতাম হয়তো কারুর প্রেমে পড়েছে। হয়তো অসবর্ণ। কিম্বা হয়তো অতি মডার্ন মেয়ে। বরং উল্টো মনে হল। সেটা হল হঠাৎ—ফিরে আসছি ও-বাড়ী থেকে; গাড়ীটা সারকুলার রোড হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে ময়দান ভেঙে এসে উঠবে এসপ্ল্যানেডের সুরেন্দ্রনাথ রোড আর চৌরঙ্গীর জংশনে, পথে দেখলাম খণ্ড খণ্ড জটলা এখানে-ওখানে। তার মধ্যে দশ-বারোটি ছেলেকে দেখলাম আহত অবস্থায় গাছতলার আড়াল দিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, একটা মিটিং ছিল মনুমেণ্টের তলায়। নতুন রিফর্ম আইন প্রবর্তিত হয়েছে, সেই আইনকে বর্জন করবার জন্যই এ-মিটিং করছিল কংগ্রেসের লেফ্‌টিস্টরা।

কংগ্রেসের সে সময়ের অবস্থার কথা আমার থেকে তুমি ভাল জানো সুলতা। হয়তো বা সে মিটিংয়ে তুমিও ছিলে এমন হতে পারে।

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা করবার জন্য তরুণ দল, কংগ্রেসের মধ্যেই ছোট ছোট দল হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু লেফ্‌টিস্ট, লেফ্‌টিস্টরা তাঁর মুখ চেয়ে থাকে, তবু তিনি দল গড়েননি। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী তখন মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে এসে তিনিই তখন কংগ্রেসের সভাপতি। বোধহয় এই কারণেই তিনি দল গড়ার দিকে মনোযোগী হননি।

সুভাষচন্দ্র নেহরুর সমান জনপ্রিয়। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের বীজ পুঁতেছেন। কিন্তু তা তখনও বীজ হয়েই আছে। দেখা দেয়নি। তখন—মানে সে-সময়টায় দেশে তিনি ছিলেন না। মাসখানেক পর ফিরলেন। সেদিনও আমি কলকাতায় ছিলাম।

এম এন রায় দল গড়তে উঠেপড়ে লেগেছেন। সব থেকে বেশী দানা বেঁধেছে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি।

কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে। ছাত্র ফেডারেশন গড়ে উঠেছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি তখন জন্মেছে কিন্তু অন্য একটা নামের আড়ালে বাল্যলীলা শুরু করেছে। সবল নয়, সুস্থ নয়।

সুলতা হেসে বললে—হ্যাঁ, তখন ওরা ন্যাশনাল ফ্রণ্টের নামে কাজ চালতো। তাদের ইণ্টারন্যাশানাল এবং এ্যাণ্টিন্যাশনাল চেহারাখানা ওই নামের নামাবলী গায়ে দিয়ে বন্দেমাতরম

বলে আওয়াজ দিত। যে মিটিংটার কথা বলছ, তার কথাও মনে পড়ছে। ঠিকই বলেছ আমিও সে মিটিংয়ে ছিলাম। পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তাহলে আমি ভুল করিনি অনুমানে।

সুলতা বললে—না, তা করনি। গোটা ভারতবর্ষেই তখন সাড়া পড়েছে।

—হ্যাঁ। সেই কারণেই সেদিন আহত অবস্থায় ওদের দেখে আমার মনে হয়েছিল হয়তো বা রথীন কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বিয়েই হয়তো করবে না। এবং তার দক্ষিণপন্থী বাপ-খুড়োদের, এমনকি অন্নপূর্ণা দেবীকেও সেটা জানতে দেয়নি।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—অকস্মাৎ যেন আমি বদলে গেলাম সুলতা। রায়বাড়ীর এলাকার বাইরে এই ময়দানে যেন সারা ভারতবর্ষের আবেগ আমার বুকে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠল যে, দেব, আমিও ঝাঁপ দেব। প্রায়শ্চিত্ত করব জীবনের। শুধু আমার নয়, আমার বাবার, আমার পূর্বপুরুষদের, ইংরেজ-আনুগত্যের প্রায়শ্চিত্ত করব। কেন নিজেকে আবদ্ধ করে রাখব এই পচে-যাওয়া জমিদারবংশের জটপাকানো বন্ধনের মধ্যে!

চৌরঙ্গীর মোড়টায় এসে দেখলাম, সেখানটা ফাঁকা। পুলিশ ছাড়া কেউ নেই। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার গাড়ীটা থামিয়েও একবার দেখে নিলে আমার চেহারাটা। তারপর গাড়ীটা ছেড়ে দিলে।

গাড়ীটা এসে জানবাজারের এই বাড়ীতে থামল। আমি গাড়ী থেকে নেমে উপরে ঘরের দরজার কড়া নাড়লাম। ভিতর থেকে একজন চাকর দরজা খুলে দিলে। আমি ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় লম্বা বারান্দাটার ওধার থেকে কে আর্ত চীৎকার করে উঠল—বাবুজী—হুজুর হামার রায়হুজুর!

কে? কণ্ঠস্বরটা পরিচিত। এবং পরমুহূর্তেই মনে হল এ তো হিলডার গলা। মনে পড়ে গেল, কাল সে আমি যে-ট্রেনে এসেছি, সেই ট্রেনেই কলকাতা এসেছে। কিন্তু সে এখানে কেন?

থমকে দাঁড়ালাম।

পরমুহূর্তেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল কুইনী। খুব আশ্চর্য হইনি। কারণ হিলডার গলার স্বর আগে পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার কুইনী?

—বড় বিপদে পড়ে এখানে এসেছি স্যার। রঘু ছিল, সেই এ-বাড়ীতে আমাদের ঢুকতে দিয়েছে। নইলে হয়তো—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—জানি না কি হত? ও-বাড়ীতে দাদিয়া ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করে যা-তা গালাগাল করেছিল—হ্যারিস ওখানে তালা ভেঙে ঢুকেছে। তারা তাকে ঠেলে ঘর থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। পড়ে গিয়ে দাদিয়ার হাঁটুটা অত্যন্ত জখম হয়েছে। যার সঙ্গে এসেছিলাম, জন চৌধুরী মারপিট শুরু হতেই

পালিয়েছে। তাই এখানে এল দাদিয়া। বললে—আর কোথা যাব ? একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—আর—। বলতে গিয়ে থেমে গেল কুইনী।

—কি আর ?

—ভাড়াটেরা বললে—রায়বাবুরা নোটিশ দিয়েছে—এ-বাড়ী আমাদের। যেন অন্য কাউকে ভাড়া না দেওয়া হয়। শুনলাম, তিন মাসের ভাড়া তারা প্রত্যেককে ছেড়ে দেবে।

—আমরা নোটিশ দিয়েছি ? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না আমার।

—না স্যার। আপনাদের বড়-তরফের বাবুরা দিয়েছেন নোটিশ।

—আমাদের বড়-তরফ ? মানে জ্যাঠামশাই ?—যজ্ঞেশ্বর রায় ?

—হ্যাঁ। তাঁর নাম আছে। আর হ্যারিসের যে-ঘরটা আমরা বন্ধ করে রেখেছিলাম সেই ঘরটা হ্যারিসকে দিয়ে খুলিয়ে তাকে থাকতে দিয়েছেন বড় রায়বাবুর ছেলেরা। হ্যারিস এখন বলছে—এ-বাড়ী বড় রায়বাবুর। এখানে তারা চিরকাল ভাড়া দিয়ে থাকে। আমার মা-বাবাও ভাড়া দিত। আমার মায়ের বাবাও ভাড়া দিতো—সে তার সাক্ষী। হ্যারিসই কলকাতায় এসে বড় রায়বাবুর কাছে গিয়েছিল। তাঁর অসুখ। তাঁর ছেলে যিনি সেটেলমেণ্টের সময় কীর্তিহাট গিয়েছিলেন, তিনিই হ্যারিসকে নিয়ে এসব করিয়েছেন।

কুইনীর কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। আমি বললাম—বেশ করেছ কুইনী। ভালই করেছ। আমি খুশি হয়েছি। আপনার ভাবতে পেরেছ—এসেছ এখানে—কিন্তু কিছু খেয়েছ ?

টপ টপ করে কুইনীর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। দোকান থেকে কিনে এনে খেয়েছি। কিন্তু দাদিয়া বড় জখম হয়েছে। অনেক রক্ত পড়েছে।

আমি বললাম—আজ বড় ক্লান্ত আমি কুইনী। মনও ভাল নেই। কাল শুনব তুমি ছিলডাকে বল গিয়ে। কাল শুনব; বুঝে দেখব। তবে বাড়ী তোমার এ আমি জানি। দরকার হলে এ-কথা আমি বলব। আদালতেও বলব।

বলে উপরে উঠে চলে গেলাম আমি।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা সে রাত্রে আদৌ ঘুম হয় নি। আমার মনের মধ্যে পাশাপাশি তিনটে চিন্তার স্রোত বইছিল। ঘুমুতে আমি পারিনি।

একটা স্রোত—অন্নপূর্ণা দেবী বড়মার বাড়ীর ঘটনা এবং ওই রথীন ছেলেটিকে নিয়ে বিচিত্র অনুমান ও কল্পনা। অন্যটি কাল যে-হাওয়াতে ময়দানে নিশ্বাস নিয়ে এসেছিলাম তার চিন্তা। ঘর সংসার বংশ—সমস্ত কিছুর বাইরে যে জগতে ও জীবনের স্রোত বইছে, তার গর্জন। সে রাত্রে এই শেষেরটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাকে কোন মতে স্থির হ'তে দিচ্ছিল না। একটা প্রবল আকর্ষণে যেন টানছিল আমাকে।

আজও পর্যন্ত আমার জানাশোনা জমিদারবংশের মধ্যে দুচার ঘর ছাড়া কেউ এই ভারতের জীবনধারাকে সমর্থন করেন নি। আমি নিজে গিয়ে বণ্ড দিয়ে ফিরে এসেছি। বাবা

গান্ধীজীকে অনেক মন্দ কথা বলে গেছেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। প্রথম বম্বেতে তারপর ১৮৮৬ সালে কলকাতায়। সে সময়ে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় জীবিত। বড় ছেলে দেবেশ্বর রায় তখন তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণ। কীর্তিহাটের লোকে বলত বড়কুমার। রত্নেশ্বর রায়ের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—ল্যাণ্ডলর্ড এ্যাসোসিয়েশন থেকেই জন্মেছে। রাজা মহারাজ উপাধিধারী বড় বড় জমিদাররা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে বেশী ছিলেন না। কিন্তু সে কালের যাঁরা এক সঙ্গে জমিদার ধনী এবং শিক্ষা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রত্ন—তাঁরা এই এ্যাসোসিয়েশনেই ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্তির, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উত্তরপাড়ার দোর্দাগুপ্রতাপ জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে এরা এঁর সঙ্গে ছিলেন।

প্রথম কংগ্রেস হবার কথা ছিল পুণায়। ছত্রপতি মহারাজাধিরাজ শিবাজীর লীলাক্ষেত্রে। জানি না এটা তাঁরা সচেতন জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে করেছিলেন কিনা। মিস্টার হিউম—আমরা জানতাম মহামতি হিউম, ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের অনুমতি নিয়েই এর পত্তন করেছিলেন। দেশে তখন একটা জাগরণ এসেছে। বীরেশ্বর রায়ের কাল চলে গেছে। রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুরের কাল তখনও যায় নি কিন্তু পোশাক বদলাচ্ছে। পুণাতে কি একটা এপিডেমিক হয়েছিল বলেই স্থান পরিবর্তন করে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বম্বেতে। বাংলার উমেশ বাঁড়ুজ্জে—ডব্লু সি ব্যানার্জি হয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট। দ্বিতীয় অধিবেশন হল কলকাতায় তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন জ্যেষ্ঠের মত সমাদর করে সাহায্য করেছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির—শুধু ধনী নন, জমিদারীতে জমিদার নন, নিজে তিনি বিরাট পণ্ডিত, তিনিই ছিলেন কলকাতায় সে কংগ্রেস অধিবেশনে রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। বম্বের দাদাভাই নওরোজী মূল সভাপতি।

সভাপতি হিসেবে দাদাভাই নওরোজীর নাম প্রস্তাব করেছিল উত্তরপাড়ার জমিদার, যাঁর প্রতাপের ভয়ে প্রজারা কাঁপত, তিনি। তখন তাঁর উনআশী বছর বয়স।

সভাপতি দাদাভাই নওরোজী থেকে বিভিন্ন প্রভিন্সের ডেলিগেটরা মুক্তকণ্ঠে কলকাতার সম্বর্ধনার প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুরের আমলের জমাখরচের খাতায় তিন অঙ্কের একটা চাঁদা খরচ আছে। কিন্তু নিজে তিনি আসতে পারেন নি, তীর্থে যাবার আয়োজন করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন দেবেশ্বর রায়; তিনি ছিলেন ভলেণ্টিয়ার দলের একজন কর্তা। এবং বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৮৮৮ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে কংগ্রেস পৃথক হয়ে গেল। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হল, স্থায়ী অস্তিত্ব; তার লক্ষ্য হল স্বতন্ত্র; দৃষ্টি জমিদার ধনীদের ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন পৃথক হয়ে গেল।

রত্নেশ্বর রায়ের কাগজপত্রের মধ্যে একখানা চিঠির নকল আছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন লিখেছিল ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে। দীর্ঘ পত্র। তার কটা লাইন আমি নোট করে রেখেছি সুলতা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সেসনে ডেলিগেট পাঠাবার জন্য অনুরোধের উত্তরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী 'রাজকুমার সর্বাধিকারী' লিখেছিলেন—

"No Political Association of the country, can feel the least hesitation in sending delegates to a conference but they will naturaly shrink from associating themselves with a rival Association, whose mode of action—whose methods and measures—may often be diametrically opposite to those of their own".

এরপর থেকে জমিদার শ্রেণীই একরকম কংগ্রেস থেকে দূরে সরেছে। ছোঁয়াছ বাঁচিয়ে চলেছে। যেটুকু ছিল, তা ছিল একগোছা না-পাকানো সুতোর বাঁধনের মত। তার অর্ধেকগুলো ছিঁড়ে গেল ১৯০৫ সালে, বাকীটা ছিঁড়লো ১৯২১ সালে। সম্পদ যাদের থাকে সুলতা তারা রাষ্ট্রবিপ্লব চায় না; আর সম্পদ যাদের আছে, তাদের বাঁচবার সাধ বড় বেশী। ওই কথাগুলোই তার সাক্ষী।

এর মধ্যেও হয় তো দু' চারজন জমিদারের দুঃসাহসী বা আবেগপ্রবণ ছেলে—কংগ্রেস কেন বোমা-পিস্তলের দলেও ঢুকেছে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জমিদার বাপকে ধরে পুলিশ আপিসে এসে নরেন গোঁসাইয়ের মত এ্যাপ্রুভার হয়েছে।

কিন্তু সেদিন যেন অনুভব করেছিলাম, না—এ আর এক যুগ! অন্ততঃ রায়বংশের পক্ষে। আর এক যুগ বলেই অতুলেশ্বর এই কাজ পেয়েছে, অর্চনা তার সহকারিণী হতে চেষ্টা ক'রেছে। মেজদি যে মেজদি, তিনিও পেরেছেন।

আমি কেন পারব না?

উত্তেজনায় মধ্যে মধ্যে উঠে বসেছি সেদিন রাত্রে। সে কতবার তা মনে নেই, তবে অনেক ক'বার তা মনে আছে।

এরই মধ্যে আর এক চিন্তাও এসেছে।

মাঝে মাঝে চীৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। যন্ত্রণাকাতর নারীকণ্ঠের চীৎকার। চেঁচাচ্ছিল —গোয়ান বুড়ী হিলডা।

সত্য বলব তোমার কাছে সুলতা—মধ্যে মধ্যে এমন বিরক্তি বোধ করছিলাম যে ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে ধমক দিই। থামতে বলি। একবার অন্ততঃ মনে হয়েছিল যে দারোয়ানকে বলি—এমন চীৎকার করলে বের করে দে ওকে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল কুইনীকে। কুইনীর সঙ্গে সেই চিঠিগুলো। রত্নেশ্বর রায়ের

দানপত্র। রায় এ্যাণ্ড কোম্পানীর চিঠি ভায়লা পিক্রসকে। তার ছেলেকে পড়বার খরচ দেবার কথা। ভায়লাকে মাসোহারা দেবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আবছা প্রশ্ন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছিল কুইনীকে। কুইনীর মধ্যে একটা কি ছিল। যা আমাকে তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট করত।

হয়তো মানুষের দেহের মধ্যে যে অনিবার্য আকর্ষণ থাকে নারীদেহের প্রতি যার জন্য পরস্পরের দেখা হওয়া মাত্র নারী চঞ্চল হয়ে উঠে মুখ ফেরায়, ঘোমটা টানে, গায়ের কাপড়টা টেনে দেয়; পুরুষ বিস্ফারিত নির্লজ্জ দৃষ্টিতে দেখে প্রতি মুহূর্তে এগুতে চায় জন্তুর মত, কেবল মানুষ বলেই পারে না, সমাজ আছে বলে পারে না, গভর্নমেণ্ট আছে বলে পারে না—এটা তাই।

ভেবে দেখ সুলতা কোন জগৎ থেকে কোন জগতে গিয়ে পড়ছিলাম আমি। কোথায় দেশ-মানুষ, আত্মদান—আবার কোথায় পুরুষ আর নারী—দৃষ্টিতে মোহ, অন্তরে প্রবল আকর্ষণ তার সঙ্গে বংশের একটা অন্যায় সংযোগের রহস্যময় কিছু। তাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। বারবার নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সেদিন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর মধ্যে কিছু কিছু বিচিত্র আত্মবিশ্লেষণ আছে। ডায়রী তিনি বিলুপ্ত করে দেবেন, এই ইচ্ছে তাঁর ছিল। ডায়রীর দপ্তরের উপর লেখা ছিল—এগুলিকে আমার চিতায় পুড়িয়ে দিয়ো। যদিই তা কোন কারণে না হয়, অর্থাৎ যদি শেষসময়ে আমি একথা বলে যেতে না পারি এবং এই লুকানো দপ্তর কারুর চোখে না পড়ে, থেকেই যায়, তবে এ ডায়রী কেউ পড়ো না। যে পড়বে সে ব্রহ্মহত্যার পিতৃহত্যার পাতকগ্রস্ত হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে। তার কারণ, শ্যামাকান্তের কাহিনী, সোমেশ্বর রায়ের কাহিনী, বিমলা দেবীর সন্তান চুরির কাহিনী তিনি পৃথিবী থেকে মুছে দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে তা হয় না। রায়বাড়ীর ক্ষেত্রে আমিই তাঁর সকল নিষেধ অমান্য করলাম।

আমি পড়েছিলাম সুলতা তোমার জন্যে। ঠাকুরদাস পালের খুনের মধ্যে তিনি কি ভাবে কতখানি জড়িয়েছিলেন তাই জানবার জন্য। এবং বিচার করবার জন্যও বটে। সেই সূত্রে পেলাম রায়বংশের গোপন করা ইতিহাসের কথা। কি সে গুপ্ত কথা? তাঁর নির্দেশ মানি নি। চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে এ কথা বিশ্বাসই করতাম না। আর পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যার পাপ—এ আমাকে অর্শাবে বলে ভয়ও করি নি, পড়তে পড়তে এই মানুষটিকে ভয় হয়েছে তাঁর কঠোরতার কথা পড়ে, সত্যবাদিতা দেখে, মনের কথা একবিন্দু গোপন করেন নি ডায়রীতে। এবং বিচিত্র রঙে রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুলতা, কিছুক্ষণ আগে অঞ্জনার সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল একখানি ঘরের মধ্যে—যখন সরস্বতীবউ দ্বিতীয়া কন্যা প্রসবের পর অসুস্থ এবং শোকার্ত, কারণ মেয়েটি মারা গেছে, সেই নিরিবিলিতেও যে সাংঘাতিক কথাগুলি অঞ্জনা বলেছিল এবং তার উত্তরে তাঁর যে স্বরূপটি প্রকাশ করেছিলেন, তা তোমাকে শুনিয়েছি।

তোমাকে বলতেই হবে যে, তিনি গোপন কিছু করেন নি, এমন কি নিজের মনের অন্ধকার কোণে নিরন্তর অন্ধকারের মত যে গোপন কামনাটি লুব্ধ পশুর মত দাঁড়িয়েছিল, তাকেও তিনি গোপন করেন নি।

এই রত্নেশ্বর রায়ের আর একদিনের বা দু তিন দিনের ডায়রীর মধ্যে বোধহয়, সারা জীবনটা আকাশের আলোর নিচে পৃথিবীর মত মেলে ধরা আছে। তার মধ্যে দেখেছি এক একটা জায়গা আছে বড় ভয়ঙ্কর। মানুষের সত্য জীবনে যা আছে—গোটা পৃথিবীর কোথাও বোধহয় তা নেই।

টেবিলের উপর থাক-বন্দী ডায়রীগুলি থেকে উপরের সেই খাতাখানা টেনে নিলে—যেখানার মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ আগে অঞ্জনা এবং রত্নেশ্বরের কথা কাটাকাটির বিবরণ পড়ে শুনিয়েছিল।

এক চিহ্নিত স্থান খুলে বের করে সুরেশ্বর বললে—ওই ঘটনার তিন মাস পর। অঞ্জনা একদিন সকালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ডায়রী সেই দিনের ডায়রী।

লিখেছেন—"প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়াই শুনিলাম অঞ্জনা গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম—প্রতি দরজায় তালাচাবীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, দারোয়ান ছিল, কিন্তু তথাপি সে পলাইয়াছে।

সংবাদটা শুনিয়া মনে হইল মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আমার মাথার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে, আমার অন্তর শাল্মলীবৃক্ষ বা বটবৃক্ষের মত এই ঝঞ্ঝার মূল লইয়া অর্ধোৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হইতেছে। আমি অবশিষ্ট মূলগুলি দিয়া এবং প্রধান মূলটি দিয়া এখনও কোনরকমে টলায়মন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

চক্ষে দেখিলাম জীবনের যত অশুভ এবং মন্দবুদ্ধি ও মতি কুটিল সন্দেহ ও আশঙ্কা, জটিল জটপাকানো কামনা এবং ভাবনা—সব আজ এই ঝড়ের আঘাতে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে পঙ্কশায়ী মূলের মত উপরে উঠিয়া শত মুখ বিস্তার করিয়াছে। যত ক্রোধ তত আক্রোশ, নিগূঢ়-তম মন্দ মতলব মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতে লাগিল। খুন করিতে ইচ্ছা হইল। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল।

ক্রমে তাহা হইতে এত ক্রোধ হইল যে মুখ হাত ধুইতে ধুইতে চৌকীতে বসিয়া প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া গেলাম! অঞ্জনা পলাইয়াছে? কাহার সহিত পলাইয়াছে? মনে মনে সব বুঝিতেছি—এই সেই শয়তান, রবিনসন-হত্যাকারী আলফান্সো পিক্রুস; সে রবিনসনকে হত্যা করিয়া এখান হইতে গোয়া এবং গোয়া হইতে পর্তুগাল গিয়াছিল কিন্তু কিছুদিন হইল আবার আসিয়া হাজির হইয়াছে।

আজ পিতৃদেব থাকিলে এবং দেওয়ানজী থাকিলে হয় তো অসমসাহসিক কিছু করা যাইত। আমি ভুল করিয়া তাহাকে একটা চাকরী দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। দেশে আজ কয়

বৎসর নীল লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। দেশের সাধারণ লোকজন উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে ভারত শাসনের ভার লইলেন কিন্তু অদ্যাপি ইংরাজ ব্যবসাদারদের প্রতাপ গেল না। গোটা দেশের শাসনপ্রণালী ও পদ্ধতি তাহারাই স্থির করিতেছে। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ব্যক্তির যুক্তি-প্রতিবাদ ইহারা গ্রাহ্য করে না; ফাদার লঙের মত ব্যক্তিকেও জেলে প্রেরণ করে। সুতরাং অনেক প্রকার চিন্তা-বিবেচনা করিয়া, ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আলফান্সোকে হাতে রাখিবার জন্যই মাসিক একশত টাকা বেতন বন্দুক ইত্যাদির তদ্বির করিতে এবং প্রয়োজন হইলে সাহেব সুবাদের শীকারের ব্যবস্থা করিতে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। আলফান্সোকে এখানেই রাখিয়াছিলাম। কারণ ও অঞ্চলের দু চারজন চিনিতেও পারে। লোকটা নাম পাল্টাইয়াছিল। পূর্বে দাড়ি-গোঁফ দুইই ছিল, এখন দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছে।

সোফিয়া বাঈকে শ্রদ্ধা করি এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, তাহাকে, বেতন দিয়া পিতার মনোরঞ্জনের জন্য বাকী জীবনটার ভার তাহার লইয়াছিলাম বলিয়াই রায়বংশের সকল গোপন কথা কখনও আর প্রকাশ পাইবে না। পিতা গত হইয়াছেন, মাতা স্বর্গে গিয়াছেন—সোফি বাঈকে পাঠাইয়াছি গোয়ালিয়রে। তানসেনের সমাধিস্থল পরিষ্কার করিয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবে।

আলফান্সোকেও ঠিক সেই কারণেই রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ক্রমশ পোষ মানাইয়া আমাদের গোয়ানপাড়ায় একটা বিবাহ দিয়া বাস করাইব। বাড়ী করিয়া দিব। ঘরসংসার ছেলেপুলে হইলেই লোকটা পোষা সার্কাসের চিতায় পরিণত হইয়া যাইবে। না হয়, তখন কীর্তিহাটের জঙ্গল অঞ্চলে সুন্দরবনের দিকে লোকটাকে পাঠাইয়া দিব, আপনা আপনিই হারাইয়া যাইবে। কিন্তু লোকটা আমার পিঠের উপর ছুরিকাঘাত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদটা শুনিয়া যেন আমি ক্রোধে ক্ষোভে যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল—দামিনী ঝি খবরটা আনিয়াছে, তাহার বুকে একটা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলি—মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! অঞ্জনা যায় নাই যাইতে পারে না! না—না—পারে না। আমাকে ছাড়িয়া সে—। কিন্তু তাহা পারিলাম না।

ক্রমশঃ উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, উত্তপ্ত রক্ত শীতল হইল, মনে হইল জমিয়া প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছি।

মৃদুস্বরে বলিলাম—পলাইয়াছে? কোথায়? গঙ্গায়—

দামিনী বলিল—সে একখানা চিঠিখানা রাখিয়া গিয়াছে। চিঠিখানা বউরাণীর নিকট রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—আপনাকে ডাকিতে।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, দেবুকে লইয়া বসিয়া আছেন মদীয় শাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং বিছানায় শুইয়া আছে স্বর্ণলতা।

শাশুড়ীকে দেখিবামাত্র অগ্নিবৎ প্রজ্জলিত হইলাম। ইনিই—ইনিই সর্বনাশের একটি হেতু। ইনি, মাস চারেক পূর্বে স্বর্ণলতাকে যখন কীর্তিহাট হইতে কলিকাতা আনা হইয়াছিল, তখন কীর্তিহাটে গিয়া দেবেশ্বরকে অঞ্জনার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

এস ডি ও সাহেবের পত্নী মেমসাহেব, সভ্যা রমণী, তিনি শুনিয়েছিলেন, অঞ্জনা দেবেশ্বরকে অসভ্য কথা শিখাইতে ছিল। শুধু তাঁহাকে দোষ দিয়াই বা লাভ কি? তাহার কথায় আমিও তো সায় দিয়াছিলাম। অঞ্জনাই দেবেশ্বরকে মানুষ করিত। তাহারই অনুগত ছিল সে। তাহার কোল ছাড়া তাহার ঘুম আসিত না। তাহার জন্যই সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় দেবেশ্বরকে কাঁধে ফেলিয়া পায়চারী করিয়া ঘুমপাড়ানী গান গাহিয়া ফিরিত। মনে পড়িল এই ছড়াটাই সে বেশী গাহিত—"সে যদি তোমার মা হ'ত', ধুলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিতো।"

মাস পাঁচেক আগে শাশুড়ী ঠাকুরণ স্বর্ণলতার অন্তর্বত্নী অবস্থায় শরীর খারাপ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন অঞ্জনা দেবশ্বরকে কি কয়েকটা অশ্লীল কথা বলিয়াছিল—অশ্লীল এই অর্থে যে, হনুমান দম্পতির সঙ্গম দেখিয়া দেবেশ্বর অঞ্জনাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—পিসী দেখ—দেখ কি হইতেছে। অঞ্জনা হাসিয়া ফেলিয়াছিল। এবং ব্যাপারটা তাহাকে অশ্লীলভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিল—এমন সবাই করে বাবা। স-বা-ই করে। তাহার পরও অনেক কথা। কথাটা শাশুড়ী ঠাকরুণ শুনিয়া স্বর্ণলতাকে বলিয়াছিলেন, স্বর্ণলতা আমাকে বলিয়াছিলেন। এবং শাশুড়ীই জেদ ধরিয়াছিলেন—কলিকাতায় যাইতেছে, সেখানে সাহেববাড়ীর সুদক্ষ আয়া নিযুক্ত করা হউক দেবেশ্বরের জন্য।

কলিকাতায় আসিয়া তাহাই হইয়াছে, সাহেববাড়ীর আয়া আসিয়াছে। দেবেশ্বরেরও তাহাকে বেশ পছন্দ হইয়াছে। তাহার সাজগোছ বিধিব্যবস্থা সত্যই ভাল। অঞ্জনা তাহাতে কাঁদিয়াছিল। তাহার পরই এই সর্বনাশের, রায়বাড়ীতে এই কলঙ্ক লেপনের সূত্রপাত। কখন কি করিয়া সে ওই দুর্দান্ত আলফান্সোকে দেখিয়াছিল কি করিয়া যোগাযোগ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। পাঁচ মাস প্রায় কলিকাতা আসা হইয়াছে—অঞ্জনাকে সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি। অঞ্জনার স্বামী একটা ব্রাত্য রমণী লইয়া ব্যভিচারপ্রমত্ত হইয়াছে সুতরাং তাহাকে জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছিলাম।

মাস দুয়েক পরে, অর্থাৎ আজ হইতে তিন মাস পূর্বে প্রথম আমার নজরে আসিল অঞ্জনা আলফান্সোর সহিত দূর হইতে হাস্য বিনিময় করে। চোখে পড়িল আমারই। কয়েকদিন হইতে দেখিতেছিলাম—আলফান্সো হঠাৎ যেন অতিরিক্ত হাঁকডাক শুরু করিয়াছে এবং দারোয়ানদের কুস্তীর আখাতেও কুস্তী লড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদেরও বাহার বাড়িয়াছে এবং সে এই বাড়ীতে বেশীক্ষণ কাটাইতেছে। তাহার ডিউটি নামমাত্র—একবার সকালে আসিয়া প্রথমে ঘোড়াগুলাকে দেখে, এবং সেগুলাকে টহল দেওয়ায়। তারপর বন্দুক ও কার্তুজগুলা গুনিয়া দেখিয়া কলিকাতা দপ্তরের ম্যানেজারকে 'সব ঠিক হ্যায়' বলিয়া সেলাম

বাজাইয়া চলিয়া যায়। আবার অপরাহ্নে আসে। তখন কাজ যৎসামান্যই। আর কাজ পড়ে, কোন গাড়ী কারখানায় গেলে। সেখানে মেরামতের কাজ দেখিয়া আসে। বাড়ীতে মেরামত-যোগ্য হইলে সে নিজেই খুলিয়া তাহা করিয়া ফেলে। তবে আমি তাহা ঠিক পছন্দ করি না। কারণ যত অস্পৃশ্য চর্বির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে কোথা যে কোন স্পর্শদোষ কিভাবে ঘটে তাহা কে বলিতে পারে?

এবার তাহার এই উল্লাসময় পরিবর্তন দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আলফান্‌সো বোধহয় আবার কোর্টশিপ করিতেছে। রবিনসনের কুঠিতে গোয়ানপাড়ায় পিক্রুজের যে একটা সৎ-বোনকে লইয়া গিয়াছিল—সে মেয়েটা, আলফান্‌সো পর্তুগালে চলিয়া গেলে অন্য একনজকে বিবাহ করিয়াছে। আলফান্‌সো পর্তুগালে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু কি কারণে তাহাকে ডাই-ভোর্স করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সেই কারণেই এরূপ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দৃষ্টি যে রায়বাড়ীর অন্দর ভেদ করিয়া অঞ্জনার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেমন করিয়া বুঝিব? একজন হিন্দু নারী, ব্রাহ্মণকন্যা তাহার এমন মতি হইতে পারে কি করিয়া বুঝিব? অবশ্য সমাজে গুপ্ত ব্যাধির মত ব্যাধি আছে। ব্যাধি, বড়বাড়ী ছোটবাড়ী বাছে না। বড়বাড়ীর বড় শিক্ষাকেও ব্যর্থ করিয়া নানা অনাচার ঘটায়। কাশীধামে থাকিতে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসিয়াছি। ঘৃণা করিয়াছি। কিন্তু কখনও ভাবি নাই যে এমন কিছু আমার বাড়ীতে ঘটিতে পারে। অন্য জমিদারের বাড়ীতে ঘটে। জমিদার, ব্যবসাদার, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল. এ পাপ যেখানে সূচীছিদ্র পথ পায় সেইখানেই প্রবেশ করে।

অন্যে পরে কা-কথা, দেবতাদের গৃহেও ঘটে।

ইন্দ্র গুরুপত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন, অহল্যা পাষাণী হইয়াছিল। চন্দ্র বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল। এবং বৃহস্পতি তারাকে চন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র বুধ-সহ আবার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তবুও আমার বাড়ীর—আমি রত্নেশ্বর—আমার বাড়ীতে এমন ঘটিবে কল্পনাও করিতে পারি নাই। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল ব্যাপারটা। প্রথম পিতৃদেবের আমলের চাকর মনিন্দর এবং দারোয়ানদের ঘর হইতে ছেদী সিং ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং আমাকে তাহা জ্ঞাত করিলে, আমি ব্যাপারটা আড়াল হইতে স্বচক্ষে লক্ষ করিলাম। দেখিলাম ছাদের আলসের উপর ভর দিয়া সে অন্তরালের একটা গলিতে দাঁড়াইয়া পরস্পরে হাসিতেছে, ইঙ্গিত বিনিময় হইতেছে। ছেদীর নির্দেশমত আমি মেথর নির্গত হইবার গলিপথ ধরিয়া আসিয়া আলফান্‌সোর পিছনে দাঁড়াইয়াছিলাম। আলফান্‌সো আমাকে প্রথমটা দেখে নাই কিন্তু আলসে হইতে অঞ্জনা আমাকে দেখিয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অদৃশ্য হইয়াছিল। আলফান্‌সোকে প্রশ্ন করিতে গিয়াও পারিলাম না।

অঞ্জনার আকস্মিক অন্তর্ধানে হতচকিত আলফান্‌সো ফিরিয়া আমাকে দেখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে

ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমি ধর্ ধর্ বলিয়া চীৎকার করিতে পারিলাম না। কারণ, মুহূর্তে কারণটা এমনই বৃহদাকার ও কুৎসিত হইয়া উঠিবে যে—যাহা শুধু অঞ্জনাকে লইয়াই হইবে না, কলিকাতার অভিজাত মহলের কাছে রায়বাড়ীর মাথাই হেঁট হইবে। ওই মেথর চলাচলের পথ ধরিয়াই যেমন চোরের মত গিয়াছিলাম তেমনি চোরের মত ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। সারাদিন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই কি করিব? আলফান্সোর উপর নিষ্ঠুর ক্রোধ সত্ত্বেও চুপ করিয়াছিলাম, লোকটা এখনি যদি নীলকর সমাজে গিয়া সব ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দেয়, তবে সর্বনাশ হইবে।

ইংরেজ জাত অতি ভয়ানক জাত। এমনিতে সে ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু ইংরাজের এক বিন্দু রক্তের জন্য সে কি না পারে?

ওঃ! সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিয়া শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্রদের, হুমায়ুন বাদশাহের কবর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, খুনী দরওয়াজায় ফাঁসী দিয়া দেহগুলিরও সৎকার করিতে দেয় নাই। ইহারা সব পারে। কাশীতে বালকদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে দেখিয়াছি। পা কাটা ছেদী আজও আমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে।

ডাকিয়া তিরস্কার করিলাম অঞ্জনাকে। আশ্চর্য! অঞ্জনা সেদিন যে উত্তর দিয়াছিল তাহাতে শুধু স্তম্ভিতই হই নাই। তাহার ঠিক উত্তরও খুঁজিয়া পাই নাই।

শুধু কয়েকদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছিলাম—অপরাধ কি আমার?

অপরাধ ধর্ম অনুসারে আমার নিশ্চয় নয়, তবুও নিজেকে অপরাধী না-ভাবিয়া পারি-নাই। হ্যাঁ, অঞ্জনাকে আশ্রয় দিয়া আমার নিজের কাছে আমি রাখিয়াছি। নিজের জন্য রাখিয়াছি। স্বর্ণলতার জন্য ঠিক নহে। তাহাকে প্রশ্রয়ও আমি দিয়াছি। ইহা স্বীকার করি। কিন্তু পাপ অভিপ্রায় আমার ছিল না। তাহার কল্যাণের জন্য রাখিয়াছিলাম এবং আমার তাহাতে আনন্দ বলিয়াও রাখিয়াছিলাম। আমার এই আনন্দ তাহার মনে আশা উদ্রিক্ত করিয়া থাকিবে। হাঁ, ইহা স্বাভাবিক।

অঞ্জনাকে এইজন্যই শাস্তি দিতে পারি নাই।

আলফান্সো সেই দিন হইতে আর আসে নাই। আমি সন্ধানের জন্য গোয়ানপাড়ার পিক্রুজকে লাগাইয়া জানিলাম, সে ভীত হইয়াছে। এবং বলিতেছে—সুযোগ পাইলেই সে কলিকাতা হইতে গোয়া পলাইয়া যাইবে। যাইবার পূর্বে তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে —সে নীলকরদের পত্র লিখিয়া রবিনসন বৃত্তান্ত জানাইয়া দিবে। ইহাই অনুমান করিয়াছিলাম।

অবশ্য কলিকাতায় বা বৃটিশ এলাকায় থাকিতে সে ইহা পারিবে না। তাহা হইলে মামলায় তাহাকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আমারও হাঙ্গামা কম হইবে না। কিন্তু আমার অর্থ, আমার সম্মান, গভর্ণমেণ্ট ঘরে আমাদের রেকর্ড—এ সমস্তই আমার সহায়। আমার অনুকূলে!

আমি তাহাতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইব।

তথাপি গোয়ানপাড়ার পিক্রজকে বলিলাম—তাহাকে বলিও, এরূপ করিবার চেষ্টা করিলে একজন ইংরাজকে দিয়াই আমি তাহাকে শেষ করাইব। এবং আমিই তাকে ধরাইয়া দিব। তদপেক্ষা তাহাকে বল—আমি আবার তাহাকে কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। সে চিরদিনের মত বৃটিশ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাউক। প্রস্তাবে সে রাজী হইয়াছিল এবং এ্যাটর্নী বাড়ীতে নগদ টাকা লইয়া এ্যাটর্নীদের তৈরী একখানি কনফেশন পত্রে সই করিয়া দিয়াছে এই পরশু তারিখ।

আর আজ—আজ দেখিতেছি অঞ্জনা নিরুদ্দেশ।

কাহার সহিত নিরুদ্দেশ ইহা কি আমার নিকটেও প্রশ্ন? না, ইহা আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট। বক্ষের অভ্যন্তর যেন আগ্নেয়গিরির মত প্রধূমিত।

শাশুড়ীকে দেখিয়াই আমার সর্বাঙ্গ যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইনি—ইনি—ইনিই অঞ্জনার অন্তর্ধানের প্রথম কারণ। ইনিই। এই কলিকাতার আধাব্রাহ্ম, এস-ডি ও সাহেবের মেমসাহেব, ইনিই প্রথম কারণ। দেবেশ্বরকে অঞ্জনার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন ইনি। সায়েববাড়ীর আয়া আনাইয়া রাখিয়াছেন ইনিই। ইঁহারা স্বামী এবং স্ত্রী—উভয়ে যত বয়স হইতেছে, ততই বেশী করিয়া সাহেব-মেম হইয়া উঠিতেছেন। আমার শ্বশুরই পরামর্শ দিয়াছিলেন আলফানসোকে মাহিনা দিয়া রাখিবার জন্য। হাজার হউক একজন গোয়ানীজ ফিরিঙ্গী, শাদা চামড়া চাকর থাকিবে। শিকার করিবার সময় সাহেবদের মনোরঞ্জন করিবে, তাহা ছাড়া লোকটার মুখ যখন বন্ধ করার প্রয়োজন, তখন তাহাকে নিশ্চয় রাখিবে।

আজ তাহার ফল ফলিল। যাহা হইবার হইয়া গেল। যে পত্রখানি অঞ্জনার শয্যার উপর পাওয়া গিয়াছে, সেই পত্রখানি লইয়া এস-ডি-ও সাহেব-দুহিতা, কীর্তিহাটের বিত্তাবতী বধূঠাকুরাণী বলিলেন—দেখ, অঞ্জনার কীর্তি দেখ।

এস-ডি-ও মেম বলিলেন—আমি জানিতাম, আমি জানিতাম। সেদিন দেবেশ্বরকে যাহা বলিতেছিল, তাহা হইতেই আমি এমনি একটা কিছু অনুমান করিয়াছিলাম। দারুণ ক্রোধে আমি পত্রখানা হাতে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এবং স্থির করিলাম শ্বশুরকে লিখিব যে, এই ধরনের ঘন ঘন কন্যার বাড়ী আসাটা তাঁহার মেমসাহেবের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হইতেছে।

আমি পত্রখানা পড়িলাম—"আমি আলফানসোর সঙ্গেই যাইতেছি। তোমাদের অনেক খাইয়াছি পরিয়াছি, অনেক দিয়াছ; গহনা কাপড়; আর কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি, কায়দাকানুন শিখিয়াছি। এবার কৃশ্চান হইব। ইংরাজী শিখিব। খাঁটি মেমসাহেব হইব। স্বেচ্ছায় যাইতেছি। এবং লাটসাহেবের কাছে জানাইতেছি যে, আমি কৃশ্চান হইতে চাই কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনেরা বাধা দিতে পারেন বলিয়া হুজুর লর্ডবাহাদুরের শরণাপন্ন হইতেছি।"

সুরেশ্বর বললে—এরপর ডায়রী লিখবার সময় রত্নেশ্বর রায় যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। তখন লিখছেন—"ইচ্ছে হচ্ছে আজই লক্ষ টাকা লাগিলেও খরচ করিয়া আলফান্সোকে হত্যা করাইব। ওই গোয়ানপাড়ার পিক্রুজকে দিয়াই হত্যা করাইব। লোকটাকে কোনমতে মুখ বাধিয়া তুলিয়া আনিয়া প্রথমে আঙুল কাটিব, তারপর চোখ দুইটা গালিয়া দিব, তাহার পর জিভটা কাটিয়া দিব। এবং কানেও বধির করিয়া দিব। হত্যা করিব না।"

আবার লিখেছেন—"অঞ্জনাকে পাইলে তাহাকে অন্য শাস্তি দিব না। তাহাকে টাকা-পয়সা সাজ-পোষাক দিয়া সাজাইয়া গরাণহাটা সোনাগাজি অঞ্চলের বারবনিতা সাজাইয়া বলিব —এই পথ ছাড়া তোমার পরিতৃপ্তি হইবে না। ইহাই তোমার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আমার অভিষেকের দিন একরূপ সংকল্প করিয়া তোমার ভার লইয়াছিলাম। সুতরাং ইহা হউক পাপের পথ, এই পথেই তোমাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া কর্তব্য পালন করিতেছি। তাহার কামার্ততার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে বহুভোগ্যা করিয়া ছাড়িয়া দিব। বলিব প্রেতিনী তুমি—এই পিণ্ডেই তোমার তৃপ্তি। তাহাই গ্রহণ কর।"

তারপর আবার লিখেছেন—"ইচ্ছা হইতেছে আলফান্সোকে টাকা দিয়া ওই আলফন্সোভুক্তা স্বৈরিণীকে আনিয়া কার্তিহাটে সিদ্ধপীঠতলায় বলিদান দিই। এবং মাংস টুকরা টুকরা করিয়া ছড়াইয়া দিই। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, কুক্কুর শৃগাল, শকুনি-গৃধিণীরা খাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিক।"

ডায়রীতেই আছে—পরপর তিন দিনের ডায়রীতে যা রয়েছে, সে যেন কোন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যাওয়া মানুষের ডায়রী। মধ্যে মধ্যে অজস্র কাটাকুটোর চিহ্ন। তার মধ্যে পেলাম একজন সহিসের পিঠে দশ কোড়া লাগাবার হুকুম দিয়েছিলেন। তিনজন দারোয়ানের জবাব হয়েছিল। কারণ, রায়বাড়ীর দুটো গেটে দু'জন পাহারা ছিল আর একজন হাতার মধ্যে টহল দিয়ে ফিরেছিল। এর মধ্যে থেকেও যখন অঞ্জনা পালিয়েছে, তখন প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব তাদের। কিন্তু তারা কিছু বলতে পারেনি। বলবে কি, জানতেও কিছু পারেনি, কারণ সদর কোন পথে অঞ্জনা অদৃশ্য হয়নি, সে অদৃশ্য হয়েছিল মেথর যাওয়ার গলি-পথটার দরজা খুলে, সেই গলি পথে পথে। এবং এসে আলফান্সোর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল একেবারে রিপন স্ট্রীটের ধারে। এ-পথ তাকে বাতলে দিয়েছিল গোয়ানপাড়ার পিক্রুজের এক চ্যালা গোয়ান। রায়বাহাদুর খুন করিয়েছিলেন একেই।

কিন্তু তারপর এর জন্য যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছিলেন সে এক পরমাশ্চর্য সুলতা। পরমাশ্চর্য।

তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন—মানুষের মন যখন নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়, তখন সে স্বর্গমর্ত-রসাতল পরিভ্রমণ করিয়া ফেরে উন্মত্ত কক্ষভ্রষ্ট উল্কার মত। কোথাও সে আশ্রয় পায় না। কোথাও আশ্রয় পাইলেও, সে তাহা লয় না।

একমাত্র আশ্রয় এবং একমাত্র আনন্দ আত্মনির্যাতনে। এইখানেই পরিত্রাণ আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বহুজনকে বা বিশ্ববাসীকে যাহারা দগ্ধ করে, হত্যা করে, তাহারা দানব বা দেবতা। আমি মনুষ্য। আমি স্থির করিলাম—আমার সর্বাপেক্ষা বিলাসের সামগ্রী তাম্রকূট সেবন আমি ত্যাগ করিব।

সুলতা বললে—কিন্তু দেবতা বা দৈত্যের চেয়েও এ-মানুষ ডেঞ্জারাস।

হেসে সুরেশ্বর বললে—ওখানে আমার কোন বাদ-প্রতিবাদ নেই। কিন্তু যে-কথা থেকে এত কথা বললাম সুলতা; সেইটে বলে নি। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সেই রাত্রে আমার মনও এমনি করে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বা স্বর্গ-মর্ত-রসাতল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রসাতলে টানছিল হিলডার চীৎকার।

সে কি অমানুষিক গোঙানী।—

ওই গোঙানী শুনে বিরক্তই হচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, হেঁকে দারোয়ানকে বলে দি যে, হিলডাকে বল চুপ করতে, না হলে বেরিয়ে যাক এখান থেকে। এমন করে চ্যাঁচানো চলবে না।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চক্ষে মনে হচ্ছিল একটি তরুণীর মুখ। আজই ভবানীপুর থেকে ফিরে এসে ওকে দেখেছি। ড্রয়িংরুমে আড়াইশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলছিল—তারই পরিপূর্ণ আলোকের মধ্যে দেখেছিলাম কুইনীকে। সেই দিন সকালে, সকালবেলাতেই পাঁশকুড়ায় তাকে দেখেছিলাম, আবার দেখলাম এই রাত্রে ইলেকট্রিক আলোর সামনে।

আশ্চর্য মমতা হয়েছিল তার উপর। গভীর মমতা।

Poor Girl!

ঈশ্বর জানেন, তিনি সাক্ষী, সুলতা, চিত্ত আমার চকিত হয়নি তা নয় হয়েছিল; কিন্তু সে অত্যন্ত নর্মাল ব্যাপার। কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য নারী-পুরুষ চলে পাশাপাশি; ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে; এর মধ্যে যেমন অহরহ একটা মুহূর্তের ভাল লাগার চকিত তরঙ্গ বর্ষা-রাত্রির জোনাকির মত জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে, ঠিক তারই মত। তার বেশী কিছু নয়। —না, ভুলই বললাম। কুইনী তো জোনাকীর মত হারিয়ে যাবার কেউ নয়। সে থাকে গোয়ানপাড়ায়। তার মায়ের বাপকে রত্নেশ্বর রায় বাড়ী দান করেছেন। নিশ্চয় কোন দেনা ছিল।

সেসব কথা ভেবেই দারোয়ানকে হেঁকে বলতে পারিনি—হিলডাকে বলে দাও, চীৎকার করতে হলে যেন বাইরে গিয়ে করে। বের করে দাও।

কুইনীর শান্ত শ্রীমতী মুখখানিও মনে পড়েছিল। সেটা যেন পুরনো বন্ধনের সঙ্গে একটা নতুন বন্ধনের মত গর্জাচ্ছিল—

দেবেশ্বর রায়ের চিঠি মনে পড়েছিল।

রত্নেশ্বর রায়ের এলিয়ট রোডের বাড়ী দানপত্রের কথা মনে পড়েছিল। বলেছি তোমাকে, সেদিন রাত্রে ভাবনা-চিন্তা আমার যেন স্বর্গ-মর্ত-রসাতল ঘুরে বেড়াচ্ছিল ধূমকেতুর মত অথবা নতুনকালের প্লেনের মত। কখনও ভাবছিলাম—দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কখনও ভাবছিলাম—সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়ে রায়বংশের সকল ঋণ শোধ করার কথা। অর্থাৎ চিন্তার প্লেনটা এখুনি ল্যাণ্ড করে আবার রানওয়ে ধরে ওমাথায় গিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল। আবার ঘুরে এসে নামছিল। কিন্তু রসাতলের দিকে যখন ওই হিলডাকে উপলক্ষ্য করে কুইনীকে লক্ষ্য করে নেমে যাচ্ছিলাম, তখন যেন ইঞ্জিনটি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বিকল হয়ে গেছে, একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে।

হ্যাঁ সুলতা, তুমি যা ভাবছ তাই।

কুইনীকে দেখে সেদিন আমি সত্য সত্যই যেন মুগ্ধ এবং মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে আলাপ যখন হয়, তখন তার মধ্যে তোমার শ্রী, তোমার রূপও ছিল। কিন্তু এর চেয়েও বড় ছিল তোমার মনের আকর্ষণ।

কিন্তু কুইনীর আকর্ষণের মধ্যে তার শ্রী-রূপ ছাড়াও একটা কিছুর আকর্ষণ আমাকে আগুনের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি করেই আকর্ষণ করছিল।

সুরেশ্বর যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ উঠে গিয়ে সে ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটের দিকে কাচের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেছে সেদিনের কথা।

আজ ১৯৫৩ সাল। সেদিন ছিল ১৯৩৭ সাল। সেদিনের চঞ্চলতা যেন আজও তার স্মৃতিকে এবং স্মৃতির সঙ্গে মনকে খানিকটা অস্থির করে তুলেছে। বাইরে নভেম্বরের রাত্রে কলকাতার রাস্তা দোকান আইন সত্ত্বেও জমজমাট রয়েছে। পথে জনতা চলছে। এ-জনতা সারাদিন যারা খাটেখোটে, পেটের ধান্ধায় ফেরে তারা ঠিক নয়। অবশ্য পেটের দায় সব সময়ই আছে। গভীর রাত্রে যে-হতভাগিনী দেহ বিক্রীর আশায় রাস্তার কোন কোণে দাঁড়িয়ে থাকে, সে পেটের দায়েই থাকে। কিন্তু তার থেকেও বেশীসংখ্যক থাকে অন্য একদল মানুষ। যারা রাত্রিকালে জীবনের উন্মত্ত নেশায় পাগলের মত বের হয়। নারীদেহের পর নারীদেহ ভোগ করে যাদের তৃপ্তি হয় না। কেন হয় না তা তারা তো জানেই না। অন্যেও জানে কিনা বলতে পারে না সুরেশ্বর। তবে ব্যাধি বললে মিটে যায় এক কথায়।

আজ তার মনে পড়ল কুইনীকে। সেদিনের কুইনীকে। যার জন্য সেদিন ১৯৩৭ সালের শীতের রাত্রে সে পায়চারি করেছিল এবং পেডি ডগলাস বার্জ মার্ডার কেস, অতুলেশ্বরের কেস, ১৮৮৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে দেবেশ্বর রায়ের অংশগ্রহণ থেকে হিলডার চীৎকারে সে যে কুইনীর চিন্তায় এসে পড়েছিল, সেই কুইনীকে আজ আবার মনে পড়ল। কুইনীর সেই আকর্ষণ আজ তার মনে পড়ছে।

সুলতা প্রশ্ন করলে—কি হল? বস! না, ক্লান্তিবোধ করছ? কিম্বা—?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুলতা উঠে গিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে ডেকে বলেছিল—সুরেশ্বর—

—সুলতা।

—তাহলে কি—তুমি সেইদিন—সেই—সেই—।

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বললে—না-না-না। ছিঃ। এতখানি ছোট তুমি আমাকে মনে কর না সুলতা!

সেদিন আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমুইনি। কিন্তু সে শুধু কুইনীর তাড়না নয়। আরও ছিল। বলেছি তোমাকে। ১৯৩৭ সাল। ১৯৩০ সাল থেকে পেডি ডগলাস বার্জ মার্ডার যেখানে হয়েছে, সেই মেদিনীপুরে তখন থাকতাম আমি। অতুলকাকা ধরা পড়েছে। মেজদিদি অর্চনাকে বাঁচাতে ধরা দিয়েছেন, জেল খাটছেন। বিমলেশ্বরকাকা ওই কাণ্ড করেছেন। আগের দিন রাত্রে অন্নপূর্ণা-মাকে দেখেছি, ফিরবার সময় ময়দানে তখনও জায়গায় জায়গায় লোক জমায়েত দেখেছি। সেদিন কেউ তাই পারে? না, তা নয়। তবে হাঁ, তার আশ্চর্য আকর্ষণ আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম। আশ্চর্য! অর্চনা, মেজদি, অতুলেশ্বর, বিমলেশ্বর এরা চারজনে চারদিকে ঘিরে আমাকে বোধহয় বাঁচিয়েছিল সেদিন।

নীচে হিলডা চীৎকার করেছে, আমি ঠিক এইখানে এই কাচঘেরা বারান্দায় পায়চারি করেছি, কখনও দাঁড়িয়ে থেকেছি। ইচ্ছে হয়েছে নীচে যেতে কিন্তু পারিনি। তার কারণ ওই চারজন। এবং আরও একজন—সে হল রঘু চাকর। সে তো আমি না ঘুমুলে ঘুমোয় না। পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল এরা।

যেন বলেছিল—না-না-না। নীচে নেমো না। নামতে গেলে বাকি থাকবে না। নতুন কাল এসেছে। পাল্টেছি, পাল্টাচ্ছি, রায়বাড়ীর আমরাও পাল্টাচ্ছি। এসময় আর নীচে নেমে৷ না।

কথাগুলো শুনতে বোধহয় তোমার সেন্টিমেণ্টাল বা ইমোশনাল মনে হচ্ছে, তা হতে পারে। এবং সত্যও তাই। কিন্তু এই সেন্টিমেণ্ট আর ইমোশন এই দুটোই সংসারে অঘটন ঘটায়, চিরকাল ঘটিয়ে আসছে, আজও ঘটাচ্ছে, সেদিনও ঘটিয়েছিল।

কুইনী একলা জেগে বসে আছে, তা যে-কেউ অনুমান করতে পারে। হিলডার ওই চীৎকার এবং যন্ত্রণা দেখে সে নিশ্চয় ঘুমোয়নি।

ভোরবেলার দিকে হিলডার চীৎকার একটু কমে এসেছিল—আমারও একটু তন্দ্রা এসেছিল। রঘু আমাকে ডাকলে।

—লালবাবু!

তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললাম—কি? এখন চা খাব না, যা।—

রঘু বললে—না লালবাবু, ওই গোয়ানপাড়ার ওই পেড়কীটি—ওই কুইনী আপনের সাথ

দেখা করনেকে মাংছে। হলদী বুড়ীর বহুৎ বেমার।

চমকে উঠলাম। কুইনী?

—হাঁ লালবাবু, ছোকরী কাঁদছে।

—কাঁদছে? কোথায়?

—সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বললে—রাত্রে আরও দু'-দুবার সে বাবুজীর কাছে আসবার জন্যে এসেছিল কিন্তু ডাকতে সাহস করেনি।

আমি চমকে উঠলাম। কুইনী রাত্রে আরও দুবার আসতে গিয়ে ফিরে গেছে? বুকটাও কেমন করে উঠল।

রায়বংশের ছেলে আমি এবং ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদের রাত্রে বলছি তোমাকে; কথাটা তুমি দুই অর্থে ধরে নিতে পার। বুকটা চলকে ওঠার হেতু কিছু ছিল না। কারণ, কুইনী কাঁদছিল, তবু রক্ত। রায়বংশের রক্ত স্থূলতা। অথবা বলতে পার মানুষের রক্তের কীর্তিনাশা ধারা। জান্তব-জীবন থেকে উদ্ধার করতে বহু তপস্যা করে মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন ভগীরথ। সাগরের কাছাকাছি এসে গঙ্গা ভুল করে পথ হারাল। মানুষই তাকে ভুল পথে নিয়ে গেল। অথবা বলতে পার, ওইটেই তো স্বাভাবিক ক্রমনিম্নতা। জলের স্বভাববশে ওই পথেই তো যাবার কথা। তাই গিয়েছে। তবে বিষ্ণুপদের মহিমা আছে, সেখান থেকে ঝরা জল; তেমনি মানুষের সাধনারও মহিমা আছে, সেই সাধনার বলে কীর্তিনাশাকে বাঁয়ে সরিয়ে পতিতোদ্ধারিণী সাগরসঙ্গমে গেছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব—গত দশ-বারো বছরের যুদ্ধ, কালোবাজার, তারপর স্বাধীনতার পর আমাদের বিজয়াদশমীর দিনের মদ খেয়ে উন্মত্ত উলঙ্গ নৃত্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব কিছুটা থাকে, মরে না, একবারে মরে না। সেদিনও আমার মনুষ্যত্ব ছিল। রায়বংশের রক্ত হলেও তার মধ্যে বেঁচে ছিল।

ঘরের দরজা খুলে দেখলাম কুইনী দাঁড়িয়ে আছে, চোখদুটি রাঙা, বুঝলাম অনেক কেঁদেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে কুইনী?

—বুড়ী দিদিমা—আর বলতে পারলে না।

—কি হল? সারারাত্রি তো চীৎকার করছিল। এই তো কিছুক্ষণ আগেও শুনেছি।

—হ্যাঁ স্যার। কিন্তু হঠাৎ মুখ খুলতে পারছে না—গোঙাচ্ছে। কি রকম হয়ে গেছে।

—চল দেখি। ভয় কি, একটু বেলা হলেই ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি। আসবে দেখবে ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। হাঁটুটা বোধহয় পেকে উঠে থাকবে।

—হঁ্যা খুব ফুলেছে।

ঠিক এই সময়েই একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঢুকল বাড়ীর ফটকের মধ্যে। এই মুহূর্তেই এলেন অন্নপূর্ণা-মা। অবশ্য আমি সঠিক অনুমান করতে পারিনি যে, এ একেবারে খোদ অন্নপূর্ণা-মা এবং রথীন। তবে ভেবেছিলাম, কম্পাস গাড়ী যখন, তখন এ ভবানীপুরের মুখুজ্যেবাড়ীর

গাড়ী। হাইকোর্টে ১৯৩৭।৩৮ সালেও এক ঘোড়া দিয়ে টানা পালকিগাড়ীর অনেক ভিড় ছিল। ওদের বাড়ীতে যখন ঢুকি বিকেলবেলা, তখন গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল। কালো ঘোড়াটার কপালে সাদা দাগটা ভাল লেগেছিল বলে চেনা হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ীটা দাঁড়াল, আমি চমকে উঠলাম। একি, ভিতরে খোদ অন্নপূর্ণা দেবী, বড়-মা? আর ও কে? রথীন?—

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ীটার পাদানের সামনের অংশটা খুলে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—বড়-মা!

চিবুকে হাত দিয়ে হাত মুখে ঠেকিয়ে বড়-মা বললেন—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাশী যাব ভোরে উঠে। ও-বাড়ীতে আর থাকব না। মা যে-বাড়ীতে দেহ রেখেছেন, সেই বাড়ীতে দেহ রাখব। ওরে মাঝরাতে দেবু এসে যেন আমাকে ডাকলে। সেই বাঁকা বাঁকা হেসে বললে—হেরে গেলে তো! আমার মত পিসী হারতে হয়। জেতা যায় না গো। আমি উঠে বসে ঝি চাকরদের ডেকে জিনিস গুছাতে বল্লাম—আমি হার মানব না। চলে যাব কাশী।—কিন্তু ভোরবেলা রথীন গোলমাল লাগালে। পায়ে জড়িয়ে ধরে বললে—হ্যাঁ, আমি বিয়ে করব, করব, করব। তুমি বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না।

গোলমাল হয়ে গেল সব। তা বললাম—আগে চল তাহলে গঙ্গাস্নান করে আসি রাণী রাসমণির ঘাটে, আর বলে আসি সুরেশ্বরকে।

বলতে বলতে নামলেন তিনি। আমার ঘাড়ের উপর হাতের ভর দিয়ে। আশী বছরের কাছে বয়স কিন্তু বড়-মা বেশ শক্ত ছিলেন। চোখে তাঁর চশমা লাগত না। তাঁর পিছনে পিছনে রথীন। রথীনকে পেয়ে বেঁচে গেলাম। অর্চনার সমস্যার সমাধান তো হলই, হিলডাকেও দেখাতে পারব। সে ডাক্তার।

বড়-মা নেমেই বললেন—তোর মায়ের ঘরে চল। যে-ঘরে তোর মা শেষকালটা থাকতো। আমি শুনেছি, আমি তোদের সব খবর নিই রে, বিশেষ করে দেবুর গুষ্টীর। তোর মা বড় পবিত্রভাবে থাকত। সেই ঘরে চল। বলতে বলতেই তিনি বললেন—এ-মেয়েটি কে রে?

অর্থাৎ কুইনী। সকালের সদ্য-ওঠা রোদটা কুইনীর মুখের উপর পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে ঈষৎ পিঙ্গলাভা, রঙের মধ্যে চাপা পর্তুগালের রঙের আভাস, কালো চোখ এবং সে-চোখদুটি তার বিচিত্র ডাগর, আয়ত, পটলচেরা, হরিণচোখ এ-সবের কোনটা না নয়, কিন্তু চোখদুটি আশ্চর্য কালো এবং আশ্চর্য গড়ন, বিশেষ করে চোখের পাতার চুলগুলি। এবং সমস্ত জড়িয়ে একটি বিষণ্ন মহিমা ফুটে উঠেছিল। নির্বাক হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখতে যাচ্ছিলাম হিলডাকে, তাতে বাধা পড়ল, তাতে তার চোখে-মুখে একটি বিরক্তির রেখা ফুটল না। তার দিকে চোখ পড়া স্বাভাবিকই ছিল। রথীনও তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি বড়-মার কথার উত্তরে বললাম—ওদের বাড়ী এখন একরকম কীর্তিহাট বড়-মা।

[এখা]নে এসে বিপদে পড়ে গেছে, দিদিমাকে নিয়ে কাল রাত্রে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—

কথায় বাধা দিয়ে বড়-মা বললেন—কাদের মেয়ে গো তুমি—হ্যাঁ মেয়ে?

বিনম্রভাবে নমস্কার করে কুইনী বললে—নমস্কার মা। আমি গোয়ানপাড়ায় ছিলাম। [আ]মি ওদের।—

—গোয়ান? ও মা! গোয়ানরা এখন এইরকম হয়েছে নাকি রে? এঁ্যা? এ যে [ক]লেজে-পড়া মেয়ে-টেয়ের মত! এঁ্যা, আগে সেই লম্বা গাউনের মত ঢিলে পা পর্যন্ত জামা পরে [ঘু]রত—।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। বললেন—উ? কাউকে যেন কিছু প্রশ্ন করলেন। সম্ভবত [নি]জেকেই।

কুইনী বললে—আমি ওখানকার মেয়ে নই মা। আমি কলকাতার মেয়ে। তবে গোয়ান-[প]াড়ার ওরা আমাদের আত্মীয়। খুব আপনজন।—

—তাই বল। কলকাতার মেয়ে তুমি।—ওরে রথীন, চশমাটা দে তো। দেখ তো ওই [ভি]জে কাপড়ের ঝোলাটার মধ্যে থাকবে। দে তো!

চশমাটা চোখে দিয়ে খুব ভাল করে কুইনীকে দেখতে লাগলেন। আমি অস্বস্তি বোধ [ক]রতে লাগলাম সুলতা। আমার পাপবোধই বল আর যাই বল মনে হচ্ছিল অন্নপূর্ণা দেবী [মে]য়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজছেন—হয়তো বা আমারই স্পর্শের ছাপ বা চিহ্ন কিছু [খু]ঁজছেন।

সেইজন্যে আমিই কৈফিয়ৎ দিলাম নিজে থেকে—মেয়েটির মায়ের দরুণ একটা বাড়ী ছিল [ক]লকাতায়, সে-বাড়ী নাকি আমাদেরই দান-করা ওদের পূর্বপুরুষকে। সেই বাড়ীতে থাকত [ও]রা। ওর বাবা ছিলেন আমাদের দেশী খৃষ্টান—মুখার্জি; ওর মা ছিলেন গোয়ান মেয়ে। [হ]ঠাৎ দুজনেই মারা গেলেন একসঙ্গে বছর-দেড়েক আগে, মেয়েটিকে গোয়ানপাড়ার হিলডা [পি]ক্রুজ বলে একটি বৃদ্ধা মহিলা আছেন—

—হলদী? হলদী?—সে তো আমার থেকে ছোট। তা অবিশ্যি এখন বুড়ী হবে বই [কি]! হলদী বলতাম আমরা। ছোট্ট মেয়েটা। সে বেঁচে আছে? আরে কালীপুজোর সময় [য]খন যেতাম, তখন আসত আমাদের কাছে। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, দাদা একখানা বাড়ী দিয়েছিলেন ভায়লেট বলে একটা মেয়েকে। সে অনেক কাণ্ড। [অ]নেক।—

আমি চুপ করে শুনছিলাম, উনি থামতেই বললাম—ওদের সেই বাড়ী জ্যাঠামশায়ের তরফ [থ]েকে ও'র ছেলেরা ওদের বেদখল করে দিয়েছে। ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া তারা আদায় [ক]রছে। খবর পেয়ে হিলডা এসেছিল কুইনীকে নিয়ে। তা কাল ঝগড়া করে হাঁকিয়ে [দি]য়েছে, হিলডাও গালাগাল করেছিল, তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গোটা হাঁটুটা জখম হয়ে

গেছে। ছাল-চামড়া তো উঠেছেই, আর কি হয়েছে জানি না। কাল ও-বাড়ী থেকে এসে দেখি ওরা কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানে এসেছে। ওই নীচের পুবদিককার একখানা ঘরে আছে। বেচারী সারারাত্রি যা চীৎকার করেছে যন্ত্রণায় যে, সে আর বলবার নয়। তাই সকালেই মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল খবরটা বলতে। তা রথীনবাবু এসেছেন ভালই হয়েছে। একবার দেখুন তো ভাই কি হয়েছে।

—টিটেনাস-ফিটেনাস নয় তো? ক'ঘণ্টা হল? মানে চোটটা লেগেছে কখন?

কুইনী এবার বললে—কাল বেলা তিনটের সময়। দিদিয়া বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিল—রায়বাবু ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন উঠোনের উপর।

বড়-মা ফোঁস করে উঠলেন—রায়বাবু?—কে?—কোন্ রায়বাবু?

কুইনী উত্তর দিলে না, আমি বললাম—প্রণবেশ্বরদা। জ্যাঠামশায়ের ছেলে।

—যজ্ঞেশ্বরের ছোট ছেলেটা—রাস্তার উপর যেটার গাড়ী আটকে কান মলে কাচ্ছি কয়লা-ওলারা গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে দেনার জন্যে গাড়ী কেড়ে নিয়েছে, সেইটে?

আমি চুপ করে রইলাম।

বড়-মা বললেন—তুই যা রথীন, হলদীকে দেখে আয় কি হয়েছে। না, দাঁড়া আমিও যাব। একবার দেখব হলদীকে।

* * *

এই ধরনের সারারাত্রি চীৎকারের জন্য হলদীকে দোষ দেওয়া যায় না। বেচারার হাঁটুটা একেবারে ফুলে এবং পেকে যেন ঢোল হয়ে উঠেছিল। সারারাত্রি চীৎকার করে ভোরবেলা বুড়ী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে জেগে উঠে আবার চীৎকার শুরু করে দিলে। রথীন দেখতে গেল তার ক্ষতটা, তাতে আতঙ্কিত হয়ে ছোট মেয়ের মত হাউ-মাউ করতে লাগল।

কুইনী তাকে বোঝালে—এমন করে না দিদিয়া। ডাক্তারবাবুকে দেখতে হবে তো। কিন্তু সে-কথা শোনে কে? এবার ঘরের ভিতর ঢুকলেন অন্নপূর্ণা-মা। ধমক দিয়ে বললেন—এই হলদী। কচি খুকি নাকি তুই? এ্যাঁ! ছেলেবেলার সে-অভ্যেস তোর দেখছি এখনও যায়নি। চুপ কর।

হলদী অন্নপূর্ণা-মাকে দেখে কেমন হয়ে গেল। সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। এবং চুপ করেই চেয়ে রইল। রথীন হাঁটুর ক্ষতটা বেশ ভাল করেই দেখলে, একবার দুবার নাড়লেও, তবু হিলডা যেন তা খেয়ালই করলে না, সে চেয়ে রইল অন্নপূর্ণা-মায়ের মুখের দিকে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—পছহানতে পারিস?—অ্যাঁ? পারছিস না?

হিলডা বললে—মালুম হচ্ছে কি চিনি আপনাকে, লেকিন—

—ঠিক ঠাওর করতে পারছিসনে? না? রায়বাহাদুর হুজুরের আমল মনে পড়ে? এ্যাঁ!

উঠে বসতে চেষ্টা করলে হিলডা। তার ফলে চাড় পেয়ে হাঁটুর ফুলোর যে-অংশটা আংশিক-

বে পেকেছিল, তা ফেটে গেল। চীৎকার করে উঠল হিলডা।

রথীন বললে—গরম জল করে আন। এখন ধুয়ে দাও। টিংচার-আইডিন থাকলে নিকটা দিয়ে দাও তাতে। তারপর আমি বরং কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দেব, সে পরিষ্কার রে দিয়ে ড্রেস করে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

আমি কুইনীকে বললাম—তুমি যাও কুইনী, রঘুকে বল—সে জল গরম করে দেবে। টিংচার াইডিনও থাকতে পারে।

অন্নপূর্ণা-মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হিলডা বললে—পিসী রাণীমাঈ!

—হ্যাঁ। পিসী রাণীমাঈ!

হিলডা বললে—এ হি দেখেন পিসী রাণীমাঈ, আপনের সাদীর সময় হামি আপনেকে কের টাপ চেয়েছিলাম, এহি দেখেন—এহি সেই টাপ, হামি আজও খুলে নাই। কুইনীকে ললাম—হামি মরব যখুন, তখুন তু খুলিয়ে লিস। ইটা খুব দামী পাথল বটে।

—হ্যাঁ, ওটা হীরে। হাত দিয়ে নাড়ছিলাম, ওটা পড়ে গেল বাগানে। খুঁজে পাওয়া াল না। একবেলা পর তুই ওটা খুঁজে পেয়ে আমাকে ফেরৎ দিতে এসেছিলি। আমি বলে-ছলাম—তুই ওটা নে। ভায়লা বলে সেই মেয়েটা তোকে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে সেছিল।

—আপনের সব মনে আছে, আপনের সব মনে আছে। ঠোঁটদুটো তার কাঁপতে লাগল। কছুক্ষণ পর বললে—তব তো আচ্ছা হল পিসী রাণীমায়ী—আপনে বিচার করে দেন। আপনে ানেন। ভায়লাকে নিয়ে গোপাল কলকাতা গেল—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—হ্যাঁ আমি জানি। আমি শুনলাম, দাদা ভায়লার ছেলেকে বাড়ী দয়ে গিয়েছিলেন। এলিয়ট রোডের বাড়ী। সেই বাড়ী প্রণবেশ্বর কেড়ে নিচ্ছে। আমি নেছি।

—হামাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।

—সেও শুনেছি। চোখে দেখছি। রত্নেশ্বর রায়, ধার্মিক রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুরের র্গসিংহাসন ওল্টাতে ওল্টাতে পড়ছে মাটিতে তাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তুই ভাবিসনে, ামার ছেলে হাইকোর্টের উকিল, তাকে বলে দেব, সে তোদের হয়ে মামলা করে দেবে াইকোর্টে। বাড়ী তোদের যাবে কোথায়?

একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন—এই মেয়েটি কে হয় ভায়লার?

—ভায়লার? ভায়লার বেটা পিড্রু, ওই পিড্রু সাদী করলে এক আংরেজ ফিরিঙ্গী লেড়কীকে। একটা বেটী পয়দা হল। ওহি বেটী সাদী করলে এক দেশী কৃশ্চান মুখুর্জিকে। ারই বেটী এই কুইনী।

—ভায়লার বেটার বেটীর বেটী?

—হাঁ !

—হ্যাঁ। তাই দেখলাম। চোখে-মুখে ভায়লার আদল আছে। ভায়লার রঙ ছিল শাদা। এর রঙে কোন মুখুজ্জেবাড়ীর রঙের ছোপ ধরেছে। কিন্তু চোখদুটো একরকম—নাক-মুখ তাও মেলে। অঞ্জনা-দিদিকে মনে পড়িয়ে দেয়, চুলগুলোও কোঁকড়া। সেই এক ছাঁচ।

কুইনী দুই হাতে তোয়ালে দিয়ে ধরে ফুটন্ত গরম জলের একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচি এনে নামালে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ওরে বেটী, একবার মুখ তোল তো, দেখি আর একবার ভাল করে।

একটু অবাক হয়ে গেল কুইনী।

ঠিক অ—। বলে থেমে গেলেন অন্নপূর্ণা-মা। তারপর বললেন—ঠিক তেমনি চোখ, তেমনি চুল। আমার বয়স তখন তো কম নয়। আমার ছয়। দেবুরও ছয়। বউদিদির কোলে একটা মেয়ে হয়ে মারা গেছে। আমার তাকে বেশ মনে পড়ে। কাশী থেকে কীর্তিহাটে আসতাম-থাকতাম, দিনরাত দেবু-আমি ছুটোছুটি করতাম—বউদিদি সামলাতে পারত না। সামলাতো ওই—।

চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—এ-বাড়ী যদি কেড়ে নেয় যজ্ঞেশ্বরের ছেলেরা তবে—। কি বলব তবে ? কি বলব ?

রথীন বললে—বড়-মা বড়-মা ! তুমি উপরে চল। এখানকার ব্যবস্থা সব হচ্ছে, হবে। চল ওপরে চল।

* * *

উপরে অন্নপূর্ণা-মাকে চেয়ারে বসিয়ে তোলা হল। রথীন আর আমি দুপাশে দুজন উঠছিলাম। হঠাৎ রথীন বললে—রাগলে আর তোমার জ্ঞানগম্যি থাকে না বড়-মা।

অন্নপূর্ণা মা বললেন—ওরে হারামজাদা, যেখানে আমি রেগে জ্ঞানগম্যি হারাই, সে হল আমার খাস এলাকা। বুঝলি ! সেখানে আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন ও-কথা যে বলবে, তার মুখে পোকা পড়বে। তোদের সংসার আমার পাতা, আমার মায়ের আশীর্বাদে আর পিসেমশায় বিমলাকান্ত চাটুজ্জের মূলধনে। বুঝলি। নইলে তোদের মূল মুখুজ্জেবংশের পরিণাম তো দেখছিস চোখে। আর এই এ-পাশে এই দেখ সুরেশ্বর ; ওদের এতবড় রায়বাড়ী, এত সম্পত্তি, এত চাল, এত চলন, তার পরিণামও দেখছিস। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর আমার ভাই, লোকে বলে তার মত লোক আর হয় না। ধার্মিক, রায়বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একেবারে কষ্টি-পাথরে নিখাদ সোনা ! হায়, হায়, হায়। কি বলব ? দেখ, তার বংশের পরিণাম দেখ !

* * *

উপরে মায়ের ঘরে এসে ঘরখানা খানিকটা চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন—সুরেশ্বর, রথীন কাল রাজী হয়েছে বিয়ে করতে। বল রে—বল রথীন।—বল, সুরেশ্বরকে কথা দে।

রথীনবাবু বললেন—আমি কথা দিলাম সুরেশ্বরবাবু, অর্চনাকে আমি বিয়ে করব, করব, করব।

আমি বললাম—বড়-মা, তাহলে কখন বিয়েটা হবে? দিন একটা স্থির করে আপনিই দিন। কলকাতা থেকেই বিয়ে দেব—আপনি যেমন বলেছেন। বিয়ের পর কখনও অর্চনাকে কীর্তিহাটে পাঠাতে বলব না। আর জগদীশকাকার সে সামর্থ্যও নেই। তাঁরা মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হলে এ-বাড়ীতে আসবেন, এসে ইচ্ছে হলে মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন বা আপনার বাড়ীতে যাবেন। আপনি যা বলেছেন, তাই হবে বড়-মা। আমরা তাই মানব।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেখ, কাল তুই গিয়েছিলি, তোকে একরকম ফিরিয়েই দিয়েছিলাম। আমি নই—ওই রথীন ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভোরবেলা উঠে এসে বললে—বড়-মা, আমাকে মাপ কর তুমি, ওই মেয়েকেই বিয়ে করব আমি। চল তুমি, সুরেশ্বরবাবুর ওখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল—একলা যেতে ঠিক আমার পা উঠছে না। তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওসব শর্তের কথা যা বলেছিলাম, তা মানবি—ভালই। তবে ওগুলো আমি এক-রকম রাগ করেই বলেছিলাম রে! শর্ত কাল যেগুলো বলেছিলাম, তার কড়াকড়ি এক রাত্রেই হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু শর্ত আজকে দিচ্ছি তোকে। বিয়ে হবে, মেয়ে আমি সাজিয়ে দেব। তুই বরাভরণটা দিস। আর এই বাড়ীতে বিয়ে হবে—ফুলশয্যের তত্ত্ব কলকাতায় একটা বড় ব্যাপার, সেটা ভাল করে করিস। কিন্তু এসব ছাড়া কিংবা এসবের উপরে একটা শর্ত আমি তোকে দিচ্ছি সুরেশ্বর। সেটা তোকে মানতে হবে।

—বলুন বড়-মা, কি মানতে হবে।

—ওই যে নীচে যে-মেয়েটিকে দেখে এলাম, কি নাম?

—কুইনী।—

—হ্যাঁ। কুইনী মুখুজ্জে। ওর বাড়ী কেড়ে নিয়েছে কোন প্যাচপোঁচে ফেলে যজ্ঞেশ্বরের ছেলেরা। ওকে ওর বাড়ী ফিরিয়ে দিতে হবে। মামলা করলে উদ্ধার হয়তো হবে। নিশ্চয় হবে। সাক্ষী তো আমি আজও বেঁচে রয়েছি। দয়াল চোখে অঞ্জনাকে দেখেনি। কিন্তু অঞ্জনার নাম, তার কাণ্ডকারখানা, তার জন্যে রায়বাহাদুর একটা গোয়ান ছোঁড়াকে কেটে ভাসিয়ে দিলে এসব দয়াল শুনেছে। জানে।

রথীন অবাক হয়ে শুনছিল—মানে ঠিক বুঝতে পারছিল না। আমি আন্দাজ করছিলাম অন্নপূর্ণা-মা কি বলছেন বা বলতে চাচ্ছেন। আমি তাঁর ডায়রীর এখান-সেখান থেকে পড়েছি, একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত পড়েছি। বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। তবু এইটুকু বিস্ময় বোধ করছিলাম যে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় অত্যাচারী প্রজাপীড়ক, জটিলবুদ্ধি, মামলাবাজ, আইনানুগত্যের মুখোশে মুখ ঢেকে ন্যায়পরায়ণ সেজে ইস্কুল, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন,

অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু ডায়রীতে মিথ্যে কথা লেখেননি। মধ্যে মধ্যে কথা বাদ দিয়ে গেছেন মাত্র।

অন্নপূর্ণা-মা বলে যাচ্ছিলেন—লোকের কাছে সত্য গোপন থাকে না। অঞ্জনা ছিল সম্পর্কে আমাদের দিদি, দাদার সমবয়সী, তার বিয়ে হয়েছিল এক বাউণ্ডুলের সঙ্গে—

—জানি বড়-মা।

—তুই জানিস ?

—জানি।

—কি করে জানলি ?

—কাগজ ঘেঁটে, রায়বাহাদুরের ডায়রী পড়ে। আপনার বাবার একখানা খাতা আছে—সেখানা পড়ে।

একটু চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তাহলে তো জানিস যে, আলফান্সো পিক্রুজ বলে সেই খুনে ফিরিঙ্গীটা অঞ্জনাকে নিয়ে পালিয়েছিল। পালিয়েছিল গোয়ায়। সেখানে অঞ্জনা মারা গেল। অঞ্জনার অসুখের সময় আলফান্সো চিঠি লিখেছিল দাদাকে—আমার দাদাকে। দাদা টাকা পাঠিয়েছিলেন হিলডার বাবার হাত দিয়ে। হিলডার তখন জন্ম হয়নি। আমারই বয়স তখন দশ—মনে পড়েছে পিড্রুজ অঞ্জনার মেয়ে ভায়লেটকে নিয়ে ফিরে এল কীর্তিহাট। শুনলাম, আলফান্সো পাগল হয়ে গেছে। পিড্রুজ মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে এখানে। দাদার নাকি তাই হুকুম ছিল।

ভায়লেট তখন তিন বছরের। বাংলা একটু-আধটু বুঝতো। হয়তো অঞ্জনা শিখিয়েছিল। ভায়লেটের চোখ ছিল ঠিক অঞ্জনাদিদির মত।

তারপর—

অনেকক্ষণই চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তখন দাদার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিয়ের পর টাকা নিয়ে সম্পত্তির দাবী ছেড়ে দিয়েছি। আমার শ্বশুর আমাকে এক-রকম ত্যাগ করেছেন। স্বামী প্রতিবাদ করতে পারেননি। আমি কাশী এসে পিসেমশায়ের মেয়ের মত সংসার পেতে ছেলেকে মানুষ করছি। একদিন খবর শুনলাম, দেবু, দেবেশ্বর তোর ঠাকুরদাদা, বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছে।

সে এই ভায়লার জন্যে। ভায়লেট পিক্রুজের জন্যে।

আমি সে-সময় একবার শ্যামনগর এসেছিলাম। দেবুকে দেখবার জন্যে। দাদাকে বলেও এসেছিলাম—এ দেবুর পাপ নয়। এ তোমার পাপের ফল।

* * *

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। অন্য কেউ হলে তার ঘাড়ে মাথা থাকত না। ধার্মিক দাদা আমায় খুন করাতেন অন্য লোককে দিয়ে, তারপর যে খুন হল, তার

ছেলেদের জমি-জেরাত-টাকা দিতেন। আবার খুন করে যে ফাঁসি যেতো, তার মামলায় টাকা খরচ করতেন। তার ছেলে-মেয়েদেরও টাকাকড়ি দিতেন। ঠাকুরদাস পাল এমনি একটা কথা বেফাঁস বলেছিল বলে হিলডার বাবা পিক্রুস তাকে খুন করেছিল। সেসব এই ভায়লা মেয়েটাকে নিয়ে।

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ হেসে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তবু এমন মানুষ, এমন শক্ত ধার্মিক মানুষ আর হয় না। আমি বললাম—এ তোমার পাপের ফল। দাদা চমকে উঠে বললে—কি বললি অন্নপূর্ণা ? এতবড় কথা তুই বললি ?

তখন ঠাকুরদাসের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে সদ্য সদ্য।

আমি বলেছিলাম—তুমি বীরেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি মেয়ে। আমি ঠাকুরদাস পাল নই। তোমার বাড়িতে আমি জল পর্যন্ত খাব না।

গুম হয়ে গেলেন প্রবলপ্রতাপ মহিমান্বিত রায়বাহাদুর। একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ, আমি তুই ভাই আর বোন। এ-বাড়ীতে তোর যে অধিকার, আমার সেই অধিকার। এ-বাড়ীর মান-মর্যাদা তুই আদালতে দাঁড়ালে—

বলেছিলাম—থাক। সে-কথা তুলো না। সেখানে পাপ তুমিও করনি, আমিও এমন কিছু ধম্মের ধ্বজা তুলিনি।

—বেশ, তাহলে বল্লে যা, এতে তুই আমার পাপটা কোথায় দেখলি ? ঠাকুরদাস কি বলে আমাকে শাসিয়েছিল তুই জানিস ?

অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—ঠাকুরদাস মরেছে ছোট মুখে বড় কথা বলে। সে তুমি যা করেছ তাই করেছ। ও যদি পাপ হয়, তবে ও-পাপ না করে তোমার উপায় ছিল না। আমি কাছে থাকলে তোমার কানে কানে বলতাম—দাও, মুখটা একেবারে বন্ধ করে দাও। আমি বলছি, ভায়লাকে দেবেশ্বর ভালবেসেছে, একটা কাণ্ড করেছে বলে তুমি লাফাচ্ছ, বলছ—ছেলের মুখদর্শন করব না। তুমি ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করে দিয়ে কীর্তিহাট এসে বসে আছ। ঠিক কথা। খুব পুণ্যিবানের কথা। কিন্তু কই বলতো, অঞ্জনাদিদিকে তো মা-বাবা এখানে ঘড়বাড়ী দিয়ে ওর স্বামীকে সুদ্ধ চাকরি দিয়ে সংসারী করে দিতে চেয়েছিলেন। তুমি সেসব করলে, বাড়ী দিলে, জমি দিলে, ওর বাউণ্ডুলে স্বামীটাকে চাকরি দিলে, কিন্তু অঞ্জনাদিদিকে সে-বাড়ীতে স্বামী নিয়ে সংসার পাততে দিলে না কেন ? তার কোলে দেবুকে দিয়ে তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে—। থাক, তুমি বড়-দাদা, বয়সে অনেক বড়। বাপেরই বয়সী—বাইশ বছরের বড়। সেসব কথা আমার বলা উচিত নয়। বলব না। অঞ্জনা যে চলে গেল, সে তোমার পাপে গেল। আবার সেই পাপের ফল তুমি টাকা-পয়সা খরচ করে গোয়ায় লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এলে। চোখের সামনে পুষে রাখলে। এ-পাপ তোমার কর্মফল কিনা ?—বল না, তুমিই বল।

কীর্তিহাটের কড়চা

চতুর্থ খণ্ড

অন্নপূর্ণা-মা সেদিন অর্চনার বিয়ে পাকা করবার সময় সুরেশ্বরকে শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—শোন, কালকে যা কথা হয়েছে, তাই ঠিক রইল, কন্যাভরণ আমি নেব না। শুধু শাঁখাশাড়ী দিবি। পাত্রকে পাত্রাভরণ দিতে হবে ও যা চাইবে। ছোঁড়ার মোটরগাড়ীতে ঝোঁক, ডাক্তার হয়েছে। একটা মোটরগাড়ী দিস্। আর ঘড়িকড়ি যা দিতে হয় আসর সাজিয়ে দিবি। যোগেশ্বরই একমাত্র টাকা রেখেছিল, জমিয়েছিল, সুদে বাড়িয়েছিল; তার অর্ধেক সে উড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধনীদের টাকা রাজা জমিদারের টাকা যাতে যায় তাতেই উড়িয়েছে। তবু ভাল সে অদ্ধেক রেখে গেছে। নগেন বলছিল—নাতবউ তোর মায়ের বুদ্ধিতে তা বিষয়-সম্পত্তিতে লগ্নী ক'রে বেড়েছে অনেক। তোর বোন নেই। তুই দিবি। তার সঙ্গে আর একটি শর্ত চাপাব।

সুরেশ্বর বলেছিল—বলুন।

—ওই বাড়ী, যা দাদা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছে অঞ্জনাদি'র মেয়ে ভায়লাকে, যাকে দেবেশ্বর কৃশ্চান হয়ে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছিল, তার বাড়ী যদি কেড়ে নেয় রায়বংশের কেউ তাতে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই সুরেশ্বর।

সুরেশ্বর বলেছিল—ব্যাপারটা যতদূর বুঝছি, তাতে হ্যারিস বলে একটা লোক, সে হল কুইনীর মায়ের সৎমামা—

—তুই বলছিস ভায়লার বেটা পিড্রুজ যে ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল, সেই মেয়েটার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর সন্তান?

—হ্যাঁ। সে কিছুদিন আগে কীর্তিহাটে গিয়েছিল। তার দাবী তার মা, মানে কুইনীর মায়ের-মা মরবার সময় কুইনীর মাকে বলেছিল, হ্যারিসকে থাকবার জন্যে একখানা ঘর দিস। লোকটা জঙ্গলে বাস করত, বড়লোকদের শিকারের শখ হলে তাদের বনে নিয়ে গিয়ে শিকারের ব্যবস্থা করে দিত। তার-পর একটা খুনখারাপী করে লোকটার জেল হয় বারো বছর। জেল থেকে ফিরে লোকটা কলকাতায় এসে দেখে কুইনীর মা মরে গেছে, কুইনীকে হিলডা নিয়ে এসেছে কীর্তিহাটে। সে কীর্তিহাটে এসেছিল কুইনীকে নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে বাস করবে, কুইনীকে মানুষ করে তুলবে লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু হিলডা লোকটাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—ওর মতলবটাই অত্যন্ত বদ মতলব। মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে—।

হ্যারিসকে নিয়ে যা ঘটেছিল তা সে সবই বললে অন্নপূর্ণা-মাকে। এবং দুই আর দুই চারের মত হ্যারিস ও প্রণবেশ্বরের যোগাযোগ ফলটাই অনুমান ক'রে বললে।—হ্যারিসই খুঁজে বের করেছে প্রণবেশ্বরদা'কে। হয়তো বা কীর্তিহাট থেকেই সে ঠিকানা-ফিকানা যোগাড় করে এনেছিল। এসে এই কাণ্ড বাধিয়েছে। তা আপনি বলছেন—আমি বাড়ীটা যদি দরকার হয় তবে না-হয় দাম দিয়েই আবার কুইনীর নামে দলিল করিয়ে দেব। নিশ্চয়

করব আমি।

রথীন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনেই গেল। একটি কথাও বললে না। সে চারিদিক ঘুরে আমার আঁকা ছবিগুলো দেখছিল।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—বিয়ে তা হলে ফাল্গুনেই হবে। তুই আয়োজন কর। কিরে রথীন? বল আর একবার বল।

—আবারও বলতে হবে?

—হবে।

—তা হলে বলছি, আগে একবার তিন সত্যি করেছি আবারও করছি। করব, করব, করব।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ভাল, তুই একবার ওই মেয়েটিকে ডাক।

—কাকে? কুইনীকে?

—হ্যাঁ।

—এখানে ডাকব?

—বারান্দাতে দাঁড়াতে বল।

কুইনী এসে বারান্দাতে দাঁড়াল, অন্নপূর্ণা-মা তাকে বললেন—তোমার বাপ তো মুখুজ্জে বামুন ছিল?

কুইনী হাসলে, বললে—হ্যাঁ মুখার্জি ছিলেন কিন্তু আমরা ক্রশ্চান। আমার বাবার বাবা তাঁর বাবা প্রপিতামহ ক্রশ্চান হয়েছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তা হলেও তুমি ভায়লেটের বংশ। আমি এই বাবুকে বলে গেলাম, কোন ভয় নেই তোমার, ও বাড়ী তোমরা নিশ্চয় ফিরে পাবে। ভায়লেটকে আমি চিনতাম।

কুইনী চুপ ক'রে রইল।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—আমি কে জান?

কুইনী বললে—জানি, হিলডাদিদিয়া বললে—আপনি কীর্তিহাটের সব থেকে বড় জমিদার রায়বাহাদুরের বোন।

—হ্যাঁ। তোমার মায়ের বাবার মা ভায়লা—ভায়লেটকে আমি তোমার মত দেখেছি। বুঝেছ? তাকে খুব ভালবাসতাম আমি।

কুইনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা বিনীত আভিজাত্য আছে সুলতা। সে আঘাত সহ্য করে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু হারে না। কারণ যুদ্ধ তো হয় না তার সঙ্গে। সে নিরস্ত্র। তবে হ্যাঁ, অনেক কুম্ভকর্ণ আছে যারা সশস্ত্রনিরস্ত্র বাছে না, চর্বণ করে হাড়গোড় পর্যন্ত শেষ করে দেয়।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—আমি সুরেশ্বরকে বলে দিলাম। তুমি পড়াশোনা কর। রায়বাড়ীর বড় তরফ তোমায় পড়ার সমস্ত খরচ যোগাবে। ভায়লেটের ছেলে মিশনারী ইস্কুলে পড়ত? তার খরচ বড় রায় তরফ। দিয়েছে। পিড্রুজ মারা গেলে তোমার মায়ের পড়ার খরচ তাও দিয়েছে। কনভেণ্টে পড়ত বোধ হয়।

কুইনী সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালে এবার। সম্ভবতঃ এত কথা তিনি জানলেন কি ক'রে সেই প্রশ্নটাই তাকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল।

অন্নপূর্ণা-মা রথীনকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন।

বিকেলবেলা খবর পেলাম বিশে ফাল্গুন বিয়ের দিন স্থির করছেন অন্নপূর্ণা-মা।

বিশে ফাল্গুনই বিয়ে হয়ে গেল সুলতা। শর্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম সুলতা। শুধু অর্চনার বিবাহের বরপণ বা খরচ সম্পর্কেই নয়, অন্নপূর্ণা-মা কুইনী সম্পর্কে যে শর্ত আমার উপর চাপিয়েছিলেন তাও আমি পালন করেছিলাম।

তার মধ্যে কিছু কথা আছে, কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সে কথা না বললে রায়বাড়ীর জবানবন্দী অসম্পূর্ণ থাকবে। এবং অর্চনাকে নিয়ে যা প্রশ্ন করলে তাও ঠিক পরিষ্কার হবে না।

* * *

বিয়ে ঠিক হয়েছে বিশে ফাল্গুন। আমি জানবাজারের বাড়ীতে। জগদীশ্বরকাকার গোটা সংসারকে এখানে নিয়ে এসেছি। হিলডা কুইনী ফিরে গেছে কীর্তিহাটে। আমি মেদিনীপুরের মিশনারীদের ইস্কুলে এবং হোস্টেলে কুইনীকে দেবার জন্যে চিঠি লিখেছি। আর বাড়ীখানার জন্য প্রণবেশ্বরদাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। অনুমান আমার সত্য, হ্যারিস এসে প্রণবেশ্বরদাদাকে দিয়ে বন্ধ ঘরখানা খুলিয়ে ঢুকে বসেছে। প্রণবেশ্বরদা হাজার হলেও রায়বাড়ীর ছেলে। বিষয় ব্যাপার বোঝে, হ্যারিসের কথায় কাগজপত্র খুঁজেপেতে পেয়েছে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ। অবশ্য বেশ ক'বছর আগের রসিদ। তখন তাদের অবস্থা ভালই ছিল। বোধ করি বিশ বছর আগের। তারপর খুঁজে খুঁজে পেয়েছে যে বাড়ীর দানপত্র হওয়া যে-কালে হয়েছে সেই কাল থেকেই কর্পোরেশনের ট্যাক্স বরাবরই দিয়ে আসছে রায়বাড়ীর বড়তরফ।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর এ দায়টা চাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন বড় ছেলে দেবেশ্বরের ঘাড়ে। তাই বরাবর দেওয়া হয়ে আসছে। বিশ বছর আগে যখন বড়তরফের বড়তরফ প্রণবেশ্বর-দাদারা কর্পোরেশনের সব ট্যাক্সই বাকী ফেলতে শুরু করলেন তখন থেকে আমাদের বা আমার তরফ থেকেই জয়েণ্ট প্রপার্টির ট্যাক্স দিয়ে আসা হচ্ছিল। এ বিশ বছরের ট্যাক্স আমরাই দিয়ে এসেছি। হ্যারিসের কাছে হদিসটা পেয়ে প্রণবেশ্বরদা নিজে থেকে গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে কর্পোরেশন ট্যাক্স দিয়ে এসেছে এবং একলা তার বাপের অর্থাৎ জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশ্বর রায়ের নামে রসিদ কাটিয়ে এনেছে। তার ফল এই। এলিয়ট রোডের বাড়ীখানি লাভ! লাভ না-হোক ক্লেম বটে। ষোল আনা না-হোক আট আনা বটে—তাতে কোন

সন্দেহ নেই। আরও একটা জিনিসে তার ভরসা ছিল, সেটা আমার মূর্খতা। সেটেলমেন্টে নগদ হাজার কয়েক টাকা দিয়ে গোয়ানগাড়া চাকরান থেকে পুরো নাখরাজ করে দিয়েছি; কীর্তিহাটে গোচরভূমি আর বসতবাড়ী কুড়ারাম ভটচাজের পাঁচালী দেখিয়ে বিনা খাজনায় ভোগ করতে দিয়েছি, এবং টাকা এখনও আমার লাখ কয়েক ছিল সুতরাং হিলডা এবং কুইনী কেঁদে পড়লে হয়তো আরও কিছু খরচ করতে আমি রাজী না হয়ে পারব না।

প্রণবেশ্বরের হিসাবে ভুল ছিল না। কিন্তু ওদের অদৃষ্ট খারাপ, তার প্যাঁচেই সত্যি অঙ্কও ভুল হয়ে যায়। পাওনার অঙ্কের বাঁদিকে কখন যে একটা ফুটকি বসিয়ে দিয়ে পূর্ণকে ভগ্নাংশ করে দেয় তা গণৎকার বলতে পারে, আমি পারি না। অন্ততঃ তখন তেমনি কপালের পালাই চলছিল।

প্রণবেশ্বরদাদাকে ধরতে চেষ্টা করেও পারছিনে। জগদীশ্বরকাকাকে আনতে চেষ্টা করছি, তাও পারছি না। জগদীশ্বরকাকা স্ত্রীর সঙ্গে অর্চনা এবং অন্য ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজে আসেননি।

কারণ তখন ইলেকশন ক্যাম্পেন চলছে পুরোদমে, এবং ইলেকশন ঠিক সামনে।

মেদিনীপুর। বাংলার পীঠস্থান মেদিনীপুর। সকলেই জানে মেদিনীপুর থেকে কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট এবং এক্সট্রিমিস্ট ক্যাণ্ডিডেট ছাড়া কেউ আসবে না। কংগ্রেসের ভিতরে তখন দুটো ভাগ তা তুমি আমার থেকে ভাল জান সুলতা। কিন্তু প্রণবেশ্বরদাদা সেখানে গেছেন, জগদীশ্বরকাকা সেখানে থেকে গেছেন এই ভোটপর্ব থেকে কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায়।

আমি সকালবেলায় উঠে বারান্দায় রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি খবরের কাগজের জন্যে। কোথায় কোন বক্তৃতা হল, কে কি বললে, তা জানবার জন্যে মন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

বিয়ের উদ্যোগের আয়োজন চলছে। খুড়ীমা ম্লান মুখে এসে যখন বলেন—হ্যাঁ বাবা, এটার কি করবে? তখন আর লজ্জার আমার বাকী থাকে না।

আমি বলি—যা বলবেন তাই হবে।

কিন্তু তিনি মাটির দিকে মুখ নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে যে অনেক খরচ হবে বাবা!

—আমি আপনাদেরই ছেলে! বললে এমন আশ্চর্য হাসেন, যাতে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতে হয়।

সেদিন সেই সকালেই মনোহরপুরের খুড়ীমা বলতে এসেছিলেন—প্রণামীর কাপড়ের কথা। দুদিন আগে ওবাড়ী থেকে অন্নপূর্ণা-মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে এর জন্যে। সকলকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে খিল বন্ধ করে অন্নপূর্ণা-মা আমাকে বলেছিলেন—শোন সুরো, আজ আমি যা বলছি তা রায়বাড়ীর মেয়ে হয়ে বলছি রে! ভবানীপুরের মুখুজ্জেবাড়ীর বউ

না আজ আমি। এরা বড় ছোট রে! সেইজন্যে আমার পেটের ছেলে থেকে—আমার রক্ত দিয়ে এদের তৈরী করে ভেবেছিলাম, যে এরা পাল্টাবে। তা পাল্টায় না রে। দেখ —ক'দিন থেকেই নগেন সুরেন বীরেন এদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, বউরাও গিয়ে যোগ দিচ্ছে। সে সব কথা কানে আসছে আমার। ছোটলোকের মত কথা রে। কাল নাকি কথা হয়েছে, শুধু কথা কেন, ফর্দও হয়ে গেছে একটা। প্রণামীর কাপড়ের ফর্দ। বুঝলি! চাকরবাকর ঝি ঠাকুর সহিস কোচম্যান এ তো সব আছেই, এগুলো বকশিশ। কিন্তু প্রণামীর দাবী নাকি রথীনের মা বলেছে—আমাদের মানে আমার. মেজবউয়ের, ছোট বউয়ের বাপ-মাদের না দিলে মাথা হেঁট হবে। ওটা তোমরা নিজেরা কিনেই দাও।

সুরেশ্বর, কথাটা আমার বড গায়ে লেগেছে রে। দেখ, ছেলেদের বলতে পারিনি কিন্তু তোকে বলতে আমার লজ্জা নেই। কেন জানিস? ওরা হল পরগোত্র, ওদের গোত্রে আমি এসে পড়েছিলাম, লাঞ্ছনার অন্ত হয়নি। আমার বাপের টাকায় আর পিসেমশায়ের টাকায় এই বংশ আমি আমার বংশ মনে করেছিলাম। কিন্তু তারাই আজ আমার বাপের বংশের খেউড় করছে, তা আমার বুকের শেলের মত বিঁধছে। শোন, ফর্দ আমি কাল করে পাঠিয়ে দেব। কাকে কি কাপড় দিতে হবে—গরদ, শান্তিপুরে, কাঁচি, মিলের পেটাই, খদ্দর সব লিখে দেব। বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস তুই দিবি। সর্বোৎকৃষ্ট। শোন, টাকা আমি দেব, কিন্তু কাকপক্ষীতে জানবে না। তুই আর আমি।

আমি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটু হয়তো উঁচু গলাতেই বলেছিলাম—না বড়মা, খরচ যা লাগে—।

তিনি মুখটা আমার চেপে ধরেছিলেন। জানিসনে সুরো, দেওয়ালের কান আছে। যা বাড়ী যা।

বাড়ী ফিরে সেই মত ফর্দই আমি করিয়েছিলাম। কথাটা কেমন করে যে জগদীশকাকার স্ত্রীর কানে উঠেছিল তা বলতে পারব না, তিনি সকালবেলাতেই অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—একটা কথা বলতে এলাম বাবা।

—কি বলুন খুড়ীমা!

—ওঁরা নাকি যা প্রণামীর কাপড়ের ফর্দ দিয়েছেন তার দাম নাকি আড়াই হাজারের কম হবে না?

সুরেশ্বর বললে—তখনও ১৯৩৭ সাল সুলতা। চালের দর চার টাকার মত, কাপড় কাঁচি ধুতির জোড়া বোধ হয় বারো-চৌদ্দ টাকার বেশী নয়। মানে একখানা ছ'-সাত টাকা। তাতে আড়াই হাজারে কত কাপড় তা বুঝতে পারছ। অবশ্য গরদ কম ছিল না। সব মুরশিদাবাদী গরদের শাড়ী। তিনি লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়েছেন তাতেই।

সুলতা, আমি হেসে বলতে যাচ্ছিলাম—খুড়ীমা, আমার সহোদরা থাকলে তো তার বিয়ের খরচ করতে হত, ভাবুন তাই করছি। জানেন তো, টাকা আমার অনেক জমিয়ে দিয়ে গেছেন আমার মা। এই কালই দেখছিলাম—। কথাটা আর শেষ হল না সুলতা, বড়মা অন্নপূর্ণা দেবীর গাড়ী এসে এ বাড়ী ঢুকল।

আমি ছুটেই নেমে গেলাম। এত সকালে অন্নপূর্ণা-মা কেন এলেন আবার! কি হল? একজন পঁচাত্তর বছর বয়স্কা মহিলা দেহে না-হয় শক্ত আছেন, মনে তো আছেনই, তবুও বয়সের বছরের পরিমাণ তো কম নয়। অনেকের ওটা বেড়েই যায় কিন্তু কমে না বোধহয় কারুরই। গাড়ীটা থামতেই আমি দরজার নিচের অংশটা খুলে দিয়ে পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—বড়মা!

দেখলাম, বড়মার সামনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন দয়াল-ঠাকুরদা।

বড়মা বললেন—তোর কাছেই এসেছি, কাজ আছে!

অন্নপূর্ণা-মা স্থূলকায় ছিলেন না, আবার গুটিয়ে খাটো হয়েও যান-নি, মুখখানা তাঁর বার্ধক্যের রেখার জালে জালে দুর্বোধ্য নয়, দেখলাম রাঙা মুখখানা থমথম করছে। কণ্ঠস্বর ভারী, তার মধ্যে এতটুকু স্নেহ-আশ্বাসের আভাস নেই;

আমি তাড়াতাড়ি দরজার নিচের কাটা দরজাটা খুলে দিলাম। বড়মা হাতখানা বাড়িয়ে বললেন—ধর আমাকে।

আমার হাত ধরে নেমে বললেন—চল, উপরে তোর মায়ের ঘরে চল। পিছন পিছন দয়াল-ঠাকুরদা নামলেন, অন্নপূর্ণা-মা বললেন—এস দয়াল, তুমি সঙ্গেই এস।

উপরের ঘরে গিয়ে মেঝের উপর কার্পেট আমিই পেতে দিলাম। বড়মা বললেন—দরজা বন্ধ করে দে। জানালাও। যা বলব তা যেন কেউ শুনতে না পায়। বাইরে বলে দে যেন কেউ না আসে। জগদীশ্বরের বউ, অর্চনা এরাও কেউ না।

বলব কি সুলতা, বুকখানা আমার কেঁপে উঠল। ভয় হল এই অলঙ্ঘনীয়া মহিলাটিকে। আবার কি বলবেন?

দয়াল-ঠাকুরদা কেবল বললেন—কেন পিসীমা, এসব বাজে—

—তুই থাম দয়াল! অন্নপূর্ণা-ঠাকুমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই মদ খাস সুরেশ্বর?

মনে মনে চমকে গেলাম। কিন্তু বাইরে চমকালাম না। বললাম—খাই বড়মা।

—খাস! আচ্ছা আর একটা কথা বল তো—সেখানে তুই কুইনীকে নিয়ে—। চুপ ক'রে গিয়ে বললেন—তার জন্যেই কি তুই কুইনীর দিদি হিলডাকে গোয়ানপাড়ার একরকম মালিক করে দিয়েছিস! নাথরাজ করে দিয়েছিস গোয়ানপাড়া?

—না। এর একটাও সত্য নয়। সত্য কেবল ওরা যখন নাথরাজ দাবী করলে—

—সে আমি দয়ালের কাছে শুনেছি। যজ্ঞরাম রায়ের নাখরাজের ছাড়পত্র দেখিয়েছিল দয়াল সেই দিন। তুই তাই দেখে গোয়ানপাড়া নাখরাজ ক'রে দিয়েছিলি।

—হ্যাঁ বড়মা। কথাটা ঠিক তাই বটে।

—টাকাও তার জন্যে অনেকগুলো খরচ করেছিস। তারপর তিক্ত হেসে বললেন—ছোট মেজবউমা, মানে শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের বউকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখিয়ে কলঙ্কভাগিনী করেছিস!

—তোমাকে কে বললে বড়মা?

দয়াল-ঠাকুরদা কাতর কণ্ঠে বললেন—ওঁকে কীর্তিহাট থেকে চিঠি লিখেছে ভাই। সে একখানা মস্ত বেনামী চিঠি।

বড়মা তাঁর গঙ্গাস্নানের ঝোলা থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখ। চিঠিখানা পেয়েছি পরশু, পেয়েই আমি লোক পাঠিয়ে দয়ালকে আনলাম। দয়াল কখনও মিথ্যে বলবে না আমার কাছে। রায়বাড়ীর সবটাই ফাট ধরছে, বংশে পচ ধরেছে তা আমি জানি। বেশী পুরনো হলেই তা হয়। রামের অযোধ্যা নেই, বংশ থাকলে তাদের কি দশা ভগবান জানেন। পুরাণে আছে যদুবংশ শেষ হয়েছিল মদ খেয়ে নিজেরা মারামারি ক'রে। বাদশাদের বংশ শুনেছি টাঙা চালায়। তাদের মধ্যেও কত পাপ কত পচন কে জানে? আশ্চর্য কিছু নয়। তোর বাপই তো তার চরম ক'রে গেছে। তোকে দেখে ভরসা হয়েছিল। তারপর ওই মেয়েটার ছবি দেখে মনে হয়েছিল সত্যি সত্যিই আমার মা বুঝি ফিরে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যি ফিরেছে রায়বংশে। এ চিঠিতে সব জঘন্য কথা আছে সুরেশ্বর। জঘন্য কথা। তাই দয়ালকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। তার কাছে জানব শুনব। তা সব শুনলাম জানলাম। তুই পড়ে দেখিস। দেখিস নয় দেখ। আর বল তো—চিঠিখানার হাতের লেখা তুই চিনিস কিনা? চিঠিখানা যে রায়বাড়ীর কোন কুলাঙ্গারের লেখা তাতে সন্দেহ নেই। অর্চনার বিয়েটা ভেঙে দিতে চায়। আর রাগ আছে তোর ওপর, খুব রাগ, সেটাও এই সব কলঙ্ক রটনা করে মেটাতে চায়। তুই যে নিজে থেকে এত টাকা খরচ করে অর্চনার বিয়ে দিতে চাস তার উপরেও একটা কুৎসিত মতলব চাপিয়েছে।

সুলতা, চিঠিখানা হাতে করে আমি প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা কাঁপুনি বেয়ে চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর আক্রোশ, ক্রোধ, প্রতিহিংসাস্পৃহা যা বল তাই। চিঠিখানা খুলতে আমার সাহস হচ্ছিল না। হোক মিথ্যা, হোক অসত্য, কিন্তু কুৎসিত ভয়ঙ্কর কদর্য কিছু কে দেখতে চায় বল!

দয়াল-ঠাকুরদা বললেন—না—না পিসীমা, কেন ওই মিথ্যেকথাভরা মতলববাজি চিঠিখানা পড়তে ওকে বলছ তুমি? না—না। চিঠিখানা তুমি নিয়ে নাও। বুঝলে? পুড়িয়ে দাও।

ছাই ক'রে দাও। পিসীমা।

অন্নপূর্ণা-মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সেই ভাল। দে, চিঠিখানা আমাকে ফিরে দে। শুধু লেখাটা দেখে বল—দেখি এ লেখা তুই চিনিস কিনা ?

আমি বললাম—না বড়মা, চিঠিখানা আমি পড়ব। পড়তে চাই।

* * *

সেটেলমেণ্টের নোটিশ পেয়ে কীর্তিহাটে এসে আমি মহিষের মত পঙ্কপল্বলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুধু নাকের ফুটো দুটি চাগিয়ে প্রমত্ত হয়ে পড়ে আছি, পত্রের বক্তব্য তাই হলেও আসল লক্ষ্য অর্চনার বিয়ে।

"আপনাদের মত বংশ—যাঁহারা বাংলাদেশে এবং কলকাতায় দেশপ্রেমিক, গান্ধীবাদী, মরালিস্ট হিসাবে বিখ্যাত, তাঁহারা যদি এই কন্যার মত কন্যাকে গৃহে বধূ করিয়া লইয়া যান তবে সম্ভবতঃ দশ মাস যাইতে না যাইতেই সন্তান কোলে করিয়া বসিবেন জানিবেন।

এই যে বড়তরফের সুরেশ্বর, যে প্রকৃতপক্ষে রায়বাড়ীর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক, এই সুরেশ্বর কি স্বার্থে দশ বারো পনেরো হাজার টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছে ? এতই উদার সে ? এতই মহৎ ?

এই ধনীপুত্রটির পিতৃপরিচয় বঙ্গদেশে বিখ্যাত, সুবিদিত। তাঁহার পুত্র এখানে আসিয়া অর্থের উত্তাপে সর্বগ্রাসী অগ্নির মত জ্বলিতেছে এবং যাহা পাইতেছে তাহাই গ্রাস করিতেছে। তাহার সম্পর্ক বিচার নাই। সে সর্বভুকের মত মেজতরফের যুবতী ছোটগিন্নীকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখাইয়া কেলেঙ্কারি ছড়াইয়াছে। তাহাকে মাসে মাসে সে নিয়মিত টাকা দিত। এই জেলের সময়েও বহু টাকা সে তাহার জন্য খরচ করিয়াছে। এবং তাহার দ্বারাই সে রায়বংশের কুমারী কন্যাগুলিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে। অর্চনার উপরেই তাহার বেশী টান ছিল।

তাহার উপর এখানে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন, জানিতে পারিবেন, গোয়ানপাড়ায় গোয়ানদের লইয়াও সেই কাণ্ড করিয়া চলিয়াছে সে। দিবারাত্রি মদ্যপান করে এবং ছবি আঁকার ছল করিয়া এখানে সেখানে বসিয়া থাকে। গোয়ানপাড়ায় হিলডা বুড়ীর এক সম্পর্কীয় নাতনী আছে, তাহার নাম কুইনী। সেই কুইনীর উপরেও তাহার খুব নজর। খবর লইলে জানিতে পারিবেন, সে তাহাকে মেদিনীপুর মিশনারী ইস্কুলে এবং বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষিতা মেমসাহেব তৈরী করিয়া লইতেছে।

অর্চনার দায় এখন কাঁধ হইতে না নামাইলে উপায় নাই। কেলেঙ্কারি হইয়া যাইবে। তাহারই জন্য তাহাকে আপনাদের পবিত্র বংশের স্কন্ধে চাপাইয়া কুইনীকে লইয়া ভবিষ্যতে স্ফূর্তির তালে আছে।

কুইনীর জন্যও খরচ সে অনেক করিতেছে। খবর লইলেই জানিতে পারিবেন। এলিয়ট

রোডের একখানা বাড়ী লইয়া সে প্রায় হাজার সাত-আষ্টেক টাকা তাহার জাঠতুতো ভাই প্রণবেশ্বরকে দিতে রাজী হইয়াছে।

'এ সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ জানাই, সেদিন ইলেকশনে ভোটের জন্য কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ···রাজা বাহাদুরের তরফের লোক আসিয়াছিল, তাহাদের তরফের বক্তারা প্রকাশ্যে বলিয়া গেল যে সুরেশ্বরবাবু নিজে আধা কৃশ্চান—ধর্ম্মহীন ব্যক্তি, তাঁহার কথায় তোমরা ভুলিয়ো না। তিনি গোয়ানপাড়ার কুইনী নামক কৃশ্চান মেয়েকে মিশনারী ইস্কুলে রাখিয়া পালিতেছেন।"

* * *

ইলেকশনের সময় আমি যেতে পারিনি কিন্তু আমার তরফের লোকেরা, কর্ম্মচারীরা কংগ্রেসের হয়েই কাজ করেছিল। কীর্তিহাটের লোকেদের বলবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। সে গোটা দেশেরই প্রায় এক অবস্থা। তবু আমি বলেছিলাম। খান দুই চিঠিও লিখেছিলাম। একটা ছোট নিবেদনপত্র ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে ছিল "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে যারা অন্ধকারে আলো জ্বেলে পথ চলছে, তাদের পিছনে চল। অন্য পথ নেই।"

কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা শক্ত হাতে ধরা একটা মশালের আলো; তার তলায় ওই দুটো লাইন লিখে এখান থেকে ছাপিয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার উত্তরে নাকি এই কথা রাজারা বলেছেন।

তা বলুন। জানি কংগ্রেস—মানে মানুষেরা জিতবে। মানুষ মানে জীবন্ত মানুষ, নতুন মানুষ, পুরনো নয়, পচা নয়। জানি আমি নিজে পচা-বাড়ীর ছেলে। আমি—যোগেশ্বর রায়, সেকালের ইংলিশম্যান স্টেটস্‌ম্যান—ইংরেজ সরকারের মুখপত্রের লেখকের ছেলে আমি। আমি 'বিদায় সত্যাগ্রহ' লিখে বাপের ধারা বজায় রেখেছি। এবং ইংরেজ আছে বলে আজও আছি। আমাকেও যেতে হবে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজিমের সঙ্গে। বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজিম যাবে। ইউরোপে সে জার্মানীর হিটলারের দুই হাতে দুই গালে চড় খেয়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথায় বন্দীশালার ক্ষেপে-যাওয়া জন্তুকে মান যাও, মান যাও বলে মানাতে চাচ্ছে। কিন্তু যেতে তাকে হবেই। তার সঙ্গেই আমি যাব। তবু আমি ওই ছোট পোস্টার এঁকে ছেপে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ আমিই এঁকেছিলাম।

কিন্তু তাতে নাম আমার ছিল না। তবে পুলিস ঠিক বের করেছিল।

আর জানত শুধু প্রণবেশ্বরদা। যেদিন জানবাজারের বাড়ীতে বসে এই ছবিটা আঁকি, সেইদিনই প্রণবেশ্বরদা এসেছিল এই এলিয়ট রোডের বাড়ী সম্পর্কে কথা বলতে। পাশে বসেছিল। আমাকে বলে গিয়েছিল—কুইনীকে ওব্‌লাইজ করতে চাও তো টাকা কিছু ছাড়। পেটে ক্ষিধে মুখে লজ্জা করা কাজের কথা নয়।

আমি চিঠিখানা থেকে চোখ তুলে তাকালাম। যেন চোখের উপর ভাসছিল প্রণবেশ্বর-

দাদার ছবি। দেখছিলাম তাকে।

বললাম—বড়মা, এ-চিঠি লিখেছে প্রণবেশ্বরদা।

—হ্যাঁ।

দয়াল-ঠাকুরদা বললেন—না ভাই, এ-হাতের লেখা আমি চিনি। এ-হাতের লেখা সুখেশ্বরের ছেলে কল্যাণেশ্বরের।

—তা হোক ঠাকুরদা, আমার এই পোস্টারের কথা অন্য কেউ জানে না—জানে শুধু প্রণবেশ্বরদা। সে দেখেছিল ছবিখানা আঁকতে।

বড়মা চুপ করে বসেছিলেন—ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন—তুই যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানা জানিস? কাশীতে কোথায় থাকে সে?

আমি বললাম—কাশীতে তো থাকেন না জ্যাঠামশায়। ঠিকানা কাশীর আছে বটে। তবে থাকেন এখানে।

—এখানে—মানে? কলকাতায়?

—না, কলকাতায় ঠিক নয়, থাকেন বরানগরে।

—বরানগরে?

—হ্যাঁ। সেদিন প্রণবেশ্বরদাদা বলে গেলেন। অনেকগুলো বডিওয়ারেণ্ট ঝুলছে, তাই কাশীর ঠিকানাটা রেখে এখানে বরানগরে আছেন। তবে মাথার গোলমাল হয়ে গেছে।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারিস?

—ঠিকানা আমাকে বলে গেছেন প্রণবেশ্বরদা। কারণ, টাকা জেঠামশাই নিজে হাতে নেন। এলিয়ট রোডের বাড়ীর ওই মিউনিসিপ্যাল বিলের ভুলের দরুণ যা পাবেন, তা নিজে হাতেই নেবেন। ছেলেদের দেবেন না।

সুরেশ্বর বললে—জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশ্বর রায়কে বাল্যকালে দেখেছিলাম। তারপর দীর্ঘকাল বোধহয় বিশ-বাইশ বছর পর দেখলাম অন্নপূর্ণা মায়ের তাগিদে। বিচিত্র যজ্ঞেশ্বর রায়। মহিমান্বিত রায়বংশের কফিনে পোরা মমি। বরানগরে গঙ্গার ধারে একখানা বড় ফাটলধরা বাড়ীতে থাকতেন তখন। বাড়ীখানা সত্যিই কফিনের মত, আর জ্যোঠামশাই রায়বংশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মমি। ইনসলভেণ্ট, প্যারালিটিক, দিলদরিয়া লোক, জেদী, উদার, বদমেজাজী, অতিভদ্র, পরস্বাপহারী, দাতা—একসঙ্গে সব। ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা মানুষটা খাট জুড়ে পড়ে ছিলেন।

ভাঙা ফাটল ধরা বাড়ী; সামনের প্রথম এবং প্রধান দরজার দু পাল্লার কব্‌জায় মরচে ধরেছে, ইস্ক্রুপ খুলে গেছে, বন্ধ আছে ভিতর থেকে—কিন্তু দুটো প্লেট আঁটা আছে দু পাল্লায়; একটাতে লেখা আছে জ্যোঠাইমার নাম, অন্যটায় লেখা আছে—'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'।

বাড়ীখানা জ্যেঠাইমার সম্পত্তি। তাঁর বাপের বাড়ীর দিক থেকে পেয়েছিলেন। বন্ধ থাকে জ্যেঠামশায়ের পাওনাদারদের ভয়ে। যেমন তেমন পাওনাদার নয়—দু-দশ বা দুশো পাঁচশো পাওনা নয়, ও হলো দু হাজার পাঁচ হাজার থেকে লাখ দু লাখ পর্যন্ত সুবিস্তৃত এবং পাওনাদারেরাও তেমনি—এ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক; এ কোম্পানী ও কোম্পানী; যাদের আসল পরিচয় হ'ল খ্যাতিমান মাড়বার রাজস্থানের শেঠেরা; আজ এই ১৯৫৩ সালে যাঁরা বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর মালিকানি কিনেছেন—তাঁরা। জ্যাঠামশায় তাঁর জীবনে রায়বাড়ীর সমস্ত ইতিহাসটাকেই পুনরাবৃত্তি করেছেন। গড়েছেন ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন আবার ভেঙেছেন। শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।

রত্নেশ্বর রায়ের জীবন মাত্র বাহান্ন বছরের জীবন। বাহান্ন বছরে রায়বাড়ীকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ে গিয়েছিলেন; বীরেশ্বর রায়ের আমলে যে সম্পত্তির আয় ছিল কুড়ি হাজার টাকা, তাকে বাড়িয়ে তিনি তুলেছিলেন চল্লিশ হাজার এবং পনের বছর পরে তাকে পঁয়তাল্লিশ হাজারে তুলবার পাকা রাস্তার প্ল্যান তৈরী ক'রে জমি পর্যন্ত প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন।

তুমি রাজনৈতিক কর্মী সুলতা; তুমি নিশ্চয় জান ভারতেশ্বরী এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এ আইন প্রচলিত ছিল। পনের বছর অন্তর বৃদ্ধি পাবার হকদার ছিল জমিদারেরা। তার কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ফসলের দাম বাড়লেই জমিদার তার অংশ বাবদ খাজনা বাড়াতেন। সারাটা জীবনভোর তিনি এ কর্তব্যকর্ম ভোলেননি। এবং কোন সময়েই আপসে করেননি, আদালতে গিয়ে নালিশ করে লড়ে পাওনা আদায় করেছেন অথবা প্রজার সঙ্গে আদালত সাক্ষী রেখে সোলেনামা করেছেন। এ ছাড়া পতিত পুকুর কাটিয়েছেন। নদীর ধারের গ্রামে বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ তৈরী করিয়েছেন। সুতরাং জমির উন্নতি করেছেন বলেও খাজনা বৃদ্ধিতে তাঁর একটা দাবী ছিল। তিনটে এণ্ট্রান্স স্কুল, দুটো চ্যারিটেবিল ডিসপেনসারী করেছিলেন, মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল তাও করে গেছেন দুটো। মাইনর ইস্কুল করেছেন আরও কয়েকটা। নিঃসন্দেহে কীর্তিমান পুরুষ। কীর্তিহাট থেকে তমলুক পর্যন্ত কাঁচা পথটা পাকা করেছিলেন; বহু দরিদ্রকে দান করেছেন; বহু বুদ্ধিমান ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে বৃত্তি দিতেন। এই জানবাজারের বাড়ীতে ওই ওপাশের একতলা ঘরগুলোতে তারা থাকত; তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা ছিল, তারা খেয়ে কলেজ যেত।

পত্নীব্রত পুরুষ শ্রীমতী স্বর্ণলতা—যার নাম সরস্বতী বউ—তার মুখের দিক ছাড়া নাকি তিনি অন্য স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাতেন না।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অপবাদ রটনা সম্পর্কে মানুষের একটা দুর্নাম আছে। কিন্তু রায়বাহাদুরের ডায়রী পড়ে আমি বলতে পারি, শুধু অপবাদই নয়; প্রশংসাবাদ সম্পর্কেও মানুষ ঠিক তাই।

মানুষের মনই হ'ল ডিফেকটিভ থারমোমিটারের মত। অপবাদ প্রশংসাবাদের উত্তাপ আসলে যাই হোক, ও একশো হলে একশো দুইয়ে গিয়ে পৌঁছবে। তবে এটা মানতে রাজী আছি যে, অপবাদ আসলে একশো হলে সেটা হয় একশো পাঁচ, আর প্রশংসাবাদ সেখানে আসলে একশো হলে একশো দুই-তিন-এর বেশী ঠেলে না। মানুষ প্রশংসাও করে নিন্দাও করে, তবে নিন্দা একটু বেশী করে।

রায়বাহাদুরের ডায়রীতে অঞ্জনার কথা যা আছে তা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি। এ ছাড়াও কখনও কখনও রায়বাহাদুরের ডায়রীতে গল্পের মত বিচিত্র ঘটনার কথা আছে। অনেকগুলোই মনে আছে—তার দু-একটা বললেই বুঝতে পারবে। হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় দুটি সুন্দরী পার্শী মেয়েকে দেখে লিখেছেন—

"অদ্য কীর্তিহাট ফিরিতেছি। গত কয়েকদিন হইতেই রূপ চাক্ষুষ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। সেদিন দত্তবাড়ীর ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দুইজন অপরূপ সুন্দরী বাঈজীকে দেখিয়া অবধি ভাবিতেছিলাম, ইহাদিগকে কীর্তিহাটে রাজ-রাজেশ্বরের কোন পর্ব উপলক্ষ্যে বায়না করিয়া লইয়া যাইব। তাহা হইলে চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইয়া তাহাদের দেখিবার সুযোগ পাইব। দত্তবাড়ীর বিবাহের নাচ-গানের আসরে রত্নেশ্বর রায় বসিয়া বসিয়া অবশ্যই এই বাঈজীদের রূপ দেখিতে পারেন না। তাহাতে শত্রুজনে অপযশ ঘোষণার প্রশ্রয় পাইবে। এবং মনের মধ্যে যে প্রবৃত্তির বিষবৃক্ষ আছে, তাহার তদ্দেশে জল-সিঞ্চন করা হইবে। কিন্তু কীর্তিহাটে সম্মুখে রাজরাজেশ্বর জিউ প্রভুকে রাখিয়া তাহাদের দেখিলে রূপের তৃষ্ণা মিটিবে কিন্তু তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারিবে না। এবং কেহ কোন নিন্দার কথাও বলিতে পারিবে না। আমার জীবনের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু অদ্য হাওড়া স্টেশনে এই পার্শী মহিলা দুটিকে দেখিয়া আমার ভ্রম ভঙ্গ হইল। কি অপরূপ রূপসী এই মেয়ে দুইটি। ইহাদিগকে যুগল তিলোত্তমা বলা চলে। ইহাদের কাছে সেই বাঈজী দুইটি অনেক মলিন। আকাশের চন্দ্রমা এবং পঙ্কপল্লবে তাহার প্রতিবিম্ব এই দুইয়ে যত তফাৎ তত তফাৎ। চক্ষু জুড়াইয়া গেল। হৃদয় ভরিয়া গেল। ঈশ্বরের রূপসৃষ্টির আর শেষ নেই তাহা অনায়াসে এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম তিনি বুঝাইয়া দিতেছেন যে, রূপ খুঁজিয়ো না, তাহা হইলে আর সারা জীবনে বিশ্রাম পাইবে না, রূপের পর রূপ আসিয়া তোমাকে হাতছানি দিয়া মরীচিকা যেমন করিয়া তৃষ্ণার্ত হরিণ ছুটাইয়া লইয়া চলে মরুভূমির উত্তাপের মধ্যে, তেমনি করিয়া ছুটাইয়া চলিবে এবং একদা মৃত্যু মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সংহার করিবে। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অপার করুণাও উপলব্ধি করিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা যেন স্বকর্ণে শুনিয়া আজ এইভাবে ট্রেনের কামরায় এই রূপসী মেয়ে দুইটিকে দেখাইয়া দিলেন।"

এমন ঘটনা রায়বাহাদুরের জীবনে অজস্র ঘটেছে। তিনি অকপটে ঘটনাগুলি লিখে

গেছেন।

কীর্তিহাটের বাড়ীতে যুবতী শ্রীমতী মেয়ে-ঝি রাখা তিনি বন্ধ করে একটা নিয়ম করেছিলেন।

করেছিলেন অঞ্জনার ঘটনার পর থেকে। রায়বাহাদুরের স্ত্রী সরস্বতী বউ স্বামীগরবিনী এবং আদরিণী ছিলেন, সে গরব সে আদর পরিমাণে এত বেশী যে, তিনি এগুলো গ্রাহ্যই করতেন না। তার কাছে যে ঝি থাকবে সে কুদর্শনা হবে এ তিনি পছন্দ করতে পারতেন না। ঝগড়া করতেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। রত্নেশ্বর রায় তাকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। সরস্বতী বউ আবার আনতেন রূপসী যুবতী ঝি এবং তাকে স্বামীর চোখের সামনে যেতে দিতেন না। এবং হেসে স্বামীকে বলতেন—কি বাতিক মা? শেষে আমায় না তাড়াও! ভিতরের তত্ত্বটা তিনি বুঝতেন না।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বড় নাতি আমার জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় ঠিক তেমনি মানুষ। পিতামহের মতই পত্নীব্রত ছিলেন। তফাৎ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় কীর্তিতে কীর্তিমান, আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় ভ্রষ্টকীর্তি। রায়বাহাদুর সম্পত্তিকে বাড়িয়ে গেছেন, বাপের আমলের আয়কে চারগুণ করেছেন—আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় দশের বাঁদিকের একটাকেই মুছে দিয়েছেন। অবশেষে স্ত্রীর পিতৃদত্ত বরানগরের এই পুরনো বাড়ীটায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।

অন্নপূর্ণা দেবী বড় জেদী মানুষ ছিলেন। বেটাছেলে হলে সম্ভবতঃ সম্পত্তির জন্ম মামলা করুন বা না করুন দাদা রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে খুনোখুনির মত একটা কিছু ক'রে বসতেন। মেয়ে বলেই তা করেননি—তার বদলে ত্যাগ ক'রে সব ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন কাশী, পিসেমশাই এবং পালকপিতা বিমলাকান্তের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইয়ের কাছে আসেননি। রত্নেশ্বর রায়ও আশ্চর্য মানুষ, বীরেশ্বর রায়ের নামে যে সব কলকাতার সম্পত্তি ছিল তাও বোনকে দিতে চান নি। জানবাজারের এই বাড়ীখানা, এখানাও সেই সম্পত্তির মধ্যে খানিকটা স্থূলতা। এগুলো অন্তত অন্নপূর্ণা দেবী ওই শ্যামাকান্তের কলঙ্ক এবং বিমলাদেবীর সন্তান চুরির কেলেঙ্কারিকে সামলে চাল হিসেবে ব্যবহার ক'রে মামলা চালাতে পারতেন, কিন্তু তাও তিনি করেননি।

জমিদারী ব্যবস্থায় ইংরেজ যখন সামন্ততন্ত্রকে পল্টন সিপাহী হাতিয়ার ইত্যাদির হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ক'রে হাল্কা-পল্কা এবং পরগণাগুলোকে প্রটে তৌজিতে ভাগ ক'রে ছোট ক'রে দিলে তখন এর প্রভাবে দুটো ফল ফলেছিল; অনেক মধ্যবিত্ত উপরে উঠে জমিদার বনে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় রক্তারক্তি যুদ্ধের নেশা মিটিয়েছে, জাল-জালিয়াতি করে পাপের শেষ রাখেনি, আবার অনেক ক্ষেত্রে মনকে উঁচুও করেছিল।

রত্নেশ্বর তাঁর জীবনে ছোটতে বড়োতে, দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে, মানি স্যুটে, রেণ্ট স্যুটে, টাইটেল স্যুটে, সাধারণ ক্রিমিন্যাল কেস এবং সেসনস কেসে মুন্সেফী আদালত এবং ডেপুটি এস-ডি-ও থেকে জজকোর্ট পর্যন্ত আপীল নিয়ে যে মামলামকদ্দমা করেছেন তার সংখ্যা কত হবে জান ? আমি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পর্যন্ত গুনে আর করিনি। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী জীবনে কি বাপের সম্পত্তি কি স্বামীর সম্পত্তির ভাগের জন্য একটিও মামলা করেন নি। অন্নপূর্ণাদেবী যদি বীরেশ্বরের পুত্রসন্তান হতেন তবে তিনি যে কি হতেন তা বলতে পারব না। তবে কন্যা হয়েও যে বংশধারাটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা সত্যই অসাধারণ। এবং তাঁর নিজের কথা যা বলেছি তোমাকে, তা একবিন্দু বাড়িয়ে বলিনি।

এই অন্নপূর্ণা দেবী এসে দাঁড়ালেন বরানগরে রত্নেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র যজ্ঞেশ্বর রায়ের স্ত্রীর পিতৃদত্ত বাড়ীর দরজায়। যজ্ঞেশ্বর রায় তখন সর্বস্বান্ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ইনসলভেন্সী নিয়েছেন, কিন্তু তবু পাওনাদারের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। সব ঐশ্বর্যবিলাসই গেছে কিন্তু একজন গুর্খা দারোয়ান তখন পর্যন্ত আছে। সে দরজা আটকালো।

আটকালো বটে, কিন্তু খুব সম্ভ্রমভরেই বললে—বাবুজীর বেমার আছে মাইজী, যানে কো মানা হ্যায়।

অন্নপূর্ণাদেবীর চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাকে কেউই বোধহয় লঙ্ঘন করতে পারতো না। আমার রূপের প্রশংসা তোমার কাছে করে লাভ নেই। তবে আমাকে দেখে খেলো লোক কেউ ভাববে না নিশ্চয়। দারোয়ান আমার পথ আটকাতে পারতো অন্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর মহিমাকে লঙ্ঘন করা যেতো না।

অন্নপূর্ণাদেবী তাকে ধমকালেন না। তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন—তোর তো কথাবার্তার তরিবৎ খুব ভালো রে বাবা!

লোকটা খানিকটা অবাক হয়ে গেল ; হয়তো বা অন্নপূর্ণা-মা কি বললেন তা ঠিক ধরতে পারলে না, তবে তার আভাসেই সে ধন্য হয়ে গেল। এমন এক মাঈজী তার কথাবার্তার তারিফ করছেন।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেখ, আমি তোর বাবুর পিতাজীর ফুফু আছি। বাবুজীর দিদিয়া। উনকে দেখনে কো লিয়ে আয়ি হ্যায়, আওর দু-চার বাত ভি হ্যায়। লেকিন উসমে ঝামেলা কুছ নেহি হ্যায় ; সমঝা ? ডিগ্রীকে বাত ভি নেহি, কুচ মাঙনে কি বাত ভি নেহি। সমঝা ? ছোড় দরওয়াজা, মুঝে যানে দো। নেহি তো উপর যাকে বাবুজী সাব কি কহনা কি অন্নপূর্ণা মাঈজী আয়ি হ্যায় ভওয়ানীপুর সে। হাঁ ?

বলতে বলতেই সিঁড়ির মাথায় দেখা দিলেন জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা খুব বড় ব্যবসাদার বাড়ীর মেয়ে।

এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকুমা! আপনি!

—হ্যাঁ আমি। যজ্ঞেশ্বরের কাছে এসেছি।

আমিও স্থট ক'রে গিয়ে প্রণাম করলাম জ্যাঠাইমাকে। জ্যাঠাইমা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—স্থরেশ্বর!

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, আমি।

—দাড়িটাড়ি রেখে এ কি চেহারা করেছিস রে!

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ওসব আমি সব ব্যবস্থা করব। ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি ও দাড়ি কামাবে।

জীবনে সবেতেই একটা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ ভূমিকা থাকে স্থলতা, সেদিনের গৌরচন্দ্রিকার সব কথাই বাদ দেব, কেননা তাতে অনেক সময় নেবে।

সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর একজন খাঁটি এ্যারিস্ট্রোক্র্যাট রায়বংশের মহিলা, বয়স পঁচাত্তর বছর, তিনি দাঁড়ালেন রায়বংশের আর একজন খাঁটি জমিদার ব্যবসাদার তনয়ের সম্মুখে।

ভূমিকা যা তা জ্যাঠাইমার সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশায়কে খবর দিয়ে তাঁকে একরকম প্রস্তুত ক'রে দিয়ে তবে অন্নপূর্ণা-মাকে জ্যাঠামশায়ের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত যজ্ঞেশ্বর রায়ের ডান দিকটা পঙ্গু হয়ে গেছে, হাতখানা থেকে পা পর্যন্ত স্নায়ুগুলো সব অবশ হয়েছে, কিন্তু ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ঠিকই আছে, কথাবার্তাও বলতে পারেন, তবে একটু যেন জড়ানো জড়ানো; বসেছিলেন সে-আমলের প্রকাণ্ড বড় একখানা খাটে। খাটের গদিটা পাশে পাশে ছিঁড়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। উপরে তোশকখানা ছেঁড়া নয় তবে পিটানো, এমন শক্ত যে জমানো তুলোর একখানা তোশক বলা যায়। তার উপর চাদরখানা পুরো তোশকটা ঢাকেনি বলেই দেখা যাচ্ছিল। খাটো চাদরখানা ময়লা চিট, বিবর্ণ। ঠাকুমাকে দেখে হেসেই জ্যাঠামশাই বললেন—এস ঠাকুমা!

থমকে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন পক্ষাঘাতটা কি রকমের, ডান পা-খানা ঢাকা ছিল, ডান হাতখানাও ছিল, স্থতরাং ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা দেখে অন্নপূর্ণা-মা বোধহয় পক্ষাঘাতের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন—প্যারালিসিস্ তোর কোনখানে রে হরি?

হরি হল যজ্ঞেশ্বরের ডাকনাম। রত্নেশ্বর রায় যজ্ঞেশ্বর নাম রেখে বলেছিলেন—যজ্ঞেশ্বর—হরি!

যজ্ঞেশ্বর হেসে বললেন—হরি চিরকাল ছলনাময় নয় ঠাকুমা? তা ভাবতে পার, পাওনাদার ফাঁকি দিতে প্যারালিটিক্ সেজে বসে আছি। শুনেছি তোমার দাদা, আমার ঠাকুরদা সাহেবদের ভোজের আসর থেকে পেট কামড়াচ্ছে ব'লে ঘরের ভিতরে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে গিয়েছিল রাধানগরের দেসরকারদের বাড়ীতে ডাকাত ফেলে

লোকটাকে ঠ্যাঙাতে আর তার ঘর পোড়াতে। আমি তো তোমাদেরই নাতি। আমি যজ্ঞেশ্বর হরি, ছলনা অবশ্যই করতে পারি। কিন্তু তা নয়। এই দেখ!

ব'লে গায়ে ঢাকা দেওয়া চাদরখানার ভেতর থেকে ডান হাতখানা বহু কষ্টে বের করলেন। হাতখানা কনুইয়ের কাছ থেকে বেঁকে রয়েছে এবং গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে আসছে। আঙুলগুলোই আগে শুকিয়ে গেছে; যখন বের করছিলেন তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল।

বললেন—এই এইটুকু এখন বের করতে পারছি, আগে একেবারেই পারতাম না। কোমর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ডান পাখানা অসাড়। নড়ে না। তোমার নাতবউ ঢেকেঢুকে দিয়ে তুলে বসিয়ে দিয়ে যায়, আবার শোবার সময় শুইয়ে দেয়। তোমাদের যজ্ঞেশ্বর হরি ছলনাময় বটে কিন্তু এ অসুখে নয়। তা তুমি হঠাৎ এলে ঠাকুমা—ব্যাপার কি বল তো! সত্যিই তুমি এলিয়ট রোডের বাড়ীখানার জন্যে এসেছ?

অন্নপূর্ণা-মা কথা বলতে পারলেন না, চুপ ক'রে বসে রইলেন মাটির দিকে তাকিয়ে।

জ্যাঠামশাই একটু অপেক্ষা ক'রে বললেন—সুরেশ্বর বাড়ীখানা কিনতে চেয়েছে শুনে খুব আশ্চার্য হইনি। রায়বংশের ছেলে, তার উপর অবস্থা ওর স্বচ্ছল। গোটা রায়বংশটা দেউলে হয়ে গেল, আশ্চর্য টেঁকে রইল যোগেশ্বরের ছেলে। শুনেছি বাপের মত খেয়ালী। বাপ খেয়ালী হলেও অন্তরকমের মানুষ ছিল, জমিদারের ছেলে, বড় ব্যবসাও ছিল আমাদের, কিন্তু যোগেশ্বর লেখাপড়া শিখে খবরের কাগজে চাকরি নিলে। বাবা তাই পছন্দ করলেন। তখন ঠাকুমা, ঠিক বুঝতে পারি নি। বাবা তো আমাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন না। তাই ভাগের সময় গোটা ব্যবসাটা আমাকে দিয়ে বাড়ী আর নগদ টাকা যোগেশ্বরকে যখন দিলেন তখন আশ্চর্য হলাম। তবে কি জান ঠাকুমা, সবই ভাগ্য। আমি ভাগ্যকে মানতাম—আজও মানি। তার জন্যে কবচ মাদুলী গ্রহরত্ন অনেক ধারণ করেছি বোঝাদরূপে। আমার ভাগ্যে কোষ্ঠীতে এই ছিল। তাই হল। কি করব? তা তুমি এ নিয়ে এলে কেন বল তো? সুরেশ্বর কিনতে চায় বুঝি, প্রণবেশ্বরের কাছে শুনেছি আমি, কুইনী বলে যে মেয়েটা এখন বাড়ীর মালিক ছিল—। একটু হেসে চুপ ক'রে গেলেন জ্যাঠামশায়, কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝতে কারুর বাকী রইল না।

এতক্ষণে অন্নপূর্ণা-মা মুখ খুললেন, বললেন—দাদা তোকে খুব ভালবাসতেন। বলতেন—ওরে আমি মরে গেলে লোকে ভাবত আমি আবার ফিরে এসেছি। তুই একেবারে আমার মত। তাই ঠিক। তেমনি কুটিল তেমনি জটিল—সবই তেমনি।

—হ্যাঁ, তা বলতেন। তাঁকে আমার ভালও লাগত। খুব ভাল লাগত। তা খানিকটা বটেও। তাঁর পথেই চলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিচিত্র ভাগ্যের কথা, তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিতে গেলেন, রায়বাড়ীকে ছোট থেকে বড় ক'রে গেলেন, আর আমি হেরে

গেলাম। আমার কোষ্ঠীতে শনির ফল, শনি আমাকে রাজা করেছিল, সে আবার সব কেড়ে নিলে।

—আজেবাজে কথা না বলে আমার কথার জবাব দে তো!

—কি বল?

—এলিয়ট রোডের বাড়ীটার উপর তুই ছোঁ দিলি কেন?

—বাড়ীটা দেখলাম আমাদের—সেই জন্যে। বাড়ীখানা কেনার দলিল পর্যন্ত রয়েছে। দেখ না। বলে নতুন বের করা একখানা কবলার কপি বের ক'রে দিলেন। মাথার বালিশের তলাতেই সেটা ছিল। তার সঙ্গে কতকগুলো কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ। আজও ট্যাক্স দিচ্ছি।

—যজ্ঞেশ্বর!

—ঠাকুমা!

—তোর ওই সব কথা-বার্তা তুই ছাড়। সোজা কথা বল। কুইনী বলে মেয়েটির পরিচয় তুই জানিস নে? ন্যাকা সাজিস নে, তোর ঠাকুরদা আমার দাদা, রায়বংশের পুণ্যবান পুরুষকে ঠিক আমি এই কথাই বলেছিলাম। দাদা, তুমি ন্যাকা সেজো না। ভায়লেট অঞ্জনাদির মেয়ে এ তুমি জানতে না? দাদা ঠিক তোর মতই ন্যাকা সেজেছিল। আমি তিনবার ছি-ছি-ছি বলেছিলাম, তাতে দাদা মাথা হেঁট করেছিল, তুই করছিস নে, তুই আরও পাষণ্ড রে যজ্ঞেশ্বর।

কথাগুলি আমি বুঝতে পারছিলাম সুলতা, আমি অবাক হইনি। লজ্জায় প্রথমটা পিছন ফিরেছিলাম, তারপর ঠিক এই কথার পরই অন্নপূর্ণা-মাকে বলেছিলাম—আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াই মা-মণি। আপনাদের কথা শেষ হোক।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—না, তুই বস সুরেশ্বর। তুইও শোন্। অর্চনার বিয়েতে তোর কাছে কুইনীর বাড়ী ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তটা পণের মধ্যে কেন ধরেছি তুইও শোন। কুইনীকে একখানা বাড়ী আমি আমার টাকায় কিনে দিতে পারি। তাতে আমার দেবুর আত্মা শান্তি পাবে; কিন্তু তাতে দাদার দানপত্র নাকচ হবে, দাদা রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর স্বর্গ থেকে সিংহাসন সমেত উল্টে পড়বে রে—পড়বে নরকে। তুই চুপ করে আছিস কেন যজ্ঞেশ্বর? রায়বাহাদুর এ বাড়ী দেবুর পাপের জন্য দেয়নি, দিয়েছিল ভায়লেট মেয়েটা অঞ্জনাদির মেয়ে ব'লে। ওকে কিছু দেবার অজুহাত খুঁজছিল দাদা; দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়েই ছিল। দেবুর এই ভুলটা হ'তেই সে বাড়ীটা লেখাপড়া করে দিল ভায়লেটকে। এই জানবাজারের বাড়ীতে যেদিন দেবু গুলি খেয়ে মরতে চেয়েছিল বাপের ভয়ে, সেদিন দাদা কলকাতা এসেছিল শুধু আমার সঙ্গে মিটমাট করতে। তখন আমি কোলে এক বছরের

ছেলেকে নিয়ে আমার স্বামীকে অনেক কষ্টে রাজী করে জোড়াসাঁকোর জ্যাঠাইমার বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম। তারপর স্বামীকে বললাম—তুমি ফিরে যাও, আমি আর ফিরে যাব না তোমাদের বাড়ী। আমি কাশীতে পিসেমশাইকে চিঠি লিখেছি, তিনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি সেখানেই থাকব, তোমাদের অন্নে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমার ছেলে বড় হয়ে তার সম্পত্তির জন্য যা করবার করবে। তার অভিভাবক হিসেবে তোমাদের কিছু করতে হবে না। কাশী থেকে মামা মানে পিসেমশাই এলেন, কীর্তিহাট থেকে দাদা এল। এসে জানবাজারের বাড়ীর ফটকে দেখলেন ভায়লাকে। বন্ধ ফটকের সামনে রাস্তার উপর মাথা ঠুকে কাঁদছে—রায়বাবু, মেরি রায়বাবু! মেরি রায়বাবু! দাদার গাড়ী এসে দাঁড়াল। দাদা এখানকার দপ্তরে খবর দিয়েছিল, কিন্তু খবরটা এসে পৌঁছোয়নি। ডাকের গোলমাল হয়েছিল। দাদা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে একেবারে ঠিক সেই সময়টাতেই এসে হাজির হল। দাদা ভায়লাকে চিনত। ভাল ক'রে চিনত। অঞ্জনার মুখের মত মুখ ছিল বলে চিনত।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় সাধু চরিত্রের লোক। লোকে বলে সাক্ষাৎ শিব। শিবের গায়ের বর্ণ দিনের আলোর থেকেও সাদা। তেমনি স্বচ্ছ এবং শুভ্র নাকি শিবের চরিত্র। কালীর ছোঁয়াচ লাগলেও জানা যায়, বোঝা যায়। যতই গোপন করুক দাদা, অঞ্জনাকে ভালবাসার কথাটা গোপন থাকেনি। আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য ভালবাসা। আশ্চর্য ধর্ম-পরায়ণতা!

অঞ্জনাকে ভালবেসে শুধু তার স্বামীর কাছ থেকেই ছিনিয়ে নিলে। কাছে কাছে চোখে চোখে রাখলে, কিন্তু সরস্বতী বউয়ের সামনে। তাকে পাহারা রেখে হেসে কথা বলে, রাগ করে, সে রাগ করলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে একরকম মান ভাঙিয়ে নিজের সাধ মেটালে, কিন্তু অঞ্জনার সাধ তাতে মিটল না। সে একদিন হলদীর বাপ পিড্রুজের দাদা, যে রবিনসনকে খুন করেছিল, তার সঙ্গে পালাল। পালাল—কীট সাহেবকে চিঠি লিখে জানিয়ে কৃশ্চান হয়ে গোয়া পালালো। বছর কয়েক পর অনেক কষ্টে গোয়া থেকে ফিরে এল কলকাতায়; কোলে তার ভায়লেট। দেহে সাতখানা রোগ ধরেছে, যা কিছু গহনাগাঁটি ছিল সব গিয়েছে; রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে ভোগ ক'রে স্পর্শ করেননি, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ সাজিয়ে গহনা দিয়েছিলেন, পালাবার সময় অঞ্জনা সে সব ফেলে যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। পিড্রুজ তার সে সব বেচে খেয়েছে, তারপর কার সঙ্গে ঝগড়ায় ছুরি মারামারি করে ছুরি খেয়ে মরেছে। অঞ্জনা সেকালের বামুনের ঘরের মেয়ে, এগিয়েছিল অনেকদূর. হুগলী জেলার একখানা অজ পাড়াগাঁ থেকে কীর্তিহাট হয়ে কলকাতা, সেখান থেকে পশ্চিম মুখে একেবারে গোয়া পর্যন্ত। তার ওদিকে সমুদ্রে ভাসতে আর সাহস হয়নি, অন্য কাউকে বিয়ে করবার মত দেহেও কিছু ছিল না, আর মনেও ঠিক হয়নি বা মনের মত মানুষ পায়নি। ফিরে

এসেছিল কলকাতা। রিপন স্ট্রীট থেকে পার্ক স্ট্রীট এলাকায় গোয়ানীজদের একটা আড্ডা ছিল, সেই আড্ডায় এসে উঠে সাহায্যের জন্তে চিঠি লিখেছিল—একখানা দাদাকে একখানা আমাকে। বলতে গেলে আমার মারফৎ পিসেমশাইকে।

বুঝতে পেরেছ সুলতা, অন্নপূর্ণা-মায়ের পিসেমশাই কে? বিমলাকান্ত। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—আমার বয়স তখন বছর-ন'য়েক হবে। অঞ্জনাদি যখন চলে যায়, তখন আমার বয়স ছিল ছ' বছর। এর তিন বছর পর অঞ্জনা ফিরে চিঠি লিখেছিল আমাকে কাশীতে। চিঠি সাহায্যের জন্য। চিঠিখানা আমার হারায়নি। চিঠিখানা আছে। পিসেমশাইয়ের স্বভাব ছিল বড় গোছালো—বড় পরিচ্ছন্ন মানুষ, চিঠিখানি তিনি রেখে দিয়েছিলেন।

তখন আমার ন'বছর বয়স। চিঠিখানা এল, খামের চিঠি; পিসেমশাই চিঠিখানা খুলে পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিখানা আমার মনে আছে—"মহামহিম মহিমান্বিতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট অধিনীর নিবেদন এই যে, এককালে আমি সম্পর্কে আপনার দূরসম্পর্কের দিদি হইতাম, তৎকালে আমার নাম ছিল অঞ্জনা এবং কীর্তিহাটের রায়বাটীতে রায়হুজুর ও রায়গিন্নীর নিকট পরম সমাদরের মধ্যেই বাস করিতাম। এবং কাজকর্ম করিতাম। কিন্তু যাহার ভাগ্য মন্দ হয়, তাহার মতিও সু হইতে কু হয়; কুমতি-দুর্মতি মন্দভাগ্য-মন্দভাগিনীদের ঘাড়ে ভর করিয়া থাকে। আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। সেই দুর্মতিবশত আমি একদা গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ক্রুশ্চানধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। ফলে আজ আমার দুঃখ-দুর্দশার অবধি নাই। আমি ক্রুশ্চান হইয়া রায়হুজুরের কলিকাতাস্থ মোকামের বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া ও গাড়ী প্রভৃতি দেখিবার জন্য যে পর্টুগীজ, যাহাকে সকলে গোয়ান বলিয়া জানিত ও ভাবিত, তাহাকে বিবাহ করিয়া গোয়া পালাইয়াছিলাম। কিন্তু মদীয় মন্দভাগ্যবশত সে ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং আমি নিরতিশয় দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি। দেহেও অনেক রোগ ঢুকিয়াছে। খুব বেশীদিন সম্ভবত বাঁচিব না। কিন্তু আপাতত চতুর্দিক অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতেছি। আমার কোলে একটি বৎসরখানেকের কন্যা। তাহাকেও বাঁচাইবার মত সামর্থ্য নাই। সেইজন্য আপনার নিকট কিছু অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া অত্র পত্রযোগে দরখাস্ত জানাইতেছি। আমার সহস্র অপরাধ, ক্রুশ্চান হইয়াছি, পরপুরুষের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি—ইহা কখনওই মার্জনার যোগ্য নয়। তবুও উদরের জ্বালায় এবং আমার কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য লজ্জার মাথা খাইয়া পত্র লিখিলাম। আপনাদের অনেক আছে। আপনার জ্যেষ্ঠ রায়হুজুরকেও পত্রযোগে দরখাস্ত জানাইয়াছি। তিনি দিবেন না জানি, তিনি কঠোর ধার্মিক লোক, তবুও করুণা করিবার সময় তো পাপ বিচার কেহ করে না, পাপীকেই তো করুণা করিতে হয়। ভগবানও পাপীকে দয়া করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে তিনি দয়া করিলে করিতে পারেন। আপনি করিবেন বলিয়া ভরসা করিতেছি। এবং দয়া করিয়া রায়হুজুরকেও যদি কিছু লেখেন—আমাকে ক্ষমা করিতে, দয়া করিতে, তবে অধিনীর প্রতি

অনেক কৃপা করা হইবেক।"

চিঠিখানা আজও আমার কাছে আছে।

অন্নপূর্ণা-মা একটু থামলেন; বয়স হয়েছিল—এতক্ষণ কথা বলে একটু হাঁপাচ্ছিলেন। থামলেও জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর রায়ের মুখ যেন পাথরের মুখ। একটি রেখারও তাতে বদল হয়নি।

এই ফাঁকে তিনি বললেন—এসব কথা তুমি যখন বলছ, তখন সত্যি বলেই মানছি ঠাকুমা, কিন্তু আমাকে তুমি বলছ কি?—যা বলছ তাই বল! বাড়ীটা ছেড়ে দিতে বলছ তো!

—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, তোকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তুই এত ছোট কাজ করলি কেন?

—ছোট কাজ কি করে হল ঠাকুমা। আইনসঙ্গত না হয়, মামলা করলেই তো বাড়ীটা পাবে।

—দাদা বাড়ীটা দান করে দলিল একখানা করে দিয়েছিল, কিন্তু বাড়ীটার করপোরেশন ট্যাক্স দিয়েছে বরাবর তোদের কলকাতার এস্টেট। পাছে ট্যাক্সের জন্ম গোলমালে পড়ে, দিতে না পারে, বিব্রত হয়, তারই জন্ম এইরকম করেছিল। তাছাড়া পাছে ওরা কেউ বিক্রি করে দেয়, দেনার দায়ে বাড়ীটাকে জড়িয়ে ফেলে, তাই এই জট পাকিয়েছিল। তুই তার সুযোগ নিয়েছিস।

—বল না, অন্যায় করেছি? কিছু বে-আইনী কিছু করেছি? বল?

—তা করিসনি। কিন্তু তুই তোর বাপকে, তোর ঠাকুরদাদাকে নরকে ডোবাচ্ছিস।

—না, ঠাকুরদার যে-দায়টা বলছ, সেটা তুমি চাপাচ্ছ দাদার উপর। মায়ের পেটের ভাই নয়, তোমার বাপ পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিল ঠাকুরদাদাকে, তার জন্যে আমার ঠাকুরদার উপর তোমার রাগ এ তো সবাই জানে গো। তবে হ্যাঁ, আমার বাপের কথা যা বললে, তা অবিশ্যি পাপপুণ্যি স্বর্গ-নরক এসব থাকলে মানতে হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হয়, পাপ করলেই তার সাজা আছে। সে-সাজার মাফ নেই ঠাকুমা। ভায়লা বলে গোয়ান ফিরিঙ্গী মেয়েটার সঙ্গ—সে বাড়ী দান করেও হয় না।

—চুপ কর, চুপ কর। ওরে যজ্ঞেশ্বর তুই চুপ কর।—

আর্তনাদ করে উঠলেন অন্নপূর্ণা-মা।

কিন্তু জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় চুপ করলেন না। তোমার ভাইপো তোমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল। তার নিন্দে তোমার সহ্য হচ্ছে না—না? কিন্তু কি করব বল? এ যে তাঁর প্রাপ্য গো। মিথ্যে তুমি অঞ্জনা-কঞ্জনার ফ্যাচাং তুলে ঠাকুরদার মত দেবচরিত্র ব্যক্তির অপমান করছ।

অন্নপূর্ণা-মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—অবিকল সেই রত্নেশ্বর রায়!

অবিকল। ঠিক এমনি করেই নিজের বাপের উপর রাগ করে কথা বলত, তারই ওপর সব দোষ চাপাত। অবিকল! লাখখানেক কি তারও বেশী মামলা দাদা করেছে। তার সব কাগজপত্র যদি থাকে, তবে অন্তত বিশ-পঞ্চাশটা মামলায় হয় মামলা দায়েরের আর্জিতে, নয় মামলার জবাবে বলা আছে—বীরেশ্বর রায় মদ্যপান করিয়া বেহুঁশ থাকিতেন, এবং মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল বলিয়া এমন স্বীকৃতি তিনি দিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তাঁহার পক্ষাঘাত ঘটিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার কোন স্বীকৃতি বা সহির মূল্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যজ্ঞেশ্বর রায় হেসে বললেন—ওসব কথা ছাড়ান দাও না ঠাকুমা। তুমি কুইনীর বাড়ীখানা কুইনীকে ফিরিয়ে দিতে চাও। তা বেশ তো, পুরনো কাসুন্দী না ঘেঁটে বাড়ীখানার দামের অর্ধেক টাকা আমাকে দিয়ে একটা না-দাবী লিখিয়ে নাও। চুকে যাক। টাকাটা তুমিও দিচ্ছ না, দেবে সুরেশ্বর। জগদীশ্বরের মেয়েটা ওর গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধেছে। ওর যখন ওগরাতেই হবে তাকে, তখন টাকাটা ওই দেবে।

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে সুলতা। আমার নিজের গলায় এতখানি ভয়ঙ্কর চড়া সুর বা গর্জন বের হতে পারে, এর আগে তা আমি জানতাম না। গান গাইবার সুকণ্ঠ রায়বংশে আছে। শ্যামাকান্তের দান এই সুকণ্ঠ আর সংগীত-ব্যাকরণে জ্ঞান—এ নিয়েই অনেকে আমরা জন্মেছি, কিন্তু এমন গর্জন এক মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ের সেই দৈত্যাকৃতি পশুচরিত্র ছেলেটা ছাড়া কারও গলায় বের হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল—কিছুদিন আগে অন্নপূর্ণা-মায়ের নামে লেখা একখানা বেনামী চিঠির কথা। যে চিঠিতে অজ্ঞাত পত্রলেখক অর্চনার প্রতি আমার স্নেহ-মমতার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে অপবাদ দিয়ে সংবাদ দিয়েছিল তাঁকে। বিয়েটা যাতে না হয়, তারই চেষ্টা ছিল তাতে। চকিত কথাটা মনে হতেই আমার ধারণা জন্মেছিল, সে-চিঠি হয় লিখেছিল বা লিখিয়েছিল—।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিলাম পশুর মত—চু-প করুন আপনি!

সে চিৎকারে চমকে উঠেছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়। চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন, নির্বাক হয়ে। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই আত্মসম্বরণ করে নিয়ে বলেছিলেন—কেন? এমন করে চিৎকার করে উঠলে কেন? একটা জন্তুর মত? এঁ্যা!

আমি বলেছিলাম—সে চিঠি তাহলে আপনি লিখিয়েছিলেন?

একটু চুপ করে থেকে যজ্ঞেশ্বর রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ। আমিই লিখিয়েছিলাম একরকম। হ্যাঁ, একরকম আমিই বইকি! প্রণবেশ্বর কীর্তিহাট থেকে এসে বললে—সমস্ত কথা, অতুল-মেজখুড়ীমার বোমা-পিস্তল নিয়ে জেলের কথা। অর্চনার সঙ্গে তোমার মাখামাখির কথা। সব শুনলাম। শুনলাম এবং সন্দেহ হল। এ তো হামেশাই হয়। বড় বড় বাড়ীতে, যে-সব বাড়ীতে বড় সংসার, পোষ্য অনেক হয়, সে সব বাড়ীর মালিকেরা ভোগ করে থাকেন

পোষ্যদের বধূ-কন্যাদের। তা করেন। যারা দুবেলা দুমুঠো ভাত পায়, মাথা গুঁজবার একখানা ঘর পায়, বড় বাড়ীর লোক বলে পরিচয় দিতে পায়, তাদের পুরুষ অভিভাবক থাকে না বা থাকলেও বোবা হয়ে থাকে। বাইরে এখানে-ওখানে গালাগাল দেয়। যেখানে কোন লোক থাকে না। এর মধ্যে মালিকপক্ষের ছেলে বা কর্তার নজরে মেয়েরা কেউ পড়লে আর কি রক্ষে থাকে ? এই তো আমার শ্বশুরবাড়ীতেই, আগে রেওয়াজ ছিল, মেয়েদের কুলীনের ঘরে বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই ঘরে রাখা, কিছু সম্পত্তি দেওয়া। তারপর হত এই তারা যখন একপাল করে ছেলে-মেয়ে বিইয়ে বসত, তখন—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—থাক। আর বেদ-বেদান্ত আওড়াতে হবে না তোকে যজ্ঞেশ্বর। তুই স্বীকার করলি এই যথেষ্ট।

—কেন, কথাটা মিথ্যে বললাম নাকি ? তোমার দাদা রায়বাহাদুরের যে অপবাদ তুমি দিচ্ছ, সেটাই বা কি গো ? কলকাতায় ওটা আকছার বড়লোক বাড়ীর কীর্তি। বড় বড় বাড়ীর কেচ্ছা আছে, বড় বাড়ীতে গরীব আত্মীয়ের বউ-বেটী নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরত, এক একখানা গয়না নিয়ে। কর্তা একলা ঘরে বসে বউ দেখতেন আর গয়না দিতেন। তোমার ভাইপো ভায়লাকে নিয়ে এতবড় যে কীর্তি করলে সেটা ? সেটাই বা কি ? তোমার ভাইপোর মেমসাহেবের ওপর একটা ঝোঁক ছিল। যোগেশ্বরকে লেখাপড়া শেখাবার নামে একজন মেমসাহেব গবর্নেস রেখেছিল, আমার মায়ের চোখ থেকে জলের ধারা-বওয়া আমি ভুলিনি, আমি তাকে চাবুক মেরে তাড়িয়েছিলাম।

বাধা দিয়ে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তুই দিব্যদৃষ্টি মহাপুরুষ রে। তোর সঙ্গে কথা কইতে আসা আমার ভুল হয়েছিল। তোর ঠাকুরদার থেকে তুই সরেস। নির্বাণ তোর এই জন্মেই হবে। শুধু টাকা আর সম্পত্তির মায়াটা থাকবে, আর ওইটেই হবে তোর সিদ্ধির বাণী। ওসব কথা থাক। এখন ওই বাড়ীর জন্যে কি নিবি তাই বল। কেস তো আমি কোর্টে ওঠাতে পারব না, নইলে দেখতাম তুই কতবড় পাষণ্ড! কত তোর টাকার জোর, আর কত তোর জেদ! আমার কপাল! বুঝলি, আমার কপাল! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে যজ্ঞেশ্বর রায় বলেছিলেন—তা দিয়ো হাজার পাঁচেক।

এবার আমি আর অন্নপূর্ণা-মাকে কথা বলতে দিই নি। বলেছিলাম—টাকাটার বদলে চেক যদি আজই দিয়ে যাই ?

—তা দিতে পার। আমি না-দাবী লিখে দেব বলে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, টাকাটার জন্যে রসিদ দিচ্ছি। তবে বেয়ারার চেক দিতে হবে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—চেক দিয়ে দে সুরেশ্বর। কিন্তু তোর বউয়ের হাতে দেব, তোকে দেব না। আর একটা প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেব।

—প্রতিশ্রুতি! হাসলেন যজ্ঞেশ্বর রায়।

—হ্যাঁ। মিথ্যে বেনামী পত্র লিখে তুই অর্চনার বিয়েতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিস। [এ]মন কাজ এর পর আর করবি নে।

চুপ করে রইলেন যজ্ঞেশ্বর রায়, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। [কি]ছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ফিরে যখন তাকালেন তখন আমি [প]র্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম সুলতা। দেখলাম, যজ্ঞেশ্বর রায়ের চোখ ছলছল করছে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন—কি বলে এমন কথাটা লিখলি তুই? [তো]র মনে এতটুকু লাগল না? একবার মনে হল না যে, মেয়েটা তোর বাপের···

—বাবার কথা তুলো না ঠাকুমা। না।

—বেশ তোর কাকা, তিনি তো তোর সঙ্গে কোন অসদ্ভাব করেন নি। শিবেশ্বর? [ছা]ড়া ঠাকুরদা তোর কাছে দেবতা, এ মেয়ে তো তাঁরই এক নাতি জগদীশ্বরের মেয়ে!

যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন—ঠাকুমা, ওটা আমার কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। সে [আ]জ থেকে নয়, সেই ছেলেবেলা থেকে। বাল্যবয়স থেকে। তোমাকে বলি। ঠাকুরদা [এ]কটা ঝিকে হঠাৎ দেখলেন, তার আগে দেখেন নি। যুবতী ঝি, বছর সতেরো-আঠারো [ব]য়স, তাকে রেখেছেন ঠাকুমা। ওই ঝিটার মা, ঠাকুমার খাস-ঝি ছিল। নাম ছিল কামিনী। কামিনীর মেয়ে যামিনী এ বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল, বারো বছর হতে না হতে তার বিয়ে দিয়ে [দি]য়েছিলেন ঠাকুরদা। মেয়েটার কপাল; বিধবা হয়ে ফিরে এল ভরাযৌবন নিয়ে। কামিনী [খু]ব করে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরলে, মা, বাড়ীর এককোণে ওকে একটু ঠাঁই দাও। ঠাকুমা ঠাকুরদার মত জানতেন, তিনি তাকে বাড়ীতে রাখলেন, খুব গোপনে। ঠাকুরদার চোখের সামনে যেতে বারণ ছিল। তা সে যেতো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিপদ ঘটল; মেয়েটা অন্তসত্ত্বা হল। মেয়েটার মা জানতে পেরে কেঁদে এসে পড়ল ঠাকুমার কাছে। উপায় কর মা। ছোটবাবু—মানে ছোটকাকা রামেশ্বর···। কথাটা শেষ পর্যন্ত রায় বাহাদুরের কানে উঠল। ঠাকুরদার খেয়াল ছিল না যে, আমি পাশের ঘরেই আছি, আমার বয়স তখন বারো পার হয়ে তেরোয় পড়েছে। ঠাকুরদা তিরস্কার করেছিলেন ঠাকুমাকে। বলেছিলেন—সরস্বতী-বউ, যে ঘরে লক্ষ্মী থাকে, তার ঘরে অলক্ষ্মী চারিদিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে এসে আশ্রয় চায়। আশ্রয় দিতে নেই। অন্ততঃ ভোগী যারা, জমিদার যারা, তাদের তো নেই-ই। দিলে কি হয় জান? ওই অলক্ষ্মী রূপসী রূপ ধরে যৌবনের ডালা তুলে ধরে ওই বংশের মালিক, তার বংশধরদের সামনে। ভোগ করলেই অলক্ষ্মীর মনস্কামনা পূর্ণ। ধর্ম পালাল, ধর্মের সঙ্গে ভাগ্য যায়, ভাগ্যের সঙ্গে যশ যায়, যশের সঙ্গে সম্মান যায়। সম্মানের সঙ্গে অধিকার যায়, ক্রমে সব যায়, লক্ষ্মী ছেড়ে পালাল, অলক্ষ্মী তখন দারিদ্র্য দুর্ভাগ্য নিয়ে বংশকে ছারখার [ক]রে দেয়। তার উপর তুমি জান না, জান না সরস্বতী-বউ, এ বংশের উপর পূর্বপুরুষের অর্জিত একটা অভিসম্পাত আছে। নিদারুণ অভিসম্পাত। নারীঘটিত পাপ বংশে ঘটবেই,

এবং তাতেই সব নষ্ট হবে। আমি এমন কঠোর সংযম করি, পূজা করি, অর্চনা করি, শুধু এই পাপ থেকে রায়বংশকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরাই তা হতে দিলে না। দেবে না। হল তো। রামেশ্বরকে ডোবালে তো পাপে। ডোবালে তুমি। দয়া করতে গিয়ে পাপের উপকরণ তুমি রামেশ্বরের মুখের সামনে ধরে দিলে। সে নতুন জোয়ান, তার দোষ কি? সে সামনে হরিণী পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে! দেখেও জ্ঞান হল না তোমার? এর আগে দেবেশ্বরকে নিয়ে এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, ভায়লা মেয়েটাকে নিয়ে কি করলে সে, তার জন্যে কি করলাম আমি—তা তো জান! ঠাকুরদাস খুন হয়ে গেল। আমি নিজে বিশ্বাস করি নে সরস্বতী-বউ। মেয়েদের সতীত্বে আর পুরুষের সৎ শুদ্ধ থাকায় বিশ্বাস করি নে। থাকতে গেলে আমার মত যারা চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকে, তারাই পারে। ঘি আর আগুনে এক জায়গায় থাকলেই জ্বলবে। দাউ-দাউ করে জ্বলবে, ঘি শেষ হলে আগুন ছাই চাপা পড়বে।

তারপর ঠাকুমা, কি বলব, আমার অদৃষ্ট, ঠাকুরদা তীর্থে গেলেন, বাবা কীর্তিহাটে এসে থাকলেন, আমরা এলাম, কলকাতায় যোগেশ্বরের জন্যে যে গবর্নেস রাখা হয়েছিল সে এসে, বিবিমহলে থাকল, বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বেড়াতো, একসঙ্গে চা খেতো। গল্প করত। মা কাঁদত। আমি বুঝতে শিখেছি। আমি শুনেছিলাম মায়ের কাছে, ভায়লেটকে নিয়ে প্রথম বয়সে বাবার কীর্তির কথা। ঠাকুরদার ভয়ে ওকথা কীর্তিহাটে মুখে আনতো না কেউ। গোয়ানরা গান করত—

> বড়া বড়া মোকাম কি বড়া কারখানা
> উধর মৎ যানা মৎ যানা
> শুননা মানা, দেখনা মানা, বাত কহনা মানা
> বড়া কারখানা—

পিড্রুর ফাঁসি হয়েছিল, তারই গান বেঁধেছিল ওরা। তবে মা জানতেন, মায়ের কাছে শুনে জেনেছিলেম, নইলে ভায়লেটকে নিয়ে যখন বাবা এসব কাণ্ড করেন, তখন বাবার বিয়েই হয় নি! তাছাড়া মেজকাকার কাছে শুনেছি, ছোটকাকার কাছে শুনেছি। ঠাকুরদা বার বার বলতেন আমাকে, তোমার বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না দাদু। সর্বনাশ হয়ে যাবে। রায়বংশের ওপর দেবরোষ আছে। নারী হতে সর্বনাশ। মনে একটা ভয় হয়েছিল। তত সন্দেহ বেড়েছিল। তারপর যে বাড়ীতে আমার বিয়ে হল, সে বাড়ীতে তখনও আমার বুড়ো দাদাশ্বশুর বেঁচে।

বয়স তখন সত্তোরের কাছে, স্ত্রী মারা গিয়ে খালাস পেয়েছেন; দীর্ঘকাল তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। পঙ্গু স্ত্রী থাকতেই তাঁর সেবা করত তাঁর পোষ্যা আপন ভাগ্নীর বিধবা মেয়ে। সে সেবা সত্যি-সত্যিই রক্ষিতার সেবা ঠাকুমা। আজ 'তুমি কথাটা বড় ঘা দিয়ে বললে বলে

আমার কাছে বলছি। এই বুড়োকে কারুর কিছু বলার উপায় ছিল না, তার কারণ এই বুড়োই কয়লাকুঠীতে সামান্য চাকরি করতে গিয়ে সেকালে পাঁচ-ছ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি করেছিল। সমস্ত সম্পত্তির দাম কষতে গেলে কোটির কাছে যাবে। শুধু ঐ মেয়েটিই নয়, ও বাড়ীতে যত পোষ্য দেখেছি, তাদের যাদের রূপ-যৌবন ছিল, সকলকেই ওই দণ্ড দিতে হয়েছে। দণ্ড দিতে হয়েছে বলছি কেন, তারা গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি বাপ-ভাইয়ের চাকরির জন্যে ওই মাশুল দিয়েছে।

একটু থামলেন যজ্ঞেশ্বর রায়।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—কথাটা তুই বেশী বাড়িয়ে বলছিস যজ্ঞেশ্বর, নইলে কথাটা সত্যি। আমার শ্বশুরবাড়ীতেও ওই হাল ছিল। তারপর পরমহংস দেব প্রকট হলেন, লোকে তাঁকে জানল, চিনল, তাঁর পিছনে স্বামীজী এলেন, তখন দেশের হাল ফিরল।

জ্যাঠামশাই বললেন—না ঠাকুমা, কথাটা ঠিক হল না। পরমহংস দেব এলেন, তাঁর কৃপায় গিরিশ ঘোষ মশায়ের থিয়েটারের মধ্যে থেকেও মতি পাল্টেছিল, কিন্তু জমিদার বড়লোকের বাড়ীর কারও কোন গতি হয় নি। যা ছিল তাই থেকেছে, তাই রয়েছে। আমাদের বংশে দেবরোষের কথা শুনি, কিন্তু সেটা কি তা জানি নে। জানতে কোন রকমেই পারি নি। শুনি ধর্মসাধনে পাপ, আর সম্পদে পাপ। ঠাকুমা, বহু কর্ম আমি করেছি, দীক্ষা আমি নিয়েছিলাম, সে সব গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছি, কিছুই আমি মানি নে। তবে এটা জানি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দ হাজার বছরে একজন। বাকী সন্ন্যাসী সাধুগুলো চোর, ভণ্ড, লম্পট। আর ধনীর ছেলেগুলো সব শয়তান, চরিত্রহীন। তারা আবার যখন গরীব হয়, লক্ষ্মী ছাড়ে, তখন শুধু পুরুষের নয়, বাড়ীর বউ-বেটীরও পতন ঘটে। ও পাপ কেউ ঘোচাতে পারে না ঠাকুমা। এ দেশে ধর্ম নিয়ে যত মাতামাতি হয়েছে, এত কোথাও হয় নি। মেয়েরা, সে স্বামীকে ভালোবাসুক না-বাসুক, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছে। ঈশ্বরকে নিয়ে এত খেলা কেউ কোথাও খেলে নি। বিধবা বিবাহ আইন করেও এদেশে চালানো যায় নি। এত পাপ, এত ভয়ঙ্কর পাপ কোন দেশে—ধর্মের উল্টোপিঠে তার আড়ালের আশ্রয়ে ঘটে নি। আবার একথাও সত্য যে, এত ভালবাসাও কোন দেশে, কোন নারী কোন পুরুষকে বাসে নি। কোন পুরুষ কোন নারীকে বাসে নি। সম্পদেও আমরা পাপ করেছি। এ আমার কথা নয় ঠাকুমা, এ আমার ঠাকুরদাদা তোমার দাদার কথা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কথা, আমাকে নিজে মুখে বলতেন এসব কথা। শুনেছি তাঁর নিজের পিতামহ—মানে বিমলাকান্তের বাপ কি এক ভীষণ সাধনা করেছিলেন। তারই পাপ নাকি আমরা ভোগ করছি। রায়বংশে ধর্মের পাপ ধনসম্পদের পাপ একসঙ্গে জমা হয়েছে। আমার মনে অহরহ সন্দেহ হয় ঠাকুমা, এ বংশে ছেলে-মেয়ে কেউ সৎ থাকতে পারে না, সতী থাকতে পারে না। চিরজীবন এই সন্দেহ আমার মনে। তাই আমি প্রণবেশ্বরের কাছে

যখন শুনলাম সুরেশ্বরের সঙ্গে জগদীশ্বরের মেয়ের এত মাখামাখি, তখন একটা সন্দেহের সুতো টেনে বের করেছিলাম। তারপর যখন শুনলাম, সুরেশ্বর তার বিয়ের জন্তে এত টাকা খরচ করছে, তখন আমার আর সেটা সন্দেহের সুতো রইল না। মোটা দড়ি হয়ে উঠল। আগেকার আমি, মানে অর্থবান যজ্ঞেশ্বর রায় হলে আমি এ সন্দেহ চিঠি লিখে তোমাকে জানাতাম না। কিন্তু গরীব হয়ে ছোট হয়ে গেছি। মনটা ছোট হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না ঠাকমা। অভিসম্পাত দাও, তা দাও। হাজার বার দাও। কিন্তু আমার উপর রাগ করে মন খারাপ করে যেয়ো না।

সুলতা! সুরেশ্বর বললে—এই যজ্ঞেশ্বর রায় আমার জ্যাঠামশাই, যে সন্দেহের দড়ি পাকিয়ে তুলেছিলেন সেদিন, সেই সুতোই কাল হয়েছিল। প্রণবেশ্বর এই সন্দেহের কথা জানিয়েছিল রথীনকে। অর্চনার সঙ্গে রথীনের বিয়ের পর প্রণবেশ্বরের সঙ্গে মাখামাখি একটু বেশী হয়েছিল রথীনের। কেন জান?

অন্নপূর্ণা-মা যে-বাড়ী, যে-বংশ দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কোন পাপ প্রবেশ করতে দেবেন না বলে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই বংশে পাপই বল আর যাই বল, সুলতা ব্যভিচারকে কি বলবে, মদ্যপানকে কি বলবে বল? বল? If it is not a sin—তা মেনে নেব আমি। Sin বলে কিছু নেই। মদ্যপানকেও মেনে নেব। খেলে কোন দোষ নেই। কিসের দোষ? Neither a sin nor a crime. ওটা উনবিংশ শতাব্দীর পিউরিট্যান মুভমেণ্টের একটা idea, তাই হল। কিন্তু ব্যভিচার? প্রথমে রথীন ডাক্তার অর্চনাকে বিয়ে করতে অরাজী হয়েছিল বলেছি। কেন শোন, একটি Anglo nurse-কে নিয়ে সে তখনই জড়িয়ে পড়েছিল। সেই মেয়েটির সঙ্গে প্রণবেশ্বরেরও আলাপ ছিল। আলাপটা ঠিক নার্সটির সঙ্গে নয়, তার দিদির সঙ্গে। সেই সূত্রে তারা চিনত পরস্পরকে, কিন্তু আত্মীয় হিসেবে পরিচয় ছিল না। প্রণবেশ্বরদাদা রথীনকে জানত মেডিকেল স্টুডেণ্ট হিসেবে প্রথম, তারপর ডাক্তার হিসেবে। আর রথীন প্রণবেশ্বরকে চিনেছিল প্রথম পেশেণ্ট হিসেবে। নার্স তাকে এবং নিজের দিদিকে স্যালভারসান ইঞ্জেকসন দেওয়াবার জন্য নিয়ে এসেছিল রথীনের কাছে। রথীন তখন সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র। তারপর নার্সটির বাড়ীতে দুই ভায়রা ভাইয়ের মত তাদের দেখা হয়েছে। এবং মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের কাছে পেশেণ্ট হিসেবে এসেছে।

পরিচয় হল বিয়ের পর।

তারপর সুলতা—যজ্ঞেশ্বর রায় যে কাজ করেছিলেন, বিবাহের আগে বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে, সেই কাজ প্রণবেশ্বর করলে বিবাহের পরে। জ্যাঠামশাই অপবাদ দিয়েছিলেন অর্চনার নামে। প্রণবেশ্বর এবার অর্চনাকে চিঠি দিয়েছিল রথীনের নামে। তার আর সেই নার্সের একসঙ্গে বসে তোলানো ছবিসমেত প্রমাণসমেত পত্র।

উদ্দেশ্য কি জান সুলতা? উদ্দেশ্য অর্চনার সুখের ঘরে আগুন লাগানো। আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তার ফল এমন হল যে—চুপ করলে সুরেশ্বর।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুরেশ্বর। সুলতাও কোন কথা খুঁজে পেলে না।

অনেকক্ষণ পর সুরেশ্বর বললে—অথচ বিয়ের পর রথীন মোটামুটি নিজেকে শুধরে নিয়েছিল। তা না হলে হয়ত ভাবতাম যে, প্রণবেশ্বরদাদার নারীদেহলোভী মন নার্সটির বড় বোনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বা তার প্রতি অরুচি ধরিয়ে নার্সটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

থাক ও কথা এখন, সুলতা। মোটামুটি বলে রাখলাম, এর পর যথাসময়ে যথাক্রমে অর্চনার এ দুর্ভাগ্যের কথা বলব। এখন ও কথা থাক।

এখন যা বলছিলাম তাই বলি।

সেদিন জ্যাঠাইমাকে সাক্ষী রেখে জ্যাঠামশায়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে দিয়ে কুইনীর ওই বাড়ীটা খালাস করে এনেছিলাম। এবং ক'দিন পর তার কাছে না-দাবী দলিল করিয়ে নিয়ে আমিও না-দাবী রেজেষ্ট্রী করে দলিল দুখানা দিয়ে এসেছিলাম অন্নপূর্ণা-মা'র হাতে। ওটা কুইনীকে আমি দিই নি। দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা-মা।

তিনি কীর্তিহাটে যান নি। কুইনীকে আনিয়েছিলেন কলকাতা। ঘটনাটা ঘটেছিল বিয়ের আগেই। কুইনীকে দলিল দুখানা হাতে দিয়ে বাড়ীতে দখল দিয়েই তাকে বলেছিলেন, এই নে তোর বাড়ীর দলিল।

কুইনী বড় শান্ত, না ঠিক বলা হল না, সুলতা, বড় নীরব মেয়ে। কথা বেশী বলে না। নীরবেই সে হাত পেতে দলিল দুখানা নিয়ে বলেছিল, আপনাকে নমস্কার করতে লজ্জা করছে, প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে, করব?

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—করবি বইকি, আমি খুশী হব রে। ক্রুশ্চান হলেও বাঙালী। প্রণাম করা তো শুধু হিঁদুর নিয়ম নয়। এ নিয়ম এই দেশের নিয়ম। যেমন এই শাড়ী পরেছিস। শাড়ী তো সাহেবদের দেশে পরে না।

—পা ছোঁব?

একটু ভেবে নিয়ে অন্নপূর্ণা-মা পা দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছোঁ!

তাঁর পা-দুখানা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই অন্নপূর্ণা-মা তাঁর হাতখানা কুইনীর মাথার ওপর রেখে আশীর্বাদ করলেন। কি আশীর্বাদ করলেন তিনিই জানেন, তবে দু ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে পড়ল।

আমি খুব বিস্মিত হই নি সুলতা। আমি এর কারণ জানতাম। ভেবেছিলাম, কুইনী কিছু বিস্মিত হবে, কিন্তু তাও সে হয় নি।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—দেখ্, আর একটা কথা তোকে বলব।

—বলুন।

—আমি সুরেশ্বরকে বলেছি, তোর পড়াশোনার খরচ সব ও দেবে। তুই পড়। ওই গোয়ানপাড়ার হলদীদের সঙ্গে থেকে ওদের মত হয়ে যাস নে।

কুইনী মৃদুস্বরে বললে—সে-কথা বাবু দিদিমাকে বলেছেন মা।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—জানি। কিন্তু তুই তো তার উত্তর দিস নি। তুই তো গোয়ান নোস কুইনী। তোর বাবা মুখুজ্জে ছিল। বামুন থেকে কৃশ্চান হয়েছিল। তোর মা—সে পিড্রুজের মেয়ে নয় কুইনী। পিড্রুজের মা ভায়লা পিড্রুজের মেয়ে, বাপ ছিল পিড্রুজ কিন্তু তার মা ছিল বামুনের মেয়ে। ভায়লার ছেলে তোর মায়ের বাপকে লোকে পিড্রুজ বলেই জানে বটে কিন্তু তা নয় কুইনী, সে-ও হল বামুনের ছেলে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—মা-বাপ একসঙ্গে মরে গিয়ে হিলডার কাছে গিয়ে পড়েছিস, কিন্তু ওদের মধ্যে থেকে ওরকম হলে তো চলবে না। তোর মায়ের বাপের বংশ খুব বড় বংশ—। চুপ করে গেলেন অন্নপূর্ণা-মা। মুখ ফিরিয়ে নিলেন কুইনীর দিক থেকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কুইনী—কোন উত্তর দিলে না বা দিতে পারলে না। শুধু ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কুইনী চলে গেলে অন্নপূর্ণা-মা মুখ ফেরালেন আমার দিকে, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে দুটি জলের ধারা গড়াচ্ছে।

অন্নপূর্ণা-মাকে আমি যত দেখছিলাম, ততই যেন অভিভূত হচ্ছিলাম। বিশেষ করে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন থেকে। তাই বা কেন সুলতা, সেই যেদিন উনি রথীনকে সঙ্গে করে এনে বিয়েতে রথীনের সম্মতি দেওয়ালেন এবং নিচে দেখলেন কুইনীকে আর হিলডাকে, সেইদিন থেকেই। আমি দেখেই যাচ্ছিলাম আর এইটুকু বুঝছিলাম যে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে যা আছে, রায় কোম্পানীর সঙ্গে ভায়লেট পিড্রুজের পত্রালাপের মধ্যে যা আছে, দেবেশ্বর রায়ের একখানা চিঠির মধ্যে যা আছে, তার চেয়েও আরও কিছু বেশি জানেন অন্নপূর্ণা-মা।

অনুমান আমার মিথ্যে নয় সুলতা। তিনি তা জানতেন।

যেদিনের কথা বলছিলাম, যেদিন কুইনীকে ওইসব কথা বলছিলেন, সেদিন ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে, অর্চনার বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে ফাল্গুনের শেষে, মার্চের ৮ তারিখে; ওই দলিল ফেরত দেবার জন্যেই অন্নপূর্ণা-মা ওদের আটকে রেখেছিলেন কলকাতায়। পড়ে গিয়ে হিলডার হাঁটুটা শুধু পাকেই নি, একটা স্থায়ী স্প্রেন হয়ে প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। তারও চিকিৎসা হচ্ছিল। সেদিন কুইনী কোন কথা বলতে পারলে না, চলে গেল—অন্নপূর্ণা-মা মুখ ফেরালেন, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়েছে। আঁচল দিয়ে মুছে তিনি বললেন—সুরেশ্বর, এ-ভারটাও তুলে নিস রে। মেয়েটাকে পড়িয়ে-শুনিয়ে মানুষ করে দে।

এতে তোর সত্যিকারের ধর্ম করা হবে রে। সে-সব কথা তোকে মুখে বলতে পারব না। কথা তো অল্প নয় রে, কথা অনেক। দেখ, কথা এত রে, কথা যদি ইট-কাঠ বা পাথর হত, কিম্বা সব কথা যদি কাগজে লিখে থাকে-থাকে সাজানো হত, তবে গোটা এই হলঘরখানাই ভরে যেত। বুঝলি! বলতে গেলে জীবনে আর কুলোবে না। আমি তোকে একখানা চিঠি দেব—চিঠিখানা দেবুর লেখা। দেবু তোর ঠাকুরদা, দেবেশ্বর রায় সম্পর্কে আমার ভাইপো, আমার সহোদরের ছেলে সে, তুই জানিস। তোর জ্যাঠাও জানে না। বয়সে প্রায় একবয়সী ছিলাম, আমি থাকতাম কাশীতে, সে থাকত কীর্তিহাটে, দুজনে দুজনকে চিঠি লিখতাম। সেকালের ছোট পোস্টকার্ড, তিন-চারটে লাইন লিখতে ফুরিয়ে যেত। তাও আমার কাছে দু-একখানা আছে। সে আমার ছোট ভাইয়ের অধিক ছিল রে। ভাইপো থেকে ভাই, ছোট ভাই বেশী আপন। আমরা বন্ধু ছিলাম। খুব ছোটবেলা কালীপুজোর পরদিন ভাইফোঁটা, আমি পিসেমশাই আর পিসীমার সঙ্গে কাশী থেকে পুজোর সময় শ্যামনগর এসে কীর্তিহাট আসতাম। সে আমার হাতের ফোঁটা নেবার জন্যে কাঁদত। একসঙ্গে খেলা করতাম। দশ বছর বয়স তখন। আমার বিয়ের জন্যে পাত্রের খোঁজ হচ্ছে, দেবু আমাকে বলেছিল—পিসী, তোমার বিয়ের পরই তো আমার বিয়ে হবে। তা তুমি বলে দিয়ো, আমি মেম বিয়ে করব। তার মনের কথা প্রথম বিশ বছর সে আমাকে বরাবর জানিয়েছে; তারপর সে বদলেছিল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘা খেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল পাথরের মত। তার একখানা চিঠি আমি তোকে দেব—তুই পড়ে দেখিস। আমার মৃত্যুর আগে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলব ঠিক করেছিলাম, তাই করতামও। কিন্তু তোকে পেয়ে মনে হচ্ছে, তুই আমার যেন সেই দেবু। তোকে এই চিঠিখানা দেব, তুই পড়ে দেখিস। তার মধ্যে তার একটা ইচ্ছের কথা আছে! ওরে, সে আমাকে লিখেছিল টাকার জন্যেই। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বর রায় আমার কাছে হাজার টাকা ধার চেয়েছিল। এই কুইনীর মায়ের বাপের মা অঞ্জনাদির পেটের মেয়ে ভায়লেটের জন্যে চেয়েছিল। আমি দিই নি।

ইচ্ছে করেই দিই নি। নইলে আমার টাকা ছিল। একটু চুপ করলেন অন্নপূর্ণা-মা। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—টাকা দিলে আর দেবেশ্বরকে কীর্তিহাটের বংশের মধ্যে পেতাম না রে। ও ভায়লেটকে নিয়ে ক্রশ্চান হয়ে যেতো। টাকাটা চেয়েছিল—। থাক, যে-চিঠিখানা দেব তোকে, তারই মধ্যেই তুই সব দেখতে পাবি।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—অথচ এর ভিত্‌টা গেড়ে দিয়েছিল আমার দাদা। রায়বাহাদুর গোঁড়া ধার্মিক রত্নেশ্বর রায়।

* * *

সুরেশ্বর বলতে বলতে থামলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—

বারোটা বাজতে চলেছে। জিরো আওয়ার। কীর্তিহাটের কড়চাও শেষ হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় আর তাঁর বড়ছেলে দেবেশ্বর রায়ের কথা বললেই শেষ। তারপর আমি আর তার শেষপুরুষ, ছবিতে যে-কড়চা এঁকেছি, তার মধ্যে আমি ছবি নই। আমি জীবন্ত। বিংশ শতাব্দীর মানুষ।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায়ের কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই শেষ। পৃথিবীতে ইংরেজ জাতের দীপ্তমধ্যাহ্ন। বৈশাখের মধ্যাহ্ন। ইংরেজ তখন বৈশাখের সূর্যের মত প্রখর প্রদীপ্ত। তার সেই প্রচণ্ড তেজের উত্তাপে বাংলাদেশে জমিদারেরা সুবর্ণরেখার বালুচরের মত সূর্যের চেয়েও অসহনীয় কিন্তু তবু লোকে তাদের সহ্য করে, দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে, তাদেরই বলে 'মা-বাপ'। বালির মধ্যে সোনার দানা বা কণা সত্যই পাওয়া যেত, খুব বেশি না হলেও, নেহাৎ কম নয়। অনেক। অনেক।

ইস্কুল, হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী যা বাংলাদেশে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল, তার বারো আনা দিয়েছে এই জমিদারেরা।

সুলতা এতক্ষণে কথা বললে, বললে—আমি তোমাকে সমর্থন করছি সুরেশ্বর। তার সংখ্যাও মোটামুটি আমার জানা আছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজ সরকার মোটামুটি জেলাওয়ারি একটা জেলা স্কুল, আর একটা সদর হাসপাতাল দিয়েছে। হয়তো বা দুটো-একটা জেলায় দুটো থাকতে পারে কিন্তু দুটোর বেশি নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হবার পূর্বে এই হিসেবে আটাশটা জেলায় গোটা-তিরিশেক ইস্কুল গভর্নমেণ্ট দিয়েছে, হাসপাতালও তাই। কিন্তু পার্টিশনের সময় প্রায় চোদ্দশ' ইস্কুল আমাদের দেশে ছিল। এর কিছু ছিল মিশনারীদের। কিছু গ্রামের লোকের চাঁদায়। শতকরা আশীটাই জমিদারদের দেওয়া। তার সঙ্গে অনেক কথা আসে, সেসব থাক, আমি ওসব শুনতে আসি নি, আমি তোমার রায়বাড়ীর বা কীর্তিহাটের কড়চা দেখতে এসেছি, শুনতে এসেছি। বলে রাখি, এর মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার পুরনো হৃদ্যতার জের অবশ্যই আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন হৃদয়ের আকর্ষণের জের নেই। তুমি কড়চার কথা বল।

ঢং-ঢং-ঢং শব্দে ঘড়িটা বাজতে শুরু করল।

সুলতা বললে—তোমার অন্নপূর্ণা-মা যে চিঠিখানা তোমাকে দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটা থেকে শুরু কর। চিঠিখানা তোমার কাছে আছে?

—আছে। যা তোমাকে বলেছি, যা আমি ছবিতে এঁকেছি, তা যে সব কাগজ থেকে পেয়েছি, সে সব কাগজ আমার কাছে বড় মূল্যবান দলিল সুলতা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইসব দলিলের দেনা আমাকে শোধ করতে হবে। লোকে আমাকে পাগল বলে। এই তো কালও রায়বাড়ীর অন্য জ্ঞাতিরা আমাকে গালাগাল দিয়ে গেলেন এর জন্যে। তা দিন। আমার সংকল্প আমি পালন করব।

সামনের টেবিলে জমা-করা কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা ছোট চন্দনকাঠের বাক্স থেকে সুরেশ্বর একখানা খাম বের করলে। সেই ছোট পোস্টকার্ড ছোট খামের আমলের—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি আঁকা খাম। তার মধ্যে থেকে লাইন-টানা চিঠির কাগজে লেখা চিঠি। চিঠির কাগজখানা গিরিমাটির রঙ ধরেছে এবং কোণগুলো ভেঙে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে ফাট ধরেছে।

* * *

চিঠিখানার তারিখ ১৮৭৮ সাল, বাংলা ১২৮৫ সাল। কলকাতার জানবাজারের বাড়ী থেকেই চিঠি লিখেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং, পিসী, মদীয় এই পত্র পাইয়া তুমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হইবে। সম্ভবত মদীয় নাম দেখিয়া আমার উপর তোমার ঘৃণারও উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু নিবেদন করিব এই যে, পত্রখানি তুমি পাঠ করিয়া দেখিয়ো। এ-সংসারে তুমি আমাকে আপন দিদির মত যে-প্রকার স্নেহ কর, তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। এমতপ্রকার স্নেহ আমাকে আমার পিতা করেন না, মাতাও করেন না। আমি আজ তাঁহাদের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি। আমাকে একরূপ ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

মদীয় বিবরণ তুমি জান। তুমি শুনিয়াছ। অবশ্য পূর্বে তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া করিলে হয়তো এমতপ্রকার অবস্থা বিপর্যয়ে পতিত হইতে হইত না। তবে তুমি ভায়লা বলিয়া যে-অনাথা মেয়েটি পিড্রুজের বাড়ীতে থাকিত, তাহাকে তুমি দেখিয়াচ। তাহাকে তুমি চেন। মেয়েটা আমা অপেক্ষা বৎসর-দুয়ের ছোট। মেমসাহেবদের মত গায়ের রঙ। সে যে অঞ্জনাপিসীর কন্যা, তাহা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম।

ইহা কি প্রকারে আমি অবগত হইলাম, তাহা বলিয়াছিলাম কিনা জানি না। তাহাই তোমাকে বলিব। না হইলে তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে না।

আমার বয়স তখন বৎসর-সাতেক, তোমার তখন বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। জানবাজারের বাড়ীতে তৎকালে ছিলাম। মা তখন প্রসবের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি দেখিতাম এই ভায়লাকে কোলে করিয়া কলিকাতাবাসী একজন গোয়ান সেরেস্তায় আসিয়া দাঁড়ায় এবং সপ্তাহে কয়েকটি করিয়া টাকা লইয়া যায়।

বাবামশায় আসিলে তিনি লোকটাকে লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কথা বলেন। আমার খুব কৌতূহল হইত। কারণ ছেলেবেলা হইতেই মেমসাহেব আমার খুব ভাল লাগে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল—তাহার করিলাম। সে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় দুই-চারিটা কথা বলিত। ইংরাজী সে জানিত না। আমি তখন ইংরাজী শিখিয়াছি, মাস্টার আমাকে তখন মুখে-মুখে ওয়ার্ড-বুক মুখস্থ করাইয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে ইংরাজী বলিতে

সে দুই হাত নাড়িয়া দিত, বুঝাইয়া দিত জানি না। বলিত, পর্টুগীজ পর্টুগীজ!

একদিবস আমার পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, ওই মেয়েটি অঞ্জনাপিসীর কন্যা। গভীর রাত্রিকাল তখন। আমি মায়ের নিকট ছোট একখানি খাটে শুইয়াছিলাম, মায়ের খাটে মা শয়ন করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, হঠাৎ মায়ের উচ্চকণ্ঠে আমি জাগিয়া উঠিলাম।

প্রথমেই শুনিলাম—ওই যে ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোলে লইয়া গোয়ান ছোঁড়াটা আসে, বল, বল, বল সে-মেয়েটা কে? কার মেয়ে? তুমি উহাকে প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করিয়া দাও কিনা? বল?

বাবামহাশয় যেন একটা চাপা গর্জন করিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিও না। যাহা বলিবে আস্তে আস্তে বল। একটা কেলেঙ্কারী করিয়া লাভ হইবে না। দেবেশ্বর জাগিয়া উঠিবে।

বলিয়া তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন—দেবেশ্বর। দেবু। বাপি। আমি আগেই ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। আমি কোন সাড়া দিলাম না, অন্তরে নিদারুণ ভয় সঞ্চারিত হইল। আমি চুপচাপ পড়িয়া রহিলাম। যেন গাঢ় ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

তারপর পিসী যাহা সেদিন শুনিয়াছিলাম, তাহার অর্থ সম্যক অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু কথাগুলি ভুলি নাই। জ্ঞান হইবার বোধশক্তি জন্মিবার পর তাহার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম—মা সেদিন ওই ভায়লাকে অঞ্জনার কন্যা বলিয়া জানিলেন। অঞ্জনার প্রতি পিতৃদেবের একটা গোপন লালসা বা অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি তাহা তাঁহার অন্তরে অন্তরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং অঞ্জনাকে তাহার দরিদ্র বাউণ্ডুলে স্বামীর নিকট হইতে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া নিজেদের কাছে কাছে রাখিয়াছিলেন। এতটা সহ্য করিতে পারে নাই অঞ্জনা। সে আলফান্সো পিড্রুজের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল। এখন আলফান্সো খুন হইয়াছে। গোয়াতে অঞ্জনাদিদি থাকিতে পারে নাই। এবং শরীরেও রোগ ধরিয়াছিল; সেই কারণে বহু কষ্টেই ওই ভায়লা মেয়েটাকে লইয়া কোনমতে কলিকাতায় আসিয়া ফিরিঙ্গিপাড়ায় যেখানে গোয়ানীজরা থাকে, সেইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এবং এখানে আসিয়া বাবামহাশয়কে পত্র লিখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। বাবামহাশয় সপ্তাহে দশ টাকা হিসাবে বরাদ্দ করিয়াছেন, একসঙ্গে সমস্ত টাকা দেন না, তাহার কারণ একসঙ্গে সমস্ত টাকাটা হাতে পাইলে সবটাই খরচ করিয়া ফেলিবে।

বাবামহাশয় নিষ্ঠুরভাবে বলিলেন—হাঁ বাসিতাম। অঞ্জনাকে ভালবাসিতাম বলিয়াই তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলাম। তোমার নাম করিয়া তোমার নিকটই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সহিত কোনপ্রকার গাঢ় সম্পর্ক হইতে দিই নাই, তাহা আমার নিষ্ঠুর চরিত্রবল। আমি অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আমি। আমি

আত্মহত্যা করিতে পারি। আমার আঙুল একটি একটি করিয়া ছেদন করিতে পারি। তাহার জন্যই করি নাই। নতুবা অঞ্জনাকে একখানা বাড়ীতে রক্ষিতা হিসাবে রাখিলে কে আমাকে বাধা দিতে পারিত। তোমার এস-ডি-ও সাহেবপিতারও ক্ষমতা ছিল না।

মা কিছু বলতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবামহাশয় বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, চুপ কর, চুপ কর। বৃথা আস্ফালন করিয়া কোন লাভ হইবে না। রত্নেশ্বর আইনকে লঙ্ঘন করিয়া চলে না। তোমার বাবা আইনের বাহিরে যাইতে পারেন না। তাহা ব্যতীত বাবার উপরে বাবার মত এস-ডি-ও'র উপর ম্যাজিস্ট্রেট, তাহার উপর কমিশনার, তাহার উপর লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নর আছেন; এদিকে জজকোর্ট আছে, হাইকোর্ট আছে। ইহাদের দিয়াই আমি সহস্র সহস্র দুর্ধর্ষ প্রজাকে পদানত করিয়াছি। বৃদ্ধি লইয়াছি। তাহাদের পায়ের গোলাম করিয়া রাখিয়াছি। তোমার বাবার কাছেই শুনিয়াছি যে, সরকারী মহলে আমার যত সুনাম, তত দুর্নাম। তবুও তাঁহারা আমার প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। তেমনি ভাবেই অঞ্জনাকে—। থাক, কথাগুলো উচ্চারণ করিতেও ঘৃণাবোধ হইতেছে। নারীজাতি অতি ঈর্ষাপরায়ণ, অঞ্জনা মরণাপন্ন, তাহার ওই শিশু-কন্যাটি লইয়া নিরাশ্রয়, আমি তাহাকে সামান্য সাহায্য করি, তাহাও তোমার সহ্য হইতেছে না।

পিসী, কথাগুলো আমি কোনদিন ভুলিতে পারি নাই। ইহার পর একদিন সেই গোয়ানটার সঙ্গে চুপি চুপি অঞ্জনাপিসীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। অঞ্জনাপিসীকে চিনিতে খুব কষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম। অঞ্জনাপিসী খুব আদর করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—আঃ! কি কপাল, আর কি বিধান। দেবুর সঙ্গে ভায়লার বিবাহ হইবার উপায় নাই। হইলে কি ভালই না হইত।

পিসী, কথাগুলা সে-সময় বোধহয় তোমাকে বলিয়াছিলাম। যেবার অঞ্জনাপিসীর মৃত্যুর পর বাবামহাশয়ের ব্যবস্থায় ভায়লেট গোয়ানপাড়ায় পিড্রুজদের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল, পিড্রুজের সৎভগ্নী পরিচয়ে এবং তুমি তাহাকে প্রথম দেখিলে সেবার বোধহয় তোমাকে কথাগুলি বলিয়াছিলাম। তোমার হয়তো মনে নাই।

কিন্তু আমার ইহাই সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। আমি ভায়লেটকে ভালবাসিয়াছি। সে-ও আমার প্রতি আশ্চর্যরূপে অনুরক্ত। তাহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না, সে-ও আমাকে ছাড়িয়া বাঁচিবে না। ধর্মমতে বিবাহ না হইলেও, আমরা স্বামী-স্ত্রীই হইয়া গিয়াছি। এবং আশঙ্কা করিতেছি, কিছুদিনের মধ্যে এ-ঘটনা আর লোকচক্ষে অপ্রকাশ থাকিবে না।

তুমি তো বাবামহাশয়কে জান। এ-কথা তিনি জানিতে পারিলে হয় ভায়লেট মরিবে, নয় আমাকে চরম অপমানে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিবেন। তাহা আমি চাহি না। আমি ভায়লেটকে লইয়া চলিয়া গিয়া কৃশ্চান হইয়া বিবাহ করিব। এবং দরিদ্র ভাবেই জীবন-যাপন আরম্ভ করিব। তবে আমার ভরসা আছে এই যে, যদি আমি কিছু টাকা একসঙ্গে

সংগ্রহ করিতে পারি, তবে আমি তাহা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উন্নতি করিতে পারিব। মাইকেল মধুসূদন মহাকবি হইয়াছিলেন। আমি হইব না কে বলিতে পারে ?

তোমার হাতে টাকা আছে। তুমি তো টাকা পাইয়াছ। আমাকে কয়েক হাজার টাকা ধার দিতে পার পিসী! আমি শোধ দিব, নিশ্চয় শোধ দিব। আমাকে বিশ্বাস কর —আমাকে বিশ্বাস কর। আমাকে বাঁচাইতে পার তুমি, বাঁচাইবে ? মায়ের গয়না আমি চুরি করিতে পারি—টাকাও চুরি করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমি করিব না। তোমার ভাইপো চোর নয়।

সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভাবলে। পুরানো চিঠিখানার শেষের পাতাটার নীচের দিকটা উপরে ছিল বলে ময়লা একটু বেশী হয়েছিল। চিঠিখানার ওই অংশ থেকে চোখ তুলে বললে—এই অংশটা আমার খুব ভাল লাগে। দেবেশ্বর রায়কে এই অংশ থেকে স্পষ্ট চেনা যায় জানা যায়। কথাগুলো খুব দামী—সেই বয়সে দেবেশ্বর রায় কি করে যে লিখেছিলেন, তা বলতে পারব না। কথাগুলো শোন, শুনলেই বুঝতে পারবে।

"পিসী আমার ভয় হইতেছে যে, তুমি আমাকে বুঝিবে না, বুঝিতে চাহিবে না। তুমি বাবামহাশয়ের সহোদরা হইলেই ভাল হইত। আশ্চর্য বোধ হয় এই যে, বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় দাদামহাশয়ের সন্তান পোষ্যপুত্র সূত্রে বীরেশ্বর রায়ের পুত্র হইয়া অবিকল তাঁহার স্বভাব কিরূপে পাইলেন ? তুমি বাবামহাশয়ের অপেক্ষাও জেদী। এই বয়সে একটি সন্তান লইয়া জেদের বশে স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ হইতে নির্বাসন লইয়া কাশীতে বিমলাকান্ত দাদামহাশয়ের কাছে পালক-পিতার কাছে গিয়া সংসার পাতিয়াছ। পিতৃবংশের সহিত মামলা করিবে না—ইহা তোমার জেদ। জেদ করিয়া তুমি স্বামীকে ছাড়িয়াছ। তাহা ছাড়া সারা দেশের মেয়েরাই এমন যে, জাতের জন্য স্বামী তাহারা অনায়াসে ছাড়িতে পারে। স্বামী কৃশ্চান কি মুসলমান হইল—স্ত্রী জাতের জন্য স্বামীকে ছাড়িল। পুরুষেও পারে। তাহাই করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পদ্মাবতীর কি অপরাধ বল ? জোরপূর্বক তাহাদের বাপ-মায়ের সহিত তাহাকেও মুসলমান হইতে হইল। তাহার জন্য নবকুমার পরিত্যাগ কেন করিবে। কিন্তু ইহাই এ-দেশে হয়। পিসী, ইহাই আমি পারি না। পারিব না। আমার কাছে জাতিধর্ম অপেক্ষাও প্রেম বড়। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহাকে ছাড়িতে পারিব না। তাহারই জন্য তোমার নিকট আমি সকাতরে আবেদন করিতেছি। পিসী, এই সাহায্যটুকু তুমি আমাকে কর। তোমার ভাইপো দেবু তোমাদের শিবঠাকুরের মত। সে প্রেমের জন্য প্রিয়তমার জন্য অঙ্গে ছাই মাখিয়া শ্মশানের পোড়াবাঁশ ও চ্যাটাইয়ে ঘর বাঁধিয়া, ভিক্ষা করিয়া থাকিতেও রাজী আছে। কিন্তু এত কষ্ট সহিবে না। অভ্যাস নাই। অভ্যাস করিতে গেলে অকালমৃত্যু ঘটিবে। পিসী, তাহা কি সহ্য করিতে পারিবে ? তুমি আমাকে টাকা ধার দাও। আমি তাহা মূলধন করিয়া ব্যবসা করিব, ঘর বাঁধিব।

* * *

শেষের দিকটায় কাব্য একটু বেশী হয়েছে এবং রোমান্টিক হয়ে পড়েছেন। তা হোন, সেটা আমি ধরি নি, কারণ তখন দেবেশ্বরের বয়স সবে ষোল পার হয়ে সতেরোতে পড়েছে। গ্রামেই হাই ইংলিশ স্কুল ছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর ছেলেকে জানবাজারের বাড়ীতে রেখে পড়াতেন। পড়তেন হিন্দু স্কুলে। তাঁর কাছে থাকত গোপাল পাল, ঠাকুরদাস পালের এ-পক্ষের বড় ছেলে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের বিয়ের ঠিক আগেই বা ঠিক পরেই তাঁরও বিয়ে হয়েছিল রঙলাল ঘোষের পিসীর সঙ্গে। সে-কথা আগেই বলেছি।

১৯৩৭ সাল থেকে আবার পিছিয়ে চল সুলতা। সময়টা ১৮৭৬ সাল। রত্নেশ্বর রায় শ্যামনগরে হাই-ইংলিশ স্কুল স্থাপন করলেন। ১৮৭৬ সালে রত্নেশ্বর রায় হাই-ইংলিশ স্কুল। বিমলাকান্ত তখনও বেঁচে; তিনি বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—না রত্নেশ্বর, আমি আজও বর্তমান রয়েছি। আমার নামে নয়। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন? তাতে কি হল? এই তো কীর্তিহাটের স্কুলের এম-ই স্কুল বাবা থাকতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল বীরেশ্বর রায় এম-ই স্কুল। তারপর স্কুল এন্ট্রান্স স্ট্যাণ্ডার্ড হল, তখন তার সঙ্গে আমার নাম জুড়ে বীরেশ্বর রায় এম-ই এ্যাণ্ড রত্নেশ্বর রায় এচই-ই স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে অন্যায় হয়েছে বলতে চান? তাছাড়া কর্মের জন্য নিন্দাই বলুন আর প্রশংসাই বলুন, এ-প্রাপ্য হল তার যে সেই কর্ম করে। সে সমাজে বলুন, রাজদ্বারে বলুন, অথবা বিধাতার বিচারালয়েই বলুন। সালটা ওই ১৮৭৮।৭৯ সাল।

এসব কথাই চিঠি মারফৎ চলছিল সুলতা।

বিমলাকান্ত লিখেছিলেন—"তাহা হইলে এ স্কুল তোমার নামেই স্থাপিত হওয়া উচিত, আমার নামে নয়। অথবা শুধু গ্রামের নামেই নামকরণ হওয়া উচিত। শ্যামনগর হাই-ইংলিশ ইস্কুল। কারণ শ্যামনগরের জমিদারী স্বত্ব আমাদের বংশের বা আমার হইলেও ইহার আসল মালিক কীর্তিহাটের রায়বংশ। তাঁহাদের অর্থেই এ লাট যার নামে ক্রয় করা হইয়াছিল। তৎপর তাহা পত্তনী লইয়াছেন কীর্তিহাটের রায় অর্থাৎ তুমি। এই লাটের বৃদ্ধি লইয়াই একদা দে-সরকারদের সহিত তোমার বিরোধ বাধিয়াছিল। তাহা হইতেই বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। রবিনসন সাহেব আসিয়া কুঠী করিতে গিয়া মরিয়াছে। দে-সরকারেরা গিয়াছে। এখন জমিদারী আমার কিন্তু পত্তনীদার হিসাবে খাস দখল তোমার। তুমি এই লাটের মোট আদায় ৫৬০০ টাকার মধ্যে সরকারকে দেয় রাজস্ব ৪০০০ টাকা বাদে ১৬০০ টাকা আমাকে ঠাকুরের সেবায়েত হিসাবে লভ্য প্রদান করিয়া থাক। লাভ তোমাদের এস্টেটের কিছুই নাই আছে লোকসান। আদায় খরচা লোকসান লাগে। লাভ বলিতে শ্যামনগর রাধানগর এবং ঠাকুরপাড়া এবং পাইকপাড়া কয়েকটির খাস দখল বা অধিপতিত্ব। তুমি এই গ্রামের বৃদ্ধির জন্য একদা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলে—এবার

শ্যামনগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়া সমুদয় মৌজায় ডৌল জমার উপর সিকি বৃদ্ধি দাবী করিয়াছ। অর্থাৎ ৫৬০০ টাকার সিকি ১৪০০ টাকা বৃদ্ধি হইবে। ইহার সহিত কিছু খাসদখলী জমি ইত্যাদিও দেওয়া হইবে। ইহা সবই রায় এস্টেটের দান। সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার কীর্তি স্থাপনের গৌরব বা পুণ্যের দাবী শ্যামনগরের ভট্টাচার্য বংশের নাই। সুতরাং ইহা তোমার নামেই স্থাপন কর। আরও একটা শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করাইয়া দিই। "সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম।" তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। পিতৃ-পুরুষের গৌরব।

প্রসঙ্গক্রমে লিখি যে ঠাকুরদাস আমাকে এ সম্পর্কে পত্র লিখিয়াছিল। শ্যামনগরে বৃদ্ধির প্রস্তাবে সে খুবই ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এবং তৎসঙ্গে আর ভদ্রজনেরাও আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমি যেন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া এই বৃদ্ধি নিবারণ করি। কিন্তু আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া পত্রাদি লিখিয়াছি। এবং এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে গ্রামের যে কি প্রকার উপকার হইবেক তাহাও বুঝাইয়াছি। তাহারা আমার পত্রের আর উত্তর দেন নাই কিন্তু জানিলাম কথাটা ঠিক তাহারা মানিতে চাহেন নাই। তোমাকে এই বৃদ্ধির জন্য অনেক অর্থাদি ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রায় দুইশত জোতের উপর বৃদ্ধির নালিশ চলিয়াছে হাই-কোর্ট পর্যন্ত। তাহাতে কৃতকার্য হইয়া তুমি মায়-খরচা ডিগ্রী পাইয়াছ। তাহাতে অবশ্যই আমি খুশী হইয়াছি। এ সম্পর্কে ঠাকুরদাস কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সে আমাকে এই লইয়া একখানা পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানায় যে ক্ষোভ আছে তাহা নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করিতেছি না। তুমি যেমন তাহার জোতের উপর বৃদ্ধি লইয়াছ তেমনি তাহাকে নিষ্কর দিয়াছ এবং যথেষ্ট করিয়াছ। কিন্তু তাহার একটা কথায় আমার খটকা লাগিয়াছে। আমি সন্দেহ করিতেছি যে, সে কোনরূপে আমায় সহিত তোমার এবং ভবানী ভগ্নীর সহিত আমার সম্পর্কের কথা জানে বা জানিতে পারিয়াছে।"

রত্নেশ্বর রায় এ পত্রের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে ইস্কুলের নাম রেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় হাই-ইংলিশ স্কুল। এবং ঠাকুরদাস পালের নাম আর কোন কিছুতে উল্লেখ পাই নি।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে চিঠিটার কথা উল্লেখ আছে। "আজ কাশী হইতে পত্র পাইলাম। পিসামহাশয় পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া ঠাকুরদাসকে বাজাইয়া দেখিব বলিয়া তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইলাম। পিসামহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইলে তো ঠাকুরদাসকে—।"

আর কিছু লেখেন নি তিনি। তারপর লিখেছেন—"কথাটা সত্য মনে হইতেছে। ইদানীং ঠাকুরদাস আমাকে নির্জনে পাইলে শ্যামনগরের বৃদ্ধি লইয়া পূর্বের সম্পর্ক ধরিয়া নির্বোধ আমাকে দাদাঠাকুর সম্বোধন করে এবং আমার সহিত বাকযুদ্ধ করিতে সাহসী হয়। আমি

সহ করি কিন্তু মাত্রা ছাড়াইবার উপক্রম করিলেই কিছু কঠোর কণ্ঠে 'ঠাকুরদাস' বলিয়া ডাকিলেই বা সজোরে গলাঝাড়া শব্দ করিলেই চুপ করিয়া যায়। আমি আঙুল দেখাইয়া বলি—যা বাহিরে যা। সাধারণ লোকের মগজে গোবর থাকে, তোর মগজে মহিষের বিষ্ঠা পোরা আছে। তর্ক করিস না, বাহিরে যা।

সে বাহিরে যায় কিন্তু বারান্দায় বা এমন কোন স্থানে বসিয়া যেন আপন মনেই বলে—"ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাত—নিম না ছাড়েন আপন জাত।" অথচ তাহার উদ্দেশ্য কথাটা আমাকে শোনানো।

যে সব মূর্খেরা ইস্কুলের উপকারিতা বুঝে না, শুধু খাজনা বৃদ্ধিটাকে অপমান বোধ করে, তাহাদের উন্নতিবিধান করিতে ভগবানেরও সাধ্য নাই। ইহারা ইংরাজকে দেখিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িবে। এ দেশী ইংরাজী জানা ব্যক্তিকে ইংরাজের সমকক্ষ ভাবিবে—অথচ নিজেরা কিছুতেই ইংরাজী শিখিবে না। বলিবে—কি বলিতেছেন মহাশয়, আমরা যদি ইংরাজীই শিখিব তবে চাষবাস করিবে কাহারা? আপনাদের ভৃত্যগিরি করিবে কাহারা? কিন্তু আশ্চর্য, প্রজা হিসাবে ইহাদের আর একটা চেহারা আছে। ঠাকুরদাস পালের ঘরে যখন জমিদারের দেওয়া আগুনে স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিয়াছিল, সে ছবি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

* * *

এরই মধ্যে ঘটনাটা ঘটল। চতুর্দশী ভায়লেটের প্রেমে পড়লেন দেবেশ্বর। কিন্তু দেবেশ্বরকে আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠাকুরদাসের দ্বিতীয়পক্ষের বড় ছেলে গোপাল।

রত্নেশ্বর রায় পত্র লিখে ঠাকুরদাসকে আসবার কথা জানালেন। কিন্তু সে এল না। রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"অন্য কেহ হইলে ঠাকুরদাস পাল বলিয়া কেহ আর শ্যামনগরে ইহার পর থাকিত না।

ইতিমধ্যেই পিক্রুজ আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে, গোপাল অঞ্জনার কন্যা ভায়লেটকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেছে। কতদিন হইতে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে তাহা সঠিক বলিতে পারিল না, তবে কিছুদিন হইতে অর্থাৎ এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেবেশ্বরের সঙ্গে সে এখানে আসিয়া এইরূপ কাণ্ড শুরু করিয়াছে। সুতরাং পিক্রুজকে দিয়া অনায়াসে এই ঘটনা লইয়া ঠাকুরদাসের সঙ্গে ঝগড়া বাধিতে পারে। ঠাকুরদাসের সঙ্গে পিক্রুজদের একটা বিবাদ ইতিমধ্যেই জন্মিয়াছে। শ্যামনগরের বৃদ্ধি কোর্ট মারফৎ মামলার রায়ের বলে হইলেও আমাদের কাছারীতে পিক্রুজ এবং তাহার অনুচরেরাই মোতায়েন আছে। কিন্তু না, তাহা করিব না। তাহাতে অধর্ম হইবে। অধর্ম আমি করিব না। পূর্বের সে-সকল দিবস বিগত হইয়াছে, যে-কালে প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া চলিত। ইচ্ছামত গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করা চলিত, তাহাদের ঘরের বধূকন্যা জোরপূর্বক হরণ করা মাত্র একটা হুকুমের অপেক্ষা রাখিত। আজ নূতন কাল নূতন আলোক নূতন উত্তাপ অনুভব করিতেছি। দক্ষিণেশ্বর গিয়া আশ্চর্য

মানুষ দেখিয়া আসিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পূর্বে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের নিকট দীক্ষা লইয়াছি নহিলে এই মহাসাধকের নিকট দীক্ষা লইয়া ধন্য হইতাম। বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যেন একটা নূতন জোয়ার আসিতেছে। তাহা ছাড়া ভায়লেট অঞ্জনার কন্যা।

যাহা হউক দেবেশ্বরকে ডাকিয়া গোপাল সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিলাম। দেবেশ্বর নতমুখে দাঁড়াইয়া শুনিল এবং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে সাবধান করিয়া দিবে। দেবেশ্বর আমার কুল-উজ্জ্বলকারী পুত্র। যেমন রূপে কন্দর্প কি কুমার কার্তিকেয়, তেমনি গুণে মেধায় অসাধারণ। বাল্যকালে আমার নিজের মেধা ও স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়া মনে করিতে সংকোচ নাই যে সে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল লজ্জাকর কথাগুলি সে শুনিল—মাথা হেঁট করিয়াই শুনিল—ক্ষণে ক্ষণে সে লাল হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু আমার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিল না। কোন প্রশ্ন করিল না। হাঁ, ইহাই তো আভিজাত্য। ইহাই তো শীলতা। কিন্তু আমি ভাবিতেছি হতভাগ্য গোপালের কথা।"

ভায়লেটকে রত্নেশ্বর রায় নেপথ্যে থেকে অঞ্জনার কন্যা হিসেবে মানুষ করছিলেন। শেষ জীবনটায় তিনি তাকে অর্থসাহায্য করেই কর্তব্য শেষ করেন নি, তার মৃত্যুকালে গোপনে তার বাড়ীতে গিয়ে ভায়লেটের ভার নিয়ে এসেছিলেন। ভার নিয়ে তাঁর সমস্যা দাঁড়িয়েছিল কি ভাবে ভায়লেটকে মানুষ করবেন? সেই গোয়ানীজ আধাপর্তুগীজটার মত? কিংবা অঞ্জনার মেয়ের মত? আলফানসো পিক্রজের দেহের যা গড়ন গায়ের যা রঙ তাতে তাকে বারো আনা পর্টুগীজ বলা চলত। এবং তার যা চরিত্র তার যা পেশা তাতেও তাকে হারমাদদের খাঁটি বংশধর বলা যেত। কিন্তু অঞ্জনা বামুনের মেয়ে; সেকালে রত্নেশ্বর রায়ের মত জমিদারপুত্রের মুখে দু'চারটে সরস কথা শুনে আর তার নিজের প্রতি কয়েকটি তারিফ বাক্য শুনে বামনের চাঁদ ধরার সাধ জেগেছিল—নিজে গলে জল হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রত্নেশ্বরের যে স্পর্শে সে গলতে পারত সে স্পর্শ পায় নি বলেই ক্ষোভের বশে চলে গিয়েছিল ওই দুঃসাহসী আলফানসো পিক্রজের সঙ্গে। হয়তো সে সেদিন আরও ঘৃণ্য কাউকেও বরণ করতে পারত। কিন্তু তার মোহ বেশীদিন টেঁকে নি। এবং ভাগ্যক্রমে আলফানসোও তার হারমাদি ট্রাডিশনকে উজ্জ্বলতর করে খুন হয়ে তাকে রেহাই দিয়েছিল। অঞ্জনা আবার ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ফেরা আর সম্ভবপর ছিল না এবং উপায়ও ছিল না। একদিকে সমাজ ছিল কঠোর। আর অন্যদিকে তার নিজেরও ধরেছিল মৃত্যু-রোগ। মৃত্যু আসন্ন বুঝে সে রত্নেশ্বর রায়কে শেষ দেখা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। এবং তা সে পেয়েও ছিল। রত্নেশ্বর রায় ওই পিছন দিকের মেথরদের দরজা দিয়েই ময়লা কাপড়জামা প'রে নিঃশব্দে চোরের মত বেরিয়ে গিয়েছিলেন এই জানবাজারের বাড়ী থেকে। এবং গিয়ে উঠেছিলেন দেশী কৃশ্চানপাড়ায় ওই এলিয়ট রোডের আশেপাশে কোন একটা খোলার বাড়ীতে।

বিস্তৃত বিবরণ লেখেন নি রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে। সে লিখবার মত লোক তিনি ছিলেন না। কঠিন কাঠের মত লোক। কাঠ হলেও বলব রত্নেশ্বর রায় ছিলেন সেকালে চন্দন কাঠ। কিন্তু রক্তচন্দন। অত্যন্ত শক্ত। অনেক ঘষলে তবে রক্তরাঙা কাঠের রস বের হয়।

যাক। অঞ্জনার কাছে বাগ্‌দান করে এসেছিলেন—ভায়লেটকে তিনি এই কলকাতার বাড়ীতে যেন ফেলে না রাখেন। কোন মিশনে না দেন। যাতে ও একেবারে ফিরিঙ্গী কৃশ্চান না হয়ে যায়। অঞ্জনা বলেছিল—দেশে তো অনেক দেশী কৃশ্চান আছে—মুখুজ্জে বাঁড়ুজ্জে চাটুজ্জে—বামুন কৃশ্চান, কায়স্থ কৃশ্চান, বণ্ডি কৃশ্চান আছে তো। তেমনি দেখে একটা বিয়ে দিলে আমি স্বস্তি পাব।

কথা দিয়ে এসেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু কাজটি করা খুব সহজ ছিল না সুলতা। তবু তিনি করেছিলেন যথাসাধ্য। হিলডার বাবা পিক্রুজের সঙ্গে আলফানসোর সম্পর্ক ছিল খুড়ো-ভাইপো। খুব নিকট সম্পর্ক, কিন্তু ওদের সমাজে তো সম্পর্কের মূল্য খুব বেশী নয়। তবে সেখানে রত্নেশ্বর রায়ের দাক্ষিণ্যে মূল্যটা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বাস্তব; টাকা আনা পাই। এবং কীর্তিহাটের গোয়ানপাড়ায় বাড়ী ঘর পর্যন্ত। এবং এই পিক্রুজই ভায়লাকে তার সৎবোন পরিচয় দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গোয়ানপাড়ায়। সেখানে কয়েকটা বছর কাটতে কাটতে ভায়লা যখন বারো-তেরো বছরের হয়ে উঠল, তখন রত্নেশ্বর রায় অকস্মাৎ একদিন মেয়েটাকে দেখলেন। দেখলেন কিশোরী ভায়লার চোখে একটু বিচিত্র দৃষ্টি ফুটছে। এবং গালে যেন একটা লালচে আভা দেখা দিয়েছে। গোয়ানপাড়ায় অন্য সঙ্গিনী মেয়েগুলোর সঙ্গে রঙ্গ ক'রেই ওই কাঁসাইয়ের দহে নেমে জল তোলপাড় ক'রে স্নান করছিল। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বিবি মহলের ছাদে। তামাটে রঙের মেয়েগুলোর মধ্যে উজ্জ্বলতমা কালো কুঞ্চিতকেশিনী ভায়লেটকে চিনতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। এবার অঞ্জনার কাছে শেষ প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে, দেশী কৃশ্চানের ঘর দেখে।

তাদের সমাজ স্বতন্ত্র, জীবনের ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তারা ধর্মে কৃশ্চান কিন্তু তারা ফিরিঙ্গী নয়। তারা ভারতীয় কৃশ্চান। সেকালে বামুন কৃশ্চান কায়স্থ কৃশ্চানের সঙ্গে করণ কারণ করত না। করলেও তা খুব বেশী নয়—বিরল ছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যেও তাই।

তবু অর্থের জোর এবং জেদী শক্তিশালী মানুষেরা সব পারে। তার সঙ্গে যদি বুদ্ধি এবং কৌশলের মাথা থাকে তবে লক্ষ্মী সরস্বতী শক্তি একসঙ্গে অঘটন ঘটাতে পারে সুলতা।

রত্নেশ্বর রায়ের তিনই ছিল।

শুধু রত্নেশ্বর রায় কেন গোটা বাংলাদেশে জমিদারদের দিকে তাকিয়ে দেখ, এই কালটা তাদের উজ্জ্বলতম জীবনাধ্যায়। মুঘল আমলের একেবারে মধ্যযুগীয় হালচাল বদলে গিয়ে নতুন হালচাল শুরু হয়েছে। যে হালচালের জন্য ইংরেজ সরকার একটু সচকিত হয়েছেন।

সাত-আট বছরের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস জন্ম নেবে এইসব বিত্তসম্পত্তিশালী এবং ইংরিজী লেখাপড়া জানা লোকেদের নেতৃত্বে। বিবেকানন্দের পদধ্বনি নেপথ্যে তখন বাজছে। সুতরাং ইংরেজের চিন্তিত না হয়ে উপায় ছিল না। তারা রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে যা করছে—করছে, তার সঙ্গে মিশন ইস্কুলগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। শুধু ঈশ্বরের পুত্র জেসাস ক্রাইস্টের অনুগামী ভক্ত তৈরী করছে না, কৃশ্চান ইংরেজ রাজ্যের খুঁটি তৈরী করবার কল্পনা করছে। রত্নেশ্বর রায় মেদিনীপুরের মেয়েদের মিশন ইস্কুলে ভায়লেটকে ভর্তি করবেন ভাবলেন। কিন্তু সেখানে ব্রাত্যদের, বিশেষ করে সাঁওতালদের ভিড় দেখে ওখান থেকে ফিরে এসে ভাব-ছিলেন কি করবেন ?

সেদিনের তাঁর ডায়রীতে আছে—"পিক্রুজকে লইয়া কৃশ্চান মিশন দেখিতে মেদিনীপুর শহরে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে দেখিলাম—যাহাদের কৃশ্চান করিয়া পাদরী সাহেবরা লেখাপড়া শিখাইতেছে তাহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল অথবা এদেশে যাহাদের আমরা চুয়ার বলিয়া থাকি তাহারাই। এখানে ভায়লেটকে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাহাতে মহা অপরাধ হইবে। সুতরাং বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম ইহাদের যে একটি খড়ো গির্জা উহারা খাড়া করিয়াছে, সেইটিকে মেরামতাদি করাইয়া একজন আমাদের দেশী কৃশ্চান পাদরীকে বেতন দিয়া লইয়া আসিব। সে পাদরীর কাজ করিবে এবং একটি পাঠশালাও করিয়া দিব। সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু পড়িবে। তাহার দ্বারাই ভায়লেটকে বিশেষ করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিব। এই পাদরী সাহেবকে দিয়া ভায়লেটকে adopted daughter করাইয়া জাতে উঠাইব।"

সব ব্যবস্থাই অত্যন্ত দ্রুত করে ফেলেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং প্রাথমিক ইস্কুলটির জন্যই তাঁর এতগুলি ইস্কুল—গোটা আষ্টেক মাইনর স্কুলে আংশিক সাহায্য, কীর্তিহাটে শ্যামনগরে দুটো এইচ ই ইস্কুল, কীর্তিহাটে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী করা সার্থক হ'ল। এই প্রাইমারী স্কুলটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেই বৎসরই তিনি হয়েছিলেন রায়বাহাদুর। সেটা ১৮৭৭ সাল। এবং সেই উপলক্ষেই রত্নেশ্বর রায়ের যুবরাজ দেবেশ্বর দেখলেন ভায়লেটকে।

দেবেশ্বরের বয়স তখন পনের বছর। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটে এসেছিলেন বাপের নির্দেশে। সঙ্গে এসেছিল গোপাল।

গোপাল ছিল দেবেশ্বরের সাথী অনুচর—মুখে বলতেন দাদা।

ঠাকুরদাস পাল তার দাদাঠাকুরকে ত্যাগ করেছিল। কমলাকান্ত রত্নেশ্বর হলেন, ঠাকুরদাস তাঁকে ছাড়ল। কিন্তু গোপাল দেবেশ্বরের সঙ্গে থাকল—তাতে আপত্তি করে নি। নিজেও দেবেশ্বরকে প্রাণের তুল্য ভালবাসত।

অনুষ্ঠানটা হয়েছিল সরস্বতী পূজোর সময়। সভায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়েছিল ভায়লেট। ডায়াসে বসেছিলেন সস্ত্রীক ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট। নিচে দুপাশে দুখানা চেয়ারে সিমেট্রি রেখে বসে ছিলেন পিতাপুত্র; একদিকে রত্নেশ্বর রায় অন্যদিকে দেবেশ্বর রায়। এবং তাঁদের সঙ্গে আরও অভ্যাগত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। তাদের সঙ্গে ছিলেন নবনিযুক্ত বৃদ্ধ বাঙালী পাদরী সাহেব।

গাঁদাফুলের মালা বোঝাই ঝুড়ি নিয়ে পিক্রস যাচ্ছিল ভায়লেটের সঙ্গে, ভায়লেট তার নির্দেশমত মালা পরিয়ে দিচ্ছিল অতিথিদের গলায়। সবশেষে পালা এল দেবেশ্বরের—শেষ মালাটি ভায়লেট পরিয়ে দিলে দেবেশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ্বর হলেন শরাহত।

*　　　*　　　*

দেবেশ্বর রায় জীবনে ডায়রী রাখেন নি। জীবনে সেদিনের যে বিবরণটুকুর কথা বললাম সেটুকু দেবেশ্বর রায়ের কোন কিছু থেকে পাই নি। পেয়েছি তাঁর পিতা স্বনামধন্য কীর্তিহাট-সিংহ রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। ভায়লেট যখন দেবেশ্বরের গলায় মালা পরায় তখন ভায়লেট নিজেই আড়াল ক'রে দেবেশ্বরকে ঢেকে রেখেছিল। এবং নিজে ভায়লেটও পিছন ফিরে ছিল রত্নেশ্বর রায়ের দিকে, নইলে নিশ্চয় তিনি দুজনের মুখ দেখে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারতেন। হয়তো সেইদিনই ভায়লেট দেবেশ্বর রায়ের নাগালের অনেক বাইরে চলে যেতো।

চোখেও দেখেন নি কিছু, কানেও দেবেশ্বর সম্পর্কে কোন নিন্দার কথা শোনেন নি। তিনি যে কঠোর নিষ্ঠায় নিজেকে সংযমের শাসনে শাসিত রেখেছিলেন তা অঞ্জনার বিবরণেই স্পষ্ট, এ ছাড়াও মধ্যে মধ্যে তাঁর ডায়রীতে যে সব অকারণ আত্মনির্যাতনের বিবরণ পাওয়া যায় তা পড়ে বিস্মিত হতে হয় এবং সে বিস্ময় একটা শেষে পরিণত হয় স্থূলতা, যখন জানতে পারি যে কোন নারীর প্রতি আকর্ষণকে নিঃশেষে মুছে ফেলবার জন্য নিজের অন্তরের কোমলতম অংশের এক টুকরো পর্দা ঝামা দিয়ে অথবা উখা দিয়ে ঘষে তুলে দিতেন। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এবং তার থেকে তিনি সম্পত্তি অর্জনের ব্যাপারে যে কত সুবিধা পেয়েছেন, তার হিসেবও রায়বাড়ীর জবানবন্দীর একটা বড় হিসেব। কিন্তু সে কথা থাক। দেবেশ্বর রায়ের কথা বলি।

দেবেশ্বর রায় ভায়লার দেওয়া মালা কণ্ঠে ধারণ করে শরাহত কুরঙ্গের মত লুটিয়ে পড়লেন। সভা থেকে ফিরে এসে শরীর ভাল নেই বলে শুলেন। ডাক্তার এসে দেখে গেল। বলে গেল সর্দি হয়েছে। বিশেষ কিছু না।

কিন্তু দেবেশ্বর রায়ের গোপালদা বুঝেছিল—তার রাজাভাইয়ের কি হয়েছে। গোপাল দেবেশ্বর থেকে মাস কয়েকের বড় কিন্তু এ সব বিষয়ে দেবেশ্বর থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। লেখাপড়ার পালাও সে তখন শেষ করেছে। প্রথমটা কীর্তিহাট এইচ ই স্কুলে দেবেশ্বর এবং সে দুজনেই পড়ত, অবশ্য দেবেশ্বর পড়ত উঁচু ক্লাসে; সে পড়ত নিচে।

তারপর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতেই ছেলেকে কলকাতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে রত্নেশ্বর রায় দেবেশ্বরকে কলকাতায় পাঠিয়ে গার্জেন টিউটারের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। গোপাল কীর্তিহাটে ফেল ক'রে ক'রে চলে গেল শ্যামনগর। মধ্যে মধ্যে পালিয়ে এসে উঠত কলকাতায় জানবাজারের বাড়ীতে তার রাঙাভাইয়ের প্রেমের টানে। কলকাতা দেখে বেড়াত। এ বিষয়ে ঠাকুরদাস খুব অসুখী ছিল না বা ছেলের উপর অসন্তুষ্ট ছিল না। তার যত কিছু ক্ষোভ অভিমান সব রত্নেশ্বর রায়ের উপর। দেবেশ্বর তার কাছে ছিল সোনার পুতুলের মত পরম প্রিয়। গোপালের চেয়েও সে বেশী ভালবাসত দেবেশ্বরকে।

দেবেশ্বর ছুটিতে কীর্তিহাট এলে সে এখানে একবার আসত। দেবেশ্বরকে দেখে সমাদর করে বাড়ী ফিরে যেত। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা ইচ্ছে করেই করত না। হয়ে গেলে খুব খাতির করে প্রণাম করে চলে যেত। দাদাঠাকুর আর বলত না সে। হুজুরও তার জিভে আসত না। সে বলত—প্রভু।

বলত—প্রভুর শরীর-মেজাজ ভাল আছে? এবং নগদ একটি টাকা সেলামী দিয়ে প্রণাম করত। রত্নেশ্বর রায় গম্ভীরভাবেই জবাব দিতেন। তিনি অবশ্য 'তুই' বলেই কথা বলতেন এবং কাছারীতে রোকা দিতেন—ঠাকুরদাস পালের বিদায়-খরচ। সেটায় প্রতিবারই কাপড়-চাদরের ব্যবস্থা থাকত। ঠাকুরদাস অমান্য করে ফিরিয়ে দিত না, নিত, কিন্তু সে কাপড়-চাদর নিয়ে সে কীর্তিহাটের সীমানা পার হত না; কাউকে না কাউকে বিলিয়ে দিয়ে যেত।

গোপালকে বলত—আমার সোনাবাবার কাছে আছিস, আমি খুশি আছি। এখানে তো কিছু হল না। তা সোনাবাবার কাছে কলকাতায় থেকে চোখোল-মুখোল হ; কিছু-মিছু কর। বুঝলি। এখানকার চাষবাস আছে, সে কুলকম্ম তো এখনও একা আমাকেই কুলোয় না, তার মধ্যে তুই আর মাথা গলিয়ে করবি কি! ওখানে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি, বুঝলি।

* * *

বিরোধ বা মান-অভিমান সত্ত্বেও দুই পিতা যেমন পুত্রদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন, পুত্রেরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবেসেছিল এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। গোপাল তখন তরিবৎ করে দেবুভাইকে সিদ্ধির সরবৎ থেকে আরম্ভ করে বছর-খানেক-দেড়েকের মধ্যেই হুইস্কীর গেলাস সোডা মিশিয়ে যথাসময়ে যোগাতে শুরু করেছে। তখন একটা হুইস্কী ছিল O. H. M. S. অন হিজ ম্যাজেস্টিক সার্ভিস। তার বোতল কিনে এনে গোপাল নিজের বাক্সে পুরে রাখত। সকালবেলা থেকে গার্জেন টিউটরের কাছে দেবেশ্বর একরকম ছিলেন, স্কুলে ছিলেন আর একরকম; গার্জেন টিউটারের কাছে যা, তার সঙ্গে একটুখানি আমীরী চাল যোগ হত। রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের ছবি আছে দেখেছ কিনা জানি না; জরির টুপী, আচকান, পায়জামা-পরা ছবি; সেটা তখন উঠি-উঠি করছে;

তার জায়গায় কোঁচানো কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবি চলিত হচ্ছে। সেই পোশাক পরে দেবেশ্বর রায় কম্পাসের বগিগাড়ী অর্থাৎ একঘোড়-টানা বগিগাড়ীতে স্কুলে যেতেন। বিকেল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আবার গার্জেন টিউটারের অধীনে দেবেশ্বর রায় শান্ত, বুদ্ধিমান, ধীর; স্কুলে ক্লাসের প্রথম দুজনের মধ্যে একজন। টিউটার ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করেন। দশটার পর দেবেশ্বরের ছুটি হয়। দেবেশ্বর কোন একটা রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বার্ণিশ করা চটি টানতে টানতে উপরে এসে ঘরে বসে ডাকেন—গোপালদা রে।

—কি রাজাভাই!

—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে গোপালদা।

—আমি ঢেলে রেখে বসে আছি সেই কখন থেকে। নাও, খাও। বলে সোডা মেশানো হুইস্কীর গ্লাস তাঁর হাতে তুলে দেয়। তৃষ্ণার্তের মত সেটা শেষ করে দেবেশ্বর বলেন—আর একটু দে না গোপালদা।

—আরও খাবে? জানাজানি হলে তোমারও বিপদ আমারও বিপদ।

—তা ঠিক। কিন্তু আর একটুখানি। একটু। এই এতটুকু।

এই গোপালদা এবং এই তার রাজাভাই দেবেশ্বর রায়। ছিপছিপে পাতলা, লম্বায় তখনই প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, সোনার বর্ণ রঙ, তার উপর নীলাভ শিরাগুলো যেন এই সৌন্দর্যের একটা বিচিত্র ইতিবৃত্ত লিখে রেখেছে—হাতের তালু, পায়ের তলা গাঢ় গোলাপী। সে নাকি দেখলেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। ঠাকুরদাস পাল ছেলেবেলায় তাঁকে দুই হাতে তুলে ধরে দোলাতো আর বলত—"ও আমার নদের ছবি, যে দেখবি সে পাগল হবি।"

সুলতা, আমার মেজদাদু আমাকে প্রথম দেখে বলেছিলেন, তাই তো ভাই, আমায় যে তুমি ধাঁধা ধরালে হে। আমার দাদা তোমার পিতামহ রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, বাংলাদেশে এমন রূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছাড়া দেখি নি। দাদা আমার তাদের কাছেও ম্লান ছিলেন না।

সেই তরুণ কিশোর দেবেশ্বর রায় ভায়লাকে দেখে শরাহত হল। ভায়লার বয়স তখন তের পার হয়ে চৌদ্দয় পড়েছে। চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালা!

সভা থেকে ফিরে এসে সে শরীর খারাপ বলে শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার দেখে বলে গেল—সীজন চেঞ্জের সময় সর্দি লেগেছে। ও কিছু না।

দেবেশ্বর চুপ করে শুয়েছিলেন, তাঁর বাসনা তখন উদ্দাম হয়ে ছুটেছে। লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মত। ভায়লা—ভায়লা—ভায়লা। তার গালের গোলাপী রঙ, কালো চোখ, কোঁকড়ানো কালো চুল কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না।

এক সময় গোপাল এসে ঘরে ঢুকল। দেবেশ্বরের শিয়রের কাছে বসেছিলেন তার মা। গোপাল তাঁকে বললে—আপনি জ্যাঠাইমা এখন যান, আমি বরং রাজাভাইয়ের কাছে বসি।

সরস্বতীঠাকরুণ প্রায় সন্ধ্যে থেকেই বসে আছেন। তিনি বললেন—তাই বস রে তুই। একটু বরং গল্পটল্প কর। তাতে হয়ত ভাল থাকবে। দেবু, আমি যাই, ওঁর খাওয়া-টাওয়াগুলো একবার দেখি।

দেবেশ্বরও তাই যেন খুঁজছিলেন। এ-কথা তিনি বলবেন কাকে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে এক গোপালদা ছাড়া তো কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন—তাই যাও।

সরস্বতী বউরাণী চলে যেতেই গোপাল দরজায় পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে কাছে এসে খাটের বিছানার উপর কনুইদুটো রেখে ঝুঁকে পড়ে বললে—সায়েবদের জন্যে আনা এক বোতল স্যাম্পেন বাগিয়েছি রাজাভাই। কিন্তু কি হল বল তো?

বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন দেবেশ্বর। গোপাল ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন করেছিল—ওই ভায়লা?

দুই হাতে গোপালের গলা জড়িয়ে ধরে দেবেশ্বর বলেছিলে—ওকে নইলে আমি বাঁচব না গোপালদা। আমি মরে যাব।

গোপালদার পক্ষে কাজটা দুরূহ হয় নি। সেকালটায় অবশ্য ধনীর পক্ষে মুগ্ধা দরিদ্র-কন্যাকে আয়ত্ত করা কোন বড় অপমানের মধ্যেই গণ্য ছিল না, তবে বর্ণভেদে অর্থাৎ জাতের উঁচু-নীচু ভেদে একটু-আধটু তফাৎ হত। নিশ্চয়ই হত। কিন্তু এছাড়াও আর একটা চিরন্তন ধারা আছে প্রেমের পথে—সেটা হল সনাতন ধারা; যে-ধারায় রাজকন্যার জন্যে রাখাল-ছেলে পাগল হয়, আবার রাজপুত্রকে দেখে ভিক্ষুকের কন্যা লালায়িত হয়ে ওঠে। রাখাল-ছেলে রাজার মেয়েকে বড় পায় না সুলতা, তবে রাজার ছেলে কৌতুকবশে ভিক্ষুক-কন্যাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। আবার প্রেমেও পড়ে। সে রাজকন্যেও পড়ে, ভিখারীর মেয়েও পড়ে।

ভায়লাও প্রেমে পড়েছিল এবং সে-প্রেমও দর্শনমাত্র প্রেম। সুতরাং কাজটা দুরূহ হয় নি গোপালের পক্ষে। তবে গোপালই এটাকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, নইলে সে-সাহস বা সে-বুদ্ধি দেবেশ্বর রায়ের ছিল না। তখনও ততখানি শক্ত হয়ে উঠতে পারেন নি।

সেটা সহজ এবং সরস করে দিয়েছিল গোপালদা।

সুলতা, পল্লীগ্রাম সরল বটে। অচতুরও বটে। শহরের মত জটিল নয় এ-কথা নিশ্চয়, কিন্তু জীবনের বৃন্দাবনে জটিলা-কুটিলা-বৃন্দা সেখানেও আছে। আজও আছে। সেকালে আরও অনেক বেশী ছিল। যে-আমলের কথা বলছি, সে-আমলে ধনী জমিদারদের এবং উচ্চবর্ণের এসব ক্ষেত্রে অন্যায় করবার একটা বে-আইনী আইন থানার দারোগাদের ঘুষ নেওয়ার মত জানাশোনা ভাবেই চলত ছিল। এতে মনে কেউ কিছু করত না। হয়তো ঘৃণা একটু করত, ঠাট্টা একটু-আধটু করত, বেশী হলে একটা সামাজিক আন্দোলন হত, তাতে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ব্রাহ্মণকে দিলেই মাপ হয়ে যেত। এবং গ্রামের যারা দুষ্ট দুর্দান্ত প্রকৃতির

তাদের হয়তো কিঞ্চিৎ দিতে হত! এটা অবশ্য উচ্চবর্ণের সাধারণজনের পক্ষে। কিন্তু জমিদার বা ধনশক্তির অধিশ্বরের মাপ্ত আলাদা। তাঁর লোকের সঙ্গে বা তাঁর বাড়ীর মুখে কোন রমণী যদি গভীর রাত্রে পথ ধরত, তবে এই দুষ্টেরা সসম্ভ্রমে সরে যেত।

কীর্তিহাটে এটি কিন্তু ছিল না, রত্নেশ্বর রায়ের কঠিন শাসনে। তাঁর হুকুম ছিল চৌকিদার এবং নিজের বাড়ীর বরকন্দাজদের উপর এবং সাধারণ লোকের উপরও বটে যে, যদি এমন ঘটনার কোন সন্ধান কেউ পায় বা সন্দেহ করে, তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানায়। গ্রামের কয়েকটা ব্রাত্য স্বৈরিণী যুবতী যারা এই ধরনের পেশা এবং নেশায় একটু বেশী প্রমত্তা হয়েছে, তাদের তিনি অর্থব্যয় করে নবদ্বীপ পাঠিয়ে দিয়ে গ্রামকে পাপমুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরই গ্রামে, তাঁরই কিশোর কন্দর্পের মত দেবেশ্বর রায়ের সঙ্গে ভায়লেটের মিলনের ব্যবস্থা অনায়াসে করে ফেললে গোপাল। এতটুকু বেগ পেতে হল না। বিচিত্রভাবে সে সমস্ত সমস্যার সরল সহজ ব্যবধান করে দিলে।

খানিকটা ঘুরেফিরে এসে বললে—রাজাদাদা, বেশ একখানা ভাল করে প্রেমপত্র লিখে দাও। তা নইলে সে ভয় খাচ্ছে। আমি বলে পাঠিয়েছিলাম, মেয়েটা শুনে কেঁদেছে। কিন্তু তারপরই বলেছে, উঁহু, উ যদি মিছে করে বলে, বাবুর নাম করে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে—। বুঝেছ? তুমি রাজাদাদা, একখানা চিঠি লেখ। বেশ ভাল করে চিঠি লেখ। আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি। ভায়লা, তোমাকে নইলে আমার দুনিয়া অন্ধকার, আমার বুক হু-হু করছে। এইসব আর কি! তুমি তো লেখাপড়া জান ভাল, আমার মত তো নও। বাগিয়ে লেখ। বুঝেছ! তার আগে দাঁড়াও বোতলটা খুলি, খানিকটা স্যাম্পেন খেয়ে নাও। বুঝেছ। ব্রেন একবারে খুলে যাবে।

সুলতা তার মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে-দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং খানিকটা রুক্ষও বটে। সুদীর্ঘ রায়বংশের জবানবন্দী সে শুনছে দু'দিন ধরে, নির্বিকার ভাবেই শুনে আসছে। কখনও একটু হেসেছে, কখনও দৃষ্টিটা উদাস হয়েছে; কখনও মুখের রেখায় ক্রোধ ফুটে উঠেছে—কপালে কুঞ্চনরেখা জেগেছে এই পর্যন্ত। এই প্রথম তার দৃষ্টি বক্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তার থেকে খানিকটা ক্রোধের উত্তাপও অনুভব করা যায়।

সুরেশ্বর সেদিকে লক্ষ্য করে নি। সে বলেই চলেছিল সামনের দেওয়ালের ছবি-গুলোর দিকে চোখ রেখে। যে ছবিখানার দিকে সে তাকিয়েছিল, সেখানা বন্দুক হাতে দেবেশ্বর রায়ের ছবি। কিন্তু চারিদিকে প্যানেল করে অনেকগুলো ছোট ছোট ছবি আঁকা আছে। একটাতে একটা কুঞ্জের মত মনোরম পরিবেশের মধ্যে ভায়লেট এবং দেবেশ্বর পরস্পরে হাত ধরে মুগ্ধ ও মুগ্ধার মত তাকিয়ে আছেন। তারপর সুসজ্জিত ঘরে সোফার উপর দেবেশ্বরের কোলে মাথা রেখে ভায়লেট শুয়ে আছে এবং মুগ্ধার মত তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটাতে দেবেশ্বর একমনে চিঠি লিখছেন। কিন্তু প্রত্যেক ছবিতেই

গোপাল পাল উঁকি মারছে।

সুলতা সুরেশ্বরকে বাধা দিয়ে বলে উঠল—তুমি থাম সুরেশ্বর।

তার কণ্ঠস্বর শুনে এবার চমকে উঠল সুরেশ্বর, চকিত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে সে সুলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নের সুরেই বললে—কি হল সুলতা ?

গম্ভীরভাবেই সুলতা বললে—তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, গোপাল ঘোষ আমার ঠাকুরদার কাকা, তাঁর সম্পর্কে যেভাবে উক্তি করছ, তাতে আমি ঠিক স্বস্তিবোধ করছি না। সেকাল হলে সহ্য হয়তো করতে হত, কিন্তু কাল অনেকটা বদলেছে। কি বলছ এসব তুমি ?

কিছুক্ষণ সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লাগল, সুলতা। কথাটা আমার মনে ছিল—ভুলে আমি যাই নি। এবং তাঁর সম্পর্কে বানিয়েও কিছু বলি নি আমি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আমি চিঠিপত্রের মধ্য থেকে সংগ্রহ করেছি।

—চিঠিপত্র ? এসব বৃত্তান্ত কে কাকে চিঠিতে লিখেছেন বা লিখতে পারেন সুরেশ্বর ?

—তিনি দেবেশ্বর রায়, সুলতা।

—কাকে লিখেছিলেন তিনি এসব কথা ?

—তাঁর পিতৃদেব, যিনি সাধারণের কাছে সিংহ ছিলেন, তাঁকেই লিখেছিলেন।

—তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন তিনি এইসব কথা ?

—হ্যাঁ, সব কথা। তবে অবশ্যই লেখার ভঙ্গিটা একটু স্বতন্ত্র ছিল।

—এ আর কতটা স্বতন্ত্র হতে পারে, সুরেশ্বর ?

—অনেক অনেক! সত্যকে যখন নির্ভয়ে কেউ প্রকাশ করে, তখন সেই সত্যই তাকে প্রকাশের ভাষা যুগিয়ে দেয়। এসব চিঠিপত্রের কতক ছিল অন্নপূর্ণা-মার কাছে যা তাঁকে লেখা, এবং কিছু ছিল বিমলাকান্তের কাছে, যা রত্নেশ্বর রায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে এবং কতক পেয়েছি এই অতিসঞ্চয়ী আশ্চর্যশৃঙ্খলা এবং সত্যবাদী রত্নেশ্বর রায়ের দপ্তর থেকে। তুমি পড়ে দেখতে পার। তবে যে-ক্ষেত্রে কথাটা তোমার গায়ে বা মনে আঘাত দিয়েছে, সে-ক্ষেত্রে বলার ভঙ্গীর দোষ আমারই হয়েছে। দেবেশ্বর রায় যা লিখেছিলেন, সেইখানটাই তোমাকে আগে শোনাই। তিনি লিখেছেন—"সেই সভাস্থলে ভায়লেট যখন আমার গলদেশে মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার গালদুটিতে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় আনত হইল, আমার বক্ষাভ্যন্তরে যেন মৃদঙ্গধ্বনির মত ধ্বনি উঠিতেছিল, আমি কম্পিত হইতেছিলাম, সেও কম্পিত হইতেছিল। এবং তখন হইতেই মনে হইল এই ভায়লেটই আমার জন্মজন্মান্তরের স্ত্রী বা প্রিয়তমা ; তাহাকে নহিলে আমি বাঁচিব না। তাই বাড়ী আসিয়া উদ্বিগ্ন-উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে অসুস্থের মত শয়ন করিয়া রহিলাম। কোন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। রায়বংশের উত্তরাধিকারিত্ব নহে, গোটা সংসারের আর কোন জন আমার কেহ নহে। শুধু ওই ভায়লেট। তাহার জন্ম আমি সবই ত্যাগ করিতে পারি। ডাক্তার আমার শিয়রে

গোপালদাকে বসাইয়া আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে গেলেন। গোপালদা এক বোতল স্যাম্পেন চুরি করিয়া সরাইয়াছিল সাহেবদের জন্য আনীত সামগ্রী হইতে; সে আমাকে তাহাই খাওয়াইল। অন্য আর কোন কথাই গোপন করিব না, আমি বৎসরখানেক অবধি মদ্যপান করিতেছি। গোপালদা কখনওই কোন অন্যায় আমাকে শিক্ষা দেয় নাই। আমি প্রলুব্ধ হইয়া যে অন্যায় করিতে চাহিয়াছি, তাহাতে সে আমাকে আনন্দিত এবং খুশি করিতে প্রাণপণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে।

ভায়লেটের ক্ষেত্রেও তাই হইল, আমি স্যাম্পেন পান করিয়া সকল সংকোচ এবং সকল লজ্জা-সংযম অতিক্রম করিয়া বলিলাম—গোপালদা, আমি ওই ভায়লেটকে ভালবাসিয়াছি। উহার জন্য আমার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে; আমার জীবন মিথ্যা মনে হইতেছে। উহাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না। আমি আত্মহত্যা করিব।

গোপালদা আমার জন্য সব করিতে পারে, প্রাণটাও দিতে পারে বলিয়া জানিতাম। সে তৎক্ষণাৎ বলিল—তাহার জন্য চিন্তা তুমি করিও না, আমি ইহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতেছি।

পরদিন সকাল হইতে সে বাহির হইল। এবং বেলা দ্বিপ্রহর সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"রাজাদাদা, তোমার পছন্দ আছে, তোমার চক্ষু আছে, তুমি সত্য সত্যই দেবেশ্বর। সে-কন্যাটি অপর গোয়ান-কন্যার মত নহে। এবং সে সত্য সত্যই তোমাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। আমি একজন দূতীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। অর্থের কথায় অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়াছে। সে অর্থ চায় না। সে নিজেকে বিক্রয় করিবে না। একমাত্র ভালবাসার জন্য নিজেকে সমর্পণ করিবে। কিন্তু সন্দেহ করিতেছে যে, তোমার নাম করিয়া দূতী তাহাকে লইয়া গিয়া অন্য কাহাকেও সমর্পণ করিবে। অথবা তুমি তাহাকে উপভোগের কারণে লইয়া গিয়া কয়েকদিনের পর উচ্ছিষ্টের মত পরিত্যাগ করিবে। তাহা ছাড়া তুমি রাজা, তুমি ব্রাহ্মণ, সে কৃশ্চান গোয়ান, সে দরিদ্র ইত্যাদি। অতএব তুমি তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দাও। খুব ভাল করিয়া লেখ। লেখ, তুমি তাহাকে ভালবাস। তুমি তাহাকে জীবনে পরিত্যাগ করিবে না। দেখ জমিদার, ধনীর ছেলেদের কত রক্ষিতা ইত্যাদি থাকে; তোমার ঠাকুরদাদার সোফিয়া বাঈয়ের গল্প তো এখানকার সকল লোকে করে। তাহার কথা শুনিয়া ভায়লেটকে আমি আরও ভালবাসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের কথা মনে পড়িল। পত্র লিখিতে বসিয়া কয়েকখানা পত্রই ছিঁড়িলাম। মনোমত হইল না। গোপালদা সেই দ্বিপ্রহরেই আমাকে খানিকটা স্যাম্পেন খাওয়াইয়া বলিল—ঘরে বসিয়া লেখ। আমি বাহিরে পাহারা দিতেছি। কেহ আসিলে ঘরে ঢুকিতে দিব না। এই কর্তা বা গিন্নী-মা আসিলে তোমাকে শব্দ করিয়া ইসারা দিব, তুমি তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুইয়া পড়িবে, যেন ঘুমাইয়া গিয়াছ। আমি বলিব দেবু-ভাইয়ের মস্তক ধরিয়াছে।"

সুলতার মুখ প্রসন্ন হয়নি। সে অপ্রসন্ন মুখেই সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। সুরেশ্বর

বললে—দেখ সুলতা, দেবেশ্বর এবং গোপাল ঘোষের সম্পর্কটা ছিল তাদের নিজস্ব সম্পর্ক এবং তাদের যে কাল সেই অনুযায়ী। আমরা তাদের উত্তরাধিকারী, আমাদের সম্পর্ক আমাদের মত। এখানে আমি জমিদারের ছেলে, একজন ইংরেজ সমর্থনকারী ইংরিজী কাগজের এডিটোরিয়েল স্টাফের অন্তর্ভুক্ত পাকা জার্নালিস্টের ছেলে—একসময় আমি বিদায় সত্যাগ্রহ বলে স্টেটস-ম্যানের চিঠির কলমে চিঠি লিখেছিলাম; আমার থেকে আজ তোমার মান বেশী, তুমি এম-এ পাশ, কলেজের প্রফেসর, পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বর, তোমাদের পার্টি যদি আগামী ইলেকশনে জেতে, তবে তুমি হয়তো একজন মিনিস্টারও হবে। তখন তুমি যা-হয় করো। কিন্তু এখন আমার জবানবন্দীর এইখানের এইটুকুতে মুখভার করো না। গোপাল পাল, ঘোষ আমি বলছি নে সুলতা, ইচ্ছে করেই না; যা করেছিলেন আমার ঠাকুরদাদার জন্যে, তা অন্য কেউ করেনি বা করে না। সেই জাতের কড়াকড়ির কালে নিজের জাত আর এই দুর্ধর্ষ গোয়ানদের হাতে তার জীবন, সব তিনি বিপন্ন করেছিলেন দেবেশ্বর রায়ের জন্য। সে দেবেশ্বরও গোপন করেননি, আমিও করছিনে। অন্যায় কিছু বললে গায়ে তোমার লাগতে অবশ্যই পারে কিন্তু অন্যায় বাড়াবাড়ি করে লাভ কি? শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা নাটকে এক জায়গায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা ওয়াটসকে বলছেন—তোমার যা চরিত্র, তাতে তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার ওপর চড়িয়ে গোটা শহর ঘুরিয়ে বের করে দেওয়া উচিত দেশ থেকে। দেখ, নবাবীকালের অভিনয় হচ্ছে বলে এটা ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজও সহ্য করেছে। স্বাধীনতার পর অবশ্যই আমরা সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান—ভারতও জেগেছে, কিন্তু জেগেছে বলে এমন অসহিষ্ণু হয়ো না। আমি তোমাকে বলছি, হলপ করেই বলছি, যা বলব তাতে দেবেশ্বর রায় থেকে গোপাল পাল এবং তাঁর বাপ ঠাকুরদাস পালই বড় হয়ে গেছেন রায়বাবুদের চেয়ে। শুধু চুপ করে শোন।

* * *

দেবেশ্বর রায় পত্র লিখে দিয়েছিলেন গোপালদার হাতে। এবং পরের দিন দিনের বেলা বলেছিলেন—চল আমার সঙ্গে। বন্দুক নাও। শিকার করতে যাচ্ছ। বুঝেছ? ভায়লা আসবে ওই সিদ্ধেশ্বরীতলায় জঙ্গলে। ওখানে তো গোয়ানটোয়ানরা কেউ আসে না। বারণ আছে। ওখানে একটা ভাঙা পড়ো বাড়ীর মত আছে, কে একজন তান্ত্রিক থাকত একজন যোগিনী নিয়ে। সেই বাড়ীটা আমি পরিষ্কারঝরিষ্কার করিয়ে রেখেছি ভায়লাকে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কবচ বলে একটা কবচ পাঠিয়ে দিয়েছি, বলেছি, এই কবচ পরলে কোন ভয় নাই। সে নিয়েছে কবচ, ঠিক আসবে।

সুরেশ্বর হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর ঘাড় নেড়ে হয় আক্ষেপ বা ব্যঙ্গ করে বললে—এ সেই শ্যামাকান্তের ভাঙা ঘর। যে ঘরে 'মনোহরা' যোগিনী বলে ব্রাত্য মেয়েটাকে নিয়ে সে বামাচারী সাধনা বা সাধনার নামে কদাচার ব্যভিচার যা বল তাই করেছিল। এঘরে লোকজন

ঢুকত না। প্রথম ছিল একটা ছিটেবেড়ার ঘর, তারপর শ্যামাকান্তের পর সোমেশ্বর রায় কিছুদিন ওই মনোহরা মেয়েটাকে নিয়ে ওখানে যেতেন। তখন কাদা দিয়ে পাকা ইট গেঁথে একখানা ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। এবং সাধনার শিমুল গাছটির তলাটাও সুন্দর ক'রে দিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় ঘরখানাকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করেও পারেন নি। সোমেশ্বর রায়ের যে দলিল তাতে এই ঘর এবং সিদ্ধেশ্বরীতলা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল। ভবানীর পরিচয় এবং শ্যামাকান্তের জীবনের বিচিত্র কথা জানার পর বীরেশ্বর রায় ওই শিমুলতলা এবং ওই ঘরখানাকে মেরামত করিয়ে শ্যামাকান্তের মৃত্যু দিনে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেও তিনি দলিলভুক্ত করে তার জন্য আর্থিক সংস্থান ক'রে দিয়ে গেছেন। সে সংস্থান আজও বজায় আছে। কিন্তু কোন অনুষ্ঠান আজ আর হয় না। তার জন্য রায়বংশের কেউই চিন্তিত নয়। সিদ্ধেশ্বরীতলার সিদ্ধাসনের কোন গৌরব কোন পবিত্রতাই ছিল না। আমি সেখানে একটা কিছু করে এসেছি। সে যথাসময়ে বলব, সুলতা। এখন সেদিনের কথা শোন। সেই দিন সেই ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখিয়েছিলেন গোপাল পাল। সেই ঘরে তাঁর প্রাণের প্রিয় দেবুভাইয়ের প্রথম বাসরশয্যা হবে।

রত্নেশ্বর রায় সিদ্ধেশ্বরীতলার একটি সংস্কার করেছিলেন। তিনি একটা গণ্ডী এঁকে দিয়েছিলেন চারিদিকে, মধ্যে মধ্যে এক একটা পিলপে গেঁথে দিয়ে বলে দিয়েছিলেন এর ভেতরে যেন কোন গোয়ান বা কোন ব্রাত্য প্রবেশ না ক'রে। এর বাইরে একটা জায়গা ছিল সেটা রত্নেশ্বর রায়ই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে গোয়ানরা বা ব্রাত্যরা ইচ্ছে হলে পুজো বা মানত মানসিকের অর্ঘ্য দিতে পারে।

এই গণ্ডীর মধ্যে ভায়লেটকে আসতে রাজী করা সহজ কথা ছিল না। তার ব্যবস্থা সুকৌশলেই বল আর আপন বিশ্বাসমতই বল—করেছিলেন দেবেশ্বরের গোপালদা। প্রথম পাঠিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর কবচ। তাই গলায় ঝুলিয়ে প্রেমমুগ্ধা কিশোরী ভায়লেট—সে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই গণ্ডীর প্রান্তে। দেবেশ্বর অপরাহ্ণের আগে থেকেই বন্দুক হাতে করে ওই সিদ্ধেশ্বরীতলার জঙ্গলের প্রান্তে প্রান্তে শিকারের ছল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তারপর এক সময় ক্লান্তি অপনোদনের ছলে জুতো খুলে সিদ্ধেশ্বরীতলার গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে বসে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে জীবনের প্রথম প্রিয়া বা নারী যাই বল তার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। সূর্য তখন পাটে বসেছে, লগ্ন বলতে গোধূলি লগ্ন, সেই লগ্নে কম্পিত পদক্ষেপে অভিসারিকা ভায়লেট এসে দাঁড়িয়েছিল ওই সীমার প্রান্তভাগে।

দেবেশ্বরও কম্পিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরেছিলেন। দেবেশ্বর রায়ের গোপালদা দিয়েছিলেন নববিধান। দু'গাছা ফুলের মালা—ওই গাঁদাফুলেরই মালা গেঁথে এনেছিলেন এবং বলেছিলেন— নাও মালাবদল ক'রে বিয়ে ক'রে নাও। আর এই সিদ্ধেশ্বরী

মায়ের সিঁদুর ওর সিঁথিতে ছুঁইয়ে দাও। আর ভায়লেটকে বলেছিলেন—তুমি মনে মনে বল—বিয়ে ক'রে আমি হিন্দু হলাম—বল!

বিচিত্র ভাগ্যের বিধান নয়, সুলতা? অন্ততঃ আমার কাছে তাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শ্যামাকান্তের কর্মফলের চক্রান্ত ওই সিদ্ধগণের পাশে ওই বিকৃত আচারে ধর্মের নাম ক'রে ব্যভিচারের জন্য সোমেশ্বর রায়ের তৈরী করা ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারসন্তান এবং কৃশ্চান মেয়ে ভায়লা ওইভাবে ধর্মের নাম ক'রেই সমাজ লোকাচার ধর্ম সব কিছুকে লঙ্ঘন করে প্রথম মিলিত হয়েছিল!

—না-না-না। বাধা এখন দিয়ো না। তুমি যা বলবে তা আমি জানি এবং তা আমি মানি। তোমার থেকেও হয়তো আরও বেশী উদার আমি, সুলতা। তোমরা রাজনৈতিক কর্মী, সংসারে লোকেদের সামনে নিজেকে তোমাদের শুদ্ধ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন চরিত্রবান মানুষ বলে প্রমাণিত করতে হয়। আমি মানি লোকাচার সমাজ ধর্ম এসব থেকেও হৃদয়ের অকৃত্রিম আকর্ষণ মিলনের আকৃতি অনেক বড়। অনেক বড়। রামী চণ্ডীদাসের মত ভাঙতে পারলে তা স্বর্গীয় হয়। ভাঙেও অনেকে। ভেঙে হয়তো সমাজে থেকে নির্বাসিত হয়ে লোকের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে পথের পাশে প'ড়ে মরে। অনেক সময় পুরুষ অত্যাচার সইতে না পেরে একদিন নারীটিকে পথে ফেলে দিয়ে দাঁতে কুটো ক'রে ফিরে আসে ঘরে। সমাজ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে ফিরিয়ে নেয় কিন্তু মেয়েটাকে চলে যেতে হয় হারিয়ে, কোথায় কেউ খোঁজ রাখে না। হয়তো দেহটাকে সম্বল ক'রে পথে নেমে যতদিন দেহটা থাকে ততদিন কোন রকমে খায় দায়, মদ খেয়ে পাগলের মত হাসে দেহব্যবসায়িনীর জীবনযাপন ক'রে। তারপর একদিন মরে এবং সেদিন তারই মত জনকয়েক ভাগ্যহতা হতভাগিনী হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায় শ্মশানে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আসে। মুসলমান বা কৃশ্চান হলে কবরে যায়। তবে মুসলমান এবং কৃশ্চান ধর্মের এখানে নারীর পক্ষে একটা উদারতা আছে, যে উদারতাকে আমি শ্রদ্ধা করি প্রশংসা করি, তার কাছে মাথা নোয়াই। মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যই নীতি তৈরী করেছে ধর্ম, আত্মাকে ধ্বংস করবার জন্য, মানুষকে হত্যা করবার জন্য নীতি তৈরী হয় নি। এমন নীতি দুর্নীতি, চণ্ডনীতি জীবনে ধ্বংসনীতি।

* * *

—এক গ্লাস জল!

—তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ সুরেশ্বর। বলে সুলতা ডাকলে—রঘু—রঘু! তোমার বাবুর জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে এস।

সুরেশ্বর তার মাথার লম্বা চুলগুলো পিছন দিকে ঠেলে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—তা হয়েছি সুলতা। তুমি আঘাত দিয়েছ আমাকে। হয়তো তুমি বলবে—আঘাত তুমিই

আমাকে আগে দিয়েছ, তা হলে বলব—না-না-না। তা দিই নি। নিজে ইচ্ছে করে তুমি নিজের মনে নিজে আঘাত করে আমার নামে অপবাদ দিচ্ছ।

জল নিয়ে এসে যে দাঁড়াল সে রঘু নয়, সে অর্চনা।

—অর্চনা! তুই এখনও জেগে রয়েছিস?

—রয়েছি। পাশের ঘরেই ছিলাম। ওই কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীটা পড়ছিলাম। আর তোমাদের কথাও শুনছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছিলাম, শত দুঃখকষ্ট নানান অভাব নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও ভাঙা বাড়ীতে বাস করত রায়েরা, বাঙলাদেশের জমিদারেরা—তারা কি সবাই তোমার মত এমনি করে পাগল হয়ে গেল? না ফাঁসির আসামীর মত রাত্রি জেগে সেলের মধ্যে বসে আছে!

গ্লাসের জলটা নিঃশেষে পান ক'রে সুরেশ্বর বললে—কে কি করছে তা জানিনে, তবে এইটুকু বলতে পারি যে অধিকাংশ জমিদারই তো আজ দেউলে এবং আজ তারা সবাই প্রায় এ অচলায়তন ভেঙে বেরুতে চায়। অনেক আগেই অনেকজনে এ থেকে বেরিয়ে এসে জীবন-সমুদ্রে নতুন স্টীমলঞ্চ ভাসিয়ে জমিদারী বজরাটাকে গাধাবোটের মত পিছনে বেঁধে দিয়েছেন। আজ যদি শান্তির ব্যাঘাত ঘটে থাকে তবে এঁদেরই ঘরে। নইলে পাড়াগাঁয়ের ছোটখাটো অসংখ্য জমিদার নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাচ্ছে। তারা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে মুক্ত আলো হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাঁচবে। কিন্তু সে সব কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। তুই কি এখানে বসবি অর্চি, না—

—বসলে আপত্তি কি অসুবিধে হবে না তোমাদের?

—আমার হবে না। আমার যখন হবে না তখন সুলতারও হবে না। কারণ বাধবার কথা সংকোচ হবার কথা যে বলে যে কনফেসার তার। যে শোনে তার নয়।

তারপর সে সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—সুলতা?

হেসে সুলতা বললে—আমি অনেকক্ষণ আগেই অর্চনাকে বলেছিলাম—আপনিও এসে বসুন না! প্রথম রান্না করতে গেলেন। তারপর—

চুপ ক'রে গেল সুলতা; মনে পড়ে গেল খেতে বসে কথাপ্রসঙ্গে যে অপ্রিয় কথা উঠে খাওয়ার আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল সেই কথাটা।

আবার শুরু করলে সুরেশ্বর, বললে—রায়বংশের অপরাধ আমি খুঁজে খুঁজে জমা করে পাহাড় করেছি। তার মধ্যে জমিদার হিসেবে নালিশ মকদ্দমা সত্য মিথ্যা অনেক ক'রেছি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর অঙ্ক কষে প্রজাকে ঘায়েল করতেন। জোতদার যখন বড় হয়ে উঠেছে সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তখন তাকে ডেকে সমাদর ক'রেছেন, প্রয়োজনমত আরও বড় এবং সম্পন্নতর হবার জন্য ঋণ দিয়েছেন। খাজনা বাকী ফেলেছেন এবং পরে সব জমে যখন পাহাড় হয়েছে তখন নালিশ ক'রে তার বুকে পাহাড় চাপিয়ে তাকে শেষ করে দিয়েছেন। আবার

উল্টোও হয়েছে, যারা ঋণ নেয় নি তাদের কোথায় কার কাছে ঋণ আছে খোঁজ ক'রে হ্যাণ্ডনোট তমসুদ কিনে নালিশ করেছেন। জিতেছেন সর্বত্র তা নয়; বহু ক্ষেত্রেই হেরেছেন। কিন্তু হেরেও তো তিনি হারতেন না, মুনসেফ কোর্টে হেরে সবজজ কোর্ট জজ কোর্ট সেখান থেকে হাইকোর্টে আপীল করতে করতে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে পিছনে প্রজাকে হাঁটতে হয় বাধ্য হয়ে। ক্লান্ত পদক্ষেপে নিঃস্ব এবং রিক্ত অবস্থায় হয়তো হাইকোর্ট থেকেও জয়ধ্বজা বয়ে বাড়ী আসতে আসতে ভেঙে পড়ে গেছে। এমন অনেক অনেক আছে। এদের দেনা শোধ করা আজ আর রায়বংশের কারুর পক্ষে সম্ভবপর নয়। সর্বস্বান্ত হয়েও নয়।

কিন্তু রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর থেকে দেবেশ্বর রায় পর্যন্ত সারাজীবন অবনত মস্তকে ঠাকুরদাস পাল আর গোপালদাস পালের ঋণ ভালবাসা স্বীকার ক'রে গেছেন। আমি তাও জানি এবং তোমার সঙ্গে গোপালদাস ঘোষের সম্পর্কও জানি, সে মনে রেখেই আমার মন্তব্য করে রেখেছি। আজ যদি গোপালদাস ঘোষ এসে আবির্ভূত হন এখানে তবে তোমার কথার প্রতিবাদ করেই বলবেন—তুই জানিস নে সুলতা, দেবু রাজাভাই আমার কি ছিল আর আমি তার কি ছিলাম, সে আমার জন্যে কি ক'রেছে তা তুই জানিস নে। আর দেবু রাজাভাই যে কি মানুষ ছিল তাও তুই জানিস নে। তুই চুপ কর।

সুলতা হেসে বললে—বেশ, তাই মেনে নিলাম। বল তোমার কথা।

—হ্যা দেবেশ্বর রায়, ষোল বছরের দেবেশ্বর রায় বিচিত্রভাবে এই শ্যামাকান্তের সিদ্ধাসনে সিদ্ধেশ্বরীতলায় যেখানে তিনি তাঁর জীবনের অভিশপ্ত নারীসাধনা আরম্ভ করেছিলেন, সেই-খানেই পাতলেন জীবনের প্রথম বাসর। মিলিত হলেন প্রথম এক কৃশ্চান কুমারীর সঙ্গে। কৃশ্চান কুমারী অঞ্জনার কন্যা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর অঞ্জনার প্রতি তাঁর গোপন প্রেমের ঋণশোধের অভিপ্রায়ে ক'দিন আগে চার্চের সংস্কার করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে শিক্ষিত করে তুলবেন বলে! একটি কুমার এবং কুমারীর সে বাসরসন্ধ্যার কথা উহ্য থাক। তা কল্পনা করবারও আমার অধিকার নেই। দেবেশ্বর রায় যে পত্রে এসব কথা নির্ভয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর বাঘের মত বাপকে খুলে লিখেছেন তাতে শুধু ওই কথাটুকুই আছে।

"সেদিন সন্ধ্যায় গোপালদার ব্যবস্থায় আমরা উভয়ে ওই গৃহের মধ্যে মিলিত হইলাম। এবং ইহার পর অসুখের হুজুগতে যে কয়েকদিনই ওখানে থাকিয়াছি—নিত্যই নিয়মিতভাবে মিলিত হইতাম। গোপালদাদার ব্যবস্থা মত সময়টা পরিবর্তিত হইত, কোনদিন সন্ধ্যায়, কোন দ্বিপ্রহরে—কোনদিন বা গভীর রাত্রে সেখানে যাইতাম। ভায়লেটও আসিত। আমরা সর্বপ্রকারে পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ হইলাম।"

* * *

ষোল বছরের এক ধনীপুত্র এবং এক চতুর্দশী কৃশ্চান কন্যা। অর্ধশ্বেতাঙ্গিনী দরিদ্র অসহায়

অনাথ। অবস্থাবৈগুণ্যে বাংলাদেশের পল্লীতে প্রায় দেশীয় কৃশ্চানদের সঙ্গে বাস করে। কথাটা গোপন ছিল না—থাকবার কথা নয়। কিন্তু দেবেশ্বরের গোপালদা দেবেশ্বরকে এমন ভাবে নিজের আড়ালে ঢেকে রেখেছিলেন যে, যে কানাঘুষোই উঠেছিল ক'দিনে সেটার মধ্যে দেবেশ্বরকে কেউ ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় নি, পেয়েছিল গোপালকেই। কিন্তু গোপালদাসকেও রত্নেশ্বর রায় কম ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে সে কম প্রশ্রয় পেতো না।

দেবেশ্বরের সে সঙ্গী ছিল, যা দেবেশ্বর খেয়েছে সেও তাই খেয়েছে, পরার কথাটা ঠিক বলতে পারব না, তবে গোপালদাস সে আমলে যে কাপড়জামা পরেছে তা অন্তত ঠাকুরদাস পালের যোগাবার সাধ্য ছিল না। ঠাকুরদাস রত্নেশ্বর রায়ের ছেলেবেলার আদরে 'ঠাকুরা' তাঁর প্রাণরক্ষাকর্তার ছেলে সে; তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে তাঁর বিবাহের সঙ্গে, তাকে তিনি ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর সৎকর্মে বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি তার উপর বিরূপ হয়েছিলেন। ঠাকুরদাসের 'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত—নিম না ছাড়েন আপন জাত' এই কটু-কথা তাঁর কানে গিয়েছে, তিনি সহ্য করেছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে আসে নি তাও তিনি কিছু বলেন নি। মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্য গোপালের উপর বিরূপ কোন দিন হন নি তিনি। তার পরিচয় রায়বংশের জমাখরচের খাতার মধ্যে আছে। চিঠিপত্রের মধ্যেও আছে।

বিরূপ হলেন এইবার। পিক্রু এসে জানালে গোপালদাস তাদের পাড়ায় ঘোরাফেরা করে, তার ভাবভঙ্গি দেখে লোকে তার সঙ্গে ভায়লেটের নাম জড়িয়ে পাঁচ কথা বলছে। ভায়লেট পিক্রুজের নিজের কেউ নয়, তবু সে তার সম্পর্কিত কাকা আলফানসোর মেয়ে, তার উপর খোদ রায়হুজুর তার ভার নিয়েছেন তার জন্য এত করছেন। পাদরী সাহেব এনে ইস্কুল বসিয়ে দিলেন, তার পিছনে গোপাল লেগেছে এ নালিশ সে জানিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা নিয়ে ভাবছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু খুব বেশী কিছু একটা করেন নি, শুধু কলকাতার নায়েবকে লিখে দিয়েছিলেন—"গোপালের উপর কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাহার স্বভাবচরিত্র মন্দ হইতেছে কিনা এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। এবং তাহাকে বলিবেন—এখানে তাহার নামে কিছু মন্দ কথা লোকে আমার নিকট বলিয়াছে। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। তবে তাহার সাবধান হওয়া উচিত বলিয়াই আমি তাহাকে নির্দেশ দিতেছি।"

এদিকে নবীন দুটি প্রাণ পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এত ব্যাকুল যে অদর্শন আর সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু ভায়লেটের করবার কিছু ছিল না। কি করবে সে? কাঁদত।

* * *

কলকাতায় দেবেশ্বর রায় কীর্তিহাটের রাজাবাবুর যুবরাজ। বাইরে শান্ত প্রসন্ন কিন্তু

জীবনে ক্ষুরের মত ধার, শাণিত তরবারির মত আস্ফালন এবং শক্তি, তিনি সহ্য করবেন কেন ?

তিনি একদিন গোপালদাসকে ডেকে বললেন—গোপালদা, তুই হয় ভায়লেটকে এনে দে, নয় বিষ এনে দে ! গোপালদা, আমি খেয়ে মরব। আমি ভায়লেটকে ছাড়া থাকতে পারছি না। পারব না।

গোপালদা সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তার জন্যে কি হয়েছে, দেবু আমার রাজাভাই। এনে আমি তাকে এখুনি দিতে পারি। কাল বল কাল যাব, তিন দিন—তিনদিনের মধ্যে ভায়লা-বউরাণীকে এনে দেব। সে নিশ্চয় আসবে। বলামাত্র আসবে আমি জানি। কিন্তু এখানে এনে রাখবে কোথায় বল ? একটা বন্দোবস্ত কর আগে ! এ-বাড়ীতে তো রাখা যাবে না, রাজাভাই। এখুনি খবর যাবে দপ্তর থেকে—এখানকার এই আমলা বেটারা বড় বজ্জাত। আমাকে সেদিন খাজাঞ্চী বললে—আমি দশটা টাকা চাইতে গিয়েছিলাম, তোমার রোকা নিয়ে, বললে—দেবুবাবুকে বলগে কিসের জন্য টাকা চাই লিখে দিতে হবে। আর তুমি এমন করে দেবুবাবুর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা গায়ে গা লাগিয়ে ঘুরো না। কত্তা চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

ষোল বছরের জমিদার-পুত্র—বুদ্ধিতে, সাহসে অসাধারণ ছিলেন দেবেশ্বর। পরবর্তীকালে তার প্রমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে রেখে গেছেন এবং যে সময়ের কথা বলছি, তার ক'মাস পরেই পিতাপুত্রে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, যে-পত্রের মধ্যে এই সমস্ত কথা তিনি খুলে লিখেছেন নির্ভয়ে, তাই তার প্রমাণ। তবুও প্রথমটা গোপালদার প্রশ্নটা দমিয়ে দিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে।

ভায়লেটকে তাঁর ভায়লাকে এনে রাখবেন কোথায় ? রাখতে হলে বাড়ী চাই, সুন্দর বাড়ী, খাট চাই, পালঙ্ক চাই, আয়না চাই, আসবাব চাই ; ভায়লার জন্য পোশাক চাই, পরিচ্ছদ চাই, তার কাছে কাজ করবার জন্য লোক চাই, জন চাই ; তাকে সাজাবার জন্য অলঙ্কার চাই—অনেক কিছু চাই।

সামনে তখন তাঁর পরীক্ষা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। সেই দারুণ চাঞ্চল্যের মধ্যেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষার পরই এই চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী পিসী অন্নপূর্ণা দেবীকে। তখন তিনি কাশীতে।

অন্নপূর্ণা দেবী সে-চিঠি পেয়ে ভাইপোকে চিঠির উত্তর দেন নি ; একটি লাল-টুকটুকে কনে খুঁজতে শুরু করেছিলেন কাশী অঞ্চলেই। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা অঞ্চলে তখন বাঙালীরা দলে দলে বাস করেছেন এবং ওসব অঞ্চলে ওঁরাই হয়েছেন প্রধান এবং সরকারী অনুগ্রহে প্রবল। ডাক্তার বাঙালী, উকিল বাঙালী, ডেপুটি বাঙালী, সাব-ডেপুটি বাঙালী। বাঙালীরা তখন আই-সি-এস হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রমেশ দত্ত,

বিহারীলাল গুপ্ত পাশ করে এসেছেন। বাঙালী তখন ভারতবর্ষে দিগ্বিজয় করছে ইংরিজী বিদ্যে আর ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের অনেকজন প্রদেশান্তরে নতুন বটগাছের মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। কাশীতেই কি বাঙালী তখন কম? কাশী আর বৃন্দাবন —এ-দুটি তীর্থই তো বাঙালীর তীর্থ। কাশীর 'বাংগালী' টোলাকে ভয় এবং খাতির কাশী-ধামের পাণ্ডারাও না করে পারত না। বৃন্দাবনে বাঙালীর খাতির আরও বেশী।

বিশেষ করে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরকে যে খাতির ইংরেজ সরকার দেখিয়েছিল, তা দেখে সারা ভারতবর্ষ চমকে গেছল। রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভ সাহেবের দেওয়ান। তাঁর পোষ্যপুত্রের ছেলে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর—তিনি ইংরেজের অনুগত ছিলেন কিন্তু তাদের অযথা আনুগত্য দেখান নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং কীর্তির জন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে কে-সি-আই-ই খেতাব দিয়েছিল। তখন তিনি বৃন্দাবনবাসী। গৃহত্যাগ করে চলে এসেছেন বৃন্দাবন। খেতাব নিতে তিনি গেলেন না কলকাতা লাটসাহেবের দরবারে। লিখলেন—আমি হিন্দু, আমি বানপ্রস্থ নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছি, এখান থেকে আর আমার কলকাতা ফেরার উপায় নেই। তাতে আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

শেষ পর্যন্ত আগ্রায় স্পেশাল দরবার করে লাটসাহেব তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন। আগ্রা নাকি বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথম বন—'অগ্রবন'। সেখানে পর্যন্ত এসেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর।

* ও *

—কোথেকে কোথায় যাচ্ছ, সুরেশ্বর। বাঙালীর সেকালের মহিমা আমার জানা আছে। তুমি তোমার দেবেশ্বর রায়ের কথা বল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—জানা আছে তা জেনেও আমার সন্দেহ হয় সুলতা, জানাটা বেশ মনে মনে তলিয়ে বিচার করে জানা তো! আজকে যারাই স্বাধীন দেশে পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে আছে, তারা সবাই তোমরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা সে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা সেধে আসছে, কোন অনুগ্রহ নেয় নি বা নাও নি। বাড়ীতে কেউ লাঠিতে তেল মাখিয়ে, কেউ গাদা-বন্দুক নিয়ে ইংরেজ তাড়াবার কল্পনা করেছ। আমরা যারা জমিদার-রাজা বা ধনীদের বংশধর, সব অপরাধ আমাদের।

অর্চনা হেসে বললে—সুরোদা, হঠাৎ তুমি যেন মেজাজের ব্যালান্স হারিয়েছ। বুঝেছি তুমি কেন সেটা হারিয়েছ।

চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সামনে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সুলতা সবিস্ময়ে দেখলে, সুরেশ্বরের বড় বড় চোখদুটি কানায় কানায় জলে ভরে উঠেছে। রশ্বর চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না, ভয় হচ্ছে, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে রে পড়বে।

—সুরেশ্বর !

—আমি বলছি সুলতাদি। আমি বলি। রায়বাড়ীর এই জবানবন্দীর সবটাই আমি জানি। সুরোদা আর কাউকে বলে নি কিন্তু আমাকে না-বলে পারে নি। আমি জানি।—

অর্চনা বললে—কথাগুলো যা তোমাদের হচ্ছিল, তা ওঘরে বসে আমি শুনছিলাম, আর কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীর নকলখানা পড়ছিলাম। আমি ভাবছিলাম। ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম সুলতাদি। অবশ্য তুমি রাগ করবে এটা বুঝতে পারি নি। কারণ এখনও ঠিক যেন মনে ধারণাই করতে পারি না, তুমি কোন রকমে কীর্তিহাটের রায়েদের ভাল-মন্দ তারা যা করেছে তার সঙ্গে জড়ানো আছ। থাকার তো কথা নয়। রায়বাড়ীর কর্তাদের হাত যাদের উপর পড়েছে, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভেঙে গেছে। তবে কিছু কিছু লোক আছে, যারা সত্যিই খুব বড় হয়েছে। তারা অবশ্য রায়বংশের কাউকে এখন আমলে আনে না।

সুরোদার ঠিক এমন ধরনের কিছু হবে, মানে চঞ্চল হবে, কি ছেলেমানুষের মত কেঁদে-টেঁদে ফেলবে, আমি তা ভেবেছিলাম। এইভাবে যখন ও চঞ্চল হয় তখন খানিকটা পাগলের মত হয়ে যায়। বড়ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়কে ও বড্ড ভালবাসে। তার ঋণ যেটা তার মধ্যে রায়বংশের পুরনো শ্যামাকান্তের ঋণকে আবিষ্কার করেছে। বলে, দেবেশ্বর রায় সে ঋণটা শোধ করতেন, করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা করতে তাঁকে দেন নি; দেন নি আমার দাদাশ্বশুরের মা, দেবেশ্বর রায়ের পিসীমা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা, আমি তাঁকে বলতাম—বড়মা।

আমার বিয়ে হবার পর ওই নামেই তাঁকে ডাকতাম। আমার বিয়ে হল, এই জানবাজারের বাড়ী থেকেই বিয়ে হয়েছিল। বড়-জ্যাঠামশাই মানে যজ্ঞেশ্বর রায় আসেন নি, ছেলেরাও কেউ আসে নি, কিন্তু দুপুরবেলার দিকে ট্যাক্সি করে জ্যাঠাইমা এসেছিলেন। সঙ্গে একজন ঝি। একটা আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডের বাড়ীতে বড়মার সঙ্গেও দেখা করে প্রণাম করে গিছলেন। বিয়ের মাস দুয়েক পরই বড়মা, আমার অন্নপূর্ণামা অসুখে পড়লেন। যেন এই বিয়েটার অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন। বলতেনও, আমাকে বলতেন—দেখ, তুই গতজন্মে আমাকে জন্ম দিয়েই পালিয়েছিলি। দেখ, সংসারে প্রসব করে সন্তানের সেবা আর ঈশ্বরের সেবা দুই সমান। সে যে না করে তার জীবনে ঋণ থাকে, জন্মান্তরে শোধ করতে হয়। সেই শোধ করতে এসেছিস। নে, বেশ করে সেবা কর; তেল গরম করে এনে পায়ে মালিশ কর, পিঠে মালিশ কর। আমি আর ঝিয়ের কাজ নেব না।

দু মাস পর হঠাৎ জ্বর হল। ঘুসঘুসে জ্বর। আমার স্বামীই দেখছিলেন। বললেন—কিছু না। হেসে বড়মা বললেন—কিচ্ছু না নয় রে, তোর বউয়ের সঙ্গে আমার আর-জন্মের মার সঙ্গে হিসেব-নিকেশের পালা পড়ল। খতেনের খাতা খুলে বসেছে হিসেব-নিকেশওয়ালা।

সুদে আসলে এতদিনে সেবা আমার কত পাওনা হয়েছে।

আমার স্বামী এসবে বিশ্বাস করতেন না, সুলতাদি। তিনি নতুন কালের নতুন মানুষ, মানে যেকালে আমার বিয়ে হল ১৯৩৭ সালে, সেকাল থেকেও অনেক পরের কালের মানুষ। এরা চালাক, এরা চতুর, এরা মুখে বলে এরা যুক্তিবাদী কিন্তু আসলে এরা অবিশ্বাসবাদী, মানে জীবনে কোন বিশ্বাস নেই। যা আজকাল, মানে মহাযুদ্ধের পরে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সব মানুষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ। তিনি লুকিয়ে মদ খেতেন, তিনি···। চুপ করে গেল অর্চনা। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে সামলে নিয়ে সে বললে—এই এমন একটা বাড়ী যা বাইরে থেকে একেবারে আদর্শবাদের মন্দিরের মত মনে হত, সেই বাড়ীর কোণে কোণে এই কালের, এই ধারার তখন শুরু হয়ে গেছে।

যাক গে, যা বলছিলাম বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা যা সুরোদা ছবিতে এঁকেছে, তার মধ্যে দেবেশ্বর-ঠাকুরদার প্রথম জীবনের সব কথাই জমা ছিল, এই বড়মা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা'র কাছে। তিনি নিজে নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দিন পনেরো পর চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন সুরোদাকে। আমাকে দিয়েই লেখালেন, এবার আমি যাইব। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমার মায়ের আসন পাতিয়া দিয়াছি; এবার আমার ডাক আসিয়াছে। আমি যাইব। তোমাকে কিছু বলিবার আছে, তোমাদের বংশের কিছু কাগজপত্র আমার নিকট আছে। তাহা তোমাকে দিতে চাই এবং তোমাকে কিছু বলিতেও চাই। সুরোদা চিঠি পেয়ে এল। বড়মা তার আগে তাঁর সেই পুরনো মেহগনী কাঠের হাতবাক্সের মধ্য থেকে বাণ্ডিল বাঁধা চিঠির তাড়া খুলে বসে বেছে বেছে খান বারো-চোদ্দ বের করলেন। বললেন—চিঠিতেই সব আছে; এতেই সব পাবি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারবি নে। যেসব কথা সামনা-সামনি দেবুর সঙ্গে কি দাদার সঙ্গে হয়েছে, তা তো চিঠির মধ্যে নেই। তার থেকে আমি বলি, তুই শোন। সে অনেক কথা রে!

* * *

সেদিনের কথা আমার চোখের উপর ভাসছে সুতলাদি। কলকাতা পৌছেই সুরোদা এসে হাজির হন আমাদের বাড়ীতে। বড়মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—বড়মা!

বড়মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছিস! আয়। দেখ, ওই কথাগুলি বললেন। তারপর বললেন—আমার ডাক এসেছে। আমি এবার যাব। তাই কথাগুলো তোকে বলে যাচ্ছি, আর এই চিঠিগুলো সেই কথার দলিল, তোকে দিয়ে যাচ্ছি। তোকে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি রে তোর দেনার কথা, তোর দায়ের কথা, তোর ইচ্ছের কথা।

সুরোদা বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইল, বড়মায়ের মুখের

দিকে।

বড়মা বললেন—কি, কিছু মাথায় ঢুকছে না তোর ?

সুরোদা হেসে বললে—না বড়মা, ঠিক ঢুকছে না! একটু গোলমাল ঠেকছে!

বড়মা বললেন—কই আমাকে রাঙাপিসী বলে ডাক তো! ওরে তুই যখন ছেলেবেলা বাপের সঙ্গে আসতিস, তখন আমার দেখলেই মনে হত, তুই আমার সেই দেবু। আমার গোরা ভাইপো! তাই তোকে ঠিক দেবুর ছেলেবেলার পোশাকের মত পোশাক তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম, তোর বাপকে বলেছিলাম—এই পোশাক পরিয়ে ওকে নিয়ে আসিস আমার কাছে। জ্বর হওয়া অবধি স্বপ্ন দেখছি, তুই এসে বলছিস—রাঙাপিসী, তোমার কাছে আমি যে সব দেনা করেছিলাম, তার হিসেবগুলো আছে, আমাকে বলে দাও। আমিই তোমার দেবু, রাঙাপিসী, গোরা ভাইপো। এই নামটি, গোরা নাম তাকে আমিই দিয়েছিলাম। গোরা মানে, সাহেব গোরা নয়, নবদ্বীপের গোরাচাঁদ।

জানালার ধার থেকে ফিরে এসে বসল সুরেশ্বর। বললে—তুই কথা বাড়িয়ে ফেলছিস অর্চনা। দে আমাকেই বলতে দে।

সুলতা, গোড়াতেই বলেছি এবং এখন অর্চনাও বলেছে, অন্নপূর্ণা মা আমার চেহারার সঙ্গে আমার ঠাকুরদার মিল দেখতে পেতেন। শুধু অন্নপূর্ণা মা কেন, মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ও বলেছিলেন একথা। রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন আমার দাদা দেবেশ্বর রায়, তুমি তার মত, হয়ত তার থেকেও উজ্জ্বল। মিল যে আছে, সে তাঁর ছবির সঙ্গে মেলালে তুমিও বের করতে পারবে। তার উপর ঘটনাচক্রে জানবাজারের বাড়ীতে হঠাৎ কুইনী এবং হিলডাকে দেখে তাঁর পুরনো কথাগুলো, যেগুলো তিনি ভুলে যেতে বসেছিলেন, সেগুলো নতুন করে মনে পড়েছিল। শুধু মনে পড়া নয়, একটা ধাক্কা যা তিনি সেকালে খেয়েছিলেন, তা আবার নতুন করে তাঁর মনে পড়েছিল।

ঘটনাগুলো বলে যাই, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন তিনি কুইনীকে দেখে চঞ্চল হয়েছিলেন, কেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুইনীর বাড়ীখানা তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে তোকে। কেন তিনি বলেছিলেন—কুইনীকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিতেই হবে তোকে। এবং কুইনীকেই বা তিনি কেন বলেছিলেন, সুরেশ্বরবাবু তোর পড়ার ব্যবস্থা করবেন। সেই মত পড়াশুনো করবি তুই। বুঝলি ?

অবলীলাক্রমে বলেছিলেন। যেমন করে আপনার নাতি-নাতনী বা তাদের ছেলেমেয়েকে বলা যায় তেমনি করে বলেছিলেন। এমনটা তুমি কখনও অনুভব করেছ কিনা জানি নে, তবে আমি অনুভব করেছি। এই কুইনীর সম্পর্কেই অনুভব করেছি। কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, কুইনীকে নিয়ে ওর সৎমামা হ্যারিসের সঙ্গে ঝগড়ার যেদিন বিচার করতে গিয়েছিলাম, তার কদিন পর বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে কুইনী এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বাড়ীর

দলিলটার সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের কখানা চিঠি সে আমাকে দেখতে দিয়েছিল। সে সব চিঠির মধ্যে আসল যা সত্য এবং জীবনের সঙ্গে জীবনের যে আসল সম্পর্ক তার একটা হিসেব ছিল। চিঠিগুলো পড়ে যখন মুখ তুললাম তখন কুইনী নেই। ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছিল, সে গোধূলির আলোয় শুকনো কাঁসাইয়ের বালুচর পার হয়ে কুইনী তখন শিলুটের ছবির মত চলে যাচ্ছিল।

সে ছবিটাও আমি এঁকেছি সুলতা। ছবিখানা আমার পরম প্রিয়। এই জবানবন্দীর মধ্যে সেখানার থাকা উচিত ছিল; কিন্তু নেই। ছবির বিচারে সেইখানাই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। আমার বিচারেই নয়, বিলেতের বিচারেও বটে। কিনতে চেয়েছিল অনেকে, কিন্তু তা আমি দিই নি। ছবিখানা কুইনীই আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিল।

এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা কেড়ে নেওয়ার খবর পেয়ে যে কথা অন্নপূর্ণামা সেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ী যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন, তা শুনেছ। সে চিঠিখানাও রয়েছে এখানে। পৃথিবীতে পুরুষ আর নারী নিয়ে চিরকাল, সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে। বিচিত্র ঘটনা এই যে, যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারীকে পেয়ে খুশী নয়, সুখী নয়। সেকালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে ধরে আনা এবং বিয়ে করা নারী তো কম থাকতো না; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারদের সংখ্যা বাদই দাও, ওটা পৌরাণিক। এই তো সেদিনের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের নবাব সরফরাজ খাঁ'র নাকি সতেরোশো বেগম ছিল। তবু সরফরাজ রাবেয়া বেগমকে বেশী ভালবাসতেন। ভালবাসা একটা বিচিত্র মনের অবস্থা, ও একবার জন্মালে আর মরে না, অনন্ত মূলের মত মানুষের সমস্ত অন্তর জুড়ে মূল বিস্তার করে দেয়। কখনও কখনও অনাবৃষ্টির সময় মনে হয় বুঝি এবার শুকিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই সারা অন্তর জুড়ে তার সবুজ অঙ্কুরের ডগা বেরিয়ে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই ভায়লা বা ভায়লেট মেয়েটাকে সেই ভালবাসায় ভালবেসেছিলেন দেবেশ্বর রায়। তাই রাঙাপিসী যিনি তাঁর খেলার সঙ্গী ছিলেন, বড় বোনের মত ছিলেন, প্রিয় সখীর মত ছিলেন, তাঁর কাছে লিখেছিলেন—পিসী, তুমি আমাকে হাজার কয়েক টাকা ধার দাও। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাখছি, টাকা আমি শোধ দেব-দেব-দেব।

তখন ঘটনাটা অনেক দূর এগিয়েছে সুলতা। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া তাঁর হয়ে গেছে। এলিয়ট রোডে একটা বাড়ী খাড়া করেছেন। এই বাড়ীটা গোপালদার সঙ্গে পরামর্শ করে করেছেন। জানবাজার থেকে রিপন স্ট্রীট বেশী দূর নয়, তার ওদিকেই এলিয়ট রোড। ফিরিঙ্গী পাড়া। পাড়াটায় যারা বাস করে, তারা খেটে-খুটে খায়, আবার ইংরেজ যখন কলকাতা পত্তন করেছিল, তখন জাহাজে করে পুরুষদের সঙ্গে অনেকে মেয়ে যারা এখানে হোটেল, বারে এবং নানা বৃত্তি করে জীবিকা উপার্জন করত, তাদের অনেকে থাকত, তাছাড়া ক্লাইভের আমল থেকে যেসব নবাব ইংরেজরা হারেম রাখত, তাদের বংশের ছেলেমেয়েরাও অনেকে এদিকপানে ছটকে এসেছিল। লালবাজার, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পার্ক

, ওয়েলেসলী হয়ে বেনিয়াপোখরা পর্যন্ত যে সমাজটা, সে সমাজের মধ্যে, এক পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দৌলত আর সাহসে কিছু এদেশী মানুষ, এদেশী সমাজ কোনমতে টিঁকে ছিল। আজও আছে। এখন বিক্রম অবশ্য আমাদের বেশী। সেকুলার স্টেটের সুনাম ক্ষুণ্ণ না করেই বেশী হয়ে উঠেছে।

যাক গে।

এই এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা ভাড়া নয়, লিজ নিয়ে ভায়লেটকে এনে রেখেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এবং পরমানন্দে মধুযামিনী যাপন শুরু করলেন। দিন-রাত্রি, কীর্তিহাট, বাপ-মা, বংশ-পরিচয় সব ভুলে এই ষোল বছরের কন্দর্পটি জীবনে বসন্তোৎসব জুড়ে দিলেন। পরীক্ষা হয়ে গেলেও কীর্তিহাট ফিরলেন না।

বার বার পত্র লিখলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু নানান অজুহাতে তিনি যাওয়া ঠেকিয়ে রাখলেন। রত্নেশ্বর রায় তাঁকে বিশ্বাস করলেন।

তখনকার সমাজ এবং বাঙালীর জীবন মনে করলে এটা খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে না সুলতা।

বাঙলাদেশ তখন জাগছে। সব দিক থেকে, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চার দিক থেকে যেন বারোটা সূর্য উঠছে।

শাস্ত্রমতে বলে, সূর্য হচ্ছেন বারোটি। বারোটি সূর্য বাঙলাদেশে তখন চারিদিকে প্রভাতের আলো ফুটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার শিক্ষা পাল্টেছে, ধর্মের চেহারা পাল্টেছে, নতুন ধর্ম জেগেছে, মুসলমান আমলে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি এবং চারিদিকে তোলা আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিল বাঙালীরা নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী তখন ছাপা হয়ে বের হয়েছে। তাতে নবাবনন্দিনী আয়েষা কুমার জগৎসিংহের প্রেমে পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কুমার জগৎসিংহের জাত বাঁচাতে বিয়েটা দিতে পারেন নি, কিন্তু সত্যি বলতে, তিলোত্তমা থেকে নবাবনন্দিনী আয়েষাকে অনেক মহীয়সী এবং সম্ভবত রূপসী মনোহারিণী করে সৃষ্টি করেছেন।

কৃশ্চানধর্মের গতি রোধ হয়ে গেছে; বউবাজারে মা ফিরিঙ্গী কালী পথরোধ করেছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে এক প্রায় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁর আশ্চর্য মহিমা। আশ্চর্য সারল্য। আশ্চর্য প্রেম। অপার ভালবাসা।

ব্রাহ্মধর্মের পর পর থাক হ'তে হ'তে আদি থেকে নববিধান, এবং নববিধান থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চেহারা নিয়েছে।

মিউটিনির পরই নীল বিদ্রোহ হয়ে গেছে। সে বিদ্রোহে বাঙালী হারে নি, জিতেছে। হরিশ মুখার্জির জেল হয়েছে। ফাদার লঙেরও জেল হয়েছে, যশোরের মাগুরা গাঁয়ের ঘোষেরা মাগুরায় বসে ছোট সাপ্তাহিক বের করেছিল, সে কাগজ নিয়ে তারা বাগবাজারে এসে

বসেছে। বাঙলা কাগজকে এক রাত্রে ইংরিজী কাগজে পরিণত করে লাটসাহেবের উদ্যত রোষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ সতেরো-আঠারো বছরের ; দ্বিজু রায়, রামানন্দ চাটুজ্জে, আচার্য প্রফুল্ল রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন বাঙলাদেশে অপরিচয়ের মধ্যে বেড়ে উঠছেন। দক্ষিণেশ্বরের যে ব্রাহ্মণের আশ্চর্য তপস্যা-চরিত্র সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে, তার মহিমা এবং তপস্যার যিনি ধারক-বাহক—দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও তখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বছর কয়েক পরেই তিনি তাঁর গুরু, যাঁকে তিনি My Master বলেছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এ সময়টা সেই সময়।

বাঙালী সে সময় শুধু ধন-সম্পদ খোঁজে না, বিষয়-বিষয় করে গলি-ঘুঁচিতে ঘোরে-ফেরে না, সে আরও অনেক কিছু খুঁজছে। অনেক প্রশ্নও তার মনে জেগেছে। একদিকে সে ওল্টাচ্ছে এদেশের পুরনো ইতিহাস, শাস্ত্র, পুঁথি, বেদান্ত, উপনিষদ, অন্যদিকে সে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আস্বাদ নিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস, কবিতা পড়েছে। শুধু রেনল্ডের 'মিস্ট্রি অব দি কোর্ট অব লণ্ডন' নয়, আরও অনেক পড়েছে, স্কট ডিকেন্স পড়েছে। জীবনে তার নতুন আলোকপাত হয়েছে। দেবেশ্বর রায় বেশ একটু ইংরিজী-ঘেঁষা লোক ছিলেন। তিনি এই অর্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী ভায়লেটের কিশোর জীবনের ভালবাসায় আকণ্ঠ ডুব দিয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে ভাবছিলেন, কিছু টাকা মূলধন পেলে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে মাইকেলের মত একজন কেউ হবেন।

সেই সময়টায় তিনি মাইকেলের মত দাড়ি-গোঁফ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং খাঁটি সাহেবী পোশাক পরে ভায়লেটকে পাশে বসিয়ে ফিটনে চড়ে বেড়াতেও যেতেন।

সুলতা, অন্নপূর্ণামা সেই রোগশয্যায় আমাকে ডেকে বললেন—দেখ, দেবু তার মৃত্যুর আগে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—রাঙাপিসী, তুমি আমাকে টাকাটা দাও নি, সে হয়তো আমার ভাল-মন্দ বিচার করতে গেলে ভালই করেছ। কারণ ভায়লেট এমনই অশিক্ষিত ছিল এবং এমনই ওয়াইল্ড ছিল যে, আমি তাকে সহ্য করতে পারতাম না। তাতে এর থেকেও অনেক বেশী যন্ত্রণা আমাকে সইতে হত।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—তখন দেবু মদ প্রায় সব সময়ই খেত। মনের যাতনায় খেত। তবে হ্যাঁ, বুঝতে কেউ পারত না। দেবুর কথাটা শুনে আমার খুব অনুশোচনা হয়েছিল রে। আমি তাকে বলেছিলাম—দেবু, টাকাটা দিতে আমি পারতাম, কিন্তু তোকে যে চিরকালের জন্যে হারাতাম, দেবু।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—না পিসী, তুমি হারাতে না আমাকে। আমি তোমার সেই দেবুই থাকতাম। তবে হ্যাঁ, বাবা-মা'র সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। সমাজের সঙ্গে হ'ত। তা হ'ত। কিন্তু তা কি আটকানোই গেল রাঙাপিসী? বল, তুমিই বল! গেল! বাবার সঙ্গে প্রতি-

পদে ঝগড়া হল। প্রতি পদে। যে মানুষটাকে সারা দেশে বললে, এমন ধার্মিক, সুবিচারক হয় না, তাকে আমি নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ছাড়া কিছু দেখলাম না। একটা অত্যন্ত হিংস্র মানুষ। উঃ রাঙাপিসী, বাবার এই মনে চেপে রাখা প্রতিহিংসা, আর সময় এবং সুযোগ বুঝে আইনের পথে শোধ তোলা এ যে কি ভয়ানক তুমি কল্পনা করতে পারবে না। জান রাঙাপিসী, বাবার পছন্দ করা মেয়ে বলে কাশীর বউকে আমি কোনদিন পছন্দ করতে পারলাম না। এমন ধর্মবাইগ্রস্ত স্বামীতে, দেবতায়, ধর্মে তার অচলা ভক্তি, কোনদিন সে আমার উপর জোর খাটালে না, কোনদিন সে আমার একটা অবিচারের প্রতিবাদ করলে না, না পারলাম তার উপর রাগ করতে, না পারলাম তার উপর ঘেন্না করতে, না পারলাম তাকে ভালবাসতে; পিসী ভালবাসতে গেলে সে ভালবাসা নিলে না, ফেলেও দিলে না, একটু হেসে পাশে সরিয়ে রেখে দিলে। নেড়েচেড়েও দেখলে না।

জানিস সে কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। অন্নপূর্ণামা বললেন—আমি সেদিনও তাকে বলতে পারলাম না যে, ওরে দেবু, ও ক'নে দাদা পছন্দ করে নি রে, পছন্দ করেছিলাম আমি। আমার বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে; তোর চিঠি পেয়ে আমি তোকে উত্তর দিলাম না, দাদাকেও বিশেষ কিছু জানালাম না, লিখলাম—আমার সঙ্গে মিটমাটের কথা যা চাহিতেছ, তাহার জন্য কলিকাতা যাইতে লিখিয়াছ; কিন্তু তুমি কাশী এস না কেন? তুমি জমিদার, স্বাধীন মানুষ; আমি মেয়েছেলে, পিসেমশায় ছুটি না পাইলে যাইব কেমন করিয়া এবং মিটমাট দুই পক্ষের মধ্যে বসিয়া করিয়াই বা দিবেন কে!

এরই মধ্যে দেখলাম এই মেয়েকে। দশাশ্বমেধ ঘাটে তার দিদিমার সঙ্গে স্নান করতে এসেছে। ফুটফুটে মেয়েটি। কিন্তু সেই বয়সে কি ধর্মনিষ্ঠা আর কি ভক্তি! পরিচয় নিয়ে জানলুম, দিদিমা নদে জেলার জমিদারবাড়ীর গিন্নী, জমিদার থেকেও ব্যবসায়ে ওদের নামডাক খুব বেশী, অবিশ্যি দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে মেয়েটি গিন্নীর মেয়ের মেয়ে, মা মারা যাওয়ার পর থেকে দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছে। আমি পরিচয় দিয়ে পিসেমশাইকে নিয়ে কথাবার্তাটা খানিকটা পেড়ে রাখলাম। দাদাকে লিখলাম, "তুমি শিগ্‌গির আসিবে। তুমি এলে মিট-মাটের কথা সব হইবে।"

দাদা আসতে পারলে না। কমিশনার লাট অনেক কথা লিখলে। রায়বাহাদুর খেতাব দেবেন সরকার, তার তদ্বিরের জন্য এখন দেশ ছেড়ে আসা অসম্ভব। অগত্যা আমি কলকাতা গেলাম। দেখলাম স্টেশনে জানবাজারের গাড়ী এসেছে। কিন্তু একজন গোমস্তা ছাড়া কেউ আসে নি। আমার রাগ হল। আমি জানবাজার গেলাম না, গিয়ে উঠলাম জোড়া-সাঁকোর জেঠামশাইয়ের বাড়ী।

সেখানে গিয়ে খবর শুনলাম, দেবেশ্বর বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

অবাক হয়ে গেলাম। দেবু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বন্দুকের গুলিতে?

উত্তর শুনলাম—হ্যাঁ।

পিসেমশাই বললেন—তাহলে এখানে নয়। ফিরে গিয়ে গাড়ীতে ওঠ মা। চল্ ওখানে চল্। এই জন্মে কেউ স্টেশনে আসে নি।

জানবাজারের বাড়ীতে গিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী এবং বিমলাকান্ত পৌছে দেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় বড় সাহেবডাক্তারকে বিদায় করছেন। সাহেব তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে তাঁর ব্রুহাম গাড়ীতে চড়ছেন। বলছেন—রয়বাবু, It is only luck—only luck—that has saved your boy. Offer your thanks and gratitude to God and God alone. I have not done anything.

অন্নপূর্ণামা বলেছিলেন আমাকে, আমি কাশীতে পিসেমশায়ের কাছে ইংরিজী শিখেছিলাম, কিন্তু সাহেবের কথা একবিন্দু বুঝি নি। পা আমার সিঁড়িতে আটকে গেল, আমি উপরে যেতে পারলাম না।

সাহেবকে বিদায় করে দাদা ফিরে এল ঘরের মধ্যে, পিসেমশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের মধ্যে, তিনি বললেন—তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই!

গম্ভীরভাবে কীর্তিহাটের রায়রাজা আমার দাদা বললে—না। তবে যা হবার হয়ে গেলেই তো ভাল হত। ভগবান আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেন, রায়বংশকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করতেন। গুলিটা চালাতে চেয়েছিল বুকে। বন্দুকটার বাঁট মেঝেতে রেখে নলটা বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টিপেছে, এখন বন্দুক তো ফায়ারিংয়ের সময় খানিকটা ঝাঁকি দেয়, back push করে, তাইতেই পিছলে গিয়ে গুলীটা বগলের ভিতরে মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। ছররা হলেও ক্ষতি হ'ত, দু-চারটে এদিক-ওদিক ঢুকতে পারত। এ একেবারে বুলেট। সুতরাং জীবনহানি হয় নি, কেলেঙ্কারিই সার হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। নড়বার শক্তি তখনও আমার হয় নি। পিসেমশাই বললেন—কি বলছ তুমি রত্নেশ্বর?

—ঠিক বলছি। আমি বাল্যকাল থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত আপনার কাছে মানুষ হয়েছি। আপনি কি আমাকে এমনিই মমতাহীন পাষণ্ড করে গড়ে তুলেছিলেন যে, নিজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রথম সন্তান সম্পর্কে এমনি কথা বলব? মরাই ওর উচিত ছিল, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, রায়বংশের দুর্ভাগ্য, সব থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আমার যে,—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল দাদা। বলেছিল—চলুন ওপরে চলুন। এখানে লোকজনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ীর গোপন কথা, কি কেলেঙ্কারির কথা সে এক রকম ওরা জেনেছে, তার প্রতিবিধান তো করতে হবে। কিন্তু আমাদের কথাগুলো ওদের শুনতে দিয়ে লাভ কি?

* * *

অন্নপূর্ণামা থাক-থাক করে চিঠিগুলো সাজিয়ে হাতে ধরে বসে কথাগুলি বলছিলেন আমাকে। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু অর্চনা, আর কেউ ছিল না। আমি অনেকটাই জানতাম, কিন্তু এমন বিশদভাবে জানতাম না। বাইরেটা দেখে যতটা জানা যায় ততটাই। মর্মকথা নয়।

দাদা জানবাজারের বাড়ীতে সেবার এসে উঠেছিল খবর-টবর না দিয়ে। খবর যা ছিল, তাতে দাদার আসবার কথা একদিন পরে, কিন্তু মেদিনীপুর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিঠি দিয়ে একদিন আগে আসতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, চুঁচড়োতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সাহেবের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে, সেটা দেখাবেন। কমিশনার নিজেই ডেকেছেন।

রত্নেশ্বর রায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেই সকালে রওনা হয়ে হাওড়া পৌঁছে ওখান থেকেই গিয়েছিলেন চুঁচড়ো। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের আসন চুঁচড়োতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে খুশী মনেই ফিরছিলেন। মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন একটা জলছিল। কিন্তু সেটাকেও তিনি লণ্ঠনের ফানুস পরিয়ে আগুন থেকে সুন্দর একটি লণ্ঠন করে তোলা যায় কিনা ভাবছিলেন। সেটা ভায়লেট এবং গোপালকে নিয়ে। ভায়লেট একদা অদৃশ্য হয়েছে কীর্তিহাট থেকে। গোপালই এনেছিল কীর্তিহাট থেকে। এবং দিনকয়েক থেকে একদিন ওই গোয়ানপাড়ারই এক আধবুড়ী গোয়ানবুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে ভায়লেটকে এনে তুলেছে এই এলিয়ট রোডের বাড়ীতে। বাড়ীখানা তখন সদ্য নতুন তৈরী হয়েছে। ঝকঝকে বাড়ী। বাড়ীটা করেছিল একজন খাঁটি সায়েব, যার মতলব ছিল—আর হোমে সে ফিরবে না। সেও এক প্রেমের ব্যাপার। এখানে প্রেমে পড়েছিল, তাই ফিরে যাবে না মতলব করেছিল। সেখানে পুরানো বিয়ে করা বউ ছেলেমেয়ে ছিল, একে নিয়ে হোমে গেলে জেল খাটতে হবে। কিন্তু তার ভাগ্য, বাড়ী-টাড়ী হল কিন্তু যে-মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল, সে মরে গেল হঠাৎ। সায়েব বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে বিলেত চলে গেল। বাড়ীটা কিনেছিল কলকাতার বাড়ীভাড়া ব্যবসায়ী যারা তাদের একজন। কিন্তু ভাড়া সহজে হচ্ছিল না। বাড়ীটার নাম রটে গিয়েছিল অপয়া—আনলাকী। গোপাল ঘোষ খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায়কে খবরটা দিয়েছিল; তরুণ দেবেশ্বর বলেছিলেন—রাবিশ! অপয়া! আনলাকী! ওসব আমি মানি নে গোপালদা। চল, বাড়ীখানা দেখে আসি। পছন্দ হলে ওই বাড়ীই নেব। নতুন বাড়ী, সায়েবী-রুচিতে করা বাড়ী।

তরুণ দেবেশ্বরের দেখবামাত্র ভাল লেগেছিল এবং সেই পথেই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা বলে পাকা করে, ওখান থেকেই গিয়েছিলেন হ্যামিল্টনের বাড়ী। হাতে আংটি ছিল। একটা খুব দামী হীরের আংটি, সেটা পৈতের সময় পেয়েছিলেন; আর একটা আংটি—সেটা বীরেশ্বর রায়ের একটা দামী দুর্লভ নীলার আংটি। সেটা তাঁর আঙুলে শেষদিন পর্যন্ত ছিল। লোকে

বারণ করত, এটা পরবেন না। কিন্তু তিনি তা ছাড়েন নি। আংটিটার গল্প ছেলে-বয়স থেকে শুনেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ নীলা সহ্য হলে রাজা হয় মানুষ। এই আংটিটা একদিন বাপের সম্মুখেই খোলা জহরতের বাক্স থেকে হাত-সাফাই করে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা পরতেন তিনি। এবং ভায়লেটকে পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল আংটিটা তাঁর সহ্য হয়েছে। হ্যামিল্টনের বাড়ীতে গিয়ে বড় হীরের আংটিটা এবং হীরের বোতাম বিক্রী করেছিলেন, আর এই নীলাটা বন্ধক রেখে টাকা কম পান নি—পেয়েছিলেন দশ হাজারের বেশী।

সেই টাকায় বাড়ী লিজ নিয়ে ফারনিচার কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভায়লেটকে কীর্তিহাট থেকে এনে মধুচন্দ্রিকা যাপন করছেন।

দেবেশ্বর রায় বাপ রত্নেশ্বর রায়কে ভয় করেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে বাপের কঠোর সমালোচক। বাপের কাঠিন্য এবং কঠোরতা তাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাছাড়া তিনি বেপরোয়া। তিনি গ্রাহ্য কাউকে করেন না। বাপকে পত্রে লেখেন—তখনকার দিনের এ-মিটিং ও-মিটিংয়ের কথা। এবং তার সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মতের কথাও জানাতেন। যা পড়ে রত্নেশ্বর মৃদু হাসতেন। তাঁর মনে পড়ত তাঁর বাল্যকালের কথা। তিনি যখন নিজেকে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর দৌহিত্র বলে জানতেন, তখন তিনি নিত্য অভিসম্পাত দিতেন এই বংশটিকে। সোচ্চারে দিতে পারতেন না ভবানী দেবীর জন্য। ভবানী দেবীকেও তিনি তখন নিজের গর্ভধারিণী বলে জানতেন না।

তারপর ?

তারপর বিচিত্র ঘটনাচক্রে সব উল্টে-পাল্টে গেল। বীরেশ্বরের পুত্র হিসাবে তিনি আজ কীর্তিহাটের ষোল আনা সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের মত অনুযায়ী বীরেশ্বর রায়ের আমলের ধারাপদ্ধতি সবই পাল্টেছেন। জোরজুলুম, জবরদস্তি, দৈহিক নির্যাতন ক'রে, গ্রাম জ্বালিয়ে, লাঠিবাজী ক'রে প্রজাশাসন তিনি তুলে দিয়েছেন। আজ সবই চলে দেশের প্রচলিত আইনের কাঁটায়-কাঁটায়। কারুর সাধ্য নেই যে তাঁকে প্রজাপীড়ক বলে, তবু তিনি নিজে জানেন, অনুভব করেন আজ কীর্তিহাটের কাছারীকে, কীর্তিহাট এস্টেটের প্রজারা কত বেশী ভয় করে। এ তো সেই তিনিই করেছেন। এবং তার সঙ্গে দেশের আমল—হাল-চাল আইন সাহায্য করেছে।

১৮৫৭ সাল থেকে ভাইকাউন্ট আর্ল ক্যানিং, লর্ড এলগিন, লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন একের পর এক লাট হয়ে এসে গোটা দেশে কেমন করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করলে তা দেখেছেন তিনি। শিখেছেন অনেক কিছু। লর্ড লিটন চলে যাবেন, আসবেন লর্ড রিপন। লর্ড লিটনই তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব মঞ্জুর করেছেন।

ছোট লাটবাহাদুর নিজে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন—"তুমি যে তোমার জমিদারীর মধ্যে নেটিব ক্রিশ্চানদের জন্য চার্চ করেছ এবং সেখানে স্কুল ক'রে দিয়েছ তাদের

জন্য, এর জন্য তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ-ধরনের উদারতা সত্যই প্রশংসনীয়।"

দেবেশ্বর আজ চিঠিপত্রে যাই লিখুক কলকাতার মিটিং এবং হুজুগ আর ফ্যাশনের নেশার তার বিন্দুমাত্র লেশ থাকবে না, যখন সে রায়বাড়ীর জমিদারীর আসনের স্বাদ পাবে। তার আয়ের স্বাদ, সম্মানের—তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মূলের সন্ধান পাবে। হ্যাঁ, তবে নতুন জীবনে এগুলো ভাল। অন্তত সমাজে, বাইরে পাঁচজনের সামনে ভাল লাগে।

তিনি জানতেন না, দেবেশ্বর নিজের জীবনে কতখানি শিকড় চালিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার মাটির উপর। বুঝতেন না তার মতামতের মূল্য কতখানি! এবং মনে তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, দেবেশ্বর ষোল বছর বয়সে চৌদ্দ বছরের ভায়লেটের প্রেমে পড়েছে এবং গোপালদার সাহায্যে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে বাড়ী ভাড়া করে রেখেছে।

রত্নেশ্বর রায়ের অনুমান ছিল এবং কীর্তিহাট অঞ্চলে প্রবল গুজব ছিল যে, গোপালই ভায়লেটকে নিয়ে পালিয়েছে কলকাতায়। রত্নেশ্বর চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায়, নায়েবকে —"গোপাল সম্পর্কে এখানে অনেক গুজব রটিয়াছে। সে কলিকাতায় কি করিতেছে বা তাহার সমুদয় বিবরণ আমাকে পত্রপাঠ জানাইবা।" দেবেশ্বরকে লিখেছিলেন—

He is a scoundrel.—The Goans of our Goanpara say that Gopal has eloped with Violet Pedros the girl—who you may remember—garlanded us in the meeting and who—happens to be the daughter of one of our women employees in the house—Anjana. You were a mere boy at that time, —she was your nurse—very favourite of yours—you may remember her. She embraced christianity and married a Goanese Christian. Violet is her daughter. You just warn him—and tell him—that he shall have to be a Christian and marry this girl.

* * *

চুঁচড়ো থেকে ফিরে বাড়ী পৌঁছেই রত্নেশ্বর নিচের ওই হলঘরে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রত্যাশা করেছিলেন, দেবেশ্বর সহাস্যমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রণাম করবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে বা কাঠের সিঁড়ির উপর, ম্যাটিংয়ে চটির দ্রুত শব্দ তুলে, ছুটে নেমে আসবে।

গম্ভীর রাশভারী মানুষ রত্নেশ্বর রায়। রায়বংশের কাঠামো, তার উপর জীবনের প্রথম দিকটা কাশীর জলে-হাওয়ায়, ঘিয়ে-ময়দায় ল্যাংড়া আম, কাশীর পেয়ারা এবং বাদাম-পেস্তা খেয়ে আর কুস্তি করে, সাঁতার কেটে মজবুত হয়ে গড়ে উঠেছে, চোখের চাউনিতে ছিল একটা তীক্ষ্ণ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি, অল্পেই কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিত। তার সামনে সহজে কেউ মুখ তুলে কথা বলতে পারত না। কিন্তু দেবেশ্বর প্রসন্ন হাসিমুখে তরুণকণ্ঠে

উৎসাহের সুরে "বাবা" বলে ডাকলে রত্নেশ্বর আর একরকম হয়ে যেতেন। প্রণাম করতে করতে ছুই হাতে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে উপরে উঠে যেতেন এক প্রবীণ ও এক নবীন বন্ধুর মত।

সেদিন তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। দেবেশ্বরের চটির শব্দ উপরে বাজল না, এগিয়ে এল না। তিনি ডাকলেন—দেবু! দেবেশ্বর!

সাড়া মিলল না। এবার তাঁর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কীর্তিহাটের এস্টেটের জমিদার রত্নেশ্বর রায়, যে-রত্নেশ্বর রায় ম্যাজিস্ট্রেটকে অ্যালিবি সাক্ষী রেখে দশ ক্রোশ দূরের রাধানগরের দে-সরকারের ঘর জালিয়ে এসেছেন, দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়ে দে-সরকারের হাত ভেঙে দিয়েছেন, যে-রত্নেশ্বর রায়ের অভিষেকের উৎসবের সময় গোপাল সিংয়ের মত দুর্ধর্ব দুর্দান্ত খুনে দাঙ্গাবাজকে একদিনে নাগপাশে বেঁধে এনে দাসখত লিখিয়েছেন, সেই জমিদার!

শুধু একটা ধমক। কাউকে উদ্দেশ করে নয়। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কোথায় দেবেশ্বর?

নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে গিয়েছিল গোটা বাড়ীটা। একটা সুচ পড়লে শোনা যেত।

—কোথায় সে? তারপর দেবেশ্বরের খাস চাকরকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—এই শুয়ার কি বাচ্চা! শুনতে পাচ্ছিস নে?

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বলেছিলেন—কোথায় সে? এই হারামজাদা!

এরপর কথাটা প্রকাশ হতে কতক্ষণ লাগে? প্রকাশ হয়ে পড়েছিল—"বড়বাবু সন্ধ্যে হলেই চলে যান, যেখানে গোপাল থাকে সেখানে। ফেরেন সকালবেলা।"

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু মুখ থেকে একটি কথাও বের হয় নি। হয়তো মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে নিয়ে থাকবেন, গোপাল যেখানে থাকে, সেখানে? তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল ভায়লেটকে। তাহলে?

কত প্রশ্ন, কত ক্ষোভ, কত ক্রোধ এর সঙ্গে জেগেছিল তার প্রকাশ বাইরে কেউ কিছু দেখে নি। দেখতে পায় নি। এবং রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেও তার এতটুকু প্রকাশ নেই। তবে গোপন করেন নি ঘটনাটাকে।

রত্নেশ্বরের ১৮৭৮ সালের ডায়রীখানা নিয়ে সুরেশ্বর পড়লে—"বাড়ী পৌঁছিয়া দেবেশ্বরকে দেখিলাম না। সকলকে প্রশ্ন করিলাম। কেহ উত্তর দিল না। নতমুখে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। আমার সন্দেহ হইল। এবার ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই শুনিলাম, এলিয়ট রোডে একখানি বাড়ী ভাড়া বা লিজ লইয়া সেখানেই দেবেশ্বর রাত্রিযাপন করে। গোপালও সেখানে থাকে। সুতরাং ভায়লেট! সে-ও সেখানে থাকে। বাড়ী ভাড়া করিবার সাধ্য গোপালের নাই। সুতরাং এ-কর্মের সকল দায় দেবেশ্বরের। তৎক্ষণাৎ আমি

গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলাম—ওসমান! গাড়ী লে আও জলদি! ওসমান! এবং বিক্ষুব্ধ অন্তর লইয়া সম্মুখের বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিলাম। গাড়ী আসিতেই তাহাতে আরোহণ করিয়া বলিলাম—ওসমান! ওসমান সেলাম করিয়া কহিল—জী হুজুর।—

—কিসকা নিমক তুম খাতে হো? হামারা?

—জরুর! হামারা বাপ আপনা বাপকে নিমক খায়া, হাম আপকে নিমক খাতা।

—হাঁ। নিমকহারাম যো হোতা হ্যায়—উসকা পর খুদা নারাজ হোতা হ্যায়, জিন্দীগি বরবাদ যাতা হ্যায়। কেয়া, বাত ঠিক হ্যায় কি, নহি?—

—হাঁ হুজুর, ঠিক হ্যায়!

—বাস, চলো, মুঝে, মেরা লড়কা তুমলোগোঁ কা বড়াবাবু, সামকো যাঁহা যাতা হ্যায়, হুঁয়া লে চলো। আউর কোই আদমী উনকা হুঁয়া খবর না দে।—চলো!

এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা অধিকাংশ ফিরিঙ্গীপাড়ার বাড়ীর মত একলাই ছিল, কিন্তু দোতলায় একখানা প্রশস্ত ঘর দেবেশ্বর নিজে করে নিয়েছিলেন। হাজার হলেও জমিদারের ছেলে, নিতান্ত একতলায় খুব একটা সুলভ-প্রাপ্যতার মধ্যে থাকতে তাঁর মন চাইত না। নিচে একখানা ঘরে থাকত গোপালদা। একখানা ঘরে থাকত ভায়লেটের সঙ্গে এসেছিল যে গোয়ানীজ মেয়েটি সে; আর বাকিগুলোর কোনটা ছিল বিলিতী কায়দায় ড্রইংরুম, কোনটায় করছিলেন লাইব্রেরী, সেখানে মাস্টার এসে ভায়লেটকে পড়াতো, লেডী করে তুলত।

রত্নেশ্বরের গাড়ী গিয়ে বাড়ীটার সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি ফটকটা খুলে থমকে দাঁড়ালেন। অতর্কিতে ঢুকলেন না।

ডাকলেন—বেশ উচ্চকণ্ঠেই ডাকলেন—দেবেশ্বর!

উপরে হাসির শব্দ উঠছিল, বন্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বাড়ীখানা যেন ভয়ার্ত হয়ে গেছে। আবার রত্নেশ্বর ডাকলেন—দেবেশ্বর! এবং এবার গিয়ে সামনের দরজায় ধাক্কা দিলেন।

—দরজা খোল দেবেশ্বর!

উত্তর একটা এল। কিন্তু কথায় নয়। বন্দুকের শব্দে। একটা বন্দুকের শব্দ উঠল দোতলায়।

রত্নেশ্বর চমকে উঠলেন। ডাকলেন—ওসমান! ভাঙো, দরজা ভাঙো।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ওসমানকেই বললেন—ওসমান, কোথায় দেবেশ্বর?

উপর থেকে তখন কাতর আর্ত চীৎকারে বুক ফাটিয়ে ভায়লেট ডাকছে—রাজাবাবু—আমার রাজাবাবু—

উপরের ঘরে এসে দরজার মুখে দাঁড়ালেন রত্নেশ্বর রায়। দেখলেন—দেবেশ্বর চিৎ হয়ে

পড়ে আছে, রক্তের মধ্যে যেন ভাসছে। তার বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কাঁদছে ভায়লেট—রাজাবাবু— My darling—রাজাবাবু—My prince—রাজাবাবু।—

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেবেশ্বর জানত, বাপ আসবেন দিনে। কিন্তু গাড়ী হাওড়া থেকে দিনেরবেলা ফিরে এসেছিল। বাপ আসেননি, চুঁচড়ো গেছেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে—এই খবর পেয়েই দেবেশ্বর দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিল এলিয়ট রোডের বাড়ী; সারাদিনরাত আজ ভায়লেটকে নিয়ে আনন্দ করবে। ভোর ভোর বাড়ী ফিরে এসে ভাল ছেলে সাজবে।

ভাল ছেলে সাজবার ইচ্ছে তার ছিল না। মিথ্যে কথায় তার শুধু অরুচিই ছিল না, ঘেন্না করত সে মিথ্যে কথা বলতে। সে কতবার বলেছে—মিথ্যে কথা বললে নিজের কাছে নিজের মান যায় রাঙাপিসী। যুধিষ্ঠির নাকি ধর্মপুত্র, তার মা কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজের ঔরসে তার জন্ম, সে সত্য গোপন ছিল না, তাই তাতে পাপ ছিল না; নিজে যুধিষ্ঠির সত্যবাদী ছিলেন বলে তাঁর রথ চলত বাতাসের উপর দিয়ে, মাটি থেকে কিছুটা ওপরে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গুরু দ্রোণকে বধ করবার জন্য তাঁকে দিয়ে বলাতে হল অশ্বত্থামা মরেছে। মরেছিল অশ্বত্থামা হাতী। কৃষ্ণ বললে—'হাতী' কথাটা বলে দরকার কি? বল অশ্বত্থামা মরেছে, তাতেই দ্রোণ শোকার্ত হবে। দুর্বল হবে। যুধিষ্ঠির বললেন—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। ইতি গজ বাক্যটি আস্তে বলেছিলেন বলে গোটা কথাটাই মিথ্যের সামিল হল। রথখানা তাঁর চিরদিনের জন্য মাটিতে নামল। কিন্তু বাবাকে এমন ভয় করে যে, সব গোলমাল হয়ে যায়। বাবার সকল কাজ আমার ভাল লাগে না। মনে হয়, বাবার মত নিষ্ঠুর অহঙ্কারী স্বার্থপর মানুষ আর নেই।

ওই ভয় করে এবং গোলমাল হয়ে যায় বলেই সে ভায়লেটকে বিয়ে করে কৃশ্চান হবে এবং ব্যবসা করে বড় হবে সংকল্প করে আমাকে চিঠি লিখেছিল টাকার জন্য। নিজের আংটি-বোতাম, হীরে-নীলা বেচে যে-টাকা পেয়েছিল, সে-টাকাটায় বাড়ী কিনে আর সারিয়ে খরচ করে ফেলে আপসোস হয়েছিল। এত খরচ না করলেই হত। কিন্তু যে দেবেশ্বর কীর্তিহাটের রায়দের উন্নতির চরম সময়ে জন্মেছে এবং রাজা-রাজড়ার ছেলেদের মত মানুষ হয়েছে, সে প্রথম প্রেম করে যে-ঘর বাঁধবে, তাতে টাকা খরচ না করে পারে! পারেনি। খরচ করেছিল। এবং খরচ করে তখন ব্যস্ত হয়েছিল টাকার জন্য, টাকা নিয়ে সে ব্যবসা করবে। ব্যবসা সে জানত না কিন্তু সাহস তার ছিল।

যাক ওসব কথা, সে আমল বোঝা কঠিন তোদের পক্ষে। তখন ছড়া ছিল—হটুমালার দেশের ছড়া।—হীরে-পোড়ানো মাজনে দাঁত ঘষত, মুক্তো-পোড়ানো চুনে পান খেতো; দুধে তারা আঁচাতো। হীরের মাজনটা অতিরঞ্জন কিন্তু বাকিগুলো সব সত্যি। রায়বাড়ীতে জামাই হোক আর বউ হোক—প্রথম খেতো সোনার থালায়। আর আঁচাবার সময় গাড়ুতে যে জল দেওয়া হত, তাতে অর্ধেকটা দুধ মেশানো থাকত। এই অর্চনার বিয়েতে রথীনকে আঁচাতে জল

দেওয়া হয়েছিল, তাতেও দু-ঝিনুক দুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রায়বাড়ীর সে-সম্পদ কল্পনা করতে পারবিনে রে। আমার বিয়ে হয়েছিল দশ পার হয়ে এগার বছরে। তখন কীর্তিহাটের লক্ষ্মীর ঘরে বড় বড় লোহার সিন্দুক মেঝেতে গাঁথা ছিল। সেগুলো ভর্তি ছিল টাকা-সোনাদানায়। তাছাড়া কলকাতার ব্যাঙ্কে ছিল। কোম্পানীর কাগজে ছিল। বউবাজারের বড়ালদের একচেটে ছিল কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার ব্যবসা; রায়বাড়ীর জন্মে বছর বছর কোম্পানীর কাগজ আলাদা করে রেখে দিত তারা। তারা জানতই যে, এ-কাগজ তারা কিনবে।

সেই বংশের বড় ছেলে, কলকাতার সেকালের সমাজে বড় হচ্ছে, মেলামেশা করছে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে একটা সে-কালের আগুন ছিল রে। ভায়লেটের সঙ্গে প্রেম করে সে দুঃখিত হয়নি, লজ্জিত হয়নি, হয়তো সেদিন এমন হঠাৎ রাত্রিকালে তার বাঘের মত বাবা যদি না হাজির হতেন, তবে সে হয়তো ভেবেচিন্তে একটা বোঝা-পড়া করতে চেষ্টা করত। কিন্তু সে প্রত্যাশা করেনি যে, তার বাবা রত্নেশ্বর রায় এসে এমনভাবে নিজে হাজির হবেন। বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠেছিল, ভায়লেট হাসছিল খিলখিল করে, সে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বলেছিল—চু-প!

ভায়লেট তার দিকে তাকিয়েছিল সভয় বিস্ময়ে। কি হল?

ঠিক সেই মুহূর্তে গোপালদা ছুটে এসে বলেছিল—রাজাভাই, সর্বনাশ হয়েছে। কর্তাবাবু!

আবার ডাক ভেসে এসেছিল—দেবেশ্বর!

এবার গোপাল দুড়দুড় করে নেমে পালাবার সময় বলেছিল—পালিয়ে এস খিড়কীর দরজা দিয়ে।

—ওই মেথর ঢোকে যেদিক দিয়ে?

—নইলে আর পথ নেই।

—তুই যা। তুই পালা। ওই পথ দিয়ে আমি পালাতে পারব না।

—তাহলে? কি করবে?

—আমার যা হয় হবে। তোকে ভাবতে হবে না।

—ভায়লা—?

ভায়লেট উত্তর দেয়নি, দেবেশ্বরকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। দেবেশ্বর বলেছিলেন—আমি বাঁচলে ও বাঁচবে। আমি যদি মরি, তবে যা হয় হবে। ওদিকে তখন নীচে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়ছে। ভেঙে ফেলবে দরজা।

দেবেশ্বরেরও চারিদিক বন্ধ, রত্নেশ্বরের হুকুম শুনতে পাচ্ছেন তিনি—ভেঙে ফেল। তোড় দো। ওদিকের দরজা আটক কর। কোনদিকে পরিত্রাণের কোন পথ নবীন দেবেশ্বরের চোখে পড়েনি, শুধু পড়েছিল বন্দুকটা। একনলা ব্রিজ লোডিং গান্ একটা—দেবেশ্বর নিজের

জন্য লাইসেন্স করিয়ে কিনেছিলেন ; সেই বন্দুকটাও ওই বাড়ীতেই তিনি রেখেছিলেন। কোন বিপদের ভয় করে রেখেছিলেন—এটা ঠিক নয়, তবে দেবেশ্বর রায় যে-বাড়ীতে তাঁর,প্রথম প্রিয়াকে নিয়ে বাস করবেন, সে-বাড়ীর দরজায় সঙ্গীনধারী পাহারাদার থাকবে না এটা তাঁর ঠিক ভাল লাগেনি। তিনি সংগীনওলা বন্দুক এবং তার সঙ্গে পাহারাদারের লাইসেন্সের চেষ্টা করছিলেন গোপনে। সেটা না-হওয়া পর্যন্ত নিজের অতিপ্রিয় এই একনলা বন্দুকটিকে ভায়লেটের শোবার ঘরের কোণে খাড়া করে রেখেছিলেন।

গোপাল ঘোষ চলে যেতেই দেবেশ্বর একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখে দেখতে পেয়েছিলেন এই বন্দুকটাকে। তিনি ছুটে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাতে টোটা পুরে শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর চিঠিতে আছে—"আত্মহত্যা করিবার জন্য সেদিন বন্দুক আমি তুলি নাই। অপমানের হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই বন্দুকে টোটা পুরিয়া আমি নিচে নামিয়া যাইতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল—যে বেতনভোগী ভৃত্যদিগের পাশবিক বলের উপর নির্ভর করিয়া আপনি আমার বাড়ীতে আমাকে অপমান করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত আমি বুঝাপড়া করিব। আমার দারোয়ান নাই, আপনার আছে, আমি একনলা বন্দুক হাতেই তাহাদিগকে ঠেকাইয়া বলিব—চলিয়া যাও। কিন্তু ভায়লা ভয় খাইল। সে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—আমার রাজাবাবু, না-না-না, এমন তুমি করিও না। না। তাহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে কি করিব ? তুই বল—কি করিব ? সে উত্তর দিতে পারে নাই। আমার একটা কথা মনে হইল, বলিলাম—তবে আয় আমরা দুইজনেই মরি। আমি তোকে গুলি করিয়া মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিব কিন্তু সে তাহাতে আরও ভয় পাইয়াছিল। তখন আমার আর আপসোসের সীমা ছিল না। এ কাহাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করিয়াছি ? এখন মনের মধ্যে আগুন আরও প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম—বেশ, তবে তুই থাক। আমিই মরিব। ইহার পর আর বাবার সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা থুত্‌নীর নিচে লাগাইয়া বাঁট্‌টা মাটিতে রাখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু দেখিলাম বন্দুকটা আমার থুত্‌নী অপেক্ষা ছোট ; ওদিকে দরজাটা ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্দুকের নলটাকে বুকে লাগাইয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টিপিয়া দিলাম। তাহার পর আর জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আজ আবার বাঁচিয়া উঠিয়া মনে হইতেছে—গলায় লাগাইলাম না কেন! তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিয়া আপনি জন্মদাতা পিতা আপনার সহিত পত্রে এই ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে হইত না। আপনি আমাকে একরূপ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ভায়লেটের কি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আপনি কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানাইবার জন্য আপনার নিকট মিনতি করিতেছি। গোপালদাদা কোথায় ? তাহার কি করিলেন ? আপনি এইসব সংবাদ আমাকে জ্ঞাত করুন। অন্যথায় আমি আর মরিবার চেষ্টা করিব না। এবার আমি

বিদ্রোহ করিব। এই ব'টী হইতে বাহির হইয়া গিয়া কৃশ্চান মিশনারীদের শরণাপন্ন হইব। সেখান হইতে রক্ষা করিতে আপনি আমাকে পারিবেন না।"

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা-মা বললেন—চিঠিখানা পুরো এক মাস এক সপ্তাহ পর, যেদিন ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলে সাহেব ডাক্তার—সেইদিন সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিঠিখানা লিখছিল, আমি ঘরে ঢুকলাম। বললাম—এ কি! সকালে ব্যাণ্ডেজ কেটেছে বিকেলে চিঠি লিখছিস। কাকে চিঠি লিখছিস দেবু?

আমরা কাশী থেকে এসেছিলাম সেই ঘটনা যেদিন ঘটে, সেইদিন, রাত্রে খবর পেয়ে জোড়াসাঁকোর জেঠামশাইয়ের বাড়ী থেকে জানবাজারের বাড়ীতে এসেছিলাম। সাহেব ডাক্তার দেখে বললে বটে—জখম এমন কিছু নয় রয়বাবু, শুধু বগলের নীচে খানিকটা মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে, সারতে বেশীদিন লাগবে না। তবুও যত্ন আর সাবধানতার অন্ত ছিল না। কীর্তিহাট থেকে সরস্বতীবউ এসেছিল; সেবার জন্যে তখন মেম-নার্স পাওয়া যেত, মেম-নার্স এসেছিল। একজন দেশী ডাক্তার চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ীতে থাকত। আমি কাশী চলে যেতে পারিনি। দেবুর ওই অবস্থায় যার জন্যে এসেছিলাম, একটা বিষয়ের মিটমাটের জন্যে তাও হয়নি, আর দেবুর জন্যে যে-মেয়েটির বিয়ের কথা পাকা করতে চেয়েছিলাম তাও হয়নি। আর আমি কাছে থাকলেই দেবু স্বস্তিতে থাকত, শান্তিতে থাকত। উঠে গেলেই চাকর-ঝি যাকে সামনে পেত বলত, রাঙাপিসীকে ডেকে দে।

আমার বদলে বউদি—সরস্বতী-বউ গেলে চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকত। কথা বলত না।

বউদি বিরক্ত হতেন। বেরিয়ে এসে আমাকে বলতেন—তুই যা অন্নপূর্ণা, আমাকে দেখে মুখ গোঁজ ক'রে চোখ বুঁজল।

আমি গিয়ে বসে ডাকতাম—দেবু! দেবু রে!

বোঁজা চোখ অমনি খুলে যেত, বলত—কোথা গিয়েছিলে?

—কেন? কি হল? শুয়ে ঘুমো না।

—তোমার পায়ে পড়ি রাঙাপিসী, তুমি খবর এনে দাও ভায়লেটের কি হল? সে কোথায়? আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না। He can do anything and everything.

—কি বলছিস?

—ঠিক বলছি। তোমার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে কি করছে দেখছ না? ন্যায়তঃ ধর্মতঃ সম্পত্তি তোমার। বীরেশ্বর রায়ের ঔরসে ভবানী দেবীর গর্ভে তুমি জন্মেছ; উনি সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র, তাকে বীরেশ্বর রায় সন্তান হবে না বলে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন এবং সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছিলেন বলে সে-সম্পত্তি তিনি তোমাকে দেবেন না। আমি গল্প শুনেছি—প্রথম

যৌবনে ওঁর বিয়েরও আগে ম্যাজিস্ট্রেট,পুলিস সাহেবকে কীর্তিহাটের বাড়ীতে ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন পাতবার জন্তে এনে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় নকল অসুখের ভান ক'রে দশ ক্রোশ দূরে রাধানগরে দে-সরকারদের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। গোপাল সিং নাম এক ছত্রি প্রজাকে এনে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করেছিলেন—

অন্নপূর্ণামা বললেন—কথাগুলো আমার কানেও কটু ঠেকছিল রে। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, না, তুই জানিসনে ঠিক। সে-সব আমার বাবার আমলের কথা, বীরেশ্বর রায়ের আমলের।

—তাও জানি। তাতেও আমার বাবা অংশীদার। তারপরের কথা তুমি জান না রাঙাপিসী। বিয়ে হয়েছে এগার বছর বয়সে, প্রথম কেটেছে তোমার কাশীতে বিমলাকান্ত ঠাকুর্দার কাছে; আমি এখানে কীর্তিহাটে কলকাতায় আছি, দিনরাত্রি শুনছি, দেশের ধন্যপুরুষ রত্নেশ্বর রায়ের সুনামের কথা, খ্যাতির কথা আর চোখে দেখছি তাঁর আসল চেহারা। আমার দাদামশায় Retired Subdivisional Officer—সিগার মুখে দিয়ে আসেন, তিনি উপদেশ দিয়ে যান, কি ভাবে কি করা উচিত। কিসে সুনাম হবে। I know them, I know them. আমি বলতে পারব না—এ case-এ তিনি কি পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু দিয়েছেন—তা নিশ্চিত। একটা অনাথা কৃশ্চান মেয়ে যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে কিছু করা কি অসম্ভব?

দেবুর কথাটা আমার খুব বাড়াবাড়ি মনে হত না সুরেশ্বর। সে-আমলে কি এমন কঠিন কাজ। রবিনসন সাহেবের মত একজন ইউরোপীয়ানের বাচ্চাকে খুন করাতে যারা পারে, তার জন্তে যারা আসর সাজিয়ে নেয়; থানার দারোগাদের টাকা ঢেলে দিয়ে মুখ বন্ধ করতে পারে, তাদের কাছে এটা কি একটা শক্ত কাজ?

আলফান্সো মরেছে, অঞ্জনা মরেছে, তার বেটী, সে রত্নেশ্বর রায়ের ছেলের মন ভুলিয়েছে, জাত-ধর্ম তার যৌবনে রূপের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে—সেখানে মেয়েটাকে—

আমি শিউরে উঠতাম। খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম অনেক—অনেককে দিয়ে, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড সুরেশ্বর, জানবাজারের চাকর-বাকর, মানুষজনের পেটের মধ্যে এই কথাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তারা স্মরণ করতে পারে না; ভায়লেট বলে কাউকে জানে না—নাম কখনও শোনেনি, এমনি তাদের চাউনি, এমনি তাদের মুখের ভাব।

যেন ঠোঁটদুটো সেলাই করে দিয়েছে।

সেদিন চিঠিখানা লিখছিল, লেখা প্রায় শেষ করে এনেছিল, সে চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—প'ড়ে দেখ!

প'ড়ে শিউরে উঠে বললাম—এই চিঠি তুই দাদাকে দিবি?

—না দিয়ে কি করব পিসী? আমার জন্তে যদি বাবা ভায়লেটকে কি গোপালদাকে

চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে হয়—।

থেমে গেল দেবেশ্বর। তারপর সামলে নিয়ে বললে—আবার আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এবার আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এবার আর ভুল হবে না।

ঠিক এই সময়ে সুরেশ্বর, হঠাৎ পাশের ঘরে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করার শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম, দেবেশ্বরের মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরী মুখের মত হয়ে গেল।

দাদার গলা। দাদা যে পাশের ঘরে কখন ঢুকেছিলেন, আমরা কেউ দেখিনি, আর বুঝতেও পারিনি।

* * *

সুরেশ্বর বলল—একটু পরিষ্কার করে বলি সুলতা, দোতলার মাঝখানে যে ঘরখানায় বাবার আমলে ড্রয়িংরুম ছিল, যে-ঘরখানায় আমার ছবির প্রথম এগজিবিশন হয়েছিল, যে ঘরখানায় বীরেশ্বর রায় থাকতেন তাঁর অসুখের সময়, সেই ঘরে রাখা হয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে আর তার পাশের যে-ঘরটা ওদিকে অন্দরের সঙ্গে যুক্ত, যে ঘরে আমার মা মারা গিছলেন, যে ঘরে ভবানী দেবী বসে পুজো করতেন, যে-ঘরে বসে রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়কে লেখা ভবানী দেবীর পত্র এবং তার পালক পিতার পত্র পড়ে আত্মপরিচয় জেনেছিলেন, জেনেছিলেন—জেনেছিলেন, তিনি বিমলাকান্তের এবং বিমলা দেবীর সন্তান নন—তিনি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর পুত্র, এ-ঘর সেই ঘর। ভবানী দেবীর পুজোর ঘরই জানবাজারের বাড়ীর লক্ষ্মীর ঘর। ঘরখানার নামই ছিল লক্ষ্মীর ঘর। ওঘরে দেওয়ালে এখনও লোহার সিন্দুক পোঁতা আছে। সে আমলে এই ঘরেই আরও কয়েকটা লোহার সিন্দুক ছিল, তাতে এখানকার লগ্নী-ব্যবসার কাগজপত্র, কোম্পানীর কাগজ থাকে থাকে সাজানো থাকত। রত্নেশ্বর রায় নতুন কোম্পানীর কাগজ কিনে সিন্দুকে তুলে রাখতে এসেছিলেন।

একশো বছর নয়, তবে পঁচাত্তর বছর আগে, এসব কাজ অর্থাৎ সিন্দুক খোলা, টাকা, সোনাদানা, মোহর, জহরত নাড়াচাড়া করার সময় লোকে অনেকটা সন্তর্পণেই করত। ব্যাঙ্ক তখন হয়েছে, তবুও মোহর কিনে কলসীবন্দী করে জমা করা আর কোম্পানীর কাগজ কিনে রাখার চলই ছিল বেশি।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা এখানকার নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসী দারোয়ানকে দরজায় রেখে অন্দরের দিকের দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিলেন। এবং কোম্পানীর কাগজ সিন্দুকে রেখে, সিন্দুক বন্ধ করার সময় এঘরে দেবু যে সব কথা আমাকে বলছিল, তা সব শুনেছিলেন। শুধু কিছুক্ষণ শুনেই নায়েবকে বলেছিলেন —তুমি নিচে যাও।

নায়েব নিচে নেমে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে দেবুর কথা শুনতে শুনতে আর সহ্য করতে পারেননি, শব্দ করে গলা ঝেড়ে একটা সাড়া দেওয়া অভ্যেস তাঁর ছিল, ঠিক সেই শব্দ করে সাড়া দিয়ে দারোয়ান বচ্চন সিংকে ডেকে বলেছিলেন—"বচ্চন, এই দরওয়াজাটা খোল

তো

ভারী দরজা, মোটা লোহার খিল, তার সঙ্গে হুক, খোলা সহজ নয়। বচ্চন সিং ছিল পালোয়ান, সে অল্পক্ষণেই খুলে ফেলে দরজাটা খুলে দিয়ে পাল্লাদুটা ঠেলে দিলে, আর দাদা বেরিয়ে এসে এ-ঘরে ঢুকলেন।

সুরেশ্বর, সে মূর্তি এখনও মনে পড়ছে আমার। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। হাতে লোহার সিন্দুকের চাবির থোলো, পা খালি। লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকেছিলেন বলে এই বেশ আর খালি পা। চোখ মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারা যায় না, শুধু রায়বংশের সোনার মত যে গায়ের রঙ, তাতে যেন খানিকটা সিন্দুর লেগেছে বলে মনে হল।

এসেই প্রথমে নার্সকে বললেন—তুমি একটু বাইরে যাবে ?

নার্স বাইরে যেতেই দাদা বললেন—যে-সব কথা তুমি বলেছিলে তোমার রাঙাপিসিকে, তা অন্তত এই নার্সটার সামনে বলা উচিত হয়নি। পিতৃনিন্দা সত্য হলেও করতে নেই। তবুও যদিই কর, তবে বাইরের লোকেদের সামনে করাটা ঠিক নয়।

আর লুকিয়ে কারুর কথা শোনা উচিতও নয়, সে অভ্যাসও আমার নেই, কিন্তু আজ অকস্মাৎ হয়ে গেল, শুনে ফেললাম ; সাড়া দিতে ভুলে গেলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবার মত ঠিক অবস্থা ছিল না আমার।

থাক্ সে কথা। এ আমার ভাগ্য। আমি রায়বংশের ধারাকে নির্মল করবার জন্যে, অভিশাপের ধারা থেকে বাঁচাবার জন্যে যে চেষ্টা করেছি সে মিথ্যে হয়ে গেছে। সে সব কথা থাক। এখন যা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছ তাই বলি। এ বাড়ীর কোন লোককে আমি বিশেষ কিছু জানতে দিইনি। ভায়লেটকে তুমি ভালবেসেছ, তাকে তুমি আমার চোখে ধুলো দিয়ে কীর্তিহাট থেকে নিয়ে এসে এখানে রেখেছিলে, সেখানে গুজব রটেছিল গোপালের নামে। আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। গোপাল যদি ঠাকুরদাসের ছেলে না হত, তবে তার ঘাড়ে মাথা থাকত না। ভায়লেট আলফান্সোর কন্যাই শুধু নয়, সে অঞ্জনার মেয়ে। অঞ্জনার কাছে তার মৃত্যুশয্যায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা চুপ করে গেলেন। দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দুটি ধারায়। কিছুক্ষণ পর অজগরের মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শোনো, ভায়লেটকে আমি খুন করাইনি, গোপালকে আমি কোন শাস্তি দিইনি। তবু রায়বংশের জাত আর মানটাকে আমাকে বাঁচাতে হবে, তাই অপবাদ গোপালের নামে রয়েছে—রয়েছে। তাকে আমি লোক পাঠিয়ে এইটুকু শুধু বলেছি যে, সে যেন কীর্তিহাট কি শ্যামনগর আর না যায়। তাকে বলেছি, আমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব, সে এখানে ব্যবসা করুক, বিয়ে করুক। আরও টাকার প্রয়োজন হয় তাকে আমি দেব। সে ঠাকুরদাসের ছেলে, সে তোমার অপরাধ রায়বংশের কলঙ্ক মাথায় নিয়েছে। তার অঙ্গ কেউ স্পর্শ

করতে পারবে না। তবে তোমার সঙ্গে আর তার সম্পর্ক থাকবে না।

আর ভায়লেট। ভায়লেট অন্তর্বত্নী—।

বুঝতে পারলে না? অন্তর্বত্নীর অর্থ? অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান হবে তার। তাকে এক মিশনের নিরাপদ আশ্রয়ে আমি রেখেছি। তার যাবতীয় খরচ আমি বহন করব। তোমার বাপকে তুমি বিশ্বাস কর। অন্ততঃ এই কথাটা বিশ্বাস কর। তবে—।

একটু থেকে গম্ভীর গলা আরও গম্ভীর করে তুলে বললেন—তবে তোমার বিবাহ দেব আমি দু-এক মাসের মধ্যেই। বিবাহ তোমাকে করতেই হবে। তার জন্ম তুমি প্রস্তুত থেকো।

বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। খিল—হুক বন্ধ হল একে একে।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—সুরেশ্বর, তোকে বলব কি, আমরা—মানে আমি আর দেবু দু'জনেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ক'টা কথা রে, তার যে কি ভার আর ওই যে আস্তে গলায় বলা, তার শব্দ যেন আমাদের শুধু বোবা না, কালা সুদ্ধ করে দিলে।

দরজাটা বন্ধ হতে হতে আবার খুলল, আবার। দাদা বললেন—ভায়লেটকে আমি নিরাপদে রেখেছি, তার সন্তান হলে তার ভারও আমি বয়ে যাব। তোমার পাপ—আমি ক্ষমা কোন-মতেই করতাম না; করলাম তার কারণ এ-পাপ তোমার নয়, এ-পাপ রায়বংশে জন্মেছ বলে তার ভাগী হতে বাধ্য হয়েছ; রায়বাড়ীর আশেপাশে সে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে বেড়িয়েছে। দরজা খোলো—দরজা খোলো। কিন্তু আমি সারাজীবন জেগে থেকে ঢুকতে দিইনি। তুমি জানতে না—অসতর্ক মুহূর্তে সে তোমাকে আশ্রয় চেয়েছে, তুমি ধনীর ছেলে মানীর ছেলে ভূস্বামীর ছেলে, তাকে আশ্রয় দিয়েছ। দিয়ে ফেলেছ। জানতে না। শ্যামাকান্তের অপরাধ—যোগভ্রষ্টতার শাস্তি, সোমেশ্বর রায়ের—বীরেশ্বর রায়ের ধারা আমি রুখতে গিয়েও পারলাম না। অঞ্জনার রূপ ধরে বাড়ী এসে ঢুকেছিল বুঝতে পারিনি।

বলেই চুপ করে গেলেন। দরদর করে চোখ থেকে জল গড়াল। একফোঁটা দু'ফোঁটা নয় রে—ধারা বয়ে গেল। এরই মধ্যে কখন যে সরস্বতী-বউ এসে ঘরে ঢুকেছিলেন, আমরা কেউ জানতে পারিনি; তিনি দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দা আগলে; পাছে সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ এসব কথা শুনে ফেলে।

হঠাৎ দরজাটা বন্ধ করে তিনি যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন আমাদের খেয়াল হল। তিনি এসে স্বামীর হাত ধরে বললেন—করছ কি? এসব হচ্ছে কি বল তো? যা হয়েছে তা হয়েছে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে ছেলেটা বেঁচেছে। বাবা এসেছিলেন, তিনি ফিরে চলে গেলেন, বলে গেলেন—ওবেলা আসবেন। এর মধ্যে আসতে চাইলেন না। বললেন—জমিদারবাড়ীতে রাজাদের বাড়ীতে যে সব কাণ্ড ঘটে, তার তুলনায় এটা আর কি এমন একটা ব্যাপার।—শুধু তোমার জন্তে বললেন—এতখানি কড়াকড়ি ভাল নয়; ও একটু কড়া বেশী।

ছেলেটা এত ভয় পেয়েছিল যে সুইসাইড করতে গেছল। চল—মুখ-হাত ধুয়ে সরবৎ খাবে চল।

দাদা যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সরস্বতী-বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন—ওই লক্ষীর ঘরের ভিতর দিয়েই। দরজা বন্ধ করলেন। এদিক থেকে দারোয়ান এসে ঠেলে দেখলে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

আমি দাদার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম। চোখ মুছে দেবুর মুখের দিকে তাকালাম। —অবাক হয়ে গেলাম সুরেশ্বর। দেখলাম—দেবেশ্বর গুম হয়ে যেন বসে আছে। দাদার মত এমন একজন কড়া মানুষ, যার মুখের দিকে প্রজারা তাকাতে পারত না। তার চোখের জল তাকে যেন এতটুকু ভেজাতে পারেনি। কালা-বোবা সে আমারই মত হয়েছিল কিন্তু সে আমার মত গলেনি।

আমি তাকে ডাকলাম—দেবু!

সে নড়লে না, যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল, যেদিকে তাকিয়েছিল সেইদিকেই তেমনিভাবে তাকিয়ে রইল—শুধু বললে—বল রাঙাপিসী!

তার সেদিনের সেই লেখা চিঠিখানা টেনে নিলাম, সে আপত্তি করলে না; বললাম—এটা ছিঁড়ে দে। ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি লেখ।

—না।

—না? অবাক হয়ে গেলাম আমি।

—না।

—এরকম চিঠি তুই লিখতে পারবিনে।

—তা লিখব না। যা উত্তর চাচ্ছিলাম—তা পেয়ে গেছি। ভায়লেটকে উনি যখন ভাল জায়গায় রেখেছেন, বলেছেন—আর গোপালদার সম্বন্ধে যা করব বলেছেন, তাতে আমি অবিশ্বাস করব না। তা উনি করবেন। অন্ততঃ লোক দেখিয়েও করবেন। কিন্তু ক্ষমা আমি চাইব না।

আমি চুপ করে রইলাম। দেবু বললে—শুনেছ? এই অবস্থার মধ্যেও বাবা আমার কনে ঠিক করেছে? একটি দশ বছরের খুকী।

—তুই কি বিশ-তিরিশ বছরের বুড়ো? তোর কনে দশ বছরের ছাড়া ক' বছরের হবে? ও-মেয়েকে আমি জানি।

—জান? মেয়েটি ভাল তো? মানে, সইতে পারবে তো আমার মত মানুষকে?

—কেন রে? তুই এমন মন্দ মানুষ কি মস্ত মানুষ এ-কথা তোকে বললে কে?

—নিজেই বলছি। আমাকে বিয়ে যে করবে, সে হয় আমার ভালবাসায় জলে মরবে

রাঙাপিসী, আমার ভালবাসার উত্তাপ আগুনের মত। নইলে আমার অবহেলায় ফেলে দেওয়া অপছন্দের পোশাকের মত এককোণে পড়ে থাকবে। ধুলোয় পোকা-মাকড়ে ভরে যাবে।

সুরেশ্বর, আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দেবু, এরকম কথাবার্তা তোর হল কি করে রে? কি করে শিখলি?

—তা জানিনে পিসী, তবে শিখেছি। আপনি কথাবার্তা আসে। ভেতর থেকে যেন কে যুগিয়ে দেয়। সে-কথা থাক। যা বলছি শোন, তুমি বিয়ের সম্বন্ধ করেছ বিয়ে আমি করব। ভালও তাকে বাসতে চেষ্টা করব। ভায়লেটের উপর আমার আকর্ষণ আর নেই। সেদিন ওকে বলেছিলাম—তুই দাঁড়া, তোকে গুলী করি, তারপর নিজে গুলী খেয়ে আত্মহত্যা করব। দুজনে একসঙ্গে মরব দুঃখ থাকবে না। তা দেখলাম—কি ভয়! একসঙ্গে মরতে যে ভয় করে, তার ভালবাসার আবার দাম কি? কানাকড়িও না। হিঁদুর মেয়ে তবু বাধ্য হয়ে বিধবা হয়ে স্বামীর বদলে ঈশ্বর ভজে বাঁচে। কোন মানুষকে আর বিয়ে করে না। এ তো কৃশ্চান, আমি বেঁচেছি তাই, মরলে তো আর কাউকে বিয়ে করে দিব্যি গাধাবোটের মত অন্য স্টীমারের টানে ভেসে চলত। নাঃ—ওকে আর আমার চাইনে—ওকে আমি আর কোনদিন ফিরে দেখব না। হিন্দু মেয়েই ভাল। কিন্তু বাবাকে তুমি বল আমার ভিক্ষেমায়ের সম্পত্তি দেবোত্তর, আমাকে লিখে দিতে। আমি আলাদা হয়ে যাব। বাবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে হলে আবার আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা-মা এখানেই নিজে মুখে কথা বলা শেষ করেছিলেন। তার কারণ বন্ধ দরজায় টোকা পড়েছিল, টোকা নয়, মৃদু ধাক্কা; আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এসেছিল—আমি রথীন!

অর্চনা মুখ নত করেছিল লজ্জায়; আমি একটু হেসেছিলাম; অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—যা, দোর খুলে দে। বাপ রে বাপ—মালিক এসেছে, ওঠ ওঠ! অর্চনা গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই একরাশ ওষুধের গন্ধ ছড়িয়ে রথীন ঢুকল। হাতে একখানা খাম। হেসে বললে—ক'টা বাজছে ঠিক আছে মা-মণি? নিজের পিতৃবংশের গল্প বলতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে ফেললে যে। আর তো দেখি ক' মিনিট বাকি। ডাক্তার হিসেবে বলতে পারি, রাত বারোটার পর যে একটা বাজে, সেটা সচরাচর কেউ শুনতে পায় না। জন্মান্তর স্মৃতি কারুর থাকে না। তোমার বয়স পঁচাত্তর পার হয়েছে। তবু তুমিই হলে এ-বংশের সব। তোমার উপর কথা বলবার ক্ষমতা তোমার নাতিদের নেই। পুত্রবধূর নেই। অর্চনাকে মা বল, সে-হিসেবে বাবাত্ব দাবী করে বলছি, ঘুমিয়ে পড়, আর না।—

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—হেসেই বললেন—ওরে, আমার বাবা হওয়া সোজা কথা নয় রে! আমার বাবা ছিলেন সত্যি করে রাজা। বুঝলি—তাঁর জীবনে কলঙ্ক অনেক, মদ খেতেন, তারপর বাঈজী ছিল কিন্তু সে-সব আমার মাকে না-পেয়ে। বুঝলি। অর্চনা-মাকে সেইভাবে

আদর করলে বাবা বলব, নইলে না। উঃ—কি এত ওষুদের ঝাঁঝালো গন্ধ রে গায়ে।

—ইথার, স্পিরিট, লাইজল গন্ধওলা ওষুদের কি আর শেষ আছে। এক্ষুনি তো হাত ধুচ্ছিলাম স্পিরিট-লাইজল দিয়ে। ওটা আমার বাতিক। তুমি কিন্তু এখন শোও। এখন—সুরেশ্বরদা, তোমার নামে টেলিগ্রাম এসেছে, জানবাজারের বাড়ী থেকে নিয়ে তোমার রঘুয়া এসেছে। তাই জন্যে আমাকে আসতে হল। নাহলে—

—টেলিগ্রাম ?—

—হ্যাঁ, মেদিনীপুর থেকে। আমি খুলেছি—। কে একজন সুধাকর টেলিগ্রাম করেছেন—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেন is considering the case of your mejdidi—come sharp.—

* * *

অন্নপূর্ণা-মার সঙ্গে সেই শেষ দেখা আমার। উনি আমার হাতে রেশমী কাপড়ে বাঁধা পুরানো চিঠির বাণ্ডিল একটা দিলেন, বললেন—নিয়ে রাখ, এর মধ্যে সব কথা পাবি। আমার দেবুর কথা। শুনেছি যখন সে মারা যায়, তখন বিকারের ঘোরে কেবলি আমাকে ডেকেছিল রাঙাপিসী রাঙাপিসী, বাবা ভায়লেটকে নর্দমার জলে ডুবিয়ে মেরে দিলেন। ছি-ছি রাঙা-পিসী। তুমি ভুলতে পার ? রাঙাপিসী! এর অর্থ অনেক। সে অনেক কথা। তা ওই কাগজের ব্যণ্ডিলের মধ্যে ছিল। দেবেশ্বর রায়ের রাঙাপিসী অন্নপূর্ণা দেবী সযত্নে সব বাণ্ডিল বেঁধে রেখেছিলেন। হয়তো আমার জন্যই রেখেছিলেন। কারণ, সেই রাত্রে ওই বাণ্ডিল হাতে হরিশ মুখার্জি রোড থেকে জানবাজার ফিরে এসে পরের দিন সকালেই আমি মেদিনীপুর রওনা হয়ে গেলাম মেজদির জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেন এসে মেদিনীপুরে ঝড়ো হাওয়ার মোড় ফিরিয়েছেন। ওখানকার অবস্থা সহজ করে এনেছেন মেলামেশার মধ্য দিয়ে, কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে।

মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর হল' তৈরী হচ্ছে। জেলার বড় বড় জমিদার, রাজা উপাধিকারী জমিদার মেদিনীপুরে অনেক, নাড়াজোল ঝাড়গ্রাম, কীর্তিহাটের পাশে গর্গ বাহাদুরেরা, রামগড়ের রাজা—সে একটা লম্বা ফর্দ হয়। তাছাড়া রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, জমিদারও আছে। পত্তনী মেজাজের শাসনতন্ত্রের মধ্যে টাকা আদায় সোজা ব্যাপার। টাকা অনেক উঠেছে।

ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের দুর্দিন এসেছে, তার এম্পায়ারের শ্রেষ্ঠ ভূখণ্ডে ; বিরাট মহীরুহের শিকড়ে টান ধরেছে, কট কট করে কাটছে ; সঙ্গে সঙ্গে মহীরুহটির প্রশাখা এই জমিদারী-গুলোই আগে শুকিয়ে আসছে ; তবু যা আছে, দু-চার-দশটা কাঁচা পাতা, ডালের মধ্যে রস, তাই তখন আদায় করে বা সম্বল করে বাঁচতে চাচ্ছে। মানুষকে ভোলাতে হবে। মানুষ আর সহজে ভুলবে না। তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতির উপর সৌধ গড়ে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা।

জমিদারেরা সঞ্চিত টাকা থেকে দিচ্ছেন। ধার করেও দিচ্ছেন। না-দিয়ে উপায় কি? যারা দেশের মানুষ, যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়ছে, তারাই জমিদারের প্রজা। জমিদারীর বিপক্ষে ফতোয়া বেরিয়ে গেছে। কীর্তিহাটের জমিদারীতে আমি যখ হয়ে আছি। টাকা আমিও দিয়েছি।

সমারোহ করে কাজকর্ম হচ্ছে। ওখানকার উকিলদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী, তাঁরা একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এসেছেন। ওদিকে মার খেয়ে ক্লান্ত মেদিনীপুরের যৌবনশক্তি গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে ১৯৪২ সালের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে, তিনি আসবেন বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলের ওপনিংয়ের জন্তে। কলকাতায় সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

এরই মধ্যে মেদিনীপুর এসে সুধাকর বাবু উকিলের মারফৎ পিটিশন দিয়ে মিস্টার সেনের সঙ্গে ইণ্টারভ্যু চাইলাম। পেলাম ইণ্টারভ্যু, মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—ও কেসটার জন্তে অলরেডি আমি রেকমেণ্ড করে লিখেছি। আশা করছি দিন-দশেকের মধ্যেই একটা উত্তর পাব। মনে হয়, ওঁকে ছেড়েই দেওয়া হবে।

মিস্টার সেনের কাছে আশ্বাস পেয়ে কীর্তিহাট ফিরলাম। আমার জীবনের সব গ্রন্থি সব জট যেন খুলে গেল বলে মনে হল। অর্চনার বিয়ে হয়ে গেছে। তবে—। তবে ফেরবার দিন অর্থাৎ টেলিগ্রাম নিয়ে রথীন যখন অন্নপূর্ণা-মার ঘরে ঢুকল, তখন তার গায়ে ওষুধের তীব্র গন্ধে আমার মনটা কেমন খারাপ হয়েছিল সুলতা।

আমি যে মদ খাই। অনেকদিন খাচ্ছি। খেয়ালী মানুষ, কখনও ছেড়ে দি, খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করি, আবার কখনও প্রতিজ্ঞা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ধরি। আমার বাধাবন্ধ নেই। গুরুজন নেই, লজ্জা-সংকোচও নেই। কিন্তু যাদের বাধাবন্ধ আছে, তাদের জানি। তাদের দেখেছি, তাদের চিনি।

১৯৩৭ সাল পার হয়ে ৩৮ সালের কাল চলছে, আমাদের জীবন পাল্টাচ্ছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি সব দিক থেকে। ১৯৩০ সালের 'মাস' মুভমেণ্টের পর যে এবার কোন মুভমেণ্ট আসছে তা কেউ জানে না, তবে সেটা যে ১৯৩০ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না এটা নিশ্চিত। তবে সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কুইট ইণ্ডিয়া, আজাদ হিন্দ, তার সঙ্গে পিপলস ওয়ারের কল্পনা কেউ ভাবতে পারে না। বড়জোর ভাবে, আর একটা রিফর্ম। শুধু মুসলিম লীগকে রাজী করতে পারলেই হয়। নতুন কালের মানুষেরা স্পষ্ট বলছে—পুরনো কিছু চলবে না। তার সঙ্গে রথীনের মদ খাওয়ার সামঞ্জস্য আছে। তবু মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম অন্নপূর্ণা-মার জন্তে। তিনি বেঁচে থাকতেই এই হল। তা হোক, উনি আর ক'দিন।—এই বলে সান্ত্বনা নিতে গিয়েও নিতে পারিনি। দুঃখ হয়েছিল অর্চনার জন্তে। মেয়েটা বড় ভাল মেয়ে। অন্নপূর্ণা-মার মেজদির কথা রায়বাড়ীর প্রবাদে আমার

বিশ্বাস নেই। ভবানী দেবী অর্চনা হয়ে ফিরে আসেননি। সায়েন্স অব হেরিডিটি আছে। চেহারার এমন মিল বিচিত্রভাবে একবংশে দেখা যায়। চরিত্রেও মিল হয়। অর্চনার সঙ্গে ভবানী দেবীর চেহারা চরিত্রের ঠিক সেই মিল। মেয়েটা অন্যায় কিছু সহ্য করতে পারবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদ থাকে—অর্চনারও আছে। রথীনের মদ খাওয়া কি ও সহ্য করতে পারবে? ভেবেছিলাম—ওকে ডেকে বলে দেব, সহ্য করে নিস অর্চনা। ও ডাক্তার মানুষ। একালের ডাক্তার। ১৯৩৮ সালের। দেখ, এককালে বীরেশ্বর রায়ের আমলে প্রবাদ ছিল রায়বাড়ীর ইটগুলো মদে ভিজিয়ে তৈরী করে পোড়ানো হয়েছিল। কীর্তিহাটের মাটি মদ খায়। সে গোটা বাংলা দেশেই। তারপর আবার মোড় ফিরেছিল। তারপর ফের আবার মোড় ফিরেছে রে। তোরা মাথার ঘোমটা টেনে নামিয়ে শুধু স্বাধীন জেনানা হতেই চাচ্ছিসনে, স্বাধীনতা আনবার জন্যে বোমা পিস্তল নিয়েও কারবার শুরু করেছিস। আমি বড়লোকের বাড়ীর পার্টির খবর জানি, মেয়েরা এখন হেল্‌থড্রিংকও করছেন। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামাসনে ভাই। লোকটাকে যদি ভালবেসে ফেরাতে পারিস তো ফেরা। নইলে মেনে নে। মনে হয়েছিল মানাতে পারবে অর্চনা।

এরপর জট মেজদিদি। তার জটও খুলে দিচ্ছেন বিধাতা। অথবা ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে আপনি খুলছে। মেজদিকে কীর্তিহাটের দেবসেবার ভার দিয়ে আমি ছুটি নেব।

ছুটি মানে কীর্তিহাট থেকে ছুটি, রায়বংশের গ্রন্থি খুলে ছুটি। চলে যাব, ঘুরে বেড়াব পৃথিবীময়, টাকা আছে আমার। ঘুরে বেড়াব। দুনিয়াময়। এবং একদিন কোথাও কোনও বিদেশে বা স্বদেশে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকব, একদিন চোখ বুঁজব। এবং এইসব কাহিনী লিখে যে সব ছবিগুলো তখন পর্যন্ত এঁকেছিলাম, সেগুলো তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে এ্যাটর্ণী সলিসিটারকে দিয়ে যাব। আমার ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায় তাঁর ছোট ছেলে অর্থাৎ আমার বাবাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়তে চেয়েছিলেন। আমার বাবা অর্ধেকটা হয়েছিলেন তাঁর মনের মত, অর্ধেকটা হয়েছিলেন তাঁর মত। তাঁকেও আমার ঠাকুরদা বলে গিয়েছিলেন।

Don't marry,—my boy—একটি স্ত্রীলোক ছাড়া দুনিয়ার সব স্ত্রীলোককে যদি মা ভাবতে পার, বলতে পার, তবেই বিয়ে করো; and try to love her—try to find out that Eternal She—in her. she is in every woman, just awaken her.

যদি চেষ্টা কর তবে নিশ্চয় একদিন ভালবাসা আসবে। পাবে—দেবে। তা যদি না পার, তবে বিয়ে করো না। একা হয়ে থাক। তোমার নিজের মা; fortunately আমার কন্যা নেই, তোমার বোন নেই, সুতরাং তোমার মা ছাড়া সব নারীর কাছেই তুমি সেই চিরন্তন পুরুষ-

Eternal He হতে পারবে। কোন অনুতাপ হবে না, কোন পাপ হবে না। শুধু নারীকে জয় করার মত শক্তি তোমার চাই। আর অনুতাপকে মনের ঘরে ঢুকতে দিতে না পারার শক্তি অর্জন করতে হবে তোমাকে।

বাবা আমার সাতাশ বছর পর্যন্ত সে কথা মেনে এসে, সাতাশ বছর বয়সে আমার মাকে বিয়ে করলেন। তারপর ঠাকুরদা যা বললেন তাই হল ; অন্য একজন উয়োম্যান মিশ্র রক্তের লাবণ্যবতী চন্দ্রিকা এল এবং বাবাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বাবাও চিঠি লিখেছেন মাকে। যখন বম্বে থেকে চন্দ্রিকাকে নিয়ে তিনি ইয়োরোপ চলে যান তখন। লিখেছিলেন, "সুরেশ্বর যেন বিবাহ না করে। আমাদের বংশে অভিশাপ আছে। আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। কারণ ঠিক জানি না, বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি, রায়বংশের ছেলে, তাদের রক্তে মদ্য এবং নারী সম্পর্কে একটা উদ্দাম ধারা আছে। এ হয়তো সকল পুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব, কিন্তু যাদের এই ধারাটা সম্পত্তি, অর্থ, সম্মানের একটা উঁচু ঢিবি বা পাহাড় বা পর্বত থেকে ঝরে, তখন সেটা জলপ্রপাতের মত সশব্দে ঝরে। একটু হাঁক-ডাক করে' ব্রাভাডো করে' এগুলো করে এবং এই সব মায়াময়ী, মোহময়ী যারা তারা এটা পছন্দ করে। সুরোর বেলা এর সম্ভাবনা খুব বেশী। তুমি তার বিয়ে দিয়ো না। সে বিয়ে করতে চাইলে, তাকে বলো বা আমার এই চিঠি দেখিও। তার প্রতি আমার উপদেশ—Don't marry. End our line with you.

কথাটা আমার মনে গেঁথে ছিল। বিয়ে করব নাই স্থির করেছিলাম। হঠাৎ মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে তুমি এলে। তোমার সঙ্গে পরিচয় বিচিত্রভাবে, ব্রজেশ্বরদার সেই শেফালিকে নিয়ে কেমন চট করে একটা কথায় জট পাকিয়ে গেল। তুমি বললে—ওর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করলেই পারতেন! যাই হোক, ওরা—ওরাও তো মানুষ। মেয়েছেলে। কথাটা সারাদিন মনে ঘুরল, সন্ধ্যেবেলা ট্যাক্সি করে গিয়ে শেফালির বাড়ী গেলাম, তার দুঃখ মোচন করে ফিরে এলাম সগৌরবে। তারপর একদিন গিয়ে দোরে দোরে যারা দেহের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পেটের অন্নের জন্যে, তাদের টাকা দিয়ে ফিরে এসে তারই গৌরবে তোমার কাছে বিকিয়ে গেলাম। তারপর কীর্তিহাটে এসে পড়লাম, রায়বংশের বিষয় আর কৃতকর্মের ইতিহাসের ঘূর্ণিতে। ডুবেই গেলাম। তোমার হাত ছেড়ে দিলাম। নিজে ডুবতেই লাগলাম। টেনে তোমাকে ধরলে হয়ত তুমিই আমার গলা টিপে ধরবে বলে ভয় হল।

সেদিন ১৯৩৮ সালে, সেদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে মনে হল, যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলাম। এবার ছুটি পাব। ভাবলাম কি জান, ভাবলাম অর্চনার বিয়ে হয়ে গেছে, মেজদি আমার খালাস পাচ্ছেন, এবার আমি খালাস, জমিদারীর দেবোত্তর যেমন আছে, তেমনি থাকবে, সে ওই মেজতরফই আপন গরজে রক্ষা করবে, আমি

ব্যক্তিগতভাবে পত্তনী স্বত্ব কিনে-কিনে যে সম্পত্তির মালিক হয়েছি, তা সব বেচে দিয়ে চলে যাব; আর ফিরব না। অন্ততঃ কীর্তিহাটে আর না। কলকাতার জানবাজারের বাড়ী. কলকাতার অন্য সম্পত্তি, তাও সব বিক্রিটিক্রি করে চলে যাব ইয়োরোপ, অথবা আমেরিকা, অথবা প্যাসিফিকের কোন দ্বীপে। সেখানে চাষবাস করব, ছবি আঁকব। আর Enjoy করব life।

আজও আমার মনের মধ্যে সেদিনের সেই স্মৃতি জলজল করছে। মনে হচ্ছে যেন হয়ত বা এইমাত্র ঘটে গেছে। মনে পড়লে সেদিনের সেই ইমোশনের স্পর্শও যেন পাই। বলতে পারি, তোমাকে সেদিন আমার এই কল্পনা 'টু এনজয় লাইফ' 'এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া'—এর মূলে ছিলে হয়ত তুমি। হয়ত বলছি এই কারণে যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না যে সে তুমি। সে একজন নারী! যে নারীর বন্ধনে চাষী বাঁধা আছে, মজুর বাঁধা আছে, গৃহস্থ বাঁধা আছে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, প্রজা, জমিদার, মহাজন, রাজা-মহারাজা, সম্রাট সবাই বাঁধা আছে; তেমনি একজন নারী। যে বিপ্লবীরা তখন আগুন নিয়ে খেলা করে, ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেয়, তাদের কথা ঠিক জানিনে, বলতে পারব না; মনের গভীরের গভীরে কেউ আছেন কিনা যাকে তারা দেশের পর্যায়ে পূজোর ফুলের মত ঢেলে দিয়ে নির্মাল্য করে দেয়। যাদের বাঁধন কেটে বেরিয়ে গেলে তবে গৌতম পরমবুদ্ধ হন, নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন, তেমনি একজন কেউ ছিল। তার মুখ শিলুটের ছবির মত দেখছিলাম। পিছনে ঝলমল করছে আলো, আর সে আমার ঘরে দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকছে। আমি তাকে ঠিক শিল্যুটের ছবির মত দেখছি।

আমি বসে গভীর চিন্তায় যেন ডুবে ছিলাম। ভাবছিলাম এই সব কথাই। ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকল একটি নয়, দুটি মেয়ে। শিলুটের মত।

শিলুটের মত হলে একজনকে চিনতাম, একজন কুইনী; তাকে একদিন বিবিমহলের ছাদের উপর থেকে এমনি শিলুটের মত দেখেছিলাম। কিন্তু অনেকটা দূরে ছিল বলে ছোট দেখিয়েছিল এর থেকে। আর একজনকে চিনলাম না; অপরিচিতা গাউন পরা একটি মেয়ে। তাদের সঙ্গে হিলডা।

অন্নপূর্ণা-মার কথা নিশ্চয় মনে আছে, তিনি তাঁর সোনাভাইপোর প্রথম প্রণয়ের ফলের বংশোদ্ভূতা এই মেয়েটিকে শুধু আমাকে দিয়ে বাড়ীই ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি, তাকে পড়িয়ে কোন দেশী কৃশ্চানের সঙ্গে বিয়ে দেবার অঙ্গীকার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন। আমি তাকে মেদিনীপুর কৃশ্চান মিশনে ভর্তি করতে গিয়ে ভর্তি করিনি। কারণ সেখানে অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল আর চুয়াড়দের মেয়ে। তাদের লেখাপড়া কতদূর কি হয় তা বলতে পারব না, তবে আবহাওয়াটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। শুধু আমারই বা কেন, বুড়ী হিলডা এসেছিল সঙ্গে, তারও হয়নি। সে বুড়ী হয়েছে, মুখে তার মাকড়শার জালের মত বার্ধক্যের

হিজিবিজি রেখা পড়েছে, কিন্তু তার চোখ এবং রঙের মধ্যে একটা পিঙ্গলাভা আছে, যথা তামার মত রঙ, যার গৌরব ওরা এখনও করে। সেটা বরং কুইনীর মধ্যেই নেই, থাকলেও ঈষৎ যৎসামান্য, চোখের তারায় শ্বেত রক্তের একটা ছাপ আছে। হিলডা বলেছিল—না বাবুসাহেব, ই জাগায় নেহি। ইভো সব কালাআদমীর মিশন আছে। না-না-না। আমাদের হামাদী খুন, হামাদী ইজ্জৎ, না-না। ইখানে কুইনীকে দিব না।

তার জন্তই তাকে শেষ পর্যন্ত দিয়েছিলাম খড়্গপুরে। ওখানে ক্রশ্চান আছে অনেক; এ্যাংলো আছে; রেলওয়ে ইস্কুল আছে, মেয়েদের বোর্ডিং আছে। সেখানেই কুইনীর পড়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। হিলডা খুসী হয়েছিল, কুইনীও খুশী হয়েছিল।

সেদিন কুইনী ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বলেছিল—নমস্কার স্যার।

মনটা যেন আমার চমকে উঠল। শুধু মন কেন, মন দেহ সব। আচমকা কেউ কিছু বললে যেমন চমকে ওঠে মানুষ ঠিক তেমনি। ঠিক তেমনিই, তবু যেন তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল। হ্যাঁ, আরও কিছু। পরে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি তার সত্যস্বরূপ। সে পরে বলছি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেয়েটিকে যেন বড় আপনার মনে হল, আমার একান্ত করে নিজস্ব সম্পত্তির মত, হ্যাঁ, সুলতা তাই ঠিক, তাই মনে হল। বুকের ভিতরে রক্ত যেন চলকে উঠল। যে চলকানো কখনো তোমার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনস-এ বেড়াতে গিয়েও হয়নি।

কণ্ঠস্বরে তার আভাস ফুটে উঠল, মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতেও তার প্রতিভাস ফুটেছিল। বলে উঠলাম—কুইনী!

মেয়েটা থমকে গেল। অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে দৃষ্টি নামিয়ে আমাকে বললে—একটা কাজে এসেছি আপনার কাছে। কোর্টে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, এখুনি ডি-এম-এর সঙ্গে দেখা করে বাসায় এসেছেন। দিদি বললে—

হিলডা সেলাম করে বললে—হ্যাঁ হুজুর, আমি বললাম। উরা শুনতে চায় না। ওদের খুন তেজী আছে, গরম আছে। দরখাস দিতে যাচ্ছিল হুজুর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। হামাদের উখানে হামরা হুজুর কংগিরিসকে ভোট দিলাম না। কংগিরিস ইংরাজ ক্রশ্চান লোকের দুষমনি করে। হামি লোক কিরিশ্চান, হামি লোক কংগিরিসকে ভোট দিলাম না।

কুইনী তাকে বাধা দিয়ে বললে—তুমি থাম দিদিয়া। আমি বলছি। মিসেস হাডসন আসুন, আমরা সব বুঝিয়ে বলব। তুমি খুব বেশী বক। থাম একটু।

আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম সুলতা। এই কয়েক মাসের মধ্যেই কুইনী কত পাল্টে গেছে! তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

কংগ্রেসকে ভোট না-দেওয়ার জন্ত গোটা কীর্তিহাট গোয়ানদের উপর বিরূপ হয়েছে।

তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন জগদীশ্বরকাকা, অর্চনার বাবা আর বিমলেশ্বর-অতুলেশ্বরের ঠিক উপরের বড়ভাই। পরন্তু যাকে আমি হাত মুচড়ে ধরেছিলাম ইতরামির জন্য সে-ই। তার সঙ্গে রঙ্গলাল ঘোষ আছেন। বৃদ্ধ রঙ্গলাল ঘোষ নাকি বলেছেন—ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই হবে, সে বড় লড়াই। সে লড়াই করবেন গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, বীরেন শাসমল। এখানে গোয়ানদের সঙ্গে লড়ব আমরা।

হিলডা নিজে এসেছিল রঙ্গলালের কাছে। আপনে ঘোষ, এমুন বাত কাহে বললেন ?

বুক চাপড়ে রঙ্গলাল বলেছেন—হামারা খুশী। তারপর বলেছেন—এইবার শোধ হবে আমার পিসের খুনের। পিক্রুজের ফাঁসিতে শোধ হয় নাই।

সেই সব খবর খড়্গাপুরের ক্রুশ্চানেরা আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পেয়েছে, খড়্গাপুর ক্রুশ্চান গার্লস হোস্টেলবাসিনী কুইনীর কাছে এবং গোয়ানপাড়া গিয়ে হিলডাকে এবং কুইনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেদিনীপুর ডি-এম-এর কাছে দরখাস্ত করতে। একদিকে ১৯৩০-এর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, আর পেডি বার্জ ডগলাস মার্ডার করা মেদিনীপুরের প্রচণ্ড ভয়, অন্যদিকে মিলিটারী বুটের থেঁতলানি আর পিউনিটিভ ট্যাক্সের ভারে জর্জরিত মেদিনীপুরে গোয়ানপাড়া থেকে খড়্গাপুর অবধি এ্যাংলোদের এবং বিদেশী উপাধিধারী কালো ক্রুশ্চানদের অবস্থা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে হেঁটে চলার মত মর্মান্তিক। ভয়ে রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে আস্ফালন করে তাড়ির নেশায় প্রমত্তের মত।

১৯৩০ সাল থেকে বাংলা দেশের সে যুদ্ধের কথা ঐতিহাসিক। সে তো বলার প্রয়োজন নেই, তবু আমার জবানবন্দীর সেদিনের এই ঘটনাটির জন্য উল্লেখের প্রয়োজন আছে, মেদিনীপুরের কথা আগে বলেছি, তার সঙ্গে একটা কথা বলা হয় নি, ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসেছেন নেতৃত্বের আসনে। সদ্য তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এদিকে নতুন ইলেকশনে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজের শক্তি, অহঙ্কার, রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধিকে চমকে দিয়ে তার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে কংগ্রেস সব Province-এ ministry form করেছে। পারে নি সিন্ধু আর বাংলায়। মুসলীম লীগের নায়ক জিন্নাসাহেব স্থির করেছিলেন চিরকালের জন্যে চলে যাবেন ইংলণ্ডে। কিন্তু দুটি প্রদেশে দুটি পা রাখবার জায়গা পেয়ে তিনি জিনিসপত্র লগেজের বাঁধনের গিঁট খুলে ফেলেছেন।

মনে একটা ধাক্কা খেলাম। তাকিয়ে ছিলাম কুইনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, কুইনী আমার আপনজন নয় ?

কুইনী অস্বস্তিবোধ করছিল বোধ হয়। আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয় অস্বস্তিকর কিছু ছিল। নিজের দৃষ্টি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, সামনে আমার আয়না ছিল না, আমি আমার দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া দেখছিলাম কুইনীর চোখে। কুইনী বললে—দেখুন, নেহাত দিদিমা বললে, সুরেশ্বর-

বাবু যখন এখানে রয়েছে, তখন আগে তাঁর কাছে যাব। তাঁকে না বলে কিছু করব না, কাউকে কিছু করতে দেব না। নিমকহারামি হবে। তাই ডি-এম-এর কাছে যাবার আগে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কি এর প্রতিবিধান করতে পারবেন ?

আমি কিছু বলবার আগেই মিসেস হাডসন বললে—Won't you ask us to sit down Babu ?

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, বসতে বললাম ; রঘুয়াকে বললাম—ভাল মিষ্টি আনতে। চা করতে।

অতিথিদের আপ্যায়ন করে বিদায় করলাম। বললাম—আমি তোমাদের ডি-এম-এর কাছে যেতেও বলব না, বারণও করব না। জমিদার হিসেবে আজ আর আমার খাজনা আদায় করে সরকারের প্রাপ্য সরকারী মালখানায় জমা দিয়ে বাকীটা নিজের জন্যে জমানো বা নিজে ভোগ করা ছাড়া আমার করণীয় কিছুই নেই। বড়জোর দু-দশ টাকা চাঁদা দিতে পারি। দেওয়া উচিত বলে মনে করি। তার বেশী কিছু নয়। তবু কীর্তিহাটে গিয়ে একথা বলব আমি। বলব এই পর্যন্ত। যেমন ঠিক তোমাদের বলছি। তার বেশী কিছু নয়।

—বাস। বাস। ওই সে হোয়ে যাবে কুইনী। বস করো। ছোটবাবু রাজাবাবু যখুন বলিয়েছেন, তখন জরুর সব মিটমাট হো যায়ে গা। দরখাস-অরখাস দেনে কা কুছ জরুরৎ নেহি। চল বাবা, ঘর চল।

মিসেস হাডসন কুইনীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। পরামর্শ করলে। তারপর ফিরে এসে বললে—বেশ তাই হল। আপনি চেষ্টা করে দেখুন। আমরা অপেক্ষা করব তার জন্য।

ওরা চলে গেল। শুধু হিলডা যাবার সময় বলে গেল—বাবুসাহেব !

—বল হিলডা !

—হামার পর, কুইনীর পর আপনে গোস্‌সা করো না। আপনের পর হামিলোগের কোই নালিশ নেহি, কুছ না !

—না-না হিলডা। তা আমি ভাবিনি।

কাতরভাবে হিলডা বললে—বহুৎ জুলুম করছে বাবু, বহুৎ জুলুম !

—আমি বারণ করব। ওদের অনুরোধ করব। তোমরা ভেবো না।

* * *

সন্ধ্যাবেলা থেকে সেদিন আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এই রাত্রিটি আমার একটি স্মরণীয় রাত্রি। অবিস্মরণীয়। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

বুঝতে পারলাম ওই কুইনী মেয়েটা আমার সমস্ত দেহ-মনকে এক আশ্চর্য মোহে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

প্রথম মনে হল, এ আমার রক্তের ধারা। রায়বংশের জীবনের অভ্যাস রক্তস্রোতের মধ্যে একটা রোগের বীজাণুর মত মিশে রয়েছে। সংসারে আজও এমন কোন ছাঁকনি তৈরী হয় নি, যা দিয়ে একে ছেঁকে শোধন করা যায়।

রঘুয়াকে ডেকে বললাম—বাজারে যা, এক বোতল হুইস্কী কিনে আন।

রঘুয়া বললে—আছে।

—আছে? অন্নপূর্ণা-মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শপথ করেছিলাম, মদও আর খাব না। সে আজ ছ-সাত মাস হয়ে গেল। তবু রঘুয়া বলছে, আছে!

রঘুয়া আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—আগেও তো তিন-চার দফে ছোড়া, আওর ফের এক রোজ হুকুম হল কি রঘুয়া লে আয় হুইস্কী! তো দো-তিন বোতল তখুন বাক্সমে ছিলো, রেখে দিলাম। আনব?

—আন।

—ইখানে? এই রাস্তার সামনা ঘরমে? উপর চলো। হামি থোড়া কুছ খানাকে সঙ্গে সব তৈয়ার করে দি!

বললাম—দে।

রঘু চলে গেল। আমিও উপরের ঘরে পায়চারি করছিলাম, আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম ওই কুইনীর কথা। ওই কিশোরীটির মুখে-চোখে, সকল তনু ঘিরে থাকা একটা আশ্চর্য মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। রায়বংশের স্রোতের মুখে ওই তনুখানিকে যেন একখানি কুমারী তরণীর মত নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম, কই সুলতাকে নিয়ে তো এমন কল্পনা করনি? কুইনীকে নিয়ে কেন?

চট করে মন উত্তর দিয়েছিল, সুলতা তোমার দ্বারা উপকৃতা নয়, তোমার অধিকারের মধ্যে সে বাস করে না। তোমার দানের অর্থে সে অন্নে শিক্ষায় দেহ-মনকে পুষ্ট করছে না।

বোধ করি ওর একটা দাবী আছে। আগের কালে এ দাবী ছিল সোচ্চারে ঘোষিত। জীবনে এবং জগতে সব ভ্যালুর মধ্যে সম্পদের ভ্যালু হল প্রত্যক্ষ স্পষ্ট; ওর স্ট্যাণ্ডার্ড—গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে মাপ করা। তার সঙ্গে শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, মালিকানিশক্তি এক হলে তো রক্ষে থাকে না। আমেদশা আবদালীর ইতিহাসটা পড়া ছিল আমার ভাল করে। অন্তত মনে ছিল। শাহ আবদালীর নাকটা বসে গিয়েছিল, সেখানে চিরস্থায়ী একটা ক্ষত ছিল; ক্ষতটা কুষ্ঠরোগের। সেই আবদালী ষাট বছর বয়সে যখন দিল্লীর রঙমহলে ঢুকল, তখন দিল্লীর বাদশাহ বংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ষোল-সতেরো কি আঠারো বছরের হজরত বেগমের দেহ-মন দাবী করে বললে—চাই, হজরৎ বেগমের দেহের মনের আমি হকদার।

আমার মনের কামনাও তারই হয়তো অবশেষ। নদীটা শুকিয়ে এসেছে, ১৭৫৭ সাল আর ১৯৩৮ সাল, ১৮১ বছরের মধ্যে। নদীটার উপরে স্রোত নেই, কিন্তু বালির তলে তলে আজও বইছে, আজও বইছে। রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে করতলগত করে পাথরের দেবতার মত দৃষ্টিভোগে সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ছেলে দেবেশ্বর রায় ভায়লেটকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন, কৈশোর চাপল্যে। আমি তার পৌত্র, সুরেশ্বর। কুইনীও ওই অঞ্জনার বংশের। আমি তাকে চোরাবালির মত গ্রাস করতে চাচ্ছি।

ঘুরতে ঘুরতে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিছু চাই। কিছু চাই। মনে পড়ল, অন্নপূর্ণা-মার দেওয়া কাগজের বাণ্ডিলটার কথা। স্যুটকেস খুলে, তাই নিয়ে বসলাম। রঘু বোতল এনে নামিয়ে রাখলে টেবিলের উপর।

সুরেশ্বর বললে—১৯৩৮ সালের সেদিন মার্চের ৩০শে। তারিখটা আমার মনে আছে সুলতা। কীর্তিহাটের রায়বংশের রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায়ের পিতাপুত্রের বিস্ময়কর দ্বন্দ্বের কাহিনীর সবটুকু জেনে শেষ করেছিলাম। কড়চা বল জবানবন্দী বল তার উপাদান সংগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সারারাত্রি জেগে অন্নপূর্ণা-মা'র দেওয়া কাগজপত্রগুলি পড়ে শেষ করেছিলাম ভোরবেলা পর্যন্ত।

বাপের সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল শৈশবে। পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই শুরু হয়েছিল। শুরু ক'রে দিয়ে গিয়েছিল অঞ্জনা। অল্প কিছুটা বয়স হতেই দেবেশ্বরের আশ্রয় মায়ের কোল থেকে গিয়ে নির্দিষ্ট হয়েছিল অঞ্জনার কোলে। চার বছর বয়স থেকে; তখন সরস্বতী বউয়ের গর্ভে এসেছে আর একজন।

সেই সময় অঞ্জনার কাছে শুয়ে সে কাঁদত। অঞ্জনাও মধ্যে মধ্যে কাঁদত। দেবেশ্বর কাঁদতেন মায়ের কোলের জন্ম। অঞ্জনা কাঁদত ব্যর্থ জীবনের জন্ম। দুজনেই দায়ী করেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বরের চরিত্রগৌরবের মধ্যে যাই থাক, সে হীরে মতি পান্না নীলা যাই হোক, তার স্পর্শ, তার দীপ্তি, সবই ছিল বড় রূঢ় উত্তপ্ত। তাঁর কণ্ঠস্বরে সঙ্গীত ছিল। কিন্তু সঙ্গীত সভয়ে বিদায় নিয়েছিল।

এগুলো অস্পষ্ট। প্রথম স্পষ্ট হয়েছে যেদিন অঞ্জনা প্রথম বন্ধ ঘরের মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে সমানে জবাব করেছে। তখন সরস্বতী বউ আঁতুড়ঘরে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেছে, প্রকৃতি অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে। তারই অবসরের মধ্যে রত্নেশ্বর রায় সন্ধান পেয়েছেন অঞ্জনা এবং আলফান্সোর সঙ্গে একটা কিছুর পালা চলেছে। এবং সে পালাটা আছে রত্নেশ্বরের ডায়েরীর মধ্যে সে তুমি শুনেছ। ঘণ্টা দুয়েক আগে ডায়রী থেকে পড়ে শুনিয়েছি। দেবেশ্বর সেটা শুনেছিলেন।

জীবনের প্রায় শেষকালে, তখনও তিনি যুবক, বাংলাদেশের বিদগ্ধ মানুষের সমাজের একজন উজ্জ্বল মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি—তখন তিনি রাঙাপিসীকে যে চিঠি লিখে

ছিলেন সেই চিঠিতে আছে এ-সংবাদটা। রত্নেশ্বর রায়ের পাশের ঘরটাই ছিল দেবেশ্বরের ঘর, এই ঘরেই অঞ্জনা দেবেশ্বরকে নিয়ে থাকতেন। সরস্বতী বউ আঁতুড়ঘরে। বাড়ীর এক প্রান্তে।

অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলবার সময় সাবধান হতে ভোলেন নি রত্নেশ্বর। সেদিকে দৃষ্টিহীন বা ভ্রূক্ষেপহীন তিনি ছিলেন না। বাড়ীটার বারান্দার দু মাথায় পাহারা রেখেই কথা বলছিলেন অঞ্জনার সঙ্গে। হুকুম ছিল কেউ যেন না আসে। কিন্তু তারা চার বছরের দেবেশ্বরকে কেউ এর মধ্যে ফেলে নি। ফেলতে পারে নি। হয়তো মনেই হয় নি। দেবেশ্বর ছিলেন মায়ের আঁতুড়ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে, সেখান থেকে এসেছিলেন অঞ্জনার খোঁজে। তাঁকে কেউ আটকায় নি। কিন্তু কিছুটা এসে নিজেই যেন আটকে গিছলেন, বাবার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অঞ্জনা পিসীর কণ্ঠস্বরের পাল্লায় ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন অঞ্জনা পিসীর জন্যে। বাবা অঞ্জনা পিসীকে বকছে। অঞ্জনা পিসী সমান উত্তর করছে। এমন কখনও ভাবতে পারেন না তখন দেবেশ্বর।

ঘরের দরজার কোণে দাঁড়িয়ে তিনি যত কেঁদেছিলেন তার সবটাই অঞ্জনা পিসীর জন্যে। আর রাগ হয়েছিল বাবার উপরে।

"এই রাগ তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইয়া এক পর্বত সৃষ্টি হইয়েছিল রাঙাপিসী। বাল্যকালে তিনি কদাচ আমাকে সমাদর করিয়াছেন। শুধু শিক্ষাই দিয়াছেন। কীর্তিহাটের প্রতিটি ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের সে কি ভয়!

রাঙাপিসী, নিত্য প্রভাত হইতে নানা স্থানের প্রজারা আসিত; তাহারা অগ্রে আসিয়া কাছারিতে সেলামী জমা দিয়া সেরেস্তায় আগমনের কারণ জানাইত, তাহার পর মা কালীর নাটমন্দিরে গিয়া মা কালীকে প্রণাম করিত। রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করিত। তখনও রাধাসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তুমি জান রাঙাপিসী, এই যুগল বিগ্রহ আমার ভিক্ষা-মা ও ভিক্ষা-বাবার। সে কথা পরে বলিব। আগের কথা আগে লিখি।

রাঙাপিসী, কীর্তিহাটের চাউল এবং ধান্যেরও জমাখরচের খাতা আছে; নিত্য প্রায় এক মণ চাউল খরচ হইত দেবোত্তরে। প্রায় একশত জনের খাদ্য। প্রজা কোনদিন পঞ্চাশ, কোনদিন ষাঠ, কোনদিন সত্তর-আশী আসিয়াছে। সকলেই সেলামী দিয়াছে। তাহারা অন্নের মূল্য দিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছে। তাদের সকলেরই প্রার্থনা এক—হুজুর মা-বাপ; হুজুর রক্ষা করুন। ডিক্রীর টাকা দিতে হইলে আমাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে।

আমার পিতার মুখ যেন প্রস্তরে গঠিত মুখ। তাঁহার এক কথা। "আইন অনুসারে যাহা প্রাপ্য তাহার অতিরিক্ত এক কপর্দক আমার দাবী নহে। ডিক্রীর টাকা ছাড়তে হইলে একদিন আমাকেও সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। সম্পত্তি প্রথমতঃ দেবোত্তর, মালিক দেবতা, দ্বিতীয়তঃ এ সম্পত্তি রায়বংশের আগামী পুরুষদের, ইহাকে আমি কোনক্রমেই ক্ষয়

করিতে পারি না। ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার অধিকার আমার নাই। কথা কয়টি শেষ হইতে-না-হইতে দারোয়ান তাহাকে বলিত—'উঠো বাহার চলো। উঠো—উঠো!'

দ্বিতীয় জনের ডাক হইত। সেই একই কথা।

পিসী, প্রথম প্রথম মনে একটা ভয় হইত, একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় জাগ্রত হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহার উপর তাঁহার কঠিন চরিত্র। রাঙাপিসী, অঞ্জনা পিসীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাহার অর্থ বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম অঞ্জনা পিসী বাবাকে কঠিন কথা বলিল। বাবার শাসন সে গ্রাহ্য করিল না। ইহার পর হঠাৎ সে চলিয়া গেল, লোকে তাহার নিন্দা করিল; "কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে" কথাটা শুনিলাম কিন্তু ঠিক বুঝিলাম না, তবে কাজটা অত্যন্ত ঘৃণ্য তাহা বুঝিলাম। বাবার ক্রোধ দেখিলাম। একটা গোয়ান ছোকরা, সে ইহাতে লিপ্ত ছিল। আলফান্সোর সহকারী হিসাবে, ঘোড়া দেখাশোনা করিত, সে কোথায় হারাইয়া গেল। শুনিলাম তাহাকে কাটিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবামহাশয়ের হুকুমে। কারণ সে আলফান্সোকে সাহায্য করিয়াছিল। আমার ভয় আরও বাড়িল। মনে হইল, বাবা এত নিষ্ঠুর কেন? তাহার পরই নিজের ভয় হইল। বাবার মত পুণ্যাত্মা ধার্মিক লোক, তাঁহার যে নিষ্ঠুর না হইয়া উপায় নাই। কি করিবেন? পাপীকে দণ্ড তিনি না দিলে কে দিবে! শিহরিয়া উঠিলাম।

কিন্তু একদিন আর মানিতে পারিলাম না। একদিন দেখিলাম, নাটমন্দিরে কালীমায়ের সম্মুখে একজন অর্ধ-উন্মাদিনী যুবতী বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই, কেশরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে, বক্ষের বস্ত্রও খসিয়া গিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, সে বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। বলিতেছে—এই বিচার? এই বিচার! মানি না, এ-বিচার মানি না, মানব না।

কীর্তিহাটের কাছারিবাড়ী ও ওদিকে নাটমন্দিরের চারিদিকে গোমস্তা, নায়েব, আমলা, পাইক, চাপরাসী, পূজক-পুরোহিত, পরিচারক প্রভৃতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে স্তম্ভিতের মত। এই উন্মাদিনীর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, জিহ্বার আগলবাঁধ নাই, সে কীর্তিহাটের রত্নেশ্বর রায়কে তিরস্কার—তাই বা কেন, গালিগালাজ করিয়া চলিয়াছে। আমিও অবাক হইয়া বাড়ীর ভিতরের দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

এমন সময় বাবামহাশয়ের গলার সাড়া পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার খাস কাছারি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—সকলে আপন-আপন কাজে চলিয়া যাও। কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না।

সে-কণ্ঠস্বর, সে-হুকুমজারীর ভঙ্গি উপেক্ষা করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না। সকলেই চলিয়া গেল। বাহিরে ফটকের সামনে কতকগুলা লোক, তাহারা বাহিরের লোক, দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, তাহারও সভয়ে প্রস্থান করল। আমিও ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলাম। কিন্তু

আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল, কান্না পাইতেছিল—আশঙ্কা হইতেছিল যে, এইবার বোধ হয় বাবা ওই হতভাগিনীকে তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। ওই স্ত্রীলোকটি দরিদ্র বটে কিন্তু নীচজাতীয়া নয়, তাহার আকৃতি ও রূপের মধ্যেই তা পরিস্ফুট ছিল। এবং তাহার আকৃতি ও রূপের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা আমার মত সাত-আট বৎসরের বালকের মনকেও দয়ার্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাই পলাইয়া গিয়াও পলাইতে পারিলাম না। ফিরিয়া গেলাম ছাদের উপর, সেখানে আলসের আড়ালে লুকাইয়া ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলাম ও শুনিতে লাগিলাম। এতক্ষণে দৃষ্টিতে পড়িল যে মেয়েটির সামনে নাটমন্দিরে এক প্রৌঢ় মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া নতদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে। লোকটার মাথা কাটিয়া গিয়াছে। কপালে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। স্ত্রীলোকটি বাবামহাশয়কে দেখিয়া পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল—বাবুমহাশয় দয়া করুন, বাবুমহাশয় কৃপা করুন। বিবেচনা করিয়া বিচার করুন বাবুমহাশয়।

রাঙাপিসী, আজও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ওই উন্মাদিনী মেয়েটির উচ্চ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, তাহার বক্ষের আকুতি-মিনতি আমার বাবামহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। বাবামহাশয়ও তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন কেহ বন্ধ করিয়া দিল—হাত দুটা দিয়া সে বুক চাপড়াইতে-ছিল, সে হাত দুইটা যেন অবশ হইয়া শুধু যুক্তকর হইয়া রহিল।

বাবামহাশয় বলিলেন—তোদের স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে-নালিশ, তাহা কি মিথ্যা? এই কালীমাতার সম্মুখে তাঁহার নির্মাল্য হাতে লইয়া বলিতে পারিস?

মেয়েটি নীরব হইয়া গেল।

পুরুষটির মাথা আরও নত হইল। বাবামশায় বলিলেন—বল্, সত্য কিনা বল!

পুরুষটি এবার বাবার পায়ে পড়িয়া বলিল—সত্য। কিন্তু হুজুর, আপনি সব শুনিয়া বিচার করিয়া—

বাবামহাশয় সিংহগর্জনে বলিলেন—বাহির হইয়া যা। তুই পাপিষ্ঠ, আর ওটা পাপিষ্ঠা; যা যা, এখুনি বাহির হইয়া যা। আমার মন্দির অপবিত্র হইয়াছে। যাহা বিচার হইয়াছে, তাহা সত্য বিচার হইয়াছে। যা—বাহির হইয়া যা। যা এবং তিন দিনের মধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া তোদের চলিয়া যাইতে হইবে।

তাহারা চলিয়া গেল। সে-সময়টা বৈশাখ মাস, বেলা তখন দ্বিপ্রহর, মেয়েটি ও পুরুষটি নতমস্তকে নীরবে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় মেয়েটি একটি থামের ছায়ায় শায়িত ঘুমন্ত একটি শিশুকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল।

এ-বিচারের কারণ শুনিয়া বাবা সম্পর্কে আমার ভয় আরও বাড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল—বাবামহাশয় বিচারক—বিধাতার মূর্তিমন্ত অবতার।

কারণ কি জান?

এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি একজন বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যাহারা কন্যা বিক্রয় করে। বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। এই প্রৌঢ়টি জল-অচল হিন্দুদের মধ্যে পুজা-অর্চনা ও পৌরোহিত্য করিত। পৈতৃক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিল তিল করিয়া পয়সা জমাইয়া অবস্থা বেশ স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়া একদা বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সাধ করিয়াছিল। এবং একটি আট বৎসরের পিতৃহীনা কন্যাকে প্রায় চারিশত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়া ঘরদুয়ার সাজাইয়া পাতিয়াছিল। সময়টা তখন দুর্ভিক্ষের সময়—মেদিনীপুরে ১৮৬৪ সালে সাইক্লোন ঝড়ের পর দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময় এই লোকটি সমস্ত শ্বশুরবাড়ীর লোকদের বাঁচাইয়াছিল। কন্যাটির মাতা ও ভ্রাতাদের পর্যন্ত স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় এইভাবেই প্রায় খেলাঘরের বরকনে খেলা শুরু করিয়া যখন কন্যাটি যৌবনে উপনীত হইল, তখন একদা হতভাগ্য পথের মধ্যে পড়িয়া গিয়া কোমরে আঘাত পাইয়া একেবারে কোমরভাঙা কুব্জ হইয়া গেল, সেই সঙ্গে তাহার পুরুষ-জীবনের সকল শক্তি তিরোহিত হইল।

সুরেশ্বর বললে, সে এক করুণ ইতিহাস—তারই সঙ্গে খানিকটা সামাজিক রুচিতে কুৎসিতও বটে। একালে যদিবা এ-সত্যকে সহ্য করা যায়, সেকালে কোনমতেই তা সহ্য করা যেতো না। এর মধ্যে মানুষের মনের চিরন্তন কামনার যে লজ্জাহীন, ভয়হীন, সঙ্কোচহীন প্রকাশ, তার তুলনা রাবণের চিতার সঙ্গে। সে নাকি কোনকালে নেভে না, চিরকাল জ্বলছে—চিরকাল জ্বলবে।

ওই মেয়েটির মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে ওই হতভাগ্যের বিচিত্র হতাশা—তার রক্ত-জল-করে-অর্জন-করা সম্পদ-সম্পত্তি সে কাকে দিয়ে যাবে। কে তার উপাধি বহন করবে। সেকালে তার সঙ্গে আরও কামনা ছিল—কে তাকে জলপিণ্ড দেবে।

এরপর যে ব্যাপার ঘটল, তা যেমন শ্রুতিকটু, সমাজবিরুদ্ধ, তেমনি এই মায়া-মমতার সংসারে সম্পদ-সম্পত্তির দুনিয়ায় চিরন্তন। মহাভারতের কাল থেকে ঘটে আসছে। ব্যাসদেব যে-সাহসের সঙ্গে সেই সত্যকে প্রকাশ করেছেন, তারই নজির তুলে দেবেশ্বর রায় তাঁর রাঙাপিসীকে অনায়াসে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—

"রাঙাপিসী, বিষয়ের সংসারে মমতার পৃথিবীতে এ বোধ হয় চিরকাল ঘটিতেছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মকাহিনী। এই হতভাগ্য দম্পতির সেই মতি হইল। এই যুবতীটি স্বামীকে সত্যই ভালবাসিত। স্বামীর সঙ্গে নাকি রাত্রে বসিয়া ক্রন্দন করিত—এসব তাহাদের কে খাইবে? অবশেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া ওই পথই ধরিল। পুরুষটির এক নীচজাতীয়া পালিকা মা ছিল, তাহার মায়ের মৃত্যুর পর সে-ই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল; সেই মায়ের গর্ভের এক ছোট ভাই, সে ছিল তাহাদের বাড়ীর কেনা গোলামের মত। ছেলে-

বেলায় ছিল রাখাল, তাহার পর হইয়াছিল মাহিন্দার, তাহার পর সে তাহাদের জমি চাষ করিত এবং চাকর বলিতে চাকর, ভারবহনকারী পশু বলিতে তাহাই, আবার বন্ধু বলিতে একান্ত আপন বন্ধু ভাই, তা-ও ছিল সে। সব কথাই তাহার সহিত হইত। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া একদা তাহাকেই সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করিল। এই অস্পৃশ্য নীচজাতীয় পুরুষটি বয়সে এই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিল এবং আকারে অবয়বে কালো কষ্টি-পাথরে গড়া ভীমাকৃতির তুল্য সুন্দর ছিল। এই মেয়েটির ও তাহার স্বামীর বংশরক্ষা করিবার নিমিত্ত এমনি কৃষ্ণবর্ণ এক পুত্র যথাসময়ে তাহারা পাইয়াছিল। তাহারই বিচার হইয়াছিল। নালিশ আনিয়াছিল—মেয়েটির ভাইয়েরা, পুরুষটির জ্ঞাতিরা। কারণ তাহারা দুইপক্ষই প্রত্যাশা করিয়াছিল—ওই নিঃসন্তান দম্পতির সম্পত্তি তাহারাই পাইবে। জ্ঞাতিদের প্রাপ্য আইনানুসারে। শ্যালকেরা আশা করিয়াছিল, দানপত্র লিখাইয়া লইবে বা তাহাদের সন্তান পোষ্যপুত্র লওয়াইবে।

প্রমাণ ছিল অকাট্য। ওই শিশুটির কৃষ্ণবর্ণ। তাহার উপর ওই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটির স্বীকারোক্তি। কাছারিতে তাহাকে থামে বাঁধিয়া তাহার পিঠ বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া স্বীকার করানো হইয়াছিল। এবং বিচারে হুকুম হইয়াছিল—এই দম্পতিকে ওই সন্তান লইয়া সামান্য অস্থাবর লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, ওই সম্পত্তি ওই গ্রামের গ্রাম্য দেবতাদের দেবোত্তররূপে গণ্য হইবে।

রাঙাপিসী, সেদিন বাল্যকালে বাবামহাশয়কে যেমন বিচারক-বিধাতার অবতার মনে হইয়াছিল, এই রায়কেও ঠিক তদ্রূপ বিধাতার রায় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ইহার পর নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হইল। আমার মুখ দেখিলেন হুগলী জেলার কায়স্থ জমিদার মিত্র-গোবিন্দপুরের জমিদার শিবদাস মিত্রের তৃতীয় পক্ষের বন্ধ্যাস্ত্রী। কৃষ্ণভামিনী দাসী। এখানেও একটা সমস্যা ছিল। সমস্যা—কৃষ্ণভামিনী দাসীকে অপবাদ দিয়া সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছিল শিবদাস মিত্রের ভাগিনেয়। কারণ ভাবী উত্তরাধিকারী সেই। অথচ শিবদাস মিত্র তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি তাহার তৃতীয় পক্ষের যুবতী নিঃসন্তান স্ত্রীকে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে উইল করিয়া দিয়াছেন। বারো মাসে বারো হাজার টাকা আয়ের জমিদারী। এবং নগদ অর্থ। কৃষ্ণভামিনী দাসী বাছিয়া বাছিয়া শরণ লইলেন ধার্মিক সাধুপ্রকৃতির খ্যাতিমান ও প্রতাপবান জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের। রাঙাপিসী, তোমার জমিদারী শ্যামনগরের পত্তনীদার কীর্তিহাটের রায়বংশ। শ্যামনগর-রাধানগর লইয়া যে বিরাট পর্ব, তাহা তোমার অগোচর নয়। শ্যামনগর হুগলী জেলার অন্তর্গত। চুঁচুড়ায় রায়েদের বাড়ী ছিল একখানা, সেখানে সেরেস্তা ছিল এবং সেখানে রত্নেশ্বর রায় মধ্যে মধ্যে যাইয়া বিশ্রাম করিতেন। গঙ্গার ধারে বাড়ী, তাঁহার প্রিয়স্থান ছিল। এখানেই একদা এই কৃষ্ণভামিনী দাসীর সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণীর পরিচয় হয়; কৃষ্ণভামিনী দাসী একদিন পাল্কী করিয়া আসিয়া

আমার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গেলেন, আট বছরের আমাকে সমাদর করিয়া কোলে লইয়া একটি মোহর দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আমার কিশোর গোপাল। এবং নিজ বাটীতে রাধাসুন্দরজীউ ঠাকুরের আরতি দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর ক্রমে সে-আলাপ গাঢ় হইল। এবং সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমার পিতার কাছে আসিয়া প্রণতা হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি অনাথা। আপনার নাম-খ্যাতি এ-অঞ্চলে কে না জানে! এ-অবলা-অনাথাকে আপনি রক্ষা করুন।

রাঙাপিসী, কথাগুলি আমার কানে এখনও যেন বাজিতেছে। মাতাঠাকুরাণী, তাঁহার পাশে আমি ভিক্ষা-মায়ের কোলের কাছে, তিনি আমাকে কোলের কাছে লইয়াই দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন।

বাবামহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—আমি সমস্তই অবগত আছি। দেবেশ্বরের গর্ভধারিণীর নিকটও আপনার কথা শুনিয়াছি। অসহায়কে রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম। ইহা যে না করে সে ধর্মে পতিত হয়। আমা হইতে যতদূর হইবে অবশ্যই তাহা করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

কৃষ্ণভামিনী দাসী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে অনেক অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিলেন। এবং আমাকে সন্তানরূপে পাইবার বাসনায় আমার উপনয়নের সময় মুখ দেখিলেন। মুখ দেখিবার কালে তিনি আমাকে মূল্যবান হীরার আংটি এবং হীরা-বসানো বোতাম, রূপার বাসন এবং একশত একটি মোহর দিয়াছিলেন।

ভিক্ষা-মা এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, রাধাসুন্দর ঠাকুরের সম্পত্তি দেবোত্তর ছিল, তাহার সেবায়েৎ-স্বত্ব বলিলেন আমাকে দিবেন। তখন রত্নেশ্বর রায়ের প্রতাপে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়—তাঁহার নাগপাশের মত কৌশল-জালে এবং অর্ধচন্দ্রবাণের মত ক্ষুরধার বুদ্ধিতে অঘটন ঘটে। সুতরাং কৃষ্ণভামিনী দাসীর স্বামীর জ্ঞাতিবর্গ পিছু হটিল। রত্নেশ্বর রায়ের প্রভাবে এবং কৌশলে সামান্য কিছু সম্পত্তি লইয়া তাহারা সম্পত্তির উপর কৃষ্ণভামিনী দাসীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করিয়া দলিল করিয়া দিল। এদিকে আমার ভিক্ষা-মা বাবামহাশয়ের সম্পর্কে বেয়ান হইলেন। তাঁহার সামনে ঘোমটা কমাইয়া কপালে চুলের রেখার প্রান্ত পর্যন্ত তুলিলেন। হাস্য-পরিহাস হইতে লাগিল।

বৎসর-তিনেক পর, তখন আমার বয়স বারো বৎসর, সবে জানবাজারের বাড়ীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করিতেছি। দেশে তখন বর্ধমান ফিবারের প্রকোপ হইয়াছে। কয়েকটা অজন্মায় দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, লোক মরিয়াছে। বর্ধমান ফিবার দেশময় ছড়াইয়াছে। রত্নেশ্বর রায় কীতিহাটে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরাতন যেটা ছিল, সেটা একটা

সামান্য ব্যাপার। এ-চিকিৎসালয় সত্যই বড় চিকিৎসালয়। তাঁহার নাম তখন দেশে কীর্তিমান লোকেদের প্রথম সারিতে স্থান পাইয়াছে, হঠাৎ কলিকাতায় বসিয়া শুনিলাম আমার ভিক্ষামাতা কৃষ্ণভামিনী দাসী বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছেন। দেশে আর ফিরিবেন না। এবং তিনি তাঁহার স্বামীর উইলসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রাধাসুন্দরের নামে দেবোত্তর করিয়া, গুজব শুনিলাম, ভিক্ষাপুত্র আমাকেই তাঁহার সেবায়েৎ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণভামিনী-মা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার কথা তুমি জান, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, তোমাকেও তিনি তোমার বিবাহের সময় মূল্যবান অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরখানেকের মধ্যে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার এতদিনের পৃথিবী সব যেন পাল্টাইয়া গেল। আমি যাহাকে এতদিন দেবতা ভাবিয়াছিলাম, তাহার ছদ্মবেশটা খসিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তিনি যাহাই হউন, দেবতা বা দানব, মানব বা অসুর—তিনি হউন পবিত্র চরিত্রবান, তিনি ত্রিসন্ধ্যা করুন, তিনি জপ করুন, তিনি প্রকাশ্যে দান করুন, তিনি হউন কীর্তিমান, তিনি দয়াহীন, মায়াহীন, ক্ষমাহীন, তিনি দেবস্থলের খড়্গের মত পবিত্র, কিন্তু তাঁহার কর্ম—দেবতার হাড়িকাষ্ঠে আবদ্ধ হতভাগ্য মেষ-মহিষ এবং ছাগগুলিকে ছেদন করা। হয়তো এককালে খড়্গ লইয়া শত্রুর সঙ্গে, বিধর্মী বা অধর্মাচারীর সঙ্গে যুদ্ধ করা হইত, কিন্তু এখন তাহা কেহ করে না; সে তাহার রক্তপিপাসার নিবৃত্তি করে, অসহায় পশুগুলিকে ছেদন করিয়া। রাঙাপিসী, আমার ভিক্ষা-মা কৃষ্ণভামিনী স্বেচ্ছায় বৃন্দাবন বাস করেন নাই। রত্নেশ্বর রায় তাহাকে সম্পত্তি দেবোত্তর করাইয়া, সে দেবোত্তরের ট্রাস্টি নিজে হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। কেন জান? কৃষ্ণভামিনী দাসী ছিলেন বন্ধ্যা এবং বয়সে পঁচিশ-ত্রিশ, তিনি বেয়াই সম্পর্ক ধরিয়া রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতে গিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সে-প্রেম এমনি গাঢ় এবং তাহার ফলে তাঁহার পক্ষে দেহ-কামনা এমনই অসম্বরণীয় হইয়াছিল যে, একদিন সমস্তই সকাতরে নিবেদন করিয়া রত্নেশ্বর রায়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রখানিকেই তিনি কৃষ্ণভামিনী দাসীর মৃত্যুবাণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে এইভাবে সর্বস্ব দেবোত্তর করাইয়া নিজে সেবায়েত ট্রাস্টি হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

রাঙাপিসী, কৃষ্ণভামিনী দাসী কিন্তু নির্বাসিতা হইয়াও নির্বাসিতা হয়েন নাই। তিনি বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিয়া কলিকাতাতেই কৃষ্ণাবাই নামে বাইজীর পেশা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি নাই, মা বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি কাঁদিয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া আমার সেদিন প্রথম আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।

আর একজন এসব কথা আমাকে বলিয়াছিল। সে-ব্যক্তি শ্যামনগরের ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই।

* * *

সুরেশ্বর থামলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে টান দিয়ে পত্রখানা পত্রের বাণ্ডিলে রেখে দিয়ে বললে—থাক, পত্র থাক। কি হবে তোমার কাছে এত প্রমাণপ্রয়োগ দিয়ে?—প্রয়োজন নেই। মুখেই বলি। রায়বংশের প্রাচীনকালের কথার আর অল্পই বাকি। সামান্য।

তবে একটা কথা বলব। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এর একটি ঘটনাও গোপন করা নেই। এবং আশ্চর্যের কথা সুলতা, তিনি এইসব ঘটনা লিখতে গিয়ে অসত্য, অসততা এবং মিথ্যা ও পাপকে, আগুনের অন্ধকারকে দহন করার মত দহন করেছেন। দৃঢ়বিশ্বাস এবং সূক্ষ্মতম বিচারবোধের পরিচয় সেখানে ছত্রে-ছত্রে। এবং নিজের উপরেও শাস্তিবিধান করেছেন।

কৃষ্ণভামিনীর পত্র পেয়ে তিনি তিন দিন উপবাস করেছিলেন। এবং নিজের রূপ ও কান্তির জন্য বার বার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, "হাঁ, আমার এই কান্তি ও রূপও ইহার জন্য দায়ী। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই বাক্য শ্রবণে পাপ, চিন্তনে পাপ। পত্রযোগে সেই পাপ আমাকে অর্শিল। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত উপবাসাদি করাই স্থির করিলাম।" তাছাড়া এই রাধাসুন্দরকে কীর্তিহাটে নিয়ে গিয়ে স্থাপন ক'রে, তার বাৎসরিক এক হাজার টাকা আয় এমন পাকা করে কীর্তি ও কর্মে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তা থেকে বছরে দশ টাকাও রায়বংশের কোন স্বার্থে লাগেনি। না, সুলতা লাগে, কিছু লাগে; লাগে রাধাসুন্দরের অন্নপ্রসাদ। সে-প্রসাদ আগে রায়বংশে গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আজ আর সে-নিষেধ কেউ মানে না। আর ওই পঙ্গু ব্রাহ্মণটি এবং সেই ব্রাত্য ঔরসজাত সন্তানটিকে বুকে করে বৈশাখের রৌদ্রে যেদিন ওই যুবতীটি আগুনের মত তেতে-ওঠা মেদিনীপুরের লালমাটির পথের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেদিন ডায়রীতে লিখেছেন—"আজ পঙ্ক এবং চন্দন, এই-দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তাহা পারিতেছি না। নাসারন্ধ্র বলিতেছে পঙ্ক-গন্ধ সহ্য করিতে পারি না, পারি না, পারি না। শ্বাসরোধ করিতেছে। অন্তর বলিতেছে—শ্বাসরোধে মৃত্যু অনিবার্য বিধান। যাহা বিধান, তাহাই বিধাতার নির্দেশ। অঙ্গে পঙ্ক মাখিলে চর্মরোগ হইবে। চর্মরোগও ব্যাধি। কি করিব, কুষ্ঠরোগীকে মমতা করিয়া কোন্ বিধানে আশ্রয় দিব? বুঝিতেছি এই মমতাগুলি মোহ, এই দুঃখগুলি অলীক, মিথ্যা। কি করিব? তাহাকে নির্বাসন দিতে আমি বাধ্য।

তবে এই বারো হাজার টাকা আয় সেকালে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আর চিকিৎসার জন্য। সে-দান কলকাতার মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও তা বজায় আছে। আজও তা থেকে কিছু উপকার হয়।

তবে একথাও ঠিক নয় যে, এ থেকে নিজের বংশের জন্য তিনি কিছু করেন নি। ধর্ম

এবং আইন বিচারমত পাপ বাঁচিয়ে এ সম্পত্তি নিজের নামে পত্তনী এবং দরপত্তনী নিয়ে দশ হাজার টাকার জমিদারীকে বাইশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। পথ সেই চিরাচরিত পথ।

খাজনা বৃদ্ধি আর পতিত আবাদ।

শেষ বৃদ্ধি হয়েছে রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর—শিবেশ্বর রায়ের হাতে তখন জমিদারী গেছে। দেবেশ্বর রায়ও সদ্য মারা গেছেন তখন। তারপর পতিত আবাদ থেকে বৃদ্ধির দিকটা অব্যাহত থাকলেও ফসলের মূল্যবৃদ্ধিহেতু বৃদ্ধি—যা ইংরেজের আইন অনুসারে পনের বছর পর পর জমিদারেরা পেতে পারে, তা আর পায় নি রায়েরা।

* * *

সুরেশ্বর পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে নিভিয়ে দিয়ে বললে, সেসব তথ্য ফ্যাক্টস ফিগারস তুমি ভাল করেই জান আমার চেয়ে। স্বীকার করবে নিশ্চয়। গোটা বাংলাদেশ জুড়েই ওখানে এক হাল। ওকথা থাক, এখন রায়বাড়ীর কথা বলি। পৃথিবীর মানুষের কাছে তোমার মারফৎ আমার জবানবন্দী শেষ করি।

বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ দেবেশ্বরের যেদিন ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েছিল, সেদিন চিঠি লিখতে বসেছিলেন বাপকে। তখন দেবেশ্বর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছেন, ষোল বছর বয়স পার হয়েছেন, তখন তাঁর মন একটা চেহারা নিয়েছে—যে-চেহারাটা বলতে গেলে রত্নেশ্বর রায় তাঁর অজ্ঞাতসারে নিজেই গড়ে দিয়েছেন। তবে তাকে শেষ গড়ন দিয়ে গেছে কৃষ্ণাবাই—অর্থাৎ বৃন্দাবন থেকে নিরুদ্দিষ্টা কৃষ্ণভামিনী দাসী আর শ্যামনগরের ঠাকুরদাস পাল, রত্নেশ্বরের গোপাল দাদার বাবা, রত্নেশ্বরের বাল্যকালের দোসর, পার্শ্বচর, শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী, যা তোমার পছন্দ সুলভ সেই বিশেষণই তুমি গ্রহণ কর। তখন তিনি রত্নেশ্বরকে বলেন—"নিম। নিম। নিম। ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত—নিম না ছাড়ে আপন জাত।" জেঠামণি, হয়তো তুমিও তোমার বাবার মত হবে। কিন্তু শোন শোন— এই সদগোপ জেঠা তোমার তোমাদের জন্তে প্রাণ দিতে পারে গো! তা পারে। কিন্তু দুঃখু কি জানো, তোমরা বড় হলেই ফণা তুলে ফোঁস ক'রে ওঠো, উঠে বল—তোরা ঢোঁড়া—তোরা দাঁড়াশ—তোরা সরে যা। তখন সে ফোঁসানি সামলায় কে?

কৃষ্ণাবাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দেবেশ্বরের, কলকাতার এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর বিয়ের আসরে। রত্নেশ্বরের চিঠির নির্দেশ মত সামাজিকতা রক্ষা করবার জন্য তাঁকে যেতে হত রায়বাড়ীর তরফ থেকে লৌকিকতা বা উপহার নিয়ে। তখন লৌকিকতারই যুগ ছিল। বড় বড় বাড়ীর রেওয়াজ ছিল তাঁদের থেকে বড় বাড়ীর নিমন্ত্রণে মোহর বা গহনা দেওয়া। সমান অবস্থার বাড়ীর নিমন্ত্রণে নগদ টাকা, দশ বিশ পঞ্চাশ কদাচিৎ একশো টাকা। সেটা নগদ টাকা। বধূর সামনে রাখা পরাতে রেখে দিয়ে, আশীর্বাদ বা প্রণাম করে চলে আসতেন।

পাশে যৌতুক বা লৌকিকতা গুনে নিয়ে খাতায় লিখে রাখবার কর্মচারী বসে থাকত। ওদিকে একদিকে খাওয়া-দাওয়ার আসর, অন্যদিকে একটা আসরে চলত সঙ্গীত-নৃত্যের আসর। সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরা সামনে বসতেন, ফরমায়েস করতেন; পিছনের লোকেরা আসত যেত; আসত যেত; ক্রমান্বয়েই বদল হত আসনের লোক। এই আসরে তরুণ কন্দর্পের মত দেবেশ্বরের হাত ধরে গৃহকর্তা নিজে সামনের আসনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বস গান শোন; খেয়ে তবে যেতে পাবে।

আশপাশের সামনের সারির শ্রোতাদের বলেছিলেন—কীর্তিহাটের রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে। গান ওদের রক্তে।

কথাটা সে-কালে কলকাতার ধনী ও গুণীসমাজে সকলেই জানত। জানত এ বংশের সকলেই জন্ম থেকে গানে বোধ নিয়ে জন্মায়, কণ্ঠস্বরও সকলের সুস্বর। এদের বংশে কেউ একজন নাকি গান গেয়ে শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

১৮৭৮।৭৯ সাল। বাংলাদেশে রামপ্রসাদী গান তখন কীর্তনের সঙ্গে প্রায় সমান মর্যাদা পেয়েছে। তান্ত্রিক সাধুদের যুগ সেটা। বীরাচারী বামাচারীদের উপর যত ঘৃণা ইংরাজী শিক্ষিতদের, সাধারণের কাছে তত সমাদর ভক্তিমার্গী শক্তিসাধকদের। রামকৃষ্ণদেব তখন পূর্ণ প্রকাশ করেছেন নিজেকে দক্ষিণেশ্বরে। ইংরিজী শিক্ষিত নরেন দত্ত, থিয়েটারের প্রবর্তক, শেক্সপীয়রভক্ত জি সি তাঁর পায়ে গড়াবেন, তার আয়োজন চলছে।

গৃহস্বামীর কথায় সকলেই ফিরে তাকিয়েছিল এই সুন্দর তরুণটির দিকে। দেবেশ্বর তখন লম্বা ছিপছিপে অসাধারণ সুন্দর কিশোর। লজ্জিত হয়ে তিনি সকলকে নমস্কার ক'রে চেয়ারে বসে, আসরের নায়িকার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

—এ কে? এ কে? এ কে?

হঠাৎ গায়িকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সেই আসরের উপরই আছাড় খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

দু'দিন পর একজন লোক এসে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে। লিখেছিলেন—তাঁর ভিক্ষামাতার প্রেতিনী। তার প্রথম পত্রেই ছিল—বাবামণি আত্মহত্যা করিলে মানুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমিও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিঃসন্তান কায়স্থ কন্যা, তোমার মুখ কেবলমাত্র মা হইবার সাধ মিটাইবার জন্য দেখি নাই, মৃত্যুর পর তোমার হাতের একটু জল পাইব এবং "রৌরব নরক হইতে মুক্তি পাইব বলিয়াও আশা করিয়াছিলাম।"

তারপর ওই বিবরণ। বিস্তৃতভাবে তিনি লিখেছিলেন, কোন কথা গোপন করেন নি। লিখেছিলেন—"দোষ আমার আমি তাঁহার রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার চরণে আপনাকে বিকাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ফিরাইয়া দিলেই পলাইয়া আসিতাম এবং

দূর হইতে তাঁহাকে ভালবাসিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতাম। কিন্তু তিনি আমাকে পদাঘাতে দূর করিলেন। দেশের ও দশের সম্মুখে অপমানিত করিলেন। তাহা আমার সহ্য হয় নাই। আমি বৃন্দাবন হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম আগ্রা। আমার রূপ ছিল এবং গানের গলা ছিল, তাহার সহিত সঞ্চিত কিছু গোপন অর্থ ছিল, আগ্রায় আসিয়া গান শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, তোমার পিতার সহিত এইভাবে একদিন সাক্ষাৎ করিব আশা করিয়া। কিন্তু আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার গোপাল, তুমি আমার মুক্তিদাতা ব্রহ্মচারী, এই পাপিনীর বেশে দেখা হইল তোমার সঙ্গে।"

রাঙাপিসী, এই পত্র পাইয়া আমি তিন দিন ক্রন্দন করিয়াছিলাম। গোপালদাদাকে পাঠাইয়া তাঁহার সন্ধান লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম; দেখা করিয়াছিলাম হাওড়া স্টেশনে, তিনি এই বঙ্গদেশ হইতেই পলাইয়া যাইতেছেন। মা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। তিনি জোর করিয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়াছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে টাকাও দিতে চাহিয়াছিলেন। একটা ভারী হাতবাক্স লইয়া বলিয়াছিলেন—এইটি তুমি লও।

কিন্তু রায়বংশের দেবেশ্বর তাহা লয় নাই। পিসী, সেদিন যদি বাক্সটা লইতাম, তবে ভায়লেটকে লইয়া সংসার পাতিয়া ব্যবসা করিবার জন্ত টাকা ঋণ চাহিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে হইত না। এবং ঠিক এইরূপ পরিণতিটা সম্ভবতঃ হইত না রাঙাপিসী, এই অল্পকালের জীবনে, এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে দেখিলাম অনেক, বুঝিলাম অনেক। স্বর্গ-নরকের হদিস পাই নাই, ভগবানকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অবিশ্বাস, তাই বা করিতে পারিলাম কই? ধর্ম—যে ধর্ম তোমরা মানিয়া চল তাহাকে মানিতে পারি নাই। তাহাকে মানিতে পারি নাই বাবামহাশয়ের কার্যকলাপের জন্ত। মানুষটা পাথর, মানুষটা পাথর! রাঙাপিসী, এই পাথরে আমি মাথা ঠুকিয়া লড়াই করিয়াছি, রক্তাক্ত করিয়াছি মাথাটা। শুধু শেষ কালটায়—রাঙাপিসী—বুঝিতে পারিলাম না। দশদিন শ্রাদ্ধের সময় আসিতে পার নাই। অথবা ইচ্ছা করিয়াই আইস নাই। ছয় মাসে রায়বাহাদুরের উপযুক্ত শ্রাদ্ধ করিব। তুমি আইস। কলিকাতায় থাকিয়াও তোমার সহিত দেখা করি না, তোমার বাড়ী যাই না, তাহার কারণ, অন্যে না-চিনুক আমি তোমাকে চিনি। আমি তোমাকে জানি। তুমি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের যোগ্যা ভগ্নী। তুমি আমাকে মগুপ বলিয়া ঘৃণা করিবে। আমি দেবতা মানি না, ধর্ম মানি না বলিয়া ঘৃণা করিবে। আরও অনেক কারণে ঘৃণা করিবে।

* * *

চিঠিখানার তারিখ ১৮৯৭ সাল। ১৮৯৬ সালে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় মারা গিয়েছিলেন। এগিয়ে এসে পড়েছি। ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল আঠারো বছর। এই আঠারো বছর রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় এবং দেবেশ্বর রায়ে নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রাম একদিনের জন্ত থামে নি। রত্নেশ্বর রায় পুত্রকে চালাতে চেয়েছিলেন নিজের মতে, নিজের পথে।

সেদিন, মানে, যেদিন রত্নেশ্বর রায় বড় ছেলের অভিযোগের কথা শুনে, লক্ষ্মীর ঘর থেকে চোখের জলের সঙ্গে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন, অঞ্জনার মেয়েকে আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম সংসারজীবনে, সমাজজীবনে। চেয়েছিলেন রেভারেণ্ড কালীমোহন ব্যানার্জি, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনবেন। এদের মধ্যে ক্রীশ্চিয়ানিটি ভারতবর্ষের স্পর্শ পেয়েছিল, ক্রীশ্চিয়ানিটির সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধনার ধারাটি যুক্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রয়েছে। আর যারা মেমসাহেব বিয়ে করে বা যে মেয়েরা সাহেব বিয়ে ক'রে ওই এলিয়ট রোড, কি খিদিরপুরে পাড়া ফেঁদেছে, যারা নাম পাল্টেছে, বুলি পাল্টেছে, তারাও রয়েছে সুলতা। তাদের দৃষ্টান্ত সে-কালে আরও কটুভাবে প্রকট ছিল, তারা নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করত। তাই যে সম্পর্ক অঞ্জনা ছিঁড়ে চলে গিয়েছিল, সেই সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন ভায়লেটকে দেশী ক্রীশ্চানসমাজে বিয়ে দিয়ে।

গোপালকে টাকাও দিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার টাকাই দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন দেবশ্বরের হাত দিয়েই। তারপর করেছিলেন দেবেশ্বরের বিবাহের আয়োজন।

রাঙাপিসীর পছন্দ-করা ওই দশ পার হয়ে এগারোয় পা-দেওয়া পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়েটির নাম উমা। মাথায় ছোটখাটো, তবে রূপসী বটে। তার সঙ্গে একটু—

থেমে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—কি বলব সুলতা? মানে ঠিক বিশেষণটি যে খুঁজে পাচ্ছি না। প্রগল্‌ভা কথাটা ঠিক হবে না।

অর্চনা হেসে বললে—বড়ঠাকুমা, ছেলেবেলা দিদিমার আদরে অকালে একটু বেশী পেকেছিলেন।

—না, অকালপক্ক কথাটাও খাটবে না। না। বরং প্রিকোসাস বলতে পারা যায়।

—না সুরোদা, প্রিকোসাস শব্দটাও ভাল না, ঠিকও নয়। তার থেকে বরং অকাল ভারিক্কি বা অকাল গিন্নীবান্নী ভাল। নিজের দিদিমার কাছ থেকে ওটাই শিখে এসেছিলেন স্বামীর প্রেয়সী হওয়ার চেয়ে বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন তিনি বেশী। বেলফুলের মালা গেঁথে রাধাসুন্দরের এবং রাধারাণীর জন্য নিত্য পাঠাতেন। কিন্তু কোনদিন সন্ধ্যায় বেলকুঁড়ি মালী তুলে দিয়ে যেত, তা নিয়ে মালা গেঁথে নিজের খোঁপায় পরেন নি বা স্বামীকে পরাবার জন্যে আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে যান নি।

—ঠিক বলেছিস অর্চি। এ কথাটা এমন ভাবে বলতে আমি কখনও পারতাম না রে। রাঙাপিসীকে যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন ওই পিতৃশ্রাদ্ধের সময়, তাতে শ্রীউমার সম্বন্ধে লিখেছে —"রাঙাপিসী, বয়স তখন ষোল পার হইয়া সতেরোতে পড়িয়াছি, একটি এগারো বছর

পা-দেওয়া কনেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তখন প্রেম করিয়াছি ভায়লেটের সঙ্গে। সাদা-চামড়ার ক্রীশ্চান্ মেয়ে, গোয়া হইতে কলিকাতার ফিরিঙ্গীপাড়া হইয়া কীর্তিহাটের গোয়ানপাড়া ফেরত ভায়লেটের সঙ্গে প্রেম করিয়াছি যে উল্লাসের মধ্যে, যে নেশার মধ্যে, তাহা বিবাহিতা এই পত্নীর মধ্যে ছিল না। থাকিবার কথা নয়। তাহার উপর উমার ছিল প্রাচীনকালের মন। সে মনের কাছে আনন্দের চেয়ে পুণ্য ও ধর্মের মূল্য বেশী। ওই বয়সেই সে ব্রতের জন্য স্বচ্ছন্দে উপবাস করিতে পারিত। সারাটা দিনই প্রায় সে কীর্তিহাটের ঠাকুরদের অর্চনার আয়োজনে ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু আমার সঙ্গে দুদণ্ড বসিয়া গল্প করিবার অথবা একটি বসন্তকালে পূর্ণিমারাত্রে মুখের দিকে চাহিয়া বসিবার অবকাশ বা আগ্রহ তাহার হয় নাই।

বলিলে বলিত, 'কেমন কথা তোমার? এ সবই তো তোমার জন্যই করি, না 'হরের মায়ের' জন্য করি। 'হরের-মা' কথাটা সে আজও ব্যবহার করে।

তাহার উপর রাঙাপিসী, বিবাহের পর কীর্তিহাটে ছিলাম এবং এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। সর্বত্রই, একলা আমার উপর নহে, আমাদের উভয়ের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য কীর্তিহাটের সংসারটাই কলিকাতায় আসিল।

শিবেশ্বর রামেশ্বরকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী আসিলেন। বাবামহাশয় পনের দিন থাকিতেন কীর্তিহাটে, পনের দিন থাকিতেন কলিকাতায়।

একদা একখানা দলিল তৈয়ারী করিয়া আমাকে বলিলেন—সহি কর।

দেখিলাম, এলিয়ট রোডের যে বাড়ীখানা আমি লিজ লইয়াছিলাম, সেখানার মালিকানি স্বত্ব কিনিয়া তিনি ওই বাটী ভায়লেটকে দান করিতেছেন। এবং জানিলাম—ভায়লেটের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।

জবানবন্দী আমার শেষ হয়ে আসছে—সুরেশ্বর বললে।

ভায়লেটকে অনেক খেসারত দিয়ে, রত্নেশ্বর রায় দেবেশ্বরের সম্মুখ থেকে সরিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভায়লেট তার মানে দেবেশ্বরের অন্তিম মুহূর্তে বিকারগ্রস্ত চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় বিকারের ঝোঁকে বলেছিলেন, গোপালদা বের ক'রে দে, কেন আনলি ভায়লাকে—বের ক'রে দে! জোর করে বের ক'রে দে, আ, হাসছে দেখ! ইউ গেট আউট আই সে! শাট্ দ্য ডোর। ইউ শাট্ দ্য ডোর!

আমার ব্যাখ্যা কি জান? শ্যামাকান্তের প্রতি সেই মহাশক্তির রোষ। সেই রোষ ভায়লা হয়ে এসেছিল তাঁর সামনে।

হঠাৎ চুপ করে গেল সুরেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সুলতা বললে—হঠাৎ এমন করে, এই যুগে, উনিশশো সালের পঞ্চাশ বছরের পর যখন

এ্যাটমিক এজে মানুষ পা দিচ্ছে, তখন এইভাবে ব্যাখ্যা করছ কেন? তুমি তো রিঅ্যাকশানারি ছিলে না, হঠাৎ এসব কি? না—এ সব তোমার আর্টের তুলির ছোপ?

অর্চনা মৃদু স্বরে বললে—মধ্যে মধ্যে এই রকম বলে ও—বংশের ঋণ শোধ করতে তুমি বাধ্য।

সুরেশ্বর বললে—নিশ্চয়ই তা বলতে পার তুমি। কিন্তু না। হয়তো বলার ঢঙটা আমার ঠিক হল না। হেরিডিটির থিয়োরি দিয়ে বললে বাহবা দিতে। তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, সেটা হল এই যে, দেবেশ্বর রায় নিজে এই কথাগুলো একরকম লিখে গেছেন মৃত্যুর দিনই। সে লেখা তোমাকে দেখাব আমি।

নইলে জীবনের শেষ বছরটা তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে যাপন করেছিলেন, জীবনে শান্তি খুঁজেছিলেন। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন কেন, ভালবেসেছিলেন তাঁর উপেক্ষিতা স্ত্রীকে।

স্ত্রী তাঁর সে ভালবাসা নিতে চান নি। বিশ্বাস করেন নি। হয়তো নেবারও শক্তি তাঁর ছিল না, তখন তিনি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন দেবতার পায়ে।

দেবেশ্বর তাতে দমেন নি। বলেছিলেন—আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, আমাদের ডাইভোর্স নেই; আমার তোমার উপর অখণ্ড অধিকার। দেবতা হোক, দৈত্য হোক, যে হবে সে হোক, তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে হয় মরব, নয় তোমায় ছিনিয়ে আনব।

এবং তা তিনি এনেছিলেন; পেরেছিলেন তিনি স্ত্রীকে তাঁর অভিমুখিনী করতে। ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা গিছলেন; তাঁর বয়স তখন ছেচল্লিশ, তাঁর স্ত্রীর বয়স চল্লিশ; বড়ছেলে—আমার জ্যাঠামশাইয়ের বয়স তখন সাতাশ, আমার বাবার বয়স পঁচিশ। তখন দেবেশ্বর রায় অহরহ চাইতেন স্ত্রীকে, বলতেন—জীবনে এত শান্তি আছে তা জানতাম না।

আমার ঠাকুমা উমা দেবী বসে হাসতেন।

হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে দেবেশ্বর চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, স্ত্রী শঙ্কিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করত—কি হল? এঁ্যা।

দেবেশ্বর বলতেন—এই জীবনেই সব শেষ? তোমাকে আর পাব না? এত ভালবাসা এত প্রেম সব শেষ এই কটা দিনেই?

স্ত্রী বলতেন—শেষ কেন হবে? শেষের মধ্যে অশেষ যিনি, ওই মা—ওঁকে ডাক, ওঁর দয়া হলে, শেষের পরেও আছে।

দেবেশ্বর বলতেন—না। ম্লান বিষণ্ণ হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন—meaningless, life is meaningless উমা!

চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতো। তাঁর স্ত্রী হাঁপিয়ে উঠতেন, তিনি নিজে এর উত্তর

জানতেন নিজের বিশ্বাসবোধে, কিন্তু তা বিশ্বাস করাবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল না। তাও দেবেশ্বর রায়কে।

তিনি নাস্তিক ছিলেন চিরজীবন। তিনি মৃত্যুর দিন এই কথাগুলো লিখে গিছলেন। "শ্যামাকান্ত মহাশক্তির যে রোষবহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বহ্নির ক্ষুধার তৃপ্তি আজও হয় নাই। বাবামহাশয় ইহার দহন হইতে বাঁচিয়াছিলেন নিজের পুণ্যে। তবু তাঁহার বুকে নাগিনীর ছোবলের মত ছোবল সে দিয়াছিল কিন্তু দংশন করিতে পারে নাই। আমাকে সে ছাড়িল না, আমি মরিলাম।"

আরও অনেক কথা। যথাসময়ে বলব। এখন হারানো ক্রমটা খুঁজে নিয়ে বলি।

বিয়ের পর সরস্বতী বউরাণী, তিন ছেলে এবং বউকে নিয়ে এসে পাকা হয়ে বসেছিলেন জানবাজারের বাড়ীতে।

দেবেশ্বর ফার্স্ট ডিভিশনে এণ্ট্রান্স পাস ক'রে প্রেসিডেন্সীতে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন; শিবেশ্বর রামেশ্বর এঁরা তখন একজন চৌদ্দ বছরের, একজন এগার বছরের। কালের বয়স বাড়ে কিনা জানিনে। তবে আমাদের বাড়ে বলে হিসেব একটা রাখি। ১৮৮০ সাল পার হয়েছে। বাংলাদেশের জীবনসমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার জেগেছে। ইংলিশ চ্যানেলের, মেডিটেরিয়ানের উত্তর কূল ঘেঁষা জোয়ারের সাদা ফেনা মাথায় করে যে ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ে আমাদের ঘরদোরের সব কিছু ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, আমাদের জীবন-সমুদ্রের ঢেউ সে ঢেউগুলোকে রুখে দিয়েছে। নতুন ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদী ধর্ম আর জীবনের প্রসার তখন তাতে আশ্চর্য জোর দিয়েছে। দু'চারজন মুসলমানও নাকি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তখন। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে কলরোল উঠছে। এরই মধ্যে নতুন বিয়ে করে দেবেশ্বর রায় প্রথম দুটো বছর শুধু পড়া আর নতুন বউকে নিয়ে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। বউকে জীবন ভ'রে পাওয়া সহজ হয় নি, পান নি; কলকাতার জানবাজারে বাড়ী হলেও এখানেও কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর চালচলনের এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। বউ সেই নিয়মানুসারে উঠত ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে। এবং নিজের ঝিকে ডেকে নিয়ে (ডাকতে অবশ্য হত না—ঝি উঠে বসেই থাকত) প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নান পর্যন্ত সেরে নিয়ে শাশুড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেন, শাশুড়ী বধূকে ভাবীকালের রায়গৃহিণীর ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতেন। রান্নাবান্না কি হবে—থেকে শুরু ক'রে, ঝি-চাকরের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সব কিছুর উপর দৃষ্টি রাখাই গৃহিণীত্ব। সেই দৃষ্টিই তিনি দিতেন। শ্বশুর এলে তাঁর সেবা এবং তাঁর উপদেশ শোনা ছিল অন্যতম কর্তব্য। এবং তার সঙ্গে আর একটা কর্তব্য ছিল, সেটি গভীর রাত্রিতে শেষবার ঘরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে দেখা না-করা।

প্রথম স্ত্রী যতদিন নিতান্ত বালিকা ছিলেন, ততদিন দেবেশ্বর এটা মেনেছিলেন, তিনি বই নিয়ে পড়ে থাকতেন। বই, বই, বই; পড়া পড়া পড়া! তাঁকেও তখন ছাঁচে ঢালাই চলছে।

অথবা নিজেই তিনি নিজেকে গড়ছেন। রায়বংশের আভিজাত্যের ইতিহাসে দেবেশ্বর শ্রেষ্ঠ অভিজাত। চলন ছিল ধীর, কিন্তু দীর্ঘদেহ দেবেশ্বরের পদক্ষেপ ছিল দীর্ঘ। বেশে-ভূষায় শুভ্রতার মহিমা ছিল অক্ষুণ্ণ, অমলিন। কণ্ঠ ছিল গম্ভীর কিন্তু স্বর ছিল মৃদু। পাতলা গোঁফ তখন বেরুচ্ছে, তা তিনি মোম দিয়ে মেজে সুচালো করতে চাচ্ছেন। গায়ে আতরের গন্ধ থাকত অহরহ। দৃষ্টি ছিল তির্যক, কথা বলতেন বেঁকিয়ে, ঠোঁট দুটিও একটু বেঁকত। নমস্কার করতেন সর্বাগ্রে। ঘৃণা করে তাকালে, যার দিকে তাকাতেন সে যেন মনে মনে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই দেবেশ্বর রায়—তখন তিনি ১৮।১৯ বছরের নবযুবক, তিনি এই বালিকা স্ত্রীর জন্য জেগে বসে থাকতেন। বই হাতে। বালিকাবধূ আসত পায়ের তোড়া বাজিয়ে, ঝুম ঝুম শব্দ তুলে। হাতে থাকত পান, নিজের হাতে সাজা। এও তাঁকে শিখিয়েছিলেন তাঁর দিদিমা এবং তাঁর শাশুড়ী। দেবেশ্বর পান দু-খিলি খেয়ে বলতেন—"মালা গাঁথতে পার না বেলফুলের এত কুঁড়ি!"

বালিকাবধূ শিউরে উঠে বলতেন—বাবা গো, ফুলে পূজো হয়, মা পূজো করেন—

—মা তো এত ফুল নিয়ে পূজো করেন না। ফুল তো গাছেই বাসী হয়।

—তা হোক। কি মনে করবেন বল তো!

এই বলতে বলতেই বালিকাবধূ ঢুলতে আরম্ভ করতেন। এবং আর কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বামীর বুকে বা কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেতেন।

এইভাবে দু বছর কাটল। বালিকাবধূ কিশোরী হল। "ত্রয়োদশ বসন্তের মালা"। দেবেশ্বর এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাস করলেন! দেবেশ্বর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। এবং বধূর কোলে এল প্রথম সন্তান।

এরই মধ্যে হঠাৎ এল সংঘাত। হঠাৎ সরস্বতী বউরাণী মারা গেলেন। সেই শ্রাদ্ধে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাটের এল ঠাকুরদাস পাল। ঠাকুরদাসের সঙ্গে আর একবার ছিন্ন প্রীতির বন্ধন জোড়া লেগেছিল, দেবেশ্বর রায়ের বিয়ের সময়। সুখী হয়েছিলেন রত্নেশ্বর। সব ভার দিয়েছিলেন ঠাকুরদাসকে। গোপালও এসেছিল বিয়েতে। কিন্তু সে কীর্তিহাট যায় নি। যায় নি গোয়ানদের জন্য। এবার এল এই শ্রাদ্ধে। তখন সে সেই পাঁচ হাজার টাকা মূলধনে ব্যবসা শুরু ক'রে বিশ-ত্রিশ হাজারের মালিক হয়েছে। হঠাৎ শ্রাদ্ধের পরেই ঠাকুরদাস খুন হয়ে গেল। বচসা করতে করতে পিক্রু গোয়ান তার পেটটা ফেড়ে দিলে।

সুরেশ্বর বললে—তার গূঢ় কারণটা রায়বাহাদুরের ডায়রীতে পাই নি সুলতা। পেয়েছি দেবেশ্বর রায় যে চিঠি লিখেছিলেন রাঙা পিসীকে, তার মধ্যে।

"ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই খুন হইলেন; সে খুনের হেতু কে, আমি অথবা গোপালদা তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই। তবে খুন পিক্রু করিলেও তাহা করাইল কে, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে নাই।"

গোপাল ঘোষ একটা অন্যায় করেছিলেন। দেবেশ্বরও তার ভাগী ছিলেন। গোপাল ঘোষ তখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মালিকই হন নি, তিনি তখন ব্রাহ্ম হয়েছেন। একটি মেয়েকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্রাহ্ম হয়েছেন। সে কথাটা তিনি বলেন নি। এবং দেবেশ্বর সেটা জানতেন, তিনিও সেটা বলেন নি। কথাটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল।

রত্নেশ্বর রায় প্রাচীনপন্থী, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। সে ক্ষোভ তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ। তিনি প্রথম দেবেশ্বরকেই বলেছিলেন—তুমি জান যখন, তখন আমাকে বল নি কেন?

দেবেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা, গোপালদা এখানে তো ব্রাহ্ম হয়েছে বলে মাথাও উঁচু করে নি। ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও খায় নি, খেতেও চায় নি; যেখানে থাকতে দিয়েছেন থেকেছে। ঠাকুর অসম্মানও করে নি।

রায়বাহাদুর বলেছিলেন—সে সদ্‌গোপ হয়ে বৈদ্যকন্যা বিবাহ করেছে। এ-অধর্ম। এর সাজা দেব আমি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তার আগে আমাকে সাজা দিতে হবে। কারণ এতে আমি মত দিয়েছিলাম। কাউকে জানাতে বারণ করেছিলাম। এবং এ শ্রাদ্ধেও তাকে আমি আসতে বলেছি বলেই সাহস করে সে এসেছে। বলেই তিনি চলে গিয়েছিলেন, অন্দরে নিজের ঘরে।

দেবেশ্বর লিখেছেন—"বাবা মহাশয়ের আসল ক্ষোভটা গোপালদাদার উপর, সে ব্রাহ্ম হইবে কেন? ব্রাহ্মধর্মের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সে তুমি অবগত আছ। আমার উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন—তোমার স্পর্ধা, তুমি এমন কথা বলিতেছ। শাস্ত্রের তুমি কি জান? আমি বলিলাম—কিছুই জানিতে চাহি না। তবে গোপালদাদা কোন অন্যায় করিয়াছে, যে শাস্ত্রে বলিবে, আমি মানিতে পারিব না। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। ইহার পরই পিক্র আসিয়া তাঁহার কাছে গোপালদাদার বিরুদ্ধে নালিশ করিল। ভায়লেটকে সে গোয়ানপাড়া হইতে তিন বৎসর পূর্বে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে।"

ঠাকুরদাস ছুটে এসেছিল। তার আগে রটে গেছে যে, পিক্র নালিশ করেছে, গোপালের নামে। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তুই বসে দেখ ঠাকুরদাস। আমার বিচারে বাধা দিস নে। আমি অন্যায় বিচার করব না।

ঠাকুরদাস চিনতেন তার দাদাঠাকুরটিকে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তার মানে? গোপাল আমাকে বলেছে, তুমি দেবুবাবুর উপর ক্ষেপেছ। দেখ, তুমি গোপালকে সাজা দাও-দাও, আমি তাকে সাজা দেব, ত্যজ্যপুত্তুর করব।

—আমিও দেবেশ্বরকে তাই করব। সম্পত্তি সব দেব বউমাকে। তারও জাত গিয়েছে।

—দাদাঠাকুর! এ সব তুমি কর না।

—না করে আমি পারি না। ধর্মের অপমান হয়েছে, পিক্র নালিশ করেছে।

—ধম্ম-অধম্ম বুঝি না। দেবুবাবা গুলি খেয়ে মরতে চেয়েছিল। প্রাশ্চিত্তির তার হয়ে

গিয়েছে। গোপালকে তুমি তখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছ। কেন দিয়েছিলে! আর পিক্রু? . ওকে তুমি শুধোও দিকি, ওর বোনের বিচার কে করবে? সে তো তোমার দেওয়া বাড়ীতে তোমার টাকায় ধেই-ধেই করে নাচছে! বেশ্যে—

পিক্রু চিৎকার করে উঠেছিল—ঝুটা বাত। মু সামাল করনা—

—যাঃ বেটা গোয়ান। চেঁচাসনে মেলা।

ধমক দিয়েছিলেন এবার রত্নেশ্বর—ঠা—কু-র-দাস।

—দাদাঠাকুর কার বিচার করবে? বল তো? তোমার বাবা, তার বাবা, তোমার মায়ের বাবা।

—দারোয়ান! দরওয়াজা সব বন্ধ কর, দারোয়ান। ঠাকুরদাস, কি বলছিস! আস্তে বল। আস্তে।

গলা নামিয়েই বলেছিল ঠাকুরদাস—কিন্তু নিচু গলা হলেও খুব শক্ত গলায় বলেছিল—দেবুবাবাকে নিয়ে যদি কিছু কর—আমি জানি, তুমি পার, সব পার, যে শ্যামনগরকে বাঁচাতে তুমি মরতে গিয়েছিলে, সেই শ্যামনগরের মানুষের টুঁটিতে পা দিয়ে তুমি টাকা বার ক'রে সেই টাকায় ইস্কুল করে দিলে। তুমি সব পার। কিন্তু এ কাজ করলে আমি গাঁয়ে-গাঁয়ে বলে বেড়াব ঢাক বাজিয়ে,—শুধাও তোমাদের জমিদার রত্নেশ্বর রায়কে—, তার মায়ের বাবার নাম কি? জমিদারের আসল মা কে? আসল বাবা কে? তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছ? উল্টে দেব শাকের ঢাকা। বলব, শুধাও ভায়লা কার বিটি? ওর বাবা যে হোক, মাটা কে?

মনে মনে চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে কিছু হয় নি। শুধু বলেছিলেন—চেঁচাস নে ঠাকুরদাস, চেঁচাস নে। যা বলবি আস্তে বল।

ঠাকুরদাস ভেবেছিল, সে জিতেছে। সে আরও স্ফীত হয়ে বলেছিল—আমি সব জানি, তোমাদের ভাই-বুনের ঝগড়ার সময়, যেদিন অন্নপূর্ণাদিদিকে সব কথা বলে চিঠিপত্তর পড়ে শোনাও, সেদিন আমি সব শুনেছি। ওসব কথা তুমি ছাড়ান দাও। দেবুবাবা বড়লোকের ছেলে, তার উপর এই তোমাদের বংশাবলীর ধারা। একটা শাপ-শাপান্ত আছে। এক পুরুষে তা ক্ষয় না দাদাঠাকুর। অনেক পুরুষ লাগে। আর এ তো একটা ওই জাতের ছুঁড়ি। নিজেদের ভেতরেই দশজনার সঙ্গে রসের খেল্ খেলে, শেষে একজনাকে বিয়ে করে। আজ বিয়ে করে, কালকে ছাড়ে, আবার আর একজনাকে ধরে।

পিক্রু লাফ দিয়ে উঠেছিল আবার—হুজুর!

হুজুর তখন পিক্রুর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

হুজুর বলেছিলেন—আমার ছেলের বিচার আমি করতে পারি পিক্রু, কিন্তু ঠাকুরদাসের ছেলের বিচার আমি করতে পারব না।

—ঠাকুরদাস কি বলছে, তার বিচার কর।

—তাও পারব না।

—তবে আমি নিজ জোর সে-শোধ নিয়ে লেবে।—

—সে কথা ওকে বল। বোঝাপড়া কর।—

বাস। সঙ্গে সঙ্গে পিক্রু ঠাকুরদাসের টুঁটি চেপে ধরেছিল। ঠাকুরদাস চমকে উঠে গলা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে বলেছিল—আয় শালা—আয়, বাইরে আয়। তুই গোয়ান, আমি গোপ। আয়!

তারপর, ওই কংসাবতীর ঘাটে—।

*　　　*　　　*

সুরেশ্বর চুপ করলে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালে একখানা ছবির সামনে।

দেবেশ্বর রায় আর উমা দেবী—তাঁর স্ত্রীর ছবি। ছবিখানায় দুজনের মধ্যে যেন একটা পাতলা কালো যবনিকার আড়াল পড়ে আছে। সুলতার মনে হল, যেন একটা মূর্তি। নারী-মূর্তি।

সুরেশ্বর ছবিখানা দেখতে দেখতে বললে, দেবেশ্বর রায় সেই দিনই রাত্রে গোপালকে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন কীর্তিহাট থেকে। কীর্তিহাট থেকে কলকাতায়। শুধু স্ত্রীকে বলেছিলেন—চল আমার সঙ্গে।

স্ত্রী বলেছিলেন—আমি রায়বাড়ীর বউ, শ্বশুরের অনুমতি না নিয়ে যেতে পারব না।

ব্যাস, সেই অবধি এই আড়াল রয়ে গেল। ধর্ম, দেবতা, রায়বংশের লালসা যা বলবে বলতে পার।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

সে ছবিখানার সামনে থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল আর একখানা ছবির সামনে। এ ছবি-খানা তার নামকরা ছবি। Indian Madona। একটি কালো মেয়ের কোলে একটি ছেলে। তার পিছনে যে রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড তাতে একটা ক্রুশের ছায়া পড়েছে।

সুলতা বললে—ও ছবিটা তো—?

অর্চনা বললে—হ্যাঁ, কুইনীর ছবি।

ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং শব্দে তিনটে বাজল। সুরেশ্বর ছবিখানার ধার থেকে সরে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে দিলে। পূর্ব-আকাশে শুকতারাকে দেখা যাচ্ছে।

সুরেশ্বর বললে—রাত্রির তৃতীয় প্রহর পার হল। চতুর্থ প্রহরের সঙ্গে সঙ্গেই আমার জবানবন্দী শেষ হবে। কাল থেকে সাধারণ মানুষ সুরেশ্বর রায়। কীর্তিহাটের জমিদার বংশের সন্তান নয়। কাঠগড়ার ভেতর থেকে বেকসুর খালাসের রায় নিয়ে বেরিয়ে আসব।

জলন্ত সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলে সে। তারপর বললে—অর্চনা আছিস ভালই হয়েছে। অসঙ্কোচে এক গ্লাস হুইস্কী খেতে পারি। তুই না থাকলে আমার সঙ্কোচ হত। সুলতা, নতুন কালের মেয়ে, রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর, কিন্তু তবু Indian moral code খানা ওর কাছে পুরনো হয় নি। ও আমাকে বলেছে খেতে, কিন্তু তা আমি পারি নি। ভাবছিলাম, আর খাবই না। কোন দিনই না। কেননা জমিদারী যখন উঠে গেল, তখন রায়বংশের শেষ অভিজাত পুরুষ হিসেবে মদটা আমার ছেড়েই দেওয়া উচিত। তাতে যদি এবার বেণীর সঙ্গে মাথাটাও যায় তো যাক। এর আগে বহুবার ছেড়েছি, আবার ধরেছি। এবার আর না। সুতরাং শেষ গ্লাসটা খেয়ে নিই। রায়বংশের সাতপুরুষের মধ্যে কুড়ারাম রায় থেকে বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় পর্যন্ত সবটাই বলেছি। এদিকে আমার খানিকটা এবং আমার বাবার সবটাই সকলের জানা। দেবেশ্বর রায়ের কথা বলছি। মদের গ্লাস হাতে না করে দেবেশ্বর রায়ের কথা বলা যায় না।

সুলতা হেসে বললে—কেন অকারণে তাঁর দোহাই পাড়ছ সুরেশ্বর? তুমি তো নিজে আর্টিস্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চয় খেতে পার। লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অধ্যাপক, ছাত্র এমন কি ফরেন এম্বাসী কনস্যুলেটে অনেক খদ্দরধারীকেও এ পদার্থ পান করতে দেখা যায়। মন্ত্রীটন্ত্রী যাঁরা, তাঁরা এদেশে যাই করুন, বিদেশে গিয়ে কি করেন বা বাড়ীতে কি করেন, তা হলপ করে কেউই বলতে পারবে না। স্বাধীনতা আসার পরও যদি মদ খাওয়ার স্বাধীনতা না থাকে তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কি বল?

একটু দূরে দেরাজের মাথার উপর রঘু বোতল-গ্লাস-সোডা সব রেখে গিয়েছিল। সুরেশ্বর উঠে গিয়ে খানিকটা হুইস্কী গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে একটু চুমুক দিয়ে বললে—কুড়ারাম রায় ভটচাজ নবাবী আমলে কারণ করতেন মায়ের নাম নিয়ে; সোমেশ্বর রায় মদও খেতেন, কারণও করতেন, বীরেশ্বর রায় ইংরেজদের এদেশী নবাবীধরনে মদ্যপান করতে শুরু করে শেষে উন্মাদের মত খেয়েছেন। ওদিকে শ্যামাকান্ত ভ্রষ্ট তান্ত্রিক—ছিলেন রত্নেশ্বরের মাতৃবংশে। তাঁর বাপও ছিলেন তান্ত্রিক। মদ্যপান তিনিও করতেন। এতে প্রথম ছেদ টেনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। শ্যামাকান্তের পুত্রের দিকে বংশধারা বিমলাকান্তে শেষ। পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু রায়বংশে রত্নেশ্বরের পর আবার দেবেশ্বর এসে শুরু করলেন মদ্যপান। এবং রায়বংশে তিনিই প্রথম রায় এ্যারিস্টোক্র্যাট, যিনি খাঁটি মডার্ন ধরনে, মানে ইংরিজী ধরনে, ইংরেজের মত, খাঁটি বিলিতী মদ খেতে ধরেছিলেন।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বললে—এবং নির্ভীকভাবে খেতে ধরলেন।

কলকাতায় ফিরে এসেই মদ ধরলেন, ফের প্রকাশ্যভাবে।

ওদিকে রত্নেশ্বর রায় পরের দিন সকালে ছেলের খবর শুনলেন। ছেলে চলে গিয়েছে রাত্রে গোপালকে নিয়ে। খবরটা বললেন পুত্রবধূ। নতমুখে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে

বললেন। নিজে থেকে নয়, ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্বশুর।

রত্নেশ্বর রায় বললেন—তুমি চলে যাও শিবেশ্বর রামেশ্বরকে নিয়ে।

বধূ নতমুখে বললে—আপনাকে ফেলে যাব কেমন করে? মা নেই!

রত্নেশ্বরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল। বলেছিলেন—তাহলে এখানেই থাক। সম্পত্তি আমি সব তোমার নামে দিয়ে যাব।

বধূ বললে—না।

—বেশ। যে নেবার তাকেই দেব আমি। আমার পৌত্রকে দেব।

অর্থাৎ দেবেশ্বরের প্রথম সন্তান। রত্নেশ্বর ছেলেকে চিঠি লিখলেন, তার কোন উত্তর পেলেন না। পেলেন নোটিশ ধরনের একখানা চিঠি।

"আমার ভিক্ষামায়ের সম্পত্তি আমাকে দিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন রত্নেশ্বর রায়। জানালেন, "দলিলের নকল পাঠাইলাম, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, না পার, আইনজ্ঞ সলিসিটার এটর্নীর বাড়ী গিয়া পরামর্শ লইবে যে, ঐ সম্পত্তি কৃষ্ণভামিনী দাসী রাধাসুন্দরের নামে দেবোত্তর করিয়া ওই দেবোত্তরের ট্রাস্টি করিয়া গিয়াছে সরস্বতী বধূরাণীকে; এবং এই দেবোত্তর সম্পত্তির পত্তনীদার হইতেছেন বিমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং দরপত্তনীদার হইতেছেন ব্যক্তিগতভাবে রত্নেশ্বর রায়। এ সম্পত্তি কৃষ্ণভামিনী তোমাকে দেন নাই বা দিতে চাহেন নাই।"

এখানেই শেষ করেন নি, সঙ্গে পুত্রবধূ এবং শিবেশ্বর রামেশ্বরকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন দেবেশ্বরকে শান্ত এবং ক্ষান্ত করবার জন্য। সঙ্গে নিজে এসেছিলেন। ছেলে হেসেছিল। রত্নেশ্বর পৌঁচেছিলেন অপরাহ্ণ বেলায়, তখন সবে কলেজ থেকে ফিরছেন দেবেশ্বর। দেবেশ্বর কিছু বলেন নি, হেসেছিলেন।

বাপ সে হাসির অর্থ বোঝেন নি সেদিন। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছ?

ছেলে উত্তর দেন নি।

বাপ বলেছিলেন—হঠাৎ সম্পত্তির এমন কি প্রয়োজন হল? আমার থেকে পৃথক হতে চাও? স্বাধীনতা?

ছেলে এবারও উত্তর দেন নি। নিরুত্তর পুত্রকে পরাজিত ভেবে পিতা বিজয়ী বীরের মত কীর্তিহাট ফিরেছিলেন। ভার দিয়ে গিয়েছিলেন পুত্রবধূকে।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—তোমাকে বোধ হয় বলি নি সুলতা এবং তুমিও জান না যে, ঠাকুমা আমার আজও জীবিত। উন্মাদ বলে ডাক্তারেরা। সমস্ত দিবা-রাত্রি শুধু জপই করে যান। কারুর সঙ্গে কথা না, বার্তা না, ডাকলে সাড়া দেন না, আপন মনেই আছেন ঠাকুর নিয়ে। কাউকে যেন চিনতেও পারেন না। চিঠি গেলে পড়েন না,

ফেলে দেন। নিজের নাম, পরিচয় সব ভুলে গেছেন। প্রথম কিছুদিন বহরমপুরে রাখা হয়েছিল, তখন এ্যাসাইলাম ছিল ওখানে। তখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। শুধু জপ করতেন আর চীৎকার করতেন—মুক্তি দাও মুক্তি দাও মুক্তি দাও। তারপর ভায়লেণ্ট হয়ে গেলেন। কপাল ঠুকতেন দেওয়ালে। তখন তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বৃন্দাবনে বাড়ী কিনে রাখা হয়। সেখানেই আছেন। বলেন—তপস্যা করছি। স্বামীর মুক্তির জন্য তপস্যা করছি। নিজের সন্তানদের মুখ দেখেন না। গেলে ক্ষেপে যেতেন শুনেছি। নিজের মনে বেশ থাকেন। তপস্যা করছেন।

আমার ইচ্ছে আছে, আমি এই সব ঋণ শোধ করে একবার যাব। তাঁর সঙ্গে দেখা করব। সম্ভবতঃ আমাকে পরিচয় দিতে হবে না, দেখলেই চিনতে পারবেন। তাঁকে বলব—দাদুর সব দেনা শোধ করেছি আমি। মেজদি এখন সেই বাড়ীতেই থাকেন, অন্যদিকে। এই অর্চনা গিয়েছিল। আমার বাবার মৃত্যু তিনি জানেন না, মায়ের মৃত্যু জানেন না, হয়তো বিয়ের কথাও জানেন না। তবুও আমাকে চিনবেন তিনি। দেবেশ্বর রায়কে তিনি নিশ্চয় ভুলে যান নি।

অর্চনা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সুরেশ্বর বললে—ইম্পসিবল্।—

একটু পর আবার আরম্ভ করলে—সুলতা, পিতাপুত্রের সে এক আশ্চর্য যুদ্ধ! চিঠিগুলো পড়লে অবাক হয়ে যাবে! কারণ যুদ্ধ হয়েছে শুধু চিঠিতে। যা চিঠিতে হয় নি—এমনি হয়েছে, তা আছে অন্নপূর্ণা-মাকে লেখা চিঠিতে। দেবেশ্বর রায়ের জবানীতে বলা।

* * *

বাপ ছেলেকে শাসিয়ে চলে গেলেন বিজয়গৌরবে। ভাবলেন, ছেলে নিশ্চয় বুঝেছে। কিন্তু দেবেশ্বর ভয়ে বুঝবার মত ছেলে ছিলেন না। রত্নেশ্বর রায় নিজের যৌবনকালটা ভুলে যান নি, তবে তিনি কথায় কথায় বলতেন—আমার সঙ্গে তোমাদের তুলনা ক'র না। আমি গরীবের ছেলে হিসেবে মানুষ হয়েছিলাম। দেবেশ্বরের প্রেমের কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিতেন ইঙ্গিতে, বলতেন—জীবনের প্রথম থেকে ধর্মাচরণের আর ব্রহ্মচর্যের তেজ ছিল আমাদের। যা তোমাদের নেই। তোমরা সাহেব হতে চলেছ।

দেবেশ্বর এর উত্তর দিলেন কাজে।

পড়া ছেড়ে দিলেন। চাকরির খোঁজে বের হলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। নিজের জীবন, নিজের ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে হয়তো জগৎটাকেই নিজের ছাঁচে ফেলে গড়ে নেবেন বলে কল্পনা করেছিলেন।

সুন্দর সুপুরুষ দেবেশ্বরের রূপের কথা বলেছি। তার সঙ্গে ছিল বাকপটুতা, শীলতায় ভদ্রতায় সম্ভ্রমে, ফলে আনত তরুণ গাছের মত—আবার প্রয়োজন হলে, বক্রতায় বাঁক

তলোয়ারের মত—ধারে ক্ষুরের মত। চলে গেলেন মেদিনীপুর, জমিদারী কোম্পানীর আপিসে। কীর্তিহাটের পরিচয়টা সেখানে সুবিদিত ছিল। চাকরি সহজেই মিলেছিল এবং ভাল চাকরিই মিলেছিল। মাইনেও ভালই দিয়েছিল। জেনারেল ম্যানেজার খুব খুশী হয়েছিল তাঁর কথায়। কীর্তিহাটের রায়বাহাদুরের ছেলে চাকরি চায় শুনে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—তুমি চাকরি করবে? কেন?

—আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে গড়তে চাই। বাপের পয়সায় বড়লোক হয়ে সুখ আছে, গৌরব নেই। একটা লাকের কথা, একটা হল নিজের শক্তির কথা।

খুব খুশী হয়ে সাহেব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ কথা তো ইণ্ডিয়ানদের মুখে শুনি না! তারা তো লাককেই সব বলে মানে।

—আমি মানিনে। তা ছাড়া—।

—কি? বল!

—টিরানী (tyranny) আমি পছন্দ করি না, টাইর‍্যাণ্ট হতে আমি চাইনে।

—মানে?

—জমিদারী মানেই tyranny—আমার বাবাকে আমি দেখেছি। যদিও তিনি আইনের পথ ছাড়া হাঁটেন না তবুও তা আইনসম্মত হলেও অত্যন্ত নির্মম নিষ্ঠুর।

—আমাদেরও তো জমিদারীর কাজ।

—আমি আপনার কাছে এসেছি জমিদারীর কাজের জন্য নয়। আপনি কোন Industrial firm-এ আমাকে ঢুকিয়ে দিন। সেখানে আমার পথ আমি করে নেব।

তাই হয়েছিল। সাহেব তাঁকে নিজে সঙ্গে করে বড় সাহেবী ফার্মে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কয়লার খনি, অভ্রের খনির মস্তবড় কারবার। সেখানে জমি-জায়গার স্বত্ব পরীক্ষার কাজ দিয়েছিল তারা। প্রথমেই মাইনে দিয়েছিল একশো পঁচিশ টাকা।

চাকরি নিয়ে, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রীকে বলেছিলেন—চল, এ বাড়ী থেকে চলে যাব আমি। নতুন বাড়ী ভাড়া করেছি।

স্ত্রী জানতেন না যে স্বামী পড়া ছেড়ে চাকরি করছেন। কারণ দশটাতেই বেরিয়ে যেতেন ফিরতেন চারটেতে। ভাইরাও জানতে পারে নি।

অবাক হয়ে গেলেন স্ত্রী। বললেন—সে কি?

—হ্যাঁ। আমি চাকরি করছি। বাড়ী ভাড়া করেছি। এ বাড়ীতে আমি থাকব না। আমার সঙ্গে যাও তো চল। নয়তো আমি একলাই যাব। পরের কথা পরে হবে।

স্ত্রী বুঝলেন। তখনকার কালে মেয়েরা একালের মেয়েদের থেকে অনেক অল্পবয়সেই অনেক বেশী বুঝত। তিনি কথাটার মানে বুঝেও বললেন—তুমি বাপের ছেলে। আমি

বেটার বউ। আমার অপরাধ তিল হলে ভাল হয়। তা ছাড়া রায়বাড়ীর বউ আমি, আমি চঞ্চল হলে আমার অধর্ম হবে। আমি যেতে পারব না শ্বশুরের হুকুম ছাড়া।

দেবেশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার। বললেন—যদি আমি বিয়ে করি আবার ?

—সে তো এমনিই করতে পার। কে বাধা দেবে তোমাকে ? সতীন নিয়েই ঘর করব।

—যদি ক্রীশ্চান হয়ে যাই ?

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এবার ওই ছোট্ট বধূটি বলেছিল—না, তা আমি পারব না।

—সে আমি জানি। বলে চলে গিয়েছিলেন দেবেশ্বর। এবং ওই বাড়ীতে বাস শুরু ক'রে মদ্যপান আরম্ভ করেছিলেন মনের ক্ষোভে। দিনে চাকরি করতেন, বিকেলে বাড়ী ফিরে পোশাক বদলে বেরিয়ে যেতেন; বন্ধুবান্ধব মজলিশ গানবাজনার আসর সেরে বাড়ী ফিরতেন অনেক রাত্রে। চাকর অপেক্ষা ক'রে থাকত। কলকাতার মজলিশে তাঁর তখন বিদগ্ধজন বলে খ্যাতি রটেছিল।

হঠাৎ চিঠি এল। চিঠি নিয়ে এল, জানবাজারের বাড়ী থেকে ছোট ভাই রামেশ্বর। রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"তুমি চাকরি লইয়াছ জানিয়া স্তম্ভিত হইলাম। পড়া ছাড়িয়াছ। স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছ। কারণ কি অবিলম্বে জানাইবে। এবং পত্রপাঠ জানবাজারের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে। পত্র আমাকে শিবেশ্বর লিখিয়াছে, বধূমাতা লেখেন নাই। পত্রসহ গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম। এই গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিবে।"

দেবেশ্বর গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। শুধু একখানা পত্র রামেশ্বরকে দিলেন, বললেন—বাবাকে যে পত্র লিখবি, তার সঙ্গে এটা পাঠিয়ে দিস। পত্রখানা সংক্ষিপ্ত;—"আমার চাকরি লওয়ায় আপনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন কেন বুঝিলাম না। সংসারে যাহার যতই থাক, কাজ করা, উপার্জন করা অগৌরবের নয়। এবং সংসারে যেখানে পৈতৃক অন্নে জীবনধারণ করিলে পদে পদে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে নিজের উপার্জিত অন্নে ভাগ্য গঠন করিলে শুধু স্বাধীনতাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, পিতার গৌরবও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করি।"

এক সপ্তাহ পর আবার গাড়ী এসে দাঁড়াল। এবার গাড়ী থেকে নামলেন বধূ। পিছনে ছেলে কোলে নিয়ে ঝি। তার সঙ্গে রামেশ্বর। এবং গাড়ীর ছাদে বোঝাই বাক্স-পেঁটরা। এবং গৃহে গৃহিণীর মতই ঢুকে বললেন—বাবা আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।

—এস। কিন্তু আমি যদি ক্রীশ্চান হয়ে থাকি ?

—সে তুমি হ'তে পার না।

হাসলেন দেবেশ্বর। শুধু বললেন—এ বাড়ীতে বাবুর্চি রান্না করে।

—সে আমি শুনেছি। জানি। ঠাকুর এক্ষুনি আসছে। বাবুর্চি থাকবে না। আর

আমি এখানে থাকব বলে আসি নি, ধরনা দিয়ে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—অ! শুধু এইটুকু বলে দেবেশ্বর স্নানের জন্যে উঠলেন—আপিস যেতে হবে। এবং বাবুর্চির হাতে খেয়ে চলে গেলেন। বিকেলে ফিরে দেখলেন বাবুর্চি নেই। তার বদলে মেদিনীপুরের খাস কীর্তিহাটী চাটুজ্জেপুত্র জলখাবার তৈরী করেছে—লুচি-হালুয়া-ফল-মিষ্টি। কিন্তু তার তরিবৎ অনেক। দেবেশ্বর সন্ধ্যায় স্নান ক'রে প্রসাধন করে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন বারোটায়। মদ্যপান করেছেন কিন্তু চঞ্চল নন, স্থির, শুধু একটু বেশী গম্ভীর। দেখলেন খাবারের থালা নিয়ে স্ত্রী প্রতীক্ষা করে রয়েছে। পরদিন রাত্রি দুটো। সেদিনও ওই বধূটি খাবারের থালা নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছে। পরদিন এলেন দশটায়। এবং এই দশটাই নিয়ম হয়ে গেল। কিন্তু জানবাজার ফিরলেন না।

স্ত্রী রোজ বলেন—আজ ওবাড়ী চল।

—না।

রোজ এই এক কথা, ওই এক উত্তর। অবশেষে একদিন, প্রায় মাসখানেক পর, রাত্রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। বাড়ীতে পুত্রবধূ বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে ঘুম পাড়াচ্ছেন আর বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ছেন। শ্বশুরকে দেখে ধড়মড করে উঠে বললেন—বাবা!

—হ্যাঁ মা। কিন্তু দেবেশ্বর কোথায়?

নতমুখে পুত্রবধূ বললেন—তিনি তো বেরিয়েছেন আপিস থেকে ফিরে—।

—ফিরবে কখন?

চুপ করে রইলেন পুত্রবধূ। রায়বাহাদুর বললেন—হুঁ। তার পর বললেন—রামেশ্বর কোথায়? শিবেশ্বর? ওবাড়ীতে শুনলাম শিবেশ্বর এখানে এসেছে।

—ওরা থিয়েটার দেখতে গেছে।

—থিয়েটার?

চুপ ক'রে রইলেন পুত্রবধূ। রায়বাহাদুর বললেন—এই ঘরে আমার একটা বিছানা করে দাও। রাত্রে আমি এখানেই থাকব। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—ওঃ অভিশাপ বটে।

এ আসনে তিনি বসেছিলেন রাত্রি দুটো পর্যন্ত। রাত্রি দুটোর সময় সেদিন দেবেশ্বর ফিরেছিলেন। পদক্ষেপ ঈষৎ স্খলিত; কণ্ঠস্বর একটু জড়িত। বললেন—তুমি দরজা খুলছ কেন, চাকর কোথায় গেল।

—চুপ কর। বাবা!

—কে?

—বাবা। কীর্তিহাট থেকে এসেছেন।

একবার চমকে উঠলেন দেবেশ্বর। তারপর এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন। নাকের ডগায় কপালে গালে লালচে আভা ফেটে পড়ছে। চোখের দৃষ্টি স্বল্প ক্লান্ত, অথবা নেশায় নিমীলিত, পরনে বাহান্ন ইঞ্চি বহরের ফরাসডাঙার কোঁচানো কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে সেকালের হাল-ফ্যাশনের কিছু বদল হওয়া মুসলমানী আমিরী পাঞ্জাবি, কাঁধে পাটকরা দুধের মত রঙের রেশমী চাদর। গুন গুন ক'রে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকেছিলেন, ফিরছেন বিশিষ্ট একজন ধনীর বাগানবাড়ীর বাঈজীর গানের আসর থেকে। স্ত্রীর কথা শুনে থমকে গিয়ে কপাল কুঁচকে চোখ বুজলেন। মনে হল মনে মনে বলছেন—ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তাঁর!

স্ত্রী আবার সামনের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বাবা বসে আছেন।

একবার তাকিয়েও দেখলেন না দেবেশ্বর, শুধু বললেন—হু! তারপর তিনি সতর্ক পদক্ষেপে পা বাড়ালেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

স্ত্রী পিছন থেকে একটু উচ্চকণ্ঠেই ব্যাকুলভাবে বললেন—ওগো, বাবা বসে আছেন, দেখা কর!

এবার দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে ফিরে তাকালেন স্ত্রীর দিকে, বললেন—ভাল। দেখা করব। বলে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির রেলিং ধ'রে উপরে উঠে গেলেন। এবং সামনেই মার্বেল টপ টেবিলের উপর হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। নিয়ম—চাকর এসে চেয়ার এগিয়ে দেবে, তিনি বসবেন, তারপর চাকর জামা জুতো চাদর একে একে খুলে নেবে। চটি এগিয়ে দেবে। ঘাড় হেঁট করে ভাবছেন, কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দিয়েছে—এ কি! বাবা এমনভাবে আসবেন কেন?

হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠলেন।—দেবেশ্বর! রত্নেশ্বর নিজেই উঠে এসেছেন, উত্তেজনার মধ্যে চটি জোড়াটা পায়ে না দিয়েই উঠে এসেছেন; দেবেশ্বর আবার চমকে উঠলেন একবার। এটা তিনি আশঙ্কা করেন নি। ঘাড় তুলে দেখে নিলেন একবার, বাপ কত দূরে, তারপর ঘাড় নামালেন। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রণাম করবার চেষ্টাও করলেন না।

—আমি জেগে বসে আছি, আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে এলে?

দেবেশ্বর নীরব। তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আমাকে তুমি এমন ক'রে উপেক্ষা করতে সাহস কর? এতবড় স্পর্ধা! তবু দেবেশ্বর নীরব। এক চুল নড়লেন না। বরং এর আগে একটু-আধটু টলছিলেন, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

—দেবেশ্বর!

নীরব দেবেশ্বর। রত্নেশ্বর বললেন—কথার উত্তর দাও!

—কাল সকালে উত্তর দেব। আজ আমি সুস্থ নই। বলে জুতো-জামা না ছেড়েই সামনেই শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—দেবেশ্বর, দরজা খোল, দেবেশ্বর!

দেবেশ্বর উত্তর দিলেন, কিন্তু সরাসরি বাপকে নয়, ডেকে স্ত্রীকে বললেন—মানিক-বউ, বাবার শোবার ব্যবস্থা করে দাও; আমার শরীরটা খারাপ করছে। তুমি একটু শিগ্‌গির এস। আমার সেই গুলী লাগা জায়গাটায় যেন কেমন ব্যথা লাগছে। একটু মালিশ দিতে হবে। চাকরটাকে বল। তুমি বাবার ঘুমের ব্যবস্থা কর।

পরদিন বেলা আটটার সময় উঠলেন দেবেশ্বর, দেখলেন রায়বাহাদুর—কীর্তিহাটের একচ্ছত্র অধিপতি রত্নেশ্বর রায়—তাঁর প্রতীক্ষায় গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে আছেন। স্নান পুজো হয়ে গেছে। পুত্রবধূ ফল কেটে রূপোর রেকাবীতে সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার সঙ্গে কিছু মেওয়া ফল। বাইরে—জানবাজারের জুড়ি, কোচম্যান সহিস; চাকর দারোয়ান। কিন্তু সবাই স্তব্ধ। যেন একটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

দেবেশ্বরের জন্য চাকর ছিল উপরে। তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেয়েই নিচে নেমে এলেন, এসে বাপকে প্রণাম করে সামনে দাঁড়ালেন। মাথা হেঁট করেই দাঁড়ালেন।

রত্নেশ্বর রায় বললেন—চা খেয়েছ?

ঘাড় নাড়লেন দেবেশ্বর—না।

রত্নেশ্বর বললেন—বউমা চা আন।

পুত্রবধূ চলে গেলেন চা আনতে। রত্নেশ্বর তিরস্কার শুরু করলেন। প্রথমে মৃদুস্বরে, তারপর সে স্বর চড়ল। দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। যে মুহূর্তে পুত্রবধূ দরজায় ঢুকলেন, অমনি চুপ করে গেলেন। বধূ চা-খাবার এনে নামিয়ে দিলেন। রায়বাহাদুর বললেন—খাও।

ছেলে নড়ল না। বাপ বললেন—নইলে আমার খাওয়া হয় না। খাবার পড়ে রয়েছে, দেখছ না?

দেবেশ্বর এবার চা ও খাবারে হাত দিলেন। বাপও ইষ্টকে নিবেদন ক'রে ফলের টুকরো মুখে দিয়ে ওবাড়ীর সরকারকে ডেকে বললেন—দারোয়ান চাকরদের বল, এ বাড়ীর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিক। সন্ধ্যেবেলা তক ওবাড়ী যাবে। কাল সকালে কীর্তিহাটে। বড়বাবু, বউমা, খোকার সব জিনিস যাবে কীর্তিহাটে।

এবার দেবেশ্বর বললেন—আমার আপত্তি আছে।

—কারুর আপত্তি আমি মানি না। পুত্র চমকাল না কিন্তু অতর্কিতে এমন ধমকে বধূটি চমকে উঠল।

দেবেশ্বর হাসলেন। বধূটির লজ্জার আর সীমা রইল না। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের। শ্বশুর

হেসে বললেন—এই ক্রোধ রিপুটা আর আমার গেল না। ভূমির অধিকারীত্বের সঙ্গে সম্বন্ধটা নিগূঢ়। ছেলের হাসিকে গ্রাহ্য করলেন না। অর্থও ভুল করলেন, ভাবলেন বিনীত আত্মসমর্পণ। স্ফীতও হলেন। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। সন্ধ্যায় এসে উঠলেন জানবাজারের বাড়ীতে। সেখানে শিবেশ্বর এবং রামেশ্বর অপরাধীর মত ঘরে লুকিয়েছিল। তাদের কয়েকটা কটু কথা বলে রেহাই দিলেন। খুশী হয়েছেন বড়ছেলেকে আয়ত্ত করেছেন।

কিন্তু কীর্তিহাটে এসে দেখলেন, ভুল তাঁরই। প্রচণ্ড ভুল করেছেন। তিনি অন্ধ।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে যা আছে তাই বলি। আমি তাঁর চেয়ে ভাল ক'রে বলতে পারব না। লিখেছেন—"আমি ভুল করিয়াছি। আমিই অন্ধ, আমিই অন্ধ। দেবেশ্বরের যে লৌহকঠিন অবাধ্যতা এবং জেদকে ভাঙিয়াছি মনে করিয়াছিলাম সেটা ধৃতরাষ্ট্রের ভাঙা লৌহভীমের মত, একটা কৃত্রিম এবং অলীক বস্তু ছাড়া কিছু নয়।"

তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন দেবেশ্বর স্বরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তিনি কীর্তিহাটে এসে, পরদিন থেকেই অন্ন এবং আহার ত্যাগ করলেন। শুধু জল। এবং মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে একখানা মোটা বই নিয়ে বসে রইলেন ইজিচেয়ারে।

কাছারীতে বসে একটা লাটের প্রজাদের সঙ্গে মিটমাটের কথা হচ্ছিল। লাটভুবনপুরের মধ্যে মৌজা খান-দশেক; দশখানা গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে মামলা চলছিল দু বছর। বৃদ্ধির জন্যে মামলা করেছিলেন রায়বাহাদুর। প্রজারা বৃদ্ধি দিতে রাজী ছিল কিন্তু সে টাকায় এক আনা থেকে শুরু করে দু' আনা পর্যন্ত উঠেছিল, তারপর খুঁট পেতে বসেছিল—লড়াই হয় হোক। এর বেশী দেবে না।

রায়বাহাদুরের দাবী ছিল—টাকায় চার আনা এবং প্রত্যেক জোতজমা জরীপ করে দেখে যার জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, তার উপর খাজনা ধার্য।

নতুন কেনা লাট। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক। রায়বাহাদুর হুকুম দিয়ে গোমস্তা পাইক উঠিয়ে এনে, কাগজ ফেলে দিয়েছিলেন মামলা সেরেস্তায়। সেখান থেকে গাদাবন্দী আর্জি গিয়ে পড়েছিল মুন্সেফী আদালতে। এ-লাটখানা ২৪ পরগণার অন্তর্গত, আলিপুর, সদর সাব-ডিভিশনের এলাকা। দু' বছর লড়ে প্রজারা গড়িয়ে পড়েছে—হুজুর, একটা মিটমাট করে নিন। টাকায় সিকি বৃদ্ধি দিতে গেলে আমরা মরে যাব। এতেই আমরা দু'বছর মামলা করে খায়েল হয়ে পড়েছি। দশখানা গ্রামের মাতব্বর সে প্রায় পঞ্চজন হিসেবে হলে পঞ্চাশ হয় সুলতা, কিন্তু পঞ্চের চেয়ে বেশি এসেছিল, দশ হিসেবে একশো নয়, বিরাশী জন। দেবোত্তরের ভাণ্ডারের খাতায় খরচ লেখা আছে, চালের খরচ। "অদ্য লাটভুবনপুরের বিরাশীজন ও অন্যান্য স্থানের ত্রিশজন প্রজা আইসে তাহাদের জন্য মায়ের ভোগ বরাদ্দ ব্যতীত বাড়তি চাউল বরাদ্দ—এক মণ আঠারো সের।"

খাস কাছারী—যে কাছারী-ঘরে অতুলেশ্বর কার্টিজ আর বোমার সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছিল, সেইটে তখন নতুন তৈরি হয়েছে—সেই ঘরে, ওই কুইন ভিক্টোরিয়ার অয়েল পেন্টিংয়ের নীচে তিনি বসেছিলেন, ফুরসী নলে টান দিচ্ছিলেন এবং মনে মনে প্রজাদের কতটা মাপ করা যায়, সেই কথা ভাবছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর খাস চাকর এসে পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডেকেছিল—হুজুর!—

চিন্তার মধ্য থেকেই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন--উঁ—। ছোট্ট উঁ।

—এই রোকাখানা। বলে সে একখানা কাগজ তাঁর সামনে এসে ধরেছিল।—কি এটা? বলে রোকাখানা তুলে ধরে পড়েই গভীরতর চিন্তায় ভুরু-কপাল কুঁচকে, ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন পলকহীন দৃষ্টিতে।

রোকাখানায় লেখা, পুত্রবধূ লিখেছেন—"আপনার ছেলে সকালবেলা হইতে কাহারও ডাকে সাড়া দিতেছেন না, জল ছাড়া কোন কিছু খাইতেছেন না, সকাল হইতে চা পর্যন্ত খান নাই। শুধু দু গ্লাস জল খাইয়াছেন। আমি কি করিব? কাহাকে বলিব? যাহা হয় আপনি করুন।"

কপালের কুঞ্চনরেখার সারির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবং দৈর্ঘ্যেও প্রসারিত হচ্ছিল দুই প্রান্তে। নাকের উপরেই ভ্রূর মধ্যে তিনটে রেখা জেগে উঠে ত্রিশূলের মত মনে হচ্ছিল। সব আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে কথা বলবে এ-সময়? হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আসছি আমি। মণ্ডলদের সব তামাক দিতে বল।

রত্নেশ্বর এসে দেখলেন দেবেশ্বর ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন। বাপের পায়ের চটির শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখে উঠে নীরবে দাঁড়ালেন।

রত্নেশ্বর বললেন—তুমি কি আমাকে অপমান করতে বদ্ধপরিকর?

দেবেশ্বর ইজিচেয়ারের পাশে একটা তেপায়া ছিল, সেটার উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে লিখে উত্তর দিলেন—"না। তবে আমারও একটা সম্মান আছে। সে সম্মান বজায় রাখিতে আমি মরিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। আমিও রায়বংশের সন্তান, উত্তরাধিকারী। আমি রায়বাড়ির প্রজা নহি। এবং আপনার প্রতি ভয়, আতঙ্ক সবকিছু—সেদিন শুক করিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াও বাঁচিয়া উঠিবার পর চলিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত আমার বয়স ষোড়শ বর্ষ অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছে, আমি পুত্রের পিতা হইয়াছি।"

রত্নেশ্বর স্থিরভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলেকে বলেছিলেন—বস।

দেবেশ্বর ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আমার পুত্র নও? তুমি ভুল করলে আমি তোমাকে শাসন করব না?

লিখেই উত্তর দিয়েছিলেন দেবেশ্বর—"পুত্রেরও স্বাধীনতা আছে। সেও মানুষ। আমার

ধারণা আমার ভাল-মন্দ বুঝিবার বয়স হইয়াছে এবং সেমত বিদ্যাবুদ্ধিও আয়ত্ত করিয়াছি। আমার জীবনের ভাল-মন্দ যেমন আপনি বিচার করেন, তেমনি আপনার চরিত্রের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া নিজেকে গঠন করিয়াছি। যে-কঠোরভাবে আপনি আত্মনির্যাতন করিয়াছেন, তাহার জন্যই আজ আপনি এমত প্রকার কঠিন ও কঠোর চরিত্র, রূঢ় প্রকৃতি। তাহার সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধি জড়িত করিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাকে আপনি ধর্ম বলেন—আমি অধর্ম মনে করি।"

দেবেশ্বরের হাত চেপে ধরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—স্বার্থবুদ্ধির অপবাদ দিচ্ছ তুমি দেবেশ্বর ?

সসম্ভ্রমে হাতখানি টেনে এবার মুখে বলেছিলেন—হাতখানা ছাড়ুন, মুখে এর উত্তর দিতে পারব না আমি। লিখে দিচ্ছি।

ছেলের হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। দেবেশ্বর লিখেছিলেন—তার দুটি দৃষ্টান্ত আমার অন্তরে মর্মান্তিক ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম আমার ভিক্ষা-মাকে যে-কারণে দেশত্যাগিনী করিয়া নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন, সে-কারণ এমন কোন অপরাধ নয়।

মাঝখানেই রত্নেশ্বর বলে উঠেছিলেন—না-না। তুমি জান না। তুমি জান না। সে আমার সর্বনাশ করত। সে আমাদের বংশের অভিসম্পাত, ছলনা করে প্রবেশ করেছিল। সর্বনাশ হয়ে যেত।

দেবেশ্বর লিখলেন, কিন্তু তাহার সম্পত্তি লইলেন কেন ?

—তার স্বামীর তাই অভিপ্রায় ছিল। সম্পত্তি দেবোত্তর করা। এবং একজন ভ্রষ্টাচরিত্রার দেবোত্তরের সেবায়েত হবার অধিকার নাই।

—আমি স্বীকার করি না, দেবতার সেবা করিবার অধিকার নাই। পাপী-তাপী-পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা সকলেরই অধিকার আছে।

দৃঢ়স্বরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না-না। বেশ্যা নিজে দেবতা স্থাপন করে পূজা করতে পারে সে তার। কিন্তু সৎ শুদ্ধ গৃহস্থের স্থাপিত বিগ্রহের সেবায়েত ভ্রষ্টা হলে তার সে অধিকার থাকে না। থাকতে পারে না। যেমন জাতিচ্যুত বা জাত্যন্তরগ্রহণে পৈত্রিক সম্পত্তিতে এমন কি পিতামাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম, সেই রক্ষা দেবেশ্বর, হতভাগিনী মরে বেঁচেছে। নাহলে সে আমাকে বলেছিল, সে তোমার মা, তোমাকে সে কথা বলতে পারব না। তবু ইঙ্গিতে বলি, বলেছিল—সে মুসলমান বা ক্রীশ্চান হয়ে যাবে। ঠাকুর গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবে।

দেবেশ্বর লিখে জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণভামিনী মরেন নি। বৃন্দাবন থেকে মৃত্যু রটনা করে পালিয়ে এসে বাইজীবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

তিক্ত হেসে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তাও জান তুমি ? সেও আমিও জানি, কিন্তু কথাটা

বলতে পারি নি তোমাকে।

এবার দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার লিখেছিলেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ রামছবি চক্রবর্তীকে স্ত্রী-পুত্রসহ নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। তাহা নিষ্ঠুরতা নয়?

—মৃত্যু? মৃত্যু নিষ্ঠুরতা নয়? কিন্তু তা নিয়ম। সমাজের মধ্যেও নিয়ম আছে। তার কিছু কিছু নিষ্ঠুর হয়ে থাকে।

এবার যেন পরাজিত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন দেবেশ্বর। লিখেছিলেন—"আপনি ভ্রান্ত সংস্কারবশে আপনার মাতামহের ভ্রান্তির বা মস্তিষ্কবিকৃতির কলঙ্ককে বংশগত অভিশম্পাত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এবং নিজেকে যন্ত্রণা দিতেছেন, আমাদিগকেও যন্ত্রণা দিতেছেন।"

সভয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—থাম থাম। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তুমি জান?

—জানি। মুখেই বলেছিলেন দেবেশ্বর।

—কে বললে।

এবার আবার কাগজ টেনে লিখে দিয়েছিলেন দেবেশ্বর, যার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিবার জন্য আপনি পিতৃকে দিয়া খুন করাইলেন। ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই। গুলি লাগিয়া যখন শয্যাশায়ী ছিলাম, তখন জ্যাঠামশাই কলিকাতা আসিয়াছিলেন; গোপনে তিনিই আমাকে সব বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ইহাতে তোমার দোষ নাই, দেবু বাবা। তোমার বাবার পিতামহ-মাতামহ দুই দিক হইতে অভিশম্পাত আছে। আমাকে তিনি সাবধান করিবার জন্যই বলিয়াছিলেন। "রায়বংশের নিন্দা করেন নাই।"

—তবে? তবে তুমি কেন আমাকে এই কঠোরতার জন্য দোষারোপ করছ। আমি নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করেছি। অঞ্জনা-কৃষ্ণভামিনী দুটো নারীকে বলতে গেলে, পঙ্কসমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, তারা ডুবে গেছে। কেন? রায়বংশকে বাঁচাতে। তুমি মূর্খের মত, পশুর মত প্রলুব্ধ হয়ে সেই অভিশাপের হাতছানিতে ছুটছ।

চুপ করে বসেছিল দেবেশ্বর, উত্তর বোধহয় খুঁজে পান নি। বা যে উত্তর তিনি পরে দিয়েছিলেন, সেটা তখন-তখনই বাপের সম্মুখে লিখে দিতে পারেন নি। দিলে সেটা মুখের উপর জবাব করা হত।

ওদিকে কাছারী থেকে লোক এসেছিল। সময়টা ভতি কাছারীর সময়। সকালবেলায় প্রথম প্রহর পার হয়ে দ্বিতীয় প্রহরে ঢুকছে দিন। কীর্তিহাটে যারা আসবার জন্য সকালে বা রাত্রি থাকতে যাত্রা করেছে, তারা এসে পৌঁছে গেছে। ওদিকে ডাক এসেছে। মামলা সেরেস্তায় তো দশখানা তৌজির মাতব্বর বসে আছে। এর মধ্যে হরকরা খবর এনেছে, তমলুকের এস-ডি-ও সাহেবের চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। রত্নেশ্বর রায় ছেলেকে নীরব দেখে বললেন—ভেবে দেখ। কিন্তু গোটা বাড়ীতে, গোটা গ্রামে একটা সোরগোল

তুলে জাহির কর না যে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের পুত্র অবাধ্য। সে তাঁকে অপমান করেছে। রায়বাহাদুর তাই নীরবে হজম করছেন। রত্নেশ্বর রায় বাঘ নয়, শেয়াল হয়ে গেছে ছেলের কাছে।

তমলুকের এস-ডি-ও অর্শে ভুগছিলেন, তার জন্য ওল খেতে বলেছে কবিরাজ এবং স্থানীয় প্রধানেরা, তাই তিনি কীর্তিহাটের রায়বাহাদুরের কাছে পাঠিয়েছেন, কিছু ভাল ওল পাঠিয়ে দিন। এবং তার বাড়ীতে জামাই-মেয়ে এসেছে, তাদের জন্যে একটা বড় মাছ এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন, খুব ভাল মিহি-পাতির মাদুরের কথা।

সেই ব্যবস্থা আগে করলেন। চিঠির উপর হুকুম লিখে পাঠিয়েছিলেন ম্যানেজারের কাছে। ওবেলার মধ্যে লোক যেন জিনিসপত্র নিয়ে তমলুকে পৌঁছয়। এই সব জিনিসের সঙ্গে আরও কিছু জিনিস, বাগানের অকালের আম, মর্তমান কলা, কিছু ভাল ঘি সের পাঁচেক যেন পাঠানো হয়।

তারপর কয়েকটা নালিশ এসেছে প্রজাদের। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার নালিশ। নিচের মহলের গোমস্তা করেছে, কিন্তু তা ঠিক মনঃপূত হয় নি, আপীল করেছে খোদ হুজুরের কাছে। সে সব দরখাস্তের উপর তারিখ দিয়ে গোমস্তাকে এবং প্রতিপক্ষকে হাজির হবার জন্য হুকুমনামা পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তারপর ডাকঘরের ডাক দেখতে বসলেন ; সাপ্তাহিক কাগজ এসেছে বাংলা-ইংরেজী বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অমৃতবাজার, ইংলিশম্যান—সে সব ঠেলে রেখে সর্বাগ্রে খুললেন একখানা সরকারী খাম, আসছে কলকাতা থেকে। তিনি নতুন ভাইসরয়কে সেলাম জানাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, তার জবাব।

জবাব এসেছে, দরখাস্ত হিজ এক্সেলেন্সি পেয়েছেন, পরে সুবিধামত সময় ও সুযোগে অবশ্যই দেওয়া হবে। রায়বাহাদুরের নাম ভাইসরয় দপ্তরে অপরিচিত নয়।

শ্বশুর চিঠি দিয়েছেন, তাও উৎসাহজনক। তিনি কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে উদ্যোগ করছেন। নূতন লাটসাহেব মার্কুইস অব রিপন। লিখেছেন—হঠাৎ খানিকটা অসুবিধা ঘটিয়া গেল, নতুবা নূতন লাট লর্ড রিপন উদার ব্যক্তি। তিনি নিশ্চয় সুবিধা দিতেন। সম্প্রতি আফগানিস্থান লইয়া রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের যে কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজই জয়ী হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানে আবার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তুমি নিশ্চয়ই কাগজে দেখিয়াছ যে, কাবুলের বৃটিশ এজেণ্টকে একদল বিদ্রোহী আফগান সৈন্য হত্যা করিয়াছে। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য লর্ড রবার্টস কাবুল অভিযান করিয়াছেন এবং কাবুল দখল করিয়াছেন। বর্তমানে কাবুলের আমীর শের আলিকে অপসারণ করিয়া তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমানকে আমীরের পদে অভিষিক্ত করা হইতেছে। এখন এখানে দারুণ ব্যস্ততা। সুতরাং অন্যরূপ ভাবিবে না। এসব মিটিলেই তোমার ইণ্টারভ্যুর সুযোগ মিলিবে। এবং আমি যতটা জাঁ

পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে আরও বড় সম্মানে সম্মানিত করিবার কল্পনা আছে। তখনকার ১৮৬৪ সালের Cyclone-এর পর তুমি যে সদাব্রত খুলিয়া লোককে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়াছ, সেবা করিয়াছ, তাহার সরকারী রিপোর্ট দেখিলাম, তোমার কাইলের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছে।

"On the whole the death by sickness are estimated to have been equal to those caused by storm and flood making a total of atleast 65,000; exclusive of the tracts not reported upon of all individuals specially amongst the zaminders who live like princes and lords by exacting money from these poor people. Roy Bahadur Ratneswar Roy the first and foremost man to be named who did more than his best to serve these poor people. He gave them shelter and food, also served with medical help from his charitable dispensary.

সুলতা, চিঠিপত্র সবই তখন ইংরিজীতে। দেবেশ্বরও ইংরিজী ছাড়া লিখতেন না। যুগটাই ইংরেজের। কিন্তু সে কথা থাক। সেদিন ওই পত্রখানার কল্যাণে লাট ভুবনপুরের প্রজাদের মঙ্গল হয়েছিল। তাদের বৃদ্ধির বোঝার কিছু উপশম হয়েছিল। টাকায় এক আনা বৃদ্ধি মাফ হয়ে তিন আনা হয়েছিল।

প্রজারা সানন্দে মেনে নিয়েছিল। কারণ এ কথা সকল লোকে জানে যে, আইনে যা প্রাপ্য হয় তা রায়বাহাদুর মাফ দেন না। এক্ষেত্রে চার আনা বৃদ্ধি তিনি নিশ্চয় পেতেন। কারণ ধান-চালের দর ১৮৭০ সালের পর থেকে এই আশী সাল পর্যন্ত টাকায় দু-তিন আনা বেড়ে গেছে। এবং রায়বাহাদুর যে বিরাট বাঁধ দিয়েছেন বন্যা রোধের জন্য, তাতে ফসলের উৎপাদন নিশ্চয় বাড়বে।

রায়বাহাদুর হুকুম দিয়েই উঠে গিয়েছিলেন নিজের আপিসঘরে। এ ঘরটা সেই ঘর সুলতা, যেটা থেকে সিন্দুক খুলে পুলিসের দল লাফ মেরে পালিয়ে এসেছিল কাঁকড়া বিছের ভয়ে এবং যে সিন্দুক থেকে পেয়েছিলাম পত্রের দপ্তর, এটা সেই ছোট ঘরখানা। এবং সেই চেয়ার, সেই টেবিল।

সেখানে বসে তিনি চিঠির জবাব লিখতে বসেছিলেন শ্বশুরকে। হঠাৎ কি মনে হয়েছিল, তাঁর খাস চাকরকে ডেকে বলেছিলেন—যা চিঠিখানা বড়বাবুকে দেখিয়ে নিয়ে আয়। বলবি, কর্তাবাবু পড়ে দেখতে বললেন। ইচ্ছে কি ছিল অনুমান করতে পারি, সম্ভবত উদ্ধত পুত্রকে তাঁর কীর্তিকলাপের এ দিকটা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। চাকর ফিরে এল দেবেশ্বরের চিঠি নিয়ে।

দেবেশ্বর তখন প্রায় উন্মাদ। মদ খেয়েছেন। বিলিতী মদ তাঁর বাক্সে লুকানো ছিল,

বের করে খেয়েছেন এবং যে কথা বাপের সামনে লিখে দিতে পারেন নি, সেই কথা লিখে চাকর মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—এইটে দিস বাবাকে। যখন একলা থাকবে তখন। দস্তুরমত খামে বন্ধ করে পাঠিয়েছেন। সবিস্ময়ে চিঠিখানা খুলে রত্নেশ্বর রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আবার।

ছেলে লিখেছে—"আপনি ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি এসব কথা অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি। আজও আবার ভাবিলাম। আপনার মতামতের সহিত আমার মতামত কোন প্রকারেই মিলিতেছে না। ইহার জন্য অর্থাৎ আমি স্বাধীন মত পোষণ করি বলিয়া আমি আপনার অবাধ্য নহি। ইহার সহিত বাধ্যতা-অবাধ্যতার কোন সম্পর্ক নাই। আপনি যাহা বিশ্বাস করেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আমি অবাধ্য নহি, আমি আমার স্বাধীন মতে চলিব। আপনি মদ্যপান করেন না, আমি মদ্যপান করি, তাহাতে দোষ দেখি না। এদেশে-ওদেশে বড় বড় লোকে মদ্যপান করিয়াছেন, করেন। আপনি করেন না, তাহাও ভাল। আপনি জীবনে মদ্যপান করেন নাই, তজ্জনিত যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাহাও বোধহয় আমার অন্তরে রহিয়াছে। আপনি বাল্যজীবনে আমাকে কঠোর সংযম শিক্ষা দিতে সম্ভবতঃ অত্যন্ত দুঃখ দিয়াছেন। শাসন করিয়াছেন। তাহা আমাকে আপনার পথ ও মতকে আমার নিকট নিষ্ঠুর এবং দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। আমার লালসাকে উগ্র হইতে উগ্রতর করিয়াছে। আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, অনেক পড়াশুনা করিয়াছি, ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের দর্শন পড়িয়াছি। আপনি এক ভ্রান্ত অভিশম্পাত-ভীতি দ্বারা ভীত হইয়া নিজের জীবনকে পীড়িত করিয়াছেন, আমাদিগকে পীড়িত করিতেছেন। ইহা মিথ্যা, ইহা ভ্রান্তি, অলীক। পৃথিবীতে যাহারাই ভূমির স্বামীত্ব ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমির শ্রেষ্ঠ ফসল ও ফল ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমিশ্রেষ্ঠ রূপবতী নারীর অধিকার পাইয়া থাকে। রাজাদের, নবাব বাদশাহদের অন্দর ও হারেমভরা নারীকুল তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর কোন সমাজ তাহা দমন করিতে পারে না। আমাদের দেশে আজ ইংরাজ এক বিবাহ করে এবং তাহারা শক্তিবলে এ অনাচার দমন করে বলিয়া কিছুটা দমিত হইয়াছে মাত্র। কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভূম্যধিকারীর এই অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই বা হইবে না। আর ওই শাস্ত্রবাক্য "পৃথিবীতে একটি পুরুষের সহিত একটি নারী ব্যতীত অপর সকলের সম্পর্ক মাতৃ-সম্পর্ক বা কন্যা-সম্পর্ক"—ইহা ভুল। ইহা নিতান্তই কাপুরুষের কথা। সংস্কারাচ্ছন্নের কথা। সমাজের দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনি দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন মাতৃসাধকদের। ইঁহাদের সম্পর্কে কটু কথা বলিতে চাহি না, এই দেশের প্রতি সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহারা শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং যতই দীর্ঘজীবন হউক, তাঁহাদের শিশুত্ব কখনও ঘোচে না, শিশু হইয়াই তাঁহারা মরেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্তন্যলালসা মেটে না। তাঁহারা সব নারীকেই মা ভাবিয়া থাকেন ভাবিতে পারেন, আমি তাহা

পারি না, তাহা পারিব না। ইহা হাস্যকর। ইহাকে সত্যই যদি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন বা করিতে পারিতেন, তবে নিজে বিবাহ না করিলেই পারিতেন। যদি করিলেন, তবে রায়বংশের শিশুদের শেষ সূতিকাগৃহে করিলেই মিটিয়া যাইত।

ওই ভাব আমার জন্য নহে। আমি পুরুষ। আমি জীবনে চলার পথে একক চলিতে পারিব না। বা একজনের সঙ্গে খুঁটে খুঁট বাঁধিয়া চলিতে পারিব না। আপনাদের শাস্ত্র পুরাতন, অচল। এ যুগের মানুষ তাহা মানিতে পারিবে না।

শৃঙ্খল দিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে চান রাখিতে পারেন, আমি শক্তি থাকিলে তাহা ছিন্ন করিব এবং সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, দেবেশ্বর যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। কীর্তিহাটে সেবার তাঁর সিংহের মত বাপের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর দাবী আদায় করে নিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। কিন্তু মুখে কথা হয় নি। সব হয়েছে চিঠিতে। তার মধ্যে কোনটা এক লাইনের চিঠি। শুধু লেখা—

Respected Sir—My answer to your letter—is no.

শেষ চিঠিখানাতে কয়েকটা লাইন আছে তা মারাত্মক। লাইন-কটা আমার মনে গাঁথা আছে। "আপনার উপলব্ধি আপনার নিজস্ব। তাহা আমার নিকট দুর্বোধ্য। তাহা বুঝিতে পারি না। একান্তভাবে অর্থহীন যদি শাস্ত্রবাক্য হয়, তবে সে শাস্ত্র ভীরুর শাস্ত্র। সে শাস্ত্র কুসংস্কারাচ্ছন্নের শাস্ত্র। পৃথিবীতে একমাত্র গর্ভধারিণী জননী এবং নিজের ঔরসজাত কন্যা ও সহোদরা এই তিনটি নারী ব্যতীত অপর সকল নারীর সহিত আমার বিচারে পুরুষের একটি মাত্র সম্পর্ক, নারী তাহার কাছে নারী ছাড়া আর কিছু নহে। আপনি অনেক সাধকদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; দক্ষিণেশ্বর গিয়া রামকৃষ্ণ নামক একজন সাধককে দেখিয়া আসিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। ইহা আমাদের দেশের এই সকল সাধকদের নিকট এবং সাধারণ মনুষ্যগণের নিকট হয়তো পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি ইহাকে তৃতীয় নয়ন দ্বারা মহাসত্য বলিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহারা শিশু হইয়াই জন্মান ও চিরজীবন শিশুত্ব ঘুচে না, এবং একলা সূতিকাগৃহে শিশুমৃত্যুর মতই মৃত্যুবরণ করেন। আজীবনের মধ্যে ইঁহাদের স্তন্যলালসা আর মেটে না। কিন্তু আমি তাহা ভাবি না। আমার এই ধারণা এবং এই প্রকৃতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, আপনার মাতামহের প্রতি দেবতার অভিশাপকে। তাহাও আমি মানি না। কারণ জন্মান্তর স্বর্গ নরক ইত্যাদি সবই আমার নিকট অলীক কল্পনা।"

* * *

সুরেশ্বর বললে—এর পর হার মেনেছিলেন রত্নেশ্বর। দেবেশ্বরকে কলকাতা ফিরে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাপ-বেটায় একটা আপোস হয়েছিল। রত্নেশ্বর দেবেশ্বরের

ভিক্কে-মা কৃষ্ণভামিনীর সম্পত্তির দুইয়ের তিন অংশের দাম হিসেবে পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা আর কলকাতার বাড়ী লিখে দিয়ে বলেছিলেন—আমি বিবেচনা করে দেখলাম, ওই সম্পত্তিটা ষোল আনা তোমারই প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে যখন আর হবার উপায় নেই, এবং তিন ভাগের দু ভাগ তোমার ভাইরা পাবে...তখন তার দাম হিসেবে এটা তোমাকে দিচ্ছি। আমার ইচ্ছায় তুমি সাহেব কোম্পানীর চাকরি ছেড়েছ; এই টাকায় তুমি এখনই ব্যবসা আরম্ভ কর।

আরও কথা হয়েছিল, দেবেশ্বর কথা দিয়েছিলেন—মদ্যপান তিনি সংযতভাবেই করবেন। অসংযতভাবে মদ্যপান স্বাস্থ্যহানি, পাপ না-হোক অপরাধ। এবং—

বেদনার্ত হাসি হেসে সুরেশ্বর বললে—এবং নারীর কথাও হয়েছিল। রত্নেশ্বর তাতেও সঙ্কোচবোধ করেন নি। ইঙ্গিতে অনুরোধ করেছিলেন অবশ্য। বলেছিলেন—হ্যাঁ, তুমি এবং সম্পদের যারা অধিকারী তারা সংসারে নারীর ক্ষেত্রে ভোগী। কুলপতি, সমাজপতিরা বহু-বিবাহ করে থাকেন। রাজারা বহুবিবাহের পরও রক্ষিতা রাখেন। আমাদের আশেপাশে তো দেখছি, রাজ-রাজড়াদের। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন রত্নেশ্বর রায়।

তারপর বলেছিলেন—তবু নিজের ইজ্জত, বংশের মর্যাদা, এসব বজায় রেখেই সব করা উচিত। মদ্যপান করতে হয় ঘরে বসে কর। বাইরে পথে বেরিয়ে মত্ততা কেন প্রকাশ করবে? শুধু তো মর্যাদা ইজ্জত নয়, নিজের নিরাপত্তা আছে, আরও অনেক কিছু আছে।

দেবেশ্বর রায় কোন উত্তর দেন নি, স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—আমি এর উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেব।

রত্নেশ্বরই প্রথম প্রস্তাব লিখে পাঠিয়েছিলেন। বাড়ী ভাড়া করে রক্ষিতা রাখার কথা ছিল। বীরেশ্বর রায়ের শেষজীবনে যেমন সোফি বাঈ ছিল। রত্নেশ্বর লিখেছিলেন—"ভায়লেটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ বা থাকে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিলে কোনদিন-না-কোনদিন এই গোয়ানপাড়ার গোয়ানরা রায়বাড়ীর দুর্নামের ধ্বজা হইয়া থাকিবে এবং ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে।"

দেবেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন—ভায়লেটের প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই। সে মোহ তাঁর কেটে গেছে। "এবং এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আপনার সহিত করিবার মত মনের কাঠিন্য আমার আর নাই। আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি এমন কোন কর্ম করিব না, যাহাতে আপনাকে লজ্জিত হইতে হইবে।"

এর পর চিঠি এসেছিল, আবার তোমাকে উত্ত্যক্ত করিতেছি। আমার বধূমাতার অবস্থা কি হইবে?

উত্তর গিয়েছিল, "আমি ইতর নহি, তাহার কোন অসম্মান হইবে না।"

এর উত্তরেও প্রশ্ন এসেছিল, "সম্মান তোমার নিকট হইতে তাহার কাম্য নয়। এবং সে

যতক্ষণ নিজে অসম্মানের মত কর্ম না করে, ততক্ষণ কাহার সাধ্য তাহাকে অসম্মান করে। আমি অবহেলা, অবজ্ঞার কথা বলিয়াছি। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য তাহার সম্পর্কেই প্রশ্ন করিয়াছি।”

দেবেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন, “বহুজন সমক্ষে শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ করিয়া শপথ করিয়া যাহা রক্ষা করিতে পারি নাই, দিব বলিয়া দিতে পারি নাই, আবার আপনার নিকট শপথ করিয়া তাহা দিব বলিয়া কি লাভ হইবে? তবে চেষ্টা আমি করিব। এবং আমি চেষ্টা করিয়া দিতে তাঁহাকে পারিব না, যদি তিনি তাঁহার পাওনা, আমি যেমন আপনার নিকট আদায় করিয়া লইলাম, তেমনি করিয়া আদায় করিয়া লইতে না পারেন।”

এর পর আর কোন প্রশ্ন রত্নেশ্বর করেন নি। শুধু নিজের ডায়রীতে লিখেছিলেন—“ভাগ্য বড়, না পৌরুষ বড়, এ প্রশ্নের সেই একই উত্তর রইল চিরকাল। “ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।” রায়বংশের ভাগ্য! এই তার কর্মফলের দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাপ্য। একটা তীরকে যেমন যে মুখে নিক্ষেপ কর, সে তার গতিতে সেই মুখেই ছোটে, তেমনি করিয়াই ছুটিয়াছে। আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।”

* * *

বিচিত্র চরিত্র দেবেশ্বর রায়; সুলতা, আজ তাঁকে বিচিত্র চরিত্র মনে হয় বটে, কিন্তু সেকালে তিনি ছিলেন ‘আলট্রা মডার্ন’। অবিশ্বাসী, নাস্তিক—ইতিবাদের একটি সংজ্ঞাকে তিনি মনুষ্যত্ব বলে মানতেন এই পর্যন্ত। তর্কে-যুক্তিতে ক্ষুরধার, কল্পনাতে তিনি অসম্ভব অবাস্তবকে জীবনে গড়ে তুলতে চান। কলকাতায় এসে খনির জায়গা কিনে খনির মালিক হয়ে বসলেন। জমিদারী তিনি পছন্দ করেন না। বলেন—মনুষ্যত্ববিরোধী। তিনি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ভারতবর্ষের অন্যতম নির্মাণকর্তা হয়ে ধনকুবের হবেন, এই তাঁর বাসনা। এসব মানুষের মন মাটিতে বিচরণ করে না, আকাশে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়; না, তার চেয়ে বলব, মাটির বুকের জলীয় বাষ্পের মত আকাশে মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায়, নিচে মাটিতে নামতে হলে হয় জলধারায় নামে, নয় বিদ্যুতের মত পৃথিবীর বুক চিরে নামে। জলধারায় নামার মধ্যেও ঝড় সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও মানুষের সর্বনাশ করে দিয়ে যায়, কখনও দেখা দিয়েও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, পৃথিবীর ফসল শুকিয়ে মরে; তবে অধিকাংশ সময়ই পৃথিবীতে ফসল বাঁচিয়ে সুফলা করে দিয়ে যায়। দেবেশ্বর ছিলেন, শুধু দেবেশ্বর কেন, সম্পদশালী সম্পত্তিশালী ঘরের ছেলেরা মানুষেরা এই মেঘের মত। হয় অতিবৃষ্টি, নয় অনাবৃষ্টিতে চিরকাল ধরে মানুষকে ক্লেশ দিচ্ছে। আবার ফসলের জলও দিচ্ছে। কিন্তু পুষ্কর মেঘের সঙ্গে তুলনা হয়, এমন বংশ বাংলাদেশে আমার চোখে একটি। সেটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশ।

জাতংবংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং, ওই একটি বংশকেই বলা যায়। দেবেশ্বরকে কিম্বা রায়বাড়ীকে আমি পুষ্কর বংশ বলি না, বলব না। তবে দেবেশ্বর অভিজাত ছিলেন।

'সম্বর্ত' মেঘ বলতে পার।

খনির ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য এবং কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রাণীগঞ্জ-গিরিডি ফিল্ড তখন সায়েব কোম্পানীর হাতে, দেবেশ্বর রায় বরাকর থেকে পশ্চিম এলাকার কয়লার জমি সংগ্রহ করে ওদিককার একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

এই দেখ, সুলতা! সুরেশ্বর একখানা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—এই ছবিখানা দেখ!

শাল গায়ে কোঁচানো কাপড়-পরা দেবেশ্বর রায়। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন তখন। ওই পোশাকেই আপিস করেন। ইংরেজ ম্যানেজার রেখেছেন। কাপড় পরে ইংরেজ চাকরকে হুকুম করেন। বিলিতী মদ খান। মেমসাহেব অনুগৃহীতা রেখেছেন।

ওদিকে প্যানেলে দেখ—প্রথমেই দেখ রামকৃষ্ণদেবের তিরোধান, ওই দেখ তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ। ওখানে লেখা আছে—উনি বলছেন "মনে রাখিও জন্ম হইতেই তুমি মহামায়ার কাছে উৎসর্গীকৃত।" ওই দেখ—বঙ্কিমচন্দ্র, হাতে আনন্দমঠ, ওখানে লেখা বন্দেমাতরম গান—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—শস্যশ্যামলাং মাতরম। তারপর দেখ রবীন্দ্রনাথ। ওখানে লিখেছি—"ওরে তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে।" ওই দেখ, তারপর কংগ্রেসের অধিবেশন।

দেবেশ্বর রায়ের মুখ দেখ, একসঙ্গে সমস্ত কিছুর প্রতি বক্র এবং ব্যঙ্গ হাস্যভরা দৃষ্টি। সব-কিছুকে অবজ্ঞা করেছেন। শুধু নিজেকে ভেবেছেন সত্য, বাকি সব মিথ্যা। বাপের সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে এমন কি নিজের বড় ছেলের সঙ্গেও মেলে নি তাঁর। এরই মধ্যে তিনি একলা চলেছেন—তিনি। বুকের ভিতর তাঁর রাক্ষসী ক্ষুধা।

এ-ক্ষুধা রায়বংশের তিন ছেলের মধ্যেই ছিল কিন্তু দেবেশ্বর রায়ের ক্ষুধার সঙ্গে কারুর ক্ষুধার তুলনা হয় না। নিত্যনূতনের ক্ষুধা। এবং এ-ক্ষুধার রুচি ছিল তাঁর ভায়লেটের স্বজাতীয়াদের মধ্যে। মিশ্র রক্ত। মিশ্র সৌন্দর্য।

তিনি স্বীকার করতেন—এ তাঁর ভায়লেটের ক্ষুধা। কিন্তু বিচিত্র কথা—জীবনে সেই গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর আর কোনদিন ভায়লেটকে স্মরণ করেন নি। মুখ দেখেন নি। কতদিন ভায়লেট এসে উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরে গেছে কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টি ফেরান নি। তার কারণ বলতেন—ওকে তো জীবনটাই দিতে চেয়েছিলাম। ওকে সঙ্গে নিয়ে মরতেই চেয়েছিলাম। ও পারলে না। আমি বাঁচতে চাই নি, এ্যাকসিডেন্টালি বেঁচেছি, ওর মুখ আর দেখে? তবে হ্যাঁ, নিত্যনূতন ফিরিঙ্গী মেয়েদের মধ্যে ওর ক্ষুধাই মেটাতে চাই তা মেটে না। আশ্চর্য লাগে। তবে এটা সেই অভিশাপ-টভিশাপও নয়, আমিও শ্যামাকান্ত নই। পুনর্জন্ম আমি মানি না। এ্যাণ্ড দিস ইজ দি ইটারন্যাল হাঙ্গার অফ ম্যান ফর উয়োম্যান। ম্যান ইজ পলিগেমাস বাই নেচার। বহু ভোগ বা সব ভোগ করব এই তার চিরন্তন

বাসনা। আমার মধ্যে এটা খুব প্রবল। তার কারণ আমি জমিদারের ছেলে, আমার শরীরে ফিউড্যাল রক্ত এবং হাতে প্রচুর অর্থ আছে এবং আমি একজন জেদী, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী ব্যক্তি। এবং আমি মিথ্যাবাদী নই, সেইহেতু ইস্কাপনকে আমি ইস্কাপনই বলি। ধর্মের ধাঁধা—নীতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের আনরিয়াল রোমান্টিক বুলিটুলি আমি পছন্দ করি না।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে কিন্তু লিখে গেছেন—এ-পাপ দেবেশ্বরের ইচ্ছাকৃত নহে। ইহা তাহার প্রাক্তন। হয়তো সে-ই পূর্বজন্মে ভ্রষ্টযোগী ছিলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইতে আসিয়াছেন, ভোগ করিতে আসিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছেন। তাহা না হইলে ভায়লেটের প্রতি যত আকর্ষণ তত ঘৃণা কেন হইবে? ভায়লেট যে অঞ্জনার কন্যা, সে-কথা অপরে না জানিলেও, আমি তো এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারি না।"

এরই মধ্যে নিঃশব্দে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে যেতেন আমার পিতামহী উমারাণী দেবী। সহ্যশক্তির জীবন্ত মূর্তির মত।

রত্নেশ্বর রায় তাঁর এই পুত্রটিকে স্বেচ্ছামত বিচরণের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, দেবেশ্বর তা কেড়ে আদায় করে নিয়েছিলেন বাপের কাছ থেকে, রত্নেশ্বর তা তাঁকে দিয়েও ছিলেন। ভাবতেন হস্তক্ষেপ করবেন না তিনি। কিন্তু এই পুত্রবধূটির কথা স্মরণ করে হস্তক্ষেপ না করে পারেন নি। এবং এই নিয়ে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছেলের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

শুধু পুত্রবধূর জন্য বললে অন্যায় হবে। রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন দেবেশ্বর রায়। তার পরিচয় আছে পিতা-পুত্রের পত্রগুলির মধ্যে। আর কিছু আছে রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর মধ্যে। এগুলি সবই পেয়েছি আমি। পত্রগুলির মধ্যে বৈষয়িক কর্ম নিয়ে বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসা এবং কুশল আদানপ্রদানই বেশী, কিন্তু যে একটি সরল আন্তরিকতা নিরাবরণ সত্য ফুটে উঠেছে, সেটি কি করে সম্ভবপর হল, তা ঠিক ধারণা করতে পারিনে আমি।

রত্নেশ্বর রায়ের শরীর ভাঙল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই। বাপ ছেলেকে লিখলেন—"এইবার তুমি আসিয়া বিষয়ের ভার গ্রহণ কর। এই দেহে এই ভার বহন করিতে হইলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে আমাকে। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

দেবেশ্বর লিখলেন—"আপনার হাতের হাল গ্রহণ করার মত যোগ্যতা আমার নাই। তদুপরি আমি জমিদারী কর্মটিকেই ঠিক পছন্দ করি না। গরীবের উপর পীড়নই তো জমিদারী চালানো নয়—এই সকল গ্রাম্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে অহরহ সাহচর্য করিয়া অনেক নীচে নামিতে হয়।"

আর একখানা পত্রে লিখেছেন—"আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার ব্যক্তিজীবনের আদর্শ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্য আপনার যাহা দেখিলাম, তাহাতে

আপনি আমা অপেক্ষা সমর্থ আছেন। আমার অমিতাচার আছে, আপনার তাহা নাই। আপনি এইসব গ্রাম্য ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের নিকট খাজনা লইয়া তাহাদের শাসন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, তাহার সঙ্গে এই সকল মনুষ্যদের জন্য একটি কল্যাণকর কর্মকল্পনা লইয়া কর্ম করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াও ইহাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাহা আমি পারিব না।"

বাপ এর উত্তরে লিখলেন—"আমার মনে হইতেছে যে, তুমি তোমার আসল মত আমার নিকট গোপন করিতেছ। আমি শয্যাশায়ী না হইলেও, আমার এই ক্লান্ত অবস্থায় আমাকে সাহায্য করা কি তোমার কর্তব্য নয়?"

উত্তরে দেবেশ্বর লিখেছিলেন—"সংসারে কর্তব্যের আর শেষ নাই। সব মান্য করিয়া চলিতে পারে এমত মানুষ আর কয়জন আছে? আমার তো কর্তব্যচ্যুতির শেষ নাই। আমি মদ্যপানে আসক্ত, আরও নানাবিধ দোষ আছে। তাহা ব্যতীত পিতাকে মান্য করিয়া চলা যেখানে কর্তব্য, সেখানে আপনার ও আমার মধ্যে মতান্তর বৃদ্ধি পায়—তাহাকে কি কোনমতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে? আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, ভয়ও করি। তাহা আন্তরিক। কিন্তু আপনার মতের সহিত আমার মতের পার্থক্যের কথা আপনি জানেন। আপনাকে সাহায্য করিতে গিয়া আপনাকে কষ্ট করা বা আপনার সহিত বিরোধ করিতে আমি চাহি না। তাহা ছাড়াও কথা আছে। শিবেশ্বর আজ উপযুক্ত হইয়াছে, জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে তাহার নেশা আছে, আসক্তি আছে। সে আপনার অধীনে কার্য করিতেছে। তদুপরি সে আপনার পন্থাকেই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। ধর্মবিশ্বাসী, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে, আমার বিবেচনায় কীর্তিহাটের দেবোত্তর এবং দেবকীর্তি পরিচালনার সেই যোগ্য ব্যক্তি। তাহাকে ঠেলিয়া আমাকে ভার দিলে সে ক্ষুব্ধ হইবে, তাহার ফল ভাল হইবে না। রামেশ্বর বি-এ পাস করিয়া ল লেকচার কমপ্লিট করিয়া এমনি রহিয়াছে এখানে। তাহাকে আপনি মামলা সেরেস্তা এবং আপনার পারসোনাল এস্টেটের ভার দিতে পারেন। আমি এখানে নানান কর্মে জড়িত। সভা-সমিতি এবং কয়েকটা এ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছি। এবং বহু যত্নে ও পরিশ্রমে যে-খনি-ব্যবসায় আমি গঠন করিয়াছি, বাহির দিক হইতে তাহার সমারোহ এবং প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট মনে হইলেও, সেটা ঠিক নহে। তাহার ভিতরে অনেক জট বাঁধিয়াছে। কয়েকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এমত অবস্থায় এসব ছাড়িয়া আমার যাওয়ার অর্থ তাহার ধ্বংসসাধন করা।

"পরিশেষে একটা সংবাদ আপনাকে আমার জানানো উচিত। এখানে সেক্রেটারিয়েটে আমার পরিচিত বন্ধুজন আছেন। কয়েকজন ইংরাজও আছেন। আমারও যাতায়াত আছে। আমি খবর পাইয়াছি যে, আপনাকে রাজা টাইটেল দিবার কথা মধ্যে মধ্যে উঠিয়া থাকে। এখন ঘন ঘন উঠিতেছে। আর একটা বড় দান হইলেই ওটা নিশ্চিত হইবে বলিয়া মনে করি।"

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় এবার হার মেনে চিঠি লিখেছিলেন সুলতা। এমনভাবে বীরেশ্বর রায়ও হার মানেন নি তাঁর কাছে। তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখে গেছেন—"আমার পিতা আমার কাছে হার মানেন নাই, আমার মাতৃদেবীর নিকট হার মানিয়াছিলেন। আমিই পুত্রের নিকট পরাজয় মানিলাম। আমার সকল দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।"

দেবেশ্বর রায়ের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন—"তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। এরূপ পত্রোত্তর আমি প্রত্যাশা করি নাই। তবে ইহাই হয়তো আমার প্রাপ্য, কারণ আমি সমস্ত জীবন ধরিয়া সকলকেই বলপূর্বক নত করিয়াছি, কাহারও নিকট নত হই নাই। এমন কি নিজের পিতৃদেবের নিকটও না। তুমি রাজা খেতাবের খবর দিয়াছ, সে সংবাদ আমার নিকট অগোচর নাই; কিন্তু রাজা খেতাবের সাধ আমার নাই। জীবনে যত দান করিয়াছি, স্মরণ করিয়া দেখিতেছি পুণ্যের জন্য কোন দান করি নাই, খ্যাতির জন্য সরকারী খেতাবের জন্য করিয়াছি। স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি কীর্তিও তাহারই জন্য। দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, দেবতার নামে দেবোত্তর এস্টেট গড়িবার জন্য; নিজের সংসারের মঙ্গল সাধন করিবেন তিনি সেই জন্য। যে অর্থব্যয় করিয়াছি দানখাতে কীর্তিখাতে তাহা নিজের তহবিল হইতে দিই নাই, প্রজাদের পীড়ন করিয়া আদায় করিয়া দিয়াছি। নিজে কিছু দিই নাই। আজ আমি শঙ্কিত। কেমন একটা শঙ্কা আমাকে যেন মাঝে মাঝে বিহ্বল করিয়া তোলে। তুমি নিজে ব্যবসায় করিয়াছ, উপার্জন করিতেছ, কিন্তু তোমার মধ্যে দেখিতেছি রায়বংশের অভিশাপ যাহা তুমি বিশ্বাস কর না তাহা যেন ফণা তুলিয়া আমাকেই দংশন করিতে চাহিতেছে। তুমি ধর্ম মান না, ঈশ্বর মান না, বলিতে গেলে এদেশের কিছুই মান্য কর না, এমন কি রাজশক্তিকেও না। আমি শুনিয়াছি, হোমরুল প্রভৃতি আন্দোলনের সঙ্গে তুমি যুক্ত। ইহা গর্বের কথাও বটে আবার অনেকটা শঙ্কার কথাও বটে। এবং ইহা আমাদের ঠিক ভারতীয় ধর্ম নহে। আমাদের শাস্ত্রমতে কলিতে ম্লেচ্ছরাই একছত্রাধিপতি হইবে। এবং সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাহা ব্যতীত এমন শান্তি-শৃঙ্খলা তাহারা স্থাপন করিয়াছে যাহা স্বপ্নাতীত। আজ আমরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া নিরাপদ নিঃশঙ্ক। অথচ তুমি পুরাপুরি ইংরাজীভাবাপন্ন। তবুও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তুমি শক্তিমান তুমি সাহসী তুমি সত্যবাদী। তুমি ছাড়া অপর কাহারও ভরসা আমি করিতে পারিতেছি না। কিছুদিন শিবেশ্বরের উপর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সে মদ্যপান করে না, সে ত্রিসন্ধ্যা করে, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। শাস্ত্রাদি পাঠ করে। সে স্ত্রীতে অনুরক্ত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে তত আমার চক্ষু খুলিতেছে; সে মদ্যপান করে না, কিন্তু শুনিতেছি সে গঞ্জিকা সেবন করে অতি গোপনে। সে ত্রিসন্ধ্যা করে দেবদ্বিজে ভক্তি করে, শাস্ত্রপাঠ করে কিন্তু শৃগালের মত ভীরু এবং লোভী; ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে বিছানায় বসিয়া সেরখানেক

সন্দেশ রসগোল্লা ভক্ষণ করে, কারণ সকাল হইতে কিছু না খাইয়া স্নানাদি সারিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া চা-পান করিবে। দেবতার ব্রাহ্মণের জমি বা বিষয় বেনামে মহাজনী করিয়া বন্ধক লয়। শাস্ত্রপাঠ করে কিন্তু স্ত্রীলোক অপেক্ষাও শুচিবাইগ্রস্ত। স্ত্রীতে অনুরক্ত কিন্তু তাহা অপেক্ষা চরিত্রহীন হইলেও ভাল হইত। কারণ সে স্ত্রী ছাড়িয়া একটা দিনও থাকিতে পারে না। ইহারই মধ্যে তাহার দুই পুত্র এক কন্যা। এখানে একটা থিয়েটার পার্টি করিয়াছে। কতকগুলা অপোগণ্ড ইতর শ্রেণীর বালক লইয়া নাচ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে প্রমত্ত রহিয়াছে। কখনও সত্য কথা বলে না, বাক্য দিয়া বাক্য রক্ষা করে না। মামলায় মকদ্দমায় প্রবল আসক্তি। কীর্তিহাট এস্টেটের মামলা সেরেস্তা আমিই বড় করিয়া পত্তন করিয়াছি, কিন্তু বাজীকর, স্বত্ব, করবৃদ্ধি প্রভৃতি জমিদারী-সংক্রান্ত মকদ্দমা ছাড়া মকদ্দমা ছিল না। শিবেশ্বর তাহার সঙ্গে মহাজনী যোগ করিয়াছে। লোকের নিকট হইতে সে হ্যাণ্ডনোট তমসুদ কিনিয়া লইয়া খাতকের নামে নালিশ করে।

তোমার পতনের মধ্যে একটা বড় কিছু পতনের মর্যাদা আছে গুরুত্ব আছে। তাহার অধঃপতন ক্ষুদ্রতায় ঘৃণ্য। সম্প্রতি একজন বাগ্দিকরের কাছে দেবোত্তরের জমি ক্রয় করিয়াছে স্ত্রীর নামে। শশকের মত ভীরু। কীটপতঙ্গ ব্যাধি সমস্ত কিছুর ভয়ে অস্থির। ডাকাতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় না। রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নী দেবীর আমলের মত দারোয়ানগুলিকে সমস্ত রাত্রি হল্লা করিতে হয়।

রামেশ্বরকেও জান। সে তোমাকে অনুকরণ করিতে চায় কিন্তু তাহার ধীশক্তি নাই এবং সাহসও নাই। দুইবার বি-এ ফেল করিয়া বিলাত যাইতে চায়। ব্যারিস্টার হইয়া আসিবে। সেও মদ্যপান করে, সেও চরিত্রভ্রষ্ট। সর্বাপেক্ষা দুঃখ তাহার যত কুদৃষ্টি রায়বাড়ীতে যাহারা আশ্রিত তাহাদের যুবতী স্ত্রী-কন্যাদের উপর।

আমি অসহায়ের মত দেখিতেছি। দেবশক্তির রোষ অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ কোন এক ব্যক্তি পাইলেও পাইতে পারে কিন্তু বংশের উপর অভিশাপ পতিত হইলে আর রক্ষা নাই। কোন এক পুরুষ পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেও বংশ পরিত্রাণ পায় না। অথবা ইহাই কালের অভিপ্রায়। কলি শেষে এমত হইবারই কথা। মানুষের সাত্ত্বিক ভাব বিলুপ্ত হইয়াছে রাজসিক ভাবও বিগত হইতেছে, এক্ষণে তামসিক ভাবই সমস্ত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে। মনে হইতেছে, অচিরকালের মধ্যেই এ দেশের অবশিষ্ট অর্ধপাদ পুণ্য তাহাও শেষ হইয়া সবই বিলুপ্ত হইবে। তবুও যে কয়টা দিন বাঁচি তুমি ভার লইলে আমি বড় সুখী হইতাম”—

ছেলে উত্তর দিলেন—সংক্ষিপ্ত উত্তর। “আপনার সহিত চিরকালের মত বিচ্ছেদ হয় ইহা কাহারও কাম্য নয়। এই শঙ্কা আছে বলিয়াই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছি। তবে আপনি যে আশঙ্কা করিয়াছেন বা দেবরোষ দেবী অভিসম্পাত অপ্রাকৃত দৈব বলিয়া যাহা বিশ্বাস করেন,

তাহা নিতান্তই সাধারণ প্রাকৃত জাগতিক ঘটনা। ইহা চিরকাল ঘটিতেছে ও ঘটিবে। শাস্ত্রীয় ধারণার ও মন্ত্র-তন্ত্রের ফেরের মধ্যে পাড়য়াই শ্যামাকান্তের ঐরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছিল নতুবা ইহা তো পৃথিবীতে জীবজগতে অতি সাধারণ ব্যাপার; মনুষ্যকুলের মধ্যেও এমন ঘটনা তো অহরহই ঘটিতেছে। বিশেষ করিয়া বিত্তশালী সম্পদশালী যাহারা তাহাদের মধ্যে এবং যাহারা দেহের শক্তিতে একেবারে দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ, যাহাদের গুণ্ডা বলি, তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা খুবই বুদ্ধিমান, চতুর, বিদ্যাবুদ্ধির শক্তিতে বলীয়ান বলিয়া দেশ ও সমাজের চলিত ধ্যানধারণা হইতে সৃষ্ট নিয়মাদির অলীক গণ্ডী পার হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন ঘটনা অনেক ঘটিতেছে। তাঁহারা শ্যামাকান্তের মত পাগল হইয়া যান না। আপনি পিতা আপনার সহিত এসব লইয়া তর্ক আমার সাজে না। অন্ততঃ আমাদের সমাজে সাজে না। তবে আপনি কথাটা লইয়া পত্রে বড়ই আক্ষেপ করিয়াছেন এবং আপনি এইরূপ ধারণার বদ্ধ সংস্কারে আজীবন ক্লেশ পাইতেছেন বলিয়াই কথাগুলি লিখিলাম। আমার জীবনে আপনার সহিত যে সংঘর্ষ এবং গরমিল তাহাও এই মতভেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই লিখিতে সাহস পাইলাম। পরিশেষে নিবেদন—সম্পত্তিরক্ষার জন্য আমাকে কীর্তিহাটে লইয়া গিয়া বিব্রত করিবেন না বা নিজেও বিব্রত হইবেন না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

—মধ্যে মধ্যে সংসারে ঘটনা এমনভাবে ঘটে সুলতা; সুরেশ্বর বললে,—যে দেখেশুনে মনে হয় মানুষ যখন কোন সংকল্প করে তাকে ভাঙবার জন্যেই ঘটনাটা কেউ ঘটালে।

আমাদের কীর্তিহাটের দয়াল দাদু আজ বেঁচে নেই, ১৯৩৭ সালেও ছিলেন, ১৯৪২ সালের সাইক্লোনের পরই মারা গিছলেন। তিনি বলতেন—ভায়া ভগবানের মত রসিকও কেউ নেই আবার দর্পহারীও কেউ নেই। জান মধ্যে মধ্যে মানুষ যখন আস্ফালন করে তখন তিনি কান পেতে শোনেন আড়ালে দাঁড়িয়ে আর মুচকে মুচকে হাসেন। তারপরই তার ঘটনাচক্রের যে বিরাট কলটি সেই কলের একটি ছোট বোতাম-টোতাম টিপে দেন আর এমন ঘটনা ঘটে যে মানুষের আস্ফালন সংকল্প সব কাচের বাসনের মত আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

—এখানেও যেন দর্পহারী ভগবান কথাটা কান পেতে শুনে হেসেছিলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এল জানবাজারে—"আগামীকাল স্টেশনে গাড়ী রাখ।" রায়বাহাদুর।

সেকালে রায়বাহাদুরেরা খেতাবটাকে বাড়ীতেও ব্যবহার করতেন। গিন্নীরা সাধারণতঃ বলেন, বলতেন—উনি ওঁর; না হয় কর্তা-কর্তার, নয় তো বাবু-বাবুর; রায়বাহাদুর হলে তাঁরাও চাকরবাকর থেকে সবার কাছেই বলেন—রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুরের। রায়বাহাদুরের টেলিগ্রামে রায়বাহাদুর লিখে ঠিকানার ঘরে নিজের নামটা লিখতেন।

চমকে উঠেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ কোন সময়ে আসছেন তিনি?—আসবার কারণ তাঁর অনেক ছিল—তখন কলকাতায় নতুন বিডন স্ট্রীটের উত্তরে গোয়াবাগানের কাছ বরাবর

এক বিঘে জমির উপর বাড়ী—হুগলকুড়িয়া লেন ; পাশে একটা তেলকল, এ হচ্ছে শিবেশ্বর এবং রামেশ্বরের জন্যে। তত্ত্ববিধান যা করবার শিবেশ্বর এসে গিয়েই করতেন। রামেশ্বর থাকতেনই জানবাজারে, দাদার ভক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর উপর খুব ভরসা শিবেশ্বর করতেন না। কিন্তু দেবেশ্বরের পক্ষে সময়টা খুব ভাল ছিল না, অন্তত বাপের সঙ্গে দেখা করবার মত শান্ত এবং স্থির ছিল না মন। তখন কিছুদিন ধরে ব্যবসা বাড়াবার জন্যে নতুন নতুন পিটখাদ কেটে চলেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটা ভুয়ো হয়ে গেল। তিনি হুণ্ডী কেটে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সময় বুঝে হুণ্ডীওলারা চেপে ধরেছে। তিনি বিব্রত। টাকা চাই। সে অনেক টাকা, সে আমলে পাঁচ লাখের কাছাকাছি। তারই জন্য তিনি ছুটোছুটি করছেন কিন্তু বাপকে জানান নি ; এ ধরনের বিপদে বাপকে কখনও জানাবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেই তিনি নেমেছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়।

দেবেশ্বর রায় শুধু জেদী ছিলেন না, তাঁর অনুমানশক্তি ছিল বুদ্ধির সঙ্গে প্রখর, তার উপর ছিল একটা আভিজাত্যবোধ।

সেকালে তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৈতৃক ঋণশোধের একটি আশ্চর্য আভিজাত্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

দেবেশ্বর রায় সেইদিনই সায়েব কোম্পানীকে চারটে কলিয়ারী বেচে হুণ্ডী শোধের ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন ; বলতে গেলে ব্যবসা একরকম উঠিয়েই দিলেন ; কারণ চালু কলিয়ারী রইল না, থাকবার মধ্যে থাকল মানভুম জেলায় বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর, তাও বরাকর থেকে এদিকে ঝরিয়া ওদিকে কাতরাস পর্যন্ত ছড়ানো। তাতে কাজ করতেও বহু অর্থ প্রয়োজন। তা হোক তিনি খুশী হলেন। বাপ যেন তাঁকে এই বিব্রত অবস্থায় না দেখেন।

টাকা তাঁর স্ত্রীর ছিল। উমা দেবী বাপ-মায়ের এক কন্যা। মানুষ হয়েছিলেন দিদিমার কাছে। তাঁর সম্পত্তি টাকায় পরিণত ক'রে কোম্পানীর কাগজ করে দিয়েছিলেন দিদিমা, সে কাগজের পরিমাণ কম নয়—দেড় লাখ। সে কাগজ ছিল রত্নেশ্বর রায়ের কাছে। বউ দিয়েছিলেন রাখতে—বাবা এ আপনি রাখুন। আমি কোথায় রাখব।

রত্নেশ্বর রেখেছিলেন। যখন দেবেশ্বর কীর্তিহাট থেকে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জিতে ফিরে আসেন তখন তিনি তাঁর ভিক্ষে-মা কৃষ্ণভামিনীর সম্পত্তির তিন ভাগের দু ভাগ বাবদ দাম হিসেব ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নামের কোম্পানীর কাগজ তিনি নেন নি। তিনি চান নি রত্নেশ্বরও দেন নি ; এমন কি উল্লেখও করেন নি।

স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও বাইরে একটা বিভেদ ছিল না কিন্তু অন্তরে অন্তরে একটা বিরাট পার্থক্যের দুই তীরে তাঁরা বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন নাস্তিক, স্ত্রী ছিলেন ঘোরতর দেবতা-বিশ্বাসী। দেবেশ্বর বাস করতেন ভাবীকালে, স্ত্রী বাস করতেন ভূতকালে ; বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী ভবানী দেবীর মত ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা। স্বামীকে ভয় করতেন

তিনি। প্রমত্ত দেবেশ্বর বিছানায় শুতেন স্ত্রী পায়ের তলায় বসে হাত বুলিয়ে দিতেন, এইটুকু না হলে দেবেশ্বরের ঘুম আসতে দেরি হত, এটুকু বড় ভাল লাগত তাঁর, পায়ে স্ত্রীর আলতো হাতের স্পর্শ পাবা মাত্র তাঁর চোখ বুজে যেত, তারপরই হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যে নাক ডাকতো তাঁর। তখন উমা দেবী জানালার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে বসে কাঁদতেন। কোন কোন দিন টের পেয়ে দেবেশ্বর প্রমত্ততার মধ্যেই পুরুষের স্বাভাবিক কামনায় আত্মনিবেদনকারীটিকে টেনে নিতেন আদর করতেন তারপর ঘুমিয়ে যেতেন। স্ত্রীও হয়তো ঘুমিয়ে যেতেন, কিছুক্ষণ পর পাশের খাটে ছেলের সাড়া পেয়ে উঠে যেতেন। সকালবেলা থেকে জীবন আর এক রকম। কায়দা আর কানুনের চাকায় চাকায় দাঁতে দাঁতে লেগে ঘুরে চলত। নিঃশব্দে সে ঘোরা, বিনা সংঘর্ষে সে ঘোরা, দিনের পর রাত্রি আসার মত সে ঘোরা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, তখনও বাংলাদেশে মেয়েদের জীবনে চলছে চরম দুর্ভাগ্য। পুরুষের ক্রীতদাসী, সমাজে বহু সুন্দর বাক্য বহু সম্মানের অভিনয়ের মধ্যে তার আসল স্বরূপ হল কেনাবেচার সামগ্রী। বাপের বুকের বোঝা। শ্বশুরের ঘরে নামে লক্ষ্মী হলেও কাজে স্বামীর অনুগ্রহনির্ভরা।

ছেলে বিয়ে করতে যেতো মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেন—কোথায় যাচ্ছ বাবা?

ছেলেকে জবাব দিতে হত—তোমার দাসী আনতে মা।

দেবেশ্বর নিজে এদের দলের ছিলেন না, অন্য মত পোষণ করতেন, কিন্তু কালের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। স্ত্রী সেকেলে মনোভাবের বলে তাকে ঘরের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, নিজের মনের ঘরের অধিকার দেন নি। সেই কারণেই স্ত্রীর টাকা তিনি বাপের কাছ থেকে চেয়ে নেন নি। স্ত্রী যা হয় করবেন অথবা তাঁর অন্তে উত্তরাধিকারীরা যা হয় করবেন, তিনি ছোঁবেন না নেবেন না এই ছিল তাঁর সংকল্প। স্ত্রী নিজে চেয়ে নিয়ে দিলে তিনি হয়তো নিতেন কিন্তু স্ত্রী তো তা দেন নি।

রত্নেশ্বর রায় সেই কোম্পানীর কাগজ নিয়েই দিতে এসেছিলেন এবং নিজে থেকে বাকী টাকা দিয়ে সব মেটানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সে অনুমান করে নিতে দেবেশ্বরের দেরি হয় নি। তাই তিনি একদিনেই কলিয়ারী বেচে দিয়ে প্রশান্তমুখে বাপকে আনতে গিয়েছিলেন হাওড়া স্টেশন।

হাওড়ায় ছেলেকে দেখে রত্নেশ্বর রায়ও ধাঁধাতে পড়েছিলেন। এমন প্রশান্ত মুখ তো তিনি কল্পনা করেন নি।

ছেলে প্রণাম করে জিনিসপত্র গাড়ীর ছাদে চাপিয়ে গাড়ির সামনের সিটে বসে বাপকে প্রশ্ন করেছিলেন—হঠাৎ এমনভাবে এলেন, খবর সব ভাল তো? চিঠি না দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন!

গাড়ীর ভিতর বসে অন্ধকারের মধ্যেই ছেলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। বললেন—হ্যাঁ ভাল।

ছেলে আর প্রশ্ন করলেন না। চুপ করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—হুগোলকুড়িয়ার বাড়ি সেদিন আমি দেখতে গিছলাম, প্ল্যান আমার ভাল লাগল না। ঘরগুলো—

—ও সব শিবেশ্বর রামেশ্বরের পছন্দ, ওদের বাড়ী ওরা যেমন চায় তেমনি হচ্ছে।

—বাড়ীটা ওখানে না করলেই হত। তেলকলটা কিনছেন তেলকলের জন্যে. ও জায়গাটা রেখে সরে বাড়ী করাই ভাল ছিল।

—থাক ওসব কথা। আমি ওজন্যে আসি নি। আমি হিসেব মেটাতে এসেছি আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দিন ফুরিয়ে আসছে। প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন, তারপর থেকে পিতামহ সোমেশ্বরের কাল থেকে সবাই আমাদের স্বল্পায়ু। পঞ্চাশ কেউ পার হয় না। তোমাকে এত ক'রে লিখলাম তুমি গেলে না। আমি এলাম তোমার যা বিশেষ কিছু আমার কাছে পাওনা আছে তাই দেবার জন্য।

—পাওনা? আপনার কাছে আমার বিশেষ পাওনা? হাসলেন দেবেশ্বর।

—হ্যাঁ। তোমার ভিক্ষে-মায়ের টাকা তুমি নিয়েছ। আমি দিয়েছি। কিন্তু বউমায়ের পিতৃধন কোম্পানীর কাগজ আমার কাছে গচ্ছিত ছিল, সেটা তুমি চাও নি। তা ছাড়া বউমায়ের দিদিমা বলেছিলেন—ওর বয়স বিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত ওর হাতে বা—।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—এমন কি তোমার হাতে দিতেও বারণ করেছিলেন।

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—কথাটা তোমাকে বলা হয় নি। এ বিয়ের সম্বন্ধ আমি করি নি; কাশীতে পিসেমশাই আর অন্নপূর্ণা এ সম্বন্ধ করেছিল। তখন তুমি গুলির ক্ষতের জন্যে বিছানায় শুয়ে। তোমার কথাটা তাঁর অগোচর ছিল না। সেইজন্যে বউমার বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাকে বা তোমাকে দিতে বারণ করেছিলেন।

দেবেশ্বর সামনের সিটে স্থির হয়ে বসে শুনছিলেন। কোন উত্তর করেন নি।

বাড়ীতে এসে মুখ হাত ধুয়ে খাবার আসনে বসে রত্নেশ্বর পুত্রবধূকে ডেকে কোম্পানীর কাগজগুলি তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—তোমার পৈতৃক ধন মা। তোমার দিদিমা তোমার বাপের সরিকানী সম্পত্তি বেচে টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ করেছিলেন। বিয়ের সময় আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—উমার বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এ কাগজ আপনার হাতে রাখবেন। আমি তার থেকেও বেশী দিন রেখেছি। সুদে আসলে জমে দেড় লক্ষের উপর দাম এর এখন। নাও তুমি। নিয়ে দেবেশ্বরকে দাও। আমি শুনেছি—দেবেশ্বর বিজনেসে লোকসান খেয়েছে। হুণ্ডির দেনায় বিব্রত হয়েছে। টাকা আমি দিতে পারতাম। কিন্তু সম্ভবতঃ দেবেশ্বর তা নেবে না। ভাইদের অজুহাত দেখাবে। সেটা

নেহাৎ মিথ্যেও নয়। শিবেশ্বর এমনিতেই বলে আমি পক্ষপাত ক'রে থাকি। দেবেশ্বর এই টাকা তুমি ব্যবসায়ে লাগাও। প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে এস্টেট থেকে টাকা ধার হিসেবেও দিতে পারি।

চমকে ঠিক ওঠেন নি দেবেশ্বর, তিনি গোড়াতেই অনুমান করেছিলেন, তবুও কথাটা এইভাবে পাড়বেন এ অনুমান করেন নি। ভেবেছিলেন রত্নেশ্বর নিজের স্বভাব অনুযায়ী উপদেশের ছলে তাঁকে অনেক তিরস্কার ক'রে বলবেন—হুণ্ডির ডিটেলস দাও, আমি সব মিটিয়ে দিয়ে তবে যাব।

বধূ কোম্পানীর কাগজগুলি হাতে তুলে না নিয়ে বললে—আপনার ছেলেকেই দিন।

—না মা, তুমি নিজে ওকে দাও, দিয়ে প্রণাম কর।

দেবেশ্বর এতক্ষণে বলেছিলেন—হুণ্ডীর ঝঞ্ঝাট সব মিটে গেছে। আজই আমি মিটিয়ে ফেলেছি।

—মিটিয়ে ফেলেছ? কি ক'রে মেটালে? আমি খবর পেয়েছিলাম—তুমি বিব্রত হয়ে পড়েছ। পাগলের মত ঘুরছ টাকার জন্মে। আমার শরীর খারাপ তবু আমি শুনে স্থির থাকতে পারি নি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যে শোনেন নি। দুটো দুটো বড় প্রজেক্ট একেবারে ফেল করে গেল—ডাইক বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এ্যাবাণ্ডন করতে হয়েছে। এদিকে পাওনাদারেরা দায় বুঝে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে যা আমাদের দেশের স্বভাব। কিন্তু আমি তাতে দমি নি। ভাজিন ল্যাণ্ড যা নিয়েছি তা রেখে চালু কলিয়ারি ক'টা বিক্রী করে দিচ্ছি বেঙ্গল কোলকে—চুক্তি হয়ে গেছে। দলিল হতে বাকী আছে। হুণ্ডীর দায় এখন বেঙ্গল কোলের।

—চালু কলিয়ারিগুলো সব বিক্রী করে দিলে, আমাকে জানালে না?

চুপ ক'রে থাকলেন দেবেশ্বর।

—আমি কি তোমার শত্রু দেবেশ্বর?

দেবেশ্বর তবু নীরব হয়ে রইলেন।

—দেবেশ্বর!

এবার দেবেশ্বর বললেন—না। আপনি জন্মদাতা পিতা। কিন্তু এ ব্যবসা আমি আপনার অমতে করেছি। এতে ফেল পড়ে দেনার জন্মে আপনার কাছে গেলে আপনার ছেলের মত কাজ করা হ'ত না।

—বউমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে?

ঘাড় নাড়লেন দেবেশ্বর। না।

সঙ্গে সঙ্গে বধূ উমা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটির উপর আছাড় খেয়ে।

এর পনের দিনের মধ্যে আবার টেলিগ্রাম এল কীর্তিহাট থেকে। রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাট ফিরে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জ্বর হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় টেলিগ্রাম করেছেন—বউমা এবং ছেলেদের নিয়ে এখানে এস, আমি অসুস্থ। ঠিক তার পরের দিন আবার টেলিগ্রাম এল—ফাদারস ইলনেস সিরিয়াস ডিলিরিয়াস কাম ইমিডিয়েটলি—শিবেশ্বর।

এবার ফিরতে হয়েছিল দেবেশ্বরকে। স্ত্রী দুই পুত্র নিয়ে দেবেশ্বর কীর্তিহাটে ফিরেছিলেন বহুকাল পর। অবশ্য দু'একদিনের বা চারদিনের জন্য কয়েকবার এসেছেন এ আসা সে আসা নয়; এবার এসেছিলেন যেন থাকতে হবে ব'লে। সঙ্গে পনের বছরের বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর এবং ছোট ছেলে যোগেশ্বর তখন তের বছরের। যোগেশ্বরের পর আর সন্তান হয় নি।

রুগ্ন বিকারগ্রস্ত বাপের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম নিজেকে হারালেন দেবেশ্বর এবং হেরেও গেলেন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বকছেন—বাবা, বাবা, বাবা! না-না-না। মা কই মা?—মা?

—স্বর্ণলতা! সরস্বতী বউ! ছি—ছি! কোথা যে যাও! কেন অঞ্জনাকে বার বার আমার কাছে আসতে দাও। ছি—ছি।—ছি-ছি। তুমি কিছু বোঝ না।—না—না—না।

—দেবেশ্বর এল না? দেবেশ্বর? দেবেশ্বর!

টপ্ টপ্ করে চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করেছিল। এই সময় শিবেশ্বর এসে গম্ভীর মুখে তাঁর হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বলেছিল—এখানা বাবা কাল লিখে ম্যানেজারের হাতে দিয়েছিলেন। উনি আমাকে দিয়েছেন। কাগজখানা তুমিই রাখ।

জ্বরে পড়ে অবধি রত্নেশ্বর রায় একটা কঠিন কিছুর আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির প্রৌঢ় ডাক্তার তাঁকে গোড়া থেকেই দেখছিলেন, তাঁকে তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা চুলকে বলেছিলেন—কই, তেমন কিছু তো ঠিক মনে হচ্ছে না।

অল্প অল্প জ্বর, শরীর খারাপ; এই পর্যন্তই—তার বেশী কিছু না। রোজ কাছারী করছিলেন। পাঁচ দিনের দিন জ্বরটা একজ্বরীতে দাঁড়াল, ষষ্ঠ দিনের দিন তিনি সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ডাক্তারকে এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একসঙ্গে। ডাক্তারকে বলেছিলেন—কি বুঝছ?

—আজ্ঞে না, তেমন কিছু নয়, বোধহয় পেট পরিষ্কার নেই—

—তুমি ঠিক ধরতে পারছ না। মেদিনীপুর থেকে সিভিল সার্জেনকে কল দাও। একটু পর বলেছিলেন—না, বেটাদের মুখখানাই লাল আর মুখেই খুব বড়াই। মেদিনীপুরের গোলাপ ডাক্তারকে কল দাও। বুঝেছ?

ম্যানেজারকে বলেছিলেন—তুমি এই টেলিগ্রামটা পাঠাও কলকাতায়।

প্রথম টেলিগ্রাম নিজে খসড়া করে দিয়েছিলেন—বউমা এবং ছেলেদের নিয়ে অবিলম্বে

স, আমি অসুস্থ—রত্নেশ্বর।

ম্যানেজার চলে যাচ্ছিলেন রত্নেশ্বর হঠাৎ তাকে ডেকে বলেছিলেন—দাঁড়াও হে। শুনে যাও।

ব'লে একখানা নাম ছাপানো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে কিছু লিখে ম্যানেজারের হাতে দিতে গিয়েও দেন নি। কাগজখানাকে সামনে রেখে তার একটা নকল ক'রে নিয়ে বলেছিলেন—"একখানা সদরের উকীলের কাছে পাঠিয়ে দাও। একখানা তোমার হাতে রইল। যদি আমার রোগ কঠিন হয় তা হ'লে এই নির্দেশমত কাজ করবে। বুঝেছ?"

কাগজখানার লেখা ছিল—"অদ্য হইতে আমার জীবিতকালের শেষক্ষণ পর্যন্ত রায়বাড়ীর সমুদয় এস্টেট ইত্যাদি সমস্তই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান দেবেশ্বর রায়ের হুকুমমত এবং তাঁহার হিসাবুদে চলিতে থাকিবে। ব্যাঙ্কের কার্যাদি বন্ধ থাকিবে। আদায়ী খাজনা ইত্যাদি ও সিন্দুকে মজুত অর্থ হইতে ব্যয়াদি নির্বাহ হইবেক। সিন্দুকে যাহা মজুদ আছে তাহা গত কালকার রোকড়ের হিসাবের মধ্যে দৃষ্ট হইবেক। তাহার পাশে আমি সহি দিয়াছি। ইহাতে অপর কোন ব্যক্তির অর্থাৎ আমার অপর দুই পুত্রের কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না। দেবেশ্বরের সকল কৃতকার্য আমার কৃতকার্যের তুল্য বলিয়া গণ্য হইবেক। আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বিছানায় বসিয়া এই পত্র লিখিলাম এবং ইহার একখণ্ড নকল সদরে আমাদের উকীলের নিকট প্রেরণ করিলাম।

ইতি রত্নেশ্বর রায়।"

শিবেশ্বর সেই কাগজখানি বড়ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—এই উনি নিজে হাতে লিখে ম্যানেজারের হাতে দিয়েছিলেন। ম্যানেজার আমাকে দিলেন পরশু উনি হুঁশ হারাবার পর। পরশু সাত দিন গেছে। মেদিনীপুরের ডাক্তার বলে গেছে জ্বর বিকার।

থেকে থেমে কথা বলছিলেন শিবেশ্বর।

দেবেশ্বর বুঝতে পারছিলেন যে, শিবেশ্বর কান্না চেপে কথা বলছে। কথাটা ঠিক। ভুল তার হয় নি। ক্ষোভে ক্রোধে তাঁর কান্না আসছিল। শিবেশ্বর জানতেন বিশ্বাস করতেন তিনিই পিতার অনুগত এবং প্রিয়তম পুত্র। দেবেশ্বরের চোখ থেকে জলের ধারা গ'ড়িয়ে পড়ল এবার।

বত্রিশ দিন পর রত্নেশ্বর রায়ের সেই জ্বরের পর পথ্য করেছিলেন—জ্বর ছেড়েছিল আটাশ দিনের দিন। বিকার কেটেছিল চব্বিশ দিনে।

বিকারের মধ্যে বার বার বলেছেন—দরজা খোল দেবেশ্বর। দেবেশ্বর! বেশ ধমক দিয়ে বলেছেন। কখনও মিনতি করে বলেছেন। তারপর বলেছেন :—ভাঙো দরজা ভাঙো আবদুল—মহাবীর, তোড়ো দরজা।

বিকার যেদিন কাটল সেদিনও ডেকেছিলেন—দেবেশ্বর! দেবেশ্বর কই? পুত্রবধূকে

মাথার শিয়রে দেখে চিনতে পেরেছিলেন—বলেছিলেন, বড়বউমা! এপাশে তাকিয়ে দেখে মেজবউমাকে দেখে বলেছিলেন—মেজবউমা! শিবেশ্বরের প্রথমা স্ত্রী ইনি।—

বড় পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডেকেছিলেন—বাবা!

—মা! তারপরই বলেছিলেন—জোরে বল, কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছি না।—

বড়বউমা বলেছিলেন—ছোটবউও রয়েছে; এই যে আমার পাশেই রয়েছে। বলে ছোটবউ অর্থাৎ রামেশ্বরের স্ত্রীকে শ্বশুরের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্বশুর একটু ক্ষীণ হেসে, ঘাড় নেড়ে সন্তোষ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দু ফোঁটা জল দুই চোখের কোণে জমে উঠেছিল।

বড়বউমা আবার বলেছিলেন—পিসীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। পরশু থেকে জ্বর কমতে শুরু করেছে দেখে কলকাতা ফিরে গেছেন। আবার আসবেন। কথা বুঝতে ভুল করেন নি রত্নেশ্বর রায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন—অন্নপূর্ণা এসেছিল!

—কি কষ্ট হচ্ছে বাবা? বোধ হয় চোখের জল দেখেই বড়বউমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথাটা—

—কষ্ট? বুঝতে পারছি না। একটু ভেবে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—বড় দুর্বল মনে হচ্ছে।

—চুপ করে শুয়ে থাকুন। বড় দুর্বলই হয়েছেন যে!

—কদিন হল আজ?

—চব্বিশ দিন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তোমরা কবে এলে?

—আজ আঠারো দিন হয়ে গেল বাবা।

—দেবেশ্বর? সে?

—এসেছেন। ওই যে—ওই বারান্দায়, আসছেন বোধ হয়।

সত্যিই বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠছিল, সে শব্দ রত্নেশ্বর রায় শুনতে পান নি। দেবেশ্বর শিবেশ্বর রামেশ্বর তিন ভাই—খবর পেয়ে বারান্দা ধরে ঘরে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বড়বউ ইসারা করে ডেকেছিলেন স্বামীকে—এস।—

দেবেশ্বর দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। রত্নেশ্বর দেবেশ্বরকেই বলেছিলেন—এসেছ?—

দেবেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিলেন। এর উত্তর দিতে তিনি পারেন নি। খুঁজে পান নি। তবে তিন ভাইয়ের চোখই জলে ভরে উঠেছিল। এরই মধ্যে ডাক্তার এসে পড়ে সবিনয়ে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার বড়বাবু।

বড়বাবু দেবেশ্বর। দেবেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ। নিশ্চয়। তবে ওঁকে বলে যেতে হবে। না-হলে—

বড়বউ উমা বলেছিলেন—জোরে বলো একটু—কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছেন না।

দেবেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন—ডাক্তার বলছেন আপনার এখন বিশ্রাম দরকার।

রত্নেশ্বর রায় ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন, হাঁ।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আর কিছু হবে না। হতে দেরি আছে। বলে গেছে আমাকে।

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন দেবেশ্বর, তাঁর সঙ্গে অন্য ভাই এবং বউয়েরাও।

রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—তোমার মা। তোমার মা সারা অসুখটা ওই ঘরে আমার সামনে বসে থেকেছে। এই তো সে গেল। বলে গেল—আমি এবার চল্লাম। এখন আসতে তোমার দেরি আছে কিছুদিন। ভাল হয়ে গেলে এবার।

* * *

বত্রিশ দিনের দিন পথ্য পেয়েছিলেন। সেদিন অন্নপূর্ণা দেবী কলকাতা থেকে এসেছিলেন কীর্তিহাট। যাবার সময় তাঁর দেবু ভাইপোকে বলে গিয়েছিলেন—তুই যেন এখনই দাদাকে ফেলে কলকাতা চলে যাস নি দেবু।

দেবেশ্বর হেসেছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চলে যাব এটা তোমরা ভাইবোনে ধরেই নিয়েছ পিসী?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—হ্যাঁ, দাদা বলছিলেন।

—সে তুমি বলতেই আমি বুঝেছি।

—না, শুধু উনি বলেন নি—আমিও বলছি। আমি তোকে জানি। তোর মত নেমকহারাম আর দুটি নেই। অত্যন্ত স্বার্থপর।

দেবেশ্বর হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, ওটা আমি মানি। তবে আমার স্বার্থবোধ একটু ভিন্ন রকমের পিসী। স্বার্থ আমার কাছে selfishness যাকে বলে তাও বটে, আবার ওইটের মধ্যেই আমার আসল মানে আসল চেহারা যাকে বলে তাও বটে। তবে এখন যাব না, অন্তত উনি একটু সেরে না ওঠা পর্যন্ত না। এ তোমাকে কথা দিলাম।

কথাটা শুনে খুশী হয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। ছেলেকে বলেছিলেন—অন্নপূর্ণা আমাকে সব বলেছে। আমি শুনে সুখী হয়েছি। একটা পাওয়ার অব অ্যাটর্নী রেজেস্ট্রী করে দিতে চাই তোমার নামে। আমাকে তোমরা খালাস দাও। আর—

একটু চুপ করে থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমি বাপ তুমি ছেলে। আমি যা চাই তা তুমি জান। কিন্তু তা বলে তাই নিয়ে তোমাকে কষ্ট আমি দেব না, দিতে

চাইনে। শুধু আমার অনুরোধ—ভোগকে ব্যভিচার করো না, মদ যদি খাও বা না খেয়ে থাকতে নাই পার—খাওয়ার যদি দোষ আছে মনে নাই হয় তোমার তবে খেয়ো। আমার বাবা খেতেন, পিতামহ খেতেন—তাঁরাও। মানে সোফিয়া বাঈকে আমি মায়ের মতই দেখেছি—শেষ কালটায়। আমার মা—তাঁর হাতেই বাবার সেবার ভার দিয়ে মারা গিছেলেন। কিন্তু ওই মদে যেন তোমাকে না খায়, আর ভোগকে ব্যভিচার করে তুল না।—

দেবেশ্বর রাঙা হয়ে উঠেছিলেন, মুখে কিছু বলেন নি।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—জমিদারী চালাবার ব্যবস্থা তুমি যেমন ভাল বুঝবে করবে—তাতে আমি কোন আপত্তি করব না। একটু সারলেই আমার ইচ্ছে পুরী গিয়ে আশ্বিন মাসটা থেকে শরীর সেরে, একবার তীর্থও দর্শন করব। ইংরেজের দৌলতে তীর্থভ্রমণে আর কষ্ট নেই—যার যেমন বিত্তের সাধ্য সে তেমনি আরামে যেতে পারে। শিবেশ্বর তোমার কাছে থাকবে, রামেশ্বর এবং ছোট বউমাকে নিয়ে আমি বরং যাব, কি বল ?—

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে চমৎকার একখানা 'ভারত দর্শন' নামে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচিত হতে পারত। সুন্দর বর্ণনা তাঁর। হয়তো ঐরকম ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় নি। পুরীতে মাস দুয়েক থেকে পুরী থেকে, দক্ষিণে মাদ্রাজ হয়ে রামেশ্বরম এবং ফেরবার সময় ভারতের পশ্চিম উপকূল হয়ে দ্বারকা, সেখান থেকে রাজস্থান, পাঞ্জাব, চিতোরগড়, জ্বালামুখী হয়ে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রী, দিল্লী, আগ্রা, বৃন্দাবন এসে সেখানে কিছুদিন থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন এক বৎসর পর। এর মধ্যে প্রতিটি স্থানে তাঁর কাছে পত্র গেছে—এক কর্মচারীদের লেখা পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র তিনি খোলেন নি পড়েন নি। এক বৎসর পর যখন তিনি ফিরলেন—তখন তাঁর কাছে শিবেশ্বরের লেখা খামের চিঠি বারো-চোদ্দখানা, না-খোলা অবস্থায় তাঁর ব্যাগে বন্ধ ছিল। কর্মচারীদের চিঠিতে সংসারের পরিজনদের কুশলেই তিনি তুষ্ট ছিলেন—তার বেশী কিছু চান নি।

যেদিন ফিরেছিলেন সেদিন কীর্তিহাটে উৎসব হয়েছিল।

হাসলে সুরেশ্বর।—

দেবেশ্বর রায় এ উৎসবের পরিকল্পনা করেছিলেন।

সে উৎসব খাঁটি সাহেবী কায়দায়। কাঁসাইয়ের ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন পালকিতে। তারপর কাঁসাইয়ের ঘাট থেকে ল্যাণ্ডো-গাড়ীতে। বাপের অনুপস্থিতিতে এ-গাড়ী এবং এক-জোড়া বাদামী রংয়ের ঘোড়া কিনেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

ঘাট থেকে সেই গাড়ীতে চড়িয়ে বাপের সামনের সিটে ছোট দুই ভাইকে বসিয়ে নিজে কোচবক্সে বসে ঘোড়ার রাশ ধরে চালিয়ে গ্রামে ঢুকেছিলেন।

রায়বাহাদুর গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পাদানীতে পা রেখে থমকে গিছলেন; বলেছিলেন—

কই যজ্ঞেশ্বর কোথায় ? সে আসে নি ? অসুখ-বিসুখ করে নি তো ?

বড় নাতিকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেন। বয়স তখন ষোল হয়েছে। তাকে তিনি এই ঘাটেই প্রত্যাশা করেছিলেন এবং তাকে তাঁর পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবেন ভাবছিলেন। দেবেশ্বর বলেছিলেন—না, তাকে আনি নি। কারণ যোগেশ্বর ধনেশ্বর জগদীশ্বর এদের তিনজনকেও তা হলে আনতে হত। ওটা ঠিক আমি পছন্দ করি না। যজ্ঞেশ্বর আসবে আর ওরা বাড়ীতে পড়ে থাকবে—কাঁদবে, সেটা অন্যায় হত।

বলেই তিনি বাপকে অনেকটা হাতে ধরে উঠিয়ে দিয়ে নিজে কোচবক্সে উঠে বসেছিলেন। তার রাশের টান পেয়েই ঘোড়া দুটো লাল কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর চলতে শুরু করেছিল —ঘাড় বেঁকিয়ে—। দেবেশ্বরের শক্তহাতের টানে ঘাড় বেঁকিয়ে মন্থরগতিতে চলছিল তারা বাধ্য হয়ে।—দ্রুত গেলে রাস্তার দুধারের লোক রায়হুজুরকে দেখতে পাবে না।

এই গাড়ীর জন্যে গ্রামের রাস্তাকে পাকা করতে হয়েছিল। তার উপর ফটক তৈরী করে, দুদিকে কলাগাছ এবং আমের শাখা দেওয়া জলভর্তি কলসী বসিয়ে দিয়েছিলেন—রাস্তার দুধারে খুঁটি পুতে আমের শাখা ঝুলিয়ে দিয়েই শেষ হয় নি, দুধারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন চাপরাসীদের। তারা বন্দুকের নল উপরদিকে তুলে পর পর ষোলটা ফায়ার করে মালিককে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। শুধু গ্রামের লোক নয়—আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক রায়বাহাদুরের প্রত্যাবর্তন দেখতে নিজে থেকেই ভিড় করে জমায়েত হয়েছিল কীর্তিহাটে। সেদিনের ভাণ্ডারের খাতায় চালের খরচ দেখেছি কুড়ি মণ। তার অর্থ দু হাজার লোকের খাবার বরাদ্দ। সন্ধ্যার সময় পুড়েছিল বারুদের কারখানা।

রত্নেশ্বর রায় নিজের ডায়রীতে লিখেছেন—'ল্যাণ্ডো গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া বাঁশ ও ফুলপাতায় নির্মিত তোরণগুলির মধ্য দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম—বন্দুকের ধ্বনি হইতে লাগিল—পথের দুই পার্শ্বে লোকজনেরা ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এসব দেখিয়া ভালই লাগিল। বুঝিতে পারিলাম—শ্রীমান দেবেশ্বর এক বৎসরের মধ্যে এস্টেটের ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত দারোয়ানদের পোশাক এবং চাপরাস দেওয়া হইয়াছে। মনে হইতেছে ইহা যেন একটি ছোটখাটো রাজ্য এবং আমিই তাহার অধীশ্বর। সমস্ত কিছুর মধ্যে আশ্চর্য একটি শৃঙ্খলা দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। দূর হইতে রায়বাড়ীর টিনের ছাদ ও ছাদের আলসেগুলি নীল আকাশের গায়ে গ্রামের গাছপালার শ্যামশোভার ঊর্ধ্বে চিত্রবৎ শুভ্র শোভায় ঝলমল করিতেছে। বুঝিলাম—মদীয় প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বাড়ীঘর সবই চুনকাম করানো হইয়াছে। জানালা দরজায় রঙ হইয়াছে। গাড়ী আসিয়া রায়জননী মা শ্যামাসুন্দরীর ফটকে দাঁড়াইল। আমি গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে মাটিতে পা দিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলাম—। দেখিলাম পুরাতন ফটক নাই—তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতন ফটক তৈয়ারী হইয়াছে। প্রথম প্রবেশপথেই দেখিলাম গোটা জগৎটাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।"

ফটকটা তৈরী করিয়েছিলেন কুড়ারাম রায় নিজে। ফটকের দুই পাশে দুটো বিরাটকায় প্রহরীর মূর্তি ছিল। পঙ্কচুনের কাজকরা মূর্তিদুটো মজবুদ ছিল খুব—কিন্তু রুচিসম্পন্ন ছিল না। সেকালের নতুন তেলেঙ্গী সিপাইয়ের আদর্শে, খাটো কুর্তা হাঁটু পর্যন্ত বগলস আঁটা, টাইট পেন্টুলান পরা মূর্তি ছিল। গোল গোল বড় বড় চোখ—তেমনি পাকানো গোঁফ; সে সব আবার রঙ লাগিয়ে মূর্তি দুটোকে আরও ভয়াল করে তোলা হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে-পুলেরা মূর্তি দুটো দেখলে ভয় খেতো; হয়তো বা যেসব গ্রাম্য দরিদ্র প্রজারা মনের দিক থেকে শৈশব বা বাল্যকাল অতিক্রম করে নি—তারাও জমিদার বাড়ী ঢুকবার সময় আতঙ্কিত হয়ে এখানে প্রবেশ করত।

সে দুটোকে ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার চিহ্নমাত্র নেই। তার স্থলে দুপাশে দুটো পাথরের সিংহ বসানো হয়েছে। সামনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে থাকা ভঙ্গিতে তৈরী সিংহের মূর্তি দুটো অদ্ভুত। রত্নেশ্বর এ ধরনের বা এ গড়নের পাথরের ছোট ছোট সিংহ উড়িষ্যায় দেখেছেন। এ দুটো দেখতে অবিকল সেই রকম হলেও আকারে বেশ বড়; অন্তত নিচের দিকে হাত তিনেক উঁচু পাথরের থামের উপর বসিয়ে অনেক বেশী উঁচু করে তোলা হয়েছে।

রত্নেশ্বর থমকে দাঁড়ানোর জন্যই সমস্ত কিছু যেন একটা হুঁচোট খেয়ে গেল। স্তব্ধ রায়-বাহাদুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিংহ দুটোর দিকে। একবার এটাকে দেখছেন—একবার ওটাকে।

ওদিকে তখন ভিতরে নাটমন্দিরে শাঁখ বাজছে, দুটি সধবা মেয়ে পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে ফটকের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ম্যানেজার থেকে কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে একদিকে—মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ীর মেয়েরা—মানে বড়বউ এবং মেজবউ—তাঁদের পিছনে রায়বাড়ীর অনেক পোষ্য। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত; মায়ের পূজক এবং পরিচারকেরা। মিনিট দুয়েক রায়বাহাদুর দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন মূর্তি দুটো। এই দু মিনিট কাল সময়ই যেন অনেক বেশী সময় বলে মনে হয়েছিল সকলের। রায়বাহাদুরের কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠেছে। রত্নেশ্বর রায়ের কপালখানি ছিল প্রশস্ত এবং চিত্তের সামান্য ক্ষোভে বা বিরক্তিতে পাঁচটা সমান্তরাল রেখা জেগে উঠত। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত তীক্ষ্ণ। তাঁর অসন্তোষ বুঝতে কারুর বাকী রইল না।—

বড়ছেলে দেবেশ্বর এসে কাছে দাঁড়ালেন, বললেন—ভিতরে চলুন। সকলে অপেক্ষা করছেন।

—এ সিংহ দুটো?

—উড়িষ্যার তৈরী। আপনি তীর্থে বেরিয়ে গেলেন পুরী থেকে—আমি ফিরবার সময় কোনারক ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে স্যাণ্ডস্টোনের সিংহমূর্তি নিয়ে এসে,

কলকাতায় সায়েব কোম্পানীকে বরাত দিয়ে, মার্বেলের বড় সাইজের করিয়ে আনিয়েছি। সে মূর্তি দুটো অত্যন্ত খারাপ ছিল, দেখতে ভালগার। এ দুটো ভাল হয় নি ?

ছেলের মুখের দিকে তাকালেন রায়বাহাদুর। দেখলেন টকটকে ফরসা রঙ বড় বেশী লাল হয়ে উঠেছে, সম্ভবতঃ এতক্ষণ ওই শক্তিমান ঘোড়া দুটোর রাশ ক'ষে টেনে ধরে এসে পরিশ্রম বেশী হয়ে গেছে। তিনি বললেন—ভাল নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু ও মূর্তি দুটো আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীবাড়ী তৈরী করাবার সময় নিজের পছন্দমত করে তৈরী করিয়েছিলেন তো!

—আছে সে দুটো। গোটাগুটি তুলবার চেষ্টা করিয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক পারা যায় নি। কিছু কিছু ভেঙে গেছে; ফেটেও গেছে। হয় তো বা আর কিছুদিনের মধ্যেই আপনা-আপনিই ফাটত—বয়স তো কম হল না—১৭৯৫ সাল আর এটা ১৮৯৬ সাল—একশো এক বছর হয়ে গেল।

—হুঁ। বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়; তারপর অকস্মাৎ যেন সচেতন হয়ে বলেছিলেন—চল ভিতরে চল। ব'লে পা বাড়িয়েছিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে চারিদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে খুঁজতে ডেকে উঠেছিলেন—দাদু, দাদুরা কই ? অর্থাৎ নাতিরা!

দেবেশ্বর বলেছিলেন—মাকে প্রণাম করুন, তারপর সকলে এসে আপনাকে প্রণাম করবে।

রত্নেশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দীর্ঘজীবী হও।

অপর সকল নাতিরা এসে প্রণাম করলে তাঁকে।—এল না কেবল বড়নাতি। সে শরীর খারাপ বলে ঘরে শুয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে ঢুকলেন রত্নেশ্বর রায়—দেবেশ্বর বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন—বললেন—আমি এখন আসছি। দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন।

বলেই, চলে গেলেন।

রত্নেশ্বর রায় নাতির ঘরে ঢুকলেন।—কি হয়েছে দাদু ?

*　　*　　*

নাতির ঘর থেকে বের হলেন একটু গম্ভীর মুখে—তারপর রায়বাড়ীটার প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখে এসে নিজের ঘরে ঢুকলেন। এতক্ষণে প্রথম কথা বললেন—বললেন, আমার ঘরটা তেল-রঙ না করলেই ভাল করতে। সাদার চেয়ে কোন রঙ আমার ভাল লাগে না, আর তেলরঙের একটা গন্ধ আছে। আঃ। ওটা আবার কি ? ও, কেরোসিন তেলে চলা পাখা। না-না-না। ওটা বড়বাবুর ঘরে দাও। না—, বড়বাবুর আর মেজবাবুর ঘরে পাখা তো আছে। তা হলে যেখানে হোক দাও। কেরোসিন তেলে চলা পাখার বাতাস গরম হবে—একটা গন্ধ হবে গ্যাসের। আমার টানা পাখা ভাল।

পরের দিন নতুন কাছারী ঘরে এসে বসেই আবার উঠে গেলেন। এসে বসলেন দেবোত্তরের সাবেক কাছারী ঘরে, যেখানে সোমেশ্বর রায় বসতেন; সেখান থেকে উঠে নিজের শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বললেন—এখানেই আমার বসবার জায়গা করতে বল। আর তোমাদের বড়বাবুকে গিয়ে বল, গত বছরের কাগজপত্র একটু দেখতে চাই। জমা-খরচ—রোকড়খানা আর মোটামুটি আয়ব্যয়ের হিসেবটা।

তিনদিন পর দেবেশ্বর এসে পাশে দাঁড়ালেন।

খাতা দেখছিলেন রত্নেশ্বর রায়। মুখ তুলে বললেন—ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে পাঠাব। কয়েকটা খরচের ব্যাপার—

—খাতা সব দেখলেন?

—হ্যাঁ। সবই ঠিক আছে প্রায়। হ্যাঁ, তবে মামলা সেরেস্তায় কয়েকটা ডিগ্রী আদায়ের ব্যাপারে—

—আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে ও টাকা আমি পূরণ করে দেব। বোধ হয় হাজার পনের হবে।

—হ্যাঁ। চোদ্দ হাজার পাঁচশো কয়েক টাকা কয়েক আনা কত পাই যেন। না-না। ও তুমি ঠিক করেছ বেশ করেছ।

—হ্যাঁ, মহেশ্বর দাসের উপর তিরিশটা নালিশে আমাদের সুদ আর খরচা নিয়ে বিশ হাজার টাকার ডিগ্রী হয়েছিল। সে শুনেছি উদ্ধত লোক। তা উদ্ধত একটু তো হবেই। বছরে সাড়ে তিন হাজার টাকা খাজনা দেয়, জমি অন্তত দু হাজার বিঘের কাছাকাছি। আমাদের গোমস্তাদের মাইনে দিয়ে সে রাখতে পারে। সে লোক এল কাছারীতে, আমি ডিভিশনাল কমিশনার এবং কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় পায়ের কাছে টাকার তোড়া নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে হুজুর, আমাকে বাঁচান তো বাঁচি নইলে আমাকে মরতে হবে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে। আমি কি করব; বহুলোকের সামনে ব্যাপার; আমি ভেবে দেখবারও অবকাশ পেলাম না—টাকার তোড়াটা তুলে নিলাম। ব্যাপারটা খানিকটা জানা ছিল—বললাম, আর আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে না তো? খাজনা দেব না, নালিশ করে নাও গে—বলবে না তো? বললে—তা কখনও বলি নি হুজুর; কিন্তু আপনার গোমস্তা—ও তো হুজুর আমারই জ্ঞাতি, ওকেও আমিই হুজুরদের দরবারে জামীন হয়ে গোমস্তার আমলার কাজে ঢুকিয়েছিলাম। তার পরেতে উন্নতি হল—হুজুরদের বিশ্বাসের লোক হল—হয়ে হুজুর আমার মাথাতেও পা দিয়ে হাঁটতে চাইলে। চোখ রাঙাতে লাগল। কি করব হুজুর, আমি রাগের বশে একদিন, চামড়ার মুখ তো—বলে ফেললাম, নালিশ করে নে গা। বিনা নালিশে দোব না। বলেছিলাম—বলা বটে। আমি টাকার তোড়াটা নিয়ে

সেখানেই তাকে খালাস দিয়ে এলাম। তারপর ঠিক এই ধরনের ডিগ্রীর খাতক প্রজা অনেক কজন এল। তাদের সব বিভিন্ন-রকম ব্যাপার। সব ক্ষেত্রেই—

চুপ করে গেলেন দেবেশ্বর। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তির সারাংশের মত কোন কোন বিশেষ ভূমি বা বাগান বা দীঘির জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন নিজে শিবেশ্বর। তা দিতে রাজী না হওয়ার জন্য শিবেশ্বরই সুকৌশলে গোমস্তাদের দিয়ে প্রজার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে নালিশ চাপিয়েছেন তাদের উপর। কথাটা কিন্তু বাপকে মুখে বলতে পারলেন না দেবেশ্বর।

রত্নেশ্বর বললেন—তোমার নোট আছে আমি দেখেছি। এবং বুঝেছি কার কথা বলতে গিয়েও তুমি পার নি। শিবেশ্বরের এই স্বভাব আমার মাথা হেঁট করে। তাই তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শিবেশ্বর কটা খরচের কথা বলেছিল,—দেখলাম তোমার নামে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একবার পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছ—

—খাতা সব দেখেছেন তা হ'লে ?

—হ্যাঁ, দেখেছি। আরও একবার আট হাজার টাকা—

—সেটা আমাদের এস্টেটের তরফ থেকে খবরের কাগজের শেয়ার কিনেছি। আর আমার নামে নেওয়া টাকাটা—ছোট খোকা যোগেশ্বরের গবর্নেসের অপমান করেছিল যজ্ঞেশ্বর, তার দরুন তাকে ক্ষতিপূরণ বলুন, হ্যাঁ, তাই ছাড়া আর কি বলব—তাই দিয়েছি। কিন্তু সে টাকা তো আমি—

গলা পরিষ্কার করার ছলে রত্নেশ্বর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাতে দেবেশ্বর থামেন নি—তিনি বলেছিলেন—সে টাকা পরে কলকাতা থেকে চেক ভাঙিয়ে এনে তো এস্টেটে জমা দিয়েছি।

রত্নেশ্বর এবার বললেন—কথাটার আলোচনা থাক। আমি সব শুনেছি।

রত্নেশ্বর রায় তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এক বছর। এই এক বছরের মধ্যে দেবেশ্বর এস্টেটের ভার নিয়েছিলেন—কিন্তু কলকাতার বসবাস ছাড়েন নি, ছেলেরা কলকাতার স্কুলে পড়ে; তিনি আসা যাওয়া করতেন। থাকতেন বিবিমহলে। মেজভাই শিবেশ্বরের স্ত্রী সংসারের গৃহিণী ছিলেন। পূজোর সময় স্কুল আপিস বন্ধ; এই সময় দেবেশ্বর স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে কীর্তিহাট এসেছিলেন। সঙ্গে এসেছিল এক মেমসাহেব।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার বাবাকে তিনি ইংরিজী পড়াতেন, আর দেবেশ্বর রায়ের চিঠিপত্র লিখতেন। অন্ততঃ সেই পরিচয়েই মেমসাহেব এসেছিল। কিন্তু ওই পরিচয়টা ছিল নিতান্তই একটা নামাবলীর মত। কীর্তিহাটের সমাজ, বাড়ীর দেবদেবীর পূজার্চনার বাধার চেয়েও শিবেশ্বরের আপত্তি খণ্ডনের জন্যই নামাবলী তিনি পরিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির

আসল পরিচয় গোপন করবার মত সতর্ক মানুষ দেবেশ্বর ছিলেন না। মেয়েটি ছিল তাঁর অনুগৃহীতা। জীবনে দেবেশ্বর রায় অনেক ভুল করে গেছেন; কিন্তু অনুশোচনা কোনো কিছুর জন্যে করেন নি। অনুশোচনা এবার এই ভুলের জন্য করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর জমিদারীর ঐশ্বর্য দেখাতে এনেছিলেন শ্বেতাঙ্গিনীটিকে। লর্ড বা আর্ল বা ডিউক অব কীর্তিহাটের কাস্‌ল্ এবং এস্টেটের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য এনেছিলেন। পুজোর পরই কালীপুজো, সে সময় কীর্তিহাটে উৎসব হয়; সেবার দেবেশ্বর সে উৎসব বাড়িয়েছিলেন। তাছাড়া রেল লাইন হয়ে অবধি রায়বাড়ীর বজরাগুলো প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মেরামত করিয়ে কাঁসাইয়ের মোহনায় পড়ে, ভাগীরথী ধরে, সুন্দরবনের শোভা দেখাবার কল্পনাও ছিল তাঁর। কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি। ভাবেন নি বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বরের বয়স পনের বছর হয়েছে এবং ঠিক এই পনের বছর বয়েসে তিনি নিজে ভায়লেটের প্রেমে পড়ে রত্নেশ্বর রায়ের মত বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

সুলতা, আমার মাতামহী উমা দেবী ছিলেন মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, তিনি নীরবে সব সহ্য করে যেতেন। স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী নন বলে আক্ষেপ ছিল, অভিমান ছিল, অনুচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত তার সমস্ত স্রোত, গতিবেগ অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হত; গভীর রাত্রে কাঁদতেন তিনি। তখন স্বামী বিলিতী মদের নেশায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকতেন। বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর এ সব লক্ষ্য করেছিল। এবং তখন তাঁর কানে এসে পৌঁচেছে বাংলা দেশের নতুন আহ্বান।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন শিকাগোতে ধর্মসম্মেলনে বিশ্বজয় হয়ে গেছে। ধনীর পুত্র যজ্ঞেশ্বর মুচী-মেথরকে, নির্ধন-দরিদ্রকে ভাই বলতে পারেন নি, কিন্তু সায়েবীয়ানার উপর, মদ্যপানের উপর একটা বিদ্বেষ জন্মেছে। ধর্মের প্রতি একটা অনুরাগ এসেছে। কিন্তু সে অনুরাগ—খানিকটা বাপের আচরণের উপর যে ক্রোধ, সেই ক্রোধ। ক্রোধ এবং ক্ষোভ কিম্বা বলতে পার যজ্ঞেশ্বর রায়ের জীবনের ভিতের পত্তন হয়েছে ওই মাল-মশলায়। নইলে চরিত্রে তিনি বিচিত্র, তার পরিচয় কিছু পেয়েছ; বলেছি অর্চনার বিয়ে প্রসঙ্গে। কুইনীর বাড়ী প্রসঙ্গে। এক নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কুটিল সন্দেহ আর ওই দিকে নিজের চরিত্রের সততার কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া অন্য কোন সততা বল, সততার সাধনা বল কিছু ছিল না। প্রথম যৌবনে অনেক দিন পর্যন্ত মদ খান নি, তারপর তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে দীক্ষার দোহাই দিয়ে মদ্যপান করেছেন। কয়লার ব্যবসায়ে একসময় উথলে উঠেছিলেন, বিশেষ করে গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, সে-সময় তিনি জাপানে কয়লা সরবরাহ করতেন। অর্ডার পাবার জন্য জাপানী ফার্মের সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন বাগানবাড়ীতে। সেখানে নাচগান হত। তিনিই উদ্যোগ করতেন। নারীর রূপ আর তার দেহ, এই দুটোর বিনিময়ে সব কিছুই পেতে পারে মানুষ। কিন্তু সে যজ্ঞেশ্বর রায় ১৯১৪।১৫ সালের যজ্ঞেশ্বর রায়। ১৮৯৪।৯৫ সালে যজ্ঞেশ্বর রায় আদর্শবাদ

ছিলেন। দাম্ভিক আদর্শবাদী। জমিদারের ছেলে, দেবেশ্বর রায়ের বড় ছেলে, রত্নেশ্বর রায়ের প্রথম পৌত্র, তাঁর যদি দম্ভ না হবে তো হবে কার? দাম্ভিক যজ্ঞেশ্বর রায় সেদিন বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে এই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটিকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু কলকাতায় কিছু বলবার অবকাশ পেত না। মহিলাটি সকালে একবার আসতেন— যোগেশ্বরকে ইংরিজী শেখাতেন, দেবেশ্বরের কাছে দু-চারখানা চিঠি ডিক্টেশন নিতেন, নিয়ে ফিরে যেতেন। দেবেশ্বর রায় তাঁর একটা ভাড়া-করা বাড়ীতে সন্ধ্যার পর গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। মদ্যপান করে গাড়ীতে বেড়ানো ছিল একটা শখ। কোন কোন দিন ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরতেন।

বাড়ীতে স্ত্রী উমা জেগে বসে থাকতেন, একখানি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। পড়েই যেতেন, পড়েই যেতেন। জীবনের কুড়িটা বৎসর ওই একখানি বই-ই তিনি পড়ে গেছেন; কতবার পড়েছেন, তার হিসেব নিজেও রাখেন নি। বইখানি শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ। যজ্ঞেশ্বর রাত্রি এগারটায়-বারোটায় উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে যেতেন; মাকে জেগে বই খুলে বসে থাকতে দেখে শুধু বলতেন—এখনও শোও নি মা?

মা বিচিত্র হেসে বলতেন—না রে। ভাগবতের উপাখ্যানটা শেষ করে নিই, তারপর শোব।

যজ্ঞেশ্বর জানতেন। কোন উপাখ্যান পড়ছ জিজ্ঞাসা করলে মাকে বই দেখে তবে বলতে হবে, তাই আর কোন কথা না বলেই চলে যেতেন। ক্রুদ্ধ হতেন বাপের উপর এবং এই বিদেশিনীর উপর। কিন্তু বলতে কিছু পারতেন না। সুযোগ পেলেন এখানে।

সেদিন সকালে বিবিমহলে বসে দেবেশ্বর আর বিদেশিনী বসে চা খাচ্ছিলেন। কীর্তিহাটে এসে অবধি এটা হয়েছিল তাঁর নিত্যকর্ম। মেমসাহেব নিজের চায়ের কাপে চা ঢালছিলেন, দেবেশ্বরের সামনে টেবিলের উপর তাঁর চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছিল, তিনি অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্রীর চায়ের জন্য। হঠাৎ ছোট ছেলে যোগেশ্বর ছুটে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর 'আন্টি'র হাত ধরে টেনে বলেছিলেন—আন্টি কাম এ্যাণ্ড সি, আন্টি! এ ভেরী বিগ বীয়ার।

একটা লোক ভালুক নাচাতে এসেছিল, ভালুকটা ছিল খুব বড়, সেইটে সে আন্টিকে দেখাবার আগ্রহে ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনেছিল। আন্টিকে যোগেশ্বর ভালবাসত। যজ্ঞেশ্বরের মত তার প্রতি তার বিরাগ ছিল না।

এর পিছনে আরও একটা কারণও ছিল, সেটা দেবেশ্বর রায় বলে গেছেন। এই মহিলাটিকে দেবেশ্বর কেবল যোগেশ্বরের জন্যেই রাখেন নি, দুই ছেলেকেই ইংরিজীতে কথা বলতে শেখাবে বলে রেখেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর গোড়া থেকেই ইংরিজীতে কাঁচা ছিলেন, ইংরিজী তিনি ভালবাসতেন না; মেমসাহেবও এই অবাধ্য ছাত্রটির ওপর প্রসন্ন ছিলেন না।

কিন্তু যোগেশ্বর ইংরিজী ভালবাসতেন, বলতে পারতেন চমৎকার। শুধু ইংরিজীতেই নয়, অন্য সব বিষয়েও ভাল ছাত্র ছিলেন। 'আন্টি'কে সে এইজন্যেই ভালবাসত এবং এই জন্যই এত বড় ভালুকটা তাকে দেখাবার জন্যে ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনেছিল। সে টানে আন্টির হাতের চায়ের কেটলীটা চায়ের কাপ থেকে সরে এসে তার পোশাকের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, খানিকটা পায়ের উপরেও গড়িয়ে পড়েছিল।

আন্টি এটা সহ্য করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কেটলীটা টেবিলের উপর রেখে যোগেশ্বরের গালে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। চড়ের জোরটা সজোর বললে তার মাত্রা ঠিক বোঝানো যাবে; গৌরবর্ণ রঙ রায়বংশে কুড়ারাম রায়েরও আগে থেকে বাসা বেঁধেছে; যোগেশ্বরের গালের সুন্দর রঙের উপর মেমসাহেবের পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছিল।

যোগেশ্বর আঘাত যত পেয়েছিলেন, তার থেকে মনে আহত হয়েছিলেন বেশী। তিনি গালে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিবিমহল থেকে চলে আসছিলেন অন্দরের দিকে; পথের উপর ওদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছিলেন বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর। পরস্পরকে দেখে পরস্পরেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর ঘোড়ার রাশ টেনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হল? কাঁদছিস কেন রে?

গালের হাতটা সরিয়ে আঙুলের দাগগুলো দেখিয়ে যোগেশ্বর বলেছিলেন—মারলে।

—কে?

—আন্টি।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে যজ্ঞেশ্বর তার গালের দাগগুলো দেখে ঘোড়াটার লাগাম পথের ধারে একটা গাছের ডালে আটকে দিয়ে চাবুকটা হাতে করে হন হন করে জুতোর শব্দ তুলে বিবিমহলের ছত্রিঘরের দিকে উঠে গিয়েছিলেন। এবং রক্তচক্ষে মেমসাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন—যোগেশ্বরকে এমন করে মেরেছ কেন? হোয়াই?

চমকে গিছলেন মেমসাহেব। দেবেশ্বরও চমকে ছিলেন। কিন্তু করতে কেউ কিছু পারে নি। যজ্ঞেশ্বর নিজের হাতের চাবুক দিয়ে মেমসাহেবের পিঠে আঘাত করে বলেছিল—এইটে বুড়ো আঙুলের দাগের জন্যে, এইটে তর্জনীর দাগের জন্যে, এইটে মধ্যমার দাগের জন্যে, এইটে—

ততক্ষণে দেবেশ্বর উঠে এসে যজ্ঞেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

যজ্ঞেশ্বর চারবারের বার চাবুকটা তুলে আর নামান নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাবুকটা হাতে নিয়ে পিছন ফিরে যেমন হন হন করে গিয়েছিলেন তেমনিভাবেই চলে এসেছিলেন।

দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন, যেন পাথর হয়ে গেছেন।

এর পরের ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত। মেমসাহেব বলেছিলেন—তোমাকে এর জন্য খেসারত দিতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—দাঁড়াও। দয়া করে আধ ঘণ্টা সবুর কর। বলেই হুকুম দিয়েছিলেন, কোচম্যানকে বল গাড়ী আনতে। যত তাড়াতাড়ি হয়।

আর একখানা কাগজে স্লিপ লিখে ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, পাঁচ হাজার টাকা এখুনিই পাঠিয়ে দিন। আমার নিজের নামে খরচ পড়বে। হাওলাত লিখবেন। টাকাটা পরে দেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ীতে করে মেমসাহেবকে নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হয়ে গিয়েছেন।

* * *

এ টাকা সেই টাকা। কথাটা শিবেশ্বর তাঁকে পত্রে লিখেছিল, কিন্তু তিনি সে-সব পত্র খোলেন নি। এখানে এসে প্রথম নাতির কাছে শুনেছেন। সেই কারণে যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যান নি দেবেশ্বর নদীর ঘাট পর্যন্ত এবং যজ্ঞেশ্বরও ঠাকুরদাকে অভ্যর্থনা জানাতে নাট-মন্দিরে নামে নি, আগের রাত্রি থেকে শরীর খারাপের অজুহাতে উপবাস করে শুয়ে ছিল। ঠাকুরদা ঘরে এলে সে কেঁদেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুরু করেও বলতে পারে নি, বলেছিল—বড়কাকা তো তোমাকে লিখেছিল। তুমি তো তার উত্তর পর্যন্ত দাও নি।

ঠাকুরদা বলেছিলেন—চিঠি এক ম্যানেজারের ছাড়া আর কারুর চিঠিই খুলে পড়ি নি আমি। শুধু তোমাদের কুশলেই খুশী ছিলাম ভাই। দেবেশ্বরের বিরুদ্ধে শিবেশ্বরের অভিযোগ, শিবেশ্বরের বিরুদ্ধে দেবেশ্বরের, কি দেবেশ্বরের বিরুদ্ধে তোমার, এ সব পড়ে তীর্থযাত্রার আনন্দ, পুণ্য এসব আমি তেতো করতে চাই নি ভাই। আচ্ছা আমি শুনব সব, শিবেশ্বরের কাছে।

শিবেশ্বর মুখে কিছু বলেন নি, তাঁর লেখা না-খোলা চিঠির ভেতর থেকে সেই চিঠিখানা বের করে হাতে দিয়ে বলেছিলেন,—পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখে খাতার খরচটায় একটা চিহ্ন দিয়ে রাখছিলেন রত্নেশ্বর রায়. কিন্তু শিবেশ্বর বলেছিলেন—টাকাটা দাদা কলকাতা থেকে এসেই শোধ করে দিয়েছেন, জমা আছে পরে। তবে আরও টাকা তিনি নিয়েছেন এবং মামলা-সেরেস্তার ডিক্রী দরুণ প্রাপ্য টাকা উনি ছেড়ে দিয়েছেন। তা সব দেখতে পাবেন খাতায়। এবং এ ছাড়া আট হাজার টাকা দিয়ে একখানা বাংলা খবরের কাগজ বের হচ্ছে, তার শেয়ার কিনেছেন। এটাও আপনাকে বিবেচনা করে দেখতে বলি। খবরের কাগজ থেকে লাভ কখনও হয় না। যারা ও থেকে লাভ করতে পারে, তাদের জাত আলাদা। আবার যেসব বড় বড় জমিদার কাগজ বের করে শখ ক'রে, লোকসান দেয়, তাঁরা হলেন বড় বড় জমিদার, জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়ীর মত বড় তাঁরা।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ!

* * *

মেমসাহেবের কথাটা তিনি জানেন, শুনেছেন, এই তথ্যটুকু জানিয়ে রত্নেশ্বর রায় বললেন

—ও আমি জানি, শুনেছি। ও কথা থাক। ও আলোচনা থাক। কিন্তু—তুমি আট হাজার টাকা দিয়ে খবরের কাগজের শেয়ার কিনেছ কেন?

—আপনার আপত্তি হবে এটা ঠিক বুঝতে পারি নি আমি। আমাদের দেশে ইংরেজ রাজা হয়ে বসে আছে, থাকল, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। হতেও পারে না। তাছাড়া প্রজারও বলবার কথা থাকতে পারে। থাকতে পারে নয়, থাকেও। আমার এক বন্ধুর কাগজ, কাগজ ভালই চলে; হঠাৎ একটা মামলায় পড়েছিল বলেই শেয়ার বিক্রী করলে। সেটা কিনেছি আমি।

—কিন্তু পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় আমরা, জমিদারেরা বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী স্বীকার করেছি—

—আমি জানি সে সব। তারপর অনেক কাল চলে গেছে। জমিদারদের অধীনে রায়তদের সঙ্গে সাবেক টেনেন্সী এ্যাক্টের কত বদল হল। জমিদারদের ক্ষমতা কত খর্ব হয়ে গেল। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর পত্তনী আইন হল। সুতরাং কোন শর্তই চিরস্থায়ী নয়। তাছাড়া আমার জন্যেই তার পুরনো সাপ্তাহিক কাগজখানা উঠে গেল।

—তার মানে?

—আমি কয়েকটা লেখা লিখেছিলাম। যার জন্যে তার কাগজ গবর্নমেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল। আমি এখানকার রাজকর্মচারীদের বিশেষ করে ব্যবসাদার ইংরেজদের কঠিন সমালোচনা করেছিলাম। বলতে গেলে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের হুকুমেই দেশ চলে। ইংলিশম্যান স্টেটসম্যান মারফতে হুকুম তৈরী করে। বিলেত থেকে তাই পাস হয়ে আসে। আমাদের কাগজের মধ্যে বেঙ্গলী আর অমৃতবাজার। বেঙ্গলীর সুরেনবাবুর সঙ্গে আমার খুব বনে না। অমৃতবাজারে মতিলালবাবু, শিশিরবাবু আমাকে ভালবাসেন, আমিও শ্রদ্ধা করি ওঁদের, কিন্তু নিজের কাগজ না হলে অন্তত নিজের ইচ্ছেমত লেখা যায় না। আমার কয়লার ব্যবসা আজ এক বছর ধরে এক রকম অচল হয়ে রয়েছে। না থাকলে এস্টেট থেকে টাকা আমি নিতাম না। বেশ আপনার অমত যখন, তখন ও টাকাও আমি ফিরে দেব এস্টেটকে।

রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—সেইটেই ভাল বলে মনে করি আমি। কারণ শিবেশ্বরের এতে আপত্তি আছে।

এ কথার উত্তর দেন নি দেবেশ্বর, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলেন—তাহলে আমি কালই কলকাতা চলে যাব।

চমকে উঠে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কালই?

—হ্যাঁ। বিলম্বে তো অকারণ সময় নষ্ট। আমার বিজনেসটা শুধু নামে দাঁড়িয়ে আছে, চালু করা প্রয়োজন। হয়তো কোন ল্যাণ্ড বিক্রী করে দেব, দিয়ে কাগজ বের করব, প্রিণ্টিং প্রেস করব।

—কয়লার জমি বিক্রী করবার আগে আমাকে জানিও।

—আপনি কিনবেন?

—কিনব।

—বেশ জানাব আমি। বলে উঠে চলে গিয়েছিলেন দেবেশ্বর।

সন্ধ্যায় রায়বাহাদুরের চাকর এসে তাঁকে জানিয়েছিল, কর্তা একবার হুজুরকে স্মরণ [ক]রেছেন। দেবেশ্বর হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে বসেছিলেন। চাকরটার দিকে তাকিয়ে তিনি [ব]লেছিলেন—বল গে, যাচ্ছি। একটু পরে।

কিছুক্ষণ পর দেবেশ্বর এসে সামনে দাঁড়ালেন। রত্নেশ্বর বললেন—বস। একটা কথা [তো]মাকে বলা প্রয়োজন। যজ্ঞেশ্বর আমার কাছে এসেছিল। সে আমায় বলে গেছে [তো]মায় জানাতে যে, সে তোমার সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক।

—অনিচ্ছুক! একটু চুপ করে থেকে বললেন—সে কথা আমাকে বললেই সে পারত।

—পারত। কিন্তু তা করে নি। আমার মনে হয় তাতে সে অন্যায় করে নি। আমি [তা] নই।

—না, আমি তা বলছি না। তবে তার কোন আশঙ্কার হেতু তো ছিল না, কারণ সে [যখ]ন বার্বারাকে চাবুক মেরেছিল, তখন আমি তাকে কিছু বলি নি।

—তা বল নি। তবু তার আশঙ্কা স্বাভাবিক। হয়তো তুমি এর পর তার উপর তুষ্ট [থা]কবে না।

—বেশ, সে এখানেই থাকতে পারে। আমি উমা আর যোগেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় [যা]ব।

—ওরাও এখানে থাকলে ভাল হয় না?

—ওরাও কি কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ, বউমারও ইচ্ছে নয় যে উনি এখান থেকে যান।

—ভাল, আমিই একলাই যাব।

বলে মাথা হেঁট করে বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি উঠে চলে এসেছিলেন এবং কীর্তিহাট [থে]কে স্টেশন পর্যন্ত কয়েক ক্রোশ পথ তিনি ভোরবেলা উঠে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন। [যজ্ঞেশ্ব]রকে বলে এসেছিলেন, তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতা ফিরতে। সকালবেলা উঠে খবরটা [শু]নে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী জুতিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর। সে গাড়ীও তিনি ফিরিয়ে [দি]য়েছিলেন।

রায়বাহাদুর বলেছিলেন—উত্তম।

নাতিদের ডেকে বলেছিলেন—এর জন্য আমার সম্পত্তির তোমাদের বাবার অংশ তোমাদে[র দি]য়ে যাব। শুধু তাই নয়, তোমাদের তিন ভাগের এক ভাগ পাঁচ আনা ছ গণ্ডা ...কিস ...ম বেড়ে

ছ ক্রান্তির বদলে ছ আনা দিয়ে যাব। বাৎসরিক ষাট হাজার টাকা আয় হলে এক আনা প্রায় চার হাজার টাকা হবে ; বিশ গুণ পণে তার দাম অন্তত আশী হাজার টাকা।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর এক আনা সম্পত্তির আয় বছরে চার হাজার টাকা ষোল আনায় চৌষট্টি হাজার টাকা। এর বাইরে আছে বারো বারো চব্বিশ হাজার টাকা দেবোত্তর। জমিদারী মুনাকার একসময় কুড়ি গুণ পণ ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড দাম। একেবারে গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডের মত ফিক্সড। গিনির দামের মত দাম তার বেড়েছে কিন্তু কমে নি কখনও তবে স্বত্ব পত্তনী বা দরপত্তনী হলে তার দাম কম হত নিশ্চয়। রায়দের সম্পত্তির যে-অংশ ব্যক্তিগত, তা সবটাই পত্তনী বা দরপত্তনী। জমিদারী বা পত্তনী যেটা মূল স্বত্ব—সেটা দেবতার নামে কেনা, সেটা দেবোত্তর। সেই হিসেবে রত্নেশ্বর রায় বড় নাতিকে বললেন—এক আনা অংশ আমি বেশী দেব, তার দাম পনের গুণো দরে হয় ষাট হাজার—দশ গুণো পণে হয় চল্লিশ হাজার ; গড় করে নিলে দাঁড়াবে পঞ্চাশ হাজারে। ডি এল রায়ের সাজাহান নাটকে আগ্রা কেল্লায় বন্দী শাজাহান হিন্দুস্থানের মসনদ আর মুকুটের লোভ দেখিয়েও মহম্মদকে পিতৃদ্রোহী করতে পারেন নি। সেটা নেহাৎ কবি-কল্পনা নাও হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর রায়ের ক্ষেত্রে সেটা কবি-কল্পনা বা অবাস্তব। বাবার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করে কীর্তিহাটেই থাকতে রাজী হয়েছিলেন। এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিষয়কর্ম বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন দাদুর কাছে।

পিতার কাছে পুত্রের মূল্য আর পুত্রের কাছে পিতার মূল্য ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছে ছোট হয়ে গেল।

দেবেশ্বরের মত দুর্ভাগা আমি দেখি নি। অথবা এমন আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মপরায়ণ রায়বংশে কেউ জন্মায় নি।

মাটির উপর মানুষ জন্মেছে বলেই মাটির দাম আছে। মাটি নিয়ে কেনা-বেচা মানুষে করে। অনেকটা মাটি কোনরকমে দখল করে তাকে হাসিল করে তার দাম বাড়ায়। মানুষেরা এসে বসবাস করে প্রজা হয়। যে-মাটির উপর মানুষ নেই, সে-মাটির দাম নেই তার নামও কেউ করে না, শোনে না। সেই মাটির দাম যখন মানুষের চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে, তখন মাটি ব্যঙ্গ করে হাসে না কিন্তু মানুষের দুঃখ-দুর্গতির বাকি থাকে না।

কথাগুলো আমার নয়, দেবেশ্বর রায়ের। তিনি কথাগুলি বাপকে লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—সংসারে লোকে দুঃখের মধ্যেও পরম সুখে থাকে, সংসারের আনন্দে। পিতা পুত্রের মুখ চাহিয়া থাকে, স্বামী স্ত্রীর মুখ চাহিয়া থাকে। আপনি অর্থমূল্যে আমার সব কাড়িয়া লইলেন। রায়বংশের চরম অপরাধ আপনি করিয়া গেলেন। বাল্যকালে আমার মনে পড়ে কালীপুজার কলিকাতার যাত্রায় নরমেধ যজ্ঞ পালা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে কোন রাজা নরকস্থ পিতার মুক্তির জন্য নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহুতি

চালু ক প্রেস করবে

বার জন্ত একটি অতি-দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে প্রচুর স্বর্ণ দিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্ষণের তিন পুত্র, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় পুত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াও মুখে দিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র আমার প্রিয়—দিতে পারিব না, হ্মণী কনিষ্ঠপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, মধ্যম পুত্র পিতামাতার কথোপকথন নিয়া অত্যন্ত বেদনার্ত চিত্তে আমাকে তো কেহ চাহে না বলিয়া স্বেচ্ছায় রাজার লোকের কট নিজেকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলন—আমি যাইব, আমার মূল্যের স্বর্ণ আমার পিতা-তাকে দান করুন। মনে আছে সে-পালা দেখিয়া শিবেশ্বর ক্রন্দন করিয়াছিল। বলিয়াছিল -আমাকে কেহ ভালবাসে না। আপনি আমাকে কোন মূল্য না দিয়াই আমার স্ত্রী-পুত্র ার সব কাড়িয়া লইলেন। মরুভূমি, যেখানে মানুষ বাস করে না, সেখানকার জমির কোন ম নাই। মাটির দাম মানুষের জন্য। মানুষই বেচে, মানুষই কেনে। সেই মাটির দাম নুষের চেয়ে বেশী হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশটাই দ্বিতীয়বার অভিশপ্ত হইল। আমি ভিশাপে বিশ্বাস করি না। আপনি করেন বলিয়াই লিখিতেছি। নারীর জন্য সর্বনাশের ভিশাপ যদি আমা হইতে হয়, তবে সম্পত্তি এবং অর্থের জন্য রায়বংশ সকল হীন কর্মই রবে—ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। চরম অধঃপতনে নামাইয়া দিলেন। বুকের ভিতরটা রেট পাথরের মত জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ইচ্ছা করিলে আমি মকদ্দমা করিতে পারি পারিব। হাইকোর্ট প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্তও চলিতে পারে কিন্তু তাহা আমি করিব না।

রত্নেশ্বর রায় উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি তোমার পুত্র অপহরণ করি নাই। তুমি তোমার র বক্ষে শেলাঘাত করিয়া বিরোধ করিয়াছ। অদ্যাবধি শরাঘাত করিতেছ। দেখিয়া মার পুত্র শিক্ষা লইয়াছে; সে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে মাত্র। আমি স্নেহবশতঃ াকে তোমার আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব ততদিন করিব। ষোল র বয়সে তুমি আমাকে যে-দুঃখ দিয়াছ, তাহা অপেক্ষা সে অধিক দুঃখ দিয়াছে কি?

উত্তরে এবার একছত্র মাত্র লিখেছিলেন দেবেশ্বর—"আমি আপনার অবাধ্য হইয়া যাহা য়াছিলাম, তাহার জন্য আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম—যজ্ঞেশ্বর বলিতে গেলে াকেই চাবুক মারিয়াছে। আপনি তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া লেন। এ-বিষয়ে আর আমি কোন পত্রালাপ করিব না। এইখানেই শেষ হইল।"

এরপর তিনি নতুন করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন দিয়েছিলেন। সেই কয়লার খনির জন্য া জায়গাগুলি পড়েই ছিল, অধিকাংশই যার অযোগ্য মনে হয়েছিল, তারই মধ্যে থেকে য়ে গেল উৎকৃষ্ট কয়লার জমি। জায়গাটা বরাকরে। জমিদার কাশিমবাজারের রাজ-ষ্টেট। তখনও রাণী স্বর্ণময়ীর আমল। দেবেশ্বর রায় আরও জায়গা সেখানে বন্দোবস্ত । দস্তুরমত ক্লাইব ষ্ট্রীটে আপিস খুলে বসলেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আফিস ার্টারে বড় বড় বাড়ী উঠেছে, গ্যাসের আলো হয়েছে। কলকাতায় সম্পত্তির দাম বেড়ে

গেছে তিনগুণ চারগুণ! দেবেশ্বর কলিয়ারী ডেভেলপমেন্টের জন্ম জানবাজারের বসতব বন্ধক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার যোগাড় করলেন। ওই বরাকর অঞ্চলের কয় খনির কাজে দুপুরুষ ধরে তারা কাজ করে আসছে। পরনে ন-হাতি ধুতি, গায়ে পি কয়লার কুঠীতে প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন গরুরগাড়ীর ঠিকাদার হিসাবে। খনির থেকে কয়লা রেল-সাইডিংয়ে চালাই করবার জন্ম গাড়ীর যোগান দিতেন। তা ক্রমে কয়লাকুঠীর—বিশেষ করে ও অঞ্চলের কয়লাকুঠীর সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁদের নিবিড় পরি কয়লার কুঠীতে বসে থেকে তাঁরা খনি তৈরী করবেন, চালাবেন, কলকাতায় বসে দেবে কলকাতার আপিস চালাবেন। এই বন্দোবস্ত করেছিলেন। দেখতে দেখতে বছর-তিনেক মধ্যে রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলকাতায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বরাকর সিমের কয়লার জন্তে।

কয়লার খনির ইতিহাস যদি খুঁজে দেখ সুলতা, তবে দেবেশ্বর রায় আর মহাদেব চক্রব নাম খুঁজে তুমি পাবে—তার সঙ্গে পাবে বরাকরের বেগনিয়া সিমের কয়লার উল্লেখ। সঙ্গে ঝরিয়ায় পাবে সুরাটার কলিয়ারীর একটা বিশেষ সিমের নাম। পশ্চিমে এডেন বিলেত, এদিকে সিংগাপুর-হংকং পর্যন্ত জাহাজে কয়লা চালান করতে শুরু করেছিলে কলকাতার আপিসে সায়েব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেখেছিলেন—কয়লার কুঠী দেখবার জন্তে সা জেনারেল ম্যানেজার রেখেছিলেন; কলকাতার বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর আপিসে সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুর মত অন্তরঙ্গতা ছিল—হ্যালো চার্লি বলে হাত বাড়িয়ে দিতেন। তা হেসে সবিস্ময়ে বলত—রয়! হোয়াটস দি নিউজ?

—আই থিঙ্ক ভেরী এনকারেজিং সামথিং; সো আই থট আই শুড কাম টু ইউ মাইসে টু এক্সটেণ্ড মাই ইনভিটেশন টু এ গার্ডেন পার্টি ইন দি ইভনিং। ইউ মাস্ট কাম।

—গার্ডেন পার্টি! নচ-গার্লস উইল বি দেয়ার?

—সার্টেনলি, গার্লস উইল বি দেয়ার, বাট নট নেটিভ নচ-গার্লস দিস টাইম। এ্যা গার্লস টু কীপ কম্পানি।

এইভাবেই সেকালের সমুদ্রে বাণিজ্য-তরী চলতো সুলতা। শুধু সেকালেই আর এদে বা বলি কেন, সব কালেই সব দেশেই বোধ হয় বাণিজ্যতরী এইভাবেই চলে। সে শ্রী সদাগরের বাপ ধনপতির আমল থেকে দেবেশ্বরের আমল পর্যন্ত।

দেবেশ্বর রায় বলতেন—শুধু বাণিজ্যতরী নয়, জীবনতরীই চলে এইভাবে। প্রকৃ হাতছানিতে পুরুষ যেভাবে এসে জোটে, সেইভাবে জীবনের সব চলে। নারী-ভূমি- চিরকাল টেনে আনছে। চিরকাল। তার মধ্যে নারীই প্রথম। রামায়ণে সীতা, মহাভার দ্রৌপদী, ট্রয়ে হেলেন, চিতোরে পদ্মিনী; দুনিয়ার যত আনটোল্ড, আনরিটন ইতিহাস ইতিকথা খুঁজে দেখ, প্রতি মানুষের জীবনেই এই।

উয়োম্যান ইজ দেয়ার ইন দি ডেপ্থ। তারই জন্ম ইউ ওয়াণ্ট এ হোম। স্থাট হোম ইজ সুইট, দি সুইটেস্ট প্লেস ইন দি ওয়ার্ল্ড ওনলি ফর হার। ইউ ওয়াণ্ট এ কিংডাম ফর হার। ইউ ওয়াণ্ট টু মেক হার এ কুইন। শী ইজ এ উইচ। সে তোমাকে মুগ্ধ করে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে—প্রকৃতি পুরুষের বুকে চড়ে নাচে। ওয়াণ্ডারফুল স্থাটস হোয়াই ম্যান ফট উইথ উয়োম্যান। পুরুষ উইথ প্রকৃতি। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পুরুষ সাধনা করে পলিগেমাস নেচারকে ডেভেলপ করেছে। তার পলিগেমাস নেচার তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। মাকড়সার জীবন দেখো। হ্যাভ ইউ সীন এ স্পাইডারস্ লাইফ চার্লি? ট্রাই টু সী। ভেরি ইণ্টারেস্টিং। দি ফিমেল স্পাইডার ইটস্ দি মেল স্পাইডার এ্যাজ সুন এ্যাজ দেয়ার এনজয়মেণ্ট ইজ কমপ্লিট। বাট ম্যান হ্যাজ টেকন রিভেঞ্জ। হি ইজ দি মাস্টার নাও।—তার সঙ্গে সে প্রভুত্ব পেয়েছে মাটির উপর—মেটিরিয়েলসের উপর।

চার্লি সাহেব মস্তবড় সায়েব কোম্পানীর কলকাতা আপিসের জেনারেল ম্যানেজার। ব্যবসাবুদ্ধিতে কয়লাখনির ভালমন্দতে খুব বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু এসব তার মাথায় ঢুকত না। অবাক হয়ে শুনত। হেসে উড়িয়ে দিতেও পারত না। কারণ গার্ডেন পার্টিতে মধ্যে মধ্যে মিস্টার রায় শেক্সপীয়র আবৃত্তি করতেন। গান করতেন প্রতি পার্টিতে। বাংলা, হিন্দী, এমন কি খাঁটি ইংরিজী সুরে ইংরিজী গানও গাইতেন তিনি, শোনাতেন মধ্যে মধ্যে। চার্লি মুগ্ধ হয়ে বলত—এ চার্মিং ম্যান। ওয়াণ্ডারফুল!

সে-আমলের পলিটিক্স্ তা-ও করেছেন। ইংরিজী কাগজে চিঠি লিখতেন ছদ্মনামে। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

*　　*　　*

কিছুদিন পর বাপ চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোরাতে। কিন্তু ঘোরেন নি তিনি। রত্নেশ্বর রায় পুত্রবধূকে নিয়ে এসেছিলেন নিজে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবেশ্বর আপিসে খবর পেয়েছিলেন—বাবা এসেছেন বড় পুত্রবধূকে নিয়ে। তিনি আপিস থেকেই উধাও হয়েছিলেন। দিন-চারেক পর পুত্রবধূ বলেছিলেন—বাবা, আপনি ফিরে যান।

—তুমি?

—আমি থাকব। একটু থেমে থেকে বলেছিলেন—যোগেশ্বরকেও নিয়ে যান। আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।

—না মা। তোমায় আমি ফিরিয়েই নিয়ে যাব। আমার হতভাগা ছেলে তোমার মর্যাদা বুঝলে না, কিন্তু একদিন এর জন্ম ওকে অনুতাপ করতে হবে।

পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায় বাগানবাড়ীর আসর ভেঙেছিলেন। দিন-তিনেক পর সকালবেলা

এসেছিলেন শিবেশ্বর। সকালবেলা ভিন্ন দেবেশ্বরের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। আপিসে দেখা হতে পারে কিন্তু সেখানে এসব বলা যায় না। তাছাড়া এখানে দেবেশ্বর রায়ের তৃতীয় মেজাজ বের হয়। খাঁটি এক সায়েবী মেজাজ।

মোম দিয়ে মাজা ও পাকানো গোঁফে অকারণে বাঁ হাতের আঙুল অতি সন্তর্পণে বুলিয়ে কপাল কুঁচকে অন্যমনস্ক ভাবে কথা বলতেন। ছোট ছোট দু-চারটে শব্দে গড়া বাক্য। তার বেশী নয়। এবং হঠাৎ টেবিলে রাখা ব্লটিং-প্যাডের কাগজ রেখে কিছু লিখতে শুরু করে দিয়ে বলতেন—এক্সিকিউজ মি প্লিজ! কাম সাম আদার টাইম। কিম্বা আই হ্যাভ নাথিং মোর টু সে। তাই সকালেই গিছলেন শিবেশ্বর।

শিবেশ্বর অনুযোগ করে বলেছিলেন—তুমি এত বড় হৃদয়হীন তা জানতাম না। তুমি বউদির সঙ্গে দেখা করলে না? বাবার সঙ্গে যা করলে ছিঃ!

চুপ করে থেকেছিলেন দেবেশ্বর। অর্থাৎ অনুযোগ মেনে নিয়েছিলেন, যেটা দেবেশ্বরের পক্ষে অস্বাভাবিক। একটু পর বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি অপরাধী। কিন্তু কি করব? দ্যাট টাইর‍্যাণ্ট—আমাদের বাবার জীবনের যত চেপে রাখা ক্ষুব্ধ প্রকৃতিগুলো উনি আমাকে দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন। হি ইজ রেসপনসিবিল। শিবেশ্বর, উনি বলেন—রায়বংশের উপর অভিশাপ আছে। সেটা আমি মানি নে। কিন্তু এটা মানি যে, ওঁর সাপ্রেসড হাঙ্গার, কৃচ্ছ্রসাধনে চাপা প্রবৃত্তি খোঁচা-খাওয়া সাপের মত আমার বুকে বিষ ঢেলেছে। আমার অপরাধ জানি, তোমার বউদির কাছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় অপরাধ বাবার। আমি ভালবেসেছিলাম ভায়লেটকে। ভায়লেট অঞ্জনাপিসীর মেয়ে। তুমি জান না, আমি জানি। আমাকে অঞ্জনাপিসী ডেকে বলে গিয়েছিল মরবার আগে, দেবু, এই মেয়েটাকে তুই তোর সেবাদাসী করে রাখিস। সাহস থাকে তো বিয়ে করিস রে। ওকে বাঁচাস। নইলে মেয়েটার হাড়ির ললাট ডোমের দুর্গতি হবে। তাই হয়েছে। ওঃ, তার একটা ছেলে হয়েছিল, সেটাকে পড়াতে চেয়েছি, পড়ে নি। চাকরি করে দিয়েছি, সেখানে ক্রিমিন্যালের কাজ করেছে। ভায়লা এখন মাতাল, কুৎসিত, ওঃ শিবেশ্বর! আমি তার জন্যে দায়ী। আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু আসল দায়ী দ্যাট টাইর‍্যাণ্ট। কি ক্ষতি হত, বলতে পার, যদি মেয়েটা—

শিবেশ্বর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন—এসব কথা কানে শোনাও পাপ দাদা। আমি শুনতে পারব না। একটা খবর দিয়ে যাই। বউদি তোমাকে খালাস দিয়েছেন। ভগবানকে আশ্রয় করেছেন। আমাকে আসবার সময় বললেন—ঠাকুপো, তোমার দাদাকে বলো, আমি তাঁকে খালাস দিলাম। যাতে তিনি আনন্দ পান, তাই যেন করেন। তবে নিজের দেহের যত্ন নেন। আমার দাদাশ্বশুরের রক্ষিতা সোফি বাঈয়ের কথা শুনেছি। উনি যদি কাউকে ভালবাসেন, তবে তাকেই যেন রাখেন। সে যত্নটত্ন করবে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দেবেশ্বর বলেছিলেন—নো। তাহলে সেটা হবে বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে ইল্লিসিট

কনেকশন। সে হয় না। ঠাকুরদা সোফি বাঈকে ভালবাসতেন আগে থেকে। তাছাড়া সে কালটা ছিল আলাদা। তখন রাজা বা বড় জায়গীরদারদের বাড়ীর পাশে পোষা রাণ্ডীমহল থাকত। সেকাল এটা নয়।

হেসে শিবেশ্বর বলেছিলেন—সে এখনও আছে। নেই কে বললে! তুমি তো কীর্তিহাটে বাস করলে না। আমি বাস করেছি বাবার সঙ্গে; বাবার হয়ে আমাকেই যেতে হয় এখানে-ওখানে নেমন্তন্ন রাখতে। এখনও জায়গীরদারের ছেলে ঘেরা বাগানের মধ্যে, পুকুরের ধারে কৃষ্ণলীলা করে।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তারা বর্বর, আই হেট দেম। বলতে পার, ষোল বছর বয়সে I was mad after Violet—সুতরাং তফাৎ কি! কিন্তু তফাৎ আছে, I loved her; অঞ্জনা-পিসীর কাছে কথা দিয়েছিলাম। অঞ্জনাপিসী, বলছি তো ওকে আমাকে দিয়ে গিছল।

—বেশ তো তাকেই রাখ।

—না তা হয় না।

—কেন? নার্স সাজিয়ে রেখে দাও।

—না-না-না। সে আর ভাবা যায় না শিবেশ্বর। আমি তো তাকে নিয়ে একসঙ্গে মরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা পারে নি। তারপর বাবা তাকে আমার দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে ফিক্রুজদের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন—একটা ছেলে হল। থাক, সে তুমি জান। কিন্তু এটা বোধ হয় জান না, সে ভায়লেট ইজ ওয়ার্স স্যান এ স্ট্রীট গার্ল; ইভন ওয়ার্স স্যান গোয়ান গার্লস। ছেলেটা বড় হয়েছে। তার লেখাপড়া হয় নি। তাকে চাকরি দিয়েছি, but he is a criminal—a drunkard—sometimes he is violent. সে যদি মায়ের সূত্র ধরে স্বীকৃতি পায় তবে সে আমার বুকে চেপে বসবে। আমার জন্যে আমি ভাবি নে। কিন্তু সে যদি কোন দিন কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের অপমান করে, তাহলে তাকে গুলী করে মারতে হবে, ভায়লেটকে মারতে হবে, নিজে মরতে হবে।

—বেশ তাহলে আর একটা কাজ কর।

—কি?

—আবার তুমি পছন্দ করে বিয়ে কর। সে কথাও বউদি বলে দিয়েছেন। বললেন—বল না ঠাকুরপো, আমি না হয় ভাঁড়ারে খাটব, রান্নাবান্না দেখব, উনি নতুন বিয়ে করে মাথায় করে রাখুন। ভারতচন্দ্রের ছড়া আউড়ে বললে—গঙ্গা নামে সতী তার তরঙ্গ এমনি,—

—না। তাও হয় না শিবেশ্বর। বিয়ের কাল এখনও যায় নি। চারটে-পাঁচটা-সাতটা বিয়ে করা যায়। কুলীনেরা বিশ-পঁচিশটা আজও করছে। কিন্তু যারা করে তাদের মধ্যে আমি নেই। দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কীর্তিহাটে থেকে সেটা ঠিক বুঝতে পার না। এক বিয়ের যুগ আসছে। ব্রাহ্মধর্মের হাওয়া বাঁচিয়ে চল, দেখ নি। তার চেয়েও

জোরাল হাওয়া এনে দিয়ে গেল কামারপুকুরের এক প্রায় নিরক্ষর বামুনের ছেলে। তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপকে চমকে দিয়েছে। আমি ওই রাজার ছেলের মত কেষ্ট সেজে কীর্তিহাটে কাঁসাইয়ের পাড়ে বৃন্দাবন লীলাও করতে পারব না, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও আঁকড়ে ধরতে পারছি না। I am doomed, শিবেশ্বর। শ্যামাকান্তের উপর যে অভিশাপ তাই হোক, আর না হয় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের কৃচ্ছ্রসাধনের জ্বালায় জলেপুড়ে মরা প্রবৃত্তি হোক যার জন্যেই হোক, আই এ্যাম লাইক এ শুটিং স্টার। এই জ্বালা নিয়ে আমাকে কীর্তিনাশার জলে ডুবে নিভে যেতে দাও! পাপ-অভিশাপের বোঝা নিয়ে আমাকে ভেসে যেতে দাও, হারিয়ে যেতে দাও।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

—এগুলো তাহলে ফিরে নিয়ে যাব?

—কি?

—বউদিদির কোম্পানীর কাগজগুলো। তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন —ওঁর কাজে লাগাতে বলো। এ নিয়ে আমি কি করব?

ফিরে দেন নি দেবেশ্বর, নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বলো, নিলাম। আর বলো, আমি যেদিন একলা থাকি, সোবার থাকি শিবেশ্বর, সেদিন আমি বসে-বসে ভাবি, আমি মরে যাচ্ছি কি মরে গেছি, বড়বউ বুকের উপর নীরবে মাথা রেখে পড়ে আছে, আর তার চোখের জলে আমার মরা দেহখানার বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবতে ভাল লাগে, আমার এত অপরাধ সত্ত্বেও সে আমার মরামুখ ধরে বলছে—এ জন্মে পেয়েও পেলাম না, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরেও যেন পাই তোমাকে। এবার যেন পেতে দিও। ধরা দিয়ো।

চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছিল। শিবেশ্বর চোখে রুমাল দিয়ে উঠে চলে এসেছিলেন।

এসব কথা আমি ছোট মেজঠাকুমার কাছে শুনেছি সুলতা। মেজঠাকুর্দা মধ্যে মধ্যে এই গল্প বলে ছোট মেজঠাকুমাকে পতিভক্তি শেখাতেন।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে চারটে বাজল।

সুরেশ্বর বললে—কথা শেষ করি সুলতা। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। তবে শীতের রাত তাই ভরসা।

এরপর হঠাৎ একটা মোড় ফিরল, এর বছর দেড়েক পর। ছোট ছেলে যোগেশ্বর একদিন পালিয়ে এল কীর্তিহাট থেকে। সকালবেলা দেবেশ্বর উঠে শুনলেন, যোগেশ্বর এসে বসে আছে বসবার ঘরে। ছোট ছেলে তাঁর প্রিয় ছিল, তার সঙ্গে রুচির মিল ছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে, ইংরিজী ভাল আয়ত্ত করেছিল, চমৎকার ইংরিজী বলত, সেই কারণে বেশী ভালবাসতেন।

দেবেশ্বর উঠে কথাটা শুনেই মুখে খানিকটা জল দিয়েই হন-হন করে এসে ঢুকেছিলেন

ছেলেকে দেখবার জন্য। ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সারারাত্রি জেগে এসেছিল সে। ছেলে তখন অনেক বেড়েছে, ছোট নেই। ষোল বছরে পা দিয়েছে। কিন্তু দেবেশ্বর রায় শুধু সুকুমার লাবণ্যযুক্ত আর সুপুরুষ ছিলেন না, বলশালী পুরুষ ছিলেন, তিনি ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন।

ছোট ছেলে যোগেশ্বর সেবার এণ্ট্রান্স দেবে। সে পালিয়ে এসেছে, দাদু তাদের দুই ভাইয়ের একসঙ্গে বিয়ের আয়োজন করছেন। কিন্তু সে এখন বিয়ে করবে না। কীর্তিহাটও তার পক্ষে অসহ্য হয়েছে। মা দিন-রাত ঠাকুর নিয়ে আছে আর ভাগবত নিয়ে আছে। আপন মনে কথা বলে। লোকে বলে মাথা খারাপ হয়েছে। দাদা ঠাকুরদার সঙ্গে কাছারী করে। কাকা মামলা-সেরেস্তা দেখে, থিয়েটার করে। কাকীমার বারো মাস অসুখ। সব ভার চাকর আর ঝিয়ের। তার ভাল লাগে নি, সে পালিয়ে এসেছে।

উৎসাহিত হয়েছিলেন দেবেশ্বর রায়। পরের দিনই সমারোহ করে ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে নয়, বাড়ীতে ; তার জন্য তিন-তিনজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আল-মারীভর্তি বই এনে ঘর বোঝাই করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শান্ত এবং সংযত হয়েছিলেন দেবেশ্বর। রায়বাহাদুরের লোক এসেছিল যোগেশ্বরকে নিতে, কিন্তু দেবেশ্বর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পরই বাপের কাছ থেকে পেলেন শেষ আঘাত। সেদিন শিবেশ্বর এসে উপস্থিত হলেন। শিবেশ্বর মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসে, কিন্তু সে ওঠে গোয়াবাগানের বাড়ীতে। রামেশ্বর ল' পড়ে, সেও থাকে ওই বাড়ীতে। কখনও-সখনও আসে সে। কিন্তু শিবেশ্বর আসে না। এবার শিবেশ্বর এল, দেখা করতে ; তাতে দেবেশ্বর রায় বিস্মিত হন নি। শুধু ভুরু কুঁচকে উঠেছিল আপনা থেকেই, কিন্তু সেটা পরম বিস্ময়ে পরিণত হল, যখন গাড়ীর ভিতর থেকে শিবেশ্বরের পিছন পিছন নামলেন দেবেশ্বরের কয়লার ব্যবসার পার্টনার। রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলিয়ারী প্রোপাইটারস ও কোল মারচেণ্টসের অংশীদার মহাদেব চক্রবর্তী নিজে।

প্রায়ই আসেন চক্রবর্তী ; প্রয়োজনে আসতে হয়। তাঁদেরও বাসা আছে এখানে। কিন্তু এবার শিবেশ্বরের পিছনে পিছনে কেন ?

চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন—কেমন মজাটি হল, দেখেন কেমন ? মজা করবার লেগে কিছু বলি নাই আমি। হুঁ।

শিবেশ্বর এবার বললেন—বাবা যজ্ঞেশ্বরের বিয়ের ঠিক করেছেন চক্রবর্তী মশায়ের মেয়ের সঙ্গে।

চক্রবর্তী হা-হা-হা-হা শব্দে হেসে জানবাজারের বাড়ীখানা মুখরিত করে দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর রায় সমস্ত সম্বন্ধ পাকা করে মেয়ের বাপকে পাঠিয়েছেন, ছেলের বাপকে বলবার জন্যে।

বলেছেন—আমার উপর কথা সে বলবে না। তবু একবার বলা উচিত, বলে আসুন। শিবেশ্বরের সঙ্গে যান আপনি। খানিকটা কৌতুকও হবে।

দেবেশ্বর স্তম্ভিতও হন নি, বিস্মিতও হন নি ; শুধু তাঁর অংশীদার এবং ভাবী বৈবাহিকের হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে খানিকটা হেসেছিলেন। মত তাঁকে দিতে হয়েছিল। বেয়াইয়ের আরও দাবী ছিল, তাঁর ছোট মেয়ের সঙ্গে যোগেশ্বরের বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সে হয় নি। দেবেশ্বর বলেছিলেন—না-না, এমন কাজ করবেন না। এ ছেলে আমার বিয়ে দেবার মত নয়। বাজে একেবারে বাজে। তাছাড়া দুই ভাইকে দুই মেয়ে দেবেন, তারপর জামাইরা যদি একজন সামনে থেকে একজন পিছন থেকে আক্রমণ করে আপনার দফা-রফা করে, তখন যে আর বাঁচবার পথ থাকবে না। এটার না আছে জমিদারী বুদ্ধি, না আছে ব্যবসাবুদ্ধি, শুধু বই পড়ে। শুধুই বই। হয়ত বউমাকে আদরই করবে না।

শিবেশ্বর মাথা নিচু করে বসেছিলেন। মহাদেব চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে ঘর ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। দেবেশ্বর চুপ করে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। বেয়াইয়ের হাসি শেষ হলে তিনি বলেছিলেন—যজ্ঞেশ্বরের বিয়েতে বাবা মত দিয়েছেন, সেখানে আমার অমতের কোন কারণ নেই।

মহাদেব চক্রবর্তী চলে যাবার পর তিনি বাপকে চিঠি লিখেছিলেন—"আপনি আপনার বড় নাতির বিবাহ শেষ পর্যন্ত একটি বর্বরের গৃহে স্থির করিবেন ইহা আমি ভাবি নাই।"

পিতা উত্তরে লিখেছিলেন—"তোমার ব্যবসা আমি নিরাপদ করিয়া দিলাম। না-হইলে এই চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ তোমার সর্বস্ব উদরসাৎ করিত। মহাদেবের দুইটি কন্যা, ছোটটির সঙ্গে যোগেশ্বরের বিবাহ দিলে ভাল করিতে।"

দেবেশ্বর লিখেছিলেন—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে গোলকুণ্ডার কথায় পড়িয়াছি, শাহজাদা ঔরংজীব গোলকুণ্ডার সুলতানের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য গোলকুণ্ডার সুলতানের এক কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনি যে, কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল আবুল হাসান নামক একজন মাতাল চরিত্রহীন মুসলমান যুবকের, গোলকুণ্ডার সিংহাসন সেই ব্যক্তিই পাইয়াছিল। অদৃষ্টে থাকিলে যজ্ঞেশ্বর একলাই চক্রবর্তীর সব কিছুর মালিক হইতে পারিবে। তবে আমি অবগত আছি যে, মহাদেব চক্রবর্তীর দাদা ভোলানাথের এক পুত্রকে সে পোষ্যপুত্র লইয়া সম্পত্তি তাহাকে দিবে। সুতরাং যোগেশ্বরকে অকারণে কয়লার কালী ঘাঁটিয়া লক্ষ্মী সন্ধান করিতে দিব না।"

ছেলের বিয়েতে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু নিতান্তই নিমন্ত্রিতের মত যাওয়া। আগে থেকে লিখেছিলেন—তিনি বিবিমহলে থাকবেন। কারণ লিখেছিলেন যে, তাঁর খাদ্যাখাদ্যের বিচার আদৌ কড়াকড়ি নয়। রোজই মুরগী খান, অবশ্য মুরগী না হলেও যদি বা চলে, মুরগীর ডিম না হলে চলবে না। এবং একটু নিরালা হলেই ভাল হয়। বিবিমহল তাঁর পছন্দমত স্থান।

রত্নেশ্বর রায় সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন ; এমনভাবে সে ব্যবস্থা করেছিলেন যে, দেবেশ্বর রায় অভিভূত এবং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিবিমহলে তাঁকে যিনি অভ্যর্থনা করেছিলেন, তিনি রায়বাড়ীর বড় বউঠাকরুণ উমা দেবী। দেবেশ্বর রায়ের চিরউপেক্ষিতা স্ত্রী। বড় ছেলের বিবাহ, শাশুড়ীহীন সংসারে তিনি জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, তিনিই স্বায়ত কর্ত্রী ; তিনি সব ফেলে বিবিমহলে দীর্ঘকাল—পাঁচ বছর পর স্বামীকে অভ্যর্থনা করলেন।

দেবেশ্বর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি ?

—হ্যাঁ, আমি।

—বাবার হুকুম বুঝি ?

—না। আমার ঠাকুরের হুকুম।

—তোমার ঠাকুর ?

—হ্যাঁ, গোবিন্দজী। গোবিন্দজী বললেন যে স্বামীকে দেখ গে আগে।

—তাই বললেন ? কথা বলেন নাকি তোমার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ বলেন। হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন। মনে-মনে, কানে-কানে বলেন।

প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছেন এই ধরিত্রীর মত সহ্যশক্তিশালিনী মেয়েটি। চাকর এই সময় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। বড়বউ এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—বললাম না, আমাকে ডাকবি, আমি এনে দেব! কেন তুই ডিম ছাড়ালি ? আমি ছাড়াব বলি নি ?

দেবেশ্বর অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি মুরগীর ডিম নাড়বে, ছোঁবে ?

—ছোঁব না ? তুমি খাবে, না ছুঁলে কি করে চলবে ? ঠাকুর পই-পই করে বলে দিয়েছেন। নিজে হাতে ছাড়িয়ে খেতে দিবি। নিজে হাতে। ঘেন্না করবি নি। হ্যাঁ! বাপ রে! বলেন, স্বামীর কাজ না করলেই পাপ।

দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে বসেই ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর রায়বাহাদুর এসেছিলেন—দেবেশ্বর!

—আজ্ঞে! চমকে উঠে দেবেশ্বর চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পিতা-পুত্রে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। ছেলে প্রণাম করেছিল। বাপ নীরবে হাত তুলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন— তোমার উপবাস কষ্ট হবে বলে শিবেশ্বরকে বলেছি নান্দীমুখ করবার জন্য। বুঝেছ ?

—হ্যাঁ। ভালই করেছেন।

এর পর মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে রায়বাহাদুর চলে এসেছিলেন।

গভর্নমেন্টের দরবারে রায়বাহাদুর হলে কি হয়, কীর্তিহাটে রত্নেশ্বর রায় রাজা। তাঁর বড়নাতির বিবাহ। উৎসব হয়েছিল বিরাট। বিপুল সমারোহ। আলোতে, বাজীতে,

বাজনায়, দানে-ধ্যানে রাজসূয় ব্যাপার, খাওয়ানো-দাওয়ানোতে চোব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় ব্যবস্থা। ক্রমাগত অষ্টাহব্যাপী। নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার নিয়ে এলাহি কাণ্ড। অবশ্য পোষ্যপুত্র হিসেবে রত্নেশ্বরের গদীতে চড়ার সময়ের মত নয়। কিন্তু দেবেশ্বর চতুর্থ দিনে বউভাতের পরই চলে এসেছিলেন।

আসবার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন—আমার সঙ্গে চল।

স্ত্রী বলেছিলেন—ওরে বাপ রে, সে কি করে হবে গো! শ্বশুর কি মনে করবেন? তাছাড়া আমার ঠাকুর? ওকে ছেড়ে তো থাকতে পারব না আমি।

—আমাকে পেয়েও থাকতে পারবে না?

—তা কি করে পারব? অভ্যেস তো নেই।

—আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব।

—তা নিয়ে যেও না, আমি ভয়ে মরে যাব।

—না। ভয় লাগবে না। আমাকে দেখে তোমার ভয় করে?

—না। কিন্তু তবু পারব না। ওগো, দয়া করে আমাকে নিয়ে যেও না। আমি যেমন এখানে গোবিন্দজীকে নিয়ে আছি, তেমনি থাকতে দাও। আমি মরে যাব।

তবুও হয়তো জোর করে তাঁকে নিয়ে আসতেন দেবেশ্বর; তাঁর সংসারী হতে অবজ্ঞাতা স্ত্রীকে ফিরে পেতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন—তা তো পারব না দেবেশ্বর। এই কুটম্ব-সজ্জন থাকতে থাকতে বড়বউমা যাবেন, এ তো হয় না। লোকে কি বলবে? তোমার না হয় কাজের ছুতো আছে। তোমার উপরে আমি আছি। ছেলের বিয়ের সব ভার আমার উপর দিয়ে যাচ্ছ—হল, মানালো। কিন্তু তোমার মা নেই, বড়বউমা যাবেন কি বলে?

চুপ করে রইলেন দেবেশ্বর। একটু পর বললেন—আমি ফিরে আসব নিতে? চুকে গেলে পর? এমন কি আমি থেকেও যেতে পারি।

একটু চুপ করে থেকে রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—তুমি থাকলে আমি খুব খুশি হব এবং তোমার কল্যাণ হবে। হয়তো তোমার সঙ্গে তোমার বাপের এবং ছেলের সঙ্গে একটা আপোস হতে পারে। কিন্তু বউমাকে পাঠাবই এ বলতে পারব না। বউমাকে নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। বউমার মাথার গোলমাল হয়েছে বলে লোকে কিন্তু আমি জানি উনি গোবিন্দকে সেবা করে সিদ্ধি পেতে চলেছেন। দেরি নেই। তাঁকে তো পাঠাতে পারব না।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তাহলে আমি চলে যাই।

—থাকতে যখন পার, তখন থাকাটাই ভাল নয় কি? তোমার তো অসুবিধা কিছু ঘটছে না। একরকম গুরুর আদরেই তো রাখা হয়েছে। অসুবিধা কিছু ঘটছে তো বল।

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল দেবেশ্বরের। এবার তিনি বলেছিলেন—কিছু অসুবিধা আছে।

সেটা ইচ্ছে করলেও দূর করতে পারবেন না। সমাগত প্রজাসজ্জনদের প্রহার দেখছি, দেখে যে কষ্ট পাচ্ছি, তা ঠিক সহ্য করা সম্ভবপর নয়।

—মানে?

—মানে, শুনেছি সমস্ত মহালে নাতির বিয়েতে চাঁদা মাথট নিয়েছেন টাকায় চার আনা। তার উপর তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে বউমাকে এবং যজ্ঞেশ্বরকে নাটমন্দিরে বসিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করলেন। আপনার অর্থের অভাব ছিল না তবু করলেন। এটা ঠিক আমি—।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় নি সুলতা, কীর্তিহাট থেকে শুধু যোগেশ্বরকে নিয়েই কলকাতা এসে ছদ্মনাম দিয়ে একখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন, সেটা বেরিয়েছিল 'ইংলিশম্যানে'। হেডিং ছিল—"দি ড্রোনস্ অব দি সোসাইটি"। ছদ্মনামটা জানতেন রত্নেশ্বর রায়।

* * *

এরপর আর পিতাপুত্রে দেখা হয় নি। দেবেশ্বর রায় তাঁর মৃতদেহ দেখেছিলেন।

১৯০০ সাল। নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরী শেষ করে টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীতে পৌঁছেই মারা গেলেন রত্নেশ্বর রায়। খামখেয়ালী দেবেশ্বর রায় এই চার বছরে একটা নতুন পথ ধরেছিলেন। বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে ডেকে কয়লার ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এবং নিজে ধীরে ধীরে সরে এসে খানিকটা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন; সেতার, এসরাজ নিয়ে গান গেয়ে কাটাতেন, কিছুটা পলিটিক্স করেছেন; আর একখানা ভাল কাগজ করবার কল্পনা করেছেন। জীবনে যেন একটা অস্থিরতার মধ্যে পড়েছিলেন তিনি। অস্থির মানুষ চিরকাল। নিত্য প্রতিমুহূর্তে যেখানে মানুষ বদলায়, সেখানে স্থির কি বা কে বল—সুলতা। তবে কিছু কিছু মানুষের অস্থিরতা বড় প্রকট, বড় স্পষ্ট ধরা পড়ে। দেবেশ্বর রায়ের এই সময়ের অস্থিরতা যেন সেই রকম। নইলে ভাবতে পার সুলতা, দেবেশ্বর রায় দক্ষিণেশ্বর যান, বেলুড় মঠে যান। নতুন করে সংস্কৃত পড়েন। কিছুদিন মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ছোট ছেলেকে আমার বাবা যোগেশ্বর রায়কে অহরহ সঙ্গে রাখতেন। আমার বাবা তখন এন্ট্রান্স, এফ-এ পাস করে বি-এ পড়ছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সবই কিছুদিনের জন্যে। কিছুদিন পর আবার পুরনো দেবেশ্বর রায়। মদের নেশায় গালে, কপালে লালচে আভা ফুটে ওঠে—চোখ লালচে এবং অর্ধ নিমীলিত হয়, মৃদু মৃদু হাসেন অথবা ঠোঁট দুটো মিলে ধনুকের মত ব্যঙ্গে বেঁকে যায়। বাড়ী ছেড়ে বাগানে গিয়ে বাসা গাড়তেন।

কারণ একটা ঘটেছিল, ভায়লেট পিক্রসের ছেলে, যাকে এলিয়ট রোডের বাড়ী দান করেছিলেন, যে রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানীতে চাকরি করত, সে মারা গেছে। ভায়লা মদ খেয়ে খেয়ে দুর্দান্ত মাতাল হয়ে পড়েছিল, ছেলের মৃত্যুর পর সে মধ্যে মধ্যে এসে এই বাড়ীর ফটকে এসে চেঁচাতো।

—'রত্নবাবু! রত্নবাবু!'

তার কণ্ঠস্বর কানে এলেই দেবেশ্বর চীৎকার করতেন—দারোয়ান, নিকাল দো, নিকাল দো। You get out—I say. Shut the gate. দারোয়ান। তারপরই চলে যেতেন বাগানবাড়ী।

এরই মধ্যে ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে কীর্তিহাটের লোক এল চিঠি নিয়ে।

লিখেছেন শিবেশ্বর—"বাবামহাশয়ের কঠিন অসুখ, পত্রপাঠ আপনি চলিয়া আসিবেন। আপনার নাম করিয়া জ্ঞান হারাইয়াছেন। কলিকাতা লইয়া যাইবার অবস্থা নাই। একজন বড় ডাক্তার লইয়া আসিবেন। গোয়াবাগানে রামেশ্বরকে পত্র দিলাম। বিডন স্ট্রীটে যজ্ঞেশ্বরের নূতন বাটীতেও পত্র গেল। সকলকে লইয়া পত্রপাঠ চলিয়া আসিতে অন্যথা করিবেন না। এবং ইহা যেভাবে ঘটিল, তাহা অতীব দুঃখের কথা, আক্ষেপের কথা। বাবামহাশয় লাট ভবানন্দবাটীর কাছারীতে সেখানকার পুলবন্দি সম্পর্কে চাঁদা ধার্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রজাদের সহিত মতান্তর ঘটে, প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে পারে না কিন্তু শীতকালের রাত্রিকালে কাছারীঘরের চালে অগ্নিসংযোগ করে। ভাগ্যক্রমে বাবামহাশয় নিরাপদে বাহিরে আসেন বটে কিন্তু শীতরাত্রে ঠাণ্ডায় জ্বরভাব হয়। সেই জ্বরভাব লইয়াই তিনি রাগ করিয়া কীর্তিহাট আসিয়াছিলেন; প্রথমে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে শীঘ্রই সারিয়া যাইবেন। কিন্তু হঠাৎ জ্বর প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

পুঃ—হরিশ মুখার্জি রোডে অন্নপূর্ণাপিসিমাকে চিঠি দিলাম।"

বিচিত্র সংঘটন, তখন দেবেশ্বর মধুপুরে গেছেন। কলকাতায় নেই। যোগেশ্বর নিজে মধুপুর গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনে হাওড়ায় গাড়ী বদল করে কীর্তিহাটে গিয়ে যখন পৌঁছুলেন তখন রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর কীর্তিহাটের রাজা—দুষ্টের দমনকর্তা, শিষ্টের শাসক বহুকীর্তিতে কীর্তিমান আর বেঁচে নেই, সকালবেলা মারা গেছেন, শবদেহ নাটমন্দিরে মা-কালীর সম্মুখে রাখা হয়েছে। সকলে অপেক্ষা করে রয়েছেন বড়বাবুর, দেবেশ্বর রায়ের। টেলিগ্রাম এসেছে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছুবেন, স্টেশনে ষোল বেহারার দুখানা পালকি রাখা হয়েছে।

দেবেশ্বর রায় বেহারাদের বলেছিলেন—মুখ বন্ধ করে যাবি।

—হুজুর, আগের লোকে পথের হাল বলে না দিলে পিছেকার বেহারারা—। চুপ করে গিয়েছিল তারা বড়বাবুর মুখ দেখে।

দেবেশ্বর তাদের বক্তব্য বুঝেছিলেন, আগের বেহারারা পথের অবস্থা না বলে দিলে পিছনের বেহারারা ঠিক চলতে পারবে না। তাদের সামনেটা তো বন্ধ। তিনি বলেছিলেন, তাহলে প্লো হিঁ—হিঁ প্লো হাঁকটা হাঁকবিনে।

শবদেহের পায়ের তলায় বসে দেবেশ্বর রায় গভীর স্বরে বারকয়েক ডাকলেন—বাবা বাবা! বাবা!—

ডাকতে ডাকতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদেছিলেন বাবার পায়ের পর মাথা রেখে।

কেউ সান্ত্বনা দিতে পারে নি। দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী উমা দেবী। তিনি সেদিন দশখানা গ্রামের লোকের সামনে স্বামীর দুই কাঁধ ধরে ডেকে বলেছিলেন—ওঠো। বড়বাবু—বড়বাবু ওঠো! ওগো, বাবা তোমাকে ক্ষমা করে গেছেন। শোন শোন, আমাকে নিজে মুখে বলে গেছেন। নিজে চিঠি লিখে দিয়ে গেছেন তোমাকে দিতে। ওঠো। আমার দিকে চেয়ে দেখ; তোমার তো অনেক আছে গো, আমার কেবল তুমি, তুমি তাও আমাকে দাও না। বাবা আমাকে বলতেন, ভয় কি! আমার দিকে চাও। ওঠো। বাবার শেষ কাজ করে এস। এই চিঠিখানা নাও।

চিঠিখানায় ছেলেকে শুধু ক্ষমা করেই যান নি রত্নেশ্বর রায়, ছেলের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। আরও লিখেছিলেন—হয়তো তোমার কথাই ঠিক; মাতামহ শ্যামাকান্তের অভিশাপ লইয়া যে-বিশ্বাসটা আমাদের বংশে একটা ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হয়তো একটা সংস্কার। তাহা ক্রিয়া করিয়াছে। সম্পদের শক্তির অফুরন্ত তৈলে প্রজ্বলিত অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে, তাহাকে আমরা অনুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যাই হোক, ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে অপমানকর বটে। পাপ তো বটে। এই পাপচক্র চক্রান্ত সৃষ্টি করিয়া বংশকে পঙ্গু করিতেছে। তুমি ইহা পরিত্যাগ কর। বধূমাতাকে সমাদর কর জীবনের স্বাদ পাইবে। শান্তি পাইবে। কল্যাণ হইবে। পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়ো না। ভায়লেটের মাসিক বৃত্তি এবং তাহার পুত্রের যে-কন্যাটি আছে, তাহার খরচ যেন বন্ধ না হয়।

পরিশেষে লিখেছিলেন—তুমি মদ্যপানে অভ্যস্ত। অশৌচ অবস্থায় মদ্যপান না করিলে হয়তো স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

বিচিত্র বিষণ্ণ একটি হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

সুরেশ্বর বললে—এটা অবশ্য আমার কল্পনা, সুলতা। ওই দেখ সেই ছবিখানা। এই দেখ দেবেশ্বরের মুখে সেই বিষণ্ণ বিচিত্র হাসি। প্যানেলে দেখ, বাঁদিকটা কালো অন্ধকারে ঢাকা হতে হতে ফিকে হয়ে লাল হয়েছে, রাত্রির পর প্রভাত হবে, সূর্যোদয় হয় নি, লালচে আভার সবটাই এসে পড়েছে দেবেশ্বরের মুখে। কালো অন্ধকারের মধ্যে নির্বাপিত রত্নেশ্বর রায়ের চিতা। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী শেষ হয়ে গেল। দেবেশ্বর নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর শেষকৃত্য করে দুফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। সামনেটা টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীর একশো বছর। দেবেশ্বরের হাতে তুলি—তিনি রায়বংশে তাঁর জীবনশিল্পের পত্তন করতে চাচ্ছেন। হাতের তুলি কাঁপছে।

অজ্ঞান হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত রায়বাহাদুর ডায়রী লিখে গেছেন। শেষ কদিনের ডায়রী অদ্ভুত সুলতা। আশ্চর্য লাগে আমার।

যেদিন রাত্রে কাছারীতে আগুন লাগল, তার আগের দিন হতে প্রজারা কাছারী আসা বন্ধ করেছিল। ব্যাপারটা পুলবন্দীর চাঁদা। নদীর ধারে ধারে বন্যা নিবারণের বাঁধ হবে—সরকার সিকি দেবেন প্রজা সিকি দেবে, জমিদার দেবেন অর্ধেক এই নিয়ম। রায়বাহাদুর বলেছেন প্রজা অর্ধেক দেবে। টাকাটা চাঁদা হিসেবে তিনি আদায় নেবেন। প্রজারা বলেছে—এই সেদিন হুজুরের পৌত্রের বিয়েতে আমরা টাকায় সিকি চাঁদা দিয়েছি আর আমরা দিতে পারব না। কয়েকদিন পর বললে দেব না। সেটা অবশ্য তাঁর সামনে নয় গ্রামে বাইরে বাইরে। রায়বাহাদুর ডেকে প্রশ্ন করলেন—এইরকম কথা শুনছি। এ সত্যি ?

কেউ উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু এর উত্তর না দিয়ে ছুটি নেই। রায়বাহাদুর উঠতে দিলেন না কাউকে।

শেষ তারা বললে—আজকের দিনটা সময় দিতে আজ্ঞে হয় হুজুর, কাল দিব উত্তর খানিক শলাপরামর্শ করি।

ছুটি দিলেন রায়বাহাদুর। ডায়রীতে শেষ লাইন লিখেছেন—"দিনে দিনে দেশকালে কি হইতেছে ? প্রজারা এই ধরনের বেয়াদপি করিতে সাহস করে!"

পরদিন সকাল থেকে গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা অনুপস্থিত। কেউ বাড়ী নেই। সকালবেলা জল খেয়ে তাদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এল না। ডিসেম্বর মাস, ভরাভর্তি ধান কাটার সময়, লাট ভবানন্দবাটীর চারখানা মৌজা নদীর ধারে, তার কোন গ্রামের মাঠে একটি লোক নেই। সোনার বর্ণ পাকা ধানে ভরা মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী উড়ছে শীতের উত্তুরে বাতাসে রৌদ্রের সঙ্গে রাত্রের শিশিরভেজা নরম ধান, শুকিয়ে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাঠ জুড়ে একটা মুড়মুড় মুড়মুড় শব্দ উঠছে।

সেইদিনই রায়বাহাদুরের হুকুমে সমস্ত গ্রামের গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া ঘরে বন্ধ রইল ঘর থেকে বের হতে পেলে না। রাখালেরা ফিরে গেল। গ্রামের রাস্তা সরকারী খাসপতিত, জমিদারের জমি, সেখানে বের হতে দেবেন না রায়বাহাদুর। বন্ধ করলেন না পানীয় জল সরকারী পুকুর থেকে। স্নান বন্ধ হল সরকারী পুকুরে। সন্ধ্যেবেলা ঢেঁড়া পড়ল—"কাল সকালবেলা এক প্রহরের মধ্যে প্রত্যেক প্রজাকে কাছারীতে হাজির হবার জন্য হুকুমজারি করা হচ্ছে। যে-প্রজা হাজির না হবে, তার সরকারী জমি, পুষ্করিণী এবং গাছপালা যা সরকারী পতিতের উপর থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি বাতিল করা হবে।"

এর পরিণাম অতি ভয়ানক জুলতা। এ যে না দেখেছে সে বুঝবে না। গরু-বাছুর পথে বের হলে খোঁয়াড়ে যায়, ইচ্ছে করলে বউ-বেটী মেয়েছেলে পথে বের হলে ট্রেসপাসার হত সেকালে। পাকা ফসল মাঠে থাকত, মিলিয়ে যেত। আরও অনেক কিছু হত। তার মধ্যে ঘরে আগুন, লাঠিবাজী, ফৌজদারী নেই জুলতা। এসব হল আইনসম্মত শাসনবিধি। কি

...তদূর অগ্রসর হতে পারেন নি রত্নেশ্বর রায়। তিনি জানতেন না যে, কাল তাঁর অজ্ঞাতসারে আরও অনেক এগিয়ে গেছে। প্রজাদের সেই কালই সেই রাত্রেই বোধ হয় খুঁচিয়ে জাগিয়ে ...গিয়ে দিয়েছিল—"যা, তার চেয়ে আজ রাত্রি পোয়াবার আগেই কাছারীতে আগুন দিয়ে ...লিয়ে দে। জমিদার বুঝুক তোরাও লড়তে পারিস।"

রত্নেশ্বর রায় তাঁর সেদিনের ডায়রীতে লিখেছেন—রাত্রিতে কাছারীতে আগুন লাগিল। ...তের রাত্রি, প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। পরে যখন লোক-লস্করের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ...ভাঙিল, তখন তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ঘরখানা জ্বলিতেছে। আমি ...স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তৎপর ক্রুদ্ধ হইলাম। দেখিতে দেখিতে মনে পড়িল আর একবার ...মিদার দে সরকার আমাকে ঘরে শিকল দিয়া প্রজা হিসাবে পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল। ...ক্ষা করিয়াছিল ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের কথা মনে করিয়া অনুশোচনা হইল। কাঁদিলাম। তাহার পর মনোমধ্যে চিন্তান্তরে উপনীত হইলাম। এবং চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এবার প্রজারা জমিদারকে ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া মারিতে চাহিতেছে। আমার মত জমিদারকেও গ্রাহ্য করিল না। কাল কি এতই বদল হইয়া গেল? ইহার পর? ভবিষ্যতে কি হইবে? জমিদারবর্গের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। আমি চিন্তিত হইতেছি রায়বংশের জন্য। আমার অন্তে মদীয় পুত্রদের কি দশা হইবেক। দেবেশ্বর একসঙ্গে আমীর মেজাজের এবং সাহেবী মেজাজের লোক। প্রজাদের সে ঘৃণাও করে, তাহাদের দয়াও করে। শিবেশ্বর মামলাবাজ এবং শক্তি না-থাকা সত্ত্বেও জবরদস্ত জমিদার হতে চায়। রামেশ্বর কলিকাতাবিলাসী ব্রাহ্মঘেঁষা একটা অপদার্থ বিলাসী। যজ্ঞেশ্বরের সম্বন্ধে আশা করিয়াছিলাম, সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরদের সংস্রবে কয়লা ব্যবসায়ী হইয়া গেল। কি করিব অদ্য হইতে তাহাই চিন্তা হইল।

সে-চিন্তার মীমাংসার পূর্বেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মারা গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

লোকে বলেছিল—ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

* * *

দেবেশ্বর মুখাগ্নি করে বাড়ী ফিরে কম্বলের শয্যায় বসে ভাইদের বলেছিলেন—আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। শিবেশ্বর ভেবেছিলেন, বড় ভাই মদ খাবেন। বাপ অনুমতি দিয়ে গেছেন তাঁর শেষ চিঠিতে। চাকরকে তিনি ডেকে বলেই গিয়েছিলেন—বড়বাবুকে মাল দিবি কিন্তু যেন বেশী দিসনে। আর দোহাই বাবা, অখাদ্য-কুখাদ্য যা খায়টায় এর সঙ্গে, খর না মুর্গীর ডিমফিম সেগুলো যেন চাইলেও দিসনে। অন্ততঃ হুকুম করলে বড়মাকে ডেকে দিস। না—বড়মা কি করবে—আমাকে ডেকে দিস অন্তত। খবরটা দিস বুঝলি!

চাকর তাঁর খাস চাকর নিমাই দাস;—সে কলকাতার মতই ট্রে-তে করে বোতল-গ্লাস-সোডা এনে নামিয়ে দিলে।

তাকিয়ে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। নিমাই চাকর তাঁর নিজের তালিম দেও চাকর। সে তাঁর চাউনির অর্থ বোঝে, কথা বলবার জন্মে মুখ খুললে জানতে পারে এব কিসের হুকুম হবে। সে তাঁর কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললে—আ মেজবাবু বললেন— ; কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেবেশ্বর ব ছিলেন—নিয়ে যা। ও আর খাব না। আর কোনদিন আনবিনে সামনে। শোন। য ভুলে গিয়ে আনতে বলি, তবে তুই মনে করিয়ে দিস। যা মাণিকবউকে বল—এক গ্ল ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসবে। অশৌচের সময় তোর হাতে জল পর্যন্ত খেতে পারব না, বুঝলি।

মাণিকবউ অর্থাৎ উমা দেবী জলের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলে —বাবা তো বলে গিছলেন খেতে তোমাকে। ফিরিয়ে দিলে কেন ?

দেবেশ্বর বলেছিলেন—আর কখনও খাব না বলে।

—খাবে না ? অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন উমা দেবী স্বামীর মুখের দিকে।—আ কখনও খাবে না ?

—না।

—তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। ভারী ভয় করে।

—বসো।

—বসবার কি উপায় আছে ? যাই দেখি, গোবিন্দমন্দিরের কাজকর্ম আমি করি তে এবার কাউকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হবে।

—কেন ? সেবার যজ্ঞেশ্বরের বিয়ের সময় চব্বিশ ঘণ্টা তো আমার কাছেই থাকতে মুর্গীর ডিম পর্যন্ত নেড়েছ—

—সেবার গোবিন্দ বলেছিলেন।

—এবার—

—না। এবার তো বলেন নি। বরং মুখ শুকিয়ে গেছে গোবিন্দর, বলছেন—বা চলে গেলেন আর কি আমার সেই যত্ন করবে এরা মাণিকবউ ? তুমি একটু দেখো। বাবা বলে গেছেন। কি করব বল ?

অকস্মাৎ ফেটে পড়েছিলেন দেবেশ্বর।—তা হ'লে আমি কাকে নিয়ে কার সঙ্গে কথ বলে থাকব বলতে পার ?

বিব্রত হয়ে মাণিকবউ বলেছিলেন—এ কি বিপদে পড়লাম মা ? আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি ? না—না—না। তোমার অনেক আছে। বই আছে, গান আছে, তারপরে লো আছে জন আছে, বিষয় আছে, ব্যাপার আছে, আমার যে গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নেই—

—না—আমি আছি। আর আমি ওসব চাইনে, আমি তোমাকে চাই। তুমি বসো। যেতে পাবে না তুমি।

—না—না—না। তোমাকে আমার ভয় করে। আর আমি যে আমাকে গোবিন্দকে প দিয়েছি। তোমাকেই দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি তো নিলে না। পায়ের তলায় ড় কাঁদতাম—কই একদিনও তো দেখ নি। বাবা টেনে এনে এখানে গোবিন্দের হাতে র বলেছিলেন—মা, ওই ওঁর পায়ে নিজেকে ঢেলে দাও। কি করব মা! অপরাধ আমার। য় তো ও করে নি, আমি জোর করে দিয়েছি। আমি তাই আছি। সেবার গোবিন্দ লছিলেন—আমি বিবিমহলে তোমার সেবা করেছিলাম। এবার তো বলেন নি। আমি রব না।

ঠিক এই মুহূর্তেই দুই ভাই এবং ম্যানেজার এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে া বলতে তাঁরা আসছেন।

শ্রাদ্ধের কথা প্রায় বাঁধা কথা ছিল সেকালে। দশ দিনে তিলকাঞ্চন সেরে রেখে ছ সে সপিণ্ডীকরণের সময় দানসাগর। কিন্তু কথা তা ছাড়াও ছিল। সম্পত্তির কথা। তা ড়া আরও একটা বড় কথা তুলেছিলেন শিবেশ্বর। হয়তো সেইটেই রায়বংশের ভবিতব্যের থা।

শ্রাদ্ধ দানসাগর ছ' মাসে নয়—দশ দিনেই করার কথা হয়েছিল। রামেশ্বর ব্যারিস্টারী ড়তে বিলেত যাবেন। অনুমতি রত্নেশ্বর দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, প্রয়োজন অনুভব রছিলেন রায়বংশের কারুর বিলেত অন্তত যাওয়া প্রয়োজন, নইলে যেন রায়বংশের সম্মান হচ্ছে।

বিষয় তিন ভাগ করে দিয়েই গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। বড় ছেলেকে ছ আনা দিয়ে ছিলেন পৌত্রদের কাছে প্রতিশ্রুতি মত। এবং নতুন প্রভিশন করে গিয়েছিলেন, তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি যা পুত্রেরা পাবে তা থেকে তাঁরা তাঁদের পুত্রদের এক ধর্মান্তর গ্রহণ ছাড়া কোন কারণেই বঞ্চিত করতে পারবেন না। সেই মতই ব্যবস্থা হয়েছিল। আদায়পত্র ত্রে হবে। শিবেশ্বর দেখাশুনা করবেন, তার জন্য একটা মাসোহারা পাবেন। মাসে ড়াইশো টাকা, বছরে তিন হাজার।

এর পরই শিবেশ্বর সেই কথা তুলেছিলেন, বাবাকে লাট ভবানন্দবাটীর প্রজারা একরকম ড়িয়েই মেরেছে। ঘরে আগুন দিয়েছিল। শিকল-তালাও দিয়েছিল। জানালা ভেঙে নি বেরিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে মরার সঙ্গে পুড়ে মরার াৎ কতটুকু। আমি বলি এ পুড়ে পুড়ে মরাই হয়েছে তাঁর। এর প্রতিকার কি হবে?

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। উত্তর চট্ ক'রে কেউ দিতে পারেন নি।

কিছুক্ষণ পর দেবেশ্বর বলেছিলেন—বাবা কি করতে চেয়েছিলেন?

—তিনি ঠিক কিছু করেন নি। তবে—

—তবে কি?

—ভাবছিলেন দেওয়ানীর পথে যাবেন, না ফৌজদারীর পথে যাবেন।

ম্যানেজার বললেন—ফৌজদারীর পথে একালে হাঙ্গামা অনেক, সে থানা থেকে পর্যন্ত মুখ চাপা দিতে দিতে অনেক বেগ পেতে হয়। তার ওপর কাল এমন পড়েছে প্রজার দোষ এ দেখবেই না লোকে, কিছু হলে আগেভাগেই জমিদারকে দায়ী ক'রে থাকবে।

শিবেশ্বর বলেছিলেন—তা ব'লে ভয় ক'রে ব'সে থাকলে দুদিন পর তারা মাথার উপর চলতে শুরু করবে। জমিদারী হয়তো ছেড়ে দিতে হবে।

দেবেশ্বর এবার বলেছিলেন—বাবা ভাবছিলেন কোন্ পথে যাবেন। আমাদের প ভাবনা নেই, পথ আমাদের একটি; বাবার মৃত্যুর শোধ। বাবা দেওয়ানীর পথে অব দুর্দান্ত প্রজাকে শাসন করবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু আমরা সে ভাবব কি ক'রে? তুলতে হলে এ চক্র যারা ক'রেছিল তার লীডার যে তার মাথাটা নিতে হবে। না পিছন থেকে সাপের মত কামড়ে বিষ ঢেলে লুকিয়ে পড়ার মধ্যে আমি নেই। তবে বাবা যদি ক্ষমা ক'রে যেতেন তাহলে আমরা চুপ ক'রে থাকতে পারতাম। অথবা এখনও সে এসে গড়িয়ে পড়ে মাথাটা লুটিয়ে দেয় তবে গলায় খাঁড়া ঠেকিয়ে আমরা ক্ষমা ক পারি। এই আমার মত। সেইটে হলে আমি খুশী হই। খুন হলে লোকে বলবে—র বাহাদুরকে এমন অপমান বা দুর্দশা কিছু ক'রেছিল যার জন্যে খুন না ক'রে ছেলেদের মেটে নি।

* * *

রায়বাড়ীতে ওই সর্বনেশে মামলা ঢুকল সুলতা। এবার মামলা একতরফা নয়। এ মামলায় প্রতিপক্ষ দাঁড়াল। প্রজারা লড়াই দিলে। ফৌজদারীতে মাঠে লড়াই হল, হল, মোড়ল লোকটা খুন হ'ল, মামলা চলল একটার পর একটা। এক বছর ব'সে রই দেবেশ্বর কীর্তিহাটে। শুধু এই জন্যেই বসে রইলেন। কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ গেলেন। মদ সেই ছেড়েছিলেন আর খান নি। জমিদারী নতুন ধাঁচে চালতে করলেন। কিন্তু তাতে শিবেশ্বরের সঙ্গে বিরোধ বাধল, তার সঙ্গে যোগ দিলেন বড় যজ্ঞেশ্বর। তিনি তখন কলকাতায় ব্যবসা দেখেন শ্বশুরের সঙ্গে। অপবাদ রটল পিতৃহন্তা সুকৌশলে ক্ষমা করছেন দেবেশ্বর রায়। মরা বাপের উপর শোধ তুলছেন। তার কা তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে বলতেন—যথেষ্ট হয়েছে, লোকটা এবার মাফ কর। অপবাদ শুনে চমকে উঠে চলে এলেন দেবেশ্বর রায়। জমিদারীর ব্য করলেন দুভাগে ভাগ ক'রে। প্রথম অবিভাজ্য দেবোত্তর এস্টেট, তার কমন ম্যানেজার ক দিলেন শিবেশ্বর রায়কে। আর দেবোত্তরের অধীনে পত্তনীদার হিসেবে যে ব্যাপাটা এবং খাস, যা রায়বংশধরদের ব্যক্তিগত, তা ভাগ ক'রে নিয়ে নিজের অংশের মধ্যে পুর

কালের আচার্য দেওয়ান ম্যানেজারের পৌত্রকে ম্যানেজার রেখে কলকাতা চলে এলেন। তখন সম্পত্তিতে তাঁর অংশ সাড়ে আট আনা, রামেশ্বর বিলেত যাবার সময় তাঁর অংশের সম্পত্তি নামমাত্র মুনাফা রেখে দরপত্তনী দিয়ে গেছেন। সেটা দু ভাই-ই নিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে এসে নতুন মানুষ দেবেশ্বর প্রথম দিনই আপিস গিয়ে চমকে গেলেন। কলকাতার আপিসে তাঁর ঘরে তাঁর চেয়ারে বসছেন বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর। রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর এই কয়েক মাসের মধ্যে পরিবর্তনটা ঘটে গেছে। ব্যবসায় পার্টনার মহাদেব চক্রবর্তী যজ্ঞেশ্বরের শ্বশুর, তিনিই নাকি এ ব্যবস্থা করেছেন। আপিসের স্টাফও বদল হয়ে গেছে। সে বেয়ারা পর্যন্ত।

যজ্ঞেশ্বর বাপকে দেখে চমকে উঠেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—পাখা এখানটায় একটু বেশী পাওয়া যায় সেই জন্যে—।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—বসো তুমি। আমি বসব না। আমি চলে যাব ঘণ্টাখানেক পর।

পরদিন এসে চেপে বসে গোটা ব্যবসাটির অবস্থা দেখে তাঁর অংশের প্রাপ্য টাকা বের করে নিয়ে স্বতন্ত্র করে ব্যাঙ্কে মজুত ক'রে বড়ছেলেকে ডেকে বললেন—শোন, কোন বিজনেসের সঙ্গে আর আমি সম্পর্ক রাখব না। ইচ্ছে বিক্রী ক'রে দি, কিন্তু ভেবে দেখলাম—তুমি যখন কাজকর্ম শিখেছ এবং অর্ধেকের অংশীদার চক্রবর্তী যখন তোমার শ্বশুর, তখন ছেড়ে না দিয়ে তোমাকে দেওয়াই ভাল। কি বল ?

চুপ ক'রে রইলেন যজ্ঞেশ্বর।

দেবেশ্বর বললেন—একটি শর্তে।

এবার বেশ ধীরভাবেই যজ্ঞেশ্বর বললেন—বলুন।

দেবেশ্বর বললেন—জানবাজারের বাড়ী, ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা যা টাকাকড়ি আছে, এ সব এখন আমার রইল, আমার অন্তে এ সমস্ত পাবে যোগেশ্বর।

—কীর্তিহাটের সম্পত্তি—

—ওতে তো বাপের ছেলেকে বঞ্চিত করবার অধিকার নেই। সে আমি বলব না। ওতে তোমাদের দুই ভাইয়ের সমান অংশ পাওয়া উচিত, তাই পাবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে যজ্ঞেশ্বর বলেছিলেন—বেশ, আমি তাতে সম্মত, শুধু মায়ের কোম্পানীর কাগজের অর্ধেক, যেটা আমি পাব সেটা আমাকে দিন। আপনি যেভাবে ব্যবসার রিজার্ভ ফাণ্ড তুলে নিয়েছেন তাতে ব্যবসা আমি চালাবো কিসে!

—তোমার মা থাকতেই তাঁর টাকাটা নেবে ? সে টাকায় আমি কখনও হাত দিই নি।

—মায়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। অর্ধোন্মাদ। সে অবশ্য আপনার জন্যেই।

—থাক। তাই পাবে তুমি। দিয়ে দেব।

—আপনি কি রিটায়ার করবেন ? না কীর্তিহাটে গিয়ে বসবেন ?

—না : আমি এখানেই থাকব। রিটায়ার করা বলতে পার। তবে একটা কিছু অবলম্বন রাখতে হবে তো। ভাবছি বাই-উইকলি ইংরিজী খবরের কাগজ করব। কাগজের প্রয়োজন আছে। আমার পরে ওটা যোগেশ্বর চালাবে। সে এবার বি-এতে ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এম-এতেও তেমনি ফল করবে। আমার বড় শখ ছিল, সেটা যোগেশ্বরকে দিয়ে করে যাব।

* * *

সুরেশ্বর বললে—টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীতে ঢুকে দেবেশ্বর রায় আর বেঁচে থাকেন নি। তারপরের কথা তুমি সবই জান সুলতা। জান না শুধু দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর কথাটা। তিনি মারা গেলেন কি ভাবে। লোকে জানে জমিদারের ছেলে যে ভাবে মারা যায় সেই ভাবেই মারা গেছেন তিনি। মদ খেয়ে খেয়ে তিনি হঠাৎ একসময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর জ্ঞান হয় নি। সেকালে বলেছিল—ব্রেন ফিবার ; একালে হলে বলত সেরিব্রেল থ্রম্বসিস্। সেইটুকু বললেই আমার অতীতকাল শেষ।

* * *

তখন লর্ড কার্জন ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়। বোধ করি এত বড় কঠিন ইম্পিরিয়েলিস্ট আর এ্যারোগ্যান্ট ভারতবর্ষ-বিদ্বেষী কেউ আসে নি। অন্তত ভাইসরয় হয়ে আসে নি। চার্চিল সাহেবের আদর্শ পুরুষ লর্ড কার্জন। তার সঙ্গে লর্ড কিচেনার তখন কম্যাণ্ডার চীফ।

স্যার হেনরী ফ্লাওয়ার সেক্রেটারী অব স্টেট। এদের পায়ের চাপে গোটা ভারতবর্ষ মুমূর্ষুর মত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা সেই চিরন্তন মন্ত্র জপছে ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ! রক্ষ মাম্ জগদীশ্বরে! রক্ষ দেবী—মহাদেবী, ত্রাহি! ত্রাহি! ত্রাহি দেবী মহেশ্বরী!

নিরুত্তর আকাশ থেকে উত্তর যা আসে তা মেঘের ডাকের মধ্যে দিয়ে আসে, আকাশ কখনও কথা কয় না। ভারতবর্ষের গলায় ইংরিজী বুটের চাপটা একটু জোরালো করে হেনরী ফ্লাওয়ার নতুন পলিসি ঘোষণা করেছিলেন—

"The Government of India must always abide by the decision of the British Cabinet even when it was regarded by them as injurious to the interest of India".

এবং বাংলাদেশে তখন নতুন প্রাণের সাড়াতে ইংরেজের মুখ ভারী হয়েছে। এমন কি জমিদারদের উপরেও মেজাজ খারাপ। জমিদারেরা পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর আর বৃদ্ধি করে খাজনা আদায়ের এজেণ্ট বা গোমস্তা থেকে দস্তুরমত বিলেতের লর্ডদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই জমিদারদের উপর শাসন চালাচ্ছে। বাঙালী ইংরিজী শিখে

ইংরেজের সঙ্গে টোক্কর মেরে চলে। এ তাদের সহ্য হয় না। শাসনযন্ত্রটার স্ক্রু ক্রমাগত টাইট দিতে চাইছে তারা।

দেবেশ্বর রায় এর বিরুদ্ধে লিখবার জন্য খবরের কাগজ বের করবেন স্থির করেছিলেন। জমিদারীর মোহ তাঁকে বাঁধতে পারে নি, কয়লার ব্যবসায়ের ঐশ্বর্যও তাঁকে ভোলাতে পারে নি। তিনি নতুন জীবনে নতুন কর্মে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

ছোটছেলে যোগেশ্বরকে বলেছিলেন—নাই বা পড়লে এম-এ। প্রেস কিনে কাজ শুরু কর। আমার সঙ্গে লেগে পড়।

সুরেশ্বর বললে—কিন্তু তা হ'ল না।

হঠাৎ বাধা এসে সামনে দাঁড়াল। অলঙ্ঘনীয় বাধা।

বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক পায়চারি ক'রে সুরেশ্বর বললে—লোকে বলে এ বাধা রায়বাড়ীর সেই অলঙ্ঘনীয় অভিশাপের বাধা।

সেই ধর্মসাধনার বিকৃত পন্থায় যে অভিশাপ অর্জন করেছিলেন শ্যামাকান্ত, আর যে অভিশাপকে সম্পদের পথে কালনাগিনীকে বুকে ধরার মত ধরেছিলেন সোমেশ্বর রায়—সেই বাধা। নারীর বাধা।

লোকে অন্তত তাই বলে। শিবেশ্বর রায়ও তাই বলেছিলেন, বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায়ও তাই বলেছিল। এবং আরও অনেক জনেই তাই বলেছিল। বলেছিল—যে অভিসম্পাতকে রত্নেশ্বর রায় কঠোরভাবে বংশ থেকে বিদায় করেছিলেন, মুছে দিয়েছিলেন, সেই অভিসম্পাতকে দেবেশ্বর রায় ওই যোগিনীসাধনের সিদ্ধাসনের জঙ্গল থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন পর তাকে ছাড়তে গেলে সে ছাড়বে কেন? সে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় ফিরে কলকাতায় এসেছেন শুনে তাঁর সামনে দীর্ঘদিন পরে এসে দাঁড়িয়েছিল ভায়লেট। তখন সে দুর্দান্ত মাতাল; পর পর ডাইভোর্স ক'রে তৃতীয় স্বামী নিয়ে ঘর করছে। ঘর করার অর্থ নিতান্তই একটা অর্থহীন ব্যাপার। এই হতভাগিনী মেয়েটাকে নিয়ে কতকগুলো পেশাদার দালাল শ্রেণীর জীব ব্যবসা করত মদ্য খাদ্য আর আশ্রয় দিয়ে। এলিয়ট রোডের যে বাড়ীটা রত্নেশ্বর রায় ভায়লেটের ছেলে পিক্রসকে দিয়েছিলেন, যাকে লেখাপড়া শেখাবার মাসোহারা দিতেন দেবেশ্বর রায়, সে ছেলের লেখাপড়া হয় নি, শেষ পর্যন্ত তাকে একটা চাকরি দিয়েছিলেন দেবেশ্বর রায় তাঁদের ফার্মে; ডকে তার কাজ ছিল; রায় চক্রবর্তীর কয়লা চালান যেত দেশান্তরে, সে ডকে বোঝাইয়ের কাজ দেখত, সে ছেলে তখন মরেছে। একমাত্র কন্যাকে কোলে নিয়ে তার স্ত্রী শাশুড়ীকে বাড়ীতে ঢুকতে দিত না। সে বেড়াত পথে পথে। তখনও তার রূপ ছিল, তখনও তার দেহ ছিল; বিবাহের নামে আশ্রয় দিয়ে কয়েকটা পাষণ্ড তাকে ব্যবসার সামগ্রী করে তুলেছিল। প্রথম প্রথম হয়তো

ভায়লেটের ভাল লেগেছিল কিন্তু ক্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে খুঁজেছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়। অথবা তার অতৃপ্ত কামনা চেয়েছিল তার জীবনের প্রথম ভালবাসার মানুষকে। অথবা অভিশাপ নিজের আসন পাতবার জন্ত চেয়েছিল অভিশপ্ত জনকে।

সে-কালে দেবেশ্বরের জীবনের পরিবর্তনের ঠিক মুখেই ভায়লেটের আবির্ভাব নিয়ে গবেষণার আর অন্ত ছিল না সুলতা। ছিল না বলেই তার উল্লেখ করছি।

কিন্তু আসলে প্রথমটা ছিল ব্ল্যাক মেলিংয়ের ব্যাপার। ভায়লেটের একটা মাসোহারা ছিল। সে আমলে সে মাসে চল্লিশ টাকা হিসেবে পেত এ বাড়ীর সেরেস্তার খাজাঞ্চির কাছ থেকে। কিন্তু তার বাড়ী ঢুকবার হুকুম ছিল না। টাকাটা লোক-মারফৎ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এবার ভায়লেটের স্বামী তাকে পাঠালে, তুই যা, বল এ টাকায় আমার কুলুচ্ছে না, আমাকে আরও কিছু দাও। ওই এলিয়ট রোডের বাড়ী থেকে তোকে তাড়িয়ে দিলে তোর বেটার বউ, তুই থাকবি কোথায়? তোকে একটা বাড়ী দিতে বল। এতনা বড়া আদমী—a rich man. I have seen the big house—beautiful horses and couches—he must pay.

ভায়লেট ভয় করত রায়বাবুকে। ভয় করত ভালও বাসত। দুই-ই। তার ঐশ্বর্য, তার জাঁকজমক—কীর্তিহাটের প্রতাপের স্মৃতি তার মনে পড়লে সে বিহ্বল হয়ে পড়ত। সেই রায়বাবু যখন তাকে চিঠি লিখে ভালবাসার কথা জানিয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল যে তার নিশ্বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তরুণ রায়বাবুর বক্ষলগ্না হয়ে তার ভয় সত্ত্বেও সে কেমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। কেবলই মনে হ'ত রায়বাবু তার রায়বাবু! তার রায়বাবু!—তারপর কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যে অনেক কিছু শিখেছিল, অনেক কিছু পেয়েছিল কিন্তু ভয় তবু কাটে নি। সে ভয় আবার প্রচণ্ডতম হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করলে যেদিন রায়বাবু বললে—দাঁড়া তোকে গুলি করি, করে নিজের বুকে গুলি করে দুজনে মরবো।

সে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল নিজের মৃত্যুর জন্ত। কিন্তু তাকে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিয়ে নিজের বুকের কাছে বন্দুকের নল লাগিয়ে রায়বাবু যখন অবলীলাক্রমে বন্দুকের ট্রিগার টেনে দিলে, তখন তার আর আতঙ্কের সীমা ছিল না।

রায়বাবু কি না পারে।

তারপর থেকে সে আর রায়বাবুর সামনে আসে নি। রায়বাবুর জন্তে বুক তার ফেটে যেত তবু সে আসতে সাহস করত না। চৌরঙ্গীর পথে কতদিন রায়বাবুর ফিটন দেখে সে লুকিয়ে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছে। বুকের ভিতরটায় যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে।

ছেলে মারা গেলে একবার সে এসেছিল, ছুটে এসেছিল ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ধ'রে এই বাড়ীর ফটকে, কিন্তু ফটকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছতে মুছতে ফিরে

গিয়েছিল। সাহস হয় নি। এতকাল পর, তেইশ বছর পর তাকে প্রায় চাবুক মেরে পাঠালে তার নতুন স্বামী মিস্টার জোনস্।

জোনসও তার সঙ্গে এসেছিল প্রথম দিন। এবং রায়বাবুর দেখা পেতে এতটুক ঝামেলা পোয়াতে হয় নি। একেবারে সামনেই পেয়েছিল তাঁকে। দেবেশ্বর রায় বসেছিলেন বাগানের মধ্যে সেই বেদীটার উপর, যে বেদীটার উপর বসে বহুকাল আগে শ্যামাকান্ত স্নানযাত্রার দিন পশ্চিম আকাশে কালো মেঘের উঁকি দেখে মেঘমল্লার গেয়েছিলেন। সেই মার্বেলের বেদীটার উপর ব'সে দেবেশ্বর কথা বলছিলেন যোগেশ্বরের সঙ্গে।

হঠাৎ এসে দাঁড়াল তারা।

—Excuse me, sir—

দেবেশ্বর ফিরে তাকালেন। মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল। ভায়লেট তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে।

দেবেশ্বর ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি ভিতরে যাও যোগেশ্বর। হ্যাঁ, আর ফটকের দারোয়ানটাকে এক্ষুনি ডেকে ডিসমিস্ করে দাও।

যোগেশ্বর চলে গিয়েছিলেন। দেবেশ্বর জোনসকে বলেছিলেন—Yes, what can I do for you, well before that—who are you please.—Good evening sir—my name is Albert jones—and let me introduce Violet Mrs. Jones...

—I see—she is Mrs. Jones now. And then?

হলদে দাঁত মেলে হেসে জোনস বলেছিল—She wants money—Roy Babu, she is your old-friend.

ভায়লেট মুখে কিছু বলে নি, বলতে পারে নি, কিন্তু অজস্রধারায় শুধু কেঁদে ছিল। চোখ দিয়ে বাঁধভাঙা নদীর জলের মত জলের ধারা নেমেছিল।

—কত টাকা চাই?—ভায়লেট?

ভায়লেট উত্তর দিতে পারে নি, সে শুধু কেঁদেই গিয়েছিল। জোনস কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেবেশ্বর বলতে দেন নি। বলেছিল—Please Mr. Jones—you please keep quiet. বল ভায়লা কত টাকা চাই—বল।

বলতে ভায়লেট কিছু পারে নি; তা না পারুক দেবেশ্বর নিজেই খাজাঞ্চীকে ডেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে ভায়লেটের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—নিয়ে যাও। তারপর জোনসকে বলেছিলেন—দেখ মিস্টার জোনস, আর যেন এ বাড়ীর ফটকে ওকে নিয়ে বা একলা মাথা গলাবার চেষ্টা করো না।

ভায়লটকে বলেছিলেন—ভায়লা, তোমার ছেলের মেয়ে তোমার গ্রাণ্ডডটার পাঁচ বছরের

হল,—তাকে কনভেণ্টে রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে আছে।—Don't forget that you are now a Grandma. বুঝতে পারছ আমার কথা ?

সেদিন তারা চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই বাড়ীটার আশেপাশে হঠাৎ বেদনার্ত নারীকণ্ঠের ডাক উঠতে লাগল—

—রায়বাবু। মাই রায়বাবু!

একটা ফিরিঙ্গী মেমসাহেব—আধ-পাগলের মত তার বেশভূষা—অঝোরঝরে কাঁদত আর ডাকত—রায়বাবু—মাই রায়বাবু!

দেবেশ্বর রায় বাইরে বারান্দায় বা বাগানে থাকলে ঘরে গিয়ে ঢুকতেন। হঠাৎ একদিন ছোটছেলেকে ডেকে বললেন—আমার মনে হচ্ছে নেমেসিসের মত একটা কিছু আসছে। আসবার কথাই বটে যোগেশ্বর। তার জন্যে আমি দুঃখিত নই অনুতপ্ত নই। তবে আমার একটা কাজ বাকী আছে। সেটা আমাকে সেরে ফেলতে হবে তার আগে। কাজটা তোমার মায়ের কাছে—তার সঙ্গে কাজ। তোমাকে একটা জিনিস বলে যাই, মাই লাস্ট ওয়ার্ড। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমি যেটা চেয়েছিলাম নিজে—যেটা আমার সম্পদের জন্যে ঐশ্বর্যের জন্যে, এ্যাণ্ড—আরও কিছুর জন্যে হয় নি—সেটা তোমার হয়েছে। সেই জন্যে তোমাকে আমি নগদ টাকা আর বাড়ী দিয়েছি। তুমি বিজনেস কর, জমিদারী থেকে দূরে থেকো। এ্যাণ্ড ফ্রম উয়োম্যান। বিয়ে ক'রে যদি সংসারী হ'তে পার—সাধারণ মানুষের মত, তা হ'লে বিয়ে করো। নইলে করো না।

যোগেশ্বর শুনেছিলেন অনেক কিছু। এই জানবাজারের বাড়ীতে পুরনো চাকর-বাকর কর্মচারীদের চাপা কথার ফিসফাসের মধ্যে থেকে শুনেছিলেন, জেনেছিলেন। জানতেন তাঁর বাপের জীবন। তিনি চুপ করে ছিলেন। কি উত্তর দেবেন এর।

দেবেশ্বর ক'দিনের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন কীর্তিহাট।

স্ত্রীর কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন, হাতজোড় করে বলেছিলেন—আমাকে ক্ষমা কর।

স্ত্রী হেসেই সারা হয়েছিলেন। ক্ষমা ? কিসের ক্ষমা ?—বেটাছেলে আবার মেয়ের কাছে ক্ষমা চায়। তিনি শুনতেই চান নি কোন কথা। আপনার সেই ধরাবাধা জীবনের ছকের মধ্যে যথানিয়মে ঘুরেই বেড়িয়েছেন দিনরাত্রি। ভোরে উঠতেন—উঠেই গোবিন্দ-মন্দিরে। ফিরতেন গোবিন্দের ভোগের পর। তারপর অতিথিসেবা। বেলা চারটে পর্যন্ত বসে থাকতেন অতিথির জন্য। তারপর আহার। শুতেন রাত্রি বারোটার সময়।

দেবেশ্বর রায় চুপ করে বসে থাকতেন স্ত্রীর প্রতীক্ষায়।

স্ত্রী এসে তিরস্কার করতেন—এ তোমার কি কাণ্ড, কি ব্যাপার ? আমার উপর এ কি অত্যাচার শুরু করলে বল তো! কেন ? বেশ তো ছিলে। আমি তো কোন আপত্তি করি নি, বাধা দিই নি।—

দেবেশ্বর কথা বলতেন না—হাসতেন।

এরই মধ্যে রায়বাড়ীতে শিবেশ্বর বাধালেন বিরাট মামলা। রত্নেশ্বর রায়ের কাছারীতে আগুন দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার পথ না পেয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি—এমন সময় একটা খাসপতিতের উপর গোপথের অধিকার নিয়ে ফৌজদারী বেধে গেল। একসঙ্গে গোহত্যা, নরহত্যা দুই হয়ে গেল। ওয়ারেন্টের ভয়ে শিবেশ্বর আর তাঁর বড়ছেলে ধনেশ্বরকে গা-ঢাকা দিতে হল। দেবেশ্বরকে বাধ্য হয়ে কাছারীতে বসতে হল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন।

রত্নেশ্বর রায়ের খাস কাছারী—যে-ঘরটায় অতুলেশ্বর পিস্তলের কার্টিজ, বোমার সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা রত্নেশ্বর রায় বড়ছেলেকেই দিয়ে গেছেন—সেই কাছারীর বারান্দায় সন্ধ্যার সময় বসেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে তিনি যেন ফেটে পড়লেন—গেট আউট, গেট আউট আই সে—গেট আউট।

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকার এবং তার পরমুহূর্তেই সে-চীৎকার আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। না দেখেও সকলে বুঝতে পেরেছিল যে কোন একটা লোক ক্রুদ্ধ চীৎকার করে উঠেই পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে ছুটে পালাল। তারপরেই একটি নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার।

দেবেশ্বর রায়ের চাকর অনন্ত শুধু সাক্ষী ছিল।

দেবেশ্বর রায় সন্ধ্যায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলেন আর আপনমনে সুর করে ইংরিজীতে কিছু বলছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। সে আলো জ্বালতে গিয়েছিল ভিতরে। হঠাৎ বড়বাবু চীৎকার করে উঠেছিল—Get out, Get out I say—Get out. তার চেয়ারের ঠেসানের পিছনে ঝুলিয়ে রাখা ছিল তাঁর মালাকা বেতের শখের ছড়িটা, সেই ছড়িটা টেনে নিয়ে তিনি আথালি-পাথালি পিটছিলেন একটা ফিরিঙ্গিকে। লোকটা প্রথমটা গর্জন করে উঠে হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল এই ছড়িগাছটা কিন্তু তা পারে নি। না পেরে আর্ত চীৎকার করে ছুটে পালাল। তার সঙ্গে ছিল একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে। সে-মেয়েটা কাতর আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়েছিল বারান্দার উপর।

নিমাই এসে পাথরের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওদিকে কাছারীর কর্মচারী ও লোকজন সকলে দূরে শুব্ধ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরুষটার চীৎকারের সঙ্গে নারীকণ্ঠের চীৎকার শুনে তারা থমকে গেছে।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেবেশ্বর রায় কঠিনস্বরে তাকে উঠতে বলেছিলেন—সে-আদেশ সে অমান্য করতে পারে নি। উঠে মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় ডেকেছিলেন—নিমাই।

মৃদুস্বরে নিমাই বলেছিল—হুজুর।

—যা, উপরে আমার ঘরে বাবার মৃত্যুর পর যে-হুইস্কির বোতলটা তুই আমার সামনে ধরেছিলি, সেটা আলমারিতে রয়েছে। আজ যেন চোখে পড়েছে আমার। সেটা নিয়ে আয়।

—আজ্ঞে।

—যা, সেটা নিয়ে আয়। আর গ্লাস।

দীর্ঘ এক বছরের উপর সময়ের পর আবার সেদিন দেবেশ্বর রায় হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছিলেন।

বাধা কে দেবে? শিবেশ্বর-ধনেশ্বর মামলার ভয়ে কীর্তিহাট থেকে সরে গেছেন। দেবেশ্বরের ছেলেরা কলকাতায়। পারতেন এক স্ত্রী মাণিকবউ কিন্তু তিনি সন্ধ্যায় তখন গোবিন্দজীর মন্দিরের বারান্দায় হাতজোড় করে বিগ্রহের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কথা বলছেন, কখনও হাসছেন, কখনও তিরস্কার করছেন। নিমাই তাঁর কাছে গিয়েও ছিল, খবরও দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেন নি নিমাইয়ের কথা।

নিমাই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছিল। বাবুকে ফেলে ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে মা-ঠাকরুণকে সমস্ত বুঝিয়ে বলবার মত সময় তার ছিল না। ফিরে এসে নিমাই চমকে উঠেছিল। বাবু কই? হুজুর?

বারান্দা শূন্য, ঘর শূন্য, দেবেশ্বর রায় নেই।

কোথায় গেলেন?

—হুজুর! বড়বাবু!

কাছারী সচকিত হয়ে উঠেছিল। সে কি? কোথায় গেলেন? বড়বাবু, দেবেশ্বর রায়, যিনি পাহাড়ের মত অটল, তিনি কোথায় গেলেন? কোথায় যাবেন। কাছারী থেকে হারিকেনের আলো হাতে হিন্দুস্থানী চাপরাসীরা ছুটেছিল। দেখতে দেখতে গোটা গ্রামটা সচকিত হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে রায়বাড়ী কীর্তিহাটে হলেও কীর্তিহাটই ছিল রায়বাড়ীর মধ্যে। রায়বাড়ীর এলাকার বাইরে গ্রামের বসতি সে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার সঙ্গে রায়বাড়ীর সম্পর্ক ছিল মৌজা এবং লাটের সম্পর্ক। তার বেশী কিছু নয়। সম্পর্ক ছিল খাজনা দেওয়া-নেওয়ায়, সম্পর্ক ছিল অনুমতি গ্রহণের; গাছ কাটবে তার অনুমতি, ঘরের বনিয়াদ কাটবে তার অনুমতি, বিয়ের অনুমতি, শ্রাদ্ধের অনুমতি, তাছাড়া জীবনের প্রতি পদে নানা অনুগ্রহের অনুমতি, নেবার জন্য। তাছাড়া অনুগ্রহ, সে অনেক, সে পদে-পদে, অন্নপ্রাশনে, বিয়েতে, পৈতেতে—মাছ চাই, কাঠ চাই, কন্যাদায়ে অর্থও চাই। পিতৃদায়ে-মাতৃদায়ে—বাঁশ, কাঠ, মাছ, অর্থ চাই। প্রয়োজন হলে বিয়েতে রায়দের গাড়ী চাই। এছাড়া ইদানীং শিবেশ্বর শখের থিয়েটার খুলে রিহারসালরুমে একটা প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন

গ্রামের কিছু লোককে। সে অল্প কিছু। আজ কথাটা দেখতে দেখতে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র চেহারা নিয়ে। কে রটালে, কার কল্পনা কেউ জানে না, বললে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অশরীরী একটা পুরুষ আর একটা নারী, একটা প্রেত আর একটা প্রেতিনী বড়বাবুকে টেনে নিয়ে গেল।

গোটা গ্রামের মানুষের গুঞ্জন একটা কলরব সৃষ্টি করে তুলেছিল। পথে পথে আলো আর মানুষ। মানুষ আর আলো। কংসাবতীর তটভূমির জঙ্গল ভেঙে ভেঙে খোঁজ শুরু হয়েছিল।

—বড়বাবু! হু-জু-র! ব-ড়-বা-বু!

শেষ প্রায় রাত্রি দুপুর নাগাদ দেবেশ্বরকে পাওয়া গিয়েছিল কাঁসাইয়ের গর্ভে বালুচরের উপর। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দেহের তাপ প্রবল। যেন পুড়ে যাচ্ছে। ধরাধরি করে তুলে এনে তাঁকে শুইয়ে দিয়েছিল তাঁর বিছানায়।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলেছিলেন কিন্তু দৃষ্টি বিহ্বল বিকারগ্রস্ত। চীৎকার করে উঠেছিলেন—গেট আউট, গেট আউট! গেট আউট আই সে। শাট দি ডোর। শাট দি ডোর!

রাত্রি দুপুরের পর মাণিকবউ দেবতাকে শয়ন করিয়ে অন্দরে এসে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কি হল?

কিন্তু উত্তর শোনেন নি। এসে শিয়রে বসে স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে ডেকেছিলেন—বড়বাবু! বড়বাবু! বড়বাবু গো! বড়বাবু! কথা বল। বড়-বাবু!

কিন্তু বড়বাবুর চেতনা আর ফেরে নি।

ওই এক কথাই তিনি বলেছেন শেষ পর্যন্ত। গেট আউট। আর, শাট দি ডোর!

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, জোন্স ভায়লেটকে নিয়ে কীর্তিহাট পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল সে-কথা নিশ্চয় বলতে হবে না। জোন্সকেই দেবেশ্বর রায় আথালি-পাতালি বেত দিয়ে মেরেছিলেন।

জোন্স পালিয়েছিল সেই রাত্রেই। তার ভয় হয়েছিল—হয়তো বা তাকে খুন করেই ফেলবে রায়বাবু। গোয়ানেরাও তাই বলেছিল তাকে। সে পালিয়েছিল কিন্তু ভায়লেট পালায় নি। সে ছিল। রায়বাবুর মৃত্যুর পর ভায়লেট ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলে সেই যোগিনীর ঘরের ভিতর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ওখানটায় কল্কে ফুলের গাছ আছে প্রচুর। কল্কেফুলের বীজ বিষ, ওটা শিখেছিল অবশ্য এখানে এসেই। সে-কথা ভায়লেট ভুলে যায় নি।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অর্চনাকে দেখে সেদিন আমি অদৃষ্টকে মেনেছিলাম। অর্চনা বিধবার বেশে বসেছিল। আমাকে দেখে কাঁদে নি। পাথরের মূর্তির মত শুকনো চোখে বসেছিল সে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অর্চনা।

সুরেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—তার সঙ্গে সুলতাও। সুরেশ্বর বললে—এত বড় দুঃখ আমি বাবার মৃত্যুসংবাদেও পাই নি। বরং চন্দ্রিকাকে নিয়ে যখন তিনি বম্বে থেকে চলে যান, তখন খবর পেয়ে এমনি ধরনের আঘাত পেয়েছিলাম। তবুও সে-আঘাতের পরিমাণ এর থেকে কম। তাতে বাবার মৃত্যু-সংবাদ ছিল না। এতে একসঙ্গে দুটো। যদিও রথীনের মদ খাওয়ার কথা আমি মেদিনীপুর যাবার আগে জেনে গিয়েছিলাম এবং নারীসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কিছুটা সন্দেহও আমার হয়েছিল। একটা নার্স নিয়ে প্রণবেশ্বরদাদার সঙ্গে ওর সঙ্গে ওর আলাপের কথাও আমার কানে এসেছিল। অনুশোচনা আমার তখনই হয়েছিল কিন্তু হাত তো আর কিছু ছিল না। ১৯৩৬-৩৭ সালে হিন্দুর ঘরে ডাইভোর্স দূরের কথা, স্বামীর দুষ্ট চরিত্রের জন্য স্বামী ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের দৃষ্টান্তও দু-চারটের বেশী ছিল না। তাছাড়া কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর মেয়ে। এবং যে-মেয়ে অবিকল তার বৃদ্ধ পিতামহী সতীবউরানীর মত দেখতে। রায়বাড়ীর প্রবীণদের বিশ্বাস—সতীবউরানীর সে-জন্মে ভোগ করে আশ মেটে নি, তাই এ-জন্মে ভোগ করতে এসেছিল।

সতীবউরানীর ভোগ-আকাঙ্ক্ষার ভাগ্য, আর রায়বাড়ীর ভাগ্য। ভরাভর্তি রায়বাড়ী যিনি এসে সারাজীবন তপস্যা করলেন, সারাজীবন সন্ন্যাসিনী সেজে থাকলেন। বাক্সে ভরা রইল বেনারসী শাড়ী, মুরশিদাবাদের গরদের শাড়ী, বসোয়া বিষ্ণুপুরের গরদ তসরের শাড়ী, ঢাকাই বালুচরী ফরাসডাঙা শান্তিপুরের শাড়ীর বোঝা সিন্দুকে তোলা রইল—মণিমুক্তো-হীরে-জহরতের জড়োয়া গহনা, খাঁটি পাকাসোনার ভারী ভারী গহনা—তপস্যা শেষ হলেও আর গায়ে পরলেন না। ফুলেল তেলের বোতল গড়াগড়ি গেল, চুলে মাখলেন না, বিলিতী খাঁটি ফরাসী দেশের সেণ্ট-ল্যাভেণ্ডারের বাহারে শিশি, দামী আতরের পলাকাটা শিশি আলমারিতে সাজানো রইল, কোনদিন মাখলেন না; তিনিই যদি রায়বাড়ীর যে আমলে বেনারসী সিল্ক দূরে থাক, তাঁতের শাড়ীর সাধ মেটে না, এমন কি মিলের শাড়ীও সময় সময় সেলাই দিয়ে পরতে হয়, হাতে সোনার পাত-মোড়া লোহা পিতলের চুড়ি পরতে হয়, সেই আমলে ভোগের জন্য পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন, তবে তার ভাগ্য ছাড়া কাকে দোষ দেব বল?

অর্চনাও সেদিন এ-ঘটনাকে ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। আমিও তাই মানতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঠিক যেন পারি নি। দোষটা নিজের ঘাড়ে পড়ছিল। বার বার মনে হয়েছিল, ধনেশ্বরকাকার স্ত্রী জনাইয়ের কাকীমার দেওয়া সন্ধান পেয়ে আমি ছুটে এসেছিলাম, এসে অন্নপূর্ণা-মাকে পেয়ে তাঁর সাজানো সংসার দেখে ডাক্তার-ছেলেটিকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আর খোঁজ করলাম না। তার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। টাকাকড়ির দিক থেকে সুবিধে করতে যাই নি, খরচ আমি অনেক করেছিলাম। এবং এই বিয়ের ব্যাপারটা না ঘটলে অন্নপূর্ণা-মা জানবাজারের বাড়ী আসতেন না। আর কুইনী এবং হলদীকে দেখে আমার পিতামহ তাঁর দেবু

ভাইপোর অপরাধ, তাঁর যৌবনের ভুলের পাপমোচনের কথাও তাঁর মনে হত না। সেটা এমন ভাবে মনে পড়েছিল যে, তিনি এলিয়ট রোডের বাড়ী খালাস করাটা অর্চনার বিয়ের পণের মধ্যে ধার্য করেছিলেন। তাতেও আমি অমত করি নি। বিয়েতে রথীন প্রথম অমত করেছিল, অন্নপূর্ণা-মা জোর করে তাকে রাজী করিয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় জ্যাঠামশাই আমার স্নেহের অপব্যাখ্যা করে বেনামী চিঠি দিয়েছিলেন, অন্নপূর্ণা-মা তাও অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি অগ্রাহ্য না করলেই ভাল করতেন।

হঠাৎ থেমে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—মাঝখান থেকে একটা কথা বলে নিই সুলতা, কথাটা ১৯৩৭ সালের নয়—কথাটা যুদ্ধের সময়ের বছর কয়েক পরের। জ্যাঠামশায় মৃত্যু-শয্যায় তখন। আমাকে ডেকেছিলেন। তাঁর দুই ছেলেই তখন ওয়ার-কণ্ট্রাক্টের নামে যত হীনতম কাজ হতে পারে তা করছে। রোজগার যথেষ্ট করত কিন্তু বাপকে দেখতো না। সে-সময় তিনি নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়ে আমাকে ডেকেছিলেন টাকার জন্যে। সে-সময় পাঁচটা কথার মধ্যে বলেছিলেন—অর্চনা সম্পর্কে বেনামী চিঠি লিখেছিলাম, তার জন্য তখন অনুশোচনা হয় নি, আজ অনুশোচনা হচ্ছে। কিন্তু কি জানিস—আমি তোদের দুজনের যে ভাইবোনের ভালবাসা এটা সহোদর-সহোদরা হলেও আমার মনে সন্দেহ জাগাতো। তাছাড়া আমার একটা রাগ ছিল, আক্রোশ ছিল—কঠিন আক্রোশ। ধনেশ্বর আর জগদীশ্বর দুই ভাই আমার মাকে ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে দেয় নি—বলেছিল, তোমার জাত গেছে জ্যাঠাইমা, তুমি ঠাকুরবাড়ী ঢুকো না! আমি তার শোধ নিয়েছিলাম। সেটা আমি ভুলি নি। জমিদারের বাচ্চা আমি, ব্যবসাদার হতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি কিন্তু জাত যায় নি, জাতে সেই গোখরোই আছি—ডোরাদার বাঘই আছি, রাগ আমরা ভুলিনে। তবে মেয়েটা সতীবউরানীর মত দেখতে, তাই দুঃখ হয়। আজ হচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলে সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর আবার বললে—ঐ কথাটা আগেও তো বলেছিলেন জ্যাঠামশাই, যখন এলিয়ট রোডের বাড়ীর দরুন পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে নেন। সেদিন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করেছিলাম অর্থগৃধ্নুতা। কিন্তু বিধবা অর্চনাকে দেখে সেদিন মনে হল অর্চনার ভাগ্য।

পরের দিন ফিরে এলেন রথীনের বাপ। মানুষটি অসীম ধৈর্যশীল মানুষ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হতে যেসব ধীর-স্থির মানুষ, আনন্দ-বেদনা-উল্লাস-দুঃখ নিঃশব্দে অভিব্যক্তিহীন মুখে শুকনো চোখে সয়ে গেছেন, তাদেরই দলের মানুষ।

বিবরণ তাঁর কাছে জানলাম, সংক্ষেপে জানালেন তিনি। একান্ত অপরাধীর মতই জানালেন—দেখ সুরেশ্বর, ঠাকুরমা আজ নেই, তিনি খবর পেয়ে বাঁচবেন না এ আমি জানতাম; টেলিগ্রামে খবরটা সেই উদ্দেশ্যেই জানিয়েছিলাম। যদি এই খবরটা শব্দভেদী বাণের মত তাঁর বুকে বিঁধে প্রাণটা বেরিয়ে যায় তো যাক। তিনি যেন সব খবর না-শোনেন না-জানতে

পারেন। অথচ আঘাতটা পান।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হয়েছে, তিনি সব না-জেনেই চলে গেছেন। জেনেশুনে গেলে সে তাঁর পক্ষে বড় মর্মান্তিক হত। অনেক অহঙ্কার করে তপস্যা করার মত কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি শ্বশুরবাড়ী বাপের বাড়ী দুই কুল ছেড়ে নিজের কুল নিজে গড়ে এই বাড়ীর পত্তন করেছিলেন। ছেলে, নাতি, তারপর তাদের ছেলেদের নিয়ে তাঁর অহংকার ছিল, প্রচণ্ড অহঙ্কার, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনের চারখানি চরণকমল তাঁর ঘরে অচঞ্চল হয়ে বিরাজ করছে। বলতেন—আলতারাঙা চারখানি পা আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই—পদ্মের উপর রেখেছেন তাঁরা। কিন্তু তিনি জানতেন না, শুধু রথীন নয়, রথীনের আগে থেকেই এ বাড়ীর ধারা পাল্টেছে। কালের হাওয়ায় সব পাল্টে গেছে। লক্ষ্মীর আটন গেছে, সরস্বতীর পিঁড়ে গেছে; লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভোল পাল্টেছে। এ-বাড়ীর ছেলেদের চরিত্র গেছে। মদ ঢুকেছে, তার সঙ্গে—।

কথাটা এই সুলতা যে, রথীনের ছোটকাকা গোপনে মদ খেতেন। রথীন ডাক্তারী পড়তে গিয়ে পড়ার সময় থেকে ভাইনাম গ্যালেসিয়া থেকে শুরু করেছিল। হাসপাতালে নার্সদের কাছে সে নিজে আকর্ষণের মানুষ ছিল—নার্সরাও কেউ কেউ তাকে আকর্ষণ করত।

১৯৩০ সালের পর থেকে কালটা অতিবিচিত্র। তার সংজ্ঞা বা তার স্বরূপ তোমার জানা সুলতা। রথীনের কাছে জীবনের চরিত্রের মূল্য কিছু ছিল না। কিন্তু সে-কথা সে সত্য হিসেবে ঘোষণা করে বলে নি কোনদিন—ক্লেভারলি সে এ-সত্য গোপন করে চলে এসেছে, চালিয়ে এসেছে। কেউ ধরতে পারে নি। সেদিন মানে যেদিন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর আসি, সেইদিন শুধু আমি অনেক রকম ওষুধের গন্ধে ঢাকা-দেওয়া মদের গন্ধটাকে তার মুখের পান-জর্দার গন্ধের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেছিলাম। আমি চিনতাম গন্ধটাকে, তাই আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে খটকাও বেধেছিল—'অর্চনা এটা সইতে পারবে তো?' জানতে সে পেরেছে এতে সন্দেহ আমার ছিল না, কিন্তু সইতে কতদিন পারবে বা এ নিয়ে তার সঙ্গে এরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়েছে কিনা বুঝতে পারি নি।

মেয়েরা দুর্জ্ঞেয় সুলতা। তাদের প্রকৃতিটাই অন্ধকারের মত, যতই উজ্জ্বল আলো জ্বালো, তার সবটা আলোয় স্পষ্ট হবে না, আলোর ঠিক নিচেটাতেই জমা করে রাখবে আপনার আসল স্বরূপকে।

নারী-প্রকৃতির আদিম স্বরূপ নাকি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রির অন্ধকারকে একসঙ্গে জমিয়ে তৈরী হয়েছে। ওকে জানা যায় না। নারীও বোধ হয় নিজেকে নিজে জানে না। আয়না না হলে মেয়েদের চলে না, আজকাল ভ্যানিটি ব্যাগে ব্যাগে ছোট আয়না হাতে হাতে ফেরে। অল্প কিছুক্ষণ পর পর আয়না দেখে মুখে তারা পাফ বুলোয়। মোহের প্রলেপ

দিয়ে দেয় প্রলেপের স্তরের উপর। নিজের অন্তরের দিকটা থেকে সে মহারাত্রির মত নিবিড় অন্ধকার। সে জানে না সে কি চায়, সে বোঝে না কেন সে কাঁদে, কেন সে হাসে!

রথীনকে সে মানিয়ে নিতে পারবে? বুঝিয়ে আপন করে নিতে পারবে? আমার সেদিন আপসোস হয়েছিল, আমি অতুলেশ্বরদের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে অর্চনার সম্পর্কের কথাটা গোপন করেছি বলে। বলা আমার উচিত ছিল।

সন্দেহ আমার মিথ্যে হয় নি।

অর্চনার সঙ্গে রথীনের বিরোধ চলছিল এই নিয়ে। অর্চনা প্রকাশ করতেও পারত না—প্রকাশ্যে ঝগড়া করতেও পারত না; ভিতরে ভিতরে গুমরে গুমরে মরত। রথীন ওদিকে একজন এ্যাংলো নার্সের প্রেমে পড়েছিল।

রথীনেরও সন্দেহ ছিল অর্চনার উপর। জ্যাঠামশায়ের বেনামী পত্রের সন্দেহ। প্রণবেশ্বর-দাদার সঙ্গে তার আলাপ ছিল—ওই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ার আলাপ। রথীনের চেম্বারে পেশেণ্ট হিসেবে আলাপ। তার মধ্য দিয়ে সে একটা সত্য জেনেছিল। জেনেছিল—প্রণবেশ্বর বড় জমিদারবংশের ছেলে, এখন জমিদার থেকে তারা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছে, তাদের বংশে সাতপুরুষ ধরে এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন ভূষণ, এ-দোষটাও তেমনি তাদের জীবনের আভিজাত্যের পরিচয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে এত টাকা খরচ করে তার সঙ্গে অর্চনার বিয়ে দেওয়ার ভারটা নেওয়ার মধ্যে, আমার স্নেহের মমতার অপব্যাখ্যাও সে করেছিল।

সে নাকি বলেছিল—গেলা গেল না বলে ওগরাতে হল।

তাতে রথীন খুব বিচলিত হয় নি। কারণ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে কালের হাওয়ায় এমন স্তরে সে তখন উঠেছে, যেখানে বিবাহের পূর্ব-জীবনের পতনস্খলনগুলো নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনার মত; হয়তো বা আরও লঘু কিছু—পথে পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলো-কাদার দাগের মত—ধুয়ে দিলেই মুছে যায়, তার উপরেও যদি কিছু হয়, কেটেকুটে যায় এবং তাতে যদি সৌন্দর্যহানিই ঘটে, তবে প্লাস্টিকসার্জারি আছে, তাতে শুধরে যাবে। এরপরও জীবনের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে; সে-দিগন্তে নারীও স্বাধীন, পুরুষও স্বাধীন—কেবলমাত্র গৃহের বন্ধন-টুকু স্বীকার করে পরস্পরকে মেনে নিয়ে যায় যা খুশি সে তা করে বা করতে পারে। কিন্তু খুব সহজ নয়, এবং সহজ হয়ও নি রথীনের পক্ষে। সে নিজের বেলা হাসপাতালে নার্সিংহোমে নার্সদের সঙ্গে কাজও করেছে, আবার অন্তরঙ্গতার চর্চাও করেছে কিন্তু বাড়ী এসে অর্চনাকে প্রশ্ন করেছে—বল, তোমার জীবনের কথা বলো। স্বীকার করো। আমি তা মেনে নেব। কারণ আমার জীবনেও পতনস্খলন হয়েছে। দু'-চারটে গল্পও বলেছে; এবং পাল্টে বলেছে—এবার তোমার কথা বলো।

অর্চনা বাঁচবার জন্য আঁকড়ে ধরেছিল অন্নপূর্ণা দেবীকে। অহরহ তাঁর কাছেই থাকত।

তিনিও তাঁকে চাইতেন এবং অর্চনা তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল বলে আনন্দের তাঁর সীমাও ছি না। ভাবতেন—তাঁর মা পুনর্জন্ম নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন তাঁকে যত্ন করতে। তাঁ শৈশবাবস্থায় যে যত্ন তাঁর মায়ের কাছে পাওনা ছিল, সেটা তাঁর মা দিতে এসেছেন তাঁর এ বৃদ্ধ বয়সে। এবং বলতেন—মরে আবার তোর পেটেই ফিরে আসব। এবার খুব যত্ন করি

আশী বছর বয়সে অন্নপূর্ণা-মায়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল, তিনি অর্চনার মুখ বোধ হয় ভা করে দেখতে পেতেন না, পেলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতেন—হ্যাঁরে অর্চি-মা, কি হয়েছে রে মুখখানা এমন ধোঁয়াটে আকাশের মত কেন রে?

ব্যাপারটা কিন্তু রথীনের বাপ-মা জানতে পেরেছিলেন। অবশ্য সত্ত সত্ত জেনেছিলেন ভাবছিলেন কি করবেন? অর্চনা সম্পর্কে তাঁরা খোঁজখবরের বাকি রাখেন নি। এবং অর্চন সম্পর্কে খোঁজখবর করে সন্তুষ্ট হয়েই নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন যে, এ-মেয়ে নিশ্চয় রথীনকে ফেরাবে

ফেরাতে হয়তো পারত। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর জন্যেই তা ঠিক হয় নি। অন্নপূর্ণা দেই কেড়ে নিয়েছিলেন অর্চনাকে এবং অর্চনাও পালিয়ে এসে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল রথীনে জেরার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে।

ফাইনাল ইয়ারে প্রথম ওর মা জানতে পেরেছিলেন, মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলেন। কি এ-যুগটা cleverness-এর যুগ, truth, sincerity এসবই বাতিল হয়ে গেছে সুরেশ্বর আমরা যারা এগুলোকে মানি, তারা অধিকাংশই লড়াই করে হেরে যাচ্ছি। দু-চারজন চারজনই বা কোথায়—চোখে তো পড়ছে দুটি মানুষ, বাংলাদেশে অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ আ বাংলার বাইরে মহাত্মা গান্ধী, তাঁরা হেরেও হার মানতে চাচ্ছেন না। চীৎকার করে সত্যে সততার জয় ঘোষণা করে যাচ্ছেন। পৃথিবী হয়তো হাসছে। তারা অঙ্ক কষে মাপজোখ করা cleverness দিয়ে মানুষের জীবনের গতির মোড় ফেরাতে চাচ্ছে, ফেরাচ্ছেও।

একটু হেসে বলেছিলেন—বলতো, রবীন্দ্রনাথ এখন বিরাট পুরুষ, তাঁর শান্তিনিকেতন তাঁ নিজের হাতে বুকের রক্ত ঢেলে গড়া প্রতিষ্ঠান, সেখানে তাঁর অবর্তমানে অন্তত পরের মানু না-আসা পর্যন্ত কালটা চালাবার কেউ আছে!

গান্ধীজী? তাঁর সম্পর্কেও সে কথা সুরেশ্বর। তাঁর পর তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা অব্যাহত রাখবে কে?

শোকার্ত নগেনবাবু বলেছিলেন—কেউ বলে জওহরলাল, কেউ বলে সুভাষচন্দ্র, কেউ বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ। একজন বললেন—সকলে মিলে। অঙ্ক কষে ওটা বলা চলে সত্য। বস্তু জগতে গান্ধীজীর যে কাজ, তা এঁরা চালাতে পারবেন কিন্তু ভাবজগতে তা পারবেন না। তা হয় না। এ কালের পরিবর্তন।

বললাম তো, আমার ছোটভাই মদ ধরেছে। জানতে যখন পারলাম তখন দেরি হয়ে গেছে। বললে—স্বাস্থ্যের জন্য খাই, বড্ড খাটুনি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে।

তারপর রথীন। হেসে রথীনের বাবা বললে—সে ডাক্তারী পড়ত। নানারকম ওষুধের গন্ধ দিয়ে মদের গন্ধ ঢেকে রাখত। তার সঙ্গে বড্ড পান-জর্দা আর সিগারেট। ডিসেকশন করবার সময় গন্ধ লাগে এই অজুহাতে সিগারেট ধরেছিল। আমরা মেনে নিয়েছিলাম। ধরতে পারি নি—সতর্ক হই নি ; ভাবি নি সিগারেট-জর্দা না খেয়েও অনেকে ডিসেকশন করে। কাল এমনি করেই প্রতারণা করে। আমাদের কালে সিগারেটেও দোষ ছিল। আমি, আমার মেজভাই পর্যন্ত খাই নি। মেজ অনেক বয়সে ধরেছে। ছোট তারপর রাত্রে খাওয়ার আগে ঘরে ব্র্যাণ্ডি খায়।

নর-নারীর প্রেম বৈধ-অবৈধ—এ চিরকাল আছে। সংজ্ঞা অবশ্য কালে-কালে পাল্টায়। কিন্তু একালে সব মিথ্যে হয়ে গেছে। শুনে আশ্চর্য হবে সুরেশ্বর যে রথীন বৌমাকে বিয়ে করার আগেই একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স মেয়েকে বিয়ে করে তাকে বিলেতে মেট্রন ট্রেনিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে, টাকা যোগাচ্ছে। এবার সে নিজে পালাচ্ছিল বিলেত। এবং তার জন্যে সে বৌমার গহনা, তার মায়ের গহনা বিক্রী করে হাজার-তিরিশেক টাকা নিয়ে বম্বে পর্যন্ত পৌঁচেছিল। বৌমাই সেটা প্রথম জানতে পেরেছিল। আমরা জানতাম কি কাজে সে বম্বে যাচ্ছে। বৌমা ঠাকুমাকে বললে—ঠাকুমা কপাল চাপড়ে আমাকে ডেকে বললেন—যা গিয়ে দেখ, ধরে নিয়ে আয়। আমি গেলাম। ধরতেও পেরেছিলাম। জাহাজখানা ঠিক দিনে ছাড়ে নি। খুঁজে-পেতে ধরে ওকে নিয়ে এলাম হোটেলে। মাথা হেঁট করেই এল। হঠাৎ বললে—বাথরুম থেকে আসি। ঢুকল ; মিনিট-দুই পরেই ফায়ারিং-এর শব্দ।

* * *

বড় আঘাত পেয়েছিলাম সুলতা। নিষ্ঠুর আঘাত। অর্চনাকে সত্যিই নিজের সহোদরার মত ভালবেসেছিলাম। ভাবছিলাম এ কি হল? ভাবছিলাম, এরপর ওর কি হবে? কীর্তিহাটে মেজদিকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, সেখান থেকে হিলডা কুইনীকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, তাদের উপর অত্যাচার করছে লোকে, বিশেষ করে ধনেশ্বরকাকার ছেলেরা, যজ্ঞেশ্বরকাকার ছেলেরা—তাদের উত্তেজিত করছেন স্বয়ং ধনেশ্বরকাকা, জগদীশ্বরকাকা ; আমি কুইনীকে হিলডাকে বলেছি, আমি ফিরে গিয়ে ওদের বুঝিয়ে বলব। যদি তারা আমার কথা শোনে তবে ভাল ; যদি না শোনে তবে সেই কথাই তোমাদের জানিয়ে দিয়ে বলব—এবার তোমরা যা-খুশি করতে পার। কিন্তু সেসব মনে করেও কলকাতা থেকে নড়তে আমি পারি নি। এই বাড়ীতে শুধু ঘুরেছি আর ভেবেছি।

এ কি করলাম একটা ভ্রান্ত আবেগবশে! অর্চনার চেহারার সঙ্গে ভবানী দেবীর চেহারার মিল আছে বলে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলের হাতে তুলে দিলাম। নিজেও তো বিশ্বাস খানিকটা করেছিলাম ওই কথাটা। অন্যত্র বিয়ে দিলেই তো হতো। জগদীশ্বরকাকা তাঁর

সম্বন্ধীর সম্বন্ধীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। সে দ্বিতীয়পক্ষ এবং সাব-ইন্সপেক্টর বা অর্চনা কেঁদে বলেছিল, আমি মরব বিষ খেয়ে। কিম্বা নিজে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেব বলব সকল কথা খুলে। সুতরাং ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কাকে দোষ দেব ?

এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন জগদীশ্বরকাকা। এলেন সস্ত্রীক। উঠলেন আমার এ বাড়ীতেই। সগুবিধবা কন্যার বাড়ীতে উঠতেই ইচ্ছে ছিল তাঁর কিন্তু খুড়ীমা তা হ দেন নি।

খুড়ীমা এসেছিলেন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। কিন্তু জগদীশ্বরকাকা এসেছিলে রথীনের সম্পত্তির খোঁজখবর নিতে।

রথীনের ইন্সিওরেন্স ছিল কিন্তু সে-পলিসি লণ্ডনবাসিনী স্ত্রীকে দেওয়া ছিল।

জগদীশ্বরকাকা ফিরে এসে আমাকে বললেন—আমার কি সর্বনাশ করেছ তুমি জান ?

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব ? অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

জগদীশ্বরকাকা বলেছিলেন—তুমি জান রথীন অর্চনাকে বিয়ের আগে একটা ফিরি মেয়েকে—

বলেছিলাম—আপনার মতই সেদিন রথীনের বাবার কাছে শুনেছি। এবং তাঁরা জেনেছেন রথীনের মৃত্যুর পর।

জগদীশ্বরকাকা চীৎকার করে উঠেছিলেন—খুন করে হাম্ ফাঁসি যায়েগা। হাম জগদীশ্ব রায় হ্যায়। কোইকো খাতির হাম নেহি করতা হ্যায়।

আমি কোন কথাই বলতে পারি নি। প্রতিবাদ দূরের কথা। বরং ভাবছিলাম জগদীশ্বর কাকা যদি আমার ওপর আঘাত করেন তো নিজের কাছ থেকে গ্লানি হতে পরিত্রাণ পাই কিন্তু জগদীশ্বরকাকার স্ত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন—ছি-ছি-ছি! তোমাকে ছি রায়বংশ! রায়বংশের জয়ধ্বজা! বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর! কেন ওকে গাল দিচ্ছ ? কি করেছে ও ? টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, এই ওর অপরাধ ?

সুলতা, জগদীশ্বরকাকা চিরদিন খুড়ীমাকে নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করেছেন। নিষ্ঠু কদর্য ভাষায় গালাগাল করেছেন। দুটো কথা তাঁর মুখে প্রায় লেগেই থাকত। হারামীর বাচ্চা হারামী আর বাঁদীর বেটী বাঁদী। শেষটা অভ্যাস করেছিলেন খুড়ীমার ওপর কথাটা প্রয়োগ করে করে। সেদিন তার একটাও বের হয় নি জগদীশ্বরকাকার মুখ থেকে।

আমার দুই কানের চারিপাশে খুড়ীমার একটা কথা বেজেই চলেছিল—বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার উপর ? বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর ? বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর ?

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে একটু হাসলে সুরেশ্বর। তারপর বললে—জান সুলতা! সেদিন একটা হিসেব করেছিলাম। বিচিত্র হিসেব। হিসেবের শুরু হল—রায়বংশের শু

থেকে আমি পর্যন্ত সাতপুরুষের মধ্যে জয়ধ্বজা উড়িয়ে সবার সামনে দাঁড়াবার মত কেউ ছিলেন ?

হ্যাঁ, জমিদার হিসেবে ছিলেন, কয়েকজনই ছিলেন। খেয়ালী-বিলাসী হিসেবেও ছিলেন। দাতা হিসেবেও ছিলেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে ? রত্নেশ্বর রায়কে প্রণাম করে বলেছিলাম—শুধু তুমিই ছিলে। তোমার অত্যাচার তোমার শোষণ-শাসন সত্ত্বেও এক তুমিই ছিলে রায়-বংশের জয়ধ্বজার মানুষ—আর কেউ না। তবে হয়তো একালে তাও নাকচ হয়ে যাবে, কারণ তুমি রায়বংশের আয়কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ষাট হাজার টাকা বৃদ্ধি করেছিলে। কুড়ারাম রায়ের দেবকীর্তির কালও গেছে।

হঠাৎ চিন্তাটা রায়বংশ ছেড়ে গোটা বাংলাদেশের সমস্ত জমিদারবংশ খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন কিন্তু মুহূর্তে মাথাটা নত হয়ে গিয়েছিল।

সুলতা সেটা ১৯৩৮ সাল।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে। অবনীন্দ্রনাথও বেঁচে। কেষ্টনগরের চৌধুরী বংশের প্রমথ চৌধুরী জীবিত। কিন্তু সব প্রাচীন। নূতন কালের উজ্জ্বল মানুষের মধ্যে একজনকেও পাই নি যার কপালে জমিদারবংশের ছাপ মারা আছে। অপরিসীম বিস্ময় বোধ করেছিলাম। জমিদারবংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ জন্মালেন কি ক'রে ? রাশিয়াতে জন্মেছিলেন 'টলস্টয়'। কাউণ্ট টলস্টয়। ঋষি টলস্টয়।

*   *   *

সেদিন কোথাও কোন সান্ত্বনা পাই নি সুলতা, হতাশায় আক্ষেপে যেন ভেঙে পড়েছিলাম। দুঃখ যেটা অর্চনার জন্যে অনুভব করেছিলাম, সেইটে—ওই জগদীশকাকার কুৎসিত কথা আর খুড়ীমার এই ক'টা কথা—"বজ্রাঘাত হয় না ওই জয়ধ্বজার উপর" আমাকে যেন পাগল করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল—রায়বংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভাল।

আবার মনে হয়েছিল—বাঁচতে হবে। যা হয়েছে তা হয়েছে, আমি বাঁচব। আমি কীর্তিহাটের সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচব।

ঠিক এই মুহূর্তে রঘুয়া চাকর এসে বলেছিল—দিদিমণি আইলেন।

—দিদিমণি ? চমকে উঠেছিলাম।

—অর্চনা-দিদিমণি !

অর্চনা এসেছে ? বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম অর্চনার শ্বশুর তাকে নিয়ে এসেছেন এ-বাড়ী। এসেছেন আমার কাছে। জগদীশ্বরকাকা সকালে দাবী জানিয়ে এসেছিলেন মেয়েকে তিনি বাড়ী নিয়ে যাবেন। রথীনের দরুন যা তার পাওনা তা অর্চনার অভিভাবক হিসেবে তাঁকেই বুঝিয়ে দেওয়া হোক। এবং অর্চনার ভরণপোষণের জন্ম মাসিক একটা খোরপোষের ব্যবস্থা করা হোক।

তাই তিনি অর্চনাকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছেন। কারণ এ বিয়ে দিয়েছিলাম আমিই। এবং আমাকে দেখেই তাঁরা আমার খুড়তুতো বোন বলে এবং অর্চনা অবিকল ভবানী দেবীর মত দেখতে বলে বিবাহ দিয়েছিলেন।

রথীনের বাপ বললেন—আমরা বউমার অভিভাবক হিসেবে তোমাকে জানি। জগদীশ্বর রায়কে জানি না। ওঁকে দেখলে এ বিয়ে হ'ত না। উনি যে দাবী জানিয়েছিলেন—বউমাকে সে সম্পর্কে মত জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি কোন উত্তর দেন নি। আমি ওঁকে এনেছি তোমার সামনে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। কথা নয় সুরেশ্বর—একটা দলিল করেছি, দেখ।

* * *

দলিলখানা পড়ে আমার মনে পড়েছিল আমার ঠাকুমার কথা। আমার ঠাকুমাকে কীর্তিহাটের ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকতে দেন নি এই জগদীশ্বরকাকা আর তাঁর দাদা ধনেশ্বর-কাকা। কলকাতায় তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন আমার জ্যাঠামশাই, আমার বাবা প্রতিবাদ করেন নি। করতে পারেন নি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্যে। ঠাকুমা কোন রকমে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। সেখানে স্বামীর ভিক্ষেমা, না, তাই বা কেন বলব সুলতা, বলব এক বৃদ্ধা বাঈজীর স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে তাঁর আশ্রমে স্থান পেয়েছিলেন। নইলে হয়তো ওই ঘরে বন্দী অবস্থায় মরতেন, না-হয় বৃন্দাবনে একলা পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে ভিক্ষে করতেন। তাঁর পৈতৃক দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁর বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় নিজের নামে নিজেদের নামে এনডোর্স করিয়ে নিয়েছিল। আমার বাবা নীরব ছিলেন, কিন্তু টাকার ভাগ নিয়েছিলেন।

আর এই ১৯০০ সালের ৩৭ বছর পর কাল এমন পাল্টেছে যে রথীনের বাবা যে দলিল করে এনেছেন তাতে অর্চনার জন্য মাসিক একশো টাকা মাসোহারা, তাছাড়া বছরে দুবার দেড়শো করে তিনশো টাকা মোট পনেরশো টাকার ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্য ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন। কিন্তু সে মূল টাকায় অর্চনার অধিকার থাকবে না। অর্চনার মৃত্যুর পর সে টাকা তাঁর অন্য উত্তরাধিকারীরা পাবে। যদি বর্তমান কালের ধারা অনুযায়ী অর্চনা বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী বা তিন আইন মতে বিবাহ করে, তবে অর্চনা এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাবে তার সংসার পাতবার জন্য; অবশ্য তারপর আর মাসোহারার অধিকারিণী সে হবে না।

ইচ্ছানুযায়ী সে পিত্রালয়ে বা হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ীতে থাকতে পারবে বা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রও থাকতে পারবে সে এবং সেক্ষেত্রে মাসিক তিরিশ টাকা পর্যন্ত বাড়ীভাড়া পেতে পারবে।

আমি বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর উদারতা দেখে।

অর্চনার শ্বশুর বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে বউমা আমার কাছেই থাকেন, পড়াশোনা

করেন ; এ অবস্থায় পড়াশোনাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আগে হলে দীক্ষা দিয়ে পুজো-অর্চনার পর ধরানো নিয়ম ছিল—এ যুগে শিক্ষা—। কিন্তু ওঁর কি মত তা উনি বলেন নি।

অর্চনা বরাবর এসে অবধি বসে ছিল পাথরের মূর্তির মত। সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বলেছিল—সুলতা, অর্চনা এখানে বসে আছে তাই বলছি নইলে রায়বাড়ীর জবানবন্দীর মধ্যে বাংলার নূতন যুগের শিক্ষিতসমাজের একটি উজ্জ্বল ঘরের লুকানো অন্ধকারের কথা প্রকাশ করতাম না। রায়বংশের ছবির সারির মধ্যে মুখুজ্জেবাড়ীর অন্ধকারের ছবি এখানে টাঙিয়ে দিতাম না।

সেদিন কথাটা অনুমান করতেও পারি নি। অর্চনাকেই দোষ দিয়েছিলাম। এদের বাড়ীটাও পচে গিয়েছিল।

অর্চনা নিজেই এবার বললে—আমি অনুমানে বুঝেছিলাম, ঠিক প্রমাণ তখনও পাই নি। তবে ভুল আমি করি নি। আলোর তলার অন্ধকার নয়—লণ্ঠনের উপরেও অন্ধকার জমে গোটা আলোটাকেই কালিপড়া লালচে আলোয় পরিণত হয়েছিল বাড়ীটা। ছ বছর পর ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের সময় আমার দেওরদের যে চেহারা দেখেছি ; সে চেহারার পত্তন ছ বছরের অনেক আগে হয়েছে। ওখানে থাকলে আমার নিষ্কৃতি ছিল না, সে যেন আমার অন্তর আমাকে বলে দিয়েছিল। ও বাড়ীতে থাকতে আমার সাহস হয় নি।

সুরেশ্বর বাধা দিয়ে বললে—থাক ওদের কথা। রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে ওইখানেই মানে রথীনের আত্মহত্যা আর অন্নপূর্ণা-মায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই ওদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। ওরা যা হয়েছে তা নিয়ে ওরা আছে। দুনিয়ার অন্তরাত্মা বলে একটা সত্তা আছে। তাতে আমি বিশ্বাস করি। মাটির বুকের মধ্যে তার উৎস, কিন্তু মানুষের বুকের ভিতরেই সে গঙ্গাধারা হয়ে বয়ে গেছে। আজ সে ধারা কীর্তিনাশা হয়ে না ভেঙেচুরেই দিক আর ভাগীরথীর মত সে মজেই যাক কাল আবার তার মোড় ফিরবে। নতুন চেহারা নেবে সে। সেই ভরসায় মানুষ বাঁচে। আমিও সেই ভরসায় বেঁচে রয়েছি, জবানবন্দী দিয়ে জমিদার জীবনের পালা শেষ ক'রে নতুন জীবন শুরু করতে চাচ্ছি। এখন জবানবন্দীর কথায় আসি। সুলতা যে কথা অর্চনা বলতে যাচ্ছিল সে বড় মর্মান্তিক। ওর শ্বশুরবাড়ীর কথা। ওর দেওরদের কথা, ওর খুড়শ্বশুরদের কথা। যুদ্ধের সময় ওরা ওয়ার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিল ; সে সময় কণ্ট্রাক্টররা যা করেছে তা বলবার প্রয়োজন নেই। সেটার আঁচ শ্বশুরবাড়ীতে মাস আষ্টেকের মধ্যেই অর্চনা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে সময় ভয় ছিল না, কারণ তখন অন্নপূর্ণা-মা বেঁচে-ছিলেন আর রথীনও তখন বেঁচে। রথীনের জীবনে পাপপুণ্য ছিল না, ধর্ম-অধর্ম ছিল না। কিন্তু অর্চনার উপর অধিকারের দাবী তার ছিল। বাপকে সে বম্বেতে বলেছিল—ভুল করেছি

রেজেস্ট্রী করে বিয়ে ক'রে, হিন্দুমতে দশটা বিয়েতে বাধা নেই—হিন্দুমতে বিয়ে করলে আমাকে মরতে হ'ত না। মা-মণির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়তো মাফ পেতাম।

যাক—। অর্চনা কীর্তিহাট ফিরল ওর বাবার সঙ্গে; জগদীশ্বরকাকা এবং ওর মা ওকে নিয়ে কীর্তিহাট ফিরলেন। আমি তার আগেই কীর্তিহাটে ফিরেছি এবং কীর্তিহাটেই নয়, আশপাশ চারিদিকের মানুষের কাছে রায়বাড়ীর জমিদারীর প্রজার কাছে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছি; হয়েছি গোয়ানদের সমর্থক হিসাবে এবং সেই সূত্রে ইংরেজ সরকারের সমর্থক হিসেবে।

মেদিনীপুরে কুইনী এবং হিলডা এসে অভিযোগ করেছিল—গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে। তারা তাদের উপর কংগ্রেসবিরোধী হিসেবে অত্যাচার করছে। আমি যদি এর প্রতিকার করি তো ভাল, নাহলে তারা মেদিনীপুরের ডি-এম-এর কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সেই কারণে কুইনী হিলডা খড়্গাপুরের মিসেস হাডসনকে নিয়ে এসেছিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, অনুরোধ করেছিলাম মিটমাটের চেষ্টা আমি করব এবং বোধ হয় মিটমাটও হয়ে যাবে; তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ—তোমরা অপেক্ষা কর।

অপেক্ষা তারা করেছিল। কুইনী হিলডা মেজদির সঙ্গেই কীর্তিহাট ফিরে গিয়েছিল আমি চলে এলাম কলকাতায় অর্চনার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পেয়ে।

সেই কারণেই আমি অর্চনা এবং জগদীশকাকাদের রেখেই কীর্তিহাট চলে এসেছিলাম। দেখলাম সারা অঞ্চলটার মানুষ ওই গোয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়ে তাঁদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোয়ানরা ভীত হয়েছে। কিন্তু নত হয় নি। তারাও প্রতিজ্ঞা করেছে তারা নত হবে না। তারা দেশের মালিক ভারতবর্ষের এম্পায়ারের সঙ্গে স্বধর্মাবলম্বী। কেন তারা নত হবে?

দুটো-চারটে ছোটখাটো ঝগড়াও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আমি কলকাতায় তখন, কুইনী হিলডা আমার প্রতিশ্রুতি পেয়েও তার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারে নি। গোয়ানদের নেত্রীত্ব করেছে কুইনী। ব্যাপারটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত যায় নি। কিন্তু এস-ডি-ও পর্যন্ত গিয়েছে এবং এস-ডি-ও সার্কেল অফিসারকে তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। জেলাটা মেদিনীপুর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তাণ্ডব শেষ হয়েছে মাত্র দু বছর আগে। সার্কেল অফিসার পুলিস রক্ষী নিয়ে এসেছিলেন তদন্তে। অভিযোগ এখানকার কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় তাদের বয়কট করা হয়েছে এবং নানাভাবে তাদের বিব্রত করা হচ্ছে। তারপর ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে কোন দিন কি অত্যাচার হয়েছে গোয়ানদের ওপর। সে ফিরিস্তি অনেক শুরু হয়েছে সিদ্ধাসন জঙ্গলে গোয়ানদের প্রবেশাধিকার থেকে। শেষ হয়েছে গোয়ানপাড়ার মেয়েরা এবং ছেলেরা কীর্তিহাটের স্কুলে জায়গা পায় না। এ ছাড়া অভিযোগ হয়েছে রায়বাড়ী ধনেশ্বরকাকার ছোটছেলে নবযুবক অরুণেশ্বর এবং সুখেশ্বরকাকার ছোটছেলে দীপকেশ্বরে

বিরুদ্ধে। তারা এই বয়কটের সুযোগে গোয়ানপাড়ার মেয়েদের উপর ঘৃণ্য অত্যাচার শুরু করেছে।

সাধারণের পক্ষে এসেছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি সেই বৃদ্ধ রঙলাল ঘোষ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন কুইনীকে যে, কোন অন্যায় কীর্তিহাটের লোকে স্বীকার করে না। কীর্তিহাটে থেকে যারা কীর্তিহাটের লোকেদের সমর্থিত প্রার্থীকে সমর্থন করবে না তাদের সঙ্গে কীর্তিহাটের লোকের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ঘরে আগুন তারা লাগাবে না এটা নিশ্চিত কিন্তু তাদের ঘরে আগুন লাগলে নেভাতে যাবে না। তারা কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে যদি একধর্মের লোক না-হয় তবে তাদের কীর্তিহাটের লোকের ধর্মস্থানে ঢুকতে দেবে না। প্রয়োজন হলে লেনদেন কাজকারবার সব বন্ধ করে দেবে।

কুইনী বলেছিল—মুসলমানরা কংগ্রেস-বিরোধী—তাদের সঙ্গে এই রকম করতে পারেন? সারওয়ার্দী সাহেবের বাড়ী মেদিনীপুর শহর।

ঝগড়া বেশ দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অরুণেশ্বর দীপকেশ্বরের অপরাধ ঠিক প্রমাণিত হয় নি। কীর্তিহাটের লোকেরা বলেছে—না—না—না। তাদের চরিত্র বড় ভাল।

সার্কেল অফিসার ফিরে গেছেন। প্রমাণ পান নি।

তারপর কুইনীর নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে হাতেলেখা পোস্টার মেরে কীর্তিহাট গোয়ানপাড়ার দেওয়াল ছেয়ে দিয়েছে কারা।

কুইনীর পড়ার খরচা দেয় কেন সুরেশ্বর রায়? কুইনী নেয় কেন? কুইনীর কলকাতার বাড়ী খালাস করতে টাকা কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে?

এই অবস্থায় আমি গিয়ে পৌঁছুলাম সুলতা।

আমার নায়েব আমাকে সমস্ত কথা বলে বললে—আপনি এ নিয়ে কিছু করবেন না, বলবেন না। ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে।

ওদিকে ঠাকুরবাড়ীতে মেজদির প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন ধনেশ্বররা কারা। ওখানে শিবেশ্বর রায়ের বংশের লোকেরা জোট বেঁধেছে।

মেজদি যেন বোবা হয়ে গেছেন। হবারই কথা। এগুলো আগে থেকেই তিনি কল্পনা করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন—স্বর্গ-বৈকুণ্ঠ-কৈলাস এ সবের কথা বইয়ে পড়েছি ভাই, গল্পে শুনেছি, যাত্রার দলে থিয়েটারে সাজিয়েগুছিয়ে দেখিয়েছে দেখেছি, যতক্ষণ পড়ি যতক্ষণ শুনি যতক্ষণ দেখি বেশ লাগে। কিন্তু ভাই পিথিবীতে যেখানে যত ঠাকুর আর ঠাকুরবাড়ী আছে, সেখানে মানুষে যা করে তাই হয়—দেবতার মহিমা কোথাও দেখি নি বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। রায়বাড়ীর কালীমা, গোবিন্দ, সৌভাগ্য-শিলা সত্যি হলে তারা কি ওই পচা মেজতরফের দত্যিগুলোর হুকুমে চলে? ওখানে আর আমি থাকতে পারব না। তার থেকে তুই আমাকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই। আমি বড়দি'র আশ্রমের উঠোন ঝাঁট দিয়ে ভিক্ষে করে খাব।

তিনি এ সব বিষয়ে একটি কথা বলেন নি। ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে যান নি। বাড়ীতে ওঠেন নি। উঠেছেন বিবি মহলে।

তিনিও আমাকে বললেন—ভাই, ধোঁয়ানো আগুনে খোঁচা দিস নে ভাই, বাতাস দিস নে, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে।

আমি ভাবলাম—কি করব?

হঠাৎ বিকেলবেলা কুইনী এল ক'জন গোয়ানকে সঙ্গে ক'রে—আমার সামনে মাথা তুলে সদর্পেই জিজ্ঞাসা করলে—এই আপনার কথার দাম? আমি কথা দিয়েছি, সে তার দাম যাচাই করতে ছাড়বে কেন?

নির্ভীক মেয়েটাকে দেখে খুশী হয়েছিলাম এবং তোমার কাছে গোপন করব না আমার দেহের মধ্যে দেবেশ্বর রায়ের রক্ত সাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল কুইনীর। সে হিলডাকে বললে—চল দিদিমা, জবাব পেয়েছি। চল। বাবুজাত—রায়বাহাদুরের জাত আলাদা হয় না। চল।

আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। লজ্জিত হলাম। বললাম—মাফ কর কুইনী। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব। আবার বলছি সে চেষ্টা আমি করব। আমি কালই বলব সকলকে। ওঁরা না-শুনলে যা ইচ্ছা হয় করো।

১৯৩৮ সালের মে মাস। আমি কীর্তিহাটের জমিদার অর্থসম্পদহীন মেজতরফ নয়; অর্থবল আমার ছিল; কিন্তু সেদিন আমিই গেলাম কীর্তিহাটের রঙলাল ঘোষের বাড়ী।

জমিদার মহাজন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সকলে সেদিন মানতে বাধ্য ছিল রঙলাল ঘোষকে।

রঙলাল ঘোষ আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না। ফিরিয়ে দিলেন, বললেন—শরীর খারাপ, তা ছাড়া সময় নেই। জবাবটা বহন ক'রে এনেছিলেন রঙলাল ঘোষের বড়ছেলে। লোকটি মিষ্টভাষী লোক। তিনি বললেন—"বাবা কি বলবেন? তিনি জানেন আপনি যার জন্যে এসেছেন। ও হবে না। গোয়ানদের সঙ্গে মিটমাট হবে না। আপনিও ও নিয়ে জড়িয়ে থাকবেন না। আর ওই কুইনী মেয়েটার পড়ার খরচা আপনি দেন তাও আর দেবেন না। আপনার বদনাম রটছে। ওদের সঙ্গে থাকলে লোকে ধর্মঘট করবে। খাজনা দেবে না। সঙ্গে সঙ্গে সোসাল বয়কটও করবে।"

আমি মাথা নিচু ক'রে ফিরে এলাম সদগোপপাড়া থেকে রায়বাড়ী। পথে কতকগুলি ছেলে হাততালি দিলে। হঠাৎ একটা নির্জন জায়গায় কে কোথা থেকে বললে—জমিদার! ফলিয়ে দেব জমিদারী। হেসে সুরেশ্বর বললে—এতদিনের রায়বংশের যে ছেলেটি কীর্তিহাটে উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করছিল তার গায়ে তারাই অবহেলা অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার কালি মাখিয়ে কালো করে দিল।

তা করুক। আমি অন্যায় করি নি এই জোরটা আমার ছিল। তাই ওখান থেকে চলে আসব সংকল্প করেছি আবার ভেঙেছি, ভেঙে সেখানে ওই কালি মেখেই কালো মুখ নিয়েই থেকেছি দিনের পর দিন। এরই মধ্যে গাঁয়ে ফিরে এলেন জগদীশকাকা অর্চনাকে নিয়ে। এবং কন্যার সম্পদ মাসিক একশো টাকা আয় আর অর্চনার গহনার মূলধন সে প্রায় পনের হাজার টাকার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে ফিরলেন। অর্চনা তখনও মুহ্যমান।

ঠিক একদিন পর অর্থাৎ পরদিন সকালেই মেজদিদি ওবাড়ী থেকে ফিরে এলেন সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে। দুই চোখ থেকে চোখের জলের ধারার আর বিরাম ছিল না।

জগদীশ্বরকাকা তাঁর গলা ধরে বাড়ী থেকে বের ক'রে পথের উপর ফেলে দিয়েছেন, চীৎকার ক'রে কুৎসিত ভাষায় তাঁর অপমান করেছেন। জেলে গিয়ে তাঁর জাত গিয়েছে : অজাতের হাতে খেয়েছেন—তাছাড়া আরও অনেক কিছু। অর্চনা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুহূর্তে জগদীশ্বরকাকা তাকে শাসিয়ে বলেছেন—এখনি গিয়ে পুলিসের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ ক'রে তোমাকে ঠেলে দিয়ে আসব শ্রীঘরে।

শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মেজদি হাতজোড় ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দে ভাই। তোর পায়ে ধরছি আমি।

তাই ঠিক করে ফেললাম। মেজদিকে বৃন্দাবনেই দিয়ে আসব। সেই ভাল—শিবেশ্বর রায়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী জেল থেকে ফিরে এসে নির্বাসিতা দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রীর পাশেই ব্রজধামের রজের উপর জীবনের শেষ আশ্রয় গড়ে তুলুন। আর কোথায় যাবেন ?

গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করা থেকে ভাল। শহরে বাজারে ব্যবসাদার কি চাকরে বড়-লোকের বাড়ীতে দাসী বা রাঁধুনীবৃত্তি থেকে সে ভাল।

যাবার সময় খবর শুনে শুধু অর্চনা এসেছিল। দেখলাম ওর চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করছে। শোকের মুহ্যমানতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—তাই যাও সুরোদা। সেই ভাল। বললাম—ভালো নয় ? জমিদার শিবেশ্বর রায়ের স্ত্রীর [illegible] দাসী বা রাঁধুনী হওয়া থেকে তো ভাল !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল অর্চনা। তারপর সুরেশ্বর অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে—তোর মনে আছে অর্চি ?

একটি রেখার মত ক্ষীণ হাসি নিঃশব্দে তার ঠোঁটের দুই প্রান্তে ফুটে উঠল—সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মনে নেই ? নিজের কথাও তো ছিল ওর মধ্যে সুরোদা। আমি তো তখন বুঝতে পেরেছি, বাবা আমার গয়নার টাকার উপর নজর ফেলেছেন। রাত্রে মাকে বলেছেন—গয়নাগুলো বেচে একবন্দ ভাল জমি কিনে ফেলব অচির নামে। আর কিছু টাকা নিয়ে তেজারতি করব। আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। শুনে সারারাত ঘুমুই নি। ভোরে উঠে তোমার ওখানে বিবিমহলে এলাম। তুমি বললে মেজদিকে বৃন্দাবনে রাখতে

যাচ্ছি। আমার মনে পড়েছিল দ্রৌপদীর অজ্ঞাতবাসে সৈরিন্ধ্রী হয়ে চাকরি করার কথা। সেকালে দাসী হয়েও এঁটো খেতে হয় নি, পায়ে হাত দিতে হয় নি ; তা ছাড়াও কীচকের মত মহাপাষণ্ডের হাত থেকেও বাঁচা সম্ভবপর হয়েছিল। একালে দ্রৌপদীরা মানে রাজা জমিদারবাড়ীর মেয়েরা চাকরি করতে গেলে ওর কোনটা থেকে রেহাই পাবে না। যাও তুমি দিয়ে এস। সেই ভাল। সেইদিনই রওনা হয়েছিলাম।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণাবাঈয়ের আশ্রমে আমার জন্যে পরমতম বিস্ময় আর ধ্রুবতারার মত স্থির আর শেষ নির্দেশ অপেক্ষা করে ছিল তা আমি জানতাম না। কোন ভৃগুজাতকের গুণীনও গণনা করে বলতে পারতেন না ; কোন মানুষ কল্পনা করতে পারতেন না।

আশ্রমে ঢুকতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

কত পরিচিতের মত বললেন—এসেছ ?

আমি অবাক হয়ে গিছলাম তাঁকে দেখে। গায়ের রঙটা টক্‌টকে গৌরবর্ণ, ছোটখাটো মাথায়, বেশ মোটাসোটা মানুষটি ; তিনি সুন্দর কি অসুন্দর সে বিচার বোধ হয় কেউ করবে না—দেখলেই মনে হবে আহা কি প্রসন্ন মানুষ !

তিনি আবার বললেন—এসেছ তো অনেক দিন—, এতদিনে। বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললেন—দেনাশোধের পালা এবার। নয় ? আমি জানি, আমি জানি। দেনা যে শোধ করতে হবে তোমাকে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিন আমি আমার পিতামহীর সামনে বসে তাঁর কথা শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে কি বলব, তিনি যা বলেছিলেন, তাই মনে হয়েছিল ধ্রুবসত্য। মনে হয়েছিল, তিনি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন, ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পাচ্ছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করে বলছেন। মনে হয়েছিল, তিনি আর মানুষ নন। মানুষের দেহেই তিনি দেবতার চেয়েও পবিত্র হয়েছেন, জগতের সব ন্যায়, সব ধর্ম তাঁকে আশ্রয় করে যেন ধন্য হয়ে গেছে।

তিনি বলছিলেন, নাতি, আমার সঙ্গে কথা হয় ঠাকুরের। সে ভাই অনেকদিন থেকে। কীর্তিহাটে মন্দিরে গেলে কথা হতো, এখানে ভাই চব্বিশ ঘণ্টা। আমার আশেপাশে অহরহ ফিরছে, কথা বলছে, বুঝেছ নাতি !

ঘাড় নেড়ে আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ বুঝেছি। মাথার গোলমাল তাঁর অনেকদিন হয়েছে। কিন্তু সে-কথাটা আমলই পায় নি মনের কাছে। আমি দেখলাম, পৃথিবীর সবকিছু আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে তাঁর কাছে। যা ঘটেছে, যা ঘটছে, তার কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে ফেলেন। কিছুই অগোচর থাকে না। সব। সেই সর্বঘটে যাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর ইচ্ছে। বলেন—ওই তো, মজা লাগাতে সে ওস্তাদ। মহা ওস্তাদ ! বিপদে ফেলে মজা দেখে বিপদেও ফেলে আবার ভরসা করলে পারও করে সেই।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক তখন, ১৯৩৮ সাল, এর ন' বছর পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ

স্বাধীন হবে। তারও দু বছর আগে এ্যাটমিক যুগ আরম্ভের যুগ। ১৯৪৫ সালে। সেই ১২৩৮ সালেও তিনি কেমন জান? মডার্ন ইণ্ডিয়ার মধ্যে আজও যেমন গঙ্গাসাগর মেলায়, পূর্ণকুম্ভে, প্রয়াগে, হরিদ্বারে অতীত ভারতের বিচিত্র রূপ লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি। এবং গঙ্গাসাগরে দারুণ শীতে বাংলার মন্ত্রীদের স্নান করার এবং প্রয়াগে কুম্ভে সেণ্টারের মন্ত্রীদের স্নানের মধ্যে মডার্ন ইণ্ডিয়া যেমন পুরানো ভারতের কাছে সবিস্ময়ে মাথা নত করে আমিও সেদিন তেমনি করে অভিভূত হয়ে তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলাম পরম সত্য এবং ধ্রুবসত্য বলে। একবিন্দু সংশয় যেমন তাঁর বলার মধ্যে ছিল না, তেমনি শোনার মধ্যেও আমার এতটুকু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে আবার সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলে, বললে—পরে এ নিয়ে আমি বিচার করেছি, খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখেছি। কেবল একটা কথা বা তাঁর একটা ধারণা ছাড়া বাকিগুলির মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু ছিলও না।

ঠাকুমা সেই গোড়াতেই আমাকে ডেকেছিলেন—'বড়বাবু' বলে। অর্থাৎ দেবেশ্বর রায়ই জন্মান্তর নিয়ে আমি অর্থাৎ সুরেশ্বর হয়ে জন্মেছি—এই ধারণাটার কথা বলছি। ওটা তিনি ছাড়েন নি। সায়েন্স অব হেরিডিটির কথা মোটামুটি জানি, কিন্তু ভাল ভাবে জানি না, তাঁকে বোঝাতে গিয়েও বোঝাতে পারি নি, আর তিনি তা ঘাড় নেড়ে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। একটি বুলিই ধরেছিলেন—জানি 'বড়বাবু' জানি। এসব আমি অনেকদিন আগে থেকে জানি। তুমি আবার আসবে, তোমাকে আবার নতুন জন্ম নিয়ে রায়বাড়ীতেই আসতে হবে, তোমাকে দেনা শোধ করতে হবে।

সুলতা, তাঁর কথাগুলো আজও আমার কানে বাজছে। বলেছিলেন—বড়বাবু, যত বড় মানুষটা তুমি, তার শতগুণ ভারী দেনার বোঝা তোমার ঘাড়ে। জন্মে জন্মে বোঝা বাড়িয়েই চলেছ, বাড়িয়েই চলেছ; এবার বোঝা নামাও, শোধ করো, দেনার বোঝা শোধ করো।

আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বলেছিলেন—আমার কাছে একটা কথা আদায় করেছিলে, তোমার মনে আছে? সেই তুমি মারা গেলে তার ক'দিন আগে! বলেছিলে—বড়বউ, তোমার ঠাকুর ঠিক বলেছেন—দেনার জন্যেই জন্মে জন্মে তোমাকে পেয়েও আমি পাচ্ছিনে। এবার দেনা শোধ করবই। তোমাকে পেতে হবে বড়বউ, প্রাণটা আমার হাহাকার করছে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম পাগলের প্রলাপ; কিন্তু তবুও অশ্রদ্ধা করে তাকে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উঠে পালিয়ে আসতেও পারছিলাম না। শুধু একটা রুদ্ধ বেদনার আবেগ বুকের মধ্যে আমার উথলে উথলে উঠছিল। ভাবছিলাম—রায়বাড়ীর দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী রত্নেশ্বর রায়ের মহাসমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূই এঁর পরিচয়

নয়, এঁর পরিচয় সীতা-সাবিত্রীর মত, এঁকে ধনসম্পদ আর মিথ্যা মর্যাদা-স্ফীত রায়বংশ এইভাবে পরিত্যাগ করেছে। হতভাগ্য রায়বংশ! অথবা রায়বংশের মত সব বংশের ভাগ্যই এই। সে সেই রামায়ণের কাল থেকে। সীতাকে বনবাসেই যেতে হয়, শেষ হয় পাতাল প্রবেশে। সঙ্গে সঙ্গে বংশের লক্ষ্মীও উবে যান।

তুমি জান কিনা আমি জানি না, মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে একটা জনপ্রবাদ আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাড়ীতে মা ভবানী ছিলেন কন্যারূপা হয়ে। যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাই রামচন্দ্রকে হত্যা করব বলে স্থির করলেন, রাজ্যের জন্য, মর্যাদার জন্য, তখন নাকি তাঁর মেয়ের রূপ ধরে মা ভবানী এসে বলেছিলেন—বাবা আমার মুখের দিকে তাকাও—! শক্তি আর অহংকারমত্ত প্রতাপাদিত্য বলেছিল—চলে যা আমার সুমুখ থেকে, তোর মুখ আর দেখব না।—

মা সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অহংকার আর অধর্ম-উত্তপ্ত বাড়ী ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর ঝাঁপিটি নিয়ে। গিয়ে উঠেছিলেন ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ী।

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে গল্পটা একটু অন্যরকম করে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—মা প্রথম ছিলেন হরি হোড়ের বাড়ীতে। তারপর ঠিক ওইভাবেই কন্যাবেশে হোড়মশায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন—বাবা, আমি আর থাকতে পারছিনে। তোমার জামাই আসছে। হোড় রেগেই ছিলেন মেয়ের ওপর, বলেছিলেন—যা-যা, এখুনি যা।

মা অন্নপূর্ণা গঙ্গা পার হয়ে যাবার সময় ঈশ্বরী পাটনীর কাঠের সেঁউতি সোনা করে দিয়ে আর তার ছেলেরা দুধে-ভাতে থাকবে এই বর দিয়ে মজুমদার-বাড়ী প্রবেশ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের গল্পটা আমাকে বলেছিলেন আমার মেজদিদি, শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষ পুরুত ভটচাজের কন্যেটি; তিনি কার কাছে এটা শুনেছিলেন তা বলতে পারিনে।

আমি সেদিন আমার ঠাকুমার সামনে বসে সেই গল্পটাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, রায়বাড়ীর লক্ষ্মী ছিলেন এই বড-বউটি; তাঁকে উপেক্ষা করলেন সবাই। স্বামী দেবেশ্বর রায়, ছেলেরা—যজ্ঞেশ্বর রায়, যোগেশ্বর রায়, মেজতরফের দেওর শিবেশ্বর রায় থেকে তাঁর ছেলে ধনেশ্বর, জগদীশ্বর সুখেশ্বর—সবাই।

ইনি বুঝি তিনিই। রায়বাড়ীর লক্ষ্মী। ইনি যা বলছেন, বাস্তব বিচারে তা প্রলাপ হলেও প্রলাপ নয়। এই হল সত্যকারের সত্য।

সুলতা, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কথা ঠাকুমা?

বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখ, ওই ভালবাসিনে! ওইসব কথা চাপা দেওয়া! তুমি বল নি আমাকে, বড়বউ তুমি বল, আমাকে তুমি জন্মজন্মান্তরে কামনা করবে! আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? আমি চুপ করেছিলাম। তোমার সে কি জেদ! কি বলব বল, আমি তো সবই জানি। ঠাকুরের সঙ্গে কথা হত, তিনি তো আমাকে সব বলতেন। আমি তাঁকে

শুধিয়েছিলাম—এত কষ্ট কেন আমার কপালে লিখলে? ঠাকুর বললেন—এর আগের ক' জন্ম আমাকে ফেলে তুই ওর পেছনে ছুটেছিস। আমি ডেকেছি আসিস নি। এবার ও তোকে ছুঁড়ে ফেলেছে, এবার তুই আমার কাছে এসেছিস, এবার তোর মুক্তি। তোর স্বামীকে বর দিয়েছিলাম। নিলে কই। নেবার মধ্যে নিলে রূপোর তাল, তার রূপের তাল। তাহলে কি বলব? তবু তুমি ছাড় না। তখন বললাম। তুমি বললে, বড়বউ, আজ থেকে জীবনের দেনা শোধ করব। তুমি শুধু এইটুকু বলো ঠাকুরকে—ঠাকুর, মুক্তি আমাকে দিয়ো না, আমাকে তোমার দাসী করে রাখ, যেদিন তার মুক্তি হবে সেইদিন মুক্তি দিয়ো আমাকে। সে ঋণশোধ করবে, কড়াক্রান্তি হিসেব করে, শোধ করবে বলে কথা দিয়েছে আমাকে। দেবেশ্বর রায় আমার সাধের বর—আমার মোহন বড়বাবু, আর যা করবে করুক, মিথ্যে কথা বলে না।—

—সে-সব বলেক'য়ে আজ ভুলে যাচ্ছ বড়বাবু! ছি-ছি-ছি!

মেজদি অবাক হয়ে সব শুনছিলেন, তিনি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন—তা ও করছে দিদি, তা ও করছে।

—করছে? তবে যে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করছ, 'কি কথা ঠাকুমা?'

হেসে বলেছিলেন—আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তা তুমি তো জান আমি ঠাট্টা বুঝি না। বোকাসোকা মানুষ। বাবাঃ যা ভয় লাগত, কথা তো নয় যেন জেরা। এখন নাতি হয়ে জন্মেছ, ভয় আর ঠিক করে না। ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। করব? আমি বললাম—করুন। জিজ্ঞাসা করলেন—মদ খাও? মাথা হেঁট করে বললাম—খাই ঠাকুমা। বললেন—হুঁ, আমি জানি। বড়বাবু মদ না-খেয়ে থাকবে! বাবাঃ, বড়বাবুর বাপ, বাঘের মত বাপ, তিনি রাগ করে গর্জাচ্ছেন, বড়বাবু টেবিল ধরে টলছেন আর আমাকে বলছেন, বড়বউ, আমার সেই গুলি খাওয়া জায়গাটায় ব্যথা করছে, মালিশ দিয়ে দেবে চল। আর বাবাকে বল, কাল—কাল কথা বলব। আর বিয়ে করেছ? বিয়ে? এবার মেজদি বললেন—না দিদি, বিয়ে করে নি। বললেন—করে নি? তাহলে? বড়বাবু আবার সেই পাপ বাড়াচ্ছ? না-না ভাই আমার, লক্ষ্মী সোনা আমার, ও-পাপ করো না ভাই। ও মহাপাপ। আমি হাত জোড় করে বললাম—না ঠাকুমা, বিয়ে আমি করি নি। কিন্তু যে-পাপের কথা বলছেন, সে-পাপও আমি করিনে। আমি রায়বংশের অভিশাপের কথা জানি, আজ ছ'পুরুষ পর্যন্ত জমানো পাপের কথা জানি।

—রাশি রাশি পাপ। ওরে নাতি, রায়বংশের পাপ জমা করলে পাহাড়-পর্বত হয় রে—পাহাড়-পর্বত হয়।

হঠাৎ যেন পাল্টে গেলেন ঠাকুমা। কি ভাবনায় যেন ডুবে রইলেন, তারপর যেন অনেকটা সহজ মানুষের মত বললেন—কি নাম তোমার নাতি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুরেশ্বর। অবিকল

তুমি বড়বাবুর মত দেখতে; বড়বাবু শেষকালে কিছুদিন আমাকে ভালবেসেছিলেন। আমি দেবতা দেবতা করতাম, আমাকে বলেছিলেন—দেখ আমি পুরুষমানুষ, তোমাকে আমি বিয়ে করেছি, কেউ যদি তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে আসে, তবে আমি তার সঙ্গে লড়ব, মরব, তার আগে তো ছেড়ে দেব না। সে যদি তোমার গোবিন্দ এসে কেড়ে নেন তবে আমি তাঁর সঙ্গেও লড়ব। না লড়ে, না মরে তোমাকে আমি ছিনিয়ে নিতে দেব না।

চোখ থেকে তাঁর জল গড়াল। বললেন—দেখ ভাই, তখন কি জানতাম কথাটা এমনি করে ফলবে! তিনি মারা গেলেন। আমাকে ঠাকুর কেমন কৌশল করে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন দেখ। ভাই, আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীকে দিয়ে পুরী তৈরী করে এখানে রাখলেন। তা ভাই আমার দশা হল, আমি এসে না পারলাম ঠাকুরকে আত্মসমর্পণ করতে, আর না পারলাম মরতে। দেখ! আঃ, তোমাকে দেখে কত কথা যে মনে পড়ছে। তুমি ভাই অবিকল আমার সেই বড়বাবু। বুঝেছ! বড় আবোলতাবোল যে মনে পড়ছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—হাঁ যা বলছিলাম, শোন ভাই নাতি। রায়বংশের পাপের কথা। বড়বাবু আমাকে বলেছিলেন—বড়বউ, পাপ আমাদের জমা করলে পর্বত হয়, গঙ্গার বুকে ফেললে গঙ্গার বুক পুরে ওঠে, মজে যায়। আমি হিসেব করে দেখেছি বড়বউ পাপ শুধু একরকম নয়, যত রকমের পাপ হতে পারে, সব-সব—সব রকম পাপ জমা হয়েছে রায়বাড়ীর পাপ-পুণ্যের সিন্দুকে। পাপের সিন্দুক বোঝাই। দেখ রায়েদের জমিদারীতে পত্তনীতে, দরপত্তনীতে একশো পঁয়ত্রিশখানা গ্রাম। এ-গ্রামের খাজনা বাড়িয়ে তিন ডবল করেছি। একশো পঁয়ত্রিশখানা গ্রামে কমপক্ষে পনের হাজার লোকের বাস, আজ পাঁচপুরুষ ধরে পাঁচ-পনেরং পঁচাত্তর হাজার লোকের মাথায় পা দিয়ে হেঁটেছি। পুজো করে ওরা যে লক্ষ্মী ঘরে তুলেছে, সে-লক্ষ্মীর ভাগ নিয়েছি। ঘরে আগুন দিয়েছি। চাবুক মেরেছি। বুকে গাছের গুঁড়ি চাপিয়েছি; থামের সঙ্গে বেঁধেছি। তাছাড়া বড়বউ নিজেদের পাপ—মদ খেয়ে নিজের সর্বনাশ করেছি। তোমার মত লক্ষ্মীকে ফেলে কত কদাচার করেছি বড়বউ, ওই ভায়লেট, ওঃ! পাপের কি শেষ আছে বড়বউ? বাবা ভিক্ষেমাকে তাড়ালেন। কেন, না, সে পাপদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে। অঞ্জনা-পিসীকে, হ্যাঁ একরকম তাকেও তিনি তাড়ালেন। তাছাড়া বাবার মাতামহের পাপ, সে-পাপ তুমি জান না, ভীষণ পাপ, বাবার পিতামহের পাপ, সে-ও ভীষণ পাপ। পাপের বিন্ধ্যপর্বত, মাথা ঠেলে উঠছে—সূর্যের পথ বন্ধ করে দাঁড়াবে একদিন, সেদিন রায়বংশে আর সূর্য উঠবে না, রাত্রি পোয়াবে না। দিনের আলোর মুখ রায়বংশ দেখবে না। হয়তো জন্তু-জানোয়ার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে হাঁক মেরে বেড়াবে। তখন এই মানুষেরাই গুলি করে মারবে, ফাঁদ পেতে ধরবে। বড়বাবু আমার হাত ধরে বলেছিল—নাতি, বলেছিল—তোমাকে দুঃখু দিয়ে তোমার চোখের জল দেখে আমার চোখের মোহ কেটে গেল বড়বউ, আমি দেখতে পাচ্ছি—কত পাপ আজ ঝোলা পাহাড়ের

মাথার ওপর ঝুলছে। যদি সময় পাই, তবে এই জন্মে এর প্রায়শ্চিত্ত করব, না পেলে কত ঘুরতে হবে জানি না। আমি বলেছিলাম—না গো না। ভগবানের নাম কর, শরণ ও, আগুনে খড় পুড়ে যাওয়ার মত পুড়ে যাবে। তা বড়বাবু হেসে বলেছিলেন—সে যদি মার মত পারতাম মাণিকবউ, তবে তো বেঁচে যেতাম। তা যে পারি না। পাপ করব র হরিনামের ঝোলা নিয়ে জপ করব—আর পাপ ছাই হবে, এত সোজা হলে পাপও মিথ্যে, ও মিথ্যে। সত্যি দেনা আর পাওনার মামলা। এতে একদিন না একদিন দেনদারকে রতেই হয়। কেন জান? মূলধনের অভাব ব'লে। এই যে রাজবাড়ী, জমিদারবাড়ী, বাবাড়ী, বাদশাবাড়ী এ সব গেছে ওই মূলধনের অভাবে। আমরা তো সামান্য। রাজ্য রামের অযোধ্যা, রামের বংশ তাও গেছে, কৃষ্ণের দ্বারকা যদুবংশ তাও গেছে। কৃষ্ণ ষোল হাজার বিয়ে করেছিলেন। তাদের ছেলে নাতিদের বউ তারাও ছিল—সব নিয়ে খ হবে, না—দশ লাখ হবে তার হিসেব বেদব্যাস দেন নি—তবে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরে হত্যাগ করলেন। রুক্মিণী সত্যভামা সহমৃতা হলেন—বাদবাকী যারা রইল তাদের এসে রেরা ব্যাধেরা ধ'রে নিয়ে গেল। ওদিকে সমুদ্রের বানে দ্বারকা ভেসে ডুবে গেল। দিল্লীর দশাদের বংশ নাকি রেঙ্গুনে দোকান করে। দিল্লীতে টাঙা চালায়। এই নিয়ম বড়-বউ। না শোধ করতে হয়, পাওনা আদায় করতে পাওনাদার আসে, লাঠি মেরে আদায় করে নিয়ে য়। এই যে একশো পঁয়ত্রিশখানা গাঁয়ের লোক যাদের কাছে আমরা বাড়তি আদায় রেছি তারা ছাড়বে মনে করেছ? ছাড়বে না। আদায় করে নেবে। কি ক'রে নেবে তা নি না, তবে নেবে। দেনার পাহাড়—সেই পাহাড়ের চূড়া হল ওই ভায়লেট। ও তোমার রি আমার মধ্যে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে পেতে হাত বাড়িয়ে পাই নে। ও এসে দাঁড়ায়।

ঠাকুমা চুপ ক'রে গেলেন। তারপর সে কি কান্না। কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর আবার যখন কথা বলতে শুরু করলেন তখন আবার কথার গোলমাল হয়ে গেল।

সুরেশ্বর বললে—মাঝখানে বেশ সহজ মানুষের মতই কথা বলছিলেন, কোন গোলমাল তো ছিল না। তবে হ্যাঁ, পুরনোকালের মানুষ বাহাত্তর বছর বয়স—তাঁর কথাগুলো তোমার আমার কাছে অন্ধ সংস্কারের কথা মনে হ'তে পারে। সে কথা আলাদা।

এবার বললেন—নাতি, তুমি সেই বড়বাবু। সেই রূপ সেই ধরনের কথাবার্তা—চলাফেরা চঙ-চাঙ সব সেই। মেজবউ বললে তুমি বিয়ে কর নি, তুমি প্রজাদিগে দয়া করেছ; বসত সব নাখরাজ করে দিয়েছ—গোচর ছেড়ে দিয়েছ; গোয়ানদের গোয়ানপাড়া সব শরীকের কাছে কিনে তাদের নিষ্কর করে দিয়েছ; এই তো দেনা শোধ করছ। তা-ছাড়া ভাই এই যৌবনে তুমি বিয়ে না করে বিবাগী হয়েছ।

হেসে ফেললেন। বুকে হাত দিয়ে বললেন—আমার জন্যে বুঝেছ আমার জন্যে। কিন্তু

ভাই, এ জন্মে তো হবে না। এখন মরলে আমার বিয়ের বয়েস হতে তো আরও বিশ বছর গো। এখন তো ষোল-সতেরোর কমে মেয়েদের বিয়েই হয় না। লেখাপড়া শিখতে হবে, তার পরে মনে কর তোমার সঙ্গে প্রেম করতে হবে—না কি লা মেজবউ? এমনি এমনি কাপড়ে-চোপড়ে মুড়ে গয়না পরিয়ে কপালে সিঁদুর ঘষে বিয়ের দিন আছে? নেই। তুমি ভাই এ জন্মটা বিয়ে না-করে দেনা শোধ কর; সেই ভায়লার বংশের কেউ থাকলে তাকে তুষ্ট ক'রো ভাই, এদিকে আমি মরি। তারপর তুমি এস। তোমারও খুশি আমারও খুশি, বৈকুণ্ঠে তুমি হবে দাস আমি হব দাসী। আর আমাদের জন্ম হবে না। কেমন?

আমি কোন উত্তর দিই নি—বা দিতে পারি নি সুলতা, বুকের ভেতর কান্নার উচ্ছ্বসিত বর্ষার কাঁসাইকে বাঁধন দিয়ে কোনমতে শুনে যাচ্ছিলাম।

দেবেশ্বর রায়—রায়বংশের মনোহর পুরুষ—যদুবংশের কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন, তাঁর স্ত্রী, রায়বাড়ীর মাণিকবউ—তাঁর এই অবস্থা! তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম কি করি নি—একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না সুলতা; সে আমি বলতে পারব না। আজ তা আমি ঠিক স্মরণ করতে পারব না। তবে হ্যাঁ—এটুকু বলতে পারি একালের ধারা মত, 'রাবিশ' বলে কথাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উল্টে পড়তে পারি নি। বলতে পারি কথাগুলো মনের মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে শিলালিপির মত খোদাই করা হয়ে গিয়েছিল বুকের মধ্যে।

রায়বংশের দেনার পরিমাণ জমা করলে পাহাড় হয়ে ওঠে। ভগবানের নামে বিশ্বাস নেই যে তাঁর নাম করলে শিলা বিগলিত হবে—সগরবংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গার ধারা নেমে এসে উদ্ধার করবে শ্যামাকান্ত চাটুজ্জেকে, সোমেশ্বর রায়কে, রাণী কাত্যায়নীকে, বীরেশ্বর রায়কে, বিমলা দেবীকে; তারপর—হ্যাঁ, রত্নেশ্বর রায়ও আছেন তাঁদের মধ্যে, নিশ্চয় আছেন, সম্ভবতঃ তাঁর পাওনাদারের সংখ্যা বেশী, রায়বাড়ীর আয়কে তিনগুণ বাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কুড়ি হাজারকে ষাট হাজারে তুলেছিলেন। দেবেশ্বর রায়, শিবেশ্বর রায়, তারপর আমার বাবা যোগেশ্বর রায় থেকে দেনা শোধ শুরু হয়েছে। অসংখ্য পাওনাদার অসংখ্য হাজারে হাজারে পাওনাদার যেন মুঠি-বাঁধা হাত তুলে তাঁদের কাছে দাবী করছে—"পাওনা শোধ করো—আমাদের পাওনা ফেলো।"

একটা কথা বিশ্বাস করো সুলতা; এইসব কথা যখন ঠাকুমা বলছিলেন তখন এ সব যেন তিনি চোখে দেখছিলেন। কয়েকবার বলেও ছিলেন—ভাই, আমি দেখতে পাচ্ছি রে, আমি দেখতে পাচ্ছি! পরলোকে রায়বংশের কর্তারা হাতজোড় করে আসামীর মত দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতা, মেজদি এতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে শুনছিলেন, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে-ছিলেন তাঁর বড়জায়ের মুখের দিকে। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে ছবিগুলো দেখতে চেষ্টা করছেন। আমার ঠাকুমা থামতেই তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর হাত ধরে নাড়া

য়ে ডেকে বললেন—দিদি !

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো মেজবউ, মেজঠাকুরপোর তীয় পক্ষের স্ত্রী ! এঁ্যা ?

—হ্যাঁ দিদি !

সমাদর করে তাঁর মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে ঠাকুমা বললেন—আহারে ! কচি য়স তোর—তোর এই দশা করে দিয়ে গেল মেজবাবু? না-না-না। মেজবাবু বড় ষ্ঠুর ছিল রে। দয়া-মায়া তার ছিল না। অন্য দোষ না থাক, মানুষকে পীড়ন আর ওই ছাবয়সে তোকে গরীবের মেয়ে পেয়ে বিয়ে করে শেষ অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে যাওয়া—বড় ষ্ঠুরের কাজ।

—দিদি ! অনেক কষ্ট তিনি পেয়েছেন বেঁচে থেকে। অনেক অন্যায়ও করেছেন। াপনার সঙ্গে যে ব্যবহার—

বাধা দিয়ে ঠাকুমা বললেন—আমার যা করেছিল ঠাকুপো তা আমি ক্ষমা করেছি মেজবউ। া আমি মাফ্ করেছি। কিন্তু ঠাকুরপো যে বড় বেশী মিথ্যে মামলা করেছে রে ! লোকের রেহর্মে নিয়ে যে মনে ভারী সুখ পেত সে।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর দিদি ?

—তা হচ্ছে ভাই।

মেজদির চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এসেছিল। বড় ভাল লেগেছিল আমার। হয়তো আমার কথা শুনে তুমি মনে মনে হাসছ। ভাবছ সুরেশ্বরের পাগল ঠাকুমা পটুয়াদের কাছে দেখা এবং শোনা নরকের বর্ণনা আর ছবির কথা বলে যাচ্ছেন, গ্রাম্য পুরুতের মেয়ে মেজদিটি সেই সব কথা ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস ক'রে কাঁদছে, ভাবপ্রবণ অর্ধশিক্ষিত ধনীর দুলাল সুরেশ্বরও তাই বিশ্বাস করছে ধ্রুবসত্য ব'লে। এ যুগে কথাটা হাসিরই বটে, শুনলে, তুমি তো তুমি, একটা ক্লাস টেনের ছেলেও ব্যঙ্গভরে হাসবে। কিন্তু না, ঠিক তা নয়। ঠাকুমার কথায় এটা আমি ভাবি নি—যে আমিই দেবেশ্বর রায়, জন্মান্তরে আবার আমি রায়বাড়ীতে এসেছি, সুরেশ্বর রায় নাম নিয়ে জন্মের ঋণ শোধ করতে। এও বিশ্বাস করি নি যে আমার পূর্বপুরুষেরা এক অদৃশ্যলোকে কায়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আর পঁচাত্তর হাজার থেকে এক লাখ অভিযোগকারীরা চীৎকার করে অবাঙমনসগোচর ঈশ্বর-বিচারকের কাছে দাবী জানাচ্ছে—মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে ওদের কায়াহীন সত্তার মাংস ছিঁড়ে খাওয়ানো হোক, কি ফাঁসি দেওয়া হোক, কি ফের কৃমিকীট করে পৃথিবীর কোন আবর্জনা-স্তূপে ওদের জন্মান্তর নেওয়ার দণ্ড দিয়ে পাঠানো হোক।

না—তা বিশ্বাস আমি করি নি।

তবে ঠাকুমার সে-বিশ্বাসকে আমি মিথ্যাও মনে করতে পারি নি। যা আমার কাছে

সত্য নয় তাই যে মিথ্যা—তা আমি মনে করি নে সুলতা। তাই তোমাকে ডেকে তো সামনে আমি জবানবন্দী দিচ্ছি। দেখ, ইতিহাসের ধারায় উত্থান-পতনের পিছনে আছে উ শক্তি, তার সঙ্গে ন্যায়নীতি জুড়তে হয়, ন্যায়নীতিকে মূল্য না-দিয়েও বড় বড় অধিনায় লোককে প্রতারিত করতেই সেটা করে। তার চেয়ে এক কণা বেশী মূল্য তার নে কিন্তু লোকে ন্যায়নীতি মানে। লোকের সঙ্গে সঙ্গে জীবন মানে। কত যুগ কত কাল জন্মান্তর পার হয়ে মানুষের দেহের মধ্যে জীবন এসে শুধু অমর হ'তেই চায় নি—আ অন্ধকারের অন্যায় থেকে ন্যায়েও আসতে চেয়েছে। রায়বংশের অন্যায়ের বাঁধনে বাঁ পড়েই আমি সেটেলমেণ্ট উপলক্ষে কীর্তিহাট গিয়ে আর ফিরি নি। প্রথম টের পেলাম ঠাকুরদা পালের খুনের কথা। খুন করিয়েছেন রত্নেশ্বর রায়; আর ঠাকুরদাস পালের প্রপৌ কন্যা তুমি। চমকে উঠেছিলাম। এবং খুঁজতে লেগেছিলাম রায়বংশের পাপ-পুণ্যে খতিয়ানের খাতা।

সে খাতাও পেয়েছিলাম। ঋণ বেরিয়েছিল বা পাপ বেরিয়েছিল অজস্র, পুঞ্জ পুঞ্জ, পিটি পিটিয়ে তাকে জমিয়ে এত ভারী তাকে করে তোলা হয়েছে যে গোটা বংশটাই তার ভা হাঁটু ভেঙে ধুলোয় মুখ গুঁজে পড়েছে। বৃন্দাবনে ঠাকুমার মুখ থেকে যেন গোটা বংশ আর্তনাদ করে উঠল—ঋণ শোধ করে আমাদের বাঁচাও। আমাদের বাঁচাও। আমাদে বাঁচাও!

যে সব ছবিগুলো আমি আঁকছিলাম সুলতা—সেগুলো যেন ঠাকুমার কাছে ভাষা পে কথা ক'য়ে উঠল।

পরের দিন আমি বৃন্দাবন থেকে চলে আসব, প্রণাম ক'রে বিদায় নিতে গেলাম ঠাকুমা কাছে, মেজদির কাছে।

মেজদি'কে কিছু টাকা দিলাম—বললাম রাখ মেজদি। দেখ আমি জানি না, ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসাও করি নি—করবার সাহসও নেই যে এখানে ওঁর অধিকার কি? কি আছে ওঁদের টাকাটা রাখ যদি কখনও কাজে লাগে!

ঠাকুমাকে প্রণাম করতে গেলাম। দেখলাম তিনি যেন অন্য মানুষ। খুব স্বাভাবিক ভাবে বললেন—তুমি আমার নাতি, সুরেশ্বর, যোগেশ্বরের ছেলে। যোগেশ্বর তাই করেছিল তোমার মাকে দুঃখ দিয়ে ফেলে রেখে কোন একটা বিবি মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল?

বুঝলাম মেজদির কাছে শুনেছেন। চুপ ক'রে রইলাম। উত্তর কি দেব বল? হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে তিনি বললেন—কপাল। রায়বংশের কপাল!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল তাঁর বুক থেকে। বললেন—যজ্ঞেশ্বর ভায়লার বাড়ীটা কেড়ে নিয়েছিল? তুমি তাকে টাকা দিয়ে বাড়ী উদ্ধার ক'রে—তার কে—যেন—ছেলের মেয়ের মেয়ে—হ্যাঁ, তাই তো বললে—তাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ? তাকে পড়ার খরচ দিচ্ছ?

এবার বললাম, দিয়েছি। অন্নপূর্ণা-মা বললেন, আর আমারও মনে হল—না দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

—হ্যাঁ ভাই। খুব অন্যায় হবে। তোমার ঠাকুরদাদা অবিকল তোমার মত দেখতে ভাই। তাঁর সব থেকে বড়-দেনা ওই ভায়লার কাছে। আমার বড়বাবু তার উপর অবিচার করেছিলেন। চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়েকে ডাকলেন, আয় একসঙ্গে দু'জনে মরি আয়। কিন্তু সে ভয় খেলে। পারলে না। বড়বাবু তো আলাদা জাতের মানুষ—তিনি গুলী খেয়ে মরতে গেলেন। গুলী খেলেন—পড়েও গেলেন। ভায়লা পালালো গোপাল ঘোষের সঙ্গে। বড়বাবু বাঁচলেন, গুলী বুকে বেঁধে নি। বেঁচে উঠে আর তাকে চোখে দেখলেন না। মেয়েটা সারাজীবন কেঁদে মল; রাস্তার ঝাড়ুদারের হাতের ঝাঁটার মত অবস্থা হল। তবু বড়বাবু তাকে ভালবাসতেন। তার জন্যেই আমি তাঁর ভালবাসা পাই নি। ভায়লাকে দূর করে দিয়ে তাকে খুঁজতেই তিনি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের গর্তে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মারা গেলেন। ভায়লা বিষ খেয়ে মল' সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। পরলোকেও মিলতে পারেন নি বড়বাবু। ওরা কিরিশ্চান তো! আঃ বড় দুঃখু! ওদের দেখো। বুঝলে!

দেখব বলে কথা দিয়েই বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু জানতাম না যে ইতিমধ্যে গোয়ানপাড়া আগুন লেগে পুড়ে গেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। হিলডা মারা গেছে। তার ঘরেই প্রথম আগুন লেগেছিল।

খবরটা পেলাম কলকাতায় পৌছে। একখানা চিঠি এসেছিল। লিখেছিল অর্চনা। লিখেছিল—সুরোদা, বৃন্দাবন থেকে এতদিন ফিরেছ বোধ হয়। খুব গুরুতর ব্যাপার এখানে। একসঙ্গে তোমাকে দুখানা চিঠি লিখছি—একখানা বৃন্দাবনে একখানা কলকাতায়। যেখানে পাও। এখানে গোয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া চরমে উঠেছিল। এবং তার ফলও ফলে গেল। সে ঝগড়াটার জন্যে তুমি মিনতি জানিয়ে ক'দিন চুপচাপ থাকতে বলে গেলে সেটা চরমে উঠে গেল দিন তিনেকের মধ্যেই। আমার দুঃখ, আমার লজ্জার কারণ এক রকম বলতে গেলে আমি। কলকাতা থেকে ফেরার পর বাবার নতুন চেহারাটা দেখে গেছ—তাপও সয়েছ খানিকটা, বাবার ভয়েই ঠাকুমা বৃন্দাবন পালালেন, সে তুমিও জান; আমিও জানি। বাবার এখন সদাসর্বদাই রুদ্রমূর্তি। তার কারণ আমার টাকা। ও টাকা এখন তার মুঠোয় তিনি সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন সকলকে। আমি তোমার সঙ্গে পালালে ভাল করতাম। ওদিকে জেলখানা থেকে অতুলকাকা গোয়ানদের খবর পেয়ে ওদের বয়কট করতে অর্ডার পাঠিয়েছিলেন। তুমি যাবার পরই অর্ডারটা গোপনে জেলখানা থেকে আসে। গ্রামে খুব কড়াকড়ি হয়। গোয়ানরা মিটিং ক'রে ঠিক করে যে তারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। মুসলীম লীগের প্রটেকশন নেবে। বাবা, এই সুযোগে ওদের এখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে আমার টাকায় ওদের জমি কিনবার মতলবে—হঠাৎ খুব কংগ্রেসী হয়ে উঠে ওদের পাড়ায়

গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে এলেন। তার দিন তিনেক পরেই রাত্রে গোয়ানপাড়ায় আগুন লাগল। গোটা পাড়াটা পুড়ে গেল—যায় গির্জের দু-পাশের রাণীগঞ্জ টালির ছাওয়ানো চাল পর্যন্ত। হিলডা পুড়ে মারা গেছে। এখানে টেনশন খুব বেশী। তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এস, অন্ততঃ আমাকে বাঁচাও। আমি বোধ হয় মরে যাব সুরোদা। গোটা গাঁয়ের লোক এটা চাপাচ্ছে বাবা এবং জ্যাঠামশায়ের ওপর। বলছে কংগ্রেস এ করতে পারে না। এ করেছেন রায়বাবুরা। ধনেশ্বরবাবু জগদীশ্বরবাবু আর সুখেশ্বরবাবুর ছেলেরা। করেছে কমলেশ্বরের সঙ্গীসাথীরা। আমার প্রণাম নাও। ইতি অর্চনা।

সুলতা সেইদিনই রওনা হলাম কীর্তিহাট।

স্টেশনে নেমে শুনলাম জগদীশ্বরকাকা নিজের বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সুরেশ্বর বললে—রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে পুরনো কাল শেষ হয়ে গেল সুলতা। দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যারা বাংলাদেশে প্রথম ইংরিজী শিক্ষা, ইংরিজী সভ্যতা, ইংরিজী আভিজাত্য আমদানি করেছিল তাদের নাম তুমি এক এক ক'রে স্মরণ কর কিম্বা আউড়ে যাও, রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব থেকে প্রত্যেকেই জমিদারীর উপর বংশের প্রতিষ্ঠা করে গিছলেন। আবার যাঁরা শুধু দেশকে শুষেছেন, চুষেছেন রক্তপায়ী বাদুড়ের মত তাঁরাও জমিদার ছিলেন। এঁদের আভিজাত্যের কাল, এঁদের গৌরবের কাল, দাপটের কাল মোটা হিসেবে বলতে গেলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। ১৯০১ থেকে নতুন কাল আরম্ভ। সেটার প্রকাশ হয়েছিল ১৯০৫ সালে।

ইংরেজ শাসনে লর্ড কার্জন শেষ অপ্রতিহত-প্রতাপ ভাইসরয়। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বিনা প্রতিবাদের ভারতেশ্বরী। দেবেশ্বর রায় রায়বাড়ীর শেষ রাজাবাবু। বাংলাদেশে জমিদারদের অপ্রতিহত প্রতাপের কাল—নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরী। ১৯০১ সাল থেকে মানুষ জাগতে শুরু করেছে। ব্যবসাদারেরা তাদের থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; ল্যাণ্ড হোল্ডারস এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে দেশী চেম্বার অব কমার্স'গুলোর দাম বেড়েছে। উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিস্টার, প্রফেসরের কাল শুরু হল। দেবেশ্বর রায়ের উত্তরাধিকারী আমার জেঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় হয়েছিলেন কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার—মস্তবড় খনিমালিক। বাবা হয়েছিলেন জার্নালিস্ট।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুরেশ্বর বললে—মানুষ কাল তৈরী করে? না, কাল মানুষ তৈরী করে? হয়তো বা দুটোই সত্যি। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরীতে বীরেশ্বর রত্নেশ্বর দেবেশ্বর রায়দের মত জমিদার অনেক ছিল। এঁদের থেকে উন্নত আর বেশী কেউ ছিল না। থাকবার মধ্যে একটা আধটা ঠাকুরবাড়ীর মত বাড়ী—মানুষের মধ্যে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষ ছিলেন জমিদারদের মধ্যে।

বলতে গেলে রায়বাড়ীর জবানবন্দী এখানেই শেষ। কারণ তার পরের কথা—আমার

বাবার কথা, যোগেশ্বর রায়ের কথা, এ শুধু তোমারই জানা কথা নয়, হয়তো এ কালের সকলের জানা কথা। আমার জ্যাঠামশায়ের কথা হয়তো তুমি জান না, কিন্তু বাংলাদেশের যারা বাঙালী ব্যবসাদারদের কথা জানে, তারা যজ্ঞেশ্বর রায়ের কথাও জানে। তার কথা জানলেই বাঙালী ব্যবসাদারের কথা জানা হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব কথা থাক সুলতা, দেবেশ্বর রায় পর্বের শেষ কথাটা বলে নি। সেটা আমিও জানতাম না।

শেষ কথা, দেবেশ্বর রায়ের পাগল স্ত্রীর বৃন্দাবনে নির্বাসন। নির্বাসন দিলেন কে জান? দিলেন শিবেশ্বর রায় এবং যজ্ঞেশ্বর রায়। এবং নীরবে মাথা নত ক'রে দেখলেন আমার বাবা বাংলাদেশের বিখ্যাত জার্নালিস্ট যোগেশ্বর রায়।

আমি কথাটা আবছা আবছা শুনেছিলাম। কিন্তু কখনো জিজ্ঞাসা করে ভালভাবে জেনে নিতে সাহস হয় নি। জিজ্ঞাসা করব কাকে? ছেলেবেলা থেকে শুনতাম ঠাকুমা থাকেন বৃন্দাবনে। বাবার কোন ব্যগ্রতা দেখি নি কোন দিন মায়ের জন্যে। মায়ের কাছেও তাঁর কথা কিছু শুনি নি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁকে পত্র দিয়ে থাকলে জানবাজারের বাড়ীর ম্যানেজার দিয়ে থাকবেন। তিনি পেয়ে থাকলেও কোন উত্তর দেন নি।

তবে চাপা একটা কথা শুনতাম—ঠাকুমা একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। তিনি নাকি স্বামীর মৃত্যুর পর উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লোকে বলে গোয়ানদের পাড়ায় গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কেউ বলত, তাদের বাড়ীতে নাকি খেয়েছিলেন। কথাগুলো এলোমেলো কথা। যার জন্য এ বাড়ীর সঙ্গে, তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক চুকে গেছে।

* * *

তিনি আজও বেঁচে আছেন। কথাটা কিন্তু কারুরই মনে থাকে না। তাঁর কথাটুকু বললেই রায়বাড়ীর কথা শেষ।

সেদিন তাঁর কথা শুনলাম।

সেদিন মানে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। তোমার মনে আছে বোধ হয় মেদিনীপুর শহরের সুধাকরবাবু উকীলের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কলকাতা থেকে গিছলাম মেদিনীপুর। তখন মেদিনীপুর খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন মিস্টার বি আর সেন। তিনি মেদিনীপুরের দমননীতির কড়াকড়ি ক্রমশ শিথিল ক'রে আনছেন। মেজঠাকুমার যে জেল হয়েছিল, তার মেয়াদ শেষ হয়েও তিনি খালাস পান নি, জেলগেটেই তাঁকে আটক আইনে আটকে জেলেই রাখা হয়েছিল। মিস্টার সেন তাঁর কেসের ফাইল প'ড়ে তদন্ত করে তাঁকে ছেড়ে দেবেন। উকীল কথাটা জানতে পেরে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আমি মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করে মেজঠাকুমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এরই মধ্যে কুইনী হিলডা এসেছিল। সঙ্গে খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান কৃশ্চানদের একটি মহিলা।

কীর্তিহাটের লোকেদের বিরুদ্ধে, বিশেষ ক'রে রায়বাড়ীর লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছে। তারা কংগ্রেসকে ভোট দেয় নি বলে তাদের উপর অন্যায় জুলুম করছে তারা। অভিযোগ করতে এসেও আমার কথা শুনে হিলডা এসেছিল আমার কাছে। কুইনীর ইচ্ছে খুব ছিল না, কৃশ্চানদের প্রতিনিধিস্থানীয়া মেয়েটির তো আদৌ ছিল না ইচ্ছে। কিন্তু হিলডার জেদে আসতে হয়েছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছি, কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, আমাকে কীর্তিহাট ফিরতে দাও। সেখানে লোকেদের সঙ্গে কথা বলে, বুঝে উত্তর দেব। যদি নিবারণ করতে না পারি তবে তোমাদের বলে দেব, তখন তোমরা যা খুশী করবে। কুইনীকে আমিই খড়্গপুর ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি, আমিই তার খরচ দিই। না হ'লে হয়তো কুইনী হিলডার কথা শুনত না। তার পরের দিনের কথা বলছি। পরের দিন সকালেই মেজঠাকুমা মুক্তি পেলেন। তাঁকে নিয়ে এলাম শহরের বাসায়।

শীর্ণ হয়ে গেছেন মেজদি। তাঁর কান্তি যেন মলিন হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। মাথার চুলগুলো কেটে ফেলেছেন। বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি মেজদি! আমি তো তোমার সঙ্গে মাস দুয়েক আগে দেখা করে গেছি, এর মধ্যে তোমার শরীর এমন খারাপ হ'ল কেন?

মেজদি ম্লান হেসে বললে—ওরে, খালাস পাব শুনে দুর্ভাবনায় এমন হয়ে গেছি ভাই।

—দুর্ভাবনা কিসের মেজদি?

—দুর্ভাবনা কিসের? দুর্ভাবনা সব কিছুর ভাই। অন্নের দুর্ভাবনা, বস্ত্রের দুর্ভাবনা, মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের দুর্ভাবনা—দুর্ভাবনা কিসের নয় তাই বল!

—আমি বেঁচে থাকতে দুর্ভাবনা ভাবছ মেজদি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেজদি বললেন—রায়বাড়ীতে আমার বড়দি—রায়বাড়ীর বড়গিন্নী, তোর ঠাকুমাকে, তার দুই ছেলে থাকতেও বৃন্দাবনে নির্বাসনে যেতে হয়েছে। আজও কেউ তাঁর খোঁজ করে না। তাঁর নিজের পৈতৃক টাকা ছিল। তাই তিনি মান বাঁচিয়ে বৈষ্ণব হয়ে বেঁচে আছেন। আমার যে কিছুই নেই সুরেশ্বর।

আমি বলেছিলাম সুলতা, বলেছিলাম—মেজদি আমি তো আছি।

হেসে মেজদি বলেছিলেন—না। ও ভরসা করতে বলিস নে। মানী মানুষ যারা তাদের পান থেকে চুন খসলেই অপমান হয়। তারা সব দুঃখ সইতে পারে অপমানের দুঃখ সইতে পারে না। জেল-ফেরত সৎমাকে ধনেশ্বর, জগদীশ্বর সহ্য করবে না রে। তোর ঠাকুমা—রায়বাড়ীর বড়বাবুর স্ত্রী মাণিকবউ-এর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল স্বামীর অবহেলায়। তার ওপর স্বামীর এই মৃত্যুতে হয়ে গেলেন উন্মাদ পাগল।

বলতে বলতে থেমে গেল সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, দেবেশ্বর রায় নদীর গর্ভে পড়েছিলেন অজ্ঞান হয়ে, লোকজনে অনেক খুঁজেপেতে তাঁকে তুলে

নিয়ে এল। আমার ঠাকুমা মাণিকবউ তখন ছিলেন গোবিন্দ মন্দিরে। রাধাগোবিন্দের সামনে সন্ধ্যেবেলা থেকে সে আমলে বারো মাস কথকতা হ'ত; নিযুক্ত কথক ছিল। ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণলীলার কথকতা চলত। মাণিকবউ কথকতা শুনে হাসতেন, কাঁদতেন, কখনও কখনও উঠে গিয়ে গোবিন্দের সামনে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে কথা বলতেন। কথকতা শেষ হ'লে নিজের হাতে শয্যা রচনা ক'রে রাধাগোবিন্দকে শয়ান করিয়ে নিজের ঘরে ফিরতেন। সেদিন বড়বাবুর অসুখের খবর নিয়ে মা'ঠাকরুণকে জানাতে গিয়েছিল অনন্ত, কিন্তু সে তাঁর কানে যায় নি। তিনি শোনেন নি। বার বার বলেছিলেন—যা যা। বড়বাবুকে ঘুমুতে বলগে যা। এখন আমি যেতে পারব না। গেলে ঠাকুর রাগ করবেন। তাতে তারই অমঙ্গল হবে। যা।

অগত্যা কথকতাতেই মধ্যপথে ছেদ টেনেছিলেন কথকঠাকুর। মাণিকবউ ঠাকুরকে শয়ান করিয়ে এসে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে আছড়ে পড়েছিলেন স্বামীর বুকে। আর প্রাণ ফাটিয়ে ডেকেছিলেন—বড়বাবু—বড়বাবু গো, বড়বাবু আমি যে এলাম, কথা বল, আমি তোমার মাণিকবউ, কথা বলবে না? বড়বাবু!

সকালবেলা খবর রটেছিল—সিদ্ধাসনের জঙ্গলে ভায়লা বিষ খেয়ে মরেছে।

মাণিকবউ শুনে নাকি হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। না, হল না সুলতা। শুধু তো বোবা নয়, তিনি যেন শুকিয়েও গিয়েছিলেন। চোখের জল শুকিয়েছিল; কণ্ঠের স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গিয়েছিলেন স্বামীর বিছানার পাশ থেকে।

দেবেশ্বর রায়কে নিয়ে সকলে যখন ব্যস্ত তখন দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে একটি মেয়ে খিড়কির পথে রায়বাড়ী থেকে বেরিয়ে, কাঁসাই পার হয়ে গিয়ে উঠেছিল সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। যেখানে সিদ্ধাসন থেকে খানিকটা দূরে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোয়ান মেয়েপুরুষেরা, মাঝখানে নামানো ছিল ভায়লেটের মৃতদেহ।

ঘোমটার ভিতর থেকে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—"সব্ তো রে, সব্ তো একটু দেখি! ওরে সব্ না। এবার দেখতে দে।"

পুরুষেরা তাঁকে কেউ চিনত না, কিন্তু গোয়ান মেয়েরা অনেকে তাঁকে দেখেছে, তারা চিনত, তারা তাঁকে রায়বাড়ীর বড়গিন্নী ব'লে চিনেছিল। তারা সসম্ভ্রমে লোকজন সরিয়ে দিয়ে দেখতে দিয়েছিল ভায়লেটের মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে ব'সে মাণিকবউ তাকে বলেছিলেন—"বেঁচে পাস নি তাই ম'রে পেলি। নয়? আমি কি করব বল? বিশ্বাস কর, আমাকে এরা ধরে এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তাকে আমি পাই নি। চেয়েছিলাম পাই নি। তুই পেয়েছিলি—তোকে পেতে দেয় নি। আমার দোষ নেই। তা এবার পেলি, এবার শান্তি হল!"

খবর নিয়ে ছুটে এসেছিল একজন গোয়ান। লোকজন গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিল, তখন তিনি বদ্ধ পাগল। কিন্তু পাগলামির একমাত্র সূত্র ওই। ওই ভায়লেট।

বাড়ী এসে ধুয়ো ধরেছিলেন—"ভায়লেট সতী হয়েছে। ওকে সতীঘাটে বড়বাবুর সঙ্গে দাহ কর।"

রায়বাড়ীর অন্দরের মধ্যে একেবারে মাঝখানকার ঘরে তাঁকে জোর ক'রে ভিতরে পুরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। স্বামীকে আর তিনি দেখতে পান নি। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনে বাধালেন হাঙ্গামা। ছেলেদের বললেন—বড়মায়ের শ্রাদ্ধ কর।

ছেলেদের বড়মা মানে, ভায়লেট।

কোন রকমে তাঁকে স্নান করিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে আবার তাঁকে ঘরে বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে কে দরজা খুলে দিয়েছিল কেউ জানে না; মাণিকবউ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সটান গিয়ে উঠেছিলেন গোয়ানপাড়ায়। তাঁর হাতে ছিল পুঁটলী-বাঁধা গহনা আর টাকা। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। যখন খোঁজ হল, তখন রাত্রি অনেকটা, লোকজন সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত; কাঙালীতে কীর্তিহাট ভরে গেছে। লোকের দাওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি গাছতলায় পর্যন্ত মানুষ শুয়ে আছে, বসে আছে। ঘুরছে ফিরছে কাঁদছে এঁটোকাঁটা চেয়ে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কোথায় খোঁজ করবে মাণিকবউয়ের! মাণিকবউয়ের গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, তার মধ্যে তাঁকে চিনে বের করা সম্ভবপর ছিল না। গোয়ানপাড়ার কথাটা কারুর মনে হয় নি।

সকালবেলা খোঁজ হয়েছিল।

গোয়ানেরাই খোঁজ দিয়ে গিয়েছিল। মাণিকবউ গহনার পুঁটলী নিয়ে গোয়ানপাড়ায় গিয়ে ওই গির্জের বারান্দায় বসেছিলেন। সকালে লোকজনদের ডেকে বলেছিলেন—আমি রায়বাড়ীর বড়বউ। তোদের ভায়লা আমার সতীন। বড়বাবু তো ওকেই ভালবাসতেন। তা ভায়লা মল, তার শ্রাদ্ধ হল না। ছেলেদের বললাম—ছেলেরা করলে না। আমি করব শ্রাদ্ধ। তোদের পাদরীকে ডাক, আমার যোগাড়যন্ত্র করে দে। এই নে এই গয়নাগুলো নে, বিক্রী করে আন।

* * *

শিবেশ্বর রায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন, যজ্ঞেশ্বর রায়ও আত্মগোপন করে ছিলেন। খুনের মামলার জন্য তখন ওয়ারেন্ট বেরিয়ে রয়েছে। শ্রাদ্ধ করেছিলেন যোগেশ্বর রায়, আমার বাবা। এবং মাণিকবউ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন ধনেশ্বর আর জগদীশ্বর। আমার বাবা থেকে ধনেশ্বরকাকা এক বছরের ছোট। জগদীশ্বরকাকা ধনেশ্বরকাকা থেকে দু বছরের ছোট। একজনের বয়স উনিশ, একজনের বয়স সতেরো। আত্মগোপন ক'রে থেকেও শিবেশ্বর রায় এই সময়ের অপূর্ব সুযোগটি ছাড়েন নি। ধনেশ্বরকাকা এবং জগদীশ্বর-

কাকা হঠাৎ একদিন গোবিন্দমন্দিরে মাণিকবউয়ের পথ আটকালেন।

মেজদাদু শিবেশ্বর রায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন এই মেদিনীপুরেই—সেই বাড়ীতে; যে বাড়ীতে আমি মেজদির অপেক্ষায় বসে ছিলাম ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। যে বাড়ীতে বসে মেজদির কাছে বসে এই সব কথা শুনছিলাম সেই বাড়ীতেই, আত্মগোপন মানে একটু আড়াল দিয়ে বসবাস করছিলেন। বাইরে Not at home নোটিশ টাঙিয়ে বাস করার মত। তিনি উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, মাণিকবউয়ের এই অপরাধ, এই গহনাগাঁটি নিয়ে গোয়ানপাড়ার গির্জের বারান্দায় পড়ে থাকার জন্যে, তার উপর পাতিত্য দোষ চাপিয়ে, তার ছেলেদের দেবোত্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না।

উকীল নাকি বলেছিলেন—পাতিত্য চাপানো যায় কিনা সে তো আমি বলতে পারবো না, তবে চাপাতে পারলে, মূল দেবোত্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে এটা নিশ্চিত। আর ভেবে দেখুন সেটা ঠিক হবে কিনা। ওই দেবোত্তরের সম্পত্তি পত্তনীদার, দরপত্তনীদার হিসেবে যা ভোগ করেন, তা তো ওদের যাবে না! ভেবে দেখুন ভাল ক'রে, একই মহালে শরীক হিসেবে থাকবেন। সেখানে ঝগড়া হবে।

তাতে শিবেশ্বর রায় দমেন নি। ছোট-তরফের রামেশ্বর বিলেত গেছে। তার স্ত্রী মারা গেছে এখানে। রামেশ্বর বিলেত থেকে হয় ফিরবে না, নয় মেম বিয়ে ক'রে ফিরবে। সুতরাং শরীক এখন তিন তরফ নয়, দু তরফ। দু তরফের এক তরফ বড়তরফকে পতিত করতে পারলে থাকবেন এক এবং অদ্বিতীয় মেজতরফের কর্তা—তিনি শিবেশ্বর রায়। তিনি তার দুই ছেলেকে ডেকে উপদেশ দিয়ে ব্যবস্থা করলেন।

মন্দিরে ঢুকতে দিয়ো না—বলো পাতিত্য ঘটেছে। গোয়ানপাড়ায় কোথায় ছিলেন কার বাড়ীতে ছিলেন, কে বলতে পারে! কি খেয়েছেন কে জানে?

ধনেশ্বর তখন গোয়ানপাড়ার চোলাই করা মদের স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। তখন তিনি উনিশ বছরের নবযুবক। সতের বছরের জগদীশ্বর রায়।

একটু থামল সুরেশ্বর। পাশেই বসেছিল অর্চনা। অর্চনা জগদীশ্বর রায়ের বড় মেয়ে; সম্ভবতঃ বলতে কুণ্ঠাবোধ করছিল।

অর্চনা বললে—থামলে কেন সুরোদা? বাবা জ্যাঠামশায়ের চেয়ে দু বছরের ছোট। তখনও ইস্কুলে পড়েন। রায়বাড়ীর রত্নেশ্বর রায় এইচ ই স্কুলে থার্ড ক্লাসে বছর তিনেক আছেন। তিনি মদ খেতেন রাত্রে, দিনে গন্ধের ভয়ে মদ খেতেন না, স্কুলে যেতে হত, তবে তার বার্ডশাইয়ের ভিতর চরস গাঁজা পোরা থাকত। তিনি তিনটে নেশা করতেন—মদ গাঁজা চরস।

*   *   *

সুলতা বললে—থাক এসব কথা থাক সুরেশ্বর। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

সুরেশ্বর বললে—শুনেই তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে সুলতা, আর রায়বাড়ীর হতভাগ্যেরা এরই মধ্যে বাস করছে, চীৎকার করছে, সে চীৎকার সেদিন শুনেছ খানিকটা, আবার আমার মত চীৎকারও করছে, পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর ব'লে। শোন—আর খুব বেশী নেই সেকালের কথা। অর্চনা মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—আমি বলছি সুরোদা, তুমি থাম। বলেই সে বলে গেল—

জ্যাঠামশাই মানে ধনেশ্বর আর বাবা সেদিন উন্মাদিনী মাণিকবউয়ের পথ আগলালে। —যেয়ো না জ্যাঠাইমা—যেতে পাবে না।

চমকে গেলেন মাণিকবউ—যেতে পাব না?

—না, তোমার জাত গেছে।

—কি? কি? কি?

—তো—মা—র জা—ত গে—ছে।

আমার বাবা জগদীশ্বর রায় হাত-পা নেড়ে ভেঙিয়ে কথা বলে সুলতাদি। সে ছেলেবেলা থেকেই। হাত-পা নেড়ে মুখ ভেঙিয়ে সে বললে—সে-দি-ন কি-রি-শ্চা-ন সতীনের ছাদ্ধ করতে গয়নার পুঁটলী নিয়ে সারারাত গোয়ানপাড়ায় পড়েছিলে। কোথা খেয়েছিলে? কার বাড়ীতে? তোমার জাত গিয়েছে, দেশসুদ্ধ লোক জানে। হৈ-হৈ উঠছে। দশ হাজার বাঙালী এসেছিল। কি বলছে তারা শোন গে! ঢুকতে পাবে না তুমি।

তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিছলেন।

সুরেশ্বর বললে—আশ্চর্য সুলতা, পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে থেকে যখন জ্ঞান হল তখন তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছেন—বড়বাবু তো তাকে ভালবাসতেন, একরকম বিয়ে করেছিলেন। তো বড়বাবুর জাত যায় নাই?

তখন বড়-তরফের সঙ্গীন অবস্থা। আমার বাবা যোগেশ্বর রায় ছুটে গেছেন দাদার কাছে। যজ্ঞেশ্বর রায়ের কাছে। যজ্ঞেশ্বর রায়ও শিবেশ্বরের মত কলকাতায় রয়েছেন। নিজের বাড়ীতে থাকেন না, অন্য বাড়ীতে থাকেন। বিডন স্ট্রীটে ওর যে বাড়ী ছিল, সেই ঠিক পাশের বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে ওয়ারেণ্ট এ্যাভয়েড করে থাকতেন। তাঁর কাছে গেল ছোটভাই।

যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন—মাকে নিয়ে এস কলকাতায়। পাগল সার্টিফিকেট নাও ডাক্তারের কাছে, তারপর একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে বন্ধ করে বেঁধেছেঁধে রেখে দাও। কথাটা বড় চাউর হয়ে গেছে। এ ছাড়া পথ নেই।

বাবা পারেন নি মাকে বেঁধে কলকাতায় আনতে।

জ্যাঠামশাই রাত্রে গিয়ে মাকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন মাণিকবউ উন্মাদ নন অথবা

উন্মাদরোগের উপসর্গটা পাল্টে গেছে। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করেন—ঠাকুর, তুমি এসে বল! সাক্ষী দাও! ঠাকুর!

বাকী সময়টা চুপ ক'রে পড়ে থাকতেন, আর আপন মনে বলতেন—এই তোমার ইচ্ছে, নয়? তোমাকে ভজলে কলঙ্কের ভাগী হতেই হবে? বেশ তাই হোক! হ্যাঁ, আমার জাত গিয়েছে। বড়বাবুকে যখন বিয়ে করেছিলাম তখনই গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো শালগ্রাম হয়ে সাক্ষী হয়েছিলে! আপত্তি তো কর নি? কেন?

আবার চেঁচিয়ে উঠতেন—ঠাকুর, এসে বল! সাক্ষী দাও। ঠাকুর!

এরই মধ্যে সুলতা, জ্যাঠামশাই তাঁর কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ সই করিয়ে নিজেদের নামে ট্রান্‌স্‌ফার করিয়ে নিয়েছিলেন। বাবাও তার ভাগ নিয়েছিলেন।

খবর অন্নপূর্ণা-মা পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন দেখতে ব্যবস্থা করতে। কিন্তু জ্যাঠামশায় তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে দিয়ে তখন চেষ্টা করিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা-মা, তাঁকে এই বাড়ীতে এনে যত্নের মধ্যে রাখতে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এরই মধ্যে মাণিকবউ একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে পালালেন।

পালালেন—একেবারে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে ভিক্ষা করেই খেতেন প্রথম প্রথম। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক বৃদ্ধা বাঈজীর। আগ্রার কৃষ্ণাবাঈ। বাংলাদেশের চুঁচুড়ার কায়স্থ জমিদারগৃহিণী কৃষ্ণভামিনী। দেবেশ্বরের ভিক্ষামায়ের। তিনি তখন বৃন্দাবন-বাসিনী হয়েছেন। অর্থ ছিল প্রচুর। তিনি নিজের কুঞ্জ করে সেখানে বাস করতেন। দেববিগ্রহ ছিল নিজের। পুজো করতেন। পাগলীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। মধ্যে মধ্যে পাগলী চীৎকার করে ডাকত—ঠাকুর—সাক্ষী দাও! এসে বল! ঠাকুর!

বাংলা কথা শুনেই তিনি ওঁকে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়ীতে, যত্ন ক'রে খাওয়াতেন।

ওঁরই বাড়ীতে একখানা ফটোগ্রাফ ছিল—এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ, মুণ্ড মাথা খড়ম পায়ে দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী দেবেশ্বর রায়ের। কৃষ্ণভামিনী দাসীর ভিক্ষাপুত্রের।

সেই ছবি দেখে মাণিকবউ হা-হা করে কেঁদে উঠেছিলেন—ও কে? ও কে? ও কে গো?

তারপর চীৎকার ক'রে ডাকতে শুরু করেছিলেন—বড়বাবু! বড়বাবু। বড়বাবু গো! দেখ—দেখ—তোমার মাণিকবউয়ের দুঃখ দেখ!—ভিক্ষা করছি। বড়বাবু! আমাকে সঙ্গে কর! বড়বাবু!

এরপর পাগলীকে আর চিনতে বাকী থাকে নি কৃষ্ণাবাঈয়ের। তিনি তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে মায়ের মত, শাশুড়ীর মত কেঁদেছিলেন কপাল চাপড়ে বুক চাপড়ে। নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন মাণিকবউকে এবং তাঁকে নিজের সন্তানের মত রেখে কলকাতায় চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন—বউমা এখানে রইলেন।

সেই অবধি তিনি সেখানেই আছেন সুলতা। তিনি ভুলে গেছেন তাঁর সন্তান, সংসার, রায়বাড়ী, কীর্তিহাট ; আর যজ্ঞেশ্বর রায় যোগেশ্বর রায়ও ভুলে গেছেন তাঁদের মাকে। কেন জান? কৃষ্ণাবাঈয়ের আশ্রয়ে থাকার পর আর তাঁকে মা বলে স্বীকার করলে কীর্তিহাটের দেবোত্তর সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না। শুধু তাই নয় সুলতা, বাংলাদেশের ধনী অভিজাতদের মহলে কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে মায়ের বাস করার অপরাধ অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁরা রটিয়ে দিয়েছেন, মা বৃন্দাবনে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। কোন সম্পর্ক তিনি নিজেই রাখেন না।

তা তিনি রাখেন না। তিনি ভুলে যেতেই চান, কিন্তু ভুলে যেতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে এ দেশের কেউ গেলে তাঁর যত্নের প্রশংসা করেন। আর "বহুমাঈজীর" কথায় ব্রজধামের লোকেরা শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান।

মেজদি সেদিন রায়বাড়ীর মাণিকবউ, দেবেশ্বরের অবজ্ঞাতা স্ত্রীর কথা বলে বললেন—আমাকে বরং তাঁর কাছে পাঠিয়ে দে ভাই। বাকী দিন ক'টা আমি তাঁর কাছেই কাটাব।

সুলতা, মাণিকবউরাণী সম্পর্কে সেই আমি প্রথম বিস্তৃত বিবরণ শুনলাম ; বললেন মেজদি। মেজদি আমার কীর্তিহাটের জীবনে ভাঙা রায়বাড়ীতে আমার মা, আমার সহোদরা বড়দি, আমার রূপসী ঠাকুমা সখি। শুনে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল। মনে হল আমার গলাটা কেউ চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাচ্ছে।

ওঃ—মাকে নির্বাসন দিয়ে দেবোত্তরের অধিকার নিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই আর বাবা। আর এইভাবে অপবাদ দিয়েছিলেন মেজদাদু শিবেশ্বর রায়!

মেজদি বললেন—ভাই, রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করেছিলেন। তিনি তো ভগবান।

হায় পঙ্গু ভগবান! হায় রাজ্য! এ রাজ্যের ভার দায় থেকে আমি কি ক'রে বাঁচব বলতে পার ঠাকুমা?—মেজদি?

মেজদি অবাক হয়ে গিছলেন আমার কথা শুনে।

সুলতা, ঠিক এই সময়ে বেলা তখন দুটো ; মেজদি জেল থেকে রিলিজড হয়ে বাড়ী এসে পৌচেছিলেন আটটা সাড়ে আটটায় ; তারপর ঠাকুমার কথা শুনতে শুনতে দুটো বেজে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না, দুটো বেজে গেছে ; কথায় ছেদ টেনে দিলে বাইসিকিলের ঘণ্টা।

টেলি-গিরাম!

* * *

টেলিগ্রাম—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছ—কাম ইমিডিয়েটলি ম্যাটার বেরি সিরিয়াস।

রথীনের কাকা টেলিগ্রাম করেছেন।

কলকাতায় সন্ধ্যাতেই রওনা হলাম সুলতা। মেজদিকে পাঠাতেই হল কীর্তিহাটে। কারণ মেজদি খালাস পেলেও কীর্তিহাটের মধ্যেই তাঁর গন্তব্যের গতিবিধি টেনে দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতায় পৌঁছুলাম রাত্রে। রাত্রি তখন এগারটা। হাওড়া থেকে বরাবরই গিয়ে উঠেছিলাম হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ীতে :

গিয়ে দেখলাম তাঁরা অন্নপূর্ণামায়ের শেষকৃত্য করে সেই মাত্র ফিরছেন কেওড়াতলা থেকে।

ভোরবেলা অন্নপূর্ণামা মারা গেছেন। রাত্রি আটটার সময় থেকে হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় বম্বে থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল রথীন আত্মহত্যা করেছে। টেলিগ্রাম করেছিলেন রথীনের বাবা। রথীন এক নার্সকে নিয়ে বিলেত পালাচ্ছিল। রথীনের বাবা অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়েছিলেন তাকে ধরতে—তাকে ফেরাতে। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—রথীন নেই। আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা শোনবামাত্র অন্নপূর্ণামা বুকে হাত দিয়ে 'কি হল' বলে ব'সে পড়েছিলেন। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যান। ভোর চারটে নাগাদ দীর্ঘ আশী বছরের জীবনে বোধ হয় কালের হাতে হার মেনে ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে চলে গেলেন।

কীর্তিহাটে যখন গিয়ে পৌঁছুলাম সুলতা, তখন কীর্তিহাট অত্যন্ত উত্তপ্ত। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় সরকারী তাঁবু ফেলে রিলিফ সেণ্টার খোলা হয়েছে। একটা ছোট পুলিস ক্যাম্প বসে গেছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে; এদিকে কীর্তিহাটে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের জন্য নেওয়া বাড়ীগুলোতে একটা বড় দল পুলিস এসে বসেছে—তাদের সঙ্গে আছেন একজন এ-এস-পি। সাধারণ তদন্তের জন্য একজন ডেপুটিও এসে রয়েছেন তাদের সঙ্গে। অতুলেশ্বর যা করেছিল বা করতে পারত তা তার নিজস্ব পুণ্য। কিন্তু সেই পুণ্যে বিচিত্রভাবে বোধ হয় কালমাহাত্ম্যে রায়বাড়ী এবং কীর্তিহাট পুণ্যবান হয়ে উঠেছিল। সেকালে পুলিস যার উপর অত্যাচার করেছে, এই কারণে সে-ই পুণ্যবান বলে খ্যাতিলাভ করেছে। সে তোমার অবিদিত নয়। বিচিত্রভাবে গোয়ান নির্যাতন পর্বে জমিদার-বাড়ী এবং কীর্তিহাটের হিন্দু প্রজারা একসঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা পড়ার মত অপরাধে অপরাধী বলে নির্ধারিত হলেও তারা দমে নি; কারণ প্রমাণ ঠিক হাতেনাতে কিছু পাওয়া যায় নি। কীর্তিহাটের কেউই দমে নি। এরই মধ্যে জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করেছেন।

গোটা গোয়ানপাড়াটা পুড়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে জীবন্ত পুড়ে মরেছে হিলডা-বুড়ী। চার্চের দুইদিকে দুখানা খড়ের ঘর ছিল—একখানায় ইস্কুল হত, অন্যখানায় থাকতেন পাদরী সাহেব। হিলডা জ্বলন্ত চার্চে ঢুকেছিল মাদার মেরীর ছবিখানা বাঁচাবার জন্যে। গোয়ানপাড়ার

লোকে বলে—এর মধ্যে কীর্তিহাটের কংগ্রেসীরা আছে আর রায়-জমিদারেরা। আমরা কংগ্রেসকে ভোট দিই নাই বলে কংগ্রেসওলারা গোসা করে আমাদের এখান থেকে ভাগায়ে দিবে বলেছে, জমিদারবাড়ীর লেড়কা অতুলবাবু ভি কংগ্রেসে আছে। জেল থেকে সে হুকুম ভেজিয়েছে। আর জগদীশবাবু আউর সুখেশ্বরবাবুর লেড়কারা হামাদের ভাগায়কে জমিন কিনে লিবে, এহি মতলবে জবরদস্তি জুলুম লাগাইলে। পহেলে হামাদের গাছ কাটিয়ে লিলে।

এর সঙ্গে আরও অনেক অভিযোগ সুলতা। কমলেশ্বর ওদের খাসী ধরে বিক্রী করে দেয়। ওদের পাড়ার মেয়েদের পিছনে ঘোরে। দু'একজন মেয়ের সঙ্গে তার কলঙ্কের সম্পর্কও আছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা দিতে পারে। তারা এখানে একটা প্রতিবাদ মিটিং করেছিল। সুরাবর্দী সাহেবের লোক এবং খড়্গপুরের হাডসন এসেছিল মিটিংয়ে। তাদের উপর কংগ্রেসের লোকে যে অত্যাচার করছে তার প্রতিবাদ করেছিল তারা। সে মিটিংয়ে গোপাল সিং ছত্রির বাড়ীর যে ছেলেটির হাত কুপিয়ে খোঁড়া করে দিয়েছে বিমলেশ্বরকাকা, সেও তাতে বক্তৃতা করেছে। ক্রীশ্চান মুসলমান হিন্দুর মিলিত প্রতিবাদ কমুনাল বলা চলবে না। মিটিংয়ে প্রিসাইড করেছিল হিলডা। তার পাশে ছিল কুইনী। এই মিটিংয়ে কমলেশ্বরবাবু আর কীর্তিহাটের কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা এসে ঢেলা মেরে মিটিং বরবাদ ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিল।

জগদীশ্বরবাবু তাদের পাড়ায় বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে শিকার করবার অছিলায় এসে শাসিয়ে বলেছিলেন, চলে যাও তোমলোগ হিঁয়াসে। দাম দেনেকো লিয়ে তৈয়ার হ্যায় হম। লেকেন হিঁয়া রহনে নেহি দেগা। কভি নেহি!

একটু উল্টোপাল্টা হল সুলতা। আগে জগদীশ্বরকাকার শাসানি, তারপর মিটিং। তার পর ছোটখাটো ব্যাপার। তারপরই একদিন পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া। হিডলা পুড়ে মরল। তার ঠিক দুদিন পরই জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করলেন।

জগদীশ্বর রায়ের আত্মহত্যা আর হিলডার অগ্নিদাহে মৃত্যু, এবং কংগ্রেসকে ভোট না-দেওয়া এই তিনটেকে জড়িয়ে পুলিস তার দক্ষ এবং শক্ত পাক দিয়ে বেশ একটা মজবুত রশি তৈরী করছিল, যাতে রায়বাড়ীর তরুণ ছেলে কটি থেকে কংগ্রেসের বৃদ্ধ সভাপতি রঙলাল ঘোষ সহ কীর্তিহাটের কয়েকজন মাতব্বরকে এক কেসে একসঙ্গে বেঁধে চালান দেওয়া যায়।

আমাকে আমার ম্যানেজার বললে, আপনি এখানে থাকবেন না বাবু, আপনি কলকাতায় চলে যান। এখানে থাকলে বিপদ হবে। এবার—।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম শেষটা শুনবার জন্যে। মুখের দিকে চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বাকীটা সম্ভবতঃ বলার ইচ্ছে ম্যানেজারের ছিল না, তবু সে বললে, এবার মেজতরফকে সেরে দিয়ে যাবে। চষে দেবে পুলিস। গ্রামের লোকও আঙুল বাড়িয়ে সাহায্য করবে না। তার উপর জগদীশ্বরবাবু এবার এলেন যেন সাপের পাঁচ পা দেখে

[ব]লেন। অর্চনা বিধবা হল, আপনি তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন—উনি এক পয়সা খরচ [ক]রেন নি। সেই মেয়ের টাকা উনি নিজের কাবেজে পেয়ে একেবারে বিলকুল ভুলে বসে [থা]কলেন—পুরনো আমলের রায়বাড়ীর দাপট ফিরিয়ে আনবেন। গোয়ানদের সঙ্গে [ক]ংগ্রেসের বিরোধ হয়েছে যেই শুনলেন, অমনি ধরলেন—আমি সোজা করে দিচ্ছি ওদের। [হি]লডাকে ডেকে বললেন, হিলডা, কিছু কিছু টাকা নিয়ে তোরা এখান থেকে চলে যা। [যা]দের আবাদী জমি আছে, তাদের দাম আমি দেব। এখানে তোদের থাকা চলবে না। [আ]মি বারণ করলাম, বললাম—বাবু, সুরেশ্বরবাবু আসুন, তিনি বলে গেছেন দু পক্ষকেই। তা [আ]মাকে ধমক দিয়ে বললেন—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, তুই আমাকে বারণ [ক]রতে আসিস ?—

পিছন থেকে রঘু বললে—লালবাবু! অরচি দিদি আসিয়াছে নিচে।

অর্চনা আমাকে চিঠি লিখেছিল, অত্যন্ত বিব্রত হয়ে চিঠি লিখেছিলো এইসবের জন্যে। তারপর জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করেছেন। না-হলে আমি এসেই ওর সঙ্গে দেখা করতাম। হয়তো ও-বাড়ীতেই নামতাম।

নিচে নেমে এলাম। দেখলাম অর্চনা চুপ ক'রে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। স্থির নিস্পন্দের মত। নিশ্বাস পড়াও বুঝা যায় না। টেবিলের উপর নতদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনায় যেন ডুবে আছে। আমি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি তাও সে বুঝতে পারে নি। আমি ডাকলাম —অর্চনা!

নীরবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বুঝলাম জগদীশ্বর কাকার আত্মহত্যার আঘাতটা মর্মান্তিক হয়ে ওর বুকে লেগেছে। টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল অর্চনা। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কাঁদিসনে ভাই। কি করবি বল? এসব দুর্ঘটনা এমনভাবে ঘটে রে যে এক মিনিট কি আধ মিনিট আগেও কেউ বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না।

অর্চনা বললে, সুরোদা, আমার জন্যে সে আত্মহত্যা করলে। আবার বাবা আমার মুখে কালি লেপে দিয়ে—ছি ছি, সুরোদা—আমি যে ছি ছি করে মরে গেলাম! কি করে আমি মুখ দেখাব বলতে পার? কোথায় যাব বলতে পার?

ঘটনাটা বিচিত্র সুলতা। অর্চনার অদৃষ্ট নয়, রায়বাড়ীর অদৃষ্ট অথবা কর্মফল যা বল তাই।

গোয়ানপাড়া পোড়া এবং জগদীশ্বরকাকার আত্মহত্যার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। জগদীশ্বরকাকা গোয়ানদের উপর খুব চীৎকার ঝঙ্কার করেছেন, অনেক শাসনবাক্য প্রয়োগ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু আত্মহত্যা তিনি তার জন্যে করেন নি।

অর্চনা বললে—সুরোদা, এ কথা মাকেও বলতে পারি নি, তোমাকে বলছি। তবে মা

হয়তো আন্দাজ করেছে। বাবা আমাকে নিয়ে এখানে আসবার পর থেকেই আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। বড় মানুষ! খাওয়া-দাওয়া চাল-চলন সমস্ত কিছুর হাল বদলে দিলেন বাড়ীতে কাজ করবার চাকর রাখলেন, চাপরাসী রাখলেন; খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদে হঠাৎ যেন সব কিছুর বদল হয়ে গেল। এখানে এসেই আমার কাছে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়েছিলেন কয়েক বিঘা জমি আমার নামে কিনবেন বলে। সেই টাকা থেকে এসব হচ্ছিল। জমি পরের নয়, জমি খানিকটা পতিত জমি, তাই তিনি আমার নামে চেক কেটে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমি এসব জানি, বুঝি—কিন্তু প্রথমটা বুঝতে চাই নি, টাকাটা আমি দিয়েছিলাম। কোন কথা, কোথাকার জমি, কার জমি জিজ্ঞাসা করি নি। ইচ্ছে হয় নি সুরোদা। তবে আপসোস হয়েছিল—কেন ও-বাড়ী থেকে চলে এলাম।

ও বাড়ীর কথা তোমাকে বলি নি সুরোদা, বলতে পারি নি। ওখানে, মানে ও বাড়ীতে ওদের এই পুরুষটা পচে গেছে সুরোদা, একেবারে পচে গেছে। আমাদের মতই পচেছে। তবে শহরের পচন সুরোদা। দেখে ধরা যায় না। সুরোদা—।

অর্চনা এতক্ষণ পাথরের মত বসে শুনেই যাচ্ছিল। সে এবার বাধা দিয়ে বললে—ওদের বাড়ীর কথা তোমার রায়বাড়ীর কথার মধ্যে নাই বা বললে সুরোদা। হয়তো দুনিয়াতে এইটেই সাধারণ নিয়ম সুরোদা। মানুষ ওঠে তপস্যা করে, নামে প্রশংসায় মহিমায় অর্থে সামর্থ্যে অসাধারণ হয়ে উঠে বংশ প্রতিষ্ঠা করে যায়। তারপর এক পুরুষ, দু পুরুষ, তিন পুরুষে সব শেষ হয়ে পাঁকের মধ্যে ডুবে যায়। হারিয়ে যায়—আর কেউ খোঁজ করে না। তবে যেখানে যত বড়ত্ব সেইখানেই তত ছোটত্ব সুরোদা; কলকাতা শহর তার এত ঝলমলে সভ্যতা, সেখানে মনুমেন্টের তলায় গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র মানুষকে ডাকছেন, মানুষেরা ছুটে যায় পাগলের মত—ফাঁসিকাঠে ঝোলে, গুলিতে বুক পাতে। আবার সন্ধ্যের পর মানুষের চেহারা পাল্টায়। সে চেহারা তুমি দেখেছ। এবং সবাই জানে। ওদের বাড়ীতেও তাই হয়েছিল সুলতাদি; আমার নিজের দেওর যে সে আমার স্বামীর সব খবর রাখত, রাখত আমাকে বলবার জন্যে। আমার ভয় ছিল তাকে। তাই পালিয়ে এলাম বাবার সঙ্গে। তখন ম্যাট্রিক পাসও করি নি। কালটাও এখন থেকে পনের বছর আগে। তখনও ভালবাসার দাম ছিল, সতীত্বের দাম ছিল আমার কাছে, আর সত্যি কথা বলছি তোমাকে সুলতাদি, আমার স্বামীকে ওই ছ মাসেই প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলাম।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—বাপের বাড়ী এলাম, এসে আর এক বিপদে পড়লাম। আমার টাকা আমার বিপদ হল। বাবা ওই টাকার উপর দৃষ্টি রেখেই আমাকে কীর্তিহাটে এনেছিলেন। তার জন্যে অনেক চোখের জল ফেলেছিলেন।

পাঁচশো টাকা প্রথম নিয়েছিলেন ক'বিঘে ডাঙ্গা লিখে দিয়ে, সে নিয়ে আমার অভিযোগ ছিল না, আগ্রহও ছিল না, ভাবছিলাম—জীবনটা কাটাব কি করে? কি নিয়ে থাকব?

অপেক্ষা করেছিলাম সুরোদাদার, বৃন্দাবন থেকে ফিরলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। সংসারে বলতে গেলে একান্ত আপন-জন, আপন সহোদর থেকেও অধিক ছিল ওই। কিন্তু তার আগেই গোল বেধে গেল।

গোয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া একটা কংগ্রেসের চলছিল ভোট দেওয়া নিয়ে। হিন্দুর গ্রামে কংগ্রেস মানেই শতকরা নিরেনব্বুইজন। এদিকে সুখেশ্বর কাকার ছেলের সঙ্গে আর একটা ঝগড়া ওদের চলছিল দেনা-পাওয়া নিয়ে। সুখেশ্বরকাকার আমল থেকেই ওঁর নিজের একটা মহাজনী কারবার ছিল। ওঁর পর কল্যাণেশ্বর দাদা প্রকাশ্যেই শুরু করেছিলেন। গোয়ানরা ছিল ওঁদের খাতক। সুখেশ্বরকাকা আগে সোনারূপোর জিনিস রেখে টাকা দিতেন, অনেকে বলত তিনি চুরির মালও সামলাতেন। কিন্তু কল্যাণেশ্বরদা প্রকাশ্যে কারবার ফেঁদে জমি-পুকুর-সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে টাকা ধার দিত। বেশী টাকা কাউকে দিত না, কম টাকা চড়া সুদে দেওয়া ছিল তার কারবার। কারবারটা চলছিল ভাল; যাদের কেউ টাকা ধার দেয় না, তাদের টাকা দেওয়ার সুবিধে হল, মহাজন যা খুসী তাই লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ সে সময় নতুন আইন হবে শোনা গেল। ফজলল হক সাহেব ডেট সেটেলমেণ্ট বোর্ড আইন তৈরী করছিলেন। কল্যাণেশ্বর দাদা শোনবামাত্র নালিশ করে বসে থাকলেন। আইন পাস হতে হতে ওদের জমি সব নীলেম করিয়ে নেবেন। ডিগ্রীও হয়ে গেল। বাবাকে ডেকে কল্যাণেশ্বরদা বলেছিলেন—জ্যাঠামশায় অর্চির জন্যে জমি কিনবেন, তা এই ডিগ্রীগুলো কিনে নিন না। ও সবই তো নীলেমে উঠলেই সেল! সে জমি কেনার মতলব মাথায় ঢুকল বাবার। তখন বুঝতে পারি নি আমি। আমার মা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবাদ তিনিও করেন নি। বরং—একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে অর্চনা।

সুরেশ্বর বললে—থাক, তুই চুপ কর। আমি বলছি রে। হ্যাঁ, খুড়ীমা জানতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন—বাবা, অর্চনার ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা তো আর ফেরাবার পথ ছিল না। বিধবা মেয়ে, জীবনটা গোটাই আছে; নগদ টাকা থাকবে না, থাকে না, টাকাটায় জমি কেনা সব থেকে নিরাপদ, থাকবে। আর তা থেকে গোটা সংসারটাই সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবে; ছেলেগুলোকে পড়াতে পারা যাবে। আর একটা মেয়ে আছে, তার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অর্চনার এতে সায় ছিল না। একবার পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। তার দরুন উনি পাঁচ বিঘে ডাঙ্গা জমিও লিখে দিয়েছিলেন। একেবারে ফাঁকি দেন নি।

হঠাৎ অতুল জেলখানা থেকে ওর দলের ছেলেদের কাছে খবর পাঠালে, গোয়ানদের ক্ষমা করো না। কঠিন শাস্তি দাও। নইলে এরপর কীর্তিহাটের লোকদের মান-ইজ্জৎ ওরা রাখবে না। লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে বুকে বসে দাড়ি উপড়ে দেবে। ওখান থেকে ভাগিয়ে দাও। উঠে যাক ওখান থেকে। সুরেশ্বরের কথা শুনো না। সে একজন ধনীর শৌখীন খেয়ালী ছেলে। তাকে বলো এটা জমিদারীর ব্যাপার নয়। এবং জমিদারী এতে চলবে না।

তারপরই পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, জ্যাঠামশায়, ডিগ্রীগুলো জারী করবার জন্যে এর থেকে ভাল সময় আর হতে পারে না। আমি আর ফেলে রাখব না। আপনি যদি নিতে চান তবে কিনে নিন। আমার চোদ্দটা ডিগ্রীতে পাঁচ হাজার কয়েক টাকার ডিগ্রী। চার হাজারে অর্চিকে আমি দিতে পারি। দেখুন। নাহলে আমার আরও খদ্দের আছে। কথাটা ভাঁওতা নয়; গোয়ানদের ঘর পুড়ে গেছে, সরকারী রিলিফ হয়তো মিলবে ঘর করবার জন্য কিন্তু এ অবস্থায় মামলা লড়ে নীলাম ঠেকানো সম্ভবপর হবে না। এবার আদালতের পেয়াদা নিয়ে কীর্তিহাটের লোকেদের সাহায্যে জমি দখলেও বেগ পেতে হবে না। স্টেট সেটেলমেণ্ট আইন পাস হয়ে বোর্ড বসতে বসতে এসব কাজ শেষ হয়ে যাবে। জগদীশ্বরকাকা মেয়েকে এসে বললেন—, কিন্তু কি সংকোচ হল কোথায় সংকোচ হল বলা শক্ত…।

কথাটা অসমাপ্ত রেখে একটু যেন ভেবে দেখলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—বলা শক্তই বা বলছি কেন সুলতা, বলা বোধ হয় খুব সোজা; জমিটা কিনে স্বার্থটা সিদ্ধি হবার কথা জগদীশ্বরকাকার নিজের বলেই সংকোচ হয়েছিল তাঁর। নাহলে হবার কথা নয়। যাক সংকোচ তাঁর হল, সংকোচভরেই কথাটা প্রথম বললেন অর্চনাকে। চার হাজার টাকার চেক একখানা লিখে দে। এ সুযোগ গেলে আর চট করে আর মিলবে না মা। কিন্তু অর্চনা দিলে না। হয়তো সংকোচ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিম্বা গোয়ানদের এই বিপদের মধ্যে ডিগ্রীজারী করে তাদের জমিটুকু আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তি হয় নি—এও হতে পারে। সে বলবে—না বাবা, ওসব জমিটমিতে আমার কাজ নেই। ও আমি কিনব না।

এক ধরনের বিষণ্ণ হাসি আছে যা কান্নার চেয়েও সকরুণ। সেই হাসি হেসে অর্চনা বললে—আমি বুঝতে পারি নি যে বাবা লোভের এবং জেদের এতখানি বশবর্তী হয়ে পড়েছেন। বুঝলে হয়তো চেকখানা লিখে দিতাম। কি করব আমি টাকা নিয়ে? অন্তত তখন তো তাই ভাবতাম। তখন তো পৃথিবী আমার কাছে অর্থহীন হয়েই গেছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি। বাবা আরও দুবার বলে কেমন যেন চোরের মত ফিরে গেলেন। দুপুরবেলা নিজের ঘরে বসে আমাকে গাল দিচ্ছিলেন নেশা ক'রে। তার সঙ্গে মাও খোঁচা দিয়ে দু-চারটা কথা বলছিলেন। আমি স্বার্থপর। আমি সুরোদার কুহকে পড়েছি। সুরোদা না বললে আমি কিছু করব না, এমন ধরনের কথার গভীরে কুৎসিত ইঙ্গিতও ছিল। শুনে আমার মাথা কেমন গরম হয়ে গেল। আমি তাঁর ঘরে এসে প্রথম সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলে ফেললাম—তোমাদের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার আমার কল্যাণের জন্য আমাকে এখানে আনো নি। এখানে আমাকে এনেছ আমার সর্বস্ব শুষে নিতে। কিন্তু সে আমি দেব না। সে আমি বলে দিলাম।

আমি ভাবতে পারি নি সুলতাদি—ওঃ! আমি ভাবতে পারি নি। ওঃ,—একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার অর্চনা বললে—রাত্রে খাবারের সঙ্গে মানে লুচির সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে দিয়েছিলেন মা। বাবার পরামর্শমতই দিয়েছিলেন। যাতে আমি অজ্ঞানের মত ঘুমিয়ে পড়ি। কলকাতা থেকে আসবার সময় টাকা রেখেছিলাম ব্যাঙ্কে, আর গয়না রাখবার জন্যে একটা নতুন লোহার সিন্দুক আলমারি এনেছিলাম। সেটা থাকত আমার মাথার শিয়রে। সেদিন খেয়ে উঠে কিছুক্ষণ পরই মনে হল মাথা ঘুরচে যেন, শরীরটা যেন কেমন করছে; তারই মধ্যে এক এক সময় অকারণে হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ এক সময় ঘুম ভাঙল। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না কিছু, তারপর মনে হল কে যেন কি করছে মাথার শিয়রে। হয়তো নেশার ঝোঁকের মধ্যেই চীৎকার করে উঠেছিলাম—কে? কে? কে?

কার একখানা হাত মুহূর্তে আমার মুখের উপর এসে পড়ল। মুখ চেপে ধরে চাপা গলায় বললে—চুপ্! সে গলার আওয়াজ ভয়ঙ্কর।

হাতখানাও অত্যন্ত কঠিন এবং নির্মম। পেষণের যন্ত্রণার মধ্যে বোধ হয় আমার নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল, আমি একটা গন্ধ থেকে চিনতে পেরেছিলাম এ হাত বাবার। গাঁজার গন্ধ উঠছিল। এদিকে এমনভাবে আমার মুখ চাপা পড়েছিল যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, প্রাণপণে ধাক্কা দিয়ে মুখ ছাড়িয়ে চীৎকার করে উঠলাম—বা-বা! বলতে পারব না সুরোদা, এতখানি শক্তি আমার কোথা থেকে এসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দুখানা হাত সাঁড়াশীর মত আমার গলার উপর এসে পড়ল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে কার যেন গলা শুনেছিলাম—ওগো, ওগো—।

আর কিছু শুনি নি। জানি না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার মুখ মাথা জলে ভিজে গেছে, বিছানা ভিজে গেছে; আর কান্না উঠছে; গোলমাল উঠছে। ও ঘরে বাবা নিজের বন্দুকের নলটা মুখে পুরে ঘোড়া টিপে দিয়েছেন, খুলিটা ফাটিয়ে দমদম বুলেট বেরিয়ে গেছে। তেলোর কাছটা এতখানি জায়গায় একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়ে গেছে।

এখানেই শেষ নয় সুলতাদি, কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারব না। কোন মেয়েছেলে বলতে পারে না। রায়বাড়ী এত বড় বাড়ী। এত তার মান, এত তার মর্যাদা, এখনও জমিদারী সুরোদার টাকার বাঁধনে আটকে আছে—তার মর্যাদা মান তো বাঁচাতে হবে। তার জন্য হতভাগিনী একটা কন্যাকে বলি যদি দিতেই হয় তো না দিয়ে উপায় কি!

ওঃ! বলে সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সম্পদের মধ্যে বিষ আছে। জীবনকে বিষিয়ে দেয়। রায়বাড়ী সেই বিষে একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সুরেশ্বর বললে—ধনেশ্বর

কাকা, মেজতরফের বড় ছেলে, তিনি ভাইপোদের সঙ্গে পরামর্শ করে রটিয়ে দিলেন, কি জান সুলতা? রটিয়ে দিলেন, অর্চনার ঘরে গভীর রাত্রে সাড়া পেয়ে জগদীশ্বর উঠে এসেছিল বন্দুক হাতে করে। কিন্তু কন্যার কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে নিজের ঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। অর্চনার মা মুখ টিপে বন্ধ ক'রে রইলেন। প্রতিবাদ করা দূরে থাক, মুখ তুলে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন না পর্যন্ত। হয়তো তাকাতে পারলেন না।

সুরেশ্বর বললে—সেদিন দুপুরবেলা বিবিমহলে টেবিলের উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত কথা আমাকে ব'লে অর্চনা বললে—আমি কোথায় যাব, কি করব, কি করে এরপর জনসমাজে মুখ দেখাবো বলতে পার সুরোদা? আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দাও।

আমি চুপ ক'রে বসে সামনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধাসনের জঙ্গলের দিকে। যে জানালাটার নিচে মধ্যে মধ্যে গোয়ানপাড়ার মেয়েরা এসে খিল খিল করে হাসত, এবং বিবিমহলের একটু পশ্চিমে কাঁসাইয়ের দহের মধ্যে তারা মৎস্যকন্যার মত সাঁতার দিত, যে জানালাটার ওপাশেই কাঁসাই তীরভূমির লম্বা অর্জুন গাছগুলোর ডালে বসে 'বউ কথা কও' পাখী ডাকত—এটা সেই জানালা। আমি কোন পথই দেখতে পাচ্ছিলাম না। না সুলতা, পাচ্ছিলাম না নয়, পথ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সে কথা বলতে, অন্ততঃ অর্চনাকে বলতে আমার সাহস ছিল না এবং পূর্ণ-সত্য প্রকাশ করতে হলে নিজের ক্ষুদ্রতাও বলতে হবে; অকপটে স্বীকার করছি, পথ ছিল; দেখতে পাচ্ছিলাম অর্চনার আবার বিবাহের পথ, সেই পথই একমাত্র তার সার্থকতার পথ। কিন্তু আমি জানতাম অর্চনা সে পথ নেবে না, নিতে পারে না এবং কীর্তিহাটের রায়-বংশের শেষ সমৃদ্ধ এবং সম্পদশালী পুরুষ, আমার জিহ্বা একথা উচ্চারণ করতে পারছিল না; বলবার চেষ্টা করতে গেলে ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গলা নিজে চেপে ধরি।

অথচ আমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর মডার্ন জার্নালিস্ট যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি নিজে আলট্রামডার্ন আর্টিস্ট সুরেশ্বর রায়। নগ্ন বাস্তবতা যে কি বিচিত্র সত্য তা সেদিন বোধ হয় প্রথম অনুভব করে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনে যাকে জীবনের দাবী বলে অন্তরে অন্তরে মানি, স্বীকার করি, বাইরে তাকে সমাজের দায়ে, বংশমর্যাদার দায়ে স্বীকার করতে পারলাম না। সুলতা, কিছুতেই আমি বলতে পারলাম না অর্চনাকে, অর্চনা তুই আবার বিয়ে কর। বরং মনে করতেই যেন মন কেমন করে উঠেছিল, রায়বাড়ীর বিধবা মেয়ে আবার বিয়ে করবে?

অর্চনা আমাকে আবার প্রশ্ন করলে—বল সুরোদা, বল আমি কি করি এখন! কি করা উচিত?

একটু চুপ করে থেকে বললে—তোমাকে একটা কথা বলি নি সুরোদা, তোমাকে বলি

সেটা। আমার ভয় করছে, টাকা-গয়নার জন্তে আমাকে এরা মেরে ফেলতে পারে। কিংবা আমাকে—

চুপ করে গেল অর্চনা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর মিথ্যে কলঙ্ক দেবে ?

—তা দিতে পারে। কিন্তু দিয়ে তো কোন লাভ হবে না। টাকাটা তো তাতে পাবে না। হয়তো আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে যেটা মাসোহারা সেটা বন্ধ হতে পারে, কিন্তু যে টাকাটা ইনসিওরেন্সের দরুন পেয়েছি—যে গয়নাগুলো আছে সে তো আমারই থাকবে। লোভ তো ওদের এইগুলোর ওপরেই।

বুঝতে পারলাম না অর্চনা কি বলতে চাচ্ছে। বললাম—কি বলছিস তুই ?

অর্চনা শুধু বললে—সুরোদা, সেজকাকার অসাধ্য কর্ম ছিল না। সে সব পারত। দাহু ঠাকুরদের গহনা গালিয়ে বিক্রী করে নিজেদের কতকগুলো পতিত জমি খারাপ জমি বিক্রী দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সবটা করেছিলেন সুখেশ্বরকাকা। উনি তার মধ্যে থেকেও সোনা সরিয়েছিলেন, আর সরিয়েছিলেন দামী পাথর। জানতে পেরেও দাহু কিছু বলতে পারেন নি। কল্যাণেশ্বরদা তার থেকেও ভয়ানক, সে সব পারে। পারে না এমন কাজ নেই। ভয় আমার ওকেই। নইলে কত অনাথা বিধবা মেয়ে গ্রামের লোকের ভরসায় কুঁড়েঘরে দুঃখ মেহনত করে জীবন কাটিয়ে দেয়। পেটের ভাবনা ছাড়া আর কিছুর ভাবনা তো থাকে না। শুধু কল্যাণেশ্বর দাদা কেন ?—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে, সুরোদা, আমার সমবয়সী দু মাসের ছোট আমার থেকে জ্যাঠামশায়ের ছেলে অরুণেশ্বর তোমার জ্যাঠার ছেলে প্রণবেশ্বর —এদের কাউকে বিশ্বাস নেই। তুমি জান না সুরোদা, তুমি যেদিন বৃন্দাবন গেছ, তার পাঁচদিন পর প্রণবেশ্বরদা এখানে এসে হাজির হয়েছে। বাবা মারা যাবার ঠিক পরদিন।

আমি শিউরে উঠলাম সুলতা। চোখ দুটো যেন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে এল। রায়-বাড়ীর দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল। কথাটা মুখে আনতে আনতে আমার জিভ কুঁকড়ে যায়।

অর্চনা বললে—তোমার যায় কিন্তু সেদিন মানে বাবার মৃত্যুর পরই কথাটা ওদের মনে উঠেই ক্ষান্ত থাকে নি, জিভেও বেরিয়েছিল। আমি গিছলাম ঠাকুরবাড়ী। মনের একান্ত দুঃখে মায়ের কাছে চুপ করে বসেছিলাম, কাছারী ঘরে বসেছিল কল্যাণেশ্বর আর প্রণবেশ্বর দা। ওদের কথা হচ্ছিল। দুজনেই তারা আমার মনোরঞ্জন বা মনোহরণের চেষ্টা করবে। কল্যাণেশ্বর বলছিল—পাপ! হুঁ! তুমিও যেমন ও পাপ নিরেনব্বুইটা ঘরে। মুসলমান ক্রীশ্চানদের তো দোষই নেই। আর ও তো খারাপ হবেই। সতের-আঠারো বছরে বিধবা হয়ে ও সতী থাকবে! বেশ আছ তুমি। ও ওই পয়সা কপালে সুরোর ভাগ্যে আছে।

প্রণবেশ্বরদা উত্তর দিয়েছিলেন—আমার বিশ্বাস, যা হবার তা হয়ে গেছে। বলে হাত-

তালি বাজিয়ে হেসে উঠেছিল, তারপর আবার বলেছিল, আমি তো সাফ কথা বলে দিছলাম জামাই ছোকরাকে—রথীনকে। সে বিশ্বাসও করেছিল।

সুরেশ্বর অর্চনাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—সুলতা আমার সেদিন মনে হয়েছিল রায়বংশ ধ্বংস হয়ে যাক। একটা ভূমিকম্প হোক, গোটা রায়বাড়ী থর-থর ক'রে কেঁপে হুড়মুড় ক'রে সব ছেলেপিলে বুড়ো-বুড়ী সব ধ্বংস করে দিক। এদের বেঁচে থাকবার আর কোন অধিকার নেই। আমি দিগ্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কথাটা বলতে পারি নি, সেই কথাটাই বলে ফেললাম, বললাম—তুই আজই আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে চল অর্চনা, কলকাতায় চল। সেখানে তুই নতুন করে জীবন আরম্ভ কর। পিছনটা মুছে দে। ভুলে যা। আমি বলি—তুই পড়া-শোনা আরম্ভ কর। পরীক্ষা দে। তোর যা বুদ্ধি তাতে তুই পাস করতে পারবি। নিশ্চয় পারবি। তারপর নিজে বিচার করে যা হয় করিস। ইচ্ছে হয় আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতিস। না-হয় যা ভাল লাগবে করবি।

—ছি! অর্চনা আমাকে এমন একটা ছি-কার দিয়েছিল উত্তরে যে সেটা আমাকে ছুঁচের মত বিঁধেছিল সুলতা।

আমার রায়বংশে জন্ম সেটা যেন আমাকে চাবুক মেরে মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেটা আমি আজও ভুলি নি। ওর কাছে আমি মাথা হেঁট করেই থাকি। আজও ও ওর ওই সত্যটাকে সত্য করেই তুলে ধরে রেখেছে—রয়েছে। মিথ্যে হতে দেয় নি।

এরই মধ্যে কখন যে বিকেল হয়ে গিয়েছিল সেদিন তা জানতেও পারি নি। জানতে পারলাম নীচের কোলাহলে।

রঘুরা এসে বললে—গোয়ানপাড়ার গোমেশ, ভিকু, আরও দুজন এসেছে, তারা দেখা করতে চায়। সঙ্গে একজন কনেস্টবল আছে।

গোমেশ, ডিক্রুজ আমার কাছেই কাজ করত। তারা এই ভোটের ঝগড়ার পর থেকেই কীর্তিহাটে ঢুকতে হবে বলে ভয়ে আসে না। এবং ভয় শুধু তাদেরই নয়—আমার ওখানকার নায়েবও আমার জ্ঞাতিদের হয়ে তাদের রাখতে সাহস করে নি।

নিচে নেমে গেলাম। গোমেশ, ডিক্রুজ সেলাম ক'রে বললে—হুজুর দুপুরে ফিরে আসছেন শুনে এসেছি হামিলোক। এরপরই "হামিলোকের বাড়ীঘর সব কিছু পুড়ে গেলো বাবু! ছাই হয়ে গেলো!" বলে গোমেশ হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। "কিছু বাঁচলো না বাবু, কিছু না।"

ডিক্রুজ বললে—চার্চ পুড়ে গেলো, মেরী মায়ের ছবি ছিলো পুড়ে গেলো। হামি লোককে রায়হুজুর একশো বরিষের নাগচ হন আনলেন। বসাইলেন। বাবু—

আমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কি করব বল? আমি থাকলে হয়তো এমনটা হতো না। আমি ছিলাম না এমন হয়ে গেল। বলতে পারব না কার দোষ, কে দায়ী।

আর তা বলেও লাভ নেই। যাই হোক, কি করতে পারি ভেবে দেখি। কাল সকালে আমি তোমাদের পাড়ায় যাব। দেখে আসব।

গোমেশ বললে—ডরকে মারে আপনার নোকরি চেড়ে দিয়েছি হুজুর। এই গাঁয়ে আমরা ঢুকতে পারি না। কুইনী একঠো চিঠি দিয়েছে আপনাকে। উভি আপনেকে যাবার কথা লিখেছে। আপনে নিজের চোখ্‌সে দেখেন কি হাল হ'ল গোয়ানদের।

কুইনীর চিঠিখানা খুলে পড়ে দেখলাম, সে লিখেছে—"আপনার কথায় নির্ভর ক'রে কি অবস্থা হয়েছে গোয়ানদের এসে দেখে যেতে অনুরোধ করছি। আজই এলে সুখী হব। কারণ আমি কালই চলে যাব খড়্গাপুর। তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার প্রয়োজন। আজই আসতে অনুরোধ করছি। গোয়ানরা অনেকে ঠিক করেছে, তারা তাদের জমি বেচে দিয়ে হয় খড়্গাপুর চলে যাবে, নয়তো কলকাতা কি আসানসোল।"

মনটা কেমন ক'রে উঠল সুলতা! চলে যাবে? ওরা এতকাল পরে চলে যাবে এখান থেকে? বিবেচনা ক'রে, বিচার ক'রে দেখলে এইটেই ঠিক যে, তাতেই তাদের মঙ্গল ছিল! তারা এসে পড়ত রেলওয়ে কলোনীতে। তাতে ক্রীশ্চানদের মধ্যে এসে অল্পদিনেই তাদের চেহারা পালটাতো। তারা কারখানায় ঢুকে প্রকাশ পেতো নতুন জীবনে। কিন্তু সে কথা মনেই এলো না। তার বদলে মনে এল—মনে হ'ল, চলে যাবে? না—.যতে দেব না।

অহঙ্কারও হ'ল, ওরা আমার কথা শুনবে। গোয়ানপাড়া আমিই নিষ্কর ক'রে দিয়েছি। আমাকেই ওরা আজও রায়বাবু ব'লে মানে। হিলডা, সেদিনও মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে গিয়েও আমি মেদিনীপুরে রয়েছি জেনে আমার কাছে গিয়েছিল।

হিলডা আমার কথা রাখতে গিয়েই এমনভাবে পুড়ে মরল। কুইনীকে মনে পড়ল। কুইনীকে আমিই গড়ে তুলেছি। রায়বাড়ীর বড়তরফের কাছে এত বড় পাওনাদার আর কেউ নেই। আমার অত্যন্ত আপনার জন। শুধু বড়তরফেরই বা কেন? অঞ্জনা দেবীকে ধরলে সব তরফ দেনদার।

তারই জন্যে, সুলতা, আমার ছবির ধারায় দেখো তুমি অঞ্জনা এবং কুইনীর চেহারা এক-রকম। তফাৎ শুধু কালের মেকআপে। রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে ঘর ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে শুধু কোলের কাছে এক অন্ন পঞ্চাশব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু খেতে দেন নি। উপবাসী রেখেছিলেন। আমার পিতামহের আগে দায় তাঁর।

আমি কোন কথা আর ভাবলাম না। অর্চনাকে বললাম—অর্চনা, তুই যা এখন ও বাড়ীতে। আমি গোয়ানপাড়া থেকে ফিরে এসে ও বাড়ীতে যাব। খুড়ীমার সঙ্গে কথা বলে তোকে আমি নিয়ে আসব এ বাড়ী।

অর্চনা মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—গোয়ানপাড়া যাবে সুরোদা? এই সন্ধ্যের মুখে?

হেসে বললাম—ভয় নেই কিছু, ভাবিসনে। আমি তো ক্ষতি কারুর করি নি!

—তা কর নি। কিন্তু তোমার ক্ষতি হলে অন্যের অনেক লাভ হতে পারে সুরোদা!

বললাম—না—না—না। এত ভয় পেলে চলবে কেন! আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব। গোয়ানদের আমি কথা দিছলাম রে। আমার কথাতেই ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ না জানিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিল। আমি বলেছিলাম—আমি চেষ্টা করে দেখি। যদি মেটাতে না পারি, তা হলে যা হয় করবে তোমরা। আমার বিশ্বাস ছিল অর্চনা আমি মেটাতে পারব। রঙলাল ঘোষ এখানকার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, তিনি আমাকে ভালবাসেন। খাতির করেন। আমি এখানকার গোচর বাউ নিষ্কর করে দিয়েছি, আমার কথা থাকবে। কিন্তু তার আগেই তোর সর্বনাশের টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলাম কলকাতা। তারপর বৃন্দাবন। এর মধ্যে আগুন জ্বলে গেছে। আমার একটা দায় আছে ভাই।

সুলতা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনের ঠাকুমার কথা। হোন তিনি পাগল, তবু তিনি আমার ঠাকুমা। তাঁর কথাটা আমার কানের পাশে যেন বেজে উঠল।—নাতি, ভায়লার দেনা আগে শোধ করো ভাই। তোমার ঠাকুরদার এত বড় দেনা আর নেই। এ দেনা শোধ না করলে তাঁর মুক্তি নেই।

একালে পরকাল অন্তত শিক্ষিত লোকে মানে না। আমি মানি কিনা জানি না, তবে সেদিন দশ আনা অন্ততঃ মানতাম না। তবু তাঁর কথাটা সেদিন সত্য বলেই মনে হয়েছিল।

অর্চনাকে বললাম—বলব, আরও কথা আছে তোকে বলব। এসে বলব। আমার না গিয়ে উপায় নেই।

কাঁসাই পার হয়ে গোয়ানপাড়া যেতে এবং ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগে, আর ওখানকার কাজ মেটাতে লেগেছিল ঘণ্টাখানেক।

কাজ খুব সংক্ষেপেই সেরে এসেছিলাম। প্রায় দেনদার যেমন পাওনাদারের টাকা দিতে গিয়ে বলে—হিসেবনিকেশ থাক, এই টাকা আমার আছে, এই আমি দিচ্ছি। এতে যদি খালাস দিতে হয় দিন; না-হলে দলিলের পিঠে উশুল দিয়ে লিখে রাখুন; পরে দেখব হিসেব-নিকেশ ক'রে আর কত আপনার পাওনা।

কুইনী প্রত্যাশা করেছিল আমি আসব। পোড়া চার্চটার পাশে একটা টিনের চালা বেঁধে তখন সেখানে থাকে। হিলডার বাড়ীটা একেবারে পুড়ে গেছে। হিলডার বাড়ীই কুইনীর বাড়ী। ওই চালাটার সামনে বসবার একটু ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। সেইখানেই বসেছিলাম।

গোয়ানপাড়ার লোকেরা ভিড় করে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। মানুষগুলির দৃষ্টিতে একটা বিরোধের রুক্ষতা যেন ঝিলিক মারছে। একটু অস্বস্তি বোধ না করে পারি নি। এ প্রত্যাশা তো করি নি আমি।

কে একজন বলে উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে—"দেখেন আমাদের হাল দেখেন!"

আমি কুইনীকে কাছে ডেকে বললাম—কুইনী, তুমি ওদের বল যে প্রত্যেক পরিবারকে আমি একশো টাকা হিসেবে সাহায্য দেব। আর তোমাদের চার্চের জন্তে আলাদা পাঁচশো টাকা দেব।

এতে সাধুবাদ উঠল না, জয়ধ্বনি দূরের কথা। চুপ ক'রে রইল সকলে। একজন কেউ বলে উঠল—একশো রূপেয়া সে কি হোবে?

আমি হেসে বললাম—কিন্তু এর জন্তে তো আমার কোন অপরাধ নেই।

—আপনার না থাক, রায়বাবুদের দায় আছে। অতুলবাবু কংগ্রেসী কাম ক'রে জেল গেলো, তব ভি রায়বাড়ীর চাল ছাড়লে না। জেলসে হুকুম পাঠালে কি—গাঁও জ্বালা দেও।

অবাক হয়ে গেলাম, আমি, বললাম—অতুলবাবু হুকুম পাঠিয়েছিল?

—হাঁ অতুলবাবু। আমরা জানি, শুনেছি।

মিসেস হাডসন গম্ভীরভাবে বসেছিল, সে বললে—So we have heard—it is a very strong rumour. We shall try to prove it.

কুইনী বললে—সকলেই তাই বলছে।

বললাম—বলুক। সত্য হলে সেটা অতুলের দায়। আমায় নয়। তবে তোমার দিদিয়ার ঘর পুড়ে গেছে, সে নিজে পুড়ে মারা গেছে, তার ক্ষতিপূরণ পুরো করব আমি—

বাধা দিয়ে কুইনী বললে—ধন্যবাদ স্যার, কিন্তু সে আমি চাইনে, নেব না। এখানকার লোক আমি নই। আমি বাঙালী ক্রীশ্চান। আমি খড়্গপুর থেকে কলকাতা চলে যাব। কীর্তিহাট থেকে, গোয়ানপাড়া থেকে দূরে থাকতে চাই।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বললে—আপনি চার্চটি আগাগোড়া নতুন ক'রে দিন। আমার দিদিয়া ওই চার্চের ভিতর মাদার মেরীর ছবি বাঁচাবার জন্তে ঢুকেছিল আর বের হ'তে পারে নি। ওতেই দিদিয়ার তৃপ্তি হবে।

বললাম—বেশ তাই দেব। আর নিজে আমি ম্যাডোনার ছবি এঁকে দেবো।

তবু লোকে খুব খুশী হয় নি। কেউ একজন পিছন থেকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল—জমিদার! হিঁয়া জিমিদারী মারাতে আসছে। থুক্ ফেকো একশোও রূপেয়া পর। কি হোবে বাবা—?

মনে মনে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলাম। কিন্তু কি করব? কোন উপায় ছিল না।

ফেরবার সময় আমার সঙ্গে গোমেশ ডিক্রুজ আসছিল। ওরা আমার কাছে কাজ করত। ওরা সে কৃতজ্ঞতাটুকু ভুলতে পারে নি। বা ওদের প্রত্যাশা তখনও ছিল। ওরা আমার সঙ্গে

আসছিল আমাকে পৌঁছে দিতে। কাঁসাইয়ের গর্ভে তখন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে উপরের দিকে উঠছে। বিস্তীর্ণ বালুময় গর্ভ জুড়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝিরা মুখর হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে তিনটি মানুষ যেন বোবা হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ এক সময় ভিক্রুজ বললে—নোকর হিসেবে আমাদের বাত্ মনে রাখবেন হুজুর। সব লোককে শ রূপেয়া দিবেন—হামরাদের তো বেশী মিনসা চাই।

না বললাম না। বললাম—আচ্ছা।

ওরা এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠতে চাইলে। আবোলতাবোলই বকছিল ওরা। আমি কান দিই নি। আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম টাকাটা বোধ হয় মিথ্যেই অপব্যয় করলাম। বংশের দেনাপাওনা বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। নিরর্থক। অর্থ ই হয় না। কিন্তু এই কথাটা যেন শক্ত এবং সোজা হয়ে ভেঙে পড়া আমার ভার সইতে পারছিল না। বেঁকে যাচ্ছিল। নুয়ে পড়ছিল। আসলে আমি আহত হয়েছিলাম। ওদের এই অকৃতজ্ঞতা আমি প্রত্যাশা করি নি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম গোমেশের কণ্ঠস্বরে। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল—বাবুজী অনেক লোক!

বলেই তারা ছুটে পালাল। আমি চমকে উঠে মুখ তুলে দেখলাম কাঁসাইয়ের ঘাটের উপর অনেক কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ নীরব পাথরের মূর্তির মত। জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

—আমরা কীর্তিহাটের। আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আমার জন্যে—

—হ্যাঁ। আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে।

—কেন? কি ব্যাপার?

—গ্রামের বিচার সভা বসেছে পঞ্চায়েতের। রায়বাড়ীর কালীমায়ের নাটমন্দিরে। আসুন আমাদের সঙ্গে।

গিয়ে দেখলুম—সত্যই নাটমন্দিরে গ্রামের লোকেরা জমায়েত হয়েছে। রায়বাড়ীর প্রবীণতম পুরুষ ধনেশ্বর রায় থেকে প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর প্রভৃতিরা একদিকে ব'সে আছে; অন্যদিকে ব'সে আছে দয়াল দাদা থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা; মাঝখানে বসেছে বৃদ্ধ রঙলাল ঘোষ। পাশে তার উকীল ছেলে।

কংগ্রেসের সভাপতি রঙলাল ঘোষ বিচারক সভাপতি। গ্রামের লোকেরা বিচার প্রার্থনা করেছেন। তার সঙ্গে আজ কণ্ঠস্বর মিলিয়েছেন রায়বাড়ীর রায়বংশধরেরা।

অভিযুক্ত আমি। সুরেশ্বর রায়। রঙলাল ঘোষ বললেন—আসুন বাবা। বসুন আপনার বিরুদ্ধে তো অনেক নালিশ গো!

সুরেশ্বর বললে—দপ্‌ করে যেন আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠি। একদিন এই নাটমন্দিরেই ভয়ার্ত মেজদিদির হাত ধরে প্রায় টেনে এনে ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর সকলের মুখের উপর চীৎকার করে বলেছিলাম, এখানকার মালিক আমি। আমার হুকুম ছাড়া অন্যের অন্যায় হুকুম আমি চলতে দেব না। মেজরায়-গিন্নীর অপমান হলে আমি সহ্য করব না। দিন ঠাকুরমশাই মেজদিকে পুষ্প-চরণোদক দিন।

কথাটা তোমার বোধ হয় মনে পড়বে সুলতা। সম্ভবত আরও মনে আছে সেদিনের কথা, যেদিন সেটেলমেণ্ট সার্কেল অফিসার হরেন ঘোষের সামনে গোচর নিয়ে ধনেশ্বরকাকাদের ঝগড়ার মধ্যে আমি আদিপুরুষ কুড়ারাম রায়ের কড়চার কথা স্মরণ করে বলেছিলাম—কীর্তিহাট বসতবাড়ী আর গোচর নিষ্কর দিয়ে গেছেন কুড়ারাম রায়, তখন ধন্য ধন্য করে উঠেছিলেন এই রঙলাল ঘোষ। সেদিন বলেছিলেন—হ্যাঁ, জমিদারের পুত্র ব্রাহ্মণের ছেলে বটেন বাবা আপনি! নমস্কার বাবা আপনাকে।

মনে পড়ে গেল, রত্নেশ্বর রায় যেদিন নিজের অধিকারে ফিরে এই কালী-মায়ের মন্দিরের বারান্দায় প্রথম কাছারী করেছিলেন, প্রজাদের প্রণাম আর সেলামী নিয়েছিলেন।

মনে পড়ল—তার পরের দিন বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বরকে নিয়ে কাছারীতে বসে পুণ্যাহ উপলক্ষে জমিদারীর সীমানার মধ্যে খেয়াঘাটের ডাক, হাটের ডাক আর মৌজা বীরপুরের মণ্ডলান আদায়ের ডাক করিয়েছিলেন, সেদিনের কথা।

আশ্চর্য সুলতা, জমিদারী নিজে কখনও করি নি। করতেও চাই নি। বরং প্রজারাই অযাচিত ভাবে আমার কাছে বিচারের জন্য এসেছে সময়ে সময়ে। আমি বিব্রত বোধ করেছি। কিন্তু সেদিন—সেদিন তারিখ ছিল ১৯৩৮ সালের মে মাসের শেষ, সেদিন ওই রঙলাল ঘোষের সামনে অভিযুক্ত হিসাবে দাঁড়াবার সময় দেখলাম, রায়বাড়ীর জমিদারত্বের সবটুকু আশ্রয়হারা হয়ে কখন আমার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে বলছে—"আমাকে বাঁচাও। আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য, তারপর সোমেশ্বর রায়, বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় আমাকে গড়ে গেছেন; তারপর থেকে আমাকে সকলে হাতুড়ি মেরে ভেঙে ভেঙে আসছে, তার মধ্যে আমার মরতেও ভাল লাগছিল কিন্তু এইভাবে আত্মসমর্পণ করে বলিদানের জন্তুর মত মরতে আমার আর লজ্জার শেষ নেই—সীমা নেই।"

রঙলাল ঘোষ হাত দিয়ে সামনের আসরে আমার বসবার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমি ভুরু কুঁচকে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললাম—নালিশ আমার বিরুদ্ধে কে করলে আপনার কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক বলে উঠল—আমরা। আমরা গ্রামের লোক। সমস্ত কণ্ঠ ক'টি তরুণ। প্রবীণেরা মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—গ্রামের লোকের অভিযোগ কি, তা আমি

জানি না কিন্তু অভিযোগের বিচারের এই আইন, এই ব্যবস্থা কে করলে ? বিচার উনি করতে বসেছেন কিসের বলে ?

একসঙ্গে অনেকগুলো হিংস্র মানুষ গর্জন করে উঠল। বললে—আমরা দিয়েছি, আবার কে ? গ্রামের লোকেরাই দিয়েছি। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট উনি, উনি ছাড়া বিচার করবেন কে ?

রঙলাল ঘোষ এবারও বললেন—অন্যায় কথা হল বাবা, অন্যায় কথা হল ! দেখুন, জমিদার হোন, ব্রাহ্মণ হোন, যা হোন—দশকে মানব না বললে চলবে না। দেশে আর দশে তফাৎ নেই বাবা। বিচার মানতে হবে। অভিযোগ শুধু গাঁয়ের লোকে করে নাই বাবা; আপনার বংশের এইসব এঁরাও করেছেন।

মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে একটা কি যেন পাক দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চীৎকার করে উঠি। বলি—না-না-না !

আমার নীরবতার মধ্যে একজন কে বলে উঠল—উনি গ্রামের লোকের, দেশের লোকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে একরকম বিরোধ করেই আজ ওই গোয়ানপাড়ায় গিয়ে তাদের ঘরপিছু একশো টাকা সাহায্য দেব বলে এসেছেন। চার্চকে নতুন করে গড়তে যা খরচ লাগবে দেবেন। ইচ্ছে করে গাঁয়ের অপমান করেছেন উনি। তাছাড়া উনি, গোয়ানরা গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, আনতে চাইছে, তাতেও একরকম সায় দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন।

—এ তো আপনি করতে পাবেন না বাবা। এ তো হতে পারে না।

আমি বললাম—সুলতা, নিজেকে শক্ত করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বললাম—কে কাকে দান করবে, কেন করবে—এ নিয়ে কারও কোন আপত্তি চলতে পারে বলে আমি মনে করি না ঘোষমশায়। মাফ করবেন, আপনার বিচার আমি মানতে পারলাম না। গোয়ানদের ঘর পুড়েছে, তাদের সাহায্য করাতে যদি আপনাদের সঙ্গে বিরোধ করা হয়, তবে তাই হল। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

মুহূর্তে সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল—তাই হল ?

সঙ্গে সঙ্গে জনতিনেক বেশ শক্ত-সমর্থ জোয়ান এসে আমাকে রূঢ়স্বরে বললে—বসুন আপনি।

রঙলাল ঘোষ বললেন—মাথা ঠাণ্ডা করুন বাবা, রাগ করে কোন ফল হবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন।

আমি চলে যেতে চাইলাম কিন্তু আমাকে জোর করে ধরে রাখলে ক'জনে। আমি স্তব্ধ হয়ে পাথরের মত দাঁড়ালাম। আমি বসব না, আমি মুখ খুলব না—আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। কিংবা বলতে পার রায়বংশের শেষ জমিদার আমি পাথরের মত অটল থাকতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ মনে হল যেন রায়বাড়ীর পলেস্তার-খসা নোনা-ধরা ইটের ফাঁক থেকে অসম্ভব অবিশ্বাস্য অভিযোগ দাখিল করছে আমার বিরুদ্ধে।

—উনি অহিন্দু, উনি অধার্মিক, উনি টিপিক্যাল জমিদার, এখানে ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি চালিয়ে আমাদের বুকে বাঁশ দিতে এসেছেন। এই গোয়ানদের রায়বাবুরা এনে বসিয়েছিলেন মহাল শাসনের জন্যে। প্রজা দুরস্ত করবার জন্য। এখন প্রজার আমল—প্রজাদের শাসন করবার জন্যে গোয়ানদের কোলের কাছে টানছেন। উনি জানেন না কিম্বা হয়তো জেনেও বুঝতে চান না যে, এই গোয়ানরা মুসলিম লীগের সঙ্গে দোস্তি করে যখন হিন্দু কীর্তিহাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সেদিন রায়বাবুদের কালীবাড়ীর গোবিন্দবাড়ীর উপর আক্রমণ হবে সব থেকে আগে। কম্যুনাল রায়ট বাধলে গোয়ানরা রায়বাবুদের সাহায্য করবে না, লীগের পাণ্ডাদের হুকুমে লীগের গুণ্ডাদের হাতে লাঠি, শড়কি যুগিয়ে দেবে।

তাছাড়া পাকা সাতপুরুষের জমিদারনন্দন উনি, ইংরিজীতে বলে ব্লু ব্লাড, তার মধ্যে লাম্পট্যের তৃষ্ণা আকণ্ঠ। এত বয়স পর্যন্ত বিবাহ করেন নি উনি ; কেন করেন নি ? প্রচুর টাকা আছে, উনি উদারতা দেখিয়ে স্বজন-সেবাপ্রীতি দেখিয়ে টাকা খরচ করেন, মনের এক ধরনের বিলাস চরিতার্থ হয়, প্রশংসা হয়, তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁদের মত লোকেরা বাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ করে নেন।

কথাগুলো বলছিলেন রঙলাল ঘোষের উকিল ছেলেটি। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

—ওই গোয়ানদের পিড্রুস গোয়ান আমার বাবার পিসেমশাই ঠাকুরদাস ঘোষকে খুন করেছিল। লোকে বলে রায়বাহাদুর ইসারা দিয়েছিলেন। গোয়ানদের একটা মেয়েকে নিয়ে এই সুরেশ্বরবাবুরই ঠাকুরদাদা দেবেশ্বর রায়—কেলেঙ্কারির আর বাকি রাখেন নি। শেষ পর্যন্ত ওই গোয়ান মেয়েটার পিছনে পিছনে এসে ওই কাঁসাইয়ের ঘাটে মারা যান। মেয়েটা বিষ খেয়ে মরেছিল। সুরেশ্বরবাবু কুইনী মেয়েটাকে পড়ার খরচ যোগাচ্ছেন। কেন ? লোকে বলে—সকলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—কি বলে তা বোধ হয় কারুর অজানা নয়।—রায়বংশে এ-দোষ চাঁদের কলঙ্কের মত। শুধু রায়বাবুরাই বা কেন, প্রায় সব জমিদারবংশেই আছে। যেখানে বিষয়, সেইখানে ব্যভিচার। তবে রায়বংশে একটু বেশি এই রকম বলে। সে সেই গোড়া থেকে। রক্ষিতা রাখতেন। জাত মানতেন না। ছোটজাত, বড়জাত বামুন পর্যন্ত—আপনাদের আত্মীয় পর্যন্ত মানতেন না।

* * *

সুলতা, এইরকম একটি রাত্রি আমার জীবনে আর কখনও আসেনি। মনে হচ্ছিল আমি মরে গেছি, আমার আত্মাকে অপরাধী করে হাজির করা হয়েছে ঈশ্বরের আদালতে, সেখানে দেখছি যেন আমার বিচারের জন্য টেনে এনে হাজির করা হয়েছে আমার পূর্বপুরুষদের। সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে আমার বাবা যোগেশ্বর রায় পর্যন্ত। আমার বিরুদ্ধে আনা

অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাঁদের জীবনের আচরণ থেকে। আমি যেন দেখছিলাম, হয়তো কল্পনায় দেখেছিলাম, তাঁরা যেন বিস্মিত, বিরক্ত, তার সঙ্গে বিব্রতও বটে। বীরেশ্বর রায় পর্যন্ত ক্ষুব্ধ, তবে বিব্রত নন। রত্নেশ্বর রায় চিন্তা করছেন। সত্যিই কি অপরাধ তিনি করেছেন? পুণ্যের বোঝার চেয়ে কি অন্যায়ের পাপের বোঝাটা ভারী হয়ে উঠল কালের হাওয়ায়? দেবেশ্বর রায় বেদনার্ত, আমার বাবাকে দেখলাম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবেশ্বর রায়, তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন। বীভৎস তাঁর চেহারা। ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁর হাড়গোড় ভেঙে যে বীভৎস মূর্তি হয়েছিল, ঠিক সেই বীভৎস মূর্তি।

* * *

ঘোষের ছেলে বলেই গেল—শুধু জাত? এঁরা সম্পর্কসুদ্ধ মানেন না। অন্তত এঁর সম্পর্কে যা শুনছি এবং বাইরে থেকে দেখেশুনে যে-সত্য অনুমান করা যায়, বোঝা যায়, তাতে অনুমান মিথ্যে বলে ঠিক মনে হয় না। এই তো রায়বংশের বাবুরা—কল্যাণবাবু, প্রণববাবু, এমন কি প্রবীণ ধনেশ্বরবাবু বসে রয়েছেন, এই তো আমার পিছনেই মাথা হেঁট করে বসে রয়েছেন—বলুন না, ওঁরা বলুন না?

ধনেশ্বরকাকা বলে উঠলেন—ছেড়ে দাও না মশাই। ও-কথাটা ছেড়ে দাও না। এখন যার বিচার হচ্ছে, তাই হোক না। গ্রামের লোকের অমতে তাদের উপেক্ষা করে গোয়ানদের এই সাহায্য দিচ্ছেন উনি—

হঠাৎ একটি ছেলে লাফ দিয়ে উঠে আমার সামনে এসে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে বললে—বলুন, স্বীকার করুন অন্যায় হয়েছে! আর বলুন দেবেন না টাকা ওদের?

হঠাৎ যেন আমি আমাকে ফিরে পেলাম। দৃঢ়কণ্ঠে আমি বললাম—না।

—না? ক্রুদ্ধকণ্ঠে সবিস্ময়ে না শব্দটা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হঠাৎ একটা ঘুঁষি আমার মুখের উপর মেরে বসল। লাগল এই ঠোঁটের ডান কোণে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটা কেটে গেল, বেশ গভীর ভাবেই কেটেছিল, মুখের মধ্যে রক্তের স্বাদ অনুভব করলাম। তখন আবার সে ঘুঁষি তুলেছে। সুরেশ্বর রায়ের রায়বংশের কাছে পাওয়া দীর্ঘ সবল দেহখানা শক্ত এবং কঠোর হয়ে উঠল। আমার হাতখানা তার থেকে অনেক লম্বা। শক্ত মুঠিতে তার হাতখানা চেপে ধরে রুখে দিলাম। রঙলাল ঘোষ প্রবীণ মানুষ, সম্ভবত নতুন যুগের মোকাবেলা করা নগ্ন সত্যটাকে স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি চীৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন—এ কি? এ কি কাণ্ড? না—না—

কিন্তু তাঁর কথা কে শুনবে? কেউ গ্রাহ্য করলে না, সভাপতির নির্দেশ,—একদল অল্পবয়সীর দল লাফ দিয়ে উঠে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে যে কি দিয়ে আঘাত করেছিল তা বলতে পারব না। আমি কিছুক্ষণ—সে বোধ হয় মিনিট-দুয়েক রুখেছিলাম,

তার পরই কপালের উপর এসে পড়ল একটা অত্যন্ত কঠিন কিছুর নিষ্ঠুর আঘাত। আমি বুঝতে পারলাম আমি জ্ঞান হারাচ্ছি, বুঝতে পারলাম পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তবু আর্তনাদ করলাম না, কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইলাম না, রায়বাড়ীর নাটমন্দিরের ওপর পড়ে মরতেই চাইলাম—এইটুকু তোমাকে বলতে পারি। কথাটা আমার বিশ্বাস করো। তারপর আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়, মনেও নেই।

জ্ঞান যখন হল, তখন আমি বিবিমহলে বিছানায় শুয়ে। আমার মাথার শিয়রে কেউ বসেছিল দেখতে পাই নি। পাশে দাঁড়িয়েছিল চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারির ডাক্তার। কাঁসাইয়ে ধারের জানালাটার পাশে চেয়ারে বসেছিলেন একজন পুলিস অফিসার। এদিকে দাঁড়িয়েছিল রঘু। সময়টা ভোরবেলা। তার মানে প্রায় সারাটা রাত্রিই এইভাবে কেটেছে। রাত্রে তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় নি। মাথায় আঘাত, চেতনাহীন অবস্থা, এ অবস্থায় এক পাল্কী ছাড়া অন্য কোন যানে এমন রোগী পাঠানো যায় না। তাই বিবিমহলে এনে ডাক্তারকে ডেকে পুলিসের পাহারায় রাখা হয়েছে।

শুনলাম, কেউ শক্ত একটা কিছু সম্ভবত লোহার শিক দিয়ে মেরেছিল আমার মাথায়, পিছন দিক থেকে মেরেছিল। কানের খুব কাছাকাছি। একটু এ-পাশে হলেই জীবন-সংশয় হত। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছিল। তারপরই সশব্দে পড়ে গিয়েছিলাম।

এতক্ষণে সকলের উত্তেজনার ছুটন্ত ধারার মুখে একটা ধ্বস ছেড়ে খসে পড়ে তার গতি রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

এক মুহূর্তে গোটা আসরটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শুধু রঙলাল ঘোষ চীৎকার করে উঠেছিলেন—কি হল? ওরে কি হল? ওরে মারামারি করিসনে। ওরে!

কেউ প্রশ্ন করে উঠেছিল—মরে গেল নাকি? বাধালি ফ্যাসাদ!

ঘোষের উকিল ছেলে শুধু মাথা ঠিক রেখে ডেকে বলেছি—জল, জল! ওরে জল আন, জল!

কতক লোক পিছু হটে সরে গিয়েছিল। কেউ কেউ চলেও গিয়েছিল। কেউ গিয়েছিল জলের সন্ধানে।

ঠিক এই সময়ে বাড়ীর অন্দরের দরজার মুখ থেকে একটি তীব্র নারী-কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল—ছি-ছি-ছি! এমন করে পচে গেছে! গোটা বংশটা এমনি করে পচে গেছে! ছি-ছি-ছি!

এ-কণ্ঠস্বর, সুলতা, গোবরডাঙার খুড়ীমার। সারাজীবন যিনি মুখ বুজে স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছেন আর ঘৃণা করেছেন স্বামীকে, শ্বশুরকে, দেওরদের, সৎ-শাশুড়ীদের, কাকে নয়,

রায়বাড়ীর মেজতরফের ইট-কাঠকেও ঘেন্না করেছেন। ধনেশ্বরকাকার স্ত্রী—ব্রজদার মা।

ব্রজদা সেই যে বউ নিয়ে এসেছিল, অতুল ধরা পড়বার সময়—সেই সময় সে যে আমার কি পরিচয় তার মায়ের কাছে দিয়ে গিছল বলতে পারব না, তবে এই আশ্চর্য গোবরডাঙার অহঙ্কৃতা মেয়েটি আমায় ভালবেসে ফেলেছিলেন—ব্রজদার চেয়েও বেশী ভালবেসেছিলেন।

তিনি তাঁর অভ্যাসমত আপন ঘরে বসেছিলেন, অর্চনা খবরটা পেয়ে ছুটে দেখতে এসেছিল কি হচ্ছে! দোতলার টানা বারান্দায় যেখানে বসে রায়বাড়ীর মেয়েরা চিকের আড়াল থেকে নাটমন্দিরে যাত্রা শুনত, বাঈনাচ দেখত, সেইখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা দেখেই ছুটে গিয়ে নিজের মায়ের পায়ে মাথা কুটতে লেগেছিল।—এইজন্যে—এইজন্যে নিয়ে এসেছিলে আমাকে? মা হয়ে, বাপ হয়ে তোমরা আমাকে এই কলঙ্ক মুখে মাখিয়ে দিতে এনেছিলে? বাপ আত্মহত্যা করে জুড়িয়েছে। তুমি? তুমি কি করবে? একবার বললে না যে আমার কন্যার কলঙ্ক যে দেয়, তার মাথায় বজ্রাঘাত হোক! পারলে না বলতে?

চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন গোবরডাঙার বউ। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে রে অর্চনা, অমন করে চেঁচাচ্ছিস?

অর্চনা চীৎকার করে উঠেছিল—কি হয়েছে গিয়ে দেখে আসুন কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে। সুরোদাকে বলি দিচ্ছে। তার বিচার হচ্ছে।

—বিচার? কিসের বিচার? কে বিচার করছে?

—বিচার করছে রঙলাল ঘোষ। নালিশ করেছে গাঁয়ের লোক, তাদের সঙ্গে কল্যাণদা, প্রণবদা, জ্যাঠাইমা কি বলব—সবাই আছে,—তাদের নালিশ হচ্ছে, সুরোদা অনেক টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিয়েছেন; ছি-ছি জ্যাঠাইমা, ছি-ছি-ছি!

কিসে থেকে কি হয় এবং কেমন করে হয়, এ বলা খুব সহজ নয় সুলতা, কখনও কখনও মনে হয় বলাই যায় না। গোবরডাঙার খুড়িমা মুহূর্তে যেন সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। অর্চনার হাত ধরে ওই ছি-ছি-ছি বলতে-বলতেই—সারা সিঁড়ি নেমে কাছারীর দরজা পেরিয়ে ঠাকুরবাড়ী ঢুকে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি। আসর ভেঙেছে। ধনেশ্বরকাকা তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কাছে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি যত বলেছিলেন—গোবরডাঙার বউ, গোবরডাঙার বউ!—আঃ, করছ কি?

গোবরডাঙার বউ তত বলেছিলেন—তুমি এমন পিশাচ, এমন অমানুষ, ছি-ছি-ছি। দাঁড়িয়ে দেখছ? মিথ্যে নালিশ করছ? ছি-ছি-ছি! এই জন্যে আমার ছেলেগুলো এমন অমানুষ, এমন পশু! ছি-ছি-ছি!—মেজঠাকুরপো গাঁজা খেতো, মদ খেতো. জন্তুর মত রাগ ছিল, তারও লজ্জা ছিল, সেও লজ্জায় আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। আর তুমি? ছি-ছি-ছি! কল্যাণেশ্বর অর্চনাকে জড়িয়ে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে অপবাদ দিচ্ছে, তাই তুমি কানে শুনছ, সায় দিচ্ছ? ছি-

ছি-ছি! ওকে তাড়াতে চাও? এই প্রবৃত্তি তোমার? ছি-ছি-ছি!

কথাটা অর্চনার কাছে শোন; তুই বল অর্চনা—আমি দেখি নি সে গোবরডাঙার খুড়িমাকে, তুই দেখেছিস। বল—জীবনে বোধ হয় একবার তিনি ওই মহিমময়ী মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

* * *

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—সেদিন তিনি যেন নিজেকে ফাটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। আমার কথা শুনে আমার হাত ধরে টেনে নীচে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে এসেছিলেন; মুখে ওই এক বুলি—ছি-ছি-ছি।

তারপর তাঁর সে-মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নাটমন্দিরে—নাটমন্দির ভরা লোক, হেজাকের আলো জ্বলছিল, তুমি পড়ে রয়েছ, রক্তের দাগগুলো কালো দাগড়া-দাগড়া ছোপের মত দেখাচ্ছিল, তারই মধ্যে জ্যাঠাইমা দাঁড়ালেন—সাদা শাঁখের মত গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মোটাসোটা মানুষ, মাথার কাপড় পড়ে গেছে গ্রাহ্য নেই; হেজাকের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করলেন জ্যাঠামশাইকে। সম্ভবত স্বামীর প্রতি জীবনের জমা-করা ঘেন্না, জীবনে সন্তানদের কাছে পাওয়া লজ্জার দুঃখ—সব যেন ফেটে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ল সেদিন সেই নাটমন্দিরে। কি বলেছিলেন সব কথা মনে নেই, বলতে পারব না। তবে একটা কথা মনে আছে। কানের পাশে আমার যেন বেজে উঠছে এই মুহূর্তে, শুধু এই মুহূর্তেই কেন সুরোদা, যখনই কোনক্রমে জ্যাঠাইমা কি সেই দিনের ঘটনা, কি আমার নিজের ভাগ্যের কথা মনে করি, তখনই কানের পাশে এইভাবেই বেজে ওঠে তাঁর কথাগুলো, আর চোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই রাত্তিরের সেই ছবি—হাজাকের উজ্জ্বল আলোয় তেমনি উজ্জ্বল জ্যাঠাইমার মূর্তি, মুখ-চোখ।

ওঃ, বলেছিলেন কথাগুলো যেন বজ্রাঘাতের ধ্বনির মত, চমকে দিয়েছিল সকলকে। আঘাতটা তাঁর নিজের বুকেই বেজেছিল। বলেছিলেন, এইজন্যেই,—এইজন্যেই আমার গর্ভের এতগুলো সন্তান—সবগুলো তার জানোয়ার, জন্তু, প্রেত আর পিশাচ, একটা মানুষ হয় নি। বিস্তু রায়বাড়ীর সব বিষ কি তুমিই খেয়েছিলে? ওঃ, ভাগ্যিস আমার গর্ভে মেয়ে হয় নি! তাহলে তো—। ছি-ছি-ছি!

শেষ পর্যন্ত যে কি হত, কি বলতেন বা করতেন তিনি, তা বলতে পারব না সুলতাদি; ঘটনা বলুন বা যা ঘটেছিল বলুন, তাতে একটা ছেদ পড়ে গেল আর একটা ঘটনা ঘটে। বাইরে পুলিস এসে পড়ল।

ময়না থানায় খবর পাঠিয়েছিল মিসেস হাডসন আর কুইনী। গোমেশ আর ডিক্রুজ সুরোদার কাছেই চাকরি করত, সে জান তুমি; কিন্তু ভোটের ব্যাপার নিয়ে কীর্তিহাটের সঙ্গে গোয়ানপাড়ার ঝগড়া লাগতেই ওদিকে গোয়ানদের পিছনে এসে দাঁড়াল মুসলিম লীগের পাণ্ডা

আর খড়্গাপুরের মিসেস হাডসন। এদিকে কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে সারাদেশ—তার সঙ্গে মহারাজ নলকে বাড়িয়ে দেওয়া কলির শানানো ছুরির মত রায়বাড়ীর কল্যাণদা, প্রণবদা, আমার বাবা, জ্যাঠামশাই, বলতে গেলে এক সুরোদাকে বাদ দিয়ে সবাই।

নল-দময়ন্তীর ব্যাপারটা কলিযুগে ঘটে নি। ঘটলে অন্য রকম ঘটত। কলির শানানো ছুরিখানা দিয়ে কাপড়খানাকে মাঝখানে চিড়ে বাঁধন কেটে পালানোর মত পালাতেন না নল, কলিযুগ হলে দময়ন্তীর বুকে বসিয়ে দিয়ে গোটা কাপড়খানা নিজে নিয়ে পালাতেন।

এখানেও ঝগড়াটা চরমে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম কীর্তিহাটে উঠল গোয়ানদের বয়কট ধ্বর ধুয়ো। তারপরই আরম্ভ হল—গাঁয়ে পেলেই ধরে মারো। ডিক্রুজ, গোমেশ পালালো। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় দোকান হয়ে গেল তিন-চারটে। তারপরই লাগল আগুন। পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া।

গোয়ানপাড়া কংগ্রেস পোড়ায় নি। রঙলাল ঘোষ কিছু জানতেন না। তবে তাঁর উকিল ছেলে জানতেন, তার সঙ্গে জানতেন রায়বাড়ীর কর্তারা। কল্যাণের খাতক ছিল অনেকগুলি, গোয়ান খাতক। অল্প অল্প টাকা সুদে-আসলে বেড়ে বেড়ে তিন-চার গুণ হয়ে বন্ধকী তমসুদে পরিণত হয়েছিল। কল্যাণদা জানতো যে, গোয়ানপাড়া সুরোদা লাখরাজ করে দিলে সেটেলমেণ্টে সে গোয়ানপাড়ার বারো আনা তার। তাই সেদিন যা পেয়েছিল সুরোদার কাছে, তাই নিয়ে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ নতুন আইন হবার কথা শোনা গেল।

ডেট-সেটেলমেণ্ট বোর্ড হবে। খাতক যত টাকা মূল নিয়েছে, তার বেশী পাবে না। আর তা সহজ কিস্তীবন্দীতে শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। কল্যাণদার দশ হাজার টাকা পাওনা, সে-হিসেবে পাঁচ হাজারের কমে দাঁড়াবে। কল্যাণদার চক্রান্তেই ধুয়ো উঠল—গোয়ান তাড়াও, হঠাও।

তার জন্যে লাগল আগুন। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল গোয়ানপাড়া। সরকার থেকে সাহায্য এল, রক্ষা করবার জন্যে পুলিস এল, তার উপর এদের হাত ছিল না। কিন্তু সুরেশ্বরদা সাহায্য করায় এরা বসাল বিচারসভা, ওদিকে সেই খবর গোয়ানপাড়ায় পৌঁছুতেই গোয়ানরা পাঠালে পুলিসে খবর। সুরেশ্বরদাকে এরা অনেকেই বড়লোক বলে খাতির করত। পাড়াটা লাখরাজ করে দেওয়ায় সত্যকার শ্রদ্ধাও অনেকে করত। কিন্তু সেদিনের সে-ব্যাপারটা খাতির কিম্বা শ্রদ্ধার জন্যে তারা করে নি—তারা জেদের বশে করেছিল।

"সুরেশ্বর রায়বাবু তাদের সাহায্য করতে চেয়েছে বলে তাকে ধরে-বেঁধে গ্রামসভা বেঁধে বিচার করছে। এখুনি পুলিস এলে নিজের চোখে দেখতে পাবেন। ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলবে। ইয়োরস ফেথফুলি, মিস্ কুইনী মুকুর্জি এবং মিসেস্ হাডসন। সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেণ্ট গোয়ান এ্যাসোসিয়েশন, কীর্তিহাট, গোয়ানপাড়া।"

অর্চনা বললে—চোখের সামনে দেখছিলাম লোকগুলো চলে যাচ্ছে। নাটমন্দিরের ভিড় পাতলা হচ্ছে। খুব খেয়াল সেদিকে ছিল না। আমি অভিভূতের মত তাকিয়েছিলাম জ্যাঠাইমার দিকে।

জ্যাঠাইমার সে কি মূর্তি!

হঠাৎ কে কাকে বললে—উঠে এস! শুনছ—উঠে এস! পুলিস, পুলিস এসেছে। পুলিস!

রঙলাল ঘোষকে বলছিল তার উকিল ছেলে।

জ্যাঠামশাই, ধনেশ্বর রায়, সুলতাদি, এবার এসে বললেন—থাম, এবার থাম গোবরডাঙার বউ—। পুলিস এসেছে। যাও বাড়ীর ভেতর যাও।

জ্যাঠাইমা যেন বুঝতেই পারলেন না। শুধু তাকিয়ে রইলেন জ্যাঠামশাইয়ের দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—শুনছ? পুলিস,—পুলিস আসছে।

হঠাৎ জ্যাঠাইমা একটা আর্তনাদ করে দুই হাতে কপাল টিপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। তারপর যেন ঢলে পড়ে গেলেন কালীমায়ের পাট-অঙ্গনে।

ওদিকে অনেকগুলো ভারী জুতোর শব্দ তুলে পুলিস ঘরে ঢুকল।

সুরোদা তখন রক্তাক্ত মাথা নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে নাটমন্দিরে, নাট-অঙ্গনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন জ্যাঠাইমা। নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বৃদ্ধ—ধনেশ্বর রায় আর রঙলাল ঘোষ। আর আমি।

একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল; বারকয়েক দপ্ দপ্ করে লাফিয়ে জলে হেজাকবাতিটা নিভে গেল।

জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটল আজ কিন্তু জমিদার রায়বাড়ীর শেষ আলো সেইদিন নিভেছিল সুলতাদি। এ-সত্য দুই চোখ মেলে আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি। সুরোদাও না।

সুরেশ্বর বললে—তাই ঠিক সুলতা, অর্চনা যা বললে, তাই ঠিক। ওই দিনই রায়বাড়ীর শেষ। অন্ততঃ বংশধারার নাটকে জমিদারী অঙ্কের শেষ। মানুষের বংশধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বংশ হয় না, সে কালের সঙ্গে চলে। শুধু এক-একটা পর্বে ছেদ পড়ে। পাঠান মুঘল সুলতান বাদশা—তার আগে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ইতিহাসবিখ্যাত রাজা মহারাজা—তাঁদের বংশ নির্বংশ হয়েছে এমন ভাববার কারণ নেই। খুঁজলে পাওয়া হয় তো যাবে—কোন দোকানদার বা মুটেমজুরের মধ্যে। মানে রাজা মহারাজা বাদশা সুলতান বংশ হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই বেঁচে থাকে তারা। সুলতানশাহী বাদশাহী চরিত্র বা মেজাজ তাদের থাকে না। তাদের কে মনে রাখে বলো? তাদের কথা কে গল্প করে বলো?—

করে না। ভাল লাগে না শুনতে। তাই বলি আমার—বংশে ছেদ পড়ল, শেষ হল। রায়-বংশেও তাই হ'ল। সেদিন যখন প্রজাদের ডেকে আমাকে অপরাধী সাজিয়ে তাদের দিয়েই বিচার করালে আমারই জ্ঞাতিরা, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে রায়বংশের নাটকে যবনিকা পড়ল। এর পর যে বংশধারা রইল—সে নদী নয়— সেগুলোকে নালা বলতে পার।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—সে সময়ে মানে ১৯৩৮।৪০ সালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশে সব জমিদারী বংশেরই অল্পবিস্তর এই দশা হয়েছে। প্রজারা সকলেই বিচার করতে বসুক না বসুক অভিযোগের ফিরিস্তি তৈরী করছিল। কিন্তু জমিদারদের তখনও কাঠগড়ায় হাজির করতে পারে নি। জমিদারী আমলের শেষ দৃশ্যের শুরুতেই রায়বংশের পালা সারা হয়ে গেল। যারা টিকে রইল তাদের অধিকাংশই সরকারকে আঁকড়ে ধ'রে টিকে রইল। রায়বংশ তা পারলে না। না পারলেন ধনেশ্বর কাকারা, না পারলেন প্রণবেশ্বর দাদারা এবং সব থেকে স্বচ্ছল অবস্থা ছিল আমার—আমিও পারলাম না তা। এবং সেইদিন রাত্রেই যা করলাম, তাতে আমি সরকারকে স্বীকার করলাম না, স্বীকার করলাম প্রজাদের। হ'ল কি জান?

আমার জ্ঞান হতেই আমার বিছানার সামনে উপবিষ্ট এস আইটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে জ্ঞান হয়েছে আপনার! কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো সুরেশ্বরবাবু?

নিজের কপালে হাত দিয়ে ব্যাণ্ডেজটায় হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতেই সব মনে পড়ে গিয়েছিল। শুধু বুঝতে পারি নি—পুলিস কোথা থেকে এল এবং কেমন করে এল! প্রশ্নটার উত্তর মিলুক বা না-মিলুক প্রশ্নটা থেকে আরও কতকগুলো ফ্যাকড়া প্রশ্ন বেরিয়ে প্রশ্নটার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছিল। কেন—পুলিস এল কেন? পুলিস এমন ক'রে বসে কেন? আমাকে ঘিরে রয়েছে কেন? আমাকে অ্যারেস্ট করেছে কিনা—ইত্যাদি—ইত্যাদি। আমি ভাবছিলাম। দারোগাটি আবার প্রশ্ন করলে—সুরেশ্বরবাবু, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?

বোধ করি দারোগার গলার আওয়াজ পেয়েই ওঘর থেকে এ-ঘরে এসে ঢুকলেন আর একজন পুলিস অফিসার—যাকে দেখে খট্ করে গোড়ালি ঠুকে দারোগাবাবু সেলাম দিল।

নতুন আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন—জ্ঞান হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার, চোখ মেলেছেন। কিন্তু সাড়া দেন নি।

নতুন আগন্তুকটি অল্পবয়সী এবং উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার আর কোন ভয় নেই—আমরা খুব সময়ে এসে পড়েছিলাম। এখন আপনি সেফ। কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো?

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতেই বললাম—ভাল। বিশেষ কষ্ট কিছু নেই—তবে মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

—ওটা খুব সিরিয়াস নয়। কিন্তু একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে যে আপনাকে। এখন সেটা পারবেন? এখন হলেই ভাল হয়।

পুলিসের কাছে স্টেটমেণ্ট! সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠল। সহস্র প্রশ্নের সবগুলোই রায়বংশ নিয়ে। মনে তো সবই পড়ছিল। ধনেশ্বর কাকা—প্রণবেশ্বরদা—জ্ঞানেশ্বর, অর্চনা, সবার কথা মনে পড়ছিল। স্টেটমেণ্ট দিতে গেলে কোন্ কথা বাদ দেব? কার কথা বাদ দেব? কেমন করে দেব?

জীবনে যে সাহস বা সত্যবোধ থাকলে ব্যাসদেবের মত মহাভারতের প্রথমেই নিজের জন্মকথা—তাঁর পিতা পরাশরের সঙ্গে মা মৎস্যগন্ধার দেহসংসর্গের কথা—অত্যন্ত সহজে বলা যায় বা বলতে পারে মানুষ, তা আমার সেদিন ছিল না—, রায়বংশের কারুরই ছিল না। সে সত্যবোধকে আড়াল করে বা ভ্রূণহত্যার মত হত্যা ক'রে দাঁড়িয়েছিল জমিদারীর মর্যাদা। ওই জমিদারীর মর্যাদাই রায়দের বংশমর্যাদা, তাছাড়া আর কিছু নয়।

ডি-এস-পি, ভদ্রলোকটি ডি-এস-পি, তিনি আবার ডাকলেন—সুরেশ্বরবাবু!

চোখ বুজেই উত্তর দিলাম—বলুন!

—স্টেটমেণ্ট দিতে হবে যে আপনাকে!

—স্টেটমেণ্ট!

—হ্যাঁ। কি হয়েছিল? কি করে আঘাত লাগল আপনার কপালে? কে মেরেছিল আপনাকে? আপনাদের বাড়ীর নাটমন্দিরে এত লোকেরা মিলে কি করছিল?

আমার থেকেও বছর ছয়-সাতের ছোট ছিলেন ভদ্রলোক। ১৯৩৮ সালে আমার বয়স আটাশ—তাঁর বয়স তখন সদ্য বিশ পেরিয়েছে। পুলিস লাইনে তখনও পাকেন নি, পাকলে এইভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিতেন না।

তিনি বললেন—ময়না থানায় গোয়ানপাড়া থেকে দুজন লোক এবং আপনার কর্মচারী আচার্যের চিঠি নিয়ে একজন লোক গিয়ে খবর দেয় যে গ্রামের লোকেরা এবং রায়বাড়ীর অন্য অন্য দেউলে-পড়া শরিকেরা মিলে আপনার বিচার সভা বসিয়েছে। গোয়ানপাড়া থেকে মিসেস হাড্‌সন আর মিস কুইনী মুখার্জী চিঠিতে লিখেছিলেন, গোমেশ এবং ডিক্রুজ এরা দেখে দেখেছে—সুরেশ্বর রায়কে কীর্তিহাটের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে তাদের বিচার সভায়। বাবু সুরেশ্বর রায় একজন কাইণ্ড-হার্টেড ইয়ং মডার্ন জমিদার—উইথ নো প্রেজুডিস অব এনি কাইণ্ড। গোয়ানরা ক্রীশ্চান বলে তিনি তাদের ঘৃণা করেন না। গোয়ানদের ঘরবাড়ী পুড়ে যাওয়ার জন্যে তিনি সকল গোয়ানকে সাহায্য করতে চেয়েছেন বলে কীর্তিহাট পিপল তাঁকে বিচার ক'রে সাজা দিতে সংকল্প করেছে এবং সুরেশ্বরবাবুর জ্ঞাতিরা—যারা সুরেশ্বরবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হতে পারে তারা—। দে হ্যাভ জয়েনড হ্যাণ্ডস উইথ দি ভিলেজারস। তাকে মেরে ফেলাও অসম্ভব নয়। আপনারা তাড়াতাড়ি এলে তাঁর জীবন রক্ষা পেতে পারে এবং গোয়ানপাড়া কারা পুড়িয়েছে তার অব্যর্থ প্রমাণও পেতে পারেন পুলিস বিভাগ।

আমরা বলতে গেলে দৌড়ে এসেছি। অফিসাররা সাইকেলে এসেছেন—আর্মড কনেস্টবলস ডবল মার্চ করে এসেছে সারাটা পথ। এসে আপনাকে জীবন্ত অবস্থায় পেয়েছি এইটেই লাক্ বলতে হবে। মাথাটা কেটে গেছে—অনেকখানি রক্ত পড়েছে। লোকজন কেউ নেই। থাকবার মধ্যে ধনেশ্বরবাবু বসে আছেন তাঁর স্ত্রীর মাথা কোলে ক'রে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় মারা গেছেন—তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে। সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। আর বুড়ো রঙলাল ঘোষ। এবং আপনার খুড়তুতো বোন অর্চনা দেবী।

সুরেশ্বর একটু হাসলে। হেসে বললে—সেদিন সর্বপ্রথম বাঁচাতে চেয়েছিলাম অর্চনাকে। তার কথাটা উল্লেখই করি নি। আর রায়বাড়ীর শরিকদের কথা এবং রঙলাল ঘোষের কথা মনে রেখে ওদের বাঁচাবার জন্য গোয়ানদের কথাটাকেই একমাত্র কথা ক'রে তুলে বলেছিলাম—হ্যাঁ, বিচার একটা হচ্ছিল, রায়বাড়ীর শরিকরাই গ্রামের লোকদের ডেকেছিলেন—বিচার করবার জন্যে। আমারই বিচার হচ্ছিল।

কিসের বিচার? কি অপরাধ করেছিলেন আপনি?

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বলে ফেললাম,—আমার একটু বেশী মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাচ্ছিল গোয়ানদের সঙ্গে—মানে—।

কি বলব ভেবে পাই নি। তবু একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলাম, আন্দাজে আন্দাজে সেই পথেই চলেছিলাম। কথাটা আংশিকভাবে সত্যও বটে। আমার শরিকদের দাবীও ছিল তাই। গোয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হোক আর অন্য অমার্জনীয় কলঙ্কের জন্যই হোক—আমায় ধর্মভ্রষ্ট জাতিচ্যুত ক'রে পতিত করতে পারলেই অন্তত: দেবোত্তরের সেবাইতের অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমি গোয়ানদের কথাটাকে সেই কারণেই আঁকড়ে ধরেছিলাম। তবুও বলতে গিয়ে থামতে হল। সত্যকে খালি মাথায় ধরে নিয়ে অনায়াসে চলা যায়, কিন্তু রাজাগিরি বা জমিদারগিরির পাগড়ী বা তাজের উপর চাপানো যায় না—তাতে ওই তাজ বা পাগড়ী ভেঙে যায় চেপ্টে যায়, অন্তত: পাগড়ী তাজ লজ্জিত হয়, লাঞ্ছিত হয়। আমি থেমে গেলাম।

কিন্তু পুলিস অফিসার ছাড়বেন কেন—তিনি যুগিয়ে দিলেন—

—মানে? বলুন—সুরেশ্বরবাবু।

—মানে! মানে তাদের সম্পর্কে কি বলব? বলব আমার কিছু দুর্বলতা আছে!

—দুর্বলতা? I See, কি দুর্বলতা? বলুন!

ভদ্রলোক আমাকে ঠেলে ঠেলে যেন কোণে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যে শক্তিতে আমি নখদাঁত বের করে দাঁড়াতে পারতাম তা আমার ছিল না। আমি বলতে পারতাম সুলতা বলতে আমি গিয়েওছিলাম আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ঋণের কথা; বলতে পারতাম আমার ঠাকুমার কথা; অনায়াসে বলতে পারতাম—আমার ঠাকুমা আমাকে বলেছেন—

ভাই নাতি, তোমার ঠাকুরদার সব থেকে বড় ঋণ ওই গোয়ানদের কাছে। ভাই, তোমার ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের সময় সেই ঋণ শোধ হ'ল না, শোধ করবার কথা কেউ ভাবলে না দেখে আমি গোয়ানপাড়ায় গির্জের পাদরীর কাছে—পাড়ার লোকেদের কাছে গিয়েছিলাম—ঋণ শোধ করতে। কিন্তু তাও হয় নি। উপরন্তু আমার জাত গেছে ব'লে আমাকে ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে দেয় নি। আমাকে এনে কলকাতায় বন্ধ রেখেছিল। সেখান থেকে আমি বেরিয়ে ভাগ্যক্রমে বৃন্দাবনে এসে গোবিন্দের আশ্রয় পেয়েছি।

বলতে বলতে সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। সে চুপ করলে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, সেদিনের সে অবস্থা আমি কখনও ভুলব না। ওঃ, কে যেন আমার গলা টিপে ধরলে। সেদিন জানতে পারি নি, বুঝতে পারি নি, তবে আজ বুঝতে পারি, বলতে পারি—গলা টিপে ধরেছিল আমার জমিদারীর ইজ্জৎ; কুড়ারাম ভটচাজ—জমিদার হয়ে রায় খেতাব নিয়েছিলেন। রায়বংশ জমিদারবংশ, রায়বাড়ীর মর্যাদা জমিদারীর মর্যাদা। ব্রাহ্মণের মর্যাদা নয়। বেদব্যাসের মর্যাদা আর পাণ্ডব কৌরবদের মর্যাদা আলাদা সুলতা। বেদব্যাসের পিতৃমাতৃ-পরিচয়ের মধ্যে কোন আবরণ নেই—কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর এবং পাণ্ডবদের সত্যকার পিতৃপরিচয় কানাঘুষোর মধ্যে লোকে বলাবলি করেছে, উচ্চারণ করতে বা এ নিয়ে গবেষণা করতে কারুর সাহস হয় নি।

আজ সত্যকেই তোমার সামনে উদ্ঘাটিত করছি। সেদিনের মত জমিদারী ইজ্জতকে বড় করছি না, সেই সঙ্গে এই সত্যটুকুও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি সুলতা যে এই ইজ্জত মিথ্যা হলেও মূল্যের দিক থেকে কম নয়। খাটো কাপড় কি বল্কল পোশাকের সঙ্গে রাজা জমিদারের পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বিচার করে দেখ,—প্রমাণ তার প্রত্যক্ষ।

পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ঋণের কথা বলতে গিয়ে বলতে পারি নি আমি। জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলেছিল—না, তুমি বলো না। ছি!

ডি-এস-পি আবার প্রশ্ন করেছিলেন—সুরেশ্বরবাবু!

আমার মনে পড়ছে কপালের ব্যাণ্ডেজে আমার চাড় পড়েছিল, টনটন করে উঠেছিল কপাল। আমি কপাল কুঁচকে বলেছিলাম—এই দুর্বলতার মানেও আমাকে বলতে হবে?

—তা হবে সুরেশ্বরবাবু। না হ'লে এর মানে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তা যে কিছু কিছু করি নি তা নয়। করেছি। ধনেশ্বরবাবুর একটা স্টেটমেণ্ট আমরা নিয়েছি। এবং সেটাকে আমরা সত্য বলেই মনে করি। তাঁর স্ত্রী শুনলাম ব্রেনে হেমারেজ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মৃত বলেই ধরা যায়। এই মুহূর্তে তিনি মিথ্যা বলবেন না। কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম; কারণ তখনও আমি গোবরডাঙার খুড়ীমার খবর জানতাম না। আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তিনি নাটমন্দিরে ঢুকেছিলেন। ডি-এস-পির কথায় বাধা দিয়ে আমি বললাম—একসকিউজ মি সার, কি বলছেন আপনি তা তো বুঝতে পারছি না। কে—

কার কথা বলছেন মৃত বলে ধরা যায় ?

ডি-এস-পি বললেন—ধনেশ্বরবাবুর স্ত্রী। তিনি এই বিচারের আসরে প্রতিবাদ করবার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ডাক্তার দেখেছেন, বলছেন—ব্রেনে কোন শিরা ছিঁড়ে হেমারেজ হচ্ছে। বোধ হয় বাঁচবেন না। বাঁচলেও প্যারালিটিক হয়ে সেবার ধন হয়ে বেঁচে থাকবেন।

আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল। আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। কি বিচিত্র পরিচয়ই না রেখে গেলেন ব্রজদার মা! ওঃ!

ডি-এস-পি আমাকে ডাকলেন। বললেন—আমার কাজটা আমি শেষ করে নেব সুরেশ্বরবাবু। যা বলছিলাম আমি—যাঁর স্ত্রী এই মুহূর্তে মৃত্যুশয্যায় তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না এইটেই ধরা যায়। ধনেশ্বরবাবু এই মুহূর্তে যা বলেছেন তাকে আমি সত্য বলেই ধরে নিয়েছি।

—কি বলেছেন তিনি না জানলে কি ক'রে এর উত্তর দিতে পারি বলুন!

তিনি বলেছেন—রায়বংশের আপনার লাইনটায় একটা দোষ আছে। সেটা আপনার পিতামহের ছিল, আপনার বাবার ছিল এবং আপনার মধ্যেও সেটা ফুটে উঠেছে। অন্যেরা নানারকম অপবাদ যা দিচ্ছে তা সবই মিথ্যে। সেগুলো বিষয় নিয়ে আক্রোশবশে দিচ্ছে। কিন্তু গোয়ানপাড়ার হিলডা পিক্রুজের সম্পর্কে নাতনী কুইনী মুখার্জি বলে একটি মেয়েকে আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাকে ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। তার কলকাতায় একখানা বাড়ী আছে, তা নিয়ে কি গোলমাল হয়েছিল, আপনি অনেক টাকা খরচ করে সে বাড়ী ঝঞ্ঝাটমুক্ত ক'রে দিয়েছেন—

খানিকটা থেমে ডি-এস-পি বললেন—ধনেশ্বরবাবু বললেন—গোয়ানদের মধ্যে কয়েকটা খারাপ মেয়ে আছে, তারা প্রায় ব্রাত্য শ্রেণীর। তাদের সঙ্গে আপনার কোন অপবাদ বা গোপন সম্পর্কের কথা আজও পর্যন্ত তিনি শোনেন নি। এবং বিশ্বাসও করেন না। তবে কুইনী সম্পর্কে কিছু কথা তাঁর কানে এসেছে। সে কুইনীর ছবি এঁকেছে। কুইনী মধ্যে মধ্যে তার বাড়ী বিবিমহলে আসা-যাওয়া করেছে। কল্যাণেশ্বরবাবু বললেন—তিনি হিলডাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ঐসব কি হচ্ছে হিলডা? সুরোবাবুর মতলবটা কি? তাতে সে বলেছিল—সুরোবাবু যে মতলব করবে তাই হাসিল হবে। তুমরা টাকা খরচ করো, এমনি জিমিদার হও, তুমার মতলব ভি হাসিল করদেগা। কুইনী তো সুরোবাবুর ঠাকুরদাদার—

সুলতা, আমার বুকের ভিতর থেকে মুহূর্তে কে যেন কথা বলে উঠেছিল। আমি ডি-এস-পি'কে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম—ইয়েস সার, আমি স্বীকার করছি কুইনী সম্পর্কে আমার উইকনেস আছে। পারসোনাল উইকনেস। আমি তাকে স্নেহ করি।

ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডি-এস-পি বললেন—দোহাই আপনার, প্লিজ কল স্পেড এ স্পেড। ভাইয়ের মত, বোনের মত, প্ল্যাটোনিক ইত্যাদি কথাগুলো বলবেন না। আমাদের পুলিসী শাস্ত্রে এগুলো নেহাতই ফাঁকা কলসীর আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের মধ্যে রক্ত যেন বিদ্রোহ করে টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছিল। আমি উঠে বসে বলেছিলাম—লেট মি ফিনিশ প্লিজ! আমার কথা ঠিক শেষ হয় নি। তার আগেই আপনি কথা বললেন।

—ও, আই এ্যাম সরি! বলুন কি বলছেন? শেষ করুন। আপনি তাকে স্নেহ করেন—। বলুন!

—হ্যাঁ, আমি তাকে স্নেহ করি। স্নেহ এবং ভালবাসায় তফাৎ খুব বেশী নয়। একটু মাত্র। বয়সে ছোট যাকে ভালবাসি তাকে স্নেহও করি। এবার কুইনী সম্পর্কে আমার ভালবাসার স্বরূপ বা মানে আপনার অভিধান মত করে নিতে পারেন।

—তার সঙ্গে আপনার দেহসম্পর্ক হয়েছে কখনও?

চমকে উঠেছিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বলেছিলাম—না।

—তা হলে? ইউ স্পেণ্ট সো মাচ মানি অন হার!

আমি হেসে বলেছিলাম—আমার টাকার অভাব নেই স্যার। একলা মানুষ টাকা ঠিক খরচ করতে পথ পাইনে। জমিদারের ছেলেদের মেজাজ এবং চরিত্র তো জানেন; বিয়ে ক'রি নি, চরিত্রদোষ চলিত অর্থে এখনও নেই। কুইনীকে ভাল লেগেছে তাকে গড়ে তুলছি, পিছনে খরচ করতে ভাল লাগছে। তারপর যা হয় হবে। এই পর্যন্ত বলতে পারি। বেশী আজ আর বলতে পারব না। শরিকরা বিচারসভা ডেকেছিল এই জন্যে। আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন—আমার মতলবটা কি? অনেকের মনে—মানে আমাদের শরিকদের ধারণা আমি ওকে বিবাহ পর্যন্ত করতে পারি। দু'একজনের ধারণা—মধ্যে কুইনী আর হিলডা বাড়ীর গোলমালের জন্যে কলকাতা গিয়েছিল, তখন রেজেস্ট্রি-কেজেস্ট্রি করে বিয়ে একটা হয়ে গেছে। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল। আমি ঠিক চিনিনে, একজন আমার সঙ্গে তর্ক করছিল, আমি রাগের বশে তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে পড়ে গেলাম আছাড় খেয়ে, পড়বার সময় শক্ত একটা কিছুতে আঘাত লেগে আমার মাথাটা কেটে গিয়ে থাকবে। আমি মাথায় একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছি মাত্র, তার বেশী কিছু বলতে পারব না। জ্ঞান হয়ে দেখছি আমি এখানে শুয়ে আছি।

ডি-এস-পি এতক্ষণে বুঝলেন—কেসটা ফেঁসে গেল। তিনি দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—সুরেশ্বরবাবু!

—বলুন!

—আপনার মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে নি?

—না। ওটা পড়ে ছিল। আমারই হাতের কাছে ছিল ওটা। আঘাত আমাকে কেউ করে নি।

ডি-এস-পি আর কিছু না বলে চলে গিছলেন রাত্রির মত।

পরের দিন সকালে ডি-এস-পি আবার এসেছিলেন আমার কাছে। তখন গোবরডাঙার খুড়ীমা মারা গেছেন—এ বাড়ীতে কান্নার রোল উঠেছে। আমি বসে আছি মাথা হেঁট ক'রে। চারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার ব্যাণ্ডেজটা আবার ভাল ক'রে বাঁধছে। কপালের ক্ষত থেকে আবার রক্ত পড়তে শুরু হয়েছিল।

ডি-এস-পি উপরে উঠে এসেছিলেন—সঙ্গে তাঁর কুইনী। কুইনীর মুখ-চোখ যেন থম্‌থম্ করছিল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম আমি। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড যেন চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ল মেদিনীপুরের বাড়ীতে মাসখানেক আগে কুইনীকে দেখে ঠিক এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। সহস্র নারীর মধ্যে যে নারী এক অজ্ঞাত বিচিত্র কারণে এক বিশেষ পুরুষের কাছে সবচেয়ে বেশী কামনীয়া হয়, রূপের ব্যাকরণের শত ত্রুটি সত্ত্বেও সব থেকে বেশী রমণীয়া হয়, সেই বিচিত্র কারণেই কুইনীকে দেখে আমার চিত্ত আমার দেহের অণুপরমাণু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কুইনী কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠেছিল—আপনাকে আমি ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি। আপনাদের বংশকে আমি জানি। আপনারা অত্যাচারী, শোষক, আপনারা ব্যভিচারী, লম্পট। আপনারা মিথ্যাবাদী প্রতারক। আপনি এই কুমতলবে আমাকে পড়ার খরচ দেন এবং আমার বাড়ীর টাকা দিয়েছেন তা আমি জানতাম না। আমি আপনার টাকা আর নেব না। গোয়ানপাড়ার কোন লোক আপনার সাহায্য নেবে না।

আমি তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। মুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম। কুইনীর রূপের স্বরূপ কেমন, সে বিচার অন্যে করতে পারে, আমি পারি না। তাকে দেখলেই সে আমার একান্ত আপনার, কিংবা সে আমার এমনি একটা—এমনি একটা ইমোশনাল ধারণা আমাকে যেন অভিভূত করে দিত। তা এখনও দেয় সুলতা।

ডি-এস-পি আমাকে সেই পত্র এবং কাগজগুলো দেখিয়েছিলেন, যেগুলো কুইনী একদিন বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে এসে আমাকে দেখিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার মুখে অস্তগামী সূর্যের আলোপড়া তার মুখ আমার মনে পড়েছিল সেদিন। সেদিন কাঁসাই পার হবার সময় কুইনীর ছবিটা দেখাচ্ছিল শিল্যুটের মত, তাও মনে পড়েছিল।

ডি-এস-পি বলেছিলেন—এগুলো দেখেছেন তো আপনি ?

বললাম—দেখেছি।

—তা হলে ?

—কি তা হলে ?

—কোন্‌টা সত্য ?

—যদি বলি দুটোই সত্য।

—বলব মিথ্যে বলছেন একটা।

—না। তা মনে করিনে। তবে যা খুশি ধরে নিতে পারেন।

একটু হেসে বলেছিলাম—আপন বলেই ওকে ভালবাসি। এই সত্যটা কেন সত্য হবে না বলুন তো ?

সুলতা, এর পরের দিনই জীবন আমার দুদিক থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। দুদিক থেকে কেন, তিন দিক থেকে।

কীর্তিহাটের শরিকদের তরফ থেকে।

কীর্তিহাটের লোকদের তরফ থেকেও।

গোয়ানপাড়ার লোকদের তরফ থেকেও।

কেউ চাইল না আমাকে।

বারো দিন পর, গোবরডাঙার খুড়ীমার শ্রাদ্ধের পর অর্চনাকে নিয়ে আমি কলকাতা চলে এলাম। ব্রজদা টেলিগ্রাম পেয়ে বিহার থেকে এসেছিল মা'র শ্রাদ্ধ করতে। সাহায্য করেছিল ব্রজদা। কীর্তিহাটের জমিদারী জীবনে যবনিকা টেনে দিলাম বলে ঘোষণা করেই কলকাতা এলাম। কয়েকদিন পর বৃন্দাবন গিয়ে নিয়ে এলাম রায়বাড়ার মেজহুজুর শিবেশ্বরের কেনা তৃতীয়পক্ষ সেই পুরোহিতকন্যাকে। গিয়ে বললাম—তোমার স্বামীর মেজছেলের কন্যা অর্চনা। তুমি তাকে বাঁচাতে জেলে গেছ। এবার ফিরে চল—তার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি রেহাই নেব। আমার বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন। আমি তা উড়িয়ে দেব। চলে যাব কলিযুগের স্বর্গে ; স্বর্গ বল স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বল বৈকুণ্ঠ—জীবনের মোক্ষধাম ইয়োরোপ। ইয়োরোপ যাব। তা ছাড়া কি করব ? সংসারে সেকালে পয়সা যার থাকত সে কাশী বৃন্দাবন যেত। একালে ইয়োরোপ যায়। আমি ভেবেছিলাম গিয়ে আর ফিরবই না। ওখানেই থেকে যাব।

যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। যাবার আগে তোমাকে রুইনীর ছবিটা প্রেজেন্ট করেছিলাম মামাতো বোনের মারফৎ। তুমি রিফিউজ করেছিলে। সেটা সেদিন আমার বগলেই ছিল।

ওঃ; ভাগ্যে তুমি ছবিখানা নাও নি সুলতা! কেন জান ? ওই ছবিখানা নতুন করে আঁকতে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে যেতাম। পারতাম না। মনে হ'ত পারব না। কিছুতেই পারব না।

সুরেশ্বর বললে—ভেবেছিলাম, ইয়োরোপ থেকে ফিরব না। ওখানেই থেকে যাব। আমার বাবা জার্মানীর হাসপাতালে জীবনে ছেদ টেনেছিলেন—আমিও তেমনি ভাবে ছেদ টেনে দেব। তারপর যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর ছেলেরা এবং শিবেশ্বর রায়ের পতিত বংশের প্রেতেরা কে কি করলে বা করবে তা নিয়ে কোন চিন্তাই করব না। ইয়োরোপে গিয়ে জীবনের অবদমিত সমস্ত বাসনাকে মুক্তি দিয়ে দেব; আমার যা অর্থ আছে—তাই দিয়েই সিংহদ্বার না হোক—একটা বেশ প্রশস্ত ফটক খুলে দেওয়া হবে।

বাসনা আমার ছিল। কারই বা থাকে না! তোমাকে নিয়েই তো বাসনা আমার কম উল্লসিত কম উচ্ছ্বসিত হয় নি। কল্পনা তো অনেক করেছিলাম। কিন্তু এক ঠাকুরদাস পালের রক্তের নদীই তোমাকে আমার নাগাল থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবং আশ্চর্যভাবে রায়বংশের গোপন পরিচয় আমার সামনে তার গোপন অপরাধের ফিরিস্তি খুলে দেখিয়ে দিলে দুনিয়ার কাছে আমাদের দেনা কত। এবং সেই দেনার সুদ কি বিচিত্রভাবে প্রকৃতির নিয়মে আমরা আদায় দিচ্ছি, দিতে বাধ্য হচ্ছি!

বাবার শেষ চিঠিখানা যা তিনি মাকে লিখেছিলেন—সেখানা আমার স্যুটকেসে রাখতাম; যে কথাটা তিনি তার মধ্যে আমাকে বলে গিয়েছিলেন তা আমার মনে অক্ষয় হয়ে ছিল। লিখেছিলেন—"মেয়েদের থেকে যদি দূরে থাকতে না পারে তবে যেন বিয়ে না করে সুরেশ্বর।"

আমি ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের থেকে দূরেই থেকেছি—ভয় ক'রে কিন্তু স্থির নিশ্চয় হতে পারি নি; বুঝতে পারি নি, মেয়েদের থেকে দূরে থাকতে পারব কিনা!

ভূসম্পত্তির অধিকার—যারা নিজেদের ভূমির বা পৃথিবীর স্বামী মনে করে—তারা জানে না কি অপরাধ করে! কথাটা জানিয়ে গিছলেন রত্নেশ্বর রায়। বলতেন—ভূমি হল পৃথিবী। পৃথিবী মানুষের মা। পৃথিবীর স্বামী যারা হতে যায় বা হয় বলে মনে করে—তাদের অসাধ্য পাপ বোধ হয় পৃথিবীতে হয় না। জীবনে তারা সম্পর্ক বাছে না। এ কথার নজীর পৃথিবীর সব দেশের রাজা-জমিদারের ঘরে আছে। অপরের স্ত্রী হরণ, দরিদ্র আত্মীয়ের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে অপবাদ জড়ো করলে পাহাড় হয়। জমিদারবাড়ী বা রাজার বাড়ীতে দরিদ্র আত্মীয় সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে এসে অনেক ক্ষেত্রে বহু উপঢৌকন উপহার নিয়ে ফিরে গেছে—অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামী কারুর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্জনার মত স্নেহের আবরণে অনুগ্রহ পেয়ে থেকে গেছে; অঞ্জনার ভাগ্য—বেচারা দৃষ্টি-ভোগের অতিরিক্ত ভোগে লাগে নি বলে নিজেকে গোয়ানীজের ভোগ্যা করে আপনি গড়িয়ে গিয়ে তার পাওয়ায় পড়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—নিজেকে আমি বার বার বহুবার বিশ্লেষণ করেছি, বিচার করেছি। দেখেছি মেজঠাকুমা, অর্চনা সম্পর্কে আমার অপরাধ কতটা! অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলছি—অকপট চিত্তে তোমাকে বলছি, শুধু তোমাকে নয়, দুনিয়াকেই বলছি, না,

খানে অপরাধ আমার ছিল না। মুসলমান বা ক্রীশ্চান হলে অর্চনা সম্পর্কে কোন মনোভাবেই দায় থাকত না কিন্তু হিন্দুধর্ম না মেনেও হিন্দু বলেই ও-কামনা কখনও জাগে নি। তবে একটু বেশী রকম সজাগ সতর্ক থেকেছি বরাবর। বুকের দরজায় কামনার করাঘাত লেই জেগে উঠেছি। কুষ্ট সাড়ায় সাড়া দিয়েছি—ও-দিক থেকে আঘাত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ওইখানেই আমি অনুভব করেছি সুলতা—সম্পদের ঐশ্বর্যের এবং ভূমির অধিকারের ক প্রবল শক্তি! সমুদ্রে পড়েও মানুষ বাঁচে, হয়তো সমুদ্রই তাকে তীরে এনে দেয় কিন্তু সম্পদ ঐশ্বর্যশালীর বাঁধনে ধরা পড়লে তাকে বাঁধনের পীড়নে এলিয়ে পড়তেই হবে। সেখানে কাউকে বাঁচাতে হলে সম্পদশালীকে রাবণের মত অভিশপ্ত করে রাখতে হবে। বাল্মীকি তাকে রাবণের কুড়ি হাতের আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আগে থেকে নলকুবরকে দিয়ে অভিশাপ দিইয়ে রেখেছিলেন—নারীর অমতে জোর করে নারীধর্ষণ করলে, দশটা মাথা একশো ফাটে ফেটে এক-একটা মাথা দশচির হয়ে যাবে। শুধু সম্পদশালীকেই দোষ দেব না—দরিদ্রকেও দোষ দেব সুলতা। তারা রিক্ত বঞ্চিত বলে তাদের ন্যায়-বিচারে মাফ করবার অধিকার কারও নেই। সে যাঁরা করবেন তাঁরা পলিটিকাল লীডার, খেয়ালী বিধাতা বা ডিক্টেটার। আমি দেখেছি—দরিদ্র পিতামাতা কন্যাকে সম্পদশালীর সামনে এনে ধরে ইচ্ছে করে। দরিদ্র নারী—সেও এসে সম্পদশালীর নজরে পড়তে চায়। কিন্তু সে সব কথা থাক। আমার জবানবন্দীতে আমার কথা বলি। রায়বংশে যে বাসনার স্রোত···সোমেশ্বর থেকে—রামাকান্ত থেকে রায়বংশের জমিদারী আর রূপের দুই কূলের মাঝখান দিয়ে বেয়ে এসেছে—তার বেগ তার স্রোত আমার মধ্যেও ছিল, কিন্তু আমি তার মুখে বাঁধ দিয়েছিলাম।

ইংল্যাণ্ড যাবার আগে ওই দিন রাত্রে ডি এস পি'র কাছে রায়বংশের ইজ্জত মর্যাদা বাঁচাতে কলঙ্ক নিলাম নিজের মাথায়। কলঙ্ক একতরফা হয় না; কলঙ্ক রটাতে হলে আর একটা তরফের প্রয়োজন হয়। তরফ খুঁজতে গিয়ে আর কাউকে পেলাম না, পেলাম ওই গোয়ানদের; গোয়ানদের মধ্যে ওই কুইনী মেয়েটির সঙ্গে একটা টাকা দেওয়ার সূত্র জড়ানো ছিল। সেই সূত্র ধরে ডি-এস-পি জিজ্ঞাসা করলেন—কুইনীর প্রতি দুর্বলতার স্বরূপটা কি? তার মানেটা কি? আমি কোণঠেসা আসামীর মতই বললাম—প্রেমও এক ধরনের স্নেহ। স্নেহও এক ধরনের প্রেম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর যেন শতমুখ হয়ে সায় দিয়ে উঠল—আমার দেহেও তার ছোঁয়াচ লাগল, কথাটা বলেও ভাল লাগল সুলতা; মনে হল আশ্চর্য একটা সত্যের সাক্ষাৎ পেলাম, সন্ধান পেলাম। জানলাম আমার মধ্যে প্রবল দেহবাসনা এবং নারীহৃদয় কামনা রয়েছে এবং ওই মেয়েটিকেই আমি দেহ দিয়ে চাই, মন দিয়ে চাই। একান্তভাবে আপনার করে চাই। আমার জমিদারসত্তা এবং আমার ব্যক্তিসত্তা দুই সত্তা সমান আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল তাকে পাবার জন্য।

আমি অনেক ভেবেছি, জাহাজে সারা বে-অব বেঙ্গল, এ্যারেবিয়ান সী, মেডিটেরিয়া... অতিক্রম করবার সময় শুধু এই কথাই ভেবেছি ; নিজেকে বিচার করেছি ; বলতে পা... নিজেকে চিরে চিরে সমস্ত কিছু ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছি এবং বুঝেছি।

জমিদারের বা ধনীর ছেলেদের একটা পাপ অভিপ্রায় থাকে—তারা তাদের উপ... নির্ভরশীল বা তাদের দ্বারা যারা উপকৃত, অনুগৃহীত তাদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে... বিশেষ করে তাদের মেয়েদের উপর ভোগের অধিকার দাবী করে। আগের কালে দাসীদে... দেহমনের অধিকার দাবী করত প্রভুরা।

আর একদিক দিয়ে মানুষের, সেটা সব মানুষেরই সুলতা, একটা ছেলেমানুষী রোমান্টিসিজম আছে—যে রোমান্টিসিজমের জন্ম হয় ছেলেবেলায় রাজপুত্র রাজকন্যা... রাজপুত্র আর চাষীর মেয়ের প্রেমের গল্প শুনে। অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে... মিলন হলেই মন ভরে ওঠে। এইটেকেই বাড়িয়ে নিয়ে গল্প বানাও—দেখবে একটি ছেলে... একটি মেয়েকে ভালবাসত, কিন্তু তাদের বিয়ে হল না ; সেই দুঃখ তারা মেটাবার জন্য তারা... কল্পনা করে এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দেবে।

সুলতা, দেবেশ্বর রায়ের পৌত্র—দেবেশ্বর রায়ের প্রথম প্রিয়া—গোয়ান মেয়ে ভায়লেটের ছেলের দৌহিত্রী—কুইনীকে ভালবাসে—তাকে সে চায় এই কথা সর্বসমক্ষে ব'লে আশ্চর্য তৃপ্তি পেয়েছিলাম। এবং পেতেও তাকে চেয়েছিলাম।

আরও একটা সত্য ছিল। সে সত্য সর্বজনীন কিনা জানি না—তবে রায়বংশে এ সত্যটা স্বীকৃত। এবং এটা রায়বংশের একটা ধারা। আমার বাবা চন্দ্রিকাকে ভালবেসেছিলেন— মিশ্র সৌন্দর্যের জন্য। দেবেশ্বর রায় পিদ্রুজ আর অঞ্জনার সন্তান ভায়লেটকে ভালবেসেছিলেন, কুইনীর মধ্যেও বোধ হয় আমি তারই আকর্ষণও অনুভব করেছিলাম। এটা বোধ হয় চিরন্তন কামনা মানুষের।

বিলেতে গিয়ে এ আকর্ষণ আমার বাড়ল সুলতা। এবং এই কুইনীর আকর্ষণই আমাকে ওখানে শ্বেতাঙ্গিনী সমাজে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিলে না। একটা ঘটনা ঘটল।

আমার ছবি কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ছবিগুলো নিয়ে একটা এগজিবিশন হয়েছিল। এই এগজিবিশনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কুইনীর ছবিখানা। বিচিত্র ঘটনা—সুলতা, যে দেখতে এল, সেই এসে থমকে দাঁড়াল কুইনীর ছবির সামনে। অবাক হয়ে দেখলে। বললে— কি সুন্দর!

শুধু ছবি সুন্দর নয়, যার ছবি সেও কত সুন্দর কি সুন্দর! দুখানা ছবি ছিল কুইনীর। একখানাতে কুইনীর কোলে একটি শিশু দিয়ে এঁকেছিলাম 'Indian Madona'—ওদের চার্চের ছবি পুড়ে গিয়েছিল, ছবিখানা ওদের চার্চের জন্যই এঁকেছিলাম—কলকাতায় এসে এবং যে টাকাটা আমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই টাকার সঙ্গে ছবিখানাও দিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু টাকা বা ছবি কিছুই নেয় নি কুইনী। আমি চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তরে সে লিখেছিল—উই আর আনএবেল টু এ্যাকসেপ্ট এনি হেল্প ফ্রম ইউ। থ্যাংকস।

কুইনীর আরও একখানা ছবি আমি এঁকেছিলাম—এ ছবিখানা সেই রক্তসন্ধ্যার আলো মুখে-পড়া কুইনীর ছবি। নাম দিয়েছিলাম 'গোধূলি লগ্ন'।

পাশাপাশি টাঙানো ছিল ছবি দু'খানা। দর্শক খুব বেশী আসে নি, কিন্তু যারাই এসেছিল তারাই ওই ছবি দু'খানার সামনে দাঁড়াত, মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখত এবং প্রশ্ন করত—কত দাম?

প্রথম দিন চমকে উঠেছিলাম—। দাম?

—হ্যাঁ, কত দাম? আমি কিনতে চাই। দাম তো লেখা নেই।

—ও ছবি দু'খানা বিক্রীর জন্য নয়।

—নয়! তাহলে তোমার বাকী ওই রাবিশগুলো কে কিনবে?

উত্তর কি দেব চুপ করেই ছিলাম। উত্তর দিতে পারতাম—বলতে পারতাম, ছবি তুমি বোঝ না তাই বাকীগুলোকে রাবিশ বলছ। ওইগুলোই modern ছবি। কিন্তু তা পারি নি, তার কারণ লোকটির পরিচয় জানতাম, একজন বড় আর্টক্রিটিক। অন্য ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ছবি দু'খানার দিকে তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর বলেছিলেন—দেয়ার ইজ লাইফ ইন দোজ টু; সো লিভিং!

আমি এরপর ছবিদুটোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। সত্যিই এক এক সময় মনে হত—সত্যিকারের কুইনী। এখনি হয়তো কথা বলবে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। এক্জিবিশন শেষ হল। সব ছবির মধ্যে ওই কুইনীর ছবিরই প্রশংসা হল বেশী। তার মধ্যে "Indian Madona" ছবিটাই বেশী পছন্দ করেছিল। আমি তাকিয়ে থাকতাম আর মধ্যে মধ্যে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতাম—আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটত দুরন্ত আবেগে। আমি অনুভব করতাম ওই মেয়েটিকে আমি জীবনে চাই।

নারীকে জীবনে পুরুষ চায়, পুরুষ নারীকে চায়। এ-চাওয়া দু'রকম। Man wants woman in life—যে woman-এর বিশেষ পরিচয় নেই; পরিচয় সে woman—তার নারীত্বই তার পরিচয়। এইটেই সাধারণ নিয়ম স্থূলতা। কিন্তু মানুষ একে আশ্চর্যভাবে বদলে নিয়েছে—সে চায়—একজন বিশেষ নারীকে। সেটা প্রথমে থাকে নেশা—পরে সেটা হয় ভালবাসা।

কুইনীকে মেদিনীপুরের বাড়ীতে মিসেস হাডসন আর হিলডার সঙ্গে দেখে প্রথম আমার নেশা জেগেছিল। শাড়ী প'রে সে আশ্চর্য যৌবন-মোহময়ী হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। বোধ হয় বলেছি কথাপ্রসঙ্গে; বলেছি, নারীকে নিয়ে মোহ সেই আমার প্রথম জাগল। তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যা জাগিয়ে

তুলেছিলাম, ছোট একটি গাছকে বড় ক'রে তুলে ফুল ফোটানোর মত ফুল ফোটাতে চেয়েছিলাম—তা সেদিন কুইনীকে দেখবামাত্র জেগে উঠেছিল ; ফুল ফোটার কথায় বলব—পাতাহীন ভুঁইচাপার গেঁড়ে থেকে হঠাৎ যেন ডাঁটি বেরিয়েছিল কুঁড়ি নিয়ে। সেই কুঁড়ি ফুটল বিলেতে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নানা অসম্ভব কল্পনা করতাম। ওই কুইনীকে নিয়ে কল্পনা। ভাল লাগত। সারারাতই প্রায় জেগে থাকতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই মদের মাত্রা বেড়ে গেল। এবং—। চুপ ক'রে গেল সুরেশ্বর। স্থির দৃষ্টিতে খোলা জানালার ওপারের দিকে তাকিয়ে বললে—সকল সত্যই বলতে বসেছি সুলতা, রায়বংশের কুড়ারাম রায় ভটচাজ থেকে শুরু করে আমার পিতামহ পর্যন্ত পিতৃপুরুষেরা ন্যায় অন্যায় যা করেছেন তা মুক্তকণ্ঠে বলেছি। অন্যায়গুলোই বড় ক'রে তুলে ধরে বলেছি। বলবার কারণ আছে—কারণ পাপগুলো সব মানুষেই করে, এ পাপ মানুষের—কিন্তু তাঁরা পাপগুলো জমিদারীরই বলে ঘোষণা করে করেছেন। আমার বাবার কথা জান। তাই আর বললাম না। এবার আমার কথা বলি। আমার মধ্যে ওই কামনা-বাসনা ওই প্রকৃতি অথবা পাপ বল পাপ, ক্রিমিন্যাল ইনস্টিংক্ট বল তাই, অন্যায় বল অন্যায়, অমার্জনীয় সামাজিক অপরাধ বল তাই—আমার রক্তের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। আমার পূর্বপুরুষেরা জমিদারীর দৌলতে সামুদ্রিক সরীসৃপের মত যে প্রবৃত্তিকে তাঁদের রক্তের মধ্যে লালন করেছিলেন, পুষ্ট করেছিলেন—যার বীজ মাছের ডিমের মত আমার রক্তে ছিল—তা ফাটল এবং হাঙরের মত হিংস্র স্বভাব নিয়ে সে বেড়ে উঠল।

সারাজীবনই একরকম—একটা সাবধান বাণী আমার কানের কাছে বেজেছিল। আমার বাবার দৃষ্টান্ত আমাকে ভীত করে রেখেছিল—তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে বাজত—সুরোর যেন বিয়ে দিয়ো না। আমার দৃষ্টান্ত দেখলে। আমাদের বংশের বড় ভয়, মেয়েদের থেকে। বংশগত ব্যাধি এটা।

মায়ের মুখ মনে পড়ত। যেন বিষে নীল হয়ে যাওয়া মুখ। যার জন্য ব্রজদার শেফালির বাড়ী গিয়ে ওই দেহব্যবসায়িনীদের দেখে আকৃষ্ট হয়েও দাতা সেজে আত্মরক্ষা করেছি। কীর্তিহাটে গিয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকেছি। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি। সেই ভয় কাটতে লাগল সন্ধ্যার কনে-দেখা আলো-মাখা তরুণী কুইনীর ছবিখানা দেখতে দেখতে। এগজিবিশনের সময় সেই যে ছবিটার মধ্যে নেশার সন্ধান দিয়ে গেল আমাকে সেই আর্ট-ক্রিটিক—সেই নেশা আমাকে পাগল করে দিলে। মদ খেতাম, আর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এবং কল্পনা করতাম। যে কল্পনা করতাম তার মধ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনা আছে, সে উন্মাদনা মহাভারতে নাগকন্যা উলূপীর জন্য অর্জুনের সাজে, ইতিহাসে পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দিন খিলজীর সাজে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশে কারুর পক্ষেই সহজে ঘটে

না, এবং আমার মত যে-মানুষ, আধা-জমিদার বা জমিদার থেকে খারিজ তার পক্ষে তো সাজেই না। কিন্তু তবু মন মানল না। এবং তা থেকেই একদিন আমি যেন লালসায় কামনায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম।

সুলতা—আমি নারী-দেহের জন্য লালায়িত হলাম। জীবনের অবরুদ্ধ ভোগের প্রবৃত্তি কুইনীর ছবির ইশারাতেই যেন বোতল-খোলা দৈত্যের মত বেরিয়ে এল।

I wanted women in my life. তার পথে কোন বাধা ছিল না, সেই সুদূর শ্বেত দ্বীপে। টাকাও আমার হাতে ছিল প্রচুর। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। টাকাটা যুদ্ধের আগে খুব কম ছিল না। মূল্য তখন তার অনেক ছিল। সেই টাকাটা দুই হাতে মুঠো ভরে নিয়ে নেমে পড়লাম লণ্ডনের নৈশজীবনে।

বন্ধু মিলতে দেরি হয় নি। ভারতীয় বন্ধুই মিলেছিল। তারা ওদেশেই কাজ করে পড়ে; জীবনের শ্লেটে তাদের হাজার হিজিবিজি, কিন্তু সে তারা গ্রাহ্য করে না। তারাও আমার টাকা-পয়সার সাচ্ছল্য দেখে প্রসন্ন উল্লাসেই এগিয়ে এসেছিল। মাস কয়েক প্রায় পাগলের মত ছুটেছি, ছুটতে চেষ্টা করেছি। তারপর হঠাৎ একদিন আমার বংশগত অভিশাপ আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

সকালবেলা ঘরে বসে আছি; ওই কুইনীর ছবির দিকে তাকিয়েই বসে সিগারেটের রিঙ ছাড়ছি আর ভাবছি; ভাবছি, কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না, তৃষ্ণা কিছুতেই মিটছে না। বাড়ছে। তার থেকেও কিছু বেশী। কুইনীর জন্যই জীবন-তৃষ্ণা বাড়ছে। সকালবেলা যখন রাত্রির অন্ধকারের ঘোর থাকে না, তখন মাকে মনে পড়ে, ঠাকুমা উমাদেবীকে মনে পড়ে, মেজঠাকুমা মেজদিকে মনে পড়ে, অর্চনাকে মনে পড়ে। বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপনার অজ্ঞাতসারে—আঃ—বলে চিৎকার করে উঠি।

আয়নায় নিজের ছবি দেখে ভয় পাই। চোখের কোলে কালি পড়েছে, গোল একটা কালো বেষ্টনীর মধ্যে আমার এই বড় চোখ দুটো যেন ঘোলাটে রঙ ধরেছে; মনে হয়, সোনার গিল্টী-করা প্রদীপটার গিল্টী উঠে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে লোহা; ঘি নেই, সরষের তেলও নেই, জ্বলছে লালচে কেরোসিনে; লালচে আলোর শিখার মাথায় ধোঁয়া উঠছে রাশি-রাশি।

নারীকে তো ভয় নয়, রায়বংশে ভয় বরাবরই নিজেকে। ধর্ম সাধনা আর ভূমির আধিপত্য করতে গিয়ে, নরনারী দেহ-মিলনের মধ্য দিয়ে প্রেমচেতনাটুকুকে বিসর্জন দিয়েছেন, নয়তো প্রকৃতি-শক্তিকে আজ্ঞাবাহিনী ক্রীতদাসীর মত আয়ত্ত করবার জন্য শ্মশানে যে যজ্ঞ করেছিলেন, তাতেই আহুতি দিয়েছেন। শ্যামাকান্ত মহাপ্রকৃতিকে ভোগ্যা নারীর মত আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন, বীরাচারের সাধনায়। বীরাচারে সিদ্ধ হয়ে তিনি খেলবেন, আর শক্তি তাকে খেলার উপকরণ যোগাবে অথবা নিজেই তার উপকরণ হবে। তিনি তাকে আদিম পুরুষের নারীকে বেঁধে রাখার মত বেঁধে রেখে দেবেন। নারীকে বেঁধে প্রহার করবেন, তবু তাকে

পেলাম না বলে আক্ষেপ করবেন। তারপর সোমেশ্বর থেকে দেবেশ্বর পর্যন্ত, তাই বা কেন, যোগেশ্বর রায় পর্যন্ত এক দশা। তাঁরা ভূমিকে ভোগ করলেন নারীর মত, আর নারীকে ভোগ করলেন ভূমির মত। ভূমিকে কখনও সেবা করলেন না, পূজা করলেন না, আদায় করলেন শুধু কর; আর নারীকে কখনও প্রেম দিলেন না, তার কাছে চাইলেন শুধু সন্তান। ভূমির গণ্ডীর পরিমাপ যত বৃহৎই হোক, কখনও হলেন না তৃপ্ত, কখনও মিটল না ক্ষুধা, নারীর দেহ ভোগ ক'রে কখনও সুখের শেষ পেলেন না, বেছে-বেছে রূপসী নারী এনে অন্তঃপুর সাজিয়ে কখনও মিটল না তৃষ্ণা। একখানা এক একর দেড় একর জমির ধানে যে সব মানুষের সারা বছরের অন্ন জোটে, একটি নারীর প্রেমে যে সব মানুষের তৃষ্ণা মেটে, সে মানুষের দল থেকে পৃথক আমি, স্বতন্ত্র আমি। তারাই সভ্য মানুষ, তারাই দেবত্বের অধিকারী। রায়বংশ ধর্মকে আশ্রয় করে বর্বরতায় ফিরে গেছে, আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে, সম্পদকে আশ্রয় করেও তাই, সেই আদিম অরণ্যযুগে ফিরে গেছে। প্রিয়ার প্রতি যার প্রেম নেই, পৃথিবীর জন্যেই বা তার প্রেম কোথায়?

সে সময় আমি ডায়রী রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। রত্নেশ্বর রায়ের মত নয়; বীরেশ্বর রায়ের মত। জীবনের স্মরণীয় দিন ও ঘটনা। মেমোরেবল ডে অ্যাণ্ড ইনসিডেন্টস।

প্রথম দিন যেদিন জীবনে প্রথম একটি কন্যা শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে সারারাত তার দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে রইলাম, কিছুতেই তাকে স্পর্শ করতে পারলাম না; কেন পারলাম না, সে সম্পর্কে লেখা আছে—"মদের নেশার মধ্যে নৈশ আবরণী-পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। বিচিত্রভাবে তার মধ্যে অনেককে দেখলাম। দেখলাম না শুধু তাকেই। মেয়েটি আমাকে গালাগাল দিলে, আমার রাগ হয়ে গেল, আমি চিৎকার করে উঠলাম—

Shut up—I say you shut up.

আমার চিৎকারে সে চমকে গিছল। ভয় পেয়েছিল। সারারাত্রির পর সে ঘুম ভেঙে উঠে আমায় তার ঘরের দরজা খুলে দিলে।"

আবার যেদিন সকল ভয়কে অতিক্রম করেছি, সেদিনও আমি চিৎকার করেছি। এবং সেই রাত্রেই চলে আসতে চেয়েছি। সম্ভব হয় নি। সারারাত্রি বসে কাটিয়েছি, প্রথম দিনের মতই।

সব লিখে রেখেছি। সেদিনও সকালে উঠে ডায়রী লেখা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে কুইনীর ছবি দেখছি, আর ওই সব কথাই ভাবছি, তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কুইনী যেন ছবির মধ্যে সজীব হয়ে উঠছে, আমাকে ডাকছে। অথচ তার শেষ কথা মনে পড়ছে, আমি ঘৃণা করি আপনাদের। আপনাদের গোটা রায়বাড়ীকে ঘৃণা করি।

এমন সময় হোটেলের পরিচারক একখানা কার্ড নিয়ে আমাকে দিতে এল, একজন কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দেখলাম—প্রিন্স হারা রে, প্রিন্স অব কীর্টিহাটা। প্রিন্স এ্যাণ্ড এ স্পিরিচুয়াল ম্যান।

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল, একটা অসহনীয় উদ্বেগ বুকের ভিতরে জমে উঠল, পুঞ্জীভূত হয়ে।

প্রিন্স অব কীর্তিহাট! প্রিন্স অব কীর্তিহাট! কে? কে?

প্রিন্স অব কীর্তিহাট নিজেই পরিচয় দিলেন, তাঁর ফাদার ছিলেন রাজা আর রে, রামেশ্বর রে। আমাদের রাজা উপাধি বংশগত। নো ওয়ান ক্যান ডিনাই আওয়ার রাজা টাইটল। ইউ সি, কীর্তিহাট ইজ ইন দি প্রভিন্স অব বেঙ্গল। উই আর কিংস এ্যাণ্ড ব্রাহমিনস বোথ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তার মুখের দিকে। মিল খুঁজছিলাম চেহারায়, রঙ-এ, কাঠামোয়, নাকে-মুখে-চোখে। পাচ্ছিলাম সে মিল। সে বলেই যাচ্ছিল, আমরা বাংলা-দেশের প্রাচীনতম অভিজাত বংশ।

You see—since the time of Raja Ballal Sen, আমার পূর্বপুরুষ রাজার chief minister ছিলেন। You see, he was and we also are the worshiper of Godess Shakti. We are তান্ত্রিকস। বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেন রাজা হলেন। He was a staunch Baisnav; আমার পূর্বপুরুষ বার বার রাজাকে বারণ করেছিলেন, এইভাবে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। প্রশ্রয় দিয়ো না।

But he turned a deaf ear to him, never cared to follow his advice; —and you,—you certainly know what happened; only seventeen সতেরোজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বাংলা দেশ জয় করেছিলেন বক্তিয়ার খিলজী!

অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন প্রিন্স হারা রে; রত্নেশ্বর রায়ের তৃতীয় পুত্র রামেশ্বর রায়ের এক পুত্র। কোন্ পুত্র তা জানি না। রামেশ্বর রায় সুকৌশলে বিষয় বিক্রী করে বিলেতে এসেছিলেন, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে বিয়ে করেছিলেন এক ব্রাহ্ম মেয়েকে। তাঁরই এক ছেলে। বিলেতে এসে বাস করছে। এসেছিলেন আই-সি-এস পড়তে।

হারা রে বললেন—

I was a very brilliant student. My subject of interest was Sanskrit —great poet Kalidasa was my first attraction, then the greatest of all poems—Veda—then Upanisada.—I learnt two things from this Upanisada, the greatest of all poetries of the world—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং,
বরস্তু বরণীয়ঃ স এব।

আপনি একজন বড় আর্টিস্ট and আমি শুনলাম—A great learned man also—also a very rich man—a Brahmin also. আপনি নিশ্চয় জানেন—I am sure. নচিকেতা এই কথাগুলি বলেছিল যমকে। And you certainly remember—what মৈত্রেয়ী told to her husband গৌতম, যেনাহং নামৃতস্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম।"

I went mad, Mr. Ray—I went mad.—and gave up the idea of apering at the I. C. S. examination, and মিস্টার রে—আমি আমার আত্মাকে দেখতে পেলাম—

—Yes, I could see—I could feel এবং সব সংশয় ছিন্ন হয়ে গেল আমার—

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে
সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি
তস্মিন্ দৃষ্টি পরাবরে।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং
ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ
যদাত্মবিদো বিদুঃ॥
ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
ব্রহ্মৈ বেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

অনর্গল বলে গেলেন হায়া রে। সুন্দর কণ্ঠ, প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ, সাদা দাড়ি

গোঁফে হাত বুলোচ্ছিলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল একটি আনন্দময় স্বপ্ন। আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ঠিক এই সময়েই এসেছিল আমার একজন রাত্রির সহচর। বিনা কার্ডেই—May I come in!—বলে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকে হারা রে-কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—so you have come—এঁ্যা!

প্রিন্স হারা রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোরের মত সঙ্কুচিত এবং ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—হরি,—হরেশ্বর রায়, রামেশ্বর রায় আমার কনিষ্ঠ পিতামহ, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র; তার সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় আমি পাই নি কীর্তিহাটের দপ্তরের কাগজের মধ্যে। এম-এ, বি-এল পাস করে এস্টেটের আইন বিভাগের দেখাশুনো করতেন। রায়বাহাদুর কিন্তু তাঁর মতের চেয়ে তাঁর পাটোয়ারী মামলায় মুহুরীর মতের বেশী দাম দিতেন। তবে ভালোবাসতেন। ভদ্রলোক ছিলেন রামেশ্বর রায়। অনুকরণ করতেন বড়দাদার কিন্তু সে 'মেটাল' ছিল না তাঁর মধ্যে, সুতরাং সে-ধার বা সে-ঝকমকানি পাবেন কোত্থেকে? বড়দাদার অনুকরণে তিনি ছিলেন বিলাসী—ভদ্রলোক। ইংরিজী এবং ইংরেজের প্রেমমুগ্ধ। তিনিই প্রথম বিলেত এসেছিলেন এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গিয়ে এলাহাবাদে বসেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী যখন মারা গেছেন, একটি কন্যা ছিল সে-স্ত্রীর গর্ভজাত, তার বিয়ে দেওয়ার অজুহাতে দেবোত্তরের অধীনে ব্যক্তিগত পত্তনী-দরপত্তনী এবং জোতজমাগুলোর একের-তিন অংশ তিনি বিক্রী করে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে গিয়ে বসেছিলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদে তাঁর প্র্যাকটিস জমে নি কিন্তু জীবনে স্বাধীন প্রেমের ক্ষেত্র এবং সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি ব্রাহ্ম মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু তাকে বিয়ে করলে সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধবে এবং সে বাধাবেন মেজদা অর্থাৎ শিবেশ্বর রায়, তা তিনি জানতেন। তাই বিক্রী করে দিয়েছিলেন বড়ভাইকে, সব বলেই বিক্রী করেছিলেন। মিস্টার আর রে'র এই পুত্রটি সেই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র হারা রে। ছাত্র তিনি ভাল ছিলেন, সংস্কৃতে, ইংরিজীতে ডবল অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছিলেন। বাপ বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু সে-পরীক্ষা তাঁর আর কখনও দেওয়া হয় নি। এখানকার কাগজে ভারতবর্ষের গৌরব প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। ইংরিজী ভাল লিখতেন, তাঁর লেখার তখন দাম হয়েছিল এবং লেখার জন্য হারা রে-র নামও হয়েছিল, দু-চারটে ছোটখাটো আসরে বক্তৃতাও দিতেন তখন। হাইড পার্কেও টুল কাঁধে করে ঘুরেছেন।

তাঁর কেরিয়ারে ভবিষ্যৎ ছিল। ও-দেশে থাকলেও ছিল, এ-দেশে এলে তো কথাই ছিল না; এ-দেশে নেতৃত্বের সব থেকে বড় কোয়ালিফিকেশন হল E. R. মানে ইংল্যাণ্ড রিটার্নড। এদের জন্যে চেয়ার খালি হওয়ার অপেক্ষা করতে হয় না—নতুন চেয়ার তোলা থাকে—এলেই নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রায়বংশের ছেলে হারা রে। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন

adultery-র দায়ে।

রায়বংশের ছেলে হারা রে, প্রথম বিয়ে করেছিলেন এক মহৎকুলের কন্যাকে। কোন এক স্যার টাইটেলধারীর আত্মীয়াকে, খাস বিলিতী স্যার এবং ভারতবর্ষের কোন এক প্রভিন্সের এক্স-গভর্নর। তাঁর এই আত্মীয়াটি তাঁর গভর্নরগিরির সময় ভারতবর্ষে এসে দেখে গেছেন এ-দেশ। দেখে গেছেন এ-দেশের যোগী-সন্ন্যাসী, ফকির, ফরচুনটেলার, পুরনো মন্দির, তীর্থস্থল, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, গোয়ালিয়র ফোর্ট, আগ্রা ফোর্ট থেকে কাশীতে সারনাথ। এবং তার সঙ্গে দেখে গেছেন ইণ্ডিয়ান প্রিন্সদের বাড়ীঘর, বিরাট মহল, যার মধ্যে তাঁরা বাস করেন। আর মনে-মনে প্রেমে পড়ে গেছেন তরুণ গৌতম বুদ্ধার সঙ্গে, যিনি সম্ভপ্রসূত পুত্র রাহুল এবং সুন্দরী গোপাকে ফেলে নির্বাণ খুঁজতে গিয়েছিলেন।

রায়বাড়ীর রূপবান এবং বিদ্বান বংশধরটির কাছে 'ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যা' এবং 'যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম্' এই পরমতত্ত্ব শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল আগুনের শিখায় আকৃষ্ট পতঙ্গের মত। বিলেতে তখনও লোকে স্বামী বিবেকানন্দকে ভোলে নি। মেয়েটি সব থেকে বেশী মুগ্ধ হয়ে গেল, যখন সে এই প্রিন্স হারা রে-র কাছে শুনলে যে, তিনি তাঁর রাজ্য উত্তরাধিকার ত্যাগ করে শুধু ইণ্ডিয়ার এনসেণ্ট কালচারের স্বরূপ এবং মহিমা প্রচারের জন্যই এ-দেশে এসেছেন এবং সারাজীবন তাই করে যাবেন, তাঁর জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন। তরুণী কুমারীটি এই রাজপুত্রটির মধ্যে গৌতমবুদ্ধার নবজন্মকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মেয়েটির কিছু পৈতৃক ধন ছিল, সবকিছু নিয়েই তিনিই প্রথম শিষ্যা, সচিব এবং সখিরূপে তাঁকে বরণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

সালটা প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পর। যুদ্ধের সময় তিনি ইংল্যাণ্ডেই ছিলেন। এবং কাগজে বৃটনদের জন্য কালীতত্ত্ব বিতরণ করে লিখতেন—এই সর্বশক্তিময়ী মাতৃশক্তি—Mother the all powerful—ব্যাখ্যা করে লিখতেন—তিনিই ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষের অন্তরলোকে ক্রোধকে সঞ্চারিত করেন এবং তখনই ওয়ার বাধে এই পৃথিবীতে।

She is peace—She is anger, She is fire, She is water, She is heat, She is cold, She is the cause of everything—এর ফলে তাঁর খ্যাতি বেড়েছিল যথেষ্ট, শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যাও বাড়ছিল সঙ্গে। হঠাৎ একদা অঘটন ঘটে গেল। ১৯১৯ সালে আর্মিস্টিসের পর। হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ীতে এসে উঠল অভিনেত্রী। সামান্য কদরের অভিনেত্রী কিন্তু অসামান্য প্রখর তার রসনা, কণ্ঠস্বরও তেমনি উচ্চ এবং কর্কশ।

সে দাবী করলে—রে তার স্বামী এবং তার সন্তানকে সে গর্ভে বহন করে বেড়াচ্ছে আর রে তাকে পরিত্যাগ করে এই ব্যভিচারিণী মহিলার গৃহে প্রমোদ-বাসর যাপন করেছেন।

বৃত্তান্ত তার অনেক স্থূলতা। মামলা হল, তাতে তিনি স্টেটমেণ্ট করলেন। বিচিত্র স্টেটমেণ্ট। বললেন—আমি ইণ্ডিয়ান তান্ত্রিক যোগী। আমি মাদার দি অল পাওয়ার-

ফুলের উপাসক, আমার পক্ষে সংসারে কোন কিছুতে বাধা নেই। There is no bar. I deny all bars. তান্ত্রিক-যোগী আমি, আমি ওই অ্যাকট্রেসটির মধ্যে এমন এক উয়োম্যানকে দেখতে পেয়েছিলাম, যে সাধনার সময় আমার পাশে বসে থাকলে Mother the all powerful নিশ্চয় দেখা দেবেন। So I accepted her as my wife—আমি তাকে ইণ্ডিয়ান তান্ত্রিক-রীতি অনুসারে বিবাহ করেছি।

জেল হয়ে গেল হারা রে-র। প্রথমা স্ত্রী ডিভোর্সের মকর্দমা করে ডিভোর্স পেলেন। কাগজে কেলেঙ্কারি হতে তিনিই দেন নি। না-হলে বোধ হয় খবরটা আগেই জানা হয়ে থাকত।

তারপর হারা রে জেল থেকে বেরিয়ে আবার একবার সেইন্ট সাজবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে খুব সুবিধে হয় নি। কিন্তু সুবিধে-অসুবিধেতে হারা রে'র কিছু যায়-আসে নি। শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত লোকও বলা যায়, তিনি বিচিত্র জীবন যাপন শুরু করলেন। দাড়ি-গোঁফ-চুল রেখে সে এক ভারতীয় তান্ত্রিক সাজলেন। এবং চিটিং-এর জন্য চুরির দায়ে আরও দু'বার জেল খেটেছেন। তা খাটুন, তবুও এখনও তাঁর লেখা কাগজে বের হয়। ভারতবর্ষের ধর্মের উপর তাঁর রচনার আদর করে ওখানকার কাগজওলারা। বিশেষ করে ১৯২১ সালের পর গান্ধীজীর 'অহিংসা'র বিরুদ্ধে তার কতকগুলো রচনার খুবই সমাদর হয়েছিল। লিখেছিলেন নাকি—

This non-violence is Sudra cult in India. This is for those who are weak—who cannot understand গীতা অর চণ্ডী অর 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'—যাঁর বাণী, যিনি কুরুক্ষেত্রে এত রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তাঁর নামে নন-ভায়লেন্স অহিংসা এর থেকে হাস্যকর কিছু হয় না। এ নেহাতই কাওয়ার্ডিস অথবা ডীপ পলিটিক্স বা কেউ বলতে পারে 'ভেরী ক্লেভার কামোফ্লেজ'।

এসব পরিচয় আমার ওই রাত্রি-সহচর বন্ধুটি মিস্টার হারা রায়ের সামনেই দিয়ে গেল। হারা রায় স্থির হয়ে শুনলেন। প্রথম যে একটা অপ্রতিভ শঙ্কিত ভাব তাঁর মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, ক্রমশঃ সেটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। প্রসন্নমুখে দাড়িতে হাত বুলিয়ে হারা রায় বললেন— জেন্টেলম্যান, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বলছি—আপনি একটি 'বদ্ধজীব'। আপনার সঙ্গে আর কোন বর্বর জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যাদের সঙ্গে জন্তু জানোয়ারের মিল বেশী, তাদের কোন প্রভেদ নেই। আপনি তান্ত্রিক স্পিরিচুয়ালিজিম কিছুই বোঝেন না। হ্যাঁ মহাশয়, আপনি যা ঘটনার বিবরণ দিলেন, তা সত্য অর্থাৎ তা ঘটেছে। কিন্তু ঘটেছে বলেই তা সত্য এমন কথা আমি স্বীকার করি না। বিচারক আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝতে পারে নি, সেই জন্য সে জেল দিয়েছে। ইংরেজ বিচারক আজ ভারতবর্ষে সমস্ত পলিটিক্যাল লীডারসকে জেলে দিচ্ছে না? কিন্তু তাই বলে কি তারা গিল্টী? আর দে ক্রিমিন্যাল? বিচার সহজ নয় মহাশয়। দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্দারকে যে প্রশ্ন করেছিল থেসিয়ান রবার

তার উত্তর আজও কেউ দিতে পারে নি। গো এ্যাণ্ড আস্ক কাইজার উইলহেল্ম দি সেকেণ্ড —নাউ লিভিং ইন হল্যাণ্ড, আস্ক হিম—আর ইউ গিল্টী স্যার? এ্যাণ্ড ইউ উইল গেট দি আনসার। তিনি নিশ্চয় বলবেন—যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি বলেই হয়ত আমাকে দোষী বলতে পার কিন্তু যুদ্ধে আমি জয়ী হলে এ-কথার উত্তর কি হত চিন্তা করে দেখ! হ্যাঁ, আমি যখন দিস মিস্টার রে-র কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি, তখন নিশ্চয় আপনি তাঁর সহচর বা পার্শ্বচর হিসেবে যা বলছেন বলতে পেরেছেন। অন্যথায় নিশ্চয়ই এ-কথা বলতে পারতেন না! পারতেন? অল রাইট, আই ফরগিভ ইউ জেণ্টলম্যান, স্মল ফ্রাইজ ইউ আর—দোষ তোমাদের দেব না। ইট ইজ নট ইজি টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি অর দি গ্রেটনেস অব মাই মিশন ইয়োর গান্ধী কুড নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি। সে আমাকে লিখেছিল—ভারতবর্ষে ফিরে এস বাট—এখানে ইণ্ডিয়ার ফিলসফি, রিলিজিয়নের গ্রেটনেস না বুঝলে দেশে হাজার মুভমেণ্টেও কিছু হবে না। অলরাইট গুড বাঈ!

দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে তিনি টুপিটি তুলে নিয়ে লম্বা রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুলের উপর বসিয়ে পিছন ফিরলেন। মনে মনে সহস্র লজ্জা, লক্ষ বেদনা আমাকে যে কি করে দিয়েছিল তা বলতে পারব না। কখনও মনে হচ্ছিল—এই মুহূর্তে আমি আত্মহত্যা করি। নইলে হয়তো কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ করে ফেলব যে, ওই লোকটি আমার পিতৃব্য—কীর্তিহাটের রায়বংশের রামেশ্বর রায়ের পুত্র। তবুও আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম —ওয়েট প্লিজ এ মিনিট অর টু।

—মি? ইউ আস্ক মি টু ওয়েট?

—ইয়েস স্যার।

—হোয়াট ফর? ইউ হ্যাভ গট সাম মোর স্ট্রং ওয়ার্ডস ফর মি—

—না। কোন কঠিন কথায় বোধ হয় আপনাকে আঘাত বা লজ্জা দেওয়া যায় না।

হেসে হারা রায় বললেন—ভ্যাটস্ এ কম্প্লিমেণ্ট। থ্যাঙ্ক যু।

—এই সামান্য কিছু সাহায্য আপনি নিয়ে যান। দশ পাউণ্ডের নোট বের করে আমি তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে নোট ক'খানা কেড়ে নিয়ে বললেন—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক ধন্যবাদ। টাকার আমার প্রয়োজন ছিল। চলে যেতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কয়েক মিনিট তোমার সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে পাইনে রয়!

ভাবলাম, হয়তো এবার কোন দুর্বল মুহূর্ত এসেছে এবং সেই দুর্লভ দুর্বল মুহূর্তটি সে অনুতাপ প্রকাশ করবে বা আমার কাছে সজল চোখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, হয়তো বা আরও কিছু টাকাও চাইতে পারে। আমার কাছে এমন একটি মুহূর্ত যত ভয়ের তত প্রলোভনের।

ভয়,—হয়তো প্রকাশ করে ফেলব তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। প্রলোভন—সে-ও ওইটেই, হ্যাঁ, ওইটেই, কেবলমাত্র তার উল্টো পিঠটা।—আমি আমার নৈশ সহচরের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল—ওকে প্রশ্রয় দেবেন না মিস্টার রয়। ডোণ্ট। ও ভয়ানক লোক, নির্লজ্জ; ধর্মাধর্ম ন্যায়নীতিজ্ঞানবর্জিত একটি ধুরন্ধর শয়তান।—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—প্লিজ, প্লিজ। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য। একটু বিরক্তি-ভরেই বলেছিলাম। কারণ, ওই বন্ধুটিও তো হারা রে থেকে উঁচুদরের মানুষ ছিল না। রাত্রির সহচর। রাত্রির লণ্ডনের মোহে তারা লণ্ডনে থেকে গেছে; উপার্জন করে, সামান্যই করে। রাত্রির লণ্ডনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। কীর্তিহাটের জমিদারীর মোহ কেটে গিয়েছে। রায়বংশের মোহও কেটে গেছে। এখানে এসেছিলাম টাকা নিয়ে এই জন্যেই। রক্তের মধ্যে থেকে যেন নির্দেশ পাচ্ছিলাম। তাই এই লোকটির সন্ধান পেয়ে তাকে ডেকে নিয়েছিলাম। টাকা পেতো সে আমার কাছে। সুতরাং তার উপর বিরক্ত হবার আমার অধিকার ছিল।

লোকটিও সরে গিয়েছিল। আমার কাছে প্রত্যাশা তার ফুরোয় নি তখনও। লোকটি চলে গেলে আমি হারা রে-কে প্রশ্ন করেছিলাম—বলুন কি বলবেন?

—ইয়ং ম্যান, ইয়ং ব্লাড তোমার—হট ব্লাড—। আমি শুনেছি, তুমি নারীক্ষুধাতুর।

আমার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। আমার খুড়ো, আমার বাবার নিজের খুড়তুতো-ভাই জিজ্ঞাসা করছেন। উনি অবশ্য জানেন না, কিন্তু আমি তো জানি। কিন্তু কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না।

—লজ্জা করছ? নো-নো-নো! লজ্জার কিছু নেই। নাথিং। তুমি জান না, তুমি বোঝ না; এটা অবশ্য দুর্ভাগ্য তোমার—ইণ্ডিয়ান এবং বেঙ্গলী হয়ে তুমি এটা বোঝ না। ফেমাস তন্ত্র কাণ্ট অব বেঙ্গল।

হঠাৎ থেমে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি জাতে কি বল তো? বাই কাস্ট—? ব্রাহমিন অর বৈশ্যা অর কায়স্থা অর এ শূদ্রা? হোয়াট?

বললাম—ব্রাহমিন।

—ব্রাহমিন? শাক্তা অর এ বৈষ্ণবা?

—কেন জিজ্ঞাসা করছ?

—বুঝেছি ওসব মানো না। দ্যাটস্ অলরাইট। ঠিক আছে। মানলে যে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা বুঝতে সুবিধা হত। ভাল, সে-কথা বলব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করব, সত্যিই তুমি হাংরী? দেখ, আমি তোমার ক্ষুধা মেটাতে কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার অনেক শিষ্যা আছে। তারা আমার কাছে এই কারণেই আসে। আমি তাদের কবচ-মাদুলী-গোছের কিছু দিয়ে থাকি। তুমি আমার কাছে নিতে পার। রয়, মেনি উয়োমেন

আমার লাইফে এসেছে। আমার কোন লজ্জা নেই। তুমি জানলে বুঝতে পৃথিবীতে ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান রিলেশনসিপ ছাড়া কিছু নেই। পুরুষ এ্যাণ্ড প্রকৃতি। নাথিং এলস্। ইফ ইউ লাইক, আই ক্যান হেল্প ইউ। থ্রো ঘ্যাট ননসেন্স ইয়ং ম্যান আউট।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখেই বোধ হয় তিনি বললেন—খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে রয়? কিন্তু আশ্চর্য আদৌ নয়। তোমাদের মনকে ইংরেজেরা ক্রীশ্চানিটি একটা মরালিটি শিখিয়েছে, যে-মরালিটি তোমরা আজকের এডুকেশনে পাও, যেটা ব্রাহ্ম সোসাইটি প্রচার করেছে এককালে, তার জন্যেই এমন মনে হচ্ছে। নাহলে এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই।

This is the only truth of life.

এবার আমি বললাম—এসব ফিলসফি-স্পিরিচুয়ালিজিম-এর দক্ষিণা তো আমাদের দেশ অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য, তার বেশী নয়। কিন্তু যে সাহায্য করতে চাচ্ছেন আমাকে, তার দক্ষিণা ওই যৎকিঞ্চিৎ হলে চলবে, না, বেশী দিতে হবে?

—অবশ্যই বেশী দিতে হবে। আপনি জানেন, আমি বলেছি আপনাকে—আমি ভিক্ষে চাইতে এলেও আমি রাজার ছেলে। ব্লু ব্লাড আছে আমার মধ্যে। আমি সন্ন্যাসী হলেও আমি তাই। এ প্রিন্স। অল্পে আমার হাত ভরে না। আমি তোমাকে সার্বিস দেব—আমার রেমুনারেশন ওই লোফার রাত্রি সহচরটার সমান নিশ্চয় হবে না। তাছাড়া মিস্টার রয়, তোমাকে ফ্রাঙ্কলি বলি—আমার অনেক দেনা। অনেক। আমার নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। অহঙ্কারটাকেই বড় করছি না—তোমার করুণার কাছেও আবেদন জানাচ্ছি।

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম সুলতা। কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। দেনাতে ডুবে গেছেন হারা রে। শুধু হারা রে নয়, কীর্তিহাটের রায়বংশের সবাই দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দিন-রাত্রি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে বলে মনে হল। এ-দেনা শোধ করবার কি কারুর সাধ্যি আছে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হারা রে বললেন—আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ রয়। আমি আবার আসব তোমার কাছে।

বলে চলে গেলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমার মনে পড়ছে সুলতা, স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে কোথাও বুঝি আমার বা রায়বংশের কোন সন্তানের সুস্থ হয়ে থাকবার অধিকার নেই।

এই মুহূর্তে এসে ঢুকেছিল আমার সেই নৈশ অনুচরটি। তার নাম মিস্টার ঘোষ-চৌধুরী। স্মার্ট ইয়ং ম্যান, ডেয়ার-ডেভিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—রয়—কি হল

মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়ে গেছে তো!

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, উত্তর দিতে পারলাম না। সে হেসে বললে—সম্ভবতঃ তুমি এবার আমাকে চলে যেতে বলবে। যাব আমি—আই অ্যাম এ স্পোর্ট; আমি তোমাকে ব্ল্যাক-মেল করব না। আমার পাওনাটা শুধু পেলেই হল। তবে এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড অর কমরেড অর গাইড যাই বল, সেই হিসেবেই বলি—ডোণ্ট ট্রাস্ট ত্থাট ম্যান—ও একটা পাইথন, লেজে জড়িয়ে পাক দিয়ে তোমার হাড়গোড় ভেঙে মাংসের দলা পাকিয়ে ধীরে ধীরে তোমাকে গিলবে।

আমি তাকে বলেছিলাম—ঘোষ-চৌধুরী, তুমি হুইস্কির জন্যে অর্ডার কর, আর দেখ ট্রাঙ্কুইলাজার ট্যাবলেট আছে ওই দেরাজে, আমাকে দাও। আমি সুস্থবোধ করছি না। ওই লোকটা আমাকে অসুস্থ করে দিয়ে গেল।

—তোমাকে কিছু খাইয়েছে? কই এরকম তো কিছু করে বলে তো কখনও শুনি নি। তবে হি নোজ হিপনটিজম। হিপনটাইজ করে টানে নিজের দিকে। স্পেশালি গার্লস—উইমেন।

—না চৌধুরী, খাওয়ায় নি কিছু। তবে হিপনটিজম বলছ তা হতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য শক্তি ওর হিপনটিজমের তোমার কাছে আমি ঠিক ভাবে এক্সপ্লেন করতে পারব না। কিন্তু আমার দেহ-মন সবকিছুকে টানছে, প্রবলভাবে টানছে। আমি ওকে ভুলতে পারছি না। অন্য কথা ভাবতে পারছি না। শুধু ওর কথাই মনে ঘুরছে। দাও, আমাকে ট্রাঙ্কুইলাই-জার দাও—ডবল ডোজে দাও। আর হুইস্কি দাও।

চৌধুরী ভিতরের অর্থ বুঝতে পারে নি। সে ভাবছিল হিপনটিজমের কথা। সে তাড়াতাড়ি আমাকে মদের গ্লাস এবং ট্রাঙ্কুইলাইজার ট্যাবলেট দিয়েছিল— আমি ডবল ডোজে খেয়ে শুয়ে ঘুমুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঘুম সহজে আসে নি।

* * *

শুধু ঘুম নয়, আনন্দ-উল্লাস এ সমস্তই যেন ওই হারা রে আমার অপহরণ করে নিয়েছিল। আমার পিছনে সে যেন অশুভ শনিগ্রহের মত অথবা কলির মত ফিরতে শুরু করেছিল। অথবা রায়বংশের প্রেতাত্মার মত ফিরতে শুরু করেছিল।

ওই ঘটনার ঠিক একদিন পর সে আবার এসেছিল আবার হোটেলে। এবার একা নয়। সঙ্গে একটি সুন্দরী তরুণী।

আশ্চর্য সুলতা, আমি কার্ড পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। ঘরে এল সে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার দেহের রক্ত চঞ্চল যেমন হয়ে উঠল, তেমনি একটা নিদারুণ আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগের সৃষ্টি করলে।

উইণ্ড হলে হার্টের উপর প্রেসার পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। তারিখটা স্মরণীয় তারিখ, থার্ড সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি-নাইন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ ওয়ার ডিক্লেয়ার করবে, তার আগে, এগারটা পনের মিনিটে প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেন রেডিয়োতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করেছে ভোরবেলা। নেভিল চেম্বারলেনের বক্তৃতা শুনছিলাম আমি। হারা রে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে মেয়েটি।

বললেন—I have come Mr. Roy. Let me introduce Miss Laura Knight to you—She is more than my own daughter—my disciple, a শিষ্যা of mine. And Laura— this is Mr. Ray—S. Ray—an artist a famous artist—and a very learned man—also a very rich man. You see those two pictures on the wall—one a mother and another a darling. But the girl is the same, you see—this is tantra of India. The Eternal Mother and the Eternal She, they are one and the same.

আমি আর সহ্য করতে পারি নি। আমি বলেছিলাম—will you please stop Mr. Ray!

মিস্টার হারা রে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—You dont like Miss Knight—? She is very intelligent with a very soft and sweet mind—She wanted to work as your secretary.—

আমি বলেছিলাম—বাংলায় বলেছিলাম, দয়া করে আপনি চলে যান—আমি জোড়হাত করছি মিস্টার রে—।

সুলতা, মেয়েটির মুখে যেন রায়বংশের আদল দেখতে পাচ্ছিলাম। থরথর করে কাঁপছিলাম আমি।

—কি হল মিস্টার রায়? আপনি অসুস্থ?

আমি এবার চিৎকার করে বলেছিলাম—Get out I say—get out—

রেডিয়োতে তখনও প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেনের বক্তৃতা চলছে। সারা ইংল্যাণ্ডের লোক বোধহয় তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেছে। যুদ্ধ! আবার সর্বনাশা যুদ্ধ বাধল।

হারা রে বললেন—কিছু টাকা ওকে দাও রায়, ওকে আমি নিয়ে এসেছি তোমার নাম করে। অনেক প্রত্যাশা করে এসেছে।

—She must get something. Mr. Ray—please.

আমি বললাম—She is your daughter!

চমকে উঠল হারা রে, বললে—কে বললে?

—ওর মুখ বলছে।

—তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ রয় কিন্তু She is a good girl—and beautiful also—Is she not?

এতক্ষণে মেয়েটি কথা বললে—Give me my dues. বলে সে আমার সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।

আমি ওদের বিদায় করলাম। মূল্য ভালই দিতে হল। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ ছিল না। বরং আসবার সময় ওদের আরও কিছু পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। হারা রে মিথ্যা কথা বলে নি; ঋণ তার অনেক, আকণ্ঠ ডুবে আছে বললে মিথ্যা বলা হয় না।

দেশে ফিরবার টিকিটের দাম আর পথ-খরচ রেখে বাকিটা হারা রে-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

দেশে ফিরেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই। ও-দেশে থাকতে আর সাহস হয় নি। লোকে বলেছিল—যুদ্ধের ভয়ে পালাচ্ছি কিন্তু তা নয়, আমি পালিয়েছিলাম হারা রে-র ভয়ে এবং তার মেয়ে শম্পা রে-র ভয়ে।

মেয়েটার নাম লরা নাইট নয়। ওর নাম শম্পা রে। ওদের ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে খানিকটা পায়চারি ক'রে সুরেশ্বর যেন দম নিয়ে বললে—সাত পুরুষ ধ'রে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত যত কলঙ্ক রায়বংশ অর্জন করেছে, সুলতা, তার মধ্যে এই হারা রায়ের কলঙ্কের চেয়ে কালো এবং নীরেট অর্থাৎ ওজনে গুরুভার কলঙ্ক আর কেউ অর্জন করে নি।

বলতে-বলতে বলতে পারি নি; দিনের আলো ফুটছে, লজ্জাবোধ করছিলাম; কিন্তু না, বলব, না বললে রায়বংশের মুক্তি নেই। খবরটা জেনেছিলাম জাহাজে উঠে। জাহাজে উঠে হঠাৎ দেখা হল একটি মহিলার সঙ্গে। আমি জাহাজে যখন উঠলাম তখন মহিলাটি ডেকের উপর দাঁড়িয়েছিলেন অন্যমনস্ক ভাবে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। পোশাক দিয়ে বোঝা গেল ভারতবর্ষের মেয়ে; তার কিছুটা পরিচয় চুলে এবং চোখে আছে; নইলে রঙ দেখে ধরা যায় না। সাদা পাড়হীন শাড়ী এবং ব্লাউস দেখা যাচ্ছিল বোতাম খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে। বয়স হয়েছে, বয়স চেহারাকে খানিকটা ভারী করে। আমার মনে হল যেন চেনা মুখ। একদিন পর তিনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে চেনা দিলেন—পরিচয় ঝালিয়ে নিলেন। এবং হারা রে'র কথা তিনিই বললেন।

ইনি অন্য কেউ নয় সুলতা, ইনি সেই 'চন্দ্রিকা'। যাই তিনি করে থাকুন, পরিচয় তাঁর যাই হোক, তিনি আমার মাতৃতুল্যা। প্রথমটা জাহাজে তাঁকে দেখে আমি খুশি হই নি,

সন্তুষ্ট হই নি। শুধু ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যের কথা। আমি তাঁকে চিনতেও চাই নি কি তিনি আমাকে চিনলেন। আমি চিনি না বলতে পারলাম না। দেখলাম যেন তি অনেকটা পাল্টে গেছেন। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে জীবনে নিস্পৃহ এবং উদাসীনা হ উঠেছেন। বাবার মৃত্যুর পর একবার মাত্র দেশে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক বাবার কিছু কাগজপত্র মাকে দিয়ে এসেছিলেন। মা আমার সে ধাক্কা সহ্য করতে পা নি। তাতেই তিনি মারা গিছলেন। মা'র মৃত্যুখবর কলকাতাতেই পেয়েছিলেন তি কিন্তু এরপর আর তিনি ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। এবং ভারত থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এ-দেশে। আবার এতকাল এদেশে কাটিয়ে এবার ইণ্ডিয়া ফিরছেন। বহুদিন থেকেই ফিরবেন ইচ্ছা ছিল, এবার এই যুদ্ধ লেগেছে বলে ফিরবার এক তাগিদ পেয়ে গেছেন।

* * *

তিনি হারা রায়কে চিনতেন। জাহাজে তখন সর্বদাই সবার মনে একটা আতঙ্ক ছাই চাপা আগুনের মধ্যে চাপা রয়েছে। একটা উত্তাপ অহরহ অনুভব করে। তাই প্রতি যাত্রীই সঙ্গী বন্ধু খুঁজে ফেরে, সামান্য অন্তরঙ্গতায় মানুষকে আপনজন ভাবতে চায়। জার্মান ইউ বোট তখন বাহির দরিয়ায় বেরিয়ে পড়েছে হাঙরের মত, তবে তার গতিবিধি তখনও উত্ত মাথায় নরওয়ে সুইডেনের উপকূল এবং উত্তর সমুদ্র হয়ে আটলান্টিকের দিকে। একদিকে ফ্রান্স, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডকে রেখে নিচের দিকে তখনও নামে নি। এই অবস্থায় চন্দ্রি মালহোত্রা আমার কাছে আসতেন, আমাকে মাই সন বলে ডাকতেন—আমি তাঁকে ফিরি দিতে পারি নি।

শুধুই বসে পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে কথা হ'ত প্রথম প্রথম। এরই ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে আমার বাড়ীর কথা আমার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করতেন।

একদিন প্রশ্ন করলেন—ইউ হ্যাভ নট ম্যারেড ?

বললাম—না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এইবার বিয়ে কর!

বললাম—না।

বললেন—কেন ?

উত্তর দিতে গিয়েও দিলাম না, দিতে পারলাম না যে বাবা তাঁর শেষ চিঠিতে বলে গেছেন—যেন আমি বিয়ে না করি।

একদিন বললেন—তুমি এতে ভেসে যাবে না ?

বললাম—না। তা মনে করি না। এখনও অন্তত যাই নি।

—মনে কর না? খুব ভাল। এই জোর যেন শেষ পর্যন্ত রেখো। একটু চুপ করে

থেকে বললেন—দেখ, তোমার বাবাকে আমি ইচ্ছে করেই টেনেছিলাম—আমিই অপরাধিনী। তিনি ঠিক ছিলেন না। আই ওয়াজ দি ম্যাগনেট। প্রথমটা কষ্ট পেয়েছিলাম আকর্ষণ করতে। কিন্তু একবার যখন তিনি আমার আকর্ষণে সংসার থেকে ছিঁড়ে বের হলেন তখন সে যেন শুটিং স্টার। তাকে ধ'রে রাখা যায় না—গেল না।

চুপ ক'রে রইলাম।

তিনি এইবার বললেন—তোমার বাবার কাছে তোমাদের বংশের গল্প শুনেছি কিছু কিছু। বলতেন—একটা কি অভিশাপ আছে তোমাদের বংশে। আমি বিশ্বাস করি নি—হেসেছি। পৃথিবীতে ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নেচার'স ল। একটি পুরুষ একটি নারীকে দেখলেই হি উইল শো হিমসেল্‌ফ অ্যাণ্ড সি উইল ট্রাই নট টু লুক এ্যাট হিম, বাট সি উইল লুক এ্যাট হিম। তার উপর যেখানে পুরুষের হাতে সম্পদ জমা হয়েছে সেখানে সে জিততে না পারলে কিনবে। কিন্তু তার থেকেও তোমাদের মধ্যে কিছু বেশী আছে। তোমাদের আর একজনকে দেখেছি আমি ইংল্যাণ্ডে। তাকে দেখলে আমার ভয় হয়। একজন বড় পণ্ডিত এবং আশ্চর্য হিপনটিক পাওয়ারের অধিকারী। সম্ভবত সম্পর্কে তোমার খুড়ো—

—আর ইউ স্পীকিং অব হারা রে?

সবিস্ময়ে চন্দ্রিকা বললেন—তুমি জান তাকে? দেখেছ?

বললাম—দেখেছি।

—কতটুকু দেখেছ? কতটুকু জেনেছ? গ্লাস-কেসের মধ্যে কিং কোব্রা দেখা এক কথা সুরেশ্বর, আর মনের মধ্যে তাকে খোলা অবস্থায় দেখা আর এক কথা। তুমি তাকে গ্লাস-কেসের মধ্যে দেখেছ। হয়তো বা তোমার সত্য পরিচয় না জেনে তোমার কাছে তার সেই বহুবার পুনরাবৃত্তি করা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলেছিল—হাজার বছর আগে তার পূর্বপুরুষেরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন।

বিষণ্ণ হেসে বললাম—হ্যাঁ। বলতে এতটুকু বাধল না।

—বাধে না। ওই পরিচয়টাকে সত্য করে তুলেছে হারা রে। লোকে মিথ্যে জেনেও আবার ওটাকে সত্য বলে মানতে চেষ্টা করছে। তারপর হয়তো উপনিষদের শ্লোক শুনিয়েছে, গীতা শুনিয়েছে—ইয়োরোপীয়ান ফিলজফিতেও পণ্ডিত হারা রে। কিন্তু সে তার পরিচয়ের কতটুকু? বারতিনেক সে জেল খেটেছে—

এবার আমি বললাম—আণ্ট চন্দ্রিকা, মিস মালহোত্রাকে এই নতুন করে পরিচয় হয়ে আণ্ট বলতাম, মিস্‌ মালহোত্রা বলতে কেমন লাগত; বললাম—আণ্ট চন্দ্রিকা, সে তার মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, যার নাম বলে লরা নাইট; কিন্তু যার আসল নাম শম্পা রায়।

চমকে উঠলেন আণ্ট চন্দ্রিকা। বললেন—দেখেছ তুমি তাকে ?

—দেখেছি। তার মুখের মধ্যে রায়বংশের মুখের আদল দেখেছি। একটু চুপ ক'রে থেকে চন্দ্রিকা দেবী আবার বললেন—ওটা তুমি ভুল দেখেছ। অথচ আদল যদি সত্য হয় তবে সেটা এ্যাকসিডেন্টাল। কিন্তু ট্রুথটা আরও ভয়ঙ্কর।

স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম উত্তরের অপেক্ষায়। চন্দ্রিকা দেবী বললেন—তুমি জান কিনা জানি না—এক সময় এক অ্যাকট্রেসের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেছিল হারা রে এবং তার জন্ম জেলে গিয়েছিল।

বললাম—জানি।

চন্দ্রিকা বললেন—লরা নাইটই মেয়েটার আসল নাম। ওকে কোলে নিয়েই ওর মা সম্ভবিধবা অবস্থায় হারা রে-র দৃষ্টিতে পড়েছিল এবং প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু—

—কি কিন্তু— ?

—মেয়েটার নাম ছেলেবেলায় হারা রে-ই পাল্টে দিয়েছিল। বলত—শম্পা। তারপর এখন লোকে বলে—সে তার মিসট্রেস ?

চমকে উঠেছিলাম শুনে।—বলছ কি তুমি ?

—সত্য বলছি। ওকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও তোমার কে ? কি নাম ওর ? লরা নাইট না শম্পা রায় ? শয়তানের হাসি হেসে হারা রে বলেছিল—"যা তোমার মনে হবে তাই। তাই মনে করতে পার। অথবা বলতে পার both—আমার ঔরসে ওর জন্ম নয়, কিন্তু তার থেকে বেশী ওকে মেয়ের মতই মানুষ করেছি এক সময়। কিন্তু তাতে কি ? পৃথিবীতে প্রকৃতি আর পুরুষ ছাড়া কিছু নেই। ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান—ইটারনাল হি এ্যাণ্ড সী ; সুরেশ্বর আমি ওকে কটু কথা বলে ধমকাতে চেষ্টা করেছিলাম, হারা রে শয়তানের মত হা-হা ক'রে হেসে বলেছিল—তুমি—তুমি বুঝতে পারবে না। বুঝবে না তুমি। রাজাদের ইতিহাসে এ তুমি পাবে, তান্ত্রিকদের তন্ত্রে এর বিধান আছে। আর যদি তুমি মিথ্যে সমাজ-শাস্ত্রের গণ্ডী পার হতে পার তবে বুঝতে পারবে, এসব মিথ্যে সব মিথ্যে। আমি তান্ত্রিকের বংশ, আমি ভূমির অধিকারীর ছেলে—আই ক্যারি রয়্যাল এ্যাণ্ড তান্ত্রিক সাধকস ব্লাড ইন মাই ভেনস।" মিস মালহোত্রা বলে যাচ্ছিলেন—আমি শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মানুষের ইতিহাস একদিকে যত আলোকোজ্জ্বল অন্তদিকে তত অন্ধকার ; গাঢ়তম চরমতম অন্ধকার, এ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু তবু মানুষ ওই আলোকোজ্জ্বল দিকটার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে, সেইটেকেই সে স্বীকার করে। হারা রায়ের মত অন্ধকারকে—।

মনে আছে সুলতা—হারা রায়কে অভিসম্পাত দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম ; মনে পড়ে গিয়েছিল শ্যামাকান্তকে। ভবানী দেবী রায়বংশে বধূ হয়ে এসেও শ্যামাকান্তের তামস তপস্যার

ধারাকে বিশুদ্ধ করতে পারেন নি।

সুলতা, নিজের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মে গেল। রাত্রে জাহাজে শুয়ে চোখ বুজলেই ওই অন্ধকার আমাকে চেপে ধরত। আমি ভয় পেতাম।

ডেকে মেয়েদের দেখতাম। জাহাজটায় ভারতীয় যাত্রীর ভিড় বেশী; বেশ কয়েকজন মহিলা যাত্রীও ছিলেন। নির্বিঘ্নে সুয়েজ পার হবার পর থেকেই সকলের উল্লাসই বেড়ে গেল। মেয়েদের বেশী। বিলেত থেকে নতুন জাত নিয়ে ফিরছেন তাঁরা। বিলেতের মুক্ত হাওয়ার দমকায় তাঁদের মাথার ঘোমটাই শুধু খসে নি, তাঁরা বেশবাসকে বেশ খানিকটা অসম্বৃত করে উতলা সমুদ্রবাতাসে নতুন যুগের ধ্বজার মত উড়িয়ে ফিরছেন।

আমি ভয়ে কারুর সঙ্গে মিশি নি। মিশতে চাই নি। কেবিনের মধ্যে রঙ তুলি নিয়ে বসে থাকতাম। ছবি আঁকার মধ্যে মগ্ন হতে চাইতাম। কিন্তু ছবি আঁকতে গেলেই মেয়ের মুখ তুলির মুখে ফুটে উঠত।

আমি ভয় পেলাম সুলতা। মনে হল আমার, আর বোধ হয় রায়বংশের বাঁচবার অধিকারই নেই।

দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা সত্য। শ্যামাকান্ত ধর্মসাধনায় যেখানে পৌছুতে চেয়েছিল পৌছেছিল, সোমেশ্বর রায় সম্পদের জোরেও সেখানে পৌছেছিলেন, আধুনিক শিক্ষাকে আয়ত্ত করে হারা রেও সেইখানে পৌছেছেন। ব্রজদা তোষামুদি শিল্প আয়ত্ত করেও সেইখানে পৌছুতে চেয়েছিলেন। আমিও ঠিক সেই পথে চলেছি, আমার ছবিতে ফুটে উঠছে নারীর মুখ।

বম্বেতে নেমেছিলাম অত্যন্ত ভীত হয়ে। মনে হয়েছিল মানুষের বংশলতার মধ্যে রায়বংশ সেই প্রথম পুরুষ থেকে এ পর্যন্ত যে পথে হেঁটেছে তাতে তার আর বাঁচবার অধিকার নেই। তাতে ছেদ টানতে হবে। অথবা ওই হারা রে'র সত্যকে এবং শ্যামাকান্তের সত্যকে সাহস করে আঁকড়ে ধরে উঁচু গলায় বলতে হবে—"এই সত্যই শ্রেষ্ঠ সত্য বাকী সবই ভ্রান্তি। মায়া। মিথ্যা।"

কিন্তু তা পারি নি। আমার কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে স্বর বের হয় নি, আমার জিভ বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে গিয়েও উচ্চারণ করতে পারে নি। আমার মনে পড়ত শ্যামাকান্তের সেই আর্তনাদের কথা। নিজেই নিজের গলা টিপে শ্যামাকান্ত বলত, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। বলতে দে। বলতে দে।

* * *

বম্বেতে নেমে মনে হল, কেন এলাম ফিরে?

ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। হিটলারের বাহিনীর ব্লিৎস ক্রিগের সামনে সমস্ত বাধা ঝড়ের মুখে ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওদিকে পোল্যাণ্ড থেকে বলকান—এদিকে ফ্রান্স থেকে

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া পর্যন্ত জলছে। ইংল্যাণ্ডকে মাশুল দিতে হবে। থাকলেই ভাল হ'ত। যেতাম ধুলো হয়ে উড়ে। ইংরেজের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের প্রসাদপুষ্ট বংশের সন্তান, যুদ্ধেও তো লেগে যেতে পারতাম। বিলেতে অনেক ইংরেজীনবিশ বিলিতি সভ্যতামুগ্ধ ভারত-সন্তান যুদ্ধে যোগ দেবার জল্পনা-কল্পনা করছে, তা শুনে এসেছিলাম। আমি তো দুদিক থেকেই যোগ্য। আমি সত্যাগ্রহকে বিদায় জানিয়ে সকল আগ্রহকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, আমার তো স্থান ছিল ওখানেই।

নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সুলতা। এ তুমি ভীরুর মত করলে কি?

বাঁধন-কাটা জীবনের সঙ্গে সুতোকাটা ঘুড়ির কোন তফাৎ নেই। এখান থেকে একটা বাতাসের তোড়ের মুখে গিয়েছিলাম বিলেতের আকাশে, আবার উল্টো বাতাসে ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। এসে একটা হোটেলে বসে ভাবতে লাগলাম বাকী জীবনটা কাটাব কি করে?

কাটা ঘুড়ির সঙ্গে যে সুতোটুকু থাকে তা মধ্যে মধ্যে গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের তারে আটকে ঘুড়িটাকে বাতাসের ঝাপটা খেতে দেখেছ, তেমনি মনের অবস্থা।

চন্দ্রিকা মালহোত্রার যাবার কথা দিল্লী। উনি বলেছিলেন কোন একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে তিনি নেবেন এবং তার উপর নির্ভর করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। সেও যদি ভাল না লাগে তবে ক্রিশ্চানমিশনে মানুষের সেবার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। বম্বেতে নেমে আমার মনের অবস্থা দেখে উনি আমাকে ফেলে দিল্লী রওনা হতে পারলেন না। যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই হোটেলে থেকে গেলেন। আমার মনের অবস্থা উনি অনুমান করেছিলেন, আমার মদ খাওয়া দেখে।

বম্বেতে হোটেলে একটা দিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে সম্ভবতঃ আক্রোশবশেই মদ বেশী পরিমাণে খাচ্ছিলাম। রায়বংশের যে জীবনধারা আমাকে কীর্তিহাট থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইংল্যাণ্ড, আবার ইংল্যাণ্ড থেকে বম্বেতে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, যার ভয়ে আমি আতঙ্ক দেখি; মায়ের মরা মুখ ভেসে ওঠে, সেই জীবনধারার জন্যেই যেন আমি পাগল হয়ে উঠছিলাম। আমি জমিদার, রায়বংশের শেষ জমিদার সন্তানের মতই জীবন-যাপন করব। কেন করব না? আমার অনেক সম্পদ জমে আছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে এসেছি বিলেতে। দেশে ব্যাঙ্কে এখনও লক্ষাধিক টাকা আমার মজুত আছে। আমার বিষয় আছে, কলকাতার বাড়ী আছে। যার মূল্য পাঁচ-ছয় লক্ষের উপর।

লক্ষই হোক আর কোটিই হোক, খরচ ক'রে ফেলতে কতক্ষণ? তবে খরচ করতে হলে ওই জমিদার বা রাজার ছেলের মত বাঁচতে হবে। ওই বাঁচার মধ্যেই খরচের পথ আছে। এক কথায় দান ক'রে দেওয়া যায়, সেটা আরও সোজা, কিন্তু হিসেবে সোজা হ'লেও কাজে কঠিন। ঠিক করে ফেললাম ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াব, রায়বংশের ছেলের মতই ঘুরে বেড়াব। ভাঙা প্রাসাদ, পুরোনো কেল্লা, বিরাট মন্দির, মসজিদ, গুহার অভ্যন্তর দেখে বেড়াব আর তার

সঙ্গে নারী আর সুরা। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে লিভার পাকিয়ে মরব ; কেউ জানবে না পরিচয় ; মুদ্দোফরাসে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফেলে দেবে। অথবা দেহটাকে চ্যারিটি করে যাব, লিখে রেখে যাব কোন মেডিকেল কলেজে দিয়ে দিতে। সেইটে হবে আমার লাস্ট উইল। এর থেকে ভাল উইল আর অধিকতর নাটকীয় উইল আর কি হতে পারে একজন রায়বংশের সন্তানের পক্ষে বল ?

সে-কাল হ'লে দেহটা দিয়ে যেতাম বিক্রমাদিত্যের মত কোন রাজাকে। বলে যেতাম —মহারাজ এই দেহটা তুমি নিয়ো, চিতায় পুড়িয়ো না, জলে ভাসিয়ে দিয়ো না, কবর দিয়ো না, বুকে বসে তান্ত্রিক তপস্যা করো, তোমার সামনে সাক্ষাৎ পরমাপ্রকৃতি আসবেন। তুমি তাঁর কাছে চেয়ে নিয়ো তোমার ইচ্ছামত বর। কোন্ বর ? অনন্তকাল পরমায়ু, অমরত্ব ? না, তা নিয়ো না।

তবে কি নেবে ? কোন্ বর নেবে ?

শ্যামাকান্ত শেষ পর্যন্ত মা বলে মুক্তি চেয়েছিল। হেরে গিয়েছিল। নিজে মুক্তি নিয়ে বংশের মধ্যে নিজের কামনা রেখে গেছে। সেই কামনা পূর্ণ হবার বর—।

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠতাম। পারতাম না ওই বর চাইবার কথা উচ্চারণ করতে।

* * *

এতটুকু বাড়িয়ে বলি নি সুলতা।

সমস্ত কথা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে পরের পর বলবার মত ক'রে মনে নেই। কারণ সে সময় প্রায় একটা বছর আমি প্রায় দিনরাত্রি মদ খেয়েছি। ইচ্ছে করেই মদ খেয়েছি তাদের মত ক'রে যারা মদ খেয়ে মরবে বলে সঙ্কল্প ক'রে মদ খায়।

বিষ খেয়ে মরায় খেদ আছে কষ্ট আছে, সব থেকে বেশী আছে গ্লানিকর অপবাদ। কেউ বিষ খেয়ে মরলেই লোকে সন্দেহ করে, জল্পনা-কল্পনা করে যে নিশ্চয় লোকটা কারুর কাছে মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে ; অথবা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে, যার জন্য দারা সমাজ এবং গভর্নমেণ্ট তার বিরোধী হয়ে তাকে সাজা দেবে। সেই সব গ্লানি থেকে এড়াবার জন্য বিষ খেয়েছে।

তার থেকে মদ খেয়ে মরা ভাল। মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এক ধরনের পাগল উল্লাস আছে, যা বিস্মিত করে দেয় সাধারণ মানুষের ঘৃণাকে, হতবাক করে দেয় কটু অপমানকর বাক্যকে।

মোট কথা কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বংশের পূর্ণ পরিচয় জেনে এবং পরিণাম দেখে পরিত্রাণ পাবার জন্য এদেশ থেকে পালিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ড। কিন্তু সেখানে গিয়েও পেলাম না, রায়বংশের সম্পদলক্ষ্মী হারা রে-কে কলঙ্কের বোঝা সমেত ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। হারা রে আজ একা নয়, ওই মেয়েটি তার কে তা জানিনে, তাকে নিয়ে নির্লজ্জ

ভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এবং ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেখান থেকে পালিয়ে এসে এবার আমি ওই ধারাতেই বাঁচতে চাচ্ছি। যে কটা দিন বাঁচব, সে কটা দিন ওই ট্রাডিশন রেখে বাঁচাই ভাল।

পুরাণে ইন্দ্রপতনের কথা আছে।

রায়বংশের ছেলে মাত্রেই ইন্দ্র। তারা পড়লে যদি ইন্দ্রপতনের মহিমা দুনিয়াকে চমকে না দেয় তো মরেও যে শান্তি পাব না। এবং সে মৃত্যুতে যে চরম লজ্জা।

ইন্দ্রেরা বিলাসের ব্যভিচারের জন্য চিরকাল মুনিঋষির অভিশাপ মাথায় নিয়েছে।

বম্বে থেকে পনেরো দিন পর মন ঠিক করে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু মিস মালহোত্রা বাধা দিলেন। না, মাই সন, এ তুমি করো না।

বললাম—না, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।

—কিন্তু এ পথ তো তোমার নয়! হলে তুমি হারা রে'র ভয়ে পালিয়ে আসতে না। হারা রে মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস, হয়তো যারা তাকে জানে না, চেনে না, তাদের কাছে ভয়ঙ্কর কিন্তু তোমার কি ভয় ছিল তার কাছে? কিছু না। ইংল্যাণ্ডে অনায়াসে তাকে এ্যাভয়েড করে আপন সুখের পথে চলতে পারতে। চল ফিরে চল, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব। আমার তোমাদের কীর্তিহাট দেখা হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমার কাছে তোমাদের কীর্তিহাটের গল্প করতেন। কীর্তিহাট আমার কাছে ড্রীমল্যাণ্ড হয়ে আছে আজও পর্যন্ত। একটা মহলের কথা বলতেন 'বিবিমহল'। ওয়াণ্ডারফুল নাম। জাস্ট লাইক দি মুঘলস রঙমহল। চল।

কিন্তু তা আমি শুনি নি। বলেছিলাম, আমাকে তুমি মাফ কর। আমি স্থির করে ফেলেছি। এবং আই ডিফার উইথ ইউ, এই-ই আমার পথ। একমাত্র পথ। জমিদারের ছেলে আমি, আমাকে জমিদারের ছেলের মতই বাঁচতে হবে, য'দিন বাঁচব এবং মরতে হলেও জমিদারের ছেলের মত মরতে হবে এবং তাই মরব।

—কিন্তু গৌতম-বুদ্ধ কি রাজার ছেলে ছিলেন না? তিনি কি রাজ্য ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে—

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেছিলাম—না, ওই একটা-দুটো ইতিহাসের নাম আমার কাছে অনুগ্রহ করে করো না। বুদ্ধ গৌতম একটা, হয়তো বা ইতিহাসে নাম ওঠে নি এমন সন্ন্যেসী হয়ে যাওয়া রাজা-জমিদারের ছেলে আরও একশো-দুশোও ছিল বা আছে। কিন্তু ওদের উল্টো মানুষের সংখ্যা কোটি দরুনে। আড়াই হাজার বছরে অনেক কোটি। প্লিজ লিভ মি। তুমি তোমার পথে যাও। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।

পরের দিনই আমি মিস মালহোত্রাকে এড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অজন্তা গুহা দেখব এবং সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ।

নিজামের হায়দ্রাবাদ।

হায়দ্রাবাদ নিজাম হারেমে ক্ষুধিত পাষাণের সুন্দরীরা জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হায়দ্রাবাদের চৌক-বাজারে রূপের হাটের জৌলুষে প্রদীপ আপনি জ্বলে ওঠে; সেখানকার গান-বাজনা-নাচের আসরে সেতারের তার আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায় না, তবলার বোলে ভুল হয় না, গানের তাল কাটে না।

১৯৪০ সাল সুলতা। আমার বয়স তখন তিরিশ। বিলেতে এক বছর থেকে ফিরেছি। আমার নিজের রূপের জলুষ তখন কম ছিল না। বম্বেতে নতুন করে সব সরঞ্জাম কিনে নিলাম। কল্পনা ছিল সারাজীবনের সরঞ্জাম যোগাড় করে নিচ্ছি।

রঙ, তুলি, ইজেল ক্যানভাস কিনলাম নতুন করে। শুনে হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে, অজন্তায় গিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত ফ্রেস্কোগুলোর নকল করব; কিন্তু না। ওসব তো অনেকে করেছেন। স্বয়ং নন্দলাল বসু করেছেন, অসিত হালদার মশাই করেছেন, আরও অনেকে করেছেন। আমি ওর জন্য এসব সরঞ্জাম কিনি নি। ওসব আমি কিনেছিলাম, অপরূপ রূপসী অবশ্যই দেখতে পাব, তাদের ছবি আঁকব বলে।

আর কিনেছিলাম একটা দামী বেহালা, আর বাঁশের বাঁশী। বাজাব। গান-বাজনার আসরে তেমন গান শুনলে আমি বাজিয়ে সঙ্গত করব।

সুরেশ্বর বললে—সংসারে মানুষের জীবনে কার্যকারণেই হোক বা ভবিতব্যের বিধানেই হোক, যা ঘটবার তার বিপরীত কিছু ঘটানো যায় না। সংকল্প করেও তা ঘটাতে পারে না মানুষ। দু-এক ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিশালী মানুষ সংকল্প করে ঘটনার গতিরোধ করে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দাম দাঁড়ায় যৎসামান্য।

আমি সংকল্প করেছিলাম—নিজেকে আমি ভাসিয়ে দেব বা রায়বংশের বড় বড় পুরুষগুলির জীবন যে খাতে প্রবল স্রোতে বয়ে গেছে সেই খাতে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেব; কোন খালেবিলে বা পঙ্কপল্বলের মধ্যে হারিয়ে যাব।

হারা রায় এবং শম্পা রায়ের বিবরণ আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল এবং মিথ্যে কথা বলব না, জীবনে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেও যে তীব্র কামনায় উন্মাদের মত রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, শিব মোহিনীর পিছনে ত্রিভুবন ছুটেছে সে কামনা আমি অনুভব করি নি। ইংল্যাণ্ডে শম্পা রায়কে দেখে আমার জীবনকামনা ভীত হল—আমাকে বললে, "ভীত হও তুমি। নত হও তুমি।"

বম্বেতে এসে কয়েক দিন মদ খেলাম, আর রায়বংশের হিসেবনিকেশ করলাম। এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, তুমিই বা এমন পঙ্গুর মত বা ওয়ারেণ্টের আসামীর মত এমন ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? দোহাই তোমার, ছিঁচকে চোর তুমি হয়ো না, দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হও। পিতৃপুরুষের পথ ছাড়া তোমার পথ নেই, আর সে পথে পায়ে হেঁটে কোন

কিছুর আড়াল দিয়ে চলবার উপায় নেই, ওপথে রাবণের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটতে হবে—অথবা রথে চড়ে ছুটতে হবে।—তাই ছোটো।

রঙ-তুলি বেহালা বাঁশী কিনে বম্বে থেকে এলাম হায়দ্রাবাদ। জাঁকজমক করে হায়দ্রাবাদের বড় হোটেলে উঠলাম। হোটেলেই ভালমন্দ সকল পথের পথিকদের পথ দেখাবার জন্যে পথের দিশারী আছে। তাদের বকশিশ দিলাম। সেলাম নিলাম। সব আয়োজনই করলাম কিন্তু ভেসে যেতে পারলাম না, রায়বংশের জীবনস্রোত আমাকে ওই খাতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না—আরও একটা খাত বেয়ে গিয়েছিল, কীর্তিনাশা পদ্মার প্রবল স্রোতকে পাশে রেখে ভাগীরথীর ধারার মত সেই খাতে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

ভাগীরথী আর কীর্তিনাশা নাম দুটো ব্যবহার করছি বলে ভেবো না নিজেকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করছি, রায়বংশের মুক্তিদাতা উত্তমপুরুষ বানাচ্ছি নিজেকে। না, তা বানাচ্ছি না। ভাগীরথীর বদলে 'হুগলী নদী' বলব বা বলছি তাহ'লে।

আমি পারলাম না ভেসে যেতে ; ওই উদ্দাম জীবনস্রোত যেন ব্যঙ্গ করে ঢেউয়ের ধাক্কায় ক্ষীণস্রোতা পাশের ছোট শাখাটার মুখের দিকেই ঠেলে দিলে।

একটু থামলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—তা ছাড়া সুলতা, তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা, তুমি একথা নিশ্চয় মানো যে, মানুষের জীবনের গতি এবং তার পরিণতি শুধু তার ব্যক্তিগত এবং বংশগত ভাগ্যলিপি বা কর্মচক্রেই চলে না ; কালের একটা হাওয়া আছে মহিমা আছে। সেটা চিরকাল আছে। ভাগীরথী যেদিন এসেছিলেন এবং সমুদ্রে মিশেছিলেন, সেদিন শুধু অভিশপ্ত সগর-সন্তানেরাই উদ্ধার হয় নি—আরও বহু বহু হয়তো কোটি কোটি পতিত আত্মা উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জলের মহিমায়। কালের মহিমা বা হাওয়াও সাহায্য করেছিল।

কালটা ১৯৪০ সাল, মার্চ মাস। ইয়োরোপে পোল্যাণ্ডের করিডোর নিয়ে শুরু যে যুদ্ধ তা ধীরে ধীরে ক'মাসে গোটা পোল্যাণ্ডের উপর ভারী রোলারের মত গড়িয়ে চলে এবার দ্রুতবেগে চলতে শুরু করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া অর্ধেক পোল্যাণ্ডের ভাগ নিয়ে ওদিকে ফিনল্যাণ্ড নিয়েছে। এদিকে জার্মানী নরওয়ে দখল করে ফ্রান্সে ঢুকে, ব্লিৎসক্রিগ চালিয়ে ফরাসী এবং ইংরেজ বাহিনীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে। ব্রেনার গিরিবর্তে হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

সারা ভারতবর্ষ থমথম করছে। প্রতীক্ষা করছে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কোন্ নির্দেশ দেবেন মানুষকে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ প্রতীক্ষা করছে সুভাষচন্দ্র কি বলবেন! কংগ্রেসের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতারা কি বলবেন! কি নির্দেশ আসবে! যে নির্দেশ যিনি দিন, সে নির্দেশ মারবার এবং মরবার হুকুমের চেয়ে কম হলে বুক ভরবে না কারুর। সে সামান্য নিরক্ষর জনেরও না।

সুলতা, এমন সময় যখন আসে তখন এমন একটা হাওয়া বয়—যেটা বৈশাখী দুপুরের হাওয়ার মত আগুনকে দ্বিগুণ করে জ্বালিয়ে তোলে। সে সময়ে সর্বনাশের নেশা লাগে বটে কিন্তু সুরা আর নারী নিয়ে ব্যভিচারের নেশা নয়। সে নেশা ঠিক তার উল্টো নেশা।

হায়দ্রাবাদের একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা শিলালিপির মত অক্ষয় হয়ে আছে বুকে। সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ রামগড়ে আপোসবিরোধী সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তৃতার কাগজ মদের গ্লাস হাতে করে পাশে সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু আশ্চর্য্য, নেশা জমে নি এবং কখন যে গ্লাসটা নামিয়ে কাগজখানা টেনে নিয়েছি তা খেয়াল করি নি।

ঘণ্টা দুয়েক বসেছিলাম এইভাবে।

কালটাই ছিল সুরা ও নারীর নেশা ছাড়বার ছুটবার কাল; নেশা করব বলে সংকল্প করলেও সে সংকল্প রাখতে পারি নি। তাছাড়া আরও এক ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি ঘটত, সেটাও আমার এই জবানবন্দীর মধ্যে বলে যাই।

সেটা শুধু আমার জীবনের সত্যই নয়, গোটা রায়-বংশেরই জীবনসত্য সেটা। মদের নেশার ঘোর বাড়লেই চোখে কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত।

সেদিন হায়দ্রাবাদের হোটেলে নিজেকে সবে প্রস্তুত করে নিচ্ছি; প্রস্তুত অর্থে সুলতা মদের নেশাটাকে বেশ প্রখর করে তুলে মনে মনে ভাবছি রায়বংশের ধুরন্ধর রায়দের কথা; কুড়ারাম রায় ভটচাজের বৈষ্ণবীর কথা, সোমেশ্বরের সেই মনোহারিণী ব্রাত্যনারীর কথা, শ্যামাকান্তকে বর্ষার কাঁসাইয়ে ফেলে দিয়ে যাকে তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, বিকৃতমস্তিষ্কা কামার্তা মেয়েটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। বিশদ বিবরণ থাক, সবই জান, মোট কথা রায়বংশের রুচি ও রীতিগুলোকে স্মরণ করে নিজেও ওই ছাঁচে নিজেকে ফেলব বলে তৈরী হচ্ছি—এমন সময় হোটেলের দালাল এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল। বললাম—কি খবর?

সে দুটি বাঈকে নিয়ে এসেছে; অর্থাৎ দেখাতে এনেছে। এরাই নাকি হায়দ্রাবাদের রূপের হাটের সব থেকে সেরা রূপসী পসারিণী, এবং রূপের হাটে রূপ ছাড়া যে গুণের প্রয়োজন সেই গুণের অধিকারিণী—নাচা-গানায় অদ্বিতীয়া; দালাল বললে—ই দোনোকে জুড়ী বাঈ তামাম হায়দ্রাবাদমে নেহি মিলেগী। বললে—ওরা বাইরে বসে আছে, ডাকব ভিতরে?

কেমন সংকোচ বোধ করলাম। মোট কথা, ব্রজদার শেফালির পাড়ায় যে সংকোচ অনুভব করেছিলাম, সেই সংকোচ আড়ষ্ট করলে আমাকে। ব্রজদার শেফালির পাড়াতে তবু তো দয়া করুণা উদারতার বাস্কেট মাথায় করে দয়া চাই করুণা চাই হাঁক দিয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়েছিলাম, ব্রাভাডো ছিল, এখানে তার কিছুই পেলাম না এবং নার্ভাস হয়ে বললাম—"না—ডাকতে হবে না"।

—তা হলে?

—বারান্দায় বসে আছে বলছ?

—হাঁ হুজুর, যেখানে লোকজন এসে বসে।

আমি বললাম, আমি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে ওদের দেখে আসছি। বুঝেছ?

সে বললে—আপনি কেন সরম করছেন হুজুর। এখানকার হালই এমনই। ওরা ডাকলে হোটেলে আসে। নাচা-গানা এখানে ভাল হয় না কিন্তু—।

সুরেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বাকীটা তুমি বুঝতে পারছ সে কি বলেছিল! বোধ করি হোটেল-জগৎটাতেই এ-রীতি—সেই অন্ধকার কাল থেকে একাল পর্যন্ত সমগৌরবে এবং কালোপযোগী পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে খোলস বদলে বদলে সমান শ্রদ্ধায় চলে আসছে।

ট্রেড-জগৎ বড় বিচিত্র জগৎ; ট্রেডের মধ্যে অনেস্টি আছে এবং অনেস্টিই হল সব থেকে বড় ক্যাপিট্যাল কিন্তু শুচিবাই ওখানে অচল। শুচিবাই চলবে না। অনেস্টির জন্য হোটেলে মেয়েদের আনাগোনা করতে দিতে হয়। না দিয়ে উপায় নেই।

তত্ত্ব আলোচনা থাক। যা ঘটেছিল বলি—আমি তাদের দেখে এলাম। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়ে দুটি পরস্পরকে ইসারা করে হাসাহাসি করতে লাগল। এবং হাস্যের সঙ্গে কিছুটা লাস্য আপনি তাদের সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ল। ভাল লাগল আমার।

মুসলমানী বাঈজী। একজন ফিরোজা; সেই তরুণী এবং অন্যজনের নাম জুলিখা, সে পরিপূর্ণ যুবতী। রবীন্দ্রনাথের 'দে লো সখি দে, পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুলহার' গানের গায়িকার মত যুবতী। তার মাথার মিহি ওড়নাখানা সত্যই বার বার মাথা থেকে খসে পড়ছিল। বার বার সে তুলে নিচ্ছিল লীলাচ্ছলে। হঠাৎ কোথায় কোন্ ঘর থেকে কলিংবেল বেজে উঠে আমাকে চমকে দিলে; আমি আত্মস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এলাম; দালালটাও আমার পিছন পিছন এল এবং আমার সোফার পাশে দাঁড়িয়ে বললে—আব ফরমাইয়ে বাবুসাব। হুকুম তো হো যায় আপকা।

আমি মদের গ্লাস যেটা ফেলে গিছলাম সেটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললাম—ঠিক হ্যায়। সন্ধ্যার পর যাব, মহফিল হবে।—

—বলুন কাকে চাই!

ভেবে ঠিক করতে পারি নি, রূপ চাই না যৌবন চাই, নাচ চাই না গান চাই—এর তো এক মুহূর্তে মীমাংসা হয় না। যারা মীমাংসা করে নিতে পারে, তারা রূপও চায় না যৌবনও চায় না, গানও চায় না, নাচও চায় না, চায় একটি নারীদেহ। তারাই সংসারে বেশী। সুলতা, আমি বোধ হয় তা নই। রায়বংশে জন্মে যে কেমন করে এমন হয়েছি আমি একথা ভেবে পাইনে। কালের কথা বলেছি, বাবার জীবনের চরমতম ট্র্যাজেডির কথা জান, মায়ের

চোখের জল দেখেছি, ধনেশ্বরকাকার দৈত্যের মত ছেলেটার পরিণাম—তাও আমার চোখের সামনে ঘটল—হয়তো সেই জন্যে এমন আমি। তার উপর আমি আর্টিস্ট—শুধু দেহ নিয়ে আমার মন ভরে না, আমি বোধ হয় রূপ যৌবন গুণ অর্থাৎ নাচগান বিচার করতে চাই। তাই বলেছিলাম—দুজনেই থাকবে মহফিলে। একজন গাইবে, একজন নাচবে।

লোকটা সাবাস সাবাস করে উঠেছিল এবং বড়রকম মক্কেল মনে করে বার বার তসলীম জানিয়েছিল। ফলে রাত্রে ওদের আস্তানায় যে মহফিলের আসর বসেছিল—তাতে জলুষের একটু বাড়াবাড়ি করেছিল। সেটা আমাকে কায়দা করবার জন্য বা গাঁথবার জন্য।

আমার খারাপ লাগে নি।

জীবনে রাজাগিরি, বাদশাগিরি, নেতাগিরি যাই বল না কেন সবই বলতে গেলে 'আবু-হোসেনি' ব্যাপার।

আবুহোসেন নিশ্চয় জান—আরব্য উপন্যাসের গল্প, হারুণ অল রশিদের হুকুমে মসরুর দেউলেপড়া উদার বণিকপুত্রকে রাত্রির মত বাদশা বানিয়ে দিয়েছিল। গিরিশবাবুর একখান নাটক আছে এই উপাখ্যান নিয়ে। আবুহোসেন সেজেই বসেছিলাম খুশীর সঙ্গে।

গ্রীষ্মকাল। আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের জলো বাতাসের ঝলক তখনও নিজাম রাজ্যে এসে পৌঁছয় নি ; গরমের মেজাজ তখন চড়া কিন্তু মুসলমানী আমীরিয়ানার ব্যবস্থায় আরামের আয়োজনের ঘাটতি ছিল না। সে তোমার গোলাপজলের ঝাঁঝরিওয়ালা পিচকারি, গোলাপ-পাশ, বেলকুঁড়ির মালা, সুবাসিত পান, আতর, ঠাণ্ডাই শরবৎ নিয়ে জাফরীকাটা আলসে-ঘেরা খোলা ছাদের উপর আসর বসেছিল একটি খণ্ড স্বপ্নলোকের মত। তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দান ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান।

বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা বীয়ার এবং দামী হুইস্কি। সারেঙ্গীদার তবলচীরা বসেছে গোঁফে তা দিয়ে, গলায় বেলকুঁড়ির মালা ঝুলিয়ে।

মেয়ে দুটি সেজেগুজে এসে বসল, সঙ্গে সঙ্গে দুটো বড় স্ট্যাণ্ডিং লাইটের স্যুইচ অন করে দিলে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত রূপ! বা রূপের এত ঐশ্বর্য! রূপকে এমন অপরূপ করা যায়, যা পুরুষের মনকে মুহূর্তে লালসায় কামনায় স্থান-কালপাত্র সব ভুলিয়ে দিতে পারে!

সঙ্গীতের যন্ত্রের সুর বাঁধা হচ্ছিল। আমি তাকিয়েছিলাম ওই ওদের দিকে। ইংল্যাণ্ডে ঠিক এই ধরনের পরিবেশ হয় নি। এমন করে ওরা সজ্জা করে অপরূপ হয়ে মন ভুলাতে পারে না। অবশ্য হোটেলে নাচ হয়, সেখানে মেয়েরা সেজে আসে। তার মধ্যে তনুদেহের অনাবৃত বিজ্ঞাপন পুরুষকে চঞ্চল করে তোলে। বুকের মধ্যে রক্তধারা বাঁধভাঙা নদীস্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও ভারতীয় প্রথা যেন বেশী মোহময়ী।

যুবতী মেয়েটি একেবারে গৃহের গৃহিণীর মতই অতিথিসৎকারে তৎপরা হয়ে উঠল। এগিয়ে

এসে প্রথম পানের খিলি এগিয়ে দিলে, তারপর বোতল থেকে ঢেলে গ্লাস পূর্ণ করে সোডা মিশিয়ে একটি পরাতে করে আমার সামনে ধরে দিয়ে উর্দুতে বললে—খেতে হুকুম হোক রাজাবাবু!

আমি গ্লাসটি নিয়ে বললাম—তোমার নাম জুলেখা!

—আমি হুজুরের বাঁদী।

—তোমরা খাবে না?

—হুকুম হলে খাব। কিন্তু হুজুরকে নাচা-গানায় খুশী করতে হবে।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকে দেখছিলাম। গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে দিলাম—তখন গান সবে শুরু হয়েছে। চোখ বুজে শুনতে লাগলাম। ভাল গায় মেয়েটি। সত্যিকারের ভাল গায়।

এরই মধ্যে ঠুং করে শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি গলায় ডাক শুনলাম—বাবুসাব!

চোখ মেলে দেখলাম, তরুণী মেয়েটি গ্লাস ভরে নিয়ে সামনে ধরেছে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিলাম। নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের কথা। সোফিয়াকে নিয়ে বীরেশ্বর রায় এমনি ভাবেই জানবাজারের বাড়ীতে আসর পাততেন।

মনের মধ্যে যেন একটা আমীরি আমেজ অনুভব করছিলাম। পকেটে হাত দিয়ে আমার টাকার থলিটা নাড়লাম—বকশিশ দেব। গ্লাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করে নামিয়ে দিয়ে বললাম—আবার ঢালো!

মেয়েটি ঢালতে লাগল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি গ্লাসটি আমার হাতে ধরিয়ে দিতেই আমি বললাম, এটা তুমি খাও।

মেয়েটি ফিক করে হাসলে।

তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে নামিয়ে রেখে আমার সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে ডান হাতখানা আমার সামনে পেতে বললে, টাকা দাও বাবুজী!

আমি একটু বিস্মিত হলাম। চলে যেতে চায় নাকি?

মেয়েটা বুঝতে পারলে আমার মনের প্রশ্ন। সে বললে—মুজরায়—গানাবাজানার-নাচনার আসরে দারু আমরা খাইনে বাবুসাহেব, দারু খাই মহব্বতির আসরে। আমার সঙ্গে মহব্বতি করতে হলে সে অনেক টাকার কারবার বাবুজী। তবে বকশিশ করলে আমরা কিছু কিছু দারু খাই। প্রথমেই তো কিছু বকশিশ করো।

আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হাতখানা পেতে মেয়েটা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বললে, আমার পাওনা বকশিশ দাও বাবুজী!

মদের নেশার মধ্যে আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল, আর একজনের

কথা, ঠিক এইভাবে সিগারেট টানতে টানতে, আমার সিগারেটের টিন থেকেই সেও সিগারেট নিয়েছিল, বলেছিল—give me my dues.

লরা নাইট ওরফে শম্পা রায়। যাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন রায়বংশের মুখের গড়নের সঙ্গে ছাঁচের সঙ্গে একটা মিল আছে। সেও বলেছিল—give me my dues.

ফিরোজা—ফিরোজা মেয়েটার নাম, সে তখনও বলছিল—দাও বাবুজী, আমার পাওনা বকশিশ দাও!

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে তাকে দিয়ে নিজেই টেনে নিয়েছিলাম হুইস্কির বোতলটা এবং একটা নতুন গ্লাস।

পর পর বোধ হয় দু'তিন গ্লাস মদ খেয়েছিলাম। মনের মধ্যে কি যেন একটা আতঙ্কের মত পাক খাচ্ছিল—যেন কত উদ্বেগ বুকে জমা হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠছিল। মনে পড়ছিল রায়বংশের ইতিহাস। যে ইতিহাস আমি সেটেলমেন্টের সময় গবেষকের মত পড়েছি-জেনেছি। কুড়ারাম ভটচাজ থেকে যোগেশ্বর রায় আমার বাবা পর্যন্ত সকলকে মনে পড়েছে, মেজকাকু শিবেশ্বর রায় এবং তার ছেলে ব্রজেশ্বর আর সেই দৈত্যটাকে মনে পড়েছে আর ভয় পেয়েছি। ক্রমাগত একটা প্রমত্ত উল্লাস নাচতে নাচতে দু হাতে ডাক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল আর তার পিছনে পিছনে আসছিল একটা ভয়ঙ্কর ছায়া—সে আসছিল দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে।

এরই মধ্যে আমার মদের নেশার প্রভাবে আমার চোখে কি করে যে ওই তরুণী মেয়েটার চেহারা পাল্টে গেল তা আমি জানি না। কিন্তু বিশ্বাস কর—গেল। একেবারে পাল্টে গেল। ফিরোজার পোশাক ছিল সেদিন চুড়িদার পায়জামার উপর পেশোয়াজ কাঁচুলি ওড়না, নাকে গয়না, কানে গয়না, কপালে টিকলির ধুক্‌ধুকি, কষকষে কালো তৈলমসৃণ চুলে জরি জড়ানো লম্বা বেণী; গলায় জড়োয়ার কণ্ঠী। হাতে কঙ্কণ চুড়ি। কিন্তু আমার মনে হল ফিরোজা নয়, এ সেই শম্পা রয়, অবিকল শম্পা রয়—সে কোন থিয়েটারের গ্রীন রুম থেকে পাকা মেকআপ-ম্যানের হাতে হায়দ্রাবাদের নাচওয়ালী সেজে এসেছে।

বার বার মুখের দিকে তাকালাম। কিছুতেই ফিরোজাকে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তার এতটুকু সন্ধান মিলল না। শম্পা রয়। অবিকল রায়বাড়ীর ছাঁচের মুখ।

বার বার অস্বীকার করলাম—না, নয় নয় নয়।

স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়েই মনের ভ্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম—অস্বীকার করছিলাম, না—নয় নয় নয়।

মেয়েটা তখন ওই যুবতী গাইয়ে মেয়ে জুলেখার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল।

আমি ডাকলাম—শোন!

সে মুখ ফেরালে—ফরমাইয়ে।

এবার মনে হল, না—শম্পা নয়—সে মেয়েটা মেমসাহেব। এ এ-দেশের মেয়ে, কিন্তু ফিরোজা নয়। মুখে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের মুখের ছাপ রয়েছে। অবিকল রয়েছে। এতটুকু ভুল হয় নি আমার।

মনে হল—অনেকটা অর্চনার মত দেখতে।

হ্যাঁ, অর্চনার মত।

আমি চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললাম—আঃ!

ফিরোজা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললে—বাবুজী!

আমি চমকে উঠে সাপ দেখে যেমন সরে যায় তেমনি করে সরে গেলাম। সকলে চমকে উঠল। গানের আসর ভেঙে গেল।

—কি হল—বাবুজী—বাবুজী!

—কুছ না। পানি। এক গিলাস পানি—

ঠাণ্ডা জল নিয়ে এগিয়ে এল জুলেখা যুবতী মেয়েটি। আশ্চর্য, জুলেখার মুখের চেহারাও যেন পাল্টে গেছে!

তার মুখেও দেখেছিলাম যেন রায়বাড়ীর কোন বধূর মুখ। ছবিতে দেখা মুখ।

আবার মনে হয়েছিল, না। রায়বাড়ীর কর্তাদের কোন অনুগৃহীতার মুখ। ঝপ করে ভেসে উঠেছিল মিস মালহোত্রার মুখ। না। পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল—না, তার মত নয়। তবে কারুর মত বটে। তাকে হয়তো চিনিনে। হয়তো সোফিয়া।

আমি আতঙ্কিতের মত উঠে দাঁড়িয়ে দালালটাকে বলেছিলাম—আমার শরীর খুব খারাপ মালুম হচ্ছে, ট্যাক্সি ডাক। আমি হোটেলে ফিরব। দুখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বলেছিলাম—জলদি করো। জলদি।

জুলেখা এসে আমার হাত ধরে বলেছিল—বাবুজী, বাবুজী, বাবুজী!

আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম এবং বলেছিলাম—ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, ছোড় দো—মুঝে ছোড় দো। মুঝে ছোড় দো!

শ্যামাকান্তের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বোধ হয় আমার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছিল সুলতা।

আমি সেই যে হায়দ্রাবাদের জুলেখা বাঈয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম, তারপর আর জীবনে নারীর জীবন-যৌবন-নীরে অবগাহন করতে ছুটে যাই নি। একটা ভয়, হ্যাঁ, একটা ভয় যেন আমার পা টেনে ধরত। কত সুন্দরী মেয়ে—কেউ আমার রূপে, কেউ আমার শিল্পী-খ্যাতির আকর্ষণে, কেউ আমার অর্থের জন্যে আমাকে আকর্ষণ করেছে, আমিও আকর্ষণ অনুভব করেছি, কিন্তু তবু এগুতে পারি নি। কেমন যেন ভয় পেয়ে এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে এসেছি। মনে মনে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি—কেন? এমন হয় কেন? নারীর জীবনস্রোত যৌবনের রূপের খাতে অনন্তকাল বইছে এবং পুরুষেরা

দলে দলে ছুটে এসে সেই আদিকাল থেকে এই স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সেখানে আমি তার তীরের ঘাটে এসে ভয় পেয়ে জলাতঙ্ক রোগীর মত ফিরে যাচ্ছি কেন?

কত রকম মনে হয়েছে। সে-সব কথা থাক। এক-একবার ভেবেছি—কোন মনের ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু যাই নি। কি হবে গিয়ে, তারা যা বলবে সে আমার অজানা ছিল না।

আমি তো বুঝতেই পারছি—এ আমার ভ্রম—মনের ভ্রম। আমার বাবার জীবন, মায়ের দুঃখ, মেজদাদু শিবেশ্বর রায়ের পরিণাম—তাঁর দৈত্যের মত পৌত্রটার পরিণতি, চোখে দেখে এবং রায়বাড়ীর দপ্তর ঘেঁটে এ-বংশের নারীজীবন নিয়ে একটা অস্বাভাবিক আসক্তির ইতিহাস পড়ে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে। ব্যাধি আমার ওইটেই। রায়বংশের ইতিহাসকে আমাকে ভুলতে হবে। মনের ডাক্তার আমাকে এই কথাই বলবেন তা আমি জানতাম। বলবেন—ভুলে যান। ওসব ভুলে যান। পৃথিবীতে এইটেই চিরকালের নর-নারীর জীবনের ধারা। আপনাদের বংশের প্রতাপ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, অর্থ ছিল, সম্পত্তি ছিল, স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের বংশের পূর্বপুরুষেরা weaker Sex-কে টাকা দিয়ে কিনেছেন, প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে কেড়ে এনেছেন—কেউবা হয়তো পুরানোকালের বিশ্বাসবশে ধর্মসাধনা করে Spiritual Power দিয়ে মেয়েদের আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই পাওয়ার কি, তা তাঁরাই জানেন। যখন যেমন যুগ। ফরগেট অল দোজ থিংস। এ-কালে যেমন যুগ সেইভাবে কোন নারীকে জীবনে পাবার চেষ্টা করুন এবং বিশ্বাস করুন, আপনি শুধু আপনার নিজের জন্যে রেসপন্সিবল, অন্য কারুর জন্যে নয়; এমন কি কাল কি করেছেন, তার জন্যে অনুশোচনা না করে বিগিন লাইফ উইথ এ ক্লীন শ্লেট ফ্রম টু ডে এবং তার মধ্যেই দেখবেন আপনি পাপীও নন পুণ্যাত্মাও নন, আপনি একজন গুড সিটিজেন। সহজ মানুষ। এর সবই আমি মানি—এ আমারই কথা স্থূলতা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই স্থূলতা, তা আমি পারি নি। কিছুতেই পারি নি। এর জন্যে যে আমাকে যা বলবে আমি প্রতিবাদ করব না, মেনে নেব।

মনে কেমন একটা সংকল্প জাগল, রায়বাড়ীর অন্য শাখার স্রোত যতদিন চলে চলুক, যতদূর চলে চলুক, দেবেশ্বর রায়ের ছোটছেলে যোগেশ্বর রায়ের জীবন ধরে যে স্রোত এখন সুরেশ্বর রায়ের দেহের খাতে বেয়ে চলেছে, তাকে আমি শেষ করে দেব এবং রায়বাড়ীর সম্পত্তির শক্তিবলটাকেও নিঃশেষিত করে দেব। নানান রকম কল্পনা করতাম, কখনও কল্পনা করতাম গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ করে জমিদারীর মালিকানা তার হাতে দেব—কখনও ভাবতাম সরকারকেই ইস্তফা দিয়ে যাব। মেদিনীপুরে গভর্নমেন্টের খাস জমিদারী অনেক আছে, সেইমত ব্যবস্থা হবে। কখনও ভাবতাম বিক্রী করে দিয়ে সেই টাকায় একটা বড় কিছু করে দিয়ে যাবে। যার থেকে রায়বংশের কোন শাখার কেউ যেন এতটুকু পাথের না পায়।

ভেবেছিলাম কোন একটা আশ্রমে চলে যাব। ১৯৪০।৪১ সাল। কালের দিক থেকে একটু বিলম্বিত হলেও, কালটায় আশ্রমবাসী হওয়ার একটা ঝোঁক তখনও বিগত হয় নি। কিন্তু তা-ও পারি নি; কারণ ঈশ্বর ধর্ম-ধ্যান-জপ এ আমার পক্ষে বিষম বস্তু ছিল। কীর্তিহাটে ঠাকুরবাড়ীতে যেতাম চরণোদক খেতাম না, মাথায় নিতাম, বাল্যভোগের প্রসাদ দু-চার দিন খেয়েছি, এ-সবই সত্যি, মিষ্টি ফল আমিই কিনে দিতাম—খেতেও মিষ্ট লাগত, প্রণামও করেছি—তার মধ্যে ভক্তি কিম্বা সত্যবোধ ছিল না স্থূলতা, যখনই ঠাকুরবাড়ী গেছি, যখনই ঠাকুরদের কথা ভেবেছি তখনই মনে হয়েছে, ওই কালীঠাকুরুণটির এবং রাধাসুন্দর ঠাকুরটির আমি অন্নদাতা পিতা। ওরা একান্তভাবে আমার। তবে মুখে সেটা কোনদিন প্রকাশ করি নি। আমাদের দেশে তো ঠাকুরে-ঠাকুরে লড়াই হয়, এবং সে-লড়াই তাঁরা করেন ওই পালক-পিতাদের হুকুমে। বিসর্জনের সময় কার প্রতিমা আগে যাবে এই নিয়ে বড় বড় খুন-জখম এবং স্বত্বের মকর্দমার নজীর পাবে হাইকোর্টে। ছোটতরফ বড়তরফের কালী-প্রতিমারা ছোটবাবু আর বড়বাবুর হুকুমে নদীর দিকে ছুটেছে; এ ওর পথ আগলেছে, ও এর পথ আগলেছে। লড়াই করতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়েছে। মুসলমানদের তাজিয়া নিয়েও এমন মামলা বছর বছর হয়। সুতরাং ধর্ম বা ধর্মের আখড়ার দিকে আমার আকর্ষণ কিছু ছিল না। ইদানীং অবশ্য অনেক ভোগী মডার্ন সন্ন্যাসীদের আশ্রম হয়েছে, যেখানে তপস্যা থেকে ভোগ বড়, কিন্তু তাদের প্রতিও আকর্ষণ ছিল না। আমি চেয়েছিলাম জীবনে মুক্তি। সে-মুক্তি কেমন করে কোন্ পথ ধরে আসবে জানি না, তবে চেয়েছিলাম তাই।

বিশ্লেষণ করে বলতে পার জমিদার বা ধনীপুত্রের আর এক ধরনের মনোবিলাস। আমি অস্বীকার করব না। অনেকটা তাই-ই বটে। সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তরাবর্ত অভিমুখে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে ছেদ পড়ল। সময়টা কালীপুজোর পর সম্ভবতঃ রাস-পূর্ণিমার আগের দিন—আমি ছিলাম তখন হরিদ্বারে। হরিদ্বার বড় ভাল লেগেছিল। ভাবছিলাম এই অঞ্চলেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ লছমনঝোলা পর্যন্ত অঞ্চলটির কোন একটি স্থানে একখানা ঘর বানিয়ে ছবি এঁকে জীবন কাটালে কেমন হয়? হঠাৎ অর্চনার চিঠি এল। কলকাতা থেকে অর্চনা লিখেছে—

সুরোদা,

বৃন্দাবন থেকে খবর দিয়েছে বড়ঠাকুমা, লিখেছেন এবার আমি যাব। লিখেছেন তোমাকেই, লিখেছেন—ভাই, কীর্তিহাটের বড়বাবু আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি রায়দের সঙ্গে বন্ধন কেটে চলে এসে বৃন্দাবনে আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীর পাপের অন্নের পিণ্ড গোবিন্দের নাম নিয়ে খেয়ে বেঁচে আছি। ছেলেরা খোঁজ করে নি। আমার বাপের লাখ টাকা ছিল,

তা ছেলেরা ঘর ছেড়ে চলে এসেছি বলে নিজেরা নিয়েছে। তাতে ক্ষোভ ছিল না, খেদ ছিল না। তারা ভুলেছিল তাতেও মনে ভাঁটা পড়েছিল—হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি। মনে পড়ল আমার সব ছিল—স্বামী-পুত্র, বিষয়-বৈভব সব। কিন্তু ভগবান সব কেড়ে নিয়েছিলেন। দেখছি মায়ার বন্ধন কাটে না, কাটতে গেলে প্রহ্লাদের মত হয়ে ওঠে। তাই শেষ সময়ে তুই যদি একবার আসিস, তবে তোকে দেখতে দেখতে চোখ বুঁজি।

ঠাকুরমার নিজের হাতে লেখা চিঠিখানা আমি নিজের কাছে রেখে দিলাম; সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী কুঞ্জের কর্মচারী যে-পত্র লিখেছেন, সেখানা তোমার কাছে পাঠালাম। পড়ে দেখো। এবং আমরা কালই রওনা হচ্ছি বৃন্দাবন। বন্দনার বরকে অথবা আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হব। ঠাকুরমাও যাচ্ছেন সে নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ইতি—

অর্চনা।

* * *

হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবন খুব বেশী পথ নয়, সেই দিন রাত্রে রওনা হয়ে ভায়া দিল্লী—পরের দিন দুপুরবেলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার পথে একটা তাড়া ছিল স্নুলতা। তাড়া ওই ঠাকুরমার চিঠির কথাগুলি। "হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি।" ওঁর পৈতৃকধন ছিল—তার মূল্য লাখ টাকার বেশী; সে-ও জ্যেঠামশায় এবং বাবা ওঁর হাত থেকে বের করে নিয়েছিলেন। এই সর্ববঞ্চিতা মহিলাটির বুকভরা ভালবাসা সারাজীবনে মানুষকে দেওয়া হয় নি—দিয়েছেন পাথরের দেবতাকে; এবং নিত্যই দেখেছেন এবেলায় দেওয়া তাঁর সে ভালবাসা পাথরের ঠাকুরের পায়ে দেওয়া ফুলের মত ও-বেলায় বাসী হয়ে শুকিয়ে গেছে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে বাইরে বিলিয়ে দিয়েছে কিম্বা ফেলে দিয়েছে। সারাটা পথ সেকালের সেই অতিসুন্দর সুপুরুষ বিদগ্ধ দেবেশ্বর রায়কে মনে মনে শুধু তিরস্কারই করেছি।

মথুরায় নামতেই একটি স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি জোয়ান ছেলে এগিয়ে এল—ছেলেটির রঙটা কালো, বেশ কালো নইলে হয়তো অনায়াসে মনে করতাম অর্চনার ভাই, হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, চিনতে পারছি না। তার কারণ, ভদ্রলোকের দেহের গঠন যেমন শক্ত বলশালী, তেমনি লম্বা-চওড়া। আমাকে চিনতে তার খুব দেরি লাগে নি, আমার পরনে বাঙালী পোশাক ছিল, আমার ছবিও সে দেখেছে। এসে আমাকে প্রণাম করলে—বললে, আমার নাম ললিত আচার্য। একটু বিস্মিত হলাম। নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না। বিলেতে যখন আমি মদ্যপান করে ভেসে যেতে চাচ্ছি, তখনই অর্চনার চিঠিতে বন্দনার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। নামটা মনে রাখবার মত মানসিক সুস্থতা ছিল না, তবে পাত্রটির অসাধারণ পরিচয় আমার মনে ছিল। ছেলেটির বাপ ইস্কুলমাস্টারী করত, ম্যাট্রিকুলেশন

পাস, সামান্য অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার, ছেলেটি বি-এ পাস করেছে অনার্স নিয়ে এবং সরকারী চাকরি পেয়েছে ; এখন সে সার্কল অফিসার। কীর্তিহাটের জমিদার কল্যাণেশ্বর রায় ধনেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে গোয়ানদের একটা দরখাস্তের তদন্তে এসেছিল। তারপর যাওয়া-আসা সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রায়বাড়ীতে তখনও পাঁচ-সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে বিবাহযোগ্যার থেকেও বেশী অরক্ষণীয়া দু-তিনটি। ছেলেটি অবিবাহিত। বন্দনাকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। সে নিজেই লোক পাঠিয়ে সম্বন্ধ করে বন্দনাকে বিবাহ করেছে। পণ নেয় নি, যৌতুক চায় নি। অর্চনা নিজেই কিছু যৌতুক আর গহনা দিয়েছে। অর্চনা লিখেছিল—সুরোদা, রায়বাড়ীর মেয়েদের সম্পর্কে একটা অপবাদ আছে যে রায়বাড়ীর মেয়ের কপালে কখনও সুখ হয় না। যে সংসারে যায়, সে সংসার ভেঙে যায় ; না গেলে মেয়ের কপাল ভাঙে। একা তো আমার নয়। অন্নপূর্ণা-মাও স্বামী নিয়ে ঘর করতে পান নি। তারপর জ্যাঠামশায়ের মেয়েদের দশা তো জান। তবু মনে হচ্ছে বন্দনার অদৃষ্ট ভাল হবে। বড়-লোকের ঘর নয় ; দালানবাড়ী নেই ; কোনখানে পাপ-তাপ মাটিতে পুঁতে পাথর চাপা দেওয়া নেই। ছেলেটির নাম ললিত, ললিতের যেমন স্বাস্থ্য তেমনি চরিত্র, তেমনি বিনয় আর লেখাপড়ায় ভারী উজ্জ্বল ; সরকারী চাকরি পেয়েছে ; বন্দনা সুখী হয়ে চাকরির জায়গায় জায়গায় ঘুরবে। তবে জ্যাঠামশায় খুঁতখুঁত করছিলেন—ছোটঘর, ছোটঘর ঠিক হবে না, ঠিক হবে না বিয়ে দেওয়া, কিন্তু মা-জ্যাঠাইমা কেউ তাঁর কথা শুনলেন না। ছোটঘর কিসের ? বিয়ে হয়ে গেল।

এ-বিবরণটুকু মনে ছিল। তার সঙ্গে আর মনে ছিল বরের উপাধি হল আচার্য, ভদ্রলোক পাদপূরণ করে দিলেন, বললেন—আমি বন্দনাকে বিয়ে করেছি।

মনে পড়ে গেল, অর্চনার চিঠি, সে লিখেছিল বন্দনার বর বা ছোটভাইকে সঙ্গে করে কালই রওনা হব আমরা। আমি তাকে আর একবার ভাল করে দেখে সত্যি-সত্যিই বেশী করে খুশী হয়ে বললাম—কাছেই যমুনার ওপারে বৃন্দাবন, তোমাকে দেখে তো ভাই ইচ্ছে করছে না, তোমাকে ললিত বলে ডাকতে। ইচ্ছে করছে তোমাকে—

ছেলেটি হেসে বলল—মেজদি আমাকে কেলেসোনা বলে নতুন নামকরণ করেছেন বৃন্দাবনে পা দিয়েই।

আমি বললাম—না, কেলেসোনা বলে তোমায় ডাকব না ভাই। ওটা মেজদি বলেছেন—মেজদিকে সাজে। আমি তোমাকে শ্যামসুন্দর বলে ডাকব। ললিতের চেয়ে খারাপ লাগবে না।

ললিত হেসে উঠে বললে—তাই ডাকবেন।

* * *

বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠে ললিত বললে—আপনাকে দেখবার আমার আগ্রহ ছিল দাদা।

আমি চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে ভাবছিলাম—একেই বলে ভাগ্য। আমি কত খুঁজে, কত অর্থব্যয় করে অর্চনাকে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলে রথীনের মত ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু তাকে সুখী করতে পারি নি। আর বন্দনার ভাগ্য দেখ, কোথা থেকে এমন একটি গুণবান, সবল স্বাস্থ্যবান, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলে পায়ে হেঁটে রায়বাড়ীতে এসে বন্দনাকে নিজে উপযাচক হয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

ললিত সারাটা পথ মথুরা থেকে বৃন্দাবন আমায় কি করে যত্ন করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। আমি হেসে বলেছিলাম—ভাই ললিত, তুমি এত ব্যস্ত হলে তো আমাকে ব্যস্ত-ত্রস্ত এবং তার উপরে কিছু থাকলে তাই হতে হয়। তুমি আমার ভগ্নীপতি, আমি তোমার সম্পর্কে বড় হলেও শ্যালক। যাকে সোজা বাংলায় বলে তালব্য-শ-য়ে আকার ল-য়ে আকার। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি ?

ললিতের মধ্যে একটা সত্যকারের বিনয় ছিল। সে বললে—দেখুন দাদা, রায়বংশে বিয়ে করে আমি খুশী হয়েছি নিশ্চয় কিন্তু কল্যাণবাবু-টাবুকে আমার ভাল লাগে না ; ওরা আমার এমন তোষামোদ করেন সার্কল-অফিসার বলে যে, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। এক অতুল-কাকা আছেন যাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। আমি সরকারী কর্মচারী, তিনি জেলখাটা স্বদেশী-করা মানুষ, তবু শ্রদ্ধা করি। গোপনে করি। প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা-খাতির করবার তো উপায় নেই। তার উপর মেদিনীপুর। আর শ্রদ্ধা করি আপনাকে। আগে শুনে শ্রদ্ধা করতাম। আজ দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে।

কি উত্তর দেব ? উত্তর কিছু দিলাম না, চুপ করে চোখ বুজে সিগারেট টানছিলাম।

ললিত একটু চুপ করে থেকে বললে—জানেন, কীর্তিহাটের রায়বংশের এত গল্প আমি ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। সে একটা ড্রিমল্যাণ্ড বা কেয়ারী কিংডামের ব্যাপারের মত। আমার ঠাকুমা বলতেন। তিনি গল্পগুলো শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ীর কাছে। শ্বশুরের কাছে। আমাদের তখন বাড়ী ছিল আপনাদেরই জমিদারীর মধ্যে তখন আপনাদের বংশের মালিক ছিলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় দি গ্রেট। আমার ঠাকুমা বলতেন—তাঁর ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেতো। বলতেন, আমার শ্বশুর কি একটা অপরাধ করে ফেলেছিলেন ; তারপর এমন ভয় হল যে, আর রায়বাহাদুরের এলাকায় থাকতে সাহস হল না। তখন আমার ঠাকুরদা তিন মাসের কচি ছেলে। ঠাকুরদার বাবা রায়বাহাদুরের ভয়ে যা জমিজমা ছিল, সব বেচেখুচে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন গ্রাম থেকে। ঠাকুরদার মা ঠাকুরদাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন সারা রাস্তাটা। মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন হাওড়াতে। সালকের দিকে গঙ্গার ধারে ছোট ছিটেবেড়ার ঘর বেঁধে বাস শুরু করেছিলেন।

আমার চোখ দুটো আপনি খুলে গিয়েছিল।

আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আচার্য? কোন্ আচার্য? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে তাঁর শাসনের ভয়ে কোন্ আচার্য তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে গ্রাম পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল?

ললিত বলছিল—আপনাদের বংশের রূপের খ্যাতি শুনেছিলাম। শুনতাম আর সাধ হত আপনাদের দেখতে। আমার ঠাকুরদার বাবাকে রায়বাড়ীর কাছারীতে ডাকা হয়েছিল। ভয়ে তাকে একলা যেতে দেন নি আমার ঠাকুরদা-মা। কচি ছেলে কোলে করে তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কীর্তিহাটের কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি স্বামীকে আগলে ছিলেন। আমার ঠাকুরদা খুব কালো ছিলেন, একেবারে নিকষ কালো। ঠাকুমা বলতেন—ব্যবসাবাণিজ্য করে ছেলে আমার খুব বড়লোক হবে, তখন রায়বাড়ীতে বিয়ে দিয়ে সুন্দর বউ আনব। কালো রঙের দুঃখ ঘুচবে।

সে বকেই যাচ্ছিল, বকেই যাচ্ছিল। লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে, সরকারী চাকরি করে; তবু আনন্দবিহ্বল ছোটছেলের মত বকেই চলেছে, বকেই চলেছে। সে আনন্দে তার কোন কলুষ ছিল না, কুটিলতা ছিল না। না—একবিন্দু এতটুকু কিছু ছিল না।

আমার মনে পড়ছিল, অন্নপূর্ণা-মায়ের কাছে পাওয়া দেবেশ্বর রায়ের লেখা একখানা চিঠির কথা। যে-চিঠিতে তিনি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের নিষ্ঠুর চরিত্রের কথা লিখতে গিয়ে দুটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। একটি ঘটনা, কীর্তিহাটের নিকটবর্তী গ্রামের এক পঙ্গু আচার্য ব্রাহ্মণ এবং তাঁর যুবতী স্ত্রী শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। ক্ষমার অযোগ্য সামাজিক অপরাধের জন্য রায়বাহাদুর হুকুম করেছিলেন, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওই মেয়েটির কোলের ছেলেটি কষ্টিপাথরের মত কালো ছিল এবং সবল-সুস্থ ছিল তার স্বাস্থ্য।

এই ললিত আচার্য—আজ রায় রত্নেশ্বর রায়বাহাদুরের প্রপৌত্রী বন্দনাকে বিবাহ করলে, সে কে?

আর একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। সেটি দেবেশ্বর রায়ের ভিক্ষে-মা, জাতিতে কায়স্থ, বিধবা কৃষ্ণভাগিনী দাসীর কথা।

তাঁর অপরাধের জন্য রায়বাহাদুর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিতা করেছিলেন। আজ বৃন্দাবনে কৃষ্ণভামিনীর সেবাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়ে শেষ শয্যা পেতেছেন রায়বাহাদুরের পরমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, দেবেশ্বর রায়ের পত্নী আমার ঠাকুমা।

ভাবছিলাম, রায়বাড়ীটা কি আজ এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে চুরমার হয়ে মাটির উপর একটা ইঁট-চুন-সুরকী-ভাঙা কাঠকাঠরার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল?

সেদিন মনে-মনে কামনা করেছিলাম—এই মুহূর্তে একটা ভূমিকম্প হোক এবং সেই ভূমিকম্পে কীর্তিহাটের রায়বাড়ী ভেঙে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাক। তার

মধ্যে রায়বংশধরেরা চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাক। ওদের কাজ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ এবং নাচগান বিক্রী করা অর্থে গড়া কৃষ্ণভামিনী সেবাকুঞ্জে দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী শেষশয্যা পেতেছে; এবং যে ব্রাত্যজনসংসর্গজাত সন্তানের জননী এবং পুরুষত্বহীন জনককে নির্বাসিত করেছিলেন রত্নেশ্বর রায় তারই পৌত্রের সঙ্গে রত্নেশ্বর রায়ের প্রপৌত্রীর বিবাহ হয়, সম্প্রদানের সময় এই ললিতের পা ধরে অর্চনা করে বলা হল, হে বিশিষ্ট বর, তোমাকে কন্যাদান করছি, তুমি গ্রহণ কর। ব্যাস্, আর বাকী কি রইল। সব শেষ হয়ে গেল—এবার ছেদ পড়ে যাক। এবং বেশ একটা টেম্পোর মাথায় পড়ুক, ভূমিকম্প হোক—। কিন্তু তা হল না। কারণ ইচ্ছে করলেই কিছু হয় না। তবে ধাক্কাটা লেগেছিল। প্রথমটা যথেষ্ট লেগেছিল। সামলাতে বেগ পেয়েছিলাম।

অর্চনা বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে সুরোদা? শরীর খুব খারাপ? চিঠিপত্রেও যা লেখ তাও যেন কেমন কেমন, এতকাল পর এলে কিন্তু—। কথা সে খুঁজে পেলে না, একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

কথাটার জবাব দিতে পারি নি, হাসি দিয়ে অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা বা ঢাকা দেওয়া যায়, মানুষে দিয়েও থাকে, সেদিন আমি তা দিতে পারি নি। সত্য কথাটা বলবার মতও বুকে জোর ছিল না, সুতরাং চুপ ক'রেই ছিলাম। অর্চনা তখনও জানত না আচার্যের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পিতামহের বাপের সঙ্গে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আসল সংঘর্ষের কথা।

বলতে বলতে থামল সুরেশ্বর। তখন দিনের আলো বেশ ফুটে উঠেছে, দিনের আলো কেন রোদ্দুরও ফুটেছে। নিচে ফ্রী স্কুল ধরে যানবাহন লোকজন চলাচলের বিচিত্র মেলানো-মেশানো সাড়া উঠেছে; ট্যাক্সির হর্ন, প্রাইভেটের ইলেকট্রিক হর্ন; ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চল ফিটনের আড্ডা—ফিটনের ঘণ্টার শব্দ, মধ্যে মাঝে গরু মোষের গাড়ী, রিক্সার ঘণ্টা, ঠেলার হুঁশিয়ারি মানুষে মানুষে সংঘর্ষের কলহের হাঁক একসঙ্গে মিশে চলমানতায় দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। সুরেশ্বর থামল। বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে—সামলাতে প্রায় একটা বেলা লেগেছিল। ঠাকুমায়ের শেষ প্রায়শ্চিত্ত দেখে এবং শুনে মনের ক্ষোভটা গেল।

তুমি হয়তো জানো—জানো বলেই ধরে নিচ্ছি, জানো না বলে তোমাকে খাটো করব কেন? আমাদের দেশ হিন্দুসমাজে নানান সংস্কারের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের একটা বিধি আছে। মানুষ দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছে, মরণ হচ্ছে না, এমন অবস্থায় মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে, নারায়ণকে ঘটে হোক শিলারূপে হোক সামনে রেখে জীবনের পাপ স্মরণ করে বলে—"ক্ষময়া ক্রিয়তে পাপং"—যে পাপই করে থাকি সে গুরুই হোক আর লঘুই হোক সে সবই তুমি মার্জনা কর। ক্রিশ্চানদের কনফেশনের সঙ্গে এর একটা মিল আছে।

ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—অসুখ দেখানোর মত কিছু ছিল

না, ক্রমশ ক্রমশ মৃত্যুর দিকে চলছিলেন কিন্তু গতিটা নেহাতই পিঁপড়ের গতির মত। তাই তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত করলেন সেদিন।

আয়োজন হয়েই ছিল কিন্তু সকাল থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে অনুষ্ঠান হয় নি; তাঁর চেতনা হলে সেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। পুরোহিত এসেছিল কিন্তু ফিরে গিয়েছিল ঠাকুমাকে ঘুমন্ত দেখে। এবং ঠিক হয়েছিল যদি এরই মধ্যে 'কোমা' এসে যায় তবে মেজঠাকুমা বা হাতে বড় ঠাকুমাকে ধ'রে তাঁর হয়ে মন্ত্র পড়বেন, ভোজ্য দান ইত্যাদি যা উৎসর্গ করবার তা তা উৎসর্গ করবেন।

আমি বসে ভাবছিলাম বৃন্দাবনে এই কৃষ্ণভামিনীর কুঞ্জে বসে মদ্যপান আমি করতে পারি কিনা? করলে বাধা কে দেবে? যিনি দিতে পারেন বা পারতেন আমার ঠাকুমা তাঁর একরকম জ্ঞান নেই। হতচেতনের মত ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু আমি যেন অধিকার মানে রাইট খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এসে ডাকলে অর্চনা। এস সুরোদা, ঠাকুমার চেতন হয়েছে, একটু যেন সুস্থ হচ্ছে, বলছেন—প্রায়শ্চিত্ত এখুনি করব। পুরোহিত চলে গেছে, মুস্কিল হয়েছিল কিন্তু বন্দনার বর ললিত বললে—আমি করিয়ে দিচ্ছি দিদি। আমি এককালে বাবার কাছে এসব কাজ শিখে ছিলাম। বাবা ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেন আর পুরুতের কাজও করতেন। আমার স্যুটকেসে বইও আছে।

গেলাম। মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি একটা বেদনা ঘুরপাক খাচ্ছিল এই মুহূর্তে সেটা চরমে উঠল। অথচ আমি আধাইংরেজ যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, নিজে একসময় বাবা মাকে এবং আমাকে যে দুঃখ দিয়েছিলেন তার জন্য পৈতের পর কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তা রাখতে পারি নি, কিছুদিন যেতে না যেতেই একেবারে আল্ট্রামডার্ন হয়ে উঠেছিলাম। জাতধর্ম ঈশ্বর পরলোক সব লোককে অবিশ্বাস করে বিলুপ্ত করে দিয়েছি, মানি না। দেবতা দেবলোক যেটুকু মানি সে মানি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য এবং এখনও এদেশে ব্রাহ্মণবংশের রক্তের একটা এ্যারিস্টোক্রেসি আছে তার জন্য, নিজে ইংরেজের দেশে গিয়েছিলাম ইংরেজললনার দেহসরোবরে ডুবে মরতে। কিন্তু মরতে পারি নি। শম্পা রায় নামধারিণী লরার দেহসরসীতে তাকিয়ে ভয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর অপমৃত্যু উঁকি মারছে।

নরকের ভয় নয়, নরক একালে কেউ মানে না, আমিও মানি না, তবু ওটাকে বড় ভালগার অশ্লীল মনে হয়েছিল তাই পালিয়ে এসেছিলাম। ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, নাহলে হয়তো ফ্রান্স বা ইটালীতে যেতাম মরণ-সরোবরের সন্ধানে। শেষ পালিয়ে এলাম। সে কি এই দেখতে এলাম?

দেবেশ্বর রায়ের অবহেলিত গৃহিণী মরছেন কৃষ্ণভামিনীর সেবা-কুঞ্জে আর তাঁর মৃত্যুকালে

প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছে ললিত আচার্য। ললিত আচার্য। অন্নপূর্ণাপিসীকে লেখা দেবেশ্বর রায়ের চিঠিখানা আমার মনে পড়ছে।

নিয়তি বা ভগবানের বিচার এ আমি মানি না। এ তা নয় তাও জানি। এমনটা নেহাতই ঘটনাচক্র। এর পিছনে কোন ত্রিকালের বিধাতার প্ল্যানিং নেই। তবে একটা জিনিস আছে সেটা হ'ল এই নিজে না থামলে কেউ রুখতে পারে না। এবং সংসারে পাপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এলেই তুমি মুক্ত।

অর্চনা বুঝতে পারছিল একটা খোঁচায় আমি অস্বস্তি ভোগ করছি; সেটা কি তা ঠিক ধরতে পারে নি। সে বলেছিল—তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

বললাম—বলব পরে। এখন না। চল এখন। বলে পা বাড়ালাম। এসে দাঁড়ালাম প্রায়শ্চিত্তের জায়গায়। কি বলব তোমাকে সুলতা, এসে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি-সত্যিই সে যেন একটি মুক্তিযজ্ঞের আসর পাতা হয়েছে।

ঠাকুমাকে গরদের কাপড় পরিয়েছে—তিনি বসেছেন মেজদিদির উপর দেহের ভার রেখে; ঠাকুমা মানুষটি বরাবরই ছোটখাটো, বয়স হয়ে আরও ছোট হয়ে গেছেন; আর আমার মেজদিদি মাথায় বেশ লম্বা এবং বন্ধ্যা নারী, তাঁর দেহখানির বাঁধুনি বেশ শক্ত, তিনি তাঁকে পিঠের দিকে জড়িয়ে ধরে বসেছেন।

সামনে আসনের উপর বসেছে জামাই ললিত আচার্য। ধবধবে কাচা কাঁচি ধুতি পরনে, গায়ে সিল্কের চাদর, গাঢ়-শ্যাম গায়ের রঙ, তার উপর সাবানে পরিষ্কার করে কাচা ধরধরে মোটা পৈতে, চোখে চশমা—ছ'ফিট লম্বা সবল স্বাস্থ্যবান যুবা, সোজা মেরুদণ্ড, বসে নিপুণ পুরোহিতের মত সামনে রাখা ভোজ্য এবং দানগুলির পাত্র পরের পর সাজিয়ে রাখছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ভরাট গলায় সে মন্ত্র উচ্চারণ করাতে শুরু করলে বলুন—কোশাতে—হ্যাঁ।

তখন রায়বাড়ীর বড়বউ কোশাতে হরিতকী ধরে হাতের উপর হাত রেখেছেন। ঠাকুমাকে দেখলাম কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক এঁকেছেন—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে।

বলুন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু! ওঁ তদবিষ্ণো পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবিবচক্ষুরাততং —ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু!

গম গম করে উঠল স্থানটি, যেন অনুষ্ঠানটি সজীব প্রাণময় হয়ে উঠল; আশ্চর্য একটা সঙ্গীত যেন সৃষ্টি করলে ললিত তার ভরাট কণ্ঠস্বরের মহিমায় আর তার জিহ্বার অতি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে।

আমি আজও মনে করতে পারছি, চোখের উপর স্পষ্ট ভাসছে সমস্ত; কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অনুষ্ঠানটির প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলাম। পরলোক, স্বর্গ নরক বাদ দাও, আমার মন যেন পবিত্র হয়ে গেল, একটি উদাসীনতা চিত্তকে স্পর্শ করলে, আমার মনের সব উত্তাপ সব ক্ষোভ যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত" অংশটুকুও মনে পড়ে নি, শুধু মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম এ অব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণ আর দেশে সমাজে নেই। মুক্তি যদি এই অনুষ্ঠানে মেলে তবে এই ছেলেটির চেয়ে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ পুরোহিত আর দেশে নেই।

ঠিক এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সুলতা। ঠাকুমা মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আমাকে দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়বিস্ফারিত হয়ে গেল কপালের কুঞ্চনরেখায় মনের অনুচ্চারিত প্রশ্ন ফুটে উঠল শিলালিপির মত; তারপর কাঁপতে শুরু করলেন।

ললিত তখন ব'লে যাচ্ছিল—ওঁ অদ্য মার্গশীর্ষ মাসি শুক্লে পক্ষে—ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শাণ্ডিল গোত্র—

ললিত একটি একটি ক'রে সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল, ঠাকুমা একটি একটি ক'রে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বলার পর তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ যেন বিস্ময়বিস্ফারিত, পুরু চশমার ওপাশে চোখ দুটিকে খুব বড় এবং খুব বেশী বিস্ফারিত মনে হচ্ছিল, দন্তহীন মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে গেছে। তিনি একটু একটু কাঁপছেন। মনে হচ্ছে একটা কিছু হয়েছে। সে একটা কিছুর অর্থ, ওই স্থানকালপাত্র বিচার করলে চরম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়ালাম বুঝি বলে আশঙ্কা হয়। সবাই আমরা সেই আশঙ্কাই করেছিলাম। কি হল?

ললিত একটু ঝুঁকে বললে—বলুন—তিথৌ—।

অর্চনা সামনে হেঁট হয়ে ডাকলে—ঠাকুমা! ঠাকুমা!

পিছন থেকে মেজদিদি বললেন—কর্তাদিদি। দিদি—গায়ে একটু নাড়া দিলেন।—দিদি!

হঠাৎ যেন সচেতন হলেন ঠাকুমা, তাঁর বাঁ হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—ছাড়, ছাড়। আঃ, ঘোমটা দিতে দে। দেখছিস না বড়বাবু দাঁড়িয়ে। ছাড়।

বড়বাবু মানে দেবেশ্বর রায়। আমরা চমকে উঠেছিলাম। কোথায় কি দেখছেন—কাকে দেখছেন?

মেজদিদি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেন—না—না—উনি বড়বাবু নন। সুরেশ্বর, ও সুরেশ্বর—নাতি আপনার নাতি। বড়দি—!

আমার মনে পড়ে গেল আমি দেখতে আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের মত। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এসে ডাকলাম—ঠাকুমা, আমি সুরেশ্বর!

—সুরেশ্বর? কে সুরেশ্বর!

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম—মন্ত্র বলুন—প্রায়শ্চিত্ত শেষ করুন!

এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন, বললেন—ও হ্যাঁ, কি বলব ?

ললিত বললে—আবার বিষ্ণু স্মরণ করে নিন, আগে বলুন—শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। নমঃ তদবিষ্ণু পরমংপদং—

আর ভুল হল না ঠাকুমায়ের—তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন একটানা। প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে চোখ থেকে জলের দুটি ধারা নেমে এল।

তিন দিন পর মারা গেলেন ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী—উমা দেবী। মারা যাওয়া তাকে বলে না, যেন চোখ বুজে ঘুমোলেন। কেউ ভাবতে পারে নি যে আর তিনি চোখ মেলবেন না। কারণ প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে রাত্রি থেকে এমন সহজ আর সুস্থ তিনি হয়ে উঠেছিলেন যে আমরা ভেবেছিলাম তিনি হয়তো নতুন ক'রে বাঁচলেন। নতুন ক'রে বাঁচাই বটে। কারণ পুরনো কথাগুলো যা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন—যা কেউ জানত না আমাদের মধ্যে—সেই সব কথা বলতে লাগলেন। হাসলেন। আমাকে ললিতকে সমাদর করলেন; অর্চনাকে দেখে দিদিশাশুড়ী ভবানী দেবীকে স্মরণ করে বললেন—কিন্তু ভাই এমন দুঃখভোগ করবার জন্য তো তাঁর ফেরার কথা নয়। দুঃখ পেয়ে গিয়েছিলেন—সুখ করবার জন্য ফিরে আসবার কথা। তা হ'লে ? তা হ'লে কেন এমন হ'ল তোর ?

আর সময় পেলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন—অবিকল আমার বড়বাবু। তফাৎ বড়বাবুর মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ ছিল। মাথায় আলবার্ট তুলে টেরি কাটতেন, আর ভয়ানক বাবু ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা আতরের গন্ধে মো মো করত। মনে হচ্ছে তিনিই তুই হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের দেনা শোধ করতে। দেনা যে অনেক। দেখ না ভাই নইলে শেষকালটায় আমার মৃত্যুশয্যায় তুই বসে থাকলি কেন ? আমার বড় ছেলে—।

জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর পৈতৃক এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী ছেড়ে বৃন্দাবন এসে ভিক্ষেশাশুড়ী কৃষ্ণভামিনী সেবাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব'লে। তিনি আসেন নি। আসতে সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিলেন।

তাই কথাটা বললেন ঠাকুমা।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার মুখের আগুনও তোকেই দিতে হবে। দেনা শোধ রে, দেনা শোধ। তা ভাই এক কাজ করিস। সারাজীবন তো মানুষকে না পেয়ে ভগবান আর দেবতাকে নিয়ে থাকলাম, ভাগবত পুরাণ অনেক পড়েছি। তোদের বংশের দেনাগুলো শোধ করিস। দেনা অনেক অনেক—অনেক। হয় না শোধ। জানতেই পারবিনে। তবে যা জানতে পারবি তা শোধ করিস। তোর কাছেই তো শুনেছি দর-পত্তনীতে পত্তনীতে রায়বাড়ীর সব জমিদারী এসে জমা হয়েছে। তুইই তো আসল মালিক। শোধ করিস—

অর্চনা পাশে বসেছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল—সুরোদা যে জমিদারী সম্পত্তি সব বেচে দেবে ঠিক করেছে।

—বেচে দেবে? চমকে উঠলেন ইলেকট্রিক শক খাওয়া মানুষের মত। বেচে দেবে? কি বেচে দেবে?

—জমিদারী।

—জমিদারী বেচে দেবে?

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন আমার কাছে। উত্তর দিতে দেরি হয়েছিল আমার; তিনি খানিকটা অধীর হয়েই বলেছিলেন—বেচে দিবি? হাঁ রে! রায়বংশ—আর কথা খুঁজে পান নি।

অর্চনাই বলেছিল—যে সব পাপের কথা বলছ ঠাকুমা তা সুরোদা জানে। পুরনো কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছে। ওই জন্যেই বেচে দেবে। জমিদারী রাখতে হলে নানা অন্যায় করতে হয়। বলে প্রজাদের দান করে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—দেখ, জমিদার রাজা, এরা হল ইন্দ্রদেবতার জ্ঞাতগোত্র রে। এদের এ না করে উপায় নেই। দেখ না ইন্দ্ররাজা স্বর্গের রাজা; রাজ্য করতে গিয়ে তাকে কত কি করতে হয়েছে। ভেবে দেখ, ব্রহ্মহত্যা করেছে, নারীহরণ করেছে। মুনিঋষিদের অপমান করেছে; রাজ্য করতে গেলেই ওসব করে। কিছু করে কিছু করতে হয়; করেছে; অভিশাপও খেয়েছে, কত লাঞ্ছনা হয়েছে, হাজারটা চোখ হয়েছে; প্রায়শ্চিত্ত করেছে; রাজ্য হারিয়ে আবার রাজ্য পেয়েছে। তা বলে তো বেচে দেয় নি রে! তুই বেচে দিবি?

ললিত ঠাকুমার কথা শুনে খুব তারিফ ক'রে বলেছিল—ঠাকুমা বড় চমৎকার কথা বলেছেন দাদা। ভারী চমৎকার! রাজা—সে ইন্দ্র থেকে দৈত্য দানব রাক্ষস মানুষ জন্তু-জানোয়ার যেই হোক তার অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই। কুটিল পথ ছাড়া তার পথ নেই। পৃথিবীতে পূজা সে পৃথক ভাবে পায় না। দশ দিকপালের মধ্যেই যা পাবার পায়। তার বেশী নয়। তবু ইন্দ্রত্বের চেয়ে কাম্য কিছু নেই। শতকরা নিরেনব্বুইজন তপস্যা করে ইন্দ্রত্বের জন্য। বড় জোর একজন চায় ভগবান কিম্বা মুক্তি। তাই কেউ তপস্যা করলেই ইন্দ্র তাকে ধ্বংস করতে চায়।

ললিত সংস্কৃতের ভাল ছাত্র, সংস্কৃতে এম-এ পাস করেছিল। সে পুরাণ থেকে ইন্দ্রতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করেছিল। সেসব কথা ভুলে গেছি, একটা কথা মনে আছে বলেছিল—এক রাম ছাড়া কোন রাজা প্রজার পরম ভক্তি পান নি। অন্যদের ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে, সেলামী নজরানা দিয়েছে, পুজো করে নি দেয় নি। ওই এক রাম ছাড়া। এর জন্য রামকে সীতা বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল।

ঠাকুমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ভেবে দেখিস ভাই। এত বড় রায়বংশের সন্তান তুই—বড় রায়ের পৌত্র, রায়বাহাদুরের প্রপৌত্র, ওরে তোকে তোর বংশাবলীকে কেউ আর গ্রাহ্য করবে না ; দেখলে মাথা নোয়াবে না। ওরে তোকে কীর্তিহাট ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে।

আমার মনে সেদিন যেন একটা কান্নার আবেগ বর্ষার মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। বর্ষণ হয় নি হ'তে দিই নি, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর জমিদারীর অতি বৃদ্ধা প্রাণপ্রতিমা বলছেন—বেচে দিয়ো না, আমাকে বেচে দিয়ো না।

* * *

চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটু পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললে—দেখ ছোটবেলা পড়েছিলাম—'বীরবল কথা'—বীরবল ছিলেন দুঃসাহসী যোদ্ধা। এক রাজার রাজ্যে কাজ করতেন। মাইনে নিতেন খুব বেশী। বলেছিলেন—যা কেউ না পারবে তাই সে করবে। রাত্রে রোজ রাজপুরীতে সারারাত্রি জেগে পাহারা দিতেন। হঠাৎ একদিন শুনলেন রাজপুরী থেকে কেউ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে। তিনি ভয় পেলেন না, এগিয়ে গেলেন। দেখলেন একজন সুন্দরী নারী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে মা? কেন কাঁদছ তুমি?

মেয়েটি বললে—আমি রাজলক্ষ্মী, এই রাজাকে আজ পরিত্যাগ ক'রে যেতে হচ্ছে ব'লে কাঁদছি। দীর্ঘকাল একে আশ্রয় ক'রে ছিলাম, রাজাকে বড় ভালবাসতাম স্নেহ করতাম—তাই বুকটা টনটন করছে।

বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন—কি অপরাধে রাজাকে ত্যাগ করবে মা?

রাজলক্ষ্মী বললেন—রাজার আজ রাত্রি অবসানে পরমায়ুর শেষ হবে। রাজার যিনি পুত্র তাঁর ভাগ্যে রাজ্য নেই।

বীরবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাজাকে কি কোন উপায়ে বাঁচানো যায় না মা!

—যায়। যদি কেউ শ্মশানে যে মহাকালী আছেন তার ওখানে গিয়ে নিজের মুণ্ড কেটে মায়ের পুজো দেয় তবে রাজা তার পরমায়ু নিয়ে বাঁচতে পারেন।

বীরবল বললেন—মা, তা হলে তুমি ফিরে যাও মা। আমি এই রাজার ভৃত্য। তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে সাধ্য হলে জীবন দিয়ে রক্ষা করাই হল যোদ্ধা ভৃত্যের কর্তব্য। সে কর্তব্য আমি পালন করব মা। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও।

রাজলক্ষ্মী তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, অন্তঃপুরের দিকে।

ঠিক সেই গল্পের বীরবলের মতই আমি সেদিন ঠাকুমার কাছে সেই আবেগের বশে বলেছিলাম—আমি কথা দিচ্ছি ঠাকুমা, আমি জমিদারী বেচব না। রাখব।

সে প্রতিশ্রুতি সেদিন যার হিসেব জ্ঞান আছে তার কাছে বড় সহজ ছিল না, এ কথা আমার থেকেও বোধ করি তুমি অনেক ভাল করে জান এবং তার ভিতরের কারণ বোঝো। জমিদারীতে জমিদার সেদিন নিতান্তই পুতুল মালিকের মত মালিক হয়েছে।

প্রজারা তখন জমিদারদের থেকে অনেক বেশী শক্তিমান হয়েছে। যে রাষ্ট্র জমিদারী সৃষ্টি করেছিল সেই রাষ্ট্রই সেদিন দুর্বল হয়ে গেছে দেশের মানুষের কাছে, সুতরাং জমিদারদের অবস্থা হয়েছে প্রায় গাছতলায় পড়ে থাকা হাত-পা-ভাঙা নাক-কাটা পাথরের মূর্তির মত, যাদের নেহাত কৃপাবশে কেউ দুটো আতপ এক মুঠো বেলপাতা এক কুশি গঙ্গাজল দিয়ে যায়।

এক বছরের উপর আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম। ফিরে এসে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছি জমিদার এবং অভিজাত বংশের যোগ্য একটি জীবনধারার জন্য, তার জন্য বাঈজীপাড়া থেকে শুরু ক'রে হোটেল, বার, সাংস্কৃতিক শিল্পীজীবনের নানা কর্নার খুঁজে বেড়াচ্ছি; অজস্র অর্থব্যয় করছি—এর মধ্যে জানবাজারের নায়েব আচার্যির পত্র পেয়েছি—"এরূপ অর্থব্যয় করিলে আর বৎসর-খানেকের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া দেনাগ্রস্ত হইবেন। আপনার এইরূপ ব্যয় অন্য দিকে জমিদারী একরূপ দায় ও বোঝার মত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তিহাটের কাছারির সংবাদ এই যে, গত বৎসরের মধ্যে জমিদারীতে একরূপ খাজনা আদায়ই হয় নাই। শুধু আমাদেরই নয়; সকলেরই এক দৃশ্য। অধিকাংশ জমিদারকেই দেনা করিয়া কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করিতে হইয়াছে। গত বৎসর আমাদের সঞ্চিত তহবিল হইতে কালেক্টারী ও পত্তনী খাজানা দাখিল করিতে কুড়ি হাজার টাকার কিছু বেশী দিতে হইয়াছে। এবং তামাদির মুখে বাকী খাজনার নালিশ করিতে রশুম খরচ দিতে হইয়াছে আট হাজার টাকা। এ টাকা কতদিনে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আপনি এইরূপভাবে দেশান্তরে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সরেজমিনে সমস্ত দেখিয়া বুঝিয়া একটি নির্দিষ্ট পথে চলিবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে যুদ্ধ বাধিয়াছে। অনেকে অনেক রকম বলিতেছে। আপনি সত্বর আসিয়া কার্যভার স্বহস্তে লইলে ভাল হয়।"

চিঠিখানা বৃন্দাবন আসবার দিন পনের আগে পেয়েছিলাম। এবং ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে জীবনের সঙ্গে বংশের ইতিহাসের সম্পর্কটা ঘুচিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন মৃত্যুশয্যায় ঠাকুমা দেবেশ্বর রায়ের লাঞ্ছিতা গৃহিণী আমার পিতার গর্ভধারিণীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলাম—না জমিদারী বেচব না। রাখব—রাখবার চেষ্টা করব জমিদারী।

সত্যিই তো, কীর্তিহাটের লোকে দেখে যদি নমস্কার না করে কীর্তিহাট ঢুকব কি করে?

হঠাৎ হেসে ফেলে সুরেশ্বর বললে—কিছু মনে করো না সুলতা, তুমি পলিটিক্স কর—বল তো একবার মিনিস্টার হয়ে দেশের লোকের সেলাম নমস্কার কুড়িয়ে তারপর কি আর মিনিস্টার না হয়ে লোকের কাছে বের হওয়া যায়!

সুলতা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট রুমালখানা বের করে চোখ মুছে বললে—তোমার

ঠাকুমার কথা বল। রাজলক্ষ্মী আর ভোটলক্ষ্মীতে এক ক'রে গণ্ডগোল করো না, পাকা সোনা আর গিল্টী এক নয়।

সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—ঠাকুমার কথা তোমার ভাল লেগেছে সুলতা?

—প্রশ্নটা নাই বা করলে সুরেশ্বর। তিনি সত্যিই বাঙলাদেশের জমিদারলক্ষ্মীর সিম্বল। বাংলাদেশের জমিদারেরা এই লক্ষ্মীর অঙ্গের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে বাঈজী পুষেছে, জুয়া খেলেছে, এই মাটির ছেলেদের ঘাড়ে বাপ-ছেলে-সম্পর্ক চাপিয়ে তাদের গোলাম করেছে। বল—তাঁর কথা বল।

সুরেশ্বর বললে—তিনি আর এক দিন বেঁচেছিলেন এই কথাবার্তার পর। মৃত্যু হল ভোররাত্রে। সকালবেলা হঠাৎ বললেন—নাতি তুই বিয়ে করবি নে?

বেশ ভাল সেদিন। সকালবেলা উঠে ইষ্ট স্মরণ করে মধু দিয়ে মকরধ্বজ খেয়ে গুন গুন করে নাম করছিলেন, আমি গিয়ে বসলাম। আমাকে হঠাৎ প্রশ্নটা করলেন।

মেজদি ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি বললেন—আপনি বলুন দিদি। বাপ-মা চলে গেছেন, একমাত্র তুমিই বলতে পার—বাধ্য করতে পার। বল তুমি।

—বিয়ে কর ভাই।

অর্চনা বলে উঠল—আমি ভেবেছিলাম ঠাকুমা, বিলেত গেল সুরোদা, মেমসাহেব বিয়ে করে ফিরছে। ওমা কোথায়?

—তা করলি নে কেন রে সুরেশ্বর?

হেসে বললাম—তোমার জন্যেই করি নি ঠাকুমা।

—কেন?

—তা হ'লে কি আমার হাতের শ্রাদ্ধের নৈবেদ্য তুমি খুশী মনে নিতে? নিতে পারতে?

—নিতাম। নিশ্চয় নিতাম। বিয়েতে জাত মানতে নেই রে। তুই বিয়ে কর, দেখ তার সেবা তার হাতে জল আমি খাই কিনা।

সন্ধোবেলা বললেন—কথাটা ডেকে বললেন—সুরেশ্বর, আমার শ্রাদ্ধ তুই করবি তো? যজ্ঞেশ্বর করবে না। সে এলো না! আমার ভিক্ষেশাশুড়ীর আশ্রমে আছি কিনা তাই। করবে না। তুই করবি?

চোখে আমার জল এল। বললাম—আমি যে তারই জন্যে ছুটে এসেছি ঠাকুমা।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, মেজঠাকুরপোর ছেলেরা আমাকে গোবিন্দের চত্বরে ঢুকতে দেয় নি। আমি সেই রাত্রে গোয়ানপাড়া গিয়েছিলাম, গির্জের পাদরীর কাছে, ভায়লার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা দিতে। সেখানে জল খেয়েছিলাম। বড়বাবুর মৃত্যুর পর আমি মরতে পারি নি, সঙ্গে যেতে পারি নি, কিন্তু ভায়লা পেরেছিল, সে বিষ খেয়ে মরেছিল। সেইজন্যে আমার ইচ্ছে ছিল—বড়বাবুর শ্রাদ্ধ হল, ভায়লার শ্রাদ্ধ করুক ওরা। তা টাকা ওরা

নেয় নি। এদিকে এরা আমাকে পতিত বলে মন্দিরে ঢুকতে দিলে না। যজ্ঞেশ্বর পাগল বলে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে। আমার কোম্পানীর কাগজ কেড়ে নিলে। মনে দুঃখ খুব পেয়েছিলাম, তাই পালিয়ে এসেছিলাম বৃন্দাবন। তা আমার বেশী ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ করবি ভাই, ওই কীর্তিহাটে গোবিন্দের নাটমন্দিরে, দানসাগর-টাগর নয়—চারটে ষোড়শ করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

বললাম—করব ঠাকুমা।

তিনি বললেন—সেই তুষ্টিরাম বামুনদের আনাস যেন। বুঝলি! চাবি দিয়ে ঘটি বাজিয়ে গান গাইবে—'ওগো স্বরেশবাবু গো, শ্রবণ কর, তুমি শ্রবণ কর গো। তোমার পুণ্যবতী পিতামহী উমাদেবী বৃন্দাবনে গোবিন্দের রাঙা চরণতলে তাঁর মুখারবিন্দ দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে যমুনায় গিয়ে স্নান করে দিব্য নববস্ত্র পরিধান করলেন, ললাটে নাসিকায় তিলক আঁকলেন, বক্ষস্থলে রাধা-গোবিন্দ নাম লিখলেন এবং গোবিন্দমন্দিরে রাধা-গোবিন্দকে দর্শন করে বাহিরে এলেন, সেখানে মকরকেতনে রতিপতির মত দিব্য মনোহরকান্তি তোমার পিতামহ, বড় রায় মহাশয় সমাদর করে বললেন—এস, এস, এস আমার প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী, আমি তোমাকে স্বর্গধাম থেকে নিতে এসেছি—এস—"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল সুলতা, দু চোখে ধারা বেয়ে নামত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কেঁদেছিলাম। মেজদি কেঁদেছিলেন হা-হা করে। অর্চনা কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ বাসনা অতৃপ্ত কল্পনা সেদিন শ্রাবণের বর্ষণের মত ঝরঝর ধারায় যেন ঝরে পড়েছিল আমাদের সবারই চোখের জলের ধারায়। কিন্তু যখন মারা গেলেন, তখন একটি কথাও বললেন না। কাউকে ডাকলেন না। আমরা কেউ জানতেই পারলাম না; শুধু সকালে উঠে অর্চনা এবং মেজঠাকুমা দেখলেন, ঠাকুমা নেই, তিনি চলে গেছেন।

রায়বংশের ইতিহাস এবার মোহনার মুখে নদীর অবস্থার মত। গোটা জাতটার জীবনে তখন জোয়ার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের জীবনস্রোতের মুখে বালির চড়া ঠেলে দিয়েছে; গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে; কোনক্রমে শতধারা হয়ে নালার মত ধারায় দু'-চারটে স্রোত গিয়ে পড়ছে। বাকি সব মজা বিলের মত কাদায়-জলে থক-থক করছে।

সুতরাং জবানবন্দী এখানেই শেষ হত। আমি সঙ্কল্পমত জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে রায়দের বংশতালিকা হতে স্বচ্ছন্দে নাম কাটিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারতাম। সম্পত্তি বিক্রী না করলে রায়বাড়ীর কৃতকর্মের জের থেকে রেহাই নেই। একটা বিচিত্র কথা বলি, সংসারে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বা জাত ফেলে দিয়ে বংশতালিকা থেকে নাম কাটিয়েও রেহাই মেলে না, সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে শরিকদের দায় ঘাড়ে চাপে। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেই তুমি খালাস। সে খালাস আমার আর হল না; হল না ঠাকুমার জন্যে। তাঁকে প্রতিশ্রুতি

দিলাম, সম্পত্তি বেচব না। অবিশ্যি তাঁকে কথা না দিলেও আমি বেচতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আজও মনে হচ্ছে বিক্রী করাই উচিত ছিল, কিন্তু বেচতে বোধ হয় পারতাম না। সম্পত্তির মমতায় যে-কথা ঠাকুমা বলেছিলেন, সেটা মিথ্যে নয়। ভূমির মত সম্পত্তি নেই। ভূমির উপর অধিকার কায়েম করতে পারলে গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত তার সম্পত্তি হয়।

কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম কীর্তিহাটে ফিরে এসে। না, যা ভাবছ তা নয়। প্রজারা সম্বর্ধনা করে নি, তারা গ্রাহ্যই করে নি বলতে গেলে, শরিক অর্থাৎ রায়বাড়ীর মেজতরফের যাঁরা তখনও সক্রিয়, তাঁরা বিরক্ত হলেন, বিদ্বিষ্ট হলেন, এ আপদ আবার কোত্থেকে এল। গ্রামের প্রধান এবং নায়ক তখন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট। মানুষেরা তাঁকেই মানে। জমিদারের বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত মনোভাব, গর্তের সাপের মত অহরহ উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মত অনুভব করা যায়। তবু ভাল লাগল। রায়বাড়ীর ইঁট-কাট, বাড়ীঘর, পুকুর বাঁধাঘাট, গাছপালা, ক্ষেতখামার—নদীর ওপারে সিদ্ধাসন, জঙ্গলের ওপাশে গোয়ানপাড়া, সবই যেন মনকে ভরে দিলে। যেন আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

শতজনের বিমুখতা এবং অপ্রসন্নতা আমাকে অথবা কীর্তিহাটের প্রকৃতিকে বা রায়বাড়ীকে অপ্রসন্ন করতে পারে নি; অন্ততঃ আমার চোখে দোল-খাওয়া গাছপালা, পাখীর ডাক আমার কানের কাছে বার বার বলেছিল, আমরা তোমার, আমরা তোমার। আমার মন বলেছিল—এসব আমার, এসব আমার!

ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে; প্রথম দশদিনে একটা তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ বৃন্দাবনে করেছিলাম। টেলিগ্রামে জ্যাঠামশাইকে খবর দিয়েছিলাম; কীর্তিহাটে খবর দিয়েছিলাম। প্রথম শ্রাদ্ধ শেষ করে অর্চনা এবং মেজদিকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলাম। কলকাতায় মাস দুয়েক থেকে ফাল্গুনের প্রথমে কীর্তিহাটে এলাম। এলাম ওই ঠাকুরমাকে দেওয়া আমার কথা রাখবার জন্য। ওখানে গোবিন্দমন্দিরের চত্বরে, যে চত্বরে মেজতরফের ধনেশ্বর রায় এবং জগদীশ্বর রায় ঠাকুমাকে ঢুকতে দেয় নি, সেই চত্বরে ঘটা করে একটি শ্রাদ্ধ আমি করব। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। চারটি ষোড়শ করব, তার মধ্যে একটি রূপোর। এই সব কল্পনা করে কীর্তিহাটে ফিরলাম। নায়েবকে লিখেছিলাম, এখন হয়ত কিছুদিন থাকব ওখানে। সুতরাং ওখানকার বাড়ীঘর মেরামত করবার ব্যবস্থা করবেন এবং বাড়ীর ভিতরটা সবই চুনকাম এবং বাইরেটা রঙ ফেরাবেন। শরিকেরা যদি তাঁদের অংশে রঙ ও চুনকাম করতে বাধা দেন, তবে তাঁদের অংশ বাদ দিয়ে আমার অংশই করাবেন।

অনুমান করেছিলাম, বাধা কেউ দেবে না। সে অনুমান ষোল আনার মধ্যে একের ছয় মিথ্যে হয়েছিল, বাকী পাঁচের-ছয় ভাগ হয়েছিল সত্যি; এক ধনেশ্বরকাকা ছাড়া বাকী সকলেই মত দিয়েছিলেন। শুধু ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন, না। আমার অংশ বাদ দিও। রঙের

পোঁচড়া আমার অংশে যেন না ঠেকে।

হয়ত জগদীশ্বরকাকা থাকলেও ওঁর সঙ্গে সায় দিতেন ; কারণ ঠাকুমার দরজা আটকাতে দুই ভাই দাঁড়িয়েছিলেন এবং ধনেশ্বরকাকাই বলেছিলেন অপ্রিয় কথাগুলি। সে-কথা ধনেশ্বরকাকা ভুলতে পারেন নি। এবং আমার টেলিগ্রাম যখন ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এখানে তাঁর কাছেই পৌঁচেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, না, অশৌচ নেব না। নিতে আমি পারি না। কিন্তু নিতে তাঁকে হয়েছিল গোবরডাঙার খুড়ীমার নির্দেশে এবং আরও একজনও নির্দেশ দিয়েছিল, সে হল অতুলেশ্বর। অতুলেশ্বর সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে। গোবরডাঙার খুড়ীমা বলেছিলেন—বাতে পঙ্গু হয়েছ, এবার মুখ থেকে পোকা পড়বে ও কথা বললে। কোন মুখে বলছ এ কথা ? অশৌচ নেবে না ?

অশৌচ তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ী মেরামতের চুনকামের প্রস্তাবে তাঁকে কেউ নড়াতে পারে নি। গোবরডাঙার খুড়ীমা অনেক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ধনেশ্বরকাকা কিছুতে রাজী হন নি। না, তা আমি পারব না, এই হয়েছিল তাঁর বুলি, তখন তিনি ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি বাত। বাতে তখন তিনি পঙ্গু। যৌবনের দুরারোগ্য যৌনব্যাধির পরিণাম।

মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম এই জন্যে যে, ওঁরা যাই করে থাকুন, আমি আজও পর্যন্ত তো ওঁদের সঙ্গে কোন বিরোধ করি নি। তবে কেন প্রত্যাখ্যান করলেন ! ঠকিয়ে বা জবরদস্তি করেও তো অনেক কিছু নিয়েছেন আমার, তবে যখন আমি উপযাচক হয়ে তাঁর অংশের বাড়ী মেরামত করাতে চাইলাম, তখন না বললেন কেন ? সঙ্গে সঙ্গে আবার ভালও লেগেছিল। তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধের এক কুচি সোনার মতই ভাল লেগেছিল।

* * *

বিচিত্র মানুষের মন, আর তার থেকেও বেশী বিচিত্র মানুষের কর্মক্ষেত্রের জের, এদের নাগপাশ থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই। গ্রামের লোকেদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য বলতে গিয়ে মনে বড় কষ্ট পেলাম।

লোকের বাড়ী বাড়ী যাবার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন নায়েব। বললেন—আগের কালে রায়বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে গ্রামে লোকের বাড়ী যাওয়া হত না, ডাকাও হত না ; শ্রদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াতে অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে যেতেন বাড়ীর পুরুত আর আহারের নিমন্ত্রণ করতেন ঠাকুরবাড়ীর পরিচারক। পান-সুপুরি-পৈতে দিয়ে বরণের ব্যবস্থা আছে, তা কর্তারা থালাখানা এনে আসরে নামিয়ে দিয়ে বলতেন, ব্রাহ্মণেভ্য নমঃ। বলে চলে যেতেন। আপনার মাতৃশ্রাদ্ধেও তাই হয়েছে। কিন্তু এখন হালচাল পাল্টে গিয়েছে বাবু ; এখন নিজে না গেলে লোকে ঠিক—। অতুলেশ্বর তখন খালাস হয়ে এসেছে, সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, আমাকে সে প্রায় নির্দেশ দিয়ে কথা বললে। বললে—লোকের বাড়ী বাড়ী যেতে হবে

তোমাকে। নাহলে আমি বারণ করব। আমি হেসে বললাম—নিশ্চয় যাব। জমিদার আমি সাজব না। কিন্তু কল্যাণেশ্বর প্রভৃতি রায়বাড়ীর নবীনেরা বললে, দেখ, আমাদের মেজ-দাদাকে ভাঁটা পড়েছে, আমরা যাই যাই, তুমি যাবে কেন? তুমি সে ইজ্জতটা রাখ। তুমি তো এখানে থাকবে না, সুরোদা! অতুলকার কথা তুমি শুনো না।

মেজদি বললেন—না সুরো, তুই অতুলের কথা শোন।

অর্চনা বললে—না সুরোদা, তুমি যাও।

গোবরডাঙার খুড়ীমা ডেকে বললেন—সুরেশ্বর, তুমি কল্যাণদের কথা শুনো না। তুমি যাও। তোমার পিতামহীর শ্রাদ্ধ, তোমার কর্তব্য, তুমি যাও।

শুধু ব্রাহ্মণবাড়ী নয়, সুলতা—গ্রামের সকল পাড়ায় পাড়ার প্রধানদের বাড়াতে বাড়ীতে যেতে হল। রায়বাড়ীর নিমন্ত্রণ বরাবরই পঞ্চগ্রামের-সপ্তগ্রামের, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতারা নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে, কিন্তু সেকালে নিমন্ত্রণ হত পাড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রণ ছুঁড়ে দিয়ে; একখানা করে রোকা পাঠাতে হত। লেখা থাকত "অত্র রোকায় রায়বাড়ীর নিমন্ত্রণ জানিবা। রায়বাড়ীতে ··উপলক্ষ্যে ভূদেব ভোজন হইবেক এবং তৎপর অন্যান্য সকলজনকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইবেক, উক্ত ভোজনের আসরে তোমাদের পাড়ার সকলকে সার আগত-স্বগত কুটুম্বস্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে।"

এবার আর রোকায় নিমন্ত্রণ চলল না, আমাকে যেতে হল। গেলাম পাড়ায় পাড়ায়। ব্রাহ্মণ এবং বর্ধিষ্ণু শূদ্রদের ঘরে ঘরে। তারপর শ্রাদ্ধের আয়োজনের পরামর্শের জন্য সর্বাগ্রে আহ্বান জানাতে হল কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টকে।

সেখানে নিয়ে গেল অতুলেশ্বর।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রঙ্গলাল ঘোষ তখন নেই। মারা গেছেন। তাঁর জায়গায় প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁর উকিল ছেলে। অতুলেশ্বর সেক্রেটারী। গ্রামে সদ্গোপদের সংখ্যাধিক্য, সুতরাং প্রেসিডেন্ট তারা ছাড়া কেউ হতে পারে না। রঙ্গলাল ঘোষের সেই উকিল ছেলেটি দাবী করলেন শ্রাদ্ধ যে রকমই করি, যত খরচই করি, কংগ্রেস কমিটির সামনে একটা সংগ্রাম আসছে, তার জন্য কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা দিতে হবে। সেও দিতে আমি রাজী হলাম, কিন্তু তবু পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলাম না ওদের কাছে। তার কারণ ওই গোয়ানপাড়ায় ভায়লেটের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করবার সঙ্কল্প করেছিলাম। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বেঁকে বসলেন ওই কথায়—না, তা করতে পাবেন না।

ঠাকুমা বলে গিয়েছিলেন তাঁর শ্রাদ্ধের সঙ্গে যেন ভায়লার জন্যে কিছু করি। বলেছিলেন —ওরে, বড়বাবু মারা গেলেন ভায়লার পিছনে ছুটতে গিয়ে। আর বড়বাবু মারা গেলে আমি ভুলতে পারলাম না, ভায়লা অনায়াসে বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

ভায়লেট মেয়েটি গলায় কেন দড়ি দিয়েছিল জানি না, তবে আমার ঠাকুমা তার ওই

ব্যাখ্যাই করেছিলেন। এবং স্বামীর শ্রাদ্ধের দিনে রাত্রি এক প্রহরের সময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন গোয়ানপাড়ায় গির্জের পাদরীর কাছে; ভায়লেটের শ্রাদ্ধ হোক, এই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাও হয় নি, কারণ গভীর রাত্রে কারুর দেখা পান নি। ফলে রায়বাড়ীতে মেজতরফ তাঁকে—।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—আমি তাঁর কথায় সঙ্কল্প করেছিলাম, গোয়ানপাড়ায় ভায়লেটের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করে দেব। আর ভায়লেটের কবরের যদি কোন সন্ধান মেলে, তবে কবরটিতে অন্ততঃ একটা মার্বেল ক্রুশ বসিয়ে কবরটি মার্বেল দিয়ে ঢেকে দেব। কিন্তু বাধা পড়ল তিন দিক থেকে। কীর্তিহাটের কংগ্রেস ও গ্রামের তরফ থেকে, রায়বাড়ীর ছেলেদের তরফ থেকে এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা, গোয়ানপাড়া থেকেও এল বাধা।

* * *

ঠাকুমা যদি কীর্তিহাটে তাঁর শ্রাদ্ধ করতে না বলতেন, আর ভায়লেটের স্মৃতির জন্যে কিছু না বলতেন, তবে এইখানে ছেদ টেনে দিয়ে বলতাম,—এই শেষ। কলকাতায় থাকতাম, নায়েব-গোমস্তারা জমিদারী চালাত, হিসেব দিত; আমি নিশ্চিন্ত মনে আজকের দিনটির অপেক্ষা করে থাকতাম। কিন্তু ঠাকুমার শেষ ইচ্ছা পালন করতে গিয়ে প্রথমেই পেলাম বাধা।

কীর্তিহাটের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বললেন—গোয়ানপাড়ায় কিছু করা হবে না। করতে গেলে বাধা পড়বে। গ্রামের লোকে হয়তো খাবে না। আপনাকে ওদের নিয়েই থাকতে হবে।

না খাওয়ার অর্থ ভীষণ। অন্ততঃ আমার ঠাকুমার শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে। তাহলে যে অপরাধে তাঁকে রাধাসুন্দরের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, যে অপরাধে তাঁর ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ তাঁদের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সেই অপরাধ কায়েম হয়ে যাবে।

গোয়ানপাড়ার ক্রীশ্চান বাসিন্দেরা সেই ভোটের সময় থেকে কংগ্রেসবিরোধী—ইংরেজদের সমর্থক হয়েছে প্রকাশ্যে। তাদের সঙ্গে মুসলীম লীগের পাণ্ডারা হাত মিলিয়েছে।

তার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দিলে অতুল—তুমি তো একবার ভুগেছ। ভোটের পর গোয়ানপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল কারা; তুমি তাদের ঘর নতুন করে গড়বার জন্যে সাহায্য করতে চেয়েছিলে, তার জন্য—।

সবটা না বলে অতুল থেমে গেল। জানে তো মনে আমার আছে। শুধু বলে দিলে এবার আবার তার থেকেও কিছু বেশী হবে।

আমি অতুলকে বলেছিলাম—অতুলকাকা, এটাও তো জান যে, সেদিন পুলিস এসে যখন আমাকে রক্তমাখা অবস্থায় পেয়েছিল, তখন আমি যে জবানবন্দী দিয়েছিলাম, তার জন্যে কীর্তিহাটের গ্রামের কারুর গায়ে আঁচ লাগে নি।

—জানি। কিন্তু সে না করে তোমার উপায় ছিল না। সে করতে তুমি মরালি বাধ্য ছিলে।

—মরালি বাধ্য ছিলাম?

—অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

একটু ভেবে আমি বলেছিলাম—তাই যদি মনে কর অতুলকাকা, তবে আমি আর তোমার তোমাদের সাহায্য চাইব না। আমি যা পারি যেমন পারি নিজেই করব। গ্রামের লোক যা করে করুক।

—বেশ কর।

অতুল চলে গিয়েছিল। মেজদিদি, অর্চনা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অতুল এমন কথা বলতে পারে, তারা তা ভাবতে পারে নি।

সাহস দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গোবরডাঙ্গার খুড়ীমা। এবং শেষ শয্যায় শুয়ে দেবেশ্বর রায়। ক'দিনের মধ্যে তিনি ভেবে ভেবে সব চক্ষুলজ্জা, সব মিথ্যে মর্যাদার মোহ ত্যাগ করে নিজের বিগত অন্যায়কে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন। স্বীকার করেছিলেন—রাধাসুন্দরের চত্বরে সেদিন উমা দেবীকে ঢুকতে দেই নি, বড়তরফকে দেবোত্তর থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে। কিন্তু বড়তরফের বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় জটিল বিষয়ী এবং দুর্দান্ত নিষ্ঠুর। তিনি মাকে পাগল বানিয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে বনবাসে দিয়ে বিষয়ের মুঠো এতটুকু আলগা হতে দেন নি। আমি দোষ স্বীকার করছি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করে যাব সুরেশ্বর, আমি বিছানায় শুয়ে এই পঙ্গুদশায় যতটা পারি সাহায্য করব।"

গোবরডাঙারখুড়ীমা বলেছিলেন—তুই পিছিয়ে আসিস নে সুরেশ্বর। জ্যাঠা মায়ের শেষ ইচ্ছে তোকে পূর্ণ করতেই হবে। ভায়লেট মেয়েটা তাঁর মরণের খবর পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিল, এ ভালবাসা কে অস্বীকার করবে! জ্যাঠাইমার মত সতীসাধ্বী হয় কে? ভায়লেটের ভালবাসার দাম তিনি বুঝবেন না তো বুঝবে কে?

বাধা এল অন্য দিক হতে। গোয়ানদের দিক হতে। তারা বললে—ভায়লেটের কবর তারা ছুঁতে দেবে না। সে কবর যেমন আছে তেমনি থাকবে। চাই নে তার মার্বেলের আবরণ, মার্বেলের ক্রশ। দেবেশ্বর রায়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল এ কথা যে বলবে তার জিভ তারা ছিঁড়ে নেবে।

দিন-সাতেকের মধ্যেই আমার নামে একটা নোটিশ এল। তমলুকের এস-ডি-ও আদেশ জারী করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, গোয়ানপাড়ার কবরস্থানে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তোমাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, সেখানে কোন কিছু করবার চেষ্টা যেন না করা হয়। লোকজনসহ সেখানে যেন না যাই।

আমি নায়েবকে বললাম—গোয়ানপাড়ার কে এসেছে নোটিশ জারী করাতে, তাকে ডাকুন।

নায়েব বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বললে—তারা কেউ আসবে না।

আমি নিজে বাইরে গেলাম। দেখলাম আদালতের পিওনের সঙ্গে তিন-চারজন গোয় এসেছে। তাদের নাম মনে পড়ল না। ভুলে গেছি বছর দুয়েকের মধ্যে। তাদের দি তাকিয়ে বললাম—দু বছর আগে যখন তোমাদের ঘর পুড়েছিল, তখন তোমাদের টা দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের অপমান করি নি। ভায়লেটের কবর আমি বাঁধিয়ে দিতে চা তোমরা দেবে না। ভাল কথা। কিন্তু ভায়লেটের নামে যদি চার্চে টাকা দিই বা ত নামে একটা কিছু করে দি গোয়ানপাড়ায়, তাহলে তাও কি নেবে না তোমরা?

ওরা চুপ করে রইল। এ-ওর মুখ তাকালে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না। চ গেল। বিকেলবেলা বিবিমহলের ঘরে বসেছিলাম, রঘু এসে বললে—সেই মেয়েটি এসেছে সেই কুইনী বলে মেয়েটি। তার সঙ্গে আছে পাড়ার পাদরী সাহেব।

কুইনী এল যেন জ্বলতে জ্বলতে। প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে। সে বললে—না, গোয়ানপাড়া কেউ কিছু নেবে না আপনার কাছে। আপনারা বড়লোক, আপনারা লজ্জাহীন, আপনা অন্ধ, আপনারা অনুভবশক্তিহীন; আপনারা মনে করেন দুনিয়াকে আপনারা কি রেখেছেন; জমির জমিদারীস্বত্ব কিনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও কিনেছেন ভেবেছেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, মনে অনুভব করতে পারছেন না যে দিনকাল পাল্টেছে; মানু আর আপনাদের হুকুম মানবে না, আপনাদের দেওয়া অপমান সইবে না। কেন আপ এমন করে অপমান করতে চাইছেন আমার মাতামহের মা ভায়লেট পিক্রুসকে? কি অধিকা আপনার?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে সে হাঁফাতে লাগল।

আমি অবাকবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

সুলতা—নারীর প্রতি পুরুষের মোহ যদি পাপ হয় তবে পাপদৃষ্টি দিয়েই আমি তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। বিলেতে হারা রে এবং লরা নাইট অথবা শম্পা রের সঙ্গে দেখা হওয়া পর থেকে তরুণী নারীর দিকে মোহ নিয়ে তাকাতে গেলেই কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত আমার ধীরে ধীরে তার মুখে চোখে রঙে হাসিতে অশ্রুতে রায়বংশের কারুর না কারুর আদল ভে উঠত, জীবন আমার শামুকের মত খোলার মধ্যে গুটিয়ে যেত; এই প্রথম কুইনীর সামনে তার ব্যতিক্রম ঘটল।

মনে পড়ল, মেদিনীপুরের বাসায় ওকে দেখে আমার জীবনে সর্বপ্রথম এই মোহময় বাসনা জেগেছিল। প্রথম যৌবনে তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু জীবনের বাসনা এমন-ভাবে জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে অজস্র ফেনা মাথায় করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে নি। আদি মৌলিক দেহবাদের প্রথম উচ্ছ্বাস। রায়বংশে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে ধর্ম শক্তি ও সম্পদে লালনে এই দেহবাদ দুর্দান্ত-দুর্দমনীয় হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে ছিল, আজ তাতে প্রবল জোয়ার

এসেছে। মেদিনীপুর বাসায় সেদিনের উচ্ছ্বাসের প্রথম জাগরণ।

এবার দু বছর পরে কুইনী আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে আমার চোখে।

আমার প্রপিতামহ রায়বাহাদুরের অতৃপ্ত কামনা যেন আমার এই কামনার মধ্যে ফুটেছে।

আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ভায়লেটের প্রতি যে কামার্ততা, তা যেন আমার বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্গার করছে।

ওকে না পেয়েই জীবন আমার শূন্য হয়ে রয়েছে।

ওর উপর অধিকার রয়েছে। ও আমার। অঞ্জনার মেয়ের বংশের মেয়ে, দেবেশ্বর রায়ের প্রথম ভালবাসার (হোক সে অবৈধ ভালবাসা) ফল, প্রথম সন্তানের দৌহিত্রী। ওকে আমিই লেখাপড়া শিখিয়ে এমন রূপে ফুটিয়েছি, ও আমার। ওকে আমায় পেতেই হবে। মনে পড়ল, গতবার পুলিসের হাত থেকে রায়বংশের সন্তানদের এবং এই গ্রামের লোকেদের, বিশেষ করে রঙলাল ঘোষকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম—"আমার কুইনীর ওপর দুর্বলতা আছে।"

সে কথাটা আমি মিথ্যা বলি নি। সে কথা সত্য।

কুইনীকে দেখছিলাম। আর মনে হচ্ছিল—।

থামল সুরেশ্বর। চোখ বুজে মনে মনে কোন ভাবনা বা চিন্তাকে উপভোগ করলে সে, মুখে ক্ষীণ রেখায় একটু হাসি ফুটে উঠল। একবার ঘাড়ও নাড়লে, মনে মনে কোন মধুর চিন্তা উপভোগ করার আনন্দে। তারপর বললে—তুমি গিরিশবাবুর বিল্বমঙ্গল পড়েছ বা অভিনয় দেখেছ সুলতা? আমি পড়েছি, অভিনয়ও দেখেছি এ্যামেচারে। তাতে চিন্তামণির রূপ এবং দেহ-মোহে অন্ধ বিল্বমঙ্গল বাপের শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধ করেই চিন্তামণির বাড়ী রওনা হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে। তুফানে প্রলয়ঙ্করী নদী, খেয়াঘাটে নৌকা নেই, কিন্তু তা উন্মত্ততার কাছে বাধা নয়। সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কাঠ বলে একটা গলিত শবকে আশ্রয় করে নদী পার হল। বাড়ীর পাঁচিলের গর্তে মুখ ভরানো সাপের লেজ ধরে পাঁচিলে উঠে চিন্তামণির ঘরে এল। চিন্তামণির বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে উঠে সব দেখে বললে—তুমি কি? বিল্বমঙ্গল তার মুখপানেই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্য কথা নেই, শুধু একটি কথা—"চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর। তুমি অতি সুন্দর।"

আমি ঠিক সেই ভাবেই কুইনীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আশ্চর্য মোহ কুইনীর সর্বাঙ্গে। তার রুক্ষ চুলে, তার রুক্ষ সৌন্দর্যে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মধ্যে ঈষৎ একটা বিদেশী ফ্যাকাসে আভাস। তার আয়ত চোখের শুভ্রচ্ছদের মধ্যে ঈষৎ নীলাভা, তার চোখের তারা কালো নয় পিঙ্গল; তাও আমার কাছে অপরূপ বলে মনে হল।

আমি তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

পুরাণের কাল হলে বলতাম, আমি মদন-বাণ-বিদ্ধ, জর্জরিত। অতি-বাস্তববাদীর ভাষায়

আমি তখন আদিম-কামনায় আদিম মানুষের মতই কামার্ত।

কুইনী আমার সে-দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন ভীতার্ত হয়ে উঠল, বোধ করি আমার দৃষ্টির উত্তাপ তাকে গলতে চাচ্ছিল। ভয়ে সে নিজের পাশের দিকে চকিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিলে, তার সঙ্গী বৃদ্ধ পাদরী বসে আছেন কিনা। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে আমাকেই তিরস্কার করে তাঁকে বললে—উঠে আসুন ফাদার। উনি শুধু অসভ্যই নন, উনি বর্বর। ওঁকে আমি ঘৃণা করি। আই হেট হিম।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—আর আপনি আমাদের এমন করে অপমান করবেন না। ভায়লেট পিক্রুজের আত্মাকে শান্তিতে কবরের তলায় ঘুমুতে দিন।

আমি শুধু একটা কথা বলেছিলাম—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না কুইনী। তুমি আমার উপর অবিচার করছ। অপমান আমি তোমাদের করি নি। আমার পিতামহ ভায়লেট পিক্রুজকে ভালবাসতেন এবং ভায়লেটও তাঁকে ভালবাসত।

কুইনী দাঁড়ায় নি, শুনতে চায় নি সে এ-কথা, দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। এতক্ষণে বৃদ্ধ পাদরী আমাকে বলেছিলেন—কুইনী ঠিক বলেছে সুরেশ্বরবাবু, কেন একটি দুঃখিনী মেয়ের অশান্ত আত্মার গলায় কলঙ্কের মণিহার পরিয়ে তাকে আরও দুঃখ দেবেন, লজ্জা দেবেন! তাছাড়া আর একটা কথা বলি—। আপনি গোয়ানদের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। এই চার্চের জন্য জমি দিয়েছেন, অর্থও দিয়েছেন; তাই আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি, ওরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিছু করতে গেলে হয়তো গোয়ানরা আপনার অনিষ্ট করবে।

* * *

তাতে আমি ভয় পাই নি সুলতা। তখন রায়বংশের রক্ত আমার মধ্যে জেগে উঠেছে। ভয় আমি গোয়ানদেরও পাই নি, কীর্তিহাটের লোকেদেরও পাই নি—আমি ঠাকুমার শ্রাদ্ধে দু'হাত খুলে খরচ করেছিলাম। ব্রাহ্মণদের ভোজন-দক্ষিণা দিয়েছিলাম, দীয়তাং ভুজ্যতাং রব তুলেছিলাম ভোজন আয়োজনে।

তখনও ১৯৪১ সাল সুলতা। জ্যৈষ্ঠ মাস, তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইয়োরোপ-আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ; ফ্রান্স পড়েছে। ডানকার্ক থেকে ইংরেজ কোনও রকমে প্রাণ-মান বাঁচিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছে। হিটলার বলকানে ঢুকেছে। আফ্রিকায় নতুন ফ্রণ্ট খুলেছে। আবিসিনিয়ায় ইটালীর বাহিনীর সঙ্গে তার শুরু। তখনও ভারতবর্ষে তার আঁচ পৌঁছোয় নি, জিনিসপত্রের বাজারে ধানচালের গোলায় কণ্ট্রোল বসে নি; তখনও বাজার সস্তাগণ্ডা, তখনো শ্রাদ্ধে বিবাহে ক্রিয়াকর্মে বাধানিষেধ নেই। আমি প্রচুর আয়োজন করে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ সমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন করলাম।

পরামর্শটা দিলেন বড়জ্যাঠামশাই।

যজ্ঞেশ্বর রায়। দেবেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম পৌত্র। রায়বংশের মধ্যে নারী সম্পর্কে রত্নেশ্বর রায়ের পর সংযমী পুরুষ। তিনি হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়েও এসে শ্রাদ্ধ করে চলে গেলেন। মায়ের শেষকৃত্য করে প্রায়শ্চিত্তই শুধু করলেন না, উমা দেবীর গহনার অর্ধেক ভাগ নিয়ে চলে গেলেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন।

বললেন—রায়বাহাদুর বলতেন, যেখানে চামড়ার জুতো চলে না, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়। পথের ধুলোর উপর হাঁটবে, তখন চামড়ার জুতো পরো, মানুষের মাথার উপর দিয়ে হাঁটতে হলে রুপোর জুতো তৈরি করে পরো, দেখবে মানুষগুলো মাথা পেতে দিয়ে বলবে—আমার মাথায় পা রাখুন। টাকা তোমার আছে সুরেশ্বর, তাই খরচ করে তিনি যা বলে গেছেন তাই কর। যখন করতে নেমেছ তখন পিছিয়ো না। টাকায় সব হয়।

তর্ক নিশ্চয় উঠবে। এবং কথাটাও নিশ্চয় সত্য নয়। কিন্তু তখন সত্য মনে হয়েছিল, সত্য হয়েও উঠেছিল। শ্রাদ্ধে কোন বাধা আসে নি। তবে হ্যাঁ, গোয়ানপাড়া নিমন্ত্রণ নেয় নি কিন্তু কিছু দরিদ্র গোয়ানরা গোপনে এসে মিষ্টি খেয়ে গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, সংকল্প যা করেছিলাম তা কোনটা অপূর্ণ থাকে নি, তা রাখি নি আমি। শ্রাদ্ধের পরদিনই কাঙালী-বিদায় কাঙালী-ভোজনের মধ্যে আর একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর সঙ্গে দেবেশ্বর রায় হসপিটালের পত্তন করেছিলাম। তাতে উমা দেবীর নামে চারটে বেড। আর একটা বেড ছিল অহিন্দুদের জন্ম রিজার্ভড। তার নাম কি হবে তা বলি নি, তবে বুঝতে কারুর বাকি থাকে নি এই বেডটি শেষ পর্যন্ত কার নামে হবে। তবু কেউ জিজ্ঞাসা করে নি বা করতে সাহস করে নি।

অতুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিল—এই বেডটা কি—

বলেছিলাম—অহিন্দু ক্রীশ্চান মুসলমানদের জন্মে থাকবে।

—কার নামে হবে?

—অনুমান করতে তো পেরেছ। কিন্তু ওতে আপত্তি করলে হাসপাতাল আমি এখানে করব না। আশা করি এতে তোমাদের জোর খাটবে না।

অতুলেশ্বর চুপ করেছিল। গোয়ানরা কেউ আসে নি। তবে আলোচনা করেছিল। তাতে তারা অখুশিত্ব প্রকাশ করে নি। খুশি হয়েছে এইটে গোপন করেছিল।

আর একটা মন্দির গড়েছিলাম। গড়েছিলাম সিদ্ধাসনের জঙ্গলে, ছোট একটি মন্দির তৈরী করিয়েছিলাম—পনের ফুট উঁচু মন্দির। যে-ঘরটায় শ্যামাকান্ত মনোহরা যোগিনীকে নিয়ে শক্তিসাধনা করেছিলেন বা শক্তিসাধনার নামে ব্যভিচার করেছিলেন, যে-ঘরে সতেরো বছরের তরুণ কন্দর্পের মত দেবেশ্বর রায় চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী ভায়লেটের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন, দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর যে-ঘরে চালের কাঠে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ভায়লেট, সেই ঘরের ভাঙা দেওয়ালগুলোর ভিতে ভিত খুঁড়ে

মন্দিরের পত্তন করেছিলাম। সিদ্ধাসনের একটি মার্বেলের বেদী তৈরি করিয়ে দেবার সংকল্প করেছিলাম।

বোধ হয় তোমার মনে আছে, ওই সিদ্ধাসনে পূজো শুধু হিন্দুরাই দিত না, গোয়ানরাও দিত; হিন্দুরা পাঁঠা বলি দিত বিজয়া-দশমীর দিন—গোয়ানরা নৈর্ঋত কোণে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মুর্গী বলি দিত।

বাতাসা-মণ্ডার পূজা ভোগ দিতে তারা বেদীর কাছে এসে নামিয়ে দিত। ১৯৪১ সাল '৪২ সাল পর্যন্তও দিয়েছে।

৪১ সালে হাসপাতালের সঙ্গে ভিত পত্তন করেছিলাম এবং মনে মনে সংকল্প করেছিলাম—মন্দির সম্পূর্ণ হলে ওই মন্দিরের মেঝেতে বেদীর নীচে একটা মার্বেল ট্যাবলেট বসিয়ে দেব, যাতে লেখা থাকবে—'যে-নারী তাঁর প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে বিরহ সহ্য করতে না পেরে এখানে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছিলেন, তাঁর অক্ষয়স্বর্গ হয়েছে এই সিদ্ধাসনের প্রসাদে।'

মুখে সংকল্প প্রকাশ করি নি। গোড়ায় কেউ বুঝতেও পারে নি।

* * *

এক বছর পর।

১৯৪২ সাল, অক্টোবর মাস। তখন মেদিনীপুর দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আগস্ট মুভমেণ্ট আরম্ভ হয়ে পূর্ণ বেগে চলেছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি বাংলা দেশে—সেই বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় তখন থানা পুড়ছে, সরকারী আপিস পুড়ছে। বড় বড় বাঁশের ডগায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মেদিনীপুর বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে। সেই সময় এই মন্দিরে কীর্তিহাটের কড়চার রায়বাড়ীর জবানবন্দীর শেষ ঘটনা ঘটল।

ওই মন্দিরেই আমার কাঁধে একজন গোয়ান ছুরি মারলে।

বিচিত্র ঘটনা। আমার জবানবন্দীর শেষ ঘটনা।

রক্তে মন্দিরের মেঝের সাদা মার্বেল লাল হয়ে গেল। এবং তাতেই ধুয়ে গেল দেবেশ্বর রায়ের অপরাধ। তাতেই আমি মুক্তি পেলাম শ্যামাকান্তের অভিশাপ থেকে। তখন বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন আসছে। পরের দিনই মেদিনীপুরের সমুদ্রকূলে তুফান তুলে ঢুকবে। তাতেই ধ্বসে যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতের মূল পাথরটা, ফেটে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে রায়বাড়ীর তিন-মহলা বাড়ীও ভাঙবে, ফাটবে।

ঘটনাটা ঘটল পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যায়।

১৯৪২ সালের আশ্বিনের দুর্গাপঞ্চমী। আকাশে তখনও মেঘের কোন ঘটা নেই, কোন ইশারা নেই, বঙ্গোপসাগরে কোথায় কোন্ দিগন্তে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তা কেউ জানে না, হয়তো প্রকৃতি নিজেও সচেতন নন; শরতের আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা চলেছে;

পূজোর ঢাক তখন ভোরবেলা আর সন্ধ্যেবেলা একবার করে বেজে যায়; তাকে ধুমুল দেওয়া বলে। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। আগস্ট মুভমেণ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে।

ইয়োরোপের যুদ্ধ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তে ছিটকে এসে পড়েছে। পার্ল হারবার থেকে শুরু করে জাপানীরা হংকং সিঙ্গাপুর কেড়ে নিয়ে গোটা বার্মা মুলুকটাই ছিনিয়ে নিয়েছে। ইংরেজের পল্টন হ'টে হ'টে ক্লান্ত হয়ে খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে ইণ্ডিয়াতে এসে হাঁপ ছেড়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলও কেড়ে নেবে আন্দাজ করে রিট্রিটের প্ল্যানিং করে ফেলেছে। মেদিনীপুর সমুদ্রকুল অঞ্চলে নৌকো সাইকেল এসব ইংরেজ সরকার কেড়ে নেবার নোটিশ দিয়েছে। এরই মধ্যে কংগ্রেস কুইট ইণ্ডিয়া রেজলুশন নিয়ে বলেছে— "ভারতবর্ষ ছেড়ে তোমরা চলে যাও।" অন্য দিকে বাজারে জিনিসপত্রের দর হু-হু করে চড়তে শুরু করেছে।

বাংলা দেশে কলকাতা থেকে শুরু করে আসাম অঞ্চল পূর্ববঙ্গ জুড়ে ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যে ছেয়ে গেছে।

এরই মধ্যে কুইট ইণ্ডিয়া রেজলুশন থেকে আগুন লেগে গেল দেশে। গোটা ভারতবর্ষেই লাগল আগুন কিন্তু বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলা হয়ে ছিল বারুদের গাদা, সেই গাদায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

মেদিনীপুরের আত্মার প্রতীক মাতঙ্গিনী হাজরা—তিনি থানা দখল করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেলেন। কিন্তু থানার দখল দিয়ে গেলেন সাধারণ মানুষদের হাতে। কীর্তিহাটের দখল নিয়ে বসল কীর্তিহাট কংগ্রেস, কংগ্রেসের সভাপতি রঙলাল মণ্ডলের ছেলে, সেক্রেটারী অতুলেশ্বর রায়।

থানার দারোগা পালিয়েছিল—কনেস্টবলেরাও পালিয়েছিল—একজন এ-এস-আই ধরা পড়ে দেশী সরকারের হাতে অ্যারেস্টেড হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যারা ইংরেজপক্ষের লোক তারা হয়েছিল নজরবন্দী। তার মধ্যে ছিলাম আমি। আমি জমিদার; আমি এর আগে মেজদির কেসে এবং অতুলেশ্বরের কেসে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছি বটে তবুও বার বার হুকুম অমান্য করেছি। আর নজরবন্দী হল গোটা গোয়ানপাড়ার লোকেরা। যে সব লীগ-পন্থী মুসলমান আনাগোনা করছিল তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে গেল আপন আপন নিরাপদ আস্তানায়।

তখন সবে হাসপাতাল তৈরী শেষ হয়েছে; বিছানাপত্র এবং সরঞ্জামও এসেছে কিন্তু অনুষ্ঠান করে উদ্বোধন হয় নি। পূজোর আগেই উদ্বোধনের কথা—উদ্বোধনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন এম খানের আসবার কথা। কিন্তু বিপ্লব বল বিপ্লব বিদ্রোহ বল বিদ্রোহ তার আগুন জ্বলবার পরই আমার উপর পরওয়ানা জারী হল—হাসপাতাল অবিলম্বে খোলা হবে; ওপন করবেন কংগ্রেস সভাপতি।

হাসপাতালের জরুরী প্রয়োজন। আহত হচ্ছে যারা তাদের চিকিৎসা চাই।

তাই হ'ল। আমি সেদিন হাত জোড় করে কংগ্রেস সভাপতিকে আহ্বান করে বললাম—আপনি যে অনুগ্রহ করে এই দেবেশ্বর রায় হাসপাতাল উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন তাতে রায়বংশ এবং আমি কৃতকৃতার্থ। আপনি জননায়ক।

জিভে আটকায় নি। সংকোচও বোধ করি নি স্থূলতা। বরং যেন কিছুটা খুশীই হয়েছিলাম। তবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধও করি নি। কারণ এদের দলে আমার স্থান অনেক নিচে এটা মনে করে আড়ষ্ট হয়ে জীবনের ছন্দে সহজ উল্লাস আসবে কি করে বল। তবে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলাম। বিনিময়ে অস্থায়ী স্থানীয় সরকার আমাকে বন্দী করে ঘরে আবদ্ধ রাখে নি বটে তবে নজরবন্দী ক'রে রেখেছিল। গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামের মধ্যে। চিঠি লেখা বারণ ছিল। আরও বাধানিষেধ ছিল কিছু কিছু। আমি এরই মধ্যে চেয়েছিলাম ওপারে সিদ্ধাসনের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার।

আমি একটা অজুহাত অনেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিলাম। ওই সিদ্ধাসনের মন্দিরে আমি ফ্রেস্কোর মত ছবি আঁকব।

প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করেছিলেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। কারণ গোটা গোয়ানপাড়াটা গত দু' বছরের ভোট ঝগড়া থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে তখন সতর্ক স্বেচ্ছাসৈনিকদের কড়া পাহারায় রয়েছে। এবং আমি নজরবন্দী হলেও বিশেষ সম্মানিত নজরবন্দী। আমার দেওয়া হাসপাতালেই কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের চিকিৎসা হচ্ছে। এমন কি প্রেসিডেণ্ট নিজেই ওপনিংয়ের সময় ওই অহিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত বেডটির নামও ঘোষণা করেছেন—ভায়লেট পিক্রুজ বেড। কিন্তু রিজার্ভড রাখার শর্তটি তুলে দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে ওই জাতিভেদ চলবে না। বলেছেন—হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান ভেদ আমাদের নেই, তারা আমাদেরই আপন লোক। তবে বিশ্বাসঘাতকতা কারুরই বরদাস্ত করা হবে না।

গোয়ানরা বলতে কিছু পারে নি, সাহস করে নি। তারা তখন হেরে গেছে, তখন গোটা পাড়াটাই কড়া পাহারায় বাস করছে। কোন অসম্মান নেই কোন নির্যাতন নেই। তবে বাইরের লোক ভিতরে আসতে পায় না, ভিতরের লোক বাইরে অর্থাৎ গ্রামের বাইরে যেতে পায় না। বাইরে যে কাজ থাক বা বাইরে থেকে যে জিনিসের প্রয়োজন হোক তা করে দেয় বা এনে দেয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নিত্য আমি যেতাম সিদ্ধাসনের নতুন মন্দিরে ছবি আঁকতে। কিন্তু আঁকা হ'ত না। কি আঁকব ভেবে পেতাম না। কল্পনার মধ্যে ক্রমাগত দেবেশ্বর রায় ও ভায়লেট পিক্রুজের ছবি ভেসে উঠত। আঁকতে ইচ্ছে হ'ত দেবেশ্বর এবং ভায়লেটের প্রথম মিলন দৃশ্য এবং ভায়লেটের ও দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুদৃশ্য।

সে ট্যাবলেটটা তখনও বসানো হয় নি। সেটা কলকাতায় বরাত দেওয়া ছিল, এসে

পৌঁছয় নি।

আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর—দুর্গাপঞ্চমীর দিন পর্যন্ত নিত্য যেতাম। ছবি আঁকার অজুহাতে, কিন্তু ছবি আঁকতে নয়; যেতাম আমি কুইনীকে দেখতে।

আমার জবানবন্দীতে আমি মিথ্যা বলব না। এর আগেই আমি বলেছি—ঠাকুমার শ্রাদ্ধের সময় যখন কুইনীকে দেখেছিলাম তখন থেকেই আমি তার মোহে আচ্ছন্ন, তার কামনায় আমি প্রমত্ত এবং কায়িক মিলনের কামনার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিকট এবং নিগূঢ় বলে তার প্রেমেও আমি প্রেমার্ত বলতে দ্বিধা করছি নে।

কুইনী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে সে আমাকে ঘৃণা করে, কিন্তু আমি তাতেও তিক্ত হই নি, বিমুখ হয় নি, প্রত্যাখ্যানেও আমি আহত হই নি, তার উপর ক্রুদ্ধ হতে পারি নি। বরং উল্টো হয়েছিল, আমি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছি। নিত্য সে প্রেম, সে কামনা তিলে তিলে বেড়ে সে তিলোত্তমার মত সম্পূর্ণ হয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় আছে।

মন্দির শুরু করবার পর থেকেই আমি কাজ দেখবার অছিলায় নিত্য যেতাম। তখনও আগস্ট মুভমেণ্ট আরম্ভ হয় নি। তখনও গোয়ানপাড়া কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে রেষারেষি বেধে চলেছে। আমিও তখন জমিদার। স্বাধীন আমার গতিবিধি। প্রয়োজন ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলব—আমার মত লোকের পক্ষে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এমন করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজে তদারক করে কাজ করানো আমার স্বভাবের বাইরে, কখনও করাই নি। হিসেবীও আমি নই। বাবা এত প্রচুর রেখে গিয়েছিলেন যে হিসেব আমাকে করতে হ'ত না। প্রায় শেষ করে এনেছি—তবুও ছিল। ঠাকুমার মৃত্যুর পর হাসপাতাল পত্তন করে এখানেই থেকে গেলাম। গিয়েছিলাম যে সব আকর্ষণে তার মধ্যে দুটো আকর্ষণ বড় ছিল—একটা ছিল জমিদারীর জেদের আকর্ষণ আর একটা কুইনীর আকর্ষণ। কুইনীকে দেখতে পাব। তার উপর নেশা ধরে গেছে আমার। জীবন কামনার্ত হয়ে তাকে চাচ্ছে।

আমার চোখে তখন কুইনীর রূপ এক আশ্চর্য রূপ।

কিন্তু কুইনী কাঁসাই পার হয়ে কীর্তিহাটে আসত না। গোয়ানরাও না।

কুইনীর এবং বৃদ্ধ পাদরীটির ব্যবস্থায় ওরা এই কীর্তিহাটের সঙ্গে ভোটের ঝগড়া থেকেই একটা সংগঠন গড়ে তুলছিল। ঠাকুমার শ্রাদ্ধে ভায়লেট পিক্রুজ আর দেবেশ্বর রায়ের সম্পর্ক নিয়ে ঝগড়াটাকে আরও পাকিয়ে তুলে নিজেদের সংগঠনটিকেও শক্ত করে তুলেছিল। কীর্তিহাটে তারা আসত না। এখানকার ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাতো না। এখানকার গার্লস স্কুলে মেয়েরা যারা পড়তে আসত, তাদেরও ছাড়িয়ে নিয়ে কুইনী নিজে একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিল। এমন কি কীর্তিহাটের দোকানে জিনিসপত্র কেনাও বন্ধ

ক'রে গ্রামেই একটা মুদীর এবং একটা ছোটখাটো মনিহারীর দোকান খুলেছিল। এ গ্রামে প্রয়োজন হলে যখন কাউকে আসতে হ'ত তখন দু'তিনজন মিলে আসত। কীর্তিহাটের লোকেরা যেতে হলে পাঁচ-সাতজন মিলে দর্পভরে যেত। গোমেশ ডিক্রুজ আমার বাড়ীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। আমি যখন জমিদারীর নেশায় কুইনীর আকর্ষণে ওখানে থাকলাম তখন কলকাতা থেকে দু'জন নেপালী দারোয়ান রেখেছিলাম। কিছুদিন পর আরও একজন ওখানকার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালকেও রেখেছিলাম। দস্তুরমত জমিদারী আসর সাজিয়ে বসে, ঠাকুমার স্মৃতিরক্ষার কাজটাকে আশ্রয় করে ওখানে কুইনীকে জয় করতে চেয়েছিলাম। এ নেশা সম্ভবতঃ সংসারে সব নারীপুরুষই যৌবনকালের সঙ্গে অল্প হলেও করে থাকে কিন্তু নেশা যাকে ধরে তার আর নিষ্কৃতি থাকে না। মদ অনেকে খায় কিন্তু মদে খাওয়া বলে একটা কথা আছে, মদে যাকে খায় তার যেমন আর নিষ্কৃতি থাকে না এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। নারীকে দেখে পুরুষের ভাল লাগে কিন্তু যে পুরুষ কোন বিশেষ নারীর নেশায় পড়ে তার আর ঘৃণা থাকে না, লজ্জা থাকে না, ভয় থাকে না, তার জন্য সে অপমান গ্রাহ্য করে না, আঘাত গ্রাহ্য করে না, সব কিছুকে মাথায় করে নিয়েও তাকে পেতে চায়। আমি কুইনীকে তেমনি করে চেয়েছিলাম।

ওই দারোয়ানদের একজনকে সঙ্গে ক'রে ওই সিদ্ধাসনের মন্দিরের কাজ দেখতে যেতাম। দেখতে যাওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেবার জন্য উড়িষ্যা থেকে পাথরের কারিগর এনে পাথরের কাজ করাবার প্ল্যান জুড়ে দিয়েছিলাম। এবং ওই মন্দির থেকে একটু সরে লাঠিয়াল বাগ্দীদের একটা পল্লী বসিয়েছিলাম, জমি দিয়ে, ঘর করবার খরচ দিয়ে, যেন গোয়ানরা মন্দিরটার ক্ষতি না করে, ভেঙে না দেয়।

গোয়ানরা আসত একটা সীমানা অবধি। তারা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখত। এদের সঙ্গে একবার না একবার কুইনী আসতো। আমি একখানা চেয়ার পেতে বসে থাকতাম এই সময়টুকুর জন্য। কুইনীকে দেখে মন তৃপ্তিতে ভরে যেত। তার দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। সে সহ্য করতে পারত না আমার দৃষ্টি, বেশ একটু উত্তপ্ত হয়েই সে চলে যেত। আমার চিত্ত দ্বিগুণ অতৃপ্ত হয়ে উঠত। কিছুদিন সে একেবারেই আসত না। আমি অশান্ত অতৃপ্ত মনে সারাক্ষণ বসে থেকে ফিরে আসতাম অপরাহ্ণে। রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না। মদ্যপান করে ঘরে বসে হয় বাঁশের বাঁশী নয় তো বেহালা নিয়ে সেই ছবির ঘরে ব'সে সুর তুলতাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাজত আমার বাঁশী, অথবা আমার বেহালা। লোকে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। কারণ আমার মনের কথা আমি ঢেকে রাখি নি আবরণ দিয়ে। আবার জবরদস্তি ক'রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেও কিছু বলি নি, যার জন্যে লোকে আমাকে শাস্তি দিতে পারে।

বেশ কিছুদিন না আসার পর কুইনী একদিন এল। আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল

বোধ হয়। ওদের সীমানা রেখার ওপাশে দাঁড়িয়ে বললে—শুনুন।

আমি উঠে গেলাম।

তীব্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—আপনি এখানে কেন আসেন? কিসের জন্য?

মন্দির দেখতে আসি বলি নি আমি। আমি বলেছিলাম—আমার ভাল লাগে বলে আসি। স্থানটিকে আমি ভালবাসি। এবং—

—কি?

—থাক সে কথা, অনুক্তই থাক।

—আপনি অতি ইতর। বলে সে চলে যেতে যেতে বলেছিল—আর আসবেন না।

—আমি আসব। আমার কথা সে শোনে নি, সে চলে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর অতুল এসে একদিন বললে—সুরেশ্বর, এতকাল পর তুমি সত্যিই জমিদার রায়বংশের ধারা ধরলে। জ্যাঠামশাই দেবেশ্বর রায়ের পার্টটা রাখবার জন্য কোমর বেঁধে লাগলে শেষ কালটায়!

বেশ খোসমেজাজে ছিলাম। অর্থাৎ নেশার মৌজে। বললাম—তোমার নীল রক্ত দেউলে হয়ে লাল হয়ে গেছে অতুল খুড়ো। যে-মাথা তাজ পরে সেই মাথা কাটা যায়, তাই ব'লে তাজ পরতে কেউ ছাড়ে না। দরকার হলে মাথাটা দেব গো।

অতুল বলেছিল—তার দেরি নেই সম্ভবতঃ—কারণ আগস্ট তখন সামনে। আগস্টের প্রথমেই কংগ্রেস কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট রেজলুশন নিলে।

দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলল। বাংলাদেশে জ্বলল প্রথম মেদিনীপুরে।

মাতঙ্গিনী হাজরার রক্ত দিয়ে সিক্ত মাটির উপর স্বাধীন ভারতের পতাকাদণ্ড পোঁতা হল। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকারের অধিকার উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পল্টন ছেড়ে দিয়ে ইংরেজ আবার তাকে কায়েম করতে চেয়েছে, বাইরে দেখানোর মত দখলও একটা নিয়েছিল বটে কিন্তু আর মেদিনীপুরে ঠিক ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয় নি।

সেই সময়ে মন্দিরের পাথর বসানোর কাজ হচ্ছিল। একটা কথা বলতে ভুলেছি, প্রথম যখন মাপ অনুযায়ী লালচে পাথরের স্ল্যাবগুলি এল তখন একটা বিস্ময়ের সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। পাথর বসাচ্ছে মন্দিরে। আশ্চর্য মন্দির তৈরী হচ্ছে!

গোয়ানপাড়ার লোক আগে এসেছিল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারা দেখেছিল। কিছুক্ষণ পর অনেকদিন পর এসেছিল কুইনী। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে সে চলে গেল।

পাথরের স্ল্যাবগুলির উপর নক্সার ডিজাইন আমি নিজে করে দিয়েছিলাম। রায়বাড়ীর কথা কীর্তিহাটের কড়চার একটা খসড়া আমি তার মধ্যে ফুটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নক্সার মূল ডিজাইনটা ছিল লতার মধ্যে বিকশিত পদ্মের সারি। যদি কোনদিন কীর্তিহাট

যাও তুমি দেখে খুশী হবে এ কথা বলতে পারি।

ওই নক্সা যখন দেওয়ালের গায়ে রূপ নিয়েছে, স্ল্যাবগুলি বসানো হয়েছে, তখন একদিন বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দেখে আমাকে ডাকলে, বললে—শুনুন!

গেলাম। সে বললে—এত সুন্দর মন্দির তৈরী করছেন কেন? কিসের কার মন্দির?

আমি বললাম—উপলক্ষ্য হিসেবে সবাই যা বলে তাই, সিদ্ধাসনের দেবী যোগিনীর মন্দির। যাঁর পুজো হয় বিজয়াদশমীর দিন, বাসন্তীপুজার সময়। আসলে এ মন্দির আমি উৎসর্গ করছি একটি ভালবাসার উদ্দেশে। এখানে একটি তরুণ একটি তরুণীকে প্রথম ভালবেসে মিলিত হয়েছিল, এবং পরে ওই প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে মেয়েটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে তাঁকে পেতে চেয়েছিল। তারই জন্যে এত সুন্দর করে গড়ছি।

স্থিরদৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ। তার আশেপাশে আরও কয়েকজন গোয়ানও ছিল। আমিও আমার আসনে ফিরে গিয়ে বসি নি, বেড়াটা মাঝখানে রেখে সে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় সে ভিড় ঠেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন থেকে আবার সে আসা বন্ধ করেছিল, কিন্তু শুদ্ধ দ্বিপ্রহরে তাকে দেখতে পেতাম সে গোয়ানপাড়ার ভিতরে তার বাড়ীর জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

যেদিন পাথর বসানো শেষ হল সেদিন আশ্বিনের আকাশ ঝলমল করছিল। পিতৃপক্ষ শেষ হয়েছে। মহালয়া গেছে আগের দিন। মন্দিরের বাইরে ভারা খুলল। ভিতরের কাজও শেষ হয়ে গেছে; সেদিন অনেক লোক এল দেখতে।

আমি খুঁজলাম কুইনীকে। এত লোকের মধ্যে কাউকে যেন আর দেখতেও পেলাম না। অনেক খুঁজে তাকে দেখতে পেলাম ভিড়ের মধ্যে। মন্দিরটাই দেখছিল সে। আমি তাকেই দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে চোখ মিলল। সে আমার দিকে তাকালে।

বাড়ী ফিরে এলাম সন্ধ্যাবেলা।

আসবার সময় কাঁসাইয়ের খেয়াঘাটে দাঁড়িয়েছিল গোমেস। সে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বললে—হুজুর! আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম—কেন? দরকার আছে?

সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে সে আমার হাতে একখানা কাগজ দিলে। তার সঙ্গে গুঁজে দিলে একটা ভাঁজকরা টুকরো কাগজ। বললে—একটা দরখাস্ত দিলাম হুজুর। এবার পুজোর সময় কাপড়চোপড় কিছু হবে না হুজুর!

বাড়ী এসে দরখাস্তখানায় চোখ বুলিয়ে টুকরো কাগজটা দেখলাম। খুব সুন্দর ক'রে পিন দিয়ে জুড়ে দেওয়া ছিল। তাতে লেখা ছিল। "মন্দির শেষ হ'ল, এরপর দয়া ক'রে আর এপারে আসবেন না। আমার মিনতি। এরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমি পঙ্গুর

মত অসহায়। আপনার অনিষ্ট করবে।”

আমি উথলে উঠেছিলাম সুলতা। ঠিক সেই সময়েই কে ডেকেছিল—সুরেশ্বর!

চমকে উঠেছিলাম। ডাক মেজদিদির। মেজদিদিকে কলকাতায় অর্চনার কাছে রেখেছিলাম। তিনি এসেছেন সেদিন। অতুল তাঁদের খবর দিয়েছে—“শ্যামাকান্তের অভিসম্পাত সুরেশ্বরের ঘাড়ে ভর করিয়াছে। সে গোয়ানপাড়ার কুইনী মেয়েটার জন্ম উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।”

আমি চমকে উঠেছিলাম। সত্যিই কি তাই? পুরুষ নারীর জন্ম পাগল হয়, নারী পুরুষের জন্ম পাগল হয়। দেহসম্ভোগের অন্তহীন অতৃপ্তিতে মানুষ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়। আবার মহাপ্রকৃতির অভিসম্পাতে শ্যামাকান্ত ইহকাল পরকাল সব হারিয়ে নিজের গলা টিপে নিজেকে পীড়িত করেন। মাথা কুটে রক্তাক্ত করেন নিজেকে।

আমি কি—। হয় তো তাই। কিন্তু ফিরবার শক্তি আমার ছিল না। আমার আপসোসও ছিল না। কুইনীর জন্ম ইহকাল হারাতে আমার এতটুকু খেদ ছিল না। আমি সব হারাতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার সব সম্পদ। আমার জীবন ব'লে বাড়াবাড়ি করব না। তবে তাও পারতাম। কুইনীর জীবন বিপন্ন হলে তাকে রক্ষা করবার জন্যে সে বিপদের সঙ্গে লড়তে যেতাম, তাতে মৃত্যু হলে মরতাম। কুইনীই যদি সেই প্রকৃতি হয়, রহস্যময়ী হয়, তবে তাকে মা আমি বলব না। তার জন্যে পাগলও হব না।

থাক সুলতা, এখন যা হয়েছিল বলি। তবে—।

তবে—একটা কথা বলে নিই। কুইনীর প্রতি এই আকর্ষণ যে কেন এত প্রমত্ত, তা আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ঠিক পুরো বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বলতে পারি—তার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার পুরুষচিত্তকে প্রমত্ত করে। আর একটা কথা। এটা এর আগে বলেছি। বার বার মনে হত, ও আমাদের—ও আমাদের—আমাদের সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে। মনে পড়ত অঞ্জনাকে, রত্নেশ্বর রায়কে। মনে পড়ত দেবেশ্বর রায় এবং ভায়লেটকে।

* * *

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। যাব সিদ্ধাসনের মন্দিরে। কিন্তু কাল মন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ঘরে মেজদি, অতুলেশ্বর থেকে ওপারে গোয়ানদের মধ্যে এ নিয়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে। এবং সময়টা এমন যে, আজ আর আমার ব্যক্তিগত অধিকার, সম্পত্তিগত অধিকার, কোন অধিকারই আমার স্বাধীন যথেচ্ছ বিচরণের পথ খোলা রাখে নি। আগস্ট মুভমেন্টের প্রথম ঝাপটা চলে গেছে। সাব-ডিভিশন এবং বড় বড় সরকারী এলাকার জায়গাগুলোয় পুলিস মিলিটারীর সাহায্যে আবার শৃঙ্খলা ফিরেছে বটে কিন্তু তার বাইরে অধিকাংশ অঞ্চলেই বিপ্লবী স্বাধীন সরকারের অধিকার কায়েম আছে। অধিকাংশ

মানুষ স্বাধীন সরকারের পক্ষে। তারাই তাদের সৈনিক। সরকারী পক্ষের লোক বলে যারা চিহ্নিত, তারা কড়া নজরের মধ্যে বসবাস করছে। তাদের উপর নির্যাতন নেই, কিন্তু তারা ভয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে। চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুর্ধর্ষ মানুষেরাও স্বাধীন সরকারের অনুগত সৈনিক হিসেবে সৎ হয়েছে এবং বিনিম্র হয়ে কাজ করছে।

আমি জমিদার, সেই হিসেবে এবং একদিন বিদায় সত্যাগ্রহ লিখেছিলাম, সেই হিসেবে তাদের খাতায় দাগী আসামী। আবার মেজদিদির কেসে অতুলেশ্বরের কেসে আমি লড়েছি এবং কীর্তিহাটের কংগ্রেস সভাপতি যেদিন আমার বিচার করবার জন্য আসামী হিসেবে তলব করেছিলেন, সেদিন পুলিসের কাছে আমি তাঁদের বাঁচিয়ে জবানবন্দী দিয়েছি বলে আমার নামের পাশে, চিত্রগুপ্তের খাতার মত, তাদের ডোসিয়ারে কিছু পুণ্যফলও আছে। আমার হাসপাতাল আমি কংগ্রেস সভাপতিকে দিয়ে ওপন করিয়েছি এবং আজ গোটা হাসপাতালটাই তাঁদের হাতে দিয়েছি, এটাও আমার একটা পুণ্যফল। তাই আমার এ স্বাধীনতাটুকু ছিল। আজ সকাল থেকে যেন ওখানে না যাই তার একটা সাবধান-বাক্য অতুলেশ্বর উচ্চারণ করে গেছে। গোমেসের হাত দিয়ে সাবধান করে দিয়েছে কুইনী। কিন্তু তাই আমাকে বেশী করে টানলে। কুইনী আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছে। আমি না গিয়ে পারি!

আমি একটু ভেবে রঙ-তুলি একটা ঝোলায় পুরে রওনা হয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্টের কাছে ছবি আঁকবার অজুহাতে ওপারে যাবার নতুন অনুমতি নিয়ে চলে গেলাম।

ওপারের ঘাটে যেখানে নামতাম, সেটা গোয়ানপাড়ার সামনে পড়ে। ওখানে নামতেই কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তারা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বললে, বাবু এসেছে আজ!

তারপর ঘটনাটা অতর্কিতেই কতকটা ঘটে গেল। ওখানে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই। বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের ভেতর। সেদিন রাজমজুরেরা নেই। থাকবার মধ্যে সঙ্গে আছে একজন দারোয়ান আর আছে যেসব শক্তপোক্ত লাঠিয়ালি-জানা ছোটজাতের হিন্দুদের বাস করিয়েছি তাদের বাড়ীর মেয়েরা। পুরুষেরা চাষের কাজে গেছে। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় গোয়ানদের রাগের আগুন সুযোগ পেয়ে জলে উঠেছে।

কেন আসবে বাবু—এই পারে কেন আসবে? তারা জানে কি জন্যে বাবু আসে! তারা আর সইবে না। পাড়ার সব থেকে নওজোয়ান ছেলেটি এসেছিল হনহন করে। তখন কুইনী এসে বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা। সে হাঁপাচ্ছিল উত্তেজনায়।

সে বললে—কেন এসেছেন? আবার কেন এসেছেন?

হেসে বললাম—মন্দিরের ভেতরে ছবি আঁকব।

—ছবি?

—হ্যাঁ।

—না। আঁকতে হবে না, পাবেন না আঁকতে, যান ফিরে যান বাড়ী।

আমি একটু হেসে বললাম—না। বলেই আমি পিছন ফিরলাম। গিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে—সেই মুহূর্তে ঘটল কাণ্ডটা। বলতে গেলে কয়েকটা নিমেষ ফেলতে যে সময় লাগে, তারই মধ্যে।

প্রথমেই শুনলাম—কুইনী চীৎকার করে বললে—না, না। জন—জন! না।

চমকে পিছন ফিরে দেখলাম একজন জোয়ান গোয়ান। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে প্রায় আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার ছুরি। ঠিক সেই মুহূর্তে, তার পিছনে ছুটে এসে তাকে সবলে কোমরে জড়িয়ে ধরলে কুইনী। —না। বলে চীৎকার করে উঠল সে। কুইনী তাকে অনুসরণ করেই ছুটে এসেছে তার পিছন পিছন।

জন তাকে ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমার উপর ছুরি তুললে। যেটুকু সময় পেয়েছিলাম, তাতেই আমি তাকে আটকাবার জন্য হাত তুললাম, ধরলামও কিন্তু আটকাতে পারলাম না। তবে ছুরিখানা সে আমার বুকে বসাতে পারলে না। হাতখানা চেপে ধরে ঠেলে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, তারই ফলে বুকে না বসে আঘাতটা লাগল আমার কাঁধে। ওদিকে মাটি থেকে উঠে কুইনী আবার তাকে জাপটে ধরলে। ইতিমধ্যে আমার দারোয়ান ছুটে এসেছে—একটা গোলমাল উঠেছে। চারিদিক থেকে লোকেরা এসেছে।

এরই মধ্যে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালে। আমার শিয়রে বসে আছেন মেজদি। শুনলাম জন ধরা পড়েছে, তাকে হাতে-পায়ে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর তার সাহায্যকারিণী এবং এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে কুইনীকেও বন্দিনী করা হয়েছে। তবে সেও জনের ছুরিতে আঘাত পেয়েছে। তার আঘাত লেগেছে বাহুতে। হাসপাতালের ভায়লেটের নামে উৎসর্গ করা বেডে তাকে রাখা হয়েছে; ভলান্টিয়ারের পাহারাধীনে।

ওদিকে পরামর্শ চলছে—কেসটা নিয়ে কি করা হবে।—ইংরেজের থানায় পাঠানো হবে? ইংরেজের আদালতে বিচার হবে? ওদিকে গোটা কীর্তিহাটের লোকেরা গোয়ানদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। একবার তারা গোয়ানপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল। এবার তারা পাড়াটা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

মেজদিকে বললাম—মেজদি, তুমি অতুলকে বল। অপরাধ ওদের নয়। অপরাধ আমার। ভালবাসা আমার অপরাধ। কুইনীকে আমি ভালবাসি। ওরা তা সইতে পারেনি। কুইনী আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে আকাশে ক্রুদ্ধ সাইক্লোনের নাকাড়া বাজল। সে-সাইক্লোন সপ্তমীর দিন এসেছিল কলকাতায়। মেদিনীপুরে এসেছিল ষষ্ঠীর মধ্যরাত্রে। সন্ধ্যা

থেকে আরম্ভ হয়েছিল উন্মত্ত ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর মাতামাতি। সন্ধ্যা থেকে আকাশ নিক কালো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। খবর এসেছিল কাঁথির ওদিকে নাকি সু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমুদ্রের তুফান এসে সব ধুয়ে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের ঝড়ের সা মেদিনীপুরের পরিচয় সৃষ্টির আদি থেকে। তারা জানে। তারা খবর পাঠায়। তার আকাশের দিকে তাকিয়ে খবর পড়তে পারে। সেদিন কংগ্রেস হুকুম দিয়েছিল—গোটা কীর্তিহাটের লোক এসে আশ্রয় নিক রায়বাড়ীর পাকা ইমারতের মধ্যে। ইস্কুল, হাসপাতাল কাছারী যেখানে যত পাকাবাড়ী আছে, এস সকলে, তার মধ্যে এসে আশ্রয় নাও। আমাকে হুকুম দিয়েছিল বিবিমহলে যেতে।

আমি আমার বেড থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলাম কুইনীর বেডের ছোট্ট ঘরখানিতে। কুইনী বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। ডাকলাম—কুইনী!

কুইনী মুখ তুলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি তাকে বললাম—ভয় কি? চল, আমার সঙ্গে চল। হাসপাতালে অন্য লোকেরা আসছে। আমার সঙ্গে বিবিমহলে চল—। যাবে না?

—গোয়ানদের কি হবে?

—তারাও এপারে এসে কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে রায়বাড়ীতে থাকবে। আমি প্রেসিডেণ্টের কাছে নতজানু হয়ে বলব।

সেই ঝড়ের মাতামাতির মধ্যেই আমি সেই আহত অবস্থাতেই তাকে নিয়ে এসে উঠেছিলাম বিবিমহলে।

সত্য কথা বলতে গেলে, সেই আমার কুইনীর সঙ্গে বিবাহ। সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের রাত্রে ভীতার্ত নির্বাক কুইনীকে আমি সারারাত বুকে জড়িয়ে ধরে বাসর যাপন করেছিলাম। সত্য অর্থে বাসর সুলভতা।

মাথার উপর প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের গর্জন একটানা বয়ে চলেছিল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছিল। বিবিমহলের নীচের তলায় একটা চোরকুঠুরীর কথা বোধ হয় বলেছি। সেটা সেকালের স্ট্রং-রুম। এই ঘরেই ব্রজদা লুকিয়ে রেখেছিল বীরেশ্বর রায়ের এবং দেবেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনার খাতা এবং ডায়েরীগুলো। সেই ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর কম্বল পেতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আমি ভয়ার্ত কুইনীকে পাশে নিয়ে একটা কম্বল দুজনে গায়ে জড়িয়ে বসেছিলাম। নির্বাক স্তব্ধ। ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল। একটা পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ ছিল, সেটা জ্বেলে বসেছিলাম। আলোর ফোকাসটা পড়েছিল দেওয়ালের গায়ে, আর চারিপাশে একটা আলোকিত আভাস—হ্যাঁ, তাছাড়া কি বলব? একটা আভাস ফুটে উঠেছিল। তারই মধ্যে, মধ্যে মধ্যে সে আমার বুকের উপর ঘুমে ঢুলে পড়ছিল, কখনও আমি পড়ছিলাম তার উপর; ঘুম ভেঙে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটা

করে হাসি ফুটে উঠছিল আমার মুখে। দেহসম্ভোগ নয়, পরস্পরের দেহের উত্তাপে একটা নরম নিশ্চিন্ততার আরাম বা আনন্দ যাই বল—তার মধ্যে ডুবেছিলাম। বাংলা কবিতার একটা লাইন মনে পড়ছে—মোহিতলালের নারী কবিতার লাইন।

'সন্তান মরিছে বুকে, তখনই যে নবগর্ভাধান'। এ-মৃত্যুকে মাথায় করে আমাদের মিলন হয়েছিল সুলতা।

* * *

এখানেই যবনিকা ফেলে দিতাম নাটক হলে। অন্ততঃ মানুষের গড়া স্টেজের নাটক হলে। পৃথিবী রঙ্গমঞ্চে যে-নাটক চলে, সে-নাটকে নাটকীয় মুহূর্ত আসে, সংঘাত আসে; যবনিকা পড়ে না, নাটকও শেষ হয় না। নাটক চলে।

পৃথিবীর কীর্তিহাট যে-কোণে, সেই কোণেও রায়বাড়ীর জীবন-নাটকে ওই ঘটনার পরও—একটা লৌকিক বিবাহ আমাদের হল। সমাজ-রাষ্ট্র এরা তো মানুষের মনের বিবাহকে মানে না—তাদের বিধানমত বিবাহ করিয়ে ছাড়ে।—তাই হল।

এই প্রাকৃতিক তাণ্ডবে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত মনে আছে তোমার—তিনদিন ধরে মেদিনীপুর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে হাজার দরুনে লোক মরেছে, হাজারে হাজারে জন্তু-জানোয়ার মরেছে। সমুদ্রের পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস সমস্ত দক্ষিণ উপকূল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গাছপালা কুরুক্ষেত্রের অক্ষৌহিণী সেনার মত ধরাশায়ী হয়েছে। গৃহহীন মানুষ জলসিক্ত মাটির বুকের উপরেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এরই মধ্যে ডি এম বলেছিলেন—ঈশ্বর মেদিনীপুরকে শাস্তি দিয়েছেন।

স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ক্যাবিনেটের মন্ত্রী তখন। তিনি এসে জনসাধারণের নৌকো কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় একজন ডেপুটি বলেছিল—সরকারী প্রয়োজনে নৌকো কেড়ে নেওয়া দরকার হয়েছিল তাই নিয়েছি। অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলেছিল।

কীর্তিহাটেও ওই সরকারী দাপটের ঢেউ এসে লাগল।

দু'দিন পর। রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে এসে হাজির হল একজন ইন্সপেকটার। তার সঙ্গে খড়্গপুরের মিসেস হাডসন এবং একজন অ্যাংলো ভদ্রলোক। অতুল, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মণ্ডল—এঁরা অবশ্য তার আগেই সরে গেছেন। গ্রামের লোকেই সরিয়ে দিয়েছে।

রিজার্ভ ফোর্স প্রথম এসেই কিছু লোককে অ্যারেস্ট করেছিল। মিসেস হাডসন এবং সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক এসেছিলেন গোয়ানদের সাহায্য দিতে। কিন্তু তাদের পেলেন এখানেই। গোয়ানদেরও আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল গার্লস স্কুলে। তাদের কথায় তারা পুলিসের কাছে নালিশ করলে, জমিদার সুরেশ্বর রায় কুইনীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কুইনী আটকে রয়েছে বিবিমহলে।

আমি তখন ঘুরে দেখছিলাম রায়বাড়ী। চারিদিক ঘুরে দেখছিলাম।

রায়বাড়ীর তিনটে সিঁড়ি, তিনটে চিলে-কোঠা।

চিলে-কোঠাগুলো সবই ভেঙে গেছে। উত্তরদিকের গোটা আলসে ভেঙেছে।

সব থেকে বড় ক্ষতি হয়েছে—বিভিন্ন সময়ে তৈরী রায়বাড়ীর বিভিন্ন মহলগুলোর জোড়ের মুখে ফাট ধরেছে।

বিবিমহলের সব থেকে যেটা শোভার বস্তু, আরামের স্থান, ছাদের উপর আটকোণা ছবি-ঘর, যেখানে বসে আমি ছবি আঁকতাম, বাঁশী-বেহালা বাজাতাম, যেখানে বসে থাকতেন বীরেশ্বর রায়, সেই ছবি-ঘরখানাও ভেঙে পড়ে গেছে।

ধানের গোলা ভেঙে ধান ছড়িয়ে পড়েছে, ভেসে গেছে। ইন্সপেক্টর কনেস্টবল নিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে—আপনাকে এ্যারেস্ট করছি। আপনি কুইনী মুখার্জি বলে ক্রীশ্চান মেয়েটিকে—

মিসেস হাডসন পা ঠুকে বলে উঠল—you are a Scoundrel, you have—

এ্যাংলো ভদ্রলোকটি একটা চড় বসিয়ে দিল আমার গালে। প্রস্তুত ছিলাম না আমি। পরমুহূর্তেই আমার রায়-রক্ত সাড়া দিয়ে উঠল—আমি ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপরে। কিন্তু তাদের সঙ্গে পারি নি আমি। তারা অনেক। আমি একা। সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না।

সাইক্লোন এবং বন্যা-বিধ্বস্ত কীর্তিহাট, মানুষেরা ক্লান্ত, ভেঙে পড়েছে। প্রতিবাদ করবারই কেউ নেই। সাহায্য করতে কে আসবে! আমাকে তারা ধরে বেঁধে ফেললে অপরাধীর মত।

—কোথায় কুইনী?

এবার আমি আত্মসম্বরণ করে বললাম—আমার ঘরে। বিবিমহলে। সে আমার ভাবী স্ত্রী—

কথা বলতে দিলে না আমাকে। অপরাধীর মতই কোমরে বেঁধে টেনে নিয়ে এল বিবিমহলে। কুইনী ছুটে বেরিয়ে এল খবর পেয়ে। আমার কোমরে দড়ি দেখে, আমার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে সে থমকে দাঁড়াল।—কেন ওঁকে বেঁধেছেন? কি করেছেন উনি?

মিসেস হাডসন বললেন—কুইনী তুমি সেফ? তোমার কোন অমর্যাদা—?

কুইনী এক কথায় সব কথার জবাব দিলে—আগে ওঁকে ছেড়ে দিন। উনি আমার ভাবী স্বামী। আমি ওঁকে ভালবাসি।

এ নিয়ে সমস্যা অনেকের কাছে ছিল কিন্তু আমার কাছে ছিল না। কুইনীর কাছে না।

ওই গোয়ানপাড়ার পাদ্রী বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাজ করেছিলেন।

আবার বাড়ীতে মেজদি বলেছিলেন, তাঁরা বিবিমহলে দাঁড়িয়েছিলেন—মেজদি, গোবরডাঙার খুড়িমা, বর্ধমানের খুড়িমা, অর্চনার মা, ব্রজদার বোন; মেজদি বলেছিলেন—কুশণ্ডিকাটা করবিনে রে? কুইনী তো আসলে মুখুজ্জে। পরে না হয় ক্রীশ্চান হয়েছে।

গোবরডাঙার খুড়িমা একটা বেলপাতায় খানিকটা কালীমায়ের প্রসাদী সিঁদুর বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—অন্তত এটা দিয়ে দে সুরেশ্বর।

কুইনী তাতে আপত্তি করে নি। একটু হেসেছিল। কালীবাড়ী নারায়ণ-মন্দিরেও সে যেতে চেয়েছিল। অন্তত আগ্রহ ছিল। কিন্তু আবার পথ আটকালে রায়েরা। কল্যাণেশ্বরেরা। এবার কল্যাণেশ্বর একা নয়। গোবরডাঙার খুড়িমাও বলেছিলেন—না, সটাতে হ্যাঁ বলতে পারব না।

তবে সিদ্ধাসনের নতুন মন্দিরে আমরা দু'জনে প্রণাম করে এসেছিলাম। কেউ আপত্তি করে নি।

ওখান থেকে গোয়ানপাড়ায় ওদের গির্জেতে গিয়েছিলাম দু'জনে। সেখান থেকে ফিরে এসে শুনলাম, রায়বাড়ীর শরিকদের জটলা হচ্ছে।

আমি পরের দিন কুইনীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। প্রয়োজন নেই। দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্বের একের ষষ্ঠাংশ অংশে আমার প্রয়োজন নেই। আমার ব্যক্তিগত জমিদারী পত্তনী দরপত্তনী স্বত্ব সে কেউ নিতে পারবে না।

যদি পারে তাতেও আমার প্রয়োজন নেই।

না। প্রয়োজন নেই।

গোটা রায়বাড়ীটাই ফেটে হাঁ হয়ে গেছে। ছাদের আলসে ভেঙে পড়েছে। ছাদে জল পড়ছে। বিবিমহলের ছত্রি উড়েছে। এবার পড়বে, ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে।

১৭৯৯ সালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং তাঁর সুযোগ্য পাটোয়ার কানুনগো—কুড়ারাম রায় ভটচাজ লর্ড কর্নওয়ালিসের হুকুমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কালী-মা'র নামে জমিদারী কিনে, সন্তান-সন্ততিদের অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে দুধে-ভাতে রেখে হাসিমুখে চোখ বুজেছিলেন—আজ ১৯৪২ সালে আগস্ট মুভমেণ্টের মধ্যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় এসে সে জমিদারীর সব কিছু আছড়ে ফেলে মড় মড় করে ভেঙে দিয়ে গেল। খবর আসতে লাগল—বড় বড় জমিদারবাড়ীর কোথাও ভেঙেছে মাথা, কোথাও ভেঙেছে মাঝখানে। কোথাও ভেঙেছে ভিত থেকে।

এখন এখানে যে মাথা গুঁজে থাকতে চাইবে সে চাপা পড়বে। প্রজারা আর বেগার দেয় না। ইট-কাঠ চাপা পড়লে তাদের ধরে এনে আর ইট-কাঠ সরানো যাবে না। তোমাদের চাপা পড়ে মরতে দেখলে তারা হাততালি দিয়ে হাসবে। পালাও, এখান থেকে পালাও।

পরিশিষ্ট

চার বছর পর ১৯৫৭ সাল, জুলাই মাস। সন্ধ্যার সময় সুলতা ঘোষ বাসায় ফিরে প্রথমেই টেবিলের উপর রাখা ডাকের কাগজপত্রগুলি নেড়েচড়ে দেখলে। বেশীর ভাগই কাগজপত্র, সাপ্তাহিক পাক্ষিক পত্র, কিছু ফরেন-এম্বাসী থেকে পাঠানো কাগজ, তাদের প্রচারপত্র। বাকী সব এদেশের। কিছু বিজ্ঞাপন। কিছু বুক পোস্ট। মিটিংয়ের নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা নোটিশ। কয়েকখানা বড় চৌকো দামী খাম সরকারী ফাংশনে নিমন্ত্রণের কার্ড এসেছে। ওগুলিকে ঠেলে রাখতে গিয়ে একখানা এমনি দামী বড় চৌকো খাম তার চোখে পড়ল। সে একটু বিস্মিত হয়ে গেল। খামটার মাথায় লেখা ৺গঙ্গা। অর্থাৎ কারও শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র।

সুলতার জীবন একক জীবন, অধ্যাপনা তার জীবিকা এবং রাজনৈতিক কাজ তার জীবনাদর্শ কিংবা জীবনের নেশা; এমন জীবনে সমাজ ও সংসারের পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গে বন্ধন তার দুর্বল। মা-বাপ মারা গেছেন বছর তিনেক আগে; ১৯৫৪ সালে। তারপর সে ভাইদের সঙ্গে আলাদা হয়ে বাসা করেছে। তার এই একক জীবনে বান্ধব-বান্ধবীদের ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন বা কোন তরুণ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিয়ের নিমন্ত্রণ আসে কিন্তু 'ওঁ গঙ্গা' লেখা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ আসে না। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ এক-আধখানা আসে পোস্টকার্ড বা খামের ভিতর কার্ড—তাতে শুধু কালো বর্ডার থাকে—ওঁ গঙ্গা-টঙ্গা থাকে না। ওঁ গঙ্গা লেখা খাম এবং খামখানা বুকপোস্ট নয়; রীতিমত খামের টিকিট মারা মুখবন্ধ পত্র। ভিতরে বোধ হয় ব্যক্তিগত পত্রও আছে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়া।

পত্রখানা হাতে নিয়ে সে ভাবলে কোথা থেকে এল? কার পত্র? কে মারা গেল? টিকিটের উপর পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখে বুঝতে চেষ্টা করলে কিন্তু নাম পড়া গেল না। কলকাতার কোন পোস্টাপিস থেকে আসছে না। কলকাতার পোস্টাপিসগুলোর সীলের একটা বিশেষত্ব থাকে। এতে তা নেই।

খুলতে যেন খানিকটা সংকোচ হচ্ছে, পিছিয়ে আসতে চাচ্ছে মন। একটু চুপ ক'রে বসে থেকে সে খুলে ফেললে। কার্ড নয় চিঠি এবং একখানা নয় দু'খানা। অনুমানমত একখানা হাতে লেখা, অন্যখানা ছাপা। ভাঁজের উল্টো পিঠ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। সে আগে ছাপা চিঠিখানাই খুলে নিচের দিকে তাকিয়ে নিমন্ত্রণকর্তার নামটা পড়ল।

সাবিত্রী রায়। কীর্তিহাট, মেদিনীপুর। কীর্তিহাটের রায় মানে রায়বাড়ী। কিন্তু সাবিত্রী রায় কে? চোখের দৃষ্টি উপরে তুলতেই তার চোখ নিবদ্ধ হল একটা নামের উপর—সুরেশ্বর রায়।

আমার স্বামী সুরেশ্বর রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে আগামী ২২শে শ্রাবণ ঝুলনপূর্ণিমার দিন তাঁহার ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পারলৌকিক বৃষোৎসর্গ ক্রিয়াদি—

আর পড়তে পারলে না সুলতা, হঠাৎ বুকের মধ্যে বর্ষার ফুলে-ওঠা মেঘের মত পুঞ্জিত মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠে তার অন্তরলোকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে।

সুরেশ্বর নেই ?

কিন্তু সাবিত্রী দেবী কে ? সুরেশ্বর বিয়ে করেছিল কুইনী মুখার্জী বলে একটি ক্রীশ্চান মেয়েকে। গোয়ানপাড়ার ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং সে তো সাবিত্রী নয়। তবে নতুন বিয়ে করেছে সুরেশ্বর ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সুলতা। মনে পড়ল চার বছর আগে দুদিন ধরে সেই রায়-বাড়ীর জবানবন্দী শোনার কথা। ১৯৪২-এর সাইক্লোনের রাত্রে সুরেশ্বর এবং কুইনী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল এবং কালী-মায়ের প্রসাদী সিঁদুর রায়বংশের মেয়েদের সামনে কুইনীর সিঁথিতে পরিয়ে দিয়েছিল। এবং কলকাতা চলে এসেছিল ক'দিন পরই। কীর্তিহাটে থাকতে পারে নি, থাকা সম্ভবপর হয় নি। রায়বংশের পুরুষেরা আপত্তি করেছিল। যে-বাড়ীতে পাষাণময়ী কালী প্রতিষ্ঠিতা, রাধাসুন্দর বিগ্রহ এবং রাজরাজেশ্বর সৌভাগ্যশিলা শালগ্রাম অধিষ্ঠিত সে বাড়ীতে এই ধরনের বিবাহ সিদ্ধ নয় এবং কোন ক্রীশ্চান বা ভিন্নজাতীয়া স্ত্রীকে নিয়ে কেউ এই রায়বাড়ী বসবাসেরও অধিকারী নন অথবা সম্পত্তিরও অংশীদার হতে পারেন না কারণ সম্পত্তি সমস্তই দেবোত্তর।

তাই কুইনীকে নিয়ে কলকাতা পালিয়ে এসেছিল সুরেশ্বর। তারপর লেগেছিল ওই বিয়েকে উপলক্ষ করে মামলা। প্রকাণ্ড মামলা। সুরেশ্বর বলেছিল—প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মে রায়বাড়ীকে একদিন হারিয়ে যেতে হবে নগণ্য হয়ে সব মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে হবে। মুঘল বাদশাহদের বংশের ছেলেদের নাকি কুরশীনামা ধ'রে খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ যে টাঙায় চড়ে লোকে তাদের খোঁজে সেই টাঙার টাঙাওয়ালাই হয়তো বাদশা বংশের। রায়বাড়ীরও সেই পালা শুরু হয়েছে। আমি এরই মধ্যে নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু দেনা শোধ করতে সংকল্প করেছিলাম বাবার মৃত্যুর পর ; মৃত্যুশয্যায় মাও আমাকে বলতেন। সেদিনও বলেছেন। সর্বশেষ বলেছিলেন—ঠাকুমা উমা দেবী। তাঁর আশীর্বাদই হোক আর যাই হোক, গোয়ানপাড়ার ক্রীশ্চান মেয়ে কুইনীর রূপের মোহ যখন আমার টানলে, যখন আমি জমিদারীর অর্থবল নিয়েও তাকে জমিদারের ছেলের মত জয় করে দেনার ভার বৃদ্ধি করি নি, তাকে প্রেম দিয়ে জয় ক'রে তার সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বেঁধে কিছু দেনা শোধই করেছিলাম। কিন্তু তা রায়বাড়ীর শরিকেরা মঞ্জুর করলে না। দেবতার দোহাই দিয়ে আদালতে নালিশ করলে—আমার জাত গেছে এ বিয়ে ক'রে, সুতরাং দেব-সেবায় আমার অধিকার নেই। দেবসেবায় অধিকার না থাকলে দেবত্র সম্পত্তি পাব না এবং হিন্দু ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের অর্জিত সম্পত্তির একটি কণারও আমি অধিকারী হতে পারি না। এ দেশের ধর্মাধিকরণের মামলার ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ইতিহাসেও আছে।

সুলতাই তাকে বাধা দিয়েছিল। চোখে দেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব থেকে বড়

কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—ক'বছর আগে যে দেশটা স্বাধীন হতে গিয়ে ধর্মের পর কবন্ধ হয়ে তবে রেহাই পেলে সে দেশে ওর নজীরের আর দরকার নেই সুরেশ্বর। তুমি বল কি হল তারপর ?

হেসে সুরেশ্বর বলেছিল—কি আর ? মামলা, মামলা দায়ের হল, মেদিনীপুরের জজ কোর্টে। আর কীর্তিহাটের পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণ ও হিন্দুসমাজের মাতব্বরদের ডেকে রায়বংশের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল দু'বছরের মধ্যে মামলা মেদিনীপুর কোর্ট থেকে হাইকোর্টে এসে দাখিল হয়েছিল। এবং এ মামলায় এবার দীর্ঘকাল পর ঘরের কোটরের অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন আমার জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপৌত্র। যজ্ঞেশ্বর রায় দেবেশ্বরের সামনে তাঁর প্রিয়পাত্রী গবর্নেস মেমসাহেবের পিঠে চাবুক মেরে তাড়িয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় বাপের কদাচারের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় নিজের মাকে ক্রীশ্চানপাড়ায় ক্রীশ্চানের ঘরে জল খাওয়ার জন্ম পাগল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে বৃন্দাবনে বনবাসিনী করেছিলেন ভায়লেটের পুত্রের দৌহিত্রী কুইনীকে ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিয়ে করার যে অন্যায় এবং যে অনাচার আমি করলাম বলে তাঁর মনে হল তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাছাড়া তখন তিনি অবস্থার দিক দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। যুদ্ধের কাল, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধ এসে পড়েছে ; বার্মা ফ্রণ্টে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি উঠেছে ; কলকাতার আকাশে জাপানী বম্বার এসে বম্বিং করে গেছে। ইংরেজ আমেরিকান কাফ্রি নিগ্রো পল্টনে দেশ ছেয়ে গেছে। তার সঙ্গে এসেছে লাখ লাখ টাকার নোট, দেশের হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই সুযোগে জ্যাঠামশাই আবার নেমেছিলেন ব্যবসাতে। তাঁর দুই ছেলে এক অ্যামেরিকান কর্নেলের সুনজরে পড়ে মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট পেয়েছেন যা থেকে রাতারাতি অবস্থা ফিরে গেছে। আবার গাড়ী কিনেছে বাড়ী কিনেছে ; সন্ধ্যার অবকাশ বিনোদনের জন্ম ময়দানে ময়দানে নিত্যনতুন বিনোদিনীর সন্ধান ক'রে বেড়ায়। তারাও এসে দাঁড়াল বাপের পিছনে। যজ্ঞেশ্বর রায় কতকগুলো পত্র বের করেছিলেন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেশ্বর রায় লিখেছিলেন পরস্পরকে। তাতে তাঁর স্বপক্ষে যাবার মত অনেক কিছু ছিল।

সে মামলা ১৯৫৩ সালে সেদিনও মেটে নি। তখনও মামলা চলছিল।

সব মনে পড়ছে সুলতার। ওঃ, সুরেশ্বর নেই! সুরেশ্বর! সুরেশ্বর তার জীবনের প্রথম যৌবনস্বপ্নের রাজপুত্র। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়েই সে এসেছিল। সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাড়ানাড়ি করতে করতে সে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল।

ফুল তুলে এনে ঢেলে দিয়ে বলেছিল—মালা গাঁথ। সে মালা গাঁথলে, সুরেশ্বরও মালা গেঁথেছিল কিন্তু বিনিময় করা হয়ে উঠল না। কোথা থেকে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল

তারই পূর্বপুরুষের রক্তের স্রোত। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের পিছন থেকে ডাক দিয়েছিল তার নরক-যন্ত্রণাকাতর পূর্বপুরুষেরা। 'উদ্ধার কর—আমাদের উদ্ধার কর। আমরা বহু ঋণে ঋণী : সে ঋণ শোধ করে আমাদের মুক্ত কর।'

থাক—সে সব কথা থাক। সে সব কথা চাপাই পড়ে থাক ; না—চাপা পড়ে নয়, কালস্রোতে অতীতকালের বিস্মৃতির দিগন্তে অন্ধকারে হারিয়ে যাক।

সুরেশ্বর সেই দেনা শোধ করতে চেয়েছিল।

সেদিনও তাই সে বলেছিল সুলতাকে। বলেছিল—এই মামলা আমার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট ক'রে দিলে সুলতা।

বড় বড় আইনজ্ঞেরা বললেন—ব্যাপারটা কতটা জটিল বুঝতে পারছি না। দলিলে অনেক রকম রয়েছে। অনেক ব্যাখ্যা হয়। আচরণেও তাঁরা অনেক রকম ক'রে গেছেন। তবু একটা কাজ করা ভাল। আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করুন। দেবোত্তর বা পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। তিন আইনে বিয়ে করেছেন, ওতে আপনার ধর্ম আপনার, স্ত্রীর ধর্ম তাঁর, তা আইন মানবে। কিন্তু কীর্তিহাটের দেবোত্তর এলাকার মধ্যে তাঁকে আনবেন না। তাতে ওঁরা সুবিধে পাবেন।

শুনে কুইনী আমাকে বললে—তুমি আমাকে বিদায় দাও। আমি চলে যাই। বিদায় না দাও আমি জোর ক'রে চলে যাব।

সুরেশ্বর বলেছিল—বলতে গেলে সে সংঘর্ষ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কুইনী উপবাস শুরু করেছিল। তার স্বামীর জীবনে ঘরে-সংসারে যদি সে সর্বময়ী কর্ত্রীত্ব না পায় তবে বিবাহ তার কিসের বিবাহ? আর এ যদি দেবেশ্বর রায়ের ঋণশোধ হয় তা হলেই বা সে এ বিবাহ স্বীকার করবে কেন? না, তাও সে চায় না। দেবেশ্বর-ভায়লেটের জীবনের দেনাপাওনার শোধবোধ হিসেবনিকেশ একান্তভাবে তাদের ব্যাপার। সুরেশ্বরও দেবেশ্বর রায় নয়, সেও ভায়লেট নয়।

সুরেশ্বর হেসে সেদিন সুলতাকে বলেছিল, আজও সুলতার মনে পড়ছে তার সে হাসিমুখ ; সুরেশ্বর বলেছিল—নারী চরিত্র, নারীর মন, নারীর হৃদয় সবই বিচিত্র—সম্ভবতঃ বিধাতার পরম রহস্যময় সৃষ্টি সুলতা। সম্ভবতঃ সে কথা তোমরা নিজেরাও জান না। কুইনী আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছিল। আমি যখন বললাম—বেশ চাইনে আমি দেবোত্তরের সেবায়েতের অধিকার। কি হবে ওতে? কি আছে? আছে শুধু দেবতার প্রসাদী অন্ন আর ইস্কুল, ডাক্তারখানায় ফাউণ্ডার হিসেবে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হওয়ার অধিকার। ও আমি চাইনে।

কুইনী সারাদিন ভেবেচিন্তে বলেছিলে—না, তাও ছেড়ে দিতে পাবে না।

—কি করব তা হ'লে আমাকে বল?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল—সে আমাকে বলে দিতে হবে? তুমি জমিদারের বংশের ছেলে—তুমি জান না? তুমি মামলা লড়ে যাও।

—সেই মামলার জন্যই তো উকীলরা বলেছে—আমরা যেন এখন রায়বাড়ীর দেবোত্তরের সীমানার মধ্যে বাস না করি। আমরা তিন আইনমতে বিয়ে করেছি; ওতে আমার জাত যায় নি, যাবে না। আজকে বিলেত থেকে এসে কেউ প্রায়শ্চিত্তও করে না। আপত্তি গ্রাহ্য হতে পারে যদি তুমি মনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে দেবতার পূজার্চনার উদ্যোগ-আয়োজনে হাত দাও। মন্দিরে ঢুকতে যাও—

—মন্দিরে না হয় নাই ঢুকলাম কিন্তু তোমার স্ত্রী হয়ে আমি সে অধিকারই বা পাব না কেন? চোখ ফেটে তার জল এসেছিল।

বলেছিল—তোমার ভগবানের কাছে যদি আমি অস্পৃশ্য হই তবে আমি তোমার ঘরের অধিকার নিয়ে কি করব?

এবার কেঁদে ফেলেছিল ঝর ঝর ক'রে—তাহলে আমার ঠাঁই কোথা রইল বল? গোয়ানপাড়ার ওদের কাছেও আমার আর স্থান নেই, তোমাদের বাড়ী কীর্তিহাটের বাড়ীতেও না। তোমার স্বর্গেও না? অথচ সম্পত্তির অধিকাংশই আজ তোমার। তুমি জমিদার। আমার জন্যে তুমি চোর সাজবে সেখানে? আমি তোমার স্ত্রী হয়েও আমার প্রাপ্য সম্মান পাব না? তার চেয়ে মুক্তি দাও আমাকে।

সুরেশ্বর বলেছিল—আমি সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম দেবোত্তরের অধিকার ছেড়ে দেব আমি। আমি ধর্ম বলতে গেলে মানিনে। তবু তোমার ধর্মান্তর গ্রহণ করতেও রাজী আছি। আমি রাজ্যের জন্য রামের মত সীতাকে বনবাস দিতে চাইনে। তার থেকে আমিও বনবাসী হব তোমার সঙ্গে।

কিন্তু তাতেও সে রাজী হয় নি।

—না। না। বলে সে শুধু কেঁদেছিল। শুধু কাঁদাই নয়, সাইক্লোনের রাত্রে সে যেমন ভয়ার্ত হয়েছিল তেমনি ভয়ার্ত হয়ে পড়েছিল। বাড়ী থেকে চলে যাবার জন্যে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েও সে ফিরে এসেছিল। যেতে তার সাহস হয় নি। ডাইভোর্সের কথাও সে তুলতে পারে নি। কারণ সে তখন একা নয়। তার গর্ভে তখন আমাদের সন্তান এসেছে।

আমি তাকে বলেছিলাম—তা হ'লে এক কাজ কর। তুমিই হিন্দুধর্ম গ্রহণ কর। তোমার পূর্বপুরুষেরা তো হিন্দু ছিলেন।

তীক্ষ্নস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠেছিল সে—না।

মনে পড়ছে সুলতার—সুরেশ্বর বলেছিল—দেখ সুলতা, যদি বলতে পারতাম বা সত্যিই এমন হ'ত যে বিষয়সম্পদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচা যায় বা তার আকর্ষণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে

একটি পুরুষ এবং একটি নারী পথে বেরিয়ে গাছতলায় বাসা বাঁধতে পারত তা হ'লে সে কথাটা আজ তোমার কাছে উঁচুগলায় বলতে বড় ভাল হ'ত। অন্ততঃ উল্লাস বোধ করতাম। কিন্তু তা হয় নি। এবং সচরাচর তা হয় না। আমাদের দেশে কত অসবর্ণ এবং এ জাতে ও জাতে প্রেম ব্যর্থ হয়েছে তার সংখ্যা নেই। তাতে সমাজ দায়ী বলে এসেছি কিন্তু সমাজের সেখানে শুধু একঘরে করার ক্ষমতাটাই চরম ক্ষমতা নয়, চরম ক্ষমতা সেখানে ঘর থেকে বের করে দেওয়া—সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া। আমার সম্পত্তি কম সম্পত্তি নয়। মূল দেবোত্তরের আয়ও আমার অংশে খরচখরচা বাদে চার হাজার টাকা। তার সঙ্গে ছিল এক বিচিত্র জেদ। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"।

যে জেদে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী শেষ হয়ে গিয়েছিল। যে জেদের মামলায় শোভাবাজারের দেবেদের বাড়ীর মামলায় ছ-সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছিল।

আবার কুইনীর এবং আমার আকর্ষণ, আমাদের প্রেম এমন ক্ষীণজীবী ছিল না—যা এই স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রথম আঘাতেই মরে যাবে।

আমরা মিথ্যাবাদীও ছিলাম না—আজও নই।

আমরা শেষ পর্যন্ত মামলার জন্যেই আইনজ্ঞদের পরামর্শে আলাদা বাস করতে লাগলাম; কুইনী চলে গেল এলিয়ট রোডের বাড়ীতে। সেখান থেকে নার্সিংহোমে। সেখানেই আমাদের একমাত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল।

সুলতা বিস্মিত হয়েছিল—তোমার ছেলে?

—হ্যাঁ। আমাদের ছেলে। কুইনীর এবং আমার। মানবেশ্বর। কুইনী তাকে নিয়ে দেরাদুনে থাকে। ছেলে থাকে রেসিডেনসিয়াল ইস্কুলে, কুইনী থাকে বাড়ীতে—সেখানে একখানা বাড়ী কিনেছে সে। ওখানে সে চাকরিও একটা করে। মানবেশ্বরের জন্মের পর সে ভর্তি হয়েছিল কলেজে; তোমাকে আগে বলেছি সে অর্চনার সঙ্গে এম-এ পাস করেছিল। সে আমার কাছ থেকে তার নিজের জন্যে কিছুই নেয় না, মানবের খরচ নেয়। সম্ভবতঃ আমরা দুজনে পরস্পর থেকে দূরে গিয়ে পড়েছি। অনেকটা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

পরস্পর থেকে দূরে দূরে থাকলে যা হয়। যেমন তোমার সঙ্গে হয়েছে। তাই। তা ছাড়াও কারণ আছে সুলতা। সে যা চায় আমি তা ঠিক সমর্থন করি না। আমি যা চাই তার সে প্রতিবাদ করে।

দেখ, আমার মনে একটা কল্পনা আছে। রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা মানুষের কল্যাণ যা ক'রে গেছেন তার পুণ্য তাঁদের—কিন্তু যে সব অকল্যাণ অত্যাচার করে গেছেন সে তাঁদের পাপ তাঁদের দুর্নাম, যা আজকে রায়বংশের ছেলেদের কপালে উল্কিতে কলঙ্কচিহ্নের মত আঁকা হয়ে গেছে, তার জন্যে কিছু করে যাব।

১৯৪৮।৪৯ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষের ক্রমশ গ'ড়ে ওঠা তোমরাও দেখেছ, হয়তো, রাজ-

নীতি ভাল বোঝ, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছ, তোমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পার কিন্তু আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম, শিল্পী হিসেবে কাজ পেয়েছিলাম, সে আমি নিয়েও ছিলাম। অবস্থা স্বচ্ছল বলে প্রত্যাখ্যান করি নি। কয়েকজন বড় নেতা বা ভারতভাগ্যবিধাতার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরা স্নেহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল একজন। তিনি প্রথম দিন আমাকে দেখে বলেছিলেন—তুমি আর্টিস্ট রয় ?

বলেছিলাম—Yes sir.

—আমার মনে হচ্ছে তোমার পিছনে একটা পুরনো ফ্যামিলির ট্রাডিশন রয়েছে। তোমার চেহারা তোমার সহবৎ বলছে।

বলেছিলাম—সামান্য আয়ের জমিদারবংশের ছেলে।

—হাঁ। সেই কথাই বলছি। খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। আরও খুশী হয়েছি তুমি শিল্পী হিসেবে কাজ করছ বলে। গুড।

তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম সুলতা। সেই সূত্রে আমি ভারতবর্ষের ইন্টিগ্রেশন চোখে দেখেছি। ভারতবর্ষের মহারাজা মহারাণাদের সে এক আশ্চর্য মহিমা।

দু'একজন জুনাগড়ের নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সেটা ক্ষুদ্র বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়। সেটা ধর্মের গোঁড়ামি বলতে পার আবার সেটাকে উল্টে পাকিস্তানীদের ধর্মের জন্য ত্যাগের মহিমাও বলতে পার।

হেসে বলেছিল সুরেশ্বর—যে বিচারবুদ্ধি সেকুলার স্টেট ভারতবর্ষে সামাজিক বিধানে আমার এবং কুইনীর মধ্যে নল আর দময়ন্তীর মাঝখানে ছুরি হাতে কলির মত আকর্ষণের বন্ধন কেটে দিচ্ছিল।

যাক। মোটমাট দিল্লী থেকে ১৯৫০ সালে আমি একটা মন নিয়ে ফিরেছিলাম। বলতে পার, ইমোশনাল মন। যে মন আমাকে বলেছিল—জমিদারী তুমিও সরকারকে দিয়ে দাও। বল স্বাধীন ভারতবর্ষে গভর্নমেণ্টের অধীনে কীর্তিহাটের প্রজাদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে থাকব আমি। তোমরা নাও জমিদারী। জমিদারীর আয় এখানকার মানুষের কল্যাণের জন্য খরচ করা হোক।

এতে কিন্তু কুইনী রাজী হয় নি। মুখে আপত্তি করে নি কিন্তু খুশী সে হয় নি।

আমি বলেছিলাম—এতেই রায়বংশের পূর্বপুরুষদের সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সে বলেছিল—মানবেশ্বরের মা হিসেবে আমি এতে আপত্তি করছি। সে জমিদারবংশে জন্মে কেন সাধারণ প্রজার সঙ্গে এক হয়ে বাস করবে কীর্তিহাটে ?

সেদিন সুরেশ্বরের জবানবন্দীতে কীর্তিহাটের কড়চায় এইখানেই ছেদ পড়েছিল। কারণ ঠিক এই সময়টিতেই একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই ট্যাক্সি থেকেই নেমেছিল একটি আধুনিকা মেয়ে এবং তার হাত ধ'রে একটি ছেলে।

সুলতার বুঝতে বাকী থাকে নি তারা কে। ছেলেটির মুখে সুরেশ্বরের ছাপ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। মেয়েটির মধ্যে ছিল একটি মিশ্র সৌন্দর্যের আভাস। রুখু চুলে পিঙ্গল আভাস, চোখের তারাতেও ছিল তাই। তার মধ্যে আছে মোহ।

এই কুইনী। মা ছেলের মুখে পাহাড় থেকে নেমে আসার ছাপ রয়েছে।

সুরেশ্বর প্রপিতামহ-পিতামহের ঋণশোধ করতে—অঞ্জনার মেয়ে ভায়লেটের ছেলের দৌহিত্রী এই মেয়েটিকে সেই আকর্ষণে জীবনে গ্রহণ করতে চেয়েছিল অথবা ওর রূপের মোহে মোহাবিষ্ট শিল্পীর মত আপনাকে হারিয়ে ওকে গ্রহণ করেছিল, তাতে তার প্রশ্ন জেগেছিল :

কিন্তু আর সে ওখানে অপেক্ষা করতে চায় নি। চলে আসতে চেয়েছিল।

আলাপ করিয়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিল তাকে সুরেশ্বর। কিন্তু জবানবন্দী বা কড়চার কথার ওখানেই শেষ। তবে আরও খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল সুলতা কথাবার্তা থেকে।

প্রাথমিক আলাপের পর কুইনী হঠাৎ বলেছিল সুলতাকে—আপনি বয়সে বড়—দিদি বলব আপনাকে। কেমন ?

সুলতা বিব্রত বোধ করেছিল, তবু বলতে হয়েছিল—বেশ তো !

কুইনী বলেছিল—সম্ভবতঃ জানেন যে উনি জমিদারী বিনা কমপেনসেশনে নেবার জন্তে গভর্নমেণ্টকে মানে চীফ মিনিস্টার ডাঃ রায়কে পত্র লিখেছেন ?

সুলতা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—কই জানিনে তো! এ কথা তো বলনি সুরেশ্বর !

হেসে সুরেশ্বর বলেছিল—না, বলি নি। ডাঃ রায়ের জবাব এখনও পাই নি। ২৩শে অ্যাসেম্বলীতে বিলটা পাস হয়েছে। ২৪শে মানে গত পরশু হঠাৎ চিঠিটা লিখে ফেললাম। টেলিফোনে কথাটা কুইনীকে জানিয়েছিলাম। ও রাগ করলে। কথাটা তোমাকে বলা হয় নি। বলবার সময়ও পাই নি। পুরনো কথা—

কুইনী কথাটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল—দেখ, জীবনে বোধহয় আমাদের মেলবার অধিকারই ছিল না। আকর্ষণ অনেক সময় দুর্নিবার হয়, আত্মসম্বরণ করা যায় না। তবু সম্বরণ করতে হয় নইলে চরম মূল্য দিতে হয়। আমাদের তাই হয়েছে। তোমারও ভুল আমারও ভুল। তার মাশুল আমি দিচ্ছি দেব, তুমিও দিচ্ছ—সম্ভবত দিয়ে যাবে। একদিন হঠাৎ দিতে অস্বীকার ক'রে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করবে তা বলছিনে। আমরা পৃথক হয়ে রয়েছি, পৃথক হয়েই গেছি। আমার কোন দাবীই তোমার কাছে নেই। সে জানাচ্ছি নে। কিন্তু মানবেশ্বর ? ওর অধিকার ও ছাড়বে কেন ? আপনি বিচার করে বলুন সুলতাদি ?

সুলতাকে বলতে হয়েছিল—কথাটা উনি অন্যায় বলেন নি সুরেশ্বর। এতে কি হচ্ছে ? যেখানে বছরে বছরে ডেভেলপমেণ্টের নাম ক'রে দেশবিদেশ থেকে হাজার কোটী দরুণে

টাকা ঋণ নেওয়া হচ্ছে সেখানে তোমার কম্‌পেনসেশনের অঙ্ক—হয়তো লক্ষই হল—তা গভর্নমেণ্টকে ছেড়ে দিয়ে কি লাভ হবে ?

সুরেশ্বর বলেছিল—রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা মুক্তি পাবেন হয়ত। আর আমার মন বলছে, তাঁরা মুক্তি পান আর না পান, আমি মুক্তি পাব। বাংলা দেশের ইতিহাসের নথিপত্রের মধ্যে থাকবে, মহাকালের খাতাতেও থাকবে, অন্ততঃ একজনও জমিদারীর কম্‌পেনসেশনের টাকা নেয় নি।

এবার কেউ কিছু বলবার আগেই পরশু রায়বাড়ীর যে শরিকরা এসেছেন কলকাতায়, তাঁরা এসে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলেন।

কুইনী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে—এই যে এঁরাও হাজির হয়েছেন। ওঁদের দাবী মিটিয়ে মিটমাট করবে নাকি ? কিন্তু কেন করবে ? আমাদের জীবনের ধারা যুক্তবেণী থেকে মুক্তবেণীতে খুলে দু দিকে বেয়ে গেল ; চলছে সমুদ্রমুখে, আর তো মিলবে না। এখন আর কার স্রোত বন্ধ করে মুখে বাঁধ দেবে ?

—ধর, আমার।

—না, আমারও না, তোমারও না। এই ভাল।

—সুরেশ্বর। কার গম্ভীর আওয়াজ এসেছিল নিচে থেকে।

—যাচ্ছি অতুলকা। বস।

অতুলেশ্বরকে নিয়ে এসেছিল রায়বাড়ীর শরিকেরা। সুরেশ্বরের আগেই সুলতা উঠে বলেছিল—আমি উঠলাম সুরেশ্বর।

ওইখানেই সুরেশ্বর ও কীর্তিহাটের কাহিনী কড়চা জবানবন্দী শেষ হয়েছিল চার বছর আগে। ১৯৫৩ সালের ২৬শে নভেম্বর সকালবেলা ন'টার সময়। সুলতা চলে এসেছিল। আর খবর রাখে নি। ভুলেই গিয়েছিল এক রকম। ওরাও খোঁজ করে নি। সে নিজেও করে নি।

* * *

এতকাল পর আজ হঠাৎ এই চিঠিখানা।

ও। সুরেশ্বর নেই। কয়েক ফোঁটা চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ল তার। টেবিলে ভর দিয়ে হাতের তালুতে থুতনি রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। ঝিরঝির করে একপশলা বৃষ্টি এসেছে। মৃদু মৃদু জলেভেজা হাওয়া আসছে। তার সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ছাট।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হাতেলেখা চিঠিখানা খুললে। নীচে নামটা দেখলে সাবিত্রী দেবী। তার পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখেছে 'কুইনী'।

কুইনীই সাবিত্রী। সাবিত্রী ? কে ? কেউ দিয়েছিল নামটা ? কেউ মানে সুরেশ্বর, না

অর্চনা, না নিজেই ও নিয়েছিল ?

হঠাৎ কুইনী থেকে সাবিত্রী কেন ?

থাক। থাক সে কথা। সে চিঠিখানা পড়লে। লিখেছে

"ভাই সুলতাদি,

এ ছাড়া আর কি বলে সম্বোধন জানাব আপনাকে ? দেখতেই পাচ্ছেন উনি নেই। ছ' মাস আগে দোলপূর্ণিমার দিন আমাকে মানবকে ফেলে চলে গেছেন। আগামী শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া করবে মানব। আপনি আসবেন দয়া করে ? এলে খুব খুশী হব। কীর্তিহাটে আপনাকে একবার নিয়ে আসবার একান্ত অভিপ্রায় ওঁর ছিল। আমি একান্তভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, আসবেন।

ইতি সাবিত্রী রায় (কুইনী)"

সুলতা মনে মনে বললে, যাব বইকি। যাব। নিশ্চয় যাব। দেখে আসব।

গেল সুলতা। খবর দেওয়া ছিল, রাস্তাঘাট এখন সুগম হয়েছে, পিচঢালা রাস্তা, কোন কষ্ট হল না তার। স্টেশনে গাড়ী ছিল, আর ছিল রঘুয়া। পথ, মোটরেও ঘণ্টা দেড়েক লাগল। বাস চলছে, তার সঙ্গে গরুর গাড়ী চলছে। আগে বাস ছিল না, মোটর ছিল না, বড় বড় জমিদারদের পাল্কি চলত, হাতী চলত। জুড়িগাড়ীও মধ্যে মধ্যে চলত।

কীর্তিহাটে এসে যখন ঢুকল, তখন বেশ বেলা হয়েছে, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; রোদ্দুর ওঠে নি এখনও। সব যেন ভিজে নরম হয়ে গেছে। মনটা সুলতার উদাসীন হয়েই ছিল। আরও যেন সজল এবং নরম হয়ে উঠল।

সর্বাগ্রে চোখে পড়ল বিরাট বড় ভাঙা তেমহলা বাড়ীটা। প্রায় মুখথুবড়ে পড়বার মত হয়ে আছে। যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারে।

সুলতা জিজ্ঞাসা করলে রঘুকে—রঘু ওইটে বুঝি বাবুদের বাড়ী ?

—হাঁ দিদিমণি। অন্দরমহল। কাছারী, ঠাকুরবাড়ী ওদিকে আছে।

—ভেঙে ফেটে তো চৌচির হয়েছে।

—হাঁ। বাবুই তো মেরামত করাতেন। থাকত সব শরিকরা। তা মামলা বাধলো তো বন্ধ করে দিলেন মেরামত। শরিকরা সব জানলা-দরজা খুলে নিয়ে গেল। ছাদ ভাঙিয়েছে, কড়ি ভি নিয়ে গেছে।

—বিবিমহল কোনটা ?

—সেটা থোড়া দূর। একদম নদীর কিনারে। উ ঠিক আছে। মেরামত করাইসেন বাবু। ওই দেখেন।

বিবিমহল অটুট আছে। তবে নাম পাল্টে গেছে। বাড়ী ঢুকবার ফটকটার থামের গায়ে ট্যাবলেট মারা 'ভবানী নিবাস'। হাসলে সুলতা। শতাব্দীর কালিপড়া দেওয়াল কি একটা

পাতলা সাদা কালি চুনের আস্তরণে ঢাকা পড়ে! তবে সুরেশ্বরের মনটা সে বুঝতে পারলে।

অর্চনা তার জন্ম অপেক্ষা করছিল। সে বললে—এস ভাই সুলতাদি। চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। চল, শ্রাদ্ধ দেখবে চল। বার বার করে বলেছে কুইনী, যেন সুলতাদিকে নিয়ে যেও।

—সে কি সেখানে? শ্রাদ্ধের আসরে?

—হ্যাঁ।

সবিস্ময়ে সুলতা প্রশ্ন করলে—শ্রাদ্ধ কি রকম হচ্ছে, মানে কি মতে? চিঠিতে বৃষোৎসর্গ লেখা!

অর্চনা বিষণ্ণ হেসে বললে—হ্যাঁ, হিন্দুমতেই হচ্ছে। হিন্দুশ্রাদ্ধের যে পদ্ধতিতে বৃষোৎসর্গ হয়। তুমি যা বলছ বুঝেছি। কিন্তু সুরোদার মৃত্যুর পর এমন ভেঙে পড়ল কুইনী যে, শরিকদের ডেকে তাদের জমি-জেরাত ছেড়ে দিলে, তারপর পণ্ডিতদের মত নিয়ে ক্রিয়া করে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়ে সাবিত্রী নাম নিয়েছে। নামটা অবশ্য সুরোদাই দিয়ে গিছল। মানব শ্রাদ্ধ করবে, সে শ্রাদ্ধের চরু রাঁধবে। সেখানেই রয়েছে সে।

সুলতা বললে—ট্রেনেই ভোরবেলা হাতমুখ ধুয়েছি। স্টেশনে এক কাপ চাও খেয়েছি। চল আগে শ্রাদ্ধের ওখানেই চল।

—এস। বলে চলতে শুরু করলে অর্চনা। বিবিমহল থেকে বেরিয়ে বড় বাগানের ভিতর দিয়ে অন্দরমহল হয়ে ঠাকুরবাড়ী। সুলতার মনে অনেক প্রশ্ন উঠছে। অনেক প্রশ্ন। হঠাৎ সুলতা থমকে দাঁড়াল। বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অর্চনা বিষণ্ণ হেসে বললে—কুইনীর কথা?

—হ্যাঁ। সেবার তো দেখে গেলাম ওঁরা পৃথক বাস করছেন, ডাইভোর্স হবে বলেই মনে হল।

অর্চনা বললে—হ্যাঁ। তাই আমরাও ভেবেছিলাম। চলছিলও ওইভাবে। কুইনী চাকরি নিয়েছিল। দেরাদুনেই থাকত। মানব বড় হতে একটু গোলমালও বেধেছিল। সুরোদা ওকে দেরাদুন থেকে সরিয়ে শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলেন। কুইনী নভেম্বরে শীতের ছুটিতে আসত, শান্তিনিকেতনে বাড়ী কিনেছিলেন সুরোদা, সেখানে এসে ছেলেকে নিয়ে থাকত। আবার গরমের সময় মানবকে সুরোদা পাঠিয়ে দিতেন দেরাদুন। নিজে আজ কলকাতা, কাল কীর্তিহাট, পরশু শান্তিনিকেতন করে ফিরতেন। সুরোদা জমিদারী বিনা কম্পেনসেশনে গভর্নমেণ্টকে দিতে চেয়েছিলেন, জানেন কিনা জানি না।

সুলতা বললে—জানি। কি হল তার?

—ডাঃ রায় লিখেছিলেন, আপনি টাকাটা নিয়ে কিছুতে দান করে দিন। আমরা বিনা কম্পেনসেশনে জমিদারী নিতে পারি না। আইনে বাধবে। সুরোদার ইচ্ছে টাকাটা তিনি

সই করে হাত পেতে নেবেন না। তাই একটা কিছু করবার চেষ্টায় ঘুরছিলেন। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তাতে জমিদারী স্বত্বটাই দান করে দেবেন। তারাই টাকাটা নেবে। এই খাটাখাটনি আর ওই দোষ, মদ খাওয়া। ওতেই হঠাৎ হল করোনারি এ্যাটাক। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে কুইনী এল। এসে তাঁর বিছানার পাশে বসল। বাড়াবাড়িটা কমলে একদিন সুরোদাকে বললে, আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দাও। সুরোদা বললে—দেব? কুইনী কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝরে করে। ছটা মাস সুরোদার বিছানার পাশ থেকে ওঠে নি। শেষকালটায় ওর কোলেই মাথা রেখে শুয়ে থাকতে ভালবাসতেন। নামটা পাল্টে সুরোদাই সাবিত্রী বলে ডাকতেন। ওর কোলেই মাথা রেখে সুরোদা চলে গেল। গত ফাল্গুন মাসে। তখনই কুইনী ওই দীক্ষা নিয়ে বিধবা সাজলে। ওটার দরকারও ছিল। না করলে এখানকার লোকে আপত্তি করত। নারায়ণ মন্দিরের চত্বরে শ্রাদ্ধ হচ্ছে, সামনে রাজরাজেশ্বরশিলা, মন্দিরে রাধাসুন্দর বিগ্রহ, ওখানে কুইনীকে চরু রাঁধতে দিত না। অবশ্য অন্য কেউ রাঁধলেও চলত। কিন্তু কুইনী ওটা নিজে হাতে করবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যেন। মনে ওর দ্বিধা হয়েছে, কষ্ট হয়েছে দীক্ষা নিতে। আমি বলেছি, কেন, তোমার দীক্ষা নিয়ে কাজটা কি? এখন তো হিন্দু কোডবিল পাস হয়েছে, এখন তো সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধবে না।

ও বলেছিল—না, অর্চনা ভাই, তাঁর শ্রাদ্ধে চরু আমি রাঁধব না, অন্যে রাঁধবে, তা সইতে আমি পারব না। বেঁচে থাকতে এই সম্পত্তির জন্যে আর ধর্মের জন্যে আমি তাঁকে পেয়ে হারালাম। তিনি আমাকে পাবার জন্যে তপস্যা করে পেলেন, পেয়েও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি মারা গেছেন। আজ যদি আমি এইটুকু না করি, তবে মানুষেরা বলবে, এ তার কেউ নয়, কেউ ছিল না। হয়তো মানবও বলবে। হয়ত অর্চনা আমার মনও বলবে। বলবে—সে আমার কেউ ছিল না।

আমিও তার কেউ ছিলাম না। ধর্ম আর সম্পদ এ দুটো আমাদের জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিলে। আজ আর আমি আমার কিছু রাখব না। তাঁর ধর্ম, তাঁর কর্ম, তাঁর সম্পদই আজ আমার সব হোক। দীক্ষা নিতে হবে, অন্ততঃ যেন চরু রাঁধতে কেউ বাধা না দেয়। শেষকালটায় সুরোদা কুইনী কুইনী করে পাগল হয়েছিলেন। সরে গেলেই ডাকতেন, সাবিত্রী! সাবিত্রী! আর বলতেন, "আমাকে ভুলে যাবে না তো?"

কুইনী বলত—আঃ, কি বলছ!

—ভুলে গেলে যদি আত্মা থাকে তবে বড় কষ্ট পাবে, আমার আত্মা! জান এখন আত্মা আছে ভাবতে ভাল লাগছে।

কেঁদে ফেলত কুইনী। ঝরঝর করে কাঁদত। শেষকালটাতেও সেই কথা।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে অর্চনা। সম্ভবতঃ সুরেশ্বরের মৃত্যুকালটা মনে পড়ে গেল।

সুলতা বললে—শেষকালটায় আর কি হয়েছিল ?

—কি আর হবে ! যা হয়েছিল—হাইপ্রেসার। ঘুম হত না। মধ্যে মধ্যে কাশত। ঠেস দিয়ে বসা, আধশোয়া হয়ে থাকত। হাতখানা থাকত কুইনীর কাঁধে। কুইনী বুকে হাত বুলোত। একটু সামলে নিয়েই বলত—"আমাকে যেন ভুলো না।" আর আক্ষেপ, রায়-বাড়ীর দেনাশোধ হল না। রায়বাড়ীর অনেক দেনা। ভেবেছিলাম কম্পেনসেশনের টাকা দিয়ে প্রতি গ্রামে একটা করে কিছু করে দেব। তা হল না। এই আপসোস।

কথা বলতে বলতেই তারা পথ চলছিল। বিবি মহল থেকে অন্দরমহলে ঢুকে মহলের পর মহল পার হয়ে চলছিল ঠাকুরবাড়ীর দিকে।

অর্চনা বললে—কখনও বলত, দেখ সাবিত্রী, আমি বোধ হয় মিথ্যে ঋণ-ঋণ করছি। কিসের ঋণ বলত ? রায়েরা তো কীর্তিহাটের জন্য কম করে নি ! অনেক করেছে। অনেক। ইস্কুল, ডাক্তারখানা।

একেবারে তিন-চার দিন আগে সিদ্ধান্ত করেছিল, জমিদারী কম্পেনসেশনের টাকা ওই দক্ষিণী ব্রাহ্মণের ভূদান যজ্ঞে দিয়ে দিও সাবিত্রী। "সব ভূমি গোপাল কি হ্যায় !" যে বলে তার যজ্ঞে দিও। তাতেই ঋণশোধ হবে আমাদের।

সোসালিজম কম্যুনিজম বুঝি না কুইনী। 'সব ভূমি গোপাল কি' বললে বুঝতে পারি মন প্রসন্ন হয়। ওখানে দিও।

বিস্মিত হয়ে সুলতা প্রশ্ন করলে—বিনোবাজীর ভূদান দেবার কথাই বুঝি শেষ সিদ্ধান্ত ?

—হ্যাঁ। সুরোদা তাই বলে গেছে। তার থেকে ভাল পথ বা দেবার মত আধার সে আর পায় নি। কুইনী এর মধ্যে গিয়ে দেখা করে এসেছে বিনোবাজীর সঙ্গে—বলতে বলতে তারা এসে ঢুকল রাধাসুন্দরের চত্বরে।

সেখানেই হয়েছে শ্রাদ্ধের আয়োজন। সামনে বেদীর উপর বসানো সিংহাসনে রাজরাজেশ্বর ঠাকুর, তার নীচে সুরেশ্বরের নিজে হাতে আঁকা পোর্ট্রেট। চারটি ষোড়শ। তাছাড়া আরও একটি রূপোর ষোড়শ। ঝকমক করছে, পালিশ করা চাঁদির ঘড়া থালা বাটী গেলাস পিলসুজ প্রভৃতি। একখানা নতুন দামী খাট, দামী বিছানা, তাতে নেটের মশারি টাঙানো। এ ছাড়াও চারখানি খাট, তাও খাটিয়া নয় ; তাও বার্নিশ-করা ঝকমকে খাট।

ভাঙা বাড়ীর সমস্ত বিষণ্ণতা এবং সঙ্কোচ যেন ধুয়ে-মুছে গেছে এখানে, এই শ্রাদ্ধের সমারোহে এবং মূল্যবান জিনিসগুলির সমাবেশে। চত্বরের অন্যদিকে সতরঞ্চির উপর ধবধবে চাদর বিছিয়ে আসর পাতা হয়েছে। সেখানে একদিকে শাস্ত্রজ্ঞেরা বসেছেন, অন্যদিকে বসেছে গ্রামের ভদ্রজনেরা। তার সঙ্গে কয়েকজন নিমন্ত্রিত অতিথি। শাস্ত্রের আলোচনা হচ্ছে।

ওপাশে ভোগবাড়ী। সেখানে রান্নাবান্না হচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে। ব্যঞ্জন-রান্নার গন্ধ আসছে। ঘি পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আজ নিয়মমত লুচিসহযোগে ফলাহার।

একদিকে বসেছে রায়বাড়ীর মেয়েরা। রূপ দেখলেই বোঝা যায়।

মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন পুরোহিত, সামনে মুণ্ডিতমস্তক মানবেশ্বর বসে আছে, তার পিঠ ধরে বসে আছে কুইনী। চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থার মত বসে আছে। তারও ঠোঁট নড়ছে। বোধ হয় মনে মনে সেও মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে, পুরোহিত বলছেন—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবা—

সব কিছু মিলে ভারী ভাল লাগল সুলতার। ধীরে ধীরে যেন অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল সে। তার মনে হল যেন জমিদারদের শেষ এ্যারিস্টোক্রাট মানুষটি জীবনরঙ্গমঞ্চে তাঁর ভূমিকা শেষ করে প্রস্থান করছেন। প্রস্থান করছেন এই সমারোহের মধ্যে দিয়ে। যাবার সময় তাঁর সঞ্চয় সম্বল সব উজাড় করে দিয়েথুয়ে শূন্যহাতে হাসিমুখে চলে যাচ্ছেন। বংশের দেনা যদি বাকী থেকে থাকে তো থেকে গেছে, থাক। তার জন্য পরলোক থাকলে নরকে খেটে শোধ দেব। না থাকে হল না শোধ। হল না, হল না। আর পাওনাই যদি থাকে তো থাক, তাও তিনি চান না। ও সবই দান করে গেলেন। চলে যাচ্ছেন কোন ঊর্ধ্বলোকে। কাঁধের চাদর উড়ছে বাতাসে। কোঁচানো ধুতির কোঁচার ভাঁজ খুলে খুলে উড়ছে। সুরেশ্বর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

নীচে ধ্যানস্থার মত বসে আছে কুইনী।

সুলতার বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে কুইনীর উপর। চোখে জল এল তার। সে চোখ বন্ধ করলে। আঁচল দিয়ে মুছলে।

অন্ধকার হয়ে গেল সব।

যবনিকা নামছে বোধ হয়।

নতুন কালের যবনিকা উঠুক। মানুষের কালের।

সমাপ্ত